ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য : বারো টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং ৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ রাণীশ্রী প্রেস হইতে শ্রীবামাচরণ মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ওঁ তৎ সৎ

পুরুষকার-বলে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও
ঐশ্বর্য্যে অনাসক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ পরহিত-ব্রত
শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ এম. এ. কে
প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ এই
গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

৪ঠা আশ্বিন, (মহালয়া)—১৩৬৭

মুখবন্ধ

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস এই দ্বিতীয় খণ্ডেই সম্পূর্ণ হইল। আমার ইচ্ছা ছিল শঙ্করোত্তর অদ্বৈত দর্শনের বিস্তৃত বিবরণসহ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও অন্য কয়েক খানা পুরাণে বর্ণিত দর্শন, নব্য ন্যায় ও আয়ুর্বেদীয় দর্শনের বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিব। কিন্তু আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় তাহার আর সম্ভাবনা নাই। তাই শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের কিঞ্চিৎ বর্ণনা সহ গ্রন্থ শেষ করিলাম।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে, গ্রন্থ মধ্যেই তাহাদের অনেকের উল্লেখ আছে। ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্তের History of Indian Philosophy এবং ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy হইতে যে সাহায্য পাইয়াছি তাহার জন্য তাহাদের নিকট ঋণ-স্বীকার করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহান্তির নিকট হইতে অরবিন্দের দর্শনের বিবরণ লিখিতে সাহায্য পাইয়াছি। সে জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশিষ্টে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কালিক ক্রম অনুসারে গৌড়পাদের ঠিক পূর্ব্বে অথবা পরে এই অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভ্রমবশতঃ তাহা হয় নাই।

আমার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ গ্রন্থ-মধ্যে কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থ শেষে একটা নির্ঘণ্ট (Index) দেওয়াও একই কারণে সম্ভবপর হইল না। তজ্জন্য ক্রুটী স্বীকার করিতেছি।

গ্রন্থকার

১৭, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট,
কলিকাতা—২৬
৮ঠা আশ্বিন (মহালয়া)—১৩৬৭

সূচীপত্র

১। **সুশৃঙ্খল দার্শনিক প্রস্থান সমূহের উদ্ভব** ১-৯

সূত্রযুগ—ষড়দর্শন—ষড়দর্শনের মধ্যে সাধারণ অংশ—বেদের প্রামাণ্য—ষড়দর্শনের আবির্ভাবকাল।

২। **বৈশেষিক দর্শন** ১০-৫৮

কাল নির্ণয়—বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থাবলী—বৈশেষিক সূত্র—বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন—বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব—পদার্থ—দ্রব্য—পরমাণুবাদ—শঙ্করাচার্য্যকৃত পরমাণুবাদের সমালোচনা—সাম্প্রতিক বিজ্ঞানে পরমাণুবাদ—গুণ—কর্ম্ম—সামান্য—বিশেষ—সমবায়—অভাব—কার্য্য ও কারণ—বৈশেষিক চরিত্রনীতি—ঈশ্বর—মোক্ষ—সমালোচনা।

৩। **ন্যায়দর্শন** ৫৯-১৫১

বৈশেষিক দর্শনের সহিত সম্বন্ধ—ন্যায় দর্শনের উৎপত্তি—ন্যায় দর্শনের গ্রন্থাবলী—ন্যায় দর্শনের আলোচ্য বিষয়—ন্যায় সূত্রের প্রণেতা—চরক সংহিতা, বৈশেষিক সূত্র ও ন্যায় সূত্র—ন্যায় দর্শনের প্রয়োজন—পদার্থ—ন্যায় দর্শন বস্তুবাদী—ন্যায় সূত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—বৈশেষিক সূত্র এবং ন্যায় সূত্রে পদার্থ-বিভাগ—ন্যায় দর্শনে জ্ঞান তত্ত্ব—লক্ষণ ও লক্ষ্য—প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষের বিবিধ বিভাগ—স্বপ্ন—অনুমান—ন্যায় (syllogism)—পাশ্চাত্ত্য লজিকে ব্যাপ্তিবিচার—আরোহিকঅনুমান—অসৎকার্য্যবাদ—উপমান—শব্দ—বেদের প্রামাণ্য—অর্থাপত্তি ও অভাব প্রমাণ—তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা—সংশয়—স্মৃতি—আভাস—জাতি—নিগ্রহস্থান—প্রমা—অপ্রমা—(সংশয়, ভ্রম, বিপর্য্যয়) প্রাকৃতিক জগৎ—কাল—ক্ষণিকবাদ খণ্ডন—জীবাত্মা ও মুক্তি—প্রেত্যভাব বা পুনর্জন্ম—মোক্ষ—ঈশ্বরবাদ—নব্য ন্যায়—পরিসমাপ্তি।

৪। **পূর্ব্বমীমাংসা** ১৫২-২০০

উৎপত্তি ও প্রয়োজন—গ্রন্থাবলী—মীমাংসাসূত্রে আলোচিত বিষয়—প্রমাণ—প্রত্যক্ষ—অবয়ব ও অবয়বী, জাতি ও ব্যক্তি—অনুমান—

উপমান—অর্থাপত্তি—অনুপলব্ধি—শব্দ ও প্রমাণ, বেদ—জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য—জ্ঞানের স্বরূপ (প্রভাকর)—কুমারিলভট্টের জ্ঞানবাদ—দৃষ্টি-বিভ্রম—পূর্ব্বমীমাংসায় তত্ত্ববিজ্ঞান—পদার্থ বিচার—আত্মা—অপূর্ব্ব—মীমাংসাদর্শনে চরিত্রনীতি—নিঃশ্রেয়স—মীমাংসাদর্শনের নিরীশ্বরবাদ—পরিসমাপ্তি।

৫। **সাংখ্যদর্শন** ২০০-৩৪৫

উপক্রমণিকা—সাংখ্যদর্শনের গ্রন্থাবলী—কাল নির্ণয়—সাংখ্যদর্শনের মূল—চরক্ সংহিতায় সাংখ্যদর্শন—মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্য—ষষ্ঠিতন্ত্র—সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন—সৎকার্য্যবাদ—সাংখ্যে প্রমাণ—আপ্তবচন বা শব্দ প্রমাণ—শব্দ অনিত্য—স্ফোট—প্রকৃতি—ত্রিগুণ—গুণত্রয়ের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় যুক্তি—পুরুষ—মহতের অভিব্যক্তি—বুদ্ধি—অহংকার—ইন্দ্রিয়গণের অভিব্যক্তি—তন্মাত্র ও পঞ্চভূত—দেশ ও কাল—সাংখ্য মনোবিজ্ঞান—সাংখ্যের চরিত্রনীতি—জীব—প্রাণ—সর্গ-প্রতিসর্গ—প্রকৃতি-লয়—বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডন—ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ—জড়বাদ খণ্ডন—অদ্বৈতবাদ খণ্ডন—নিত্য ঈশ্বরবাদ খণ্ডন—সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ—সাংখ্য ও বেদ—সংসৃতি বা জন্মান্তর—সাংখ্যের অবিবেক ও বেদান্তের অবিদ্যা—বিবেক জ্ঞানের ফল—আখ্যায়িকা ও উপমা—সাংখ্যদর্শনে বন্ধ ও মুক্তি—সাংখ্য ও বেদান্ত।

৬। **যোগদর্শন—** ৩৪৬-৩৮৯

উপক্রমণিকা—যোগদর্শনের প্রাচীনত্ব—"যোগ" শব্দের অর্থ—যোগ-দর্শনের গ্রন্থাবলী—যোগ-দর্শনের তত্ত্বাবলী—প্রকৃতি ও পুরুষ—দ্রষ্টা ও দৃশ্য, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ—যোগের প্রয়োজন—চিত্তবৃত্তি—দুঃখমুক্তির উপায়—সম্প্র-জ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ—যোগের সাধন—চিত্তের একাগ্রতা লাভের উপায়—যোগ দর্শনে ঈশ্বর—যোগের বস্তু-তন্ত্রতা—মনোবিজ্ঞান—চিত্তের ত্রিবিধ পরিণাম—ভূত ও ইন্দ্রিয় পরিণাম—সিদ্ধি বা যোগ-বিভূতি—নির্ম্মাণ চিত্ত ও কায়ব্যূহ—কর্ম্মফল ও কর্ম্মবাসনা—কৈবল্য।

৭। **উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন—** ৩৯০-৪১৩

রচনা কাল—অন্যান্য দর্শনের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সম্বন্ধ—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও টীকা—ব্রহ্মসূত্রের সংক্ষিপ্তসার।

৮। অদ্বৈত বেদান্ত— ৩৯০-৪১৩

গৌড়পাদ—গৌড়পাদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম। ৪১৩-৪২৩

৯। ভর্ত্তৃহরি ও ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ৪২৩-৪২৪

১০। শঙ্করাচার্য্য— ৪২৪-৫২৮

শঙ্করের দর্শন—চতুঃসূত্রী—জ্ঞান-তত্ত্ব—প্রমাণ—অনুমান—শব্দ ও অর্থ—শব্দ-প্রমাণ—সৎকার্যবাদ—সৎ ও অসৎ—দেশ, কাল ও কারণ—বিরুদ্ধ মত খণ্ডন—বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন—পূর্ব্ব মীমাংসা খণ্ডন—সাংখ্য ও যোগ খণ্ডন—বৈশেষিকমত খণ্ডন—বৌদ্ধমত খণ্ডন—জৈনমত খণ্ডন—ভাগবত মত খণ্ডন—ব্রহ্ম ও জগৎ—বিশুদ্ধ চৈতন্য—ব্রহ্মের স্বরূপ—জগতের মিথ্যাত্ব সত্য ও মিথ্যা—ব্যবহারিক জ্ঞান—ভ্রান্তি জ্ঞান—মায়া—অবিদ্যা—মায়াবাদের যৌক্তিকতা—ঈশ্বর—কর্ম্মবাদ—এক জীববাদ ও অনেকজীববাদ—দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ—শঙ্কর দর্শনে চরিত্রনীতি—উপাসনা—মোক্ষ—শঙ্কর, ক্যাণ্ট ও ফিষ্‌টে—শাঙ্কর দর্শন ও ব্রহ্মসূত্র—আধুনিক বিজ্ঞানও মায়াবাদ—পরিসমাপ্তি।

১১। ভাস্করাচার্য্য—ভেদাভেদ-বাদ ৫২৯

১২। যাদবপ্রকাশ—রামানুজের গুরু-ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ ৫৩০

১৩। রামানুজ ৫৩১-৫৬৩

জীবনী—সিদ্ধান্ত—প্রমাণ—দ্রব্য ও গুণ—অনুভূতি ও সংবিদের স্বরূপ—জীব—ঈশ্বর—সৃষ্টি—অবিদ্যা ও মায়া—শঙ্কর ও রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ।

১৪। নিম্বার্কাচার্য্য ৫৬৩-৫৬৬

চতুঃসন সম্প্রদায়—রাধাকৃষ্ণের উপাসনা—রামানুজ ও নিম্বার্ক।

১৫। শৈবদর্শন—ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য ৫৬৬-৫৭৫

শৈবসিদ্ধান্ত—২৮ আগম—ঈশ্বর—আত্মা—বিশ্ব ও মানব তাহার দেহ—মায়া উপাদান, অবিনাশী, বিশ্বের বীজ—জগৎ মিথ্যা নহে—সৃষ্টিতে শুভ উদ্দেশ্য—শিব করুণাময়।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন—আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারা—শিব সূত্র-বসুগুপ্ত—অভিনবগুপ্ত।
বীরশৈব দর্শন—শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—প্রতিষ্ঠাতা বসব—বসব-সংহিতা।

১৬। দ্বৈতবাদ—মধ্বাচার্য্য ৫৭৫-৫৭৯

বায়ু, হরির প্রেয়সী প্রতিমা—তত্ত্ববাদ—পঞ্চভেদ।

১৭। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ— ৫৮০-৫৮২

বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য্য—মোক্ষ—মর্য্যাদামার্গ—পুষ্টিমার্গ।

১৮। শাক্তদর্শন— ৫৮৩-৫৯২

শাক্ত আগম—শুভাগম—কৌল আগম—মিশ্রাগম—তন্ত্র—প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, আধুনিক যুগ—শাক্ত দর্শনের গ্রন্থাবলী—শাক্ত মনোবিজ্ঞান শাক্ত দ্বৈতবাদ—নাদ তত্ত্ব—শব্দ ব্রহ্ম—মায়া ও মুক্তি।

১৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন— ৫৯৩-৫৯৮
শ্রীচৈতন্য—জীব গোস্বামী।

২০। মধুসূদন সরস্বতী—প্রস্থান ভেদ—অদ্বৈত সিদ্ধি—গীতার টীকা।

২১। শ্রীঅরবিন্দ— ৫৯৮-৬০২

মানস সংবিদের পরিবর্ত্তন (Transformation of Consciousness)—অতি মানস সংবিদ—উর্দ্ধ মানস-সংবিদ—মানস সংবিদ—জৈব সংবিদ—পার্থিব সংবিদ—আরোহণ ও অবতরণ—জন্মান্তর—বেদ-ব্যাখ্যা—পুরুষোত্তম তত্ত্ব—মুক্তি।

২২। পরিশিষ্ট—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ— ৬০৩-৬২০

গ্রন্থারম্ভ কাহিনী—রামের প্রতি বশিষ্ঠের উপদেশ—মনস্তত্ত্ব—পরমার্থ—উৎপত্তি ও সৃষ্টি—দৈব ও পুরুষকার—মুক্তি—সমালোচনা।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সুশৃঙ্খল দার্শনিক প্রস্থান সমূহের উদ্ভব

১

সূত্র যুগ

বেদে দার্শনিক তত্ত্ব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। উপনিষদেও দর্শন সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত হয় নাই। যুক্তিদ্বারা কোনও মত সমর্থনের চেষ্টা বেদ ও উপনিষদে নাই। ঋষিগণ যাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের বাক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বিরুদ্ধ মতও যে ছিল না তাহা নহে। উপনিষদের পরবর্ত্তী যুগে নানা মতবাদের উদ্ভব হয়। এই সকল মতের সংঘর্ষের ফলে প্রত্যেক মত যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন উপলব্ধ হয়, এবং শৃংখলাবদ্ধ দর্শনের উদ্ভব হয়। জৈন ও বৌদ্ধগণ যখন বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করিলেন এবং বেদ-বিরোধী মত প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন পরম্পরাগত বিশ্বাসে আঘাত পড়িল, এবং তাহার যৌক্তিকতা অনুসন্ধানে অনেকে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফলে যুক্তির ভিত্তির উপরে দর্শনের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা উদ্ভূত হয়। পূর্ব্বে জগতের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল মত বেদ উপনিষদাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত জ্ঞানের ভিত্তি ও প্রমাণের আলোচনা বিশেষ ছিল না। সুশৃঙ্খল দর্শনের যখন উদ্ভব হইল তখন প্রমাণের আলোচনা তাহাতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল।

সুশৃঙ্খল দর্শনের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই সূত্র সাহিত্যের উদ্ভব হয়। বৈদিক সাহিত্য কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হইত। সেই বিশাল সাহিত্য কণ্ঠস্থ রাখা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু তাহার জন্য ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টার কোনও ক্রটী হয় নাই। অন্যান্য উপায়ের সহিত এই উদ্দেশ্যে "সূত্র" রচনার সূত্রপাত

হয়। অন্য কোনও দেশে সাহিত্যসংরক্ষণের জন্য এরূপ কোনও কৌশল অবলম্বনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সূত্র সকল অতি সংক্ষিপ্ত। মধ্বাচার্য্য সূত্রের লক্ষণ-বর্ণনায় লিখিয়াছেন, তাহারা অল্পাক্ষর কিন্তু সারবৎ হইবে, অর্থাৎ অল্পাক্ষরের সাহায্যে সারমর্ম্ম প্রকাশ করিবে, এবং এরূপভাবে প্রকাশ করিবে, যাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-বিধি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে সূত্ররীতি অবলম্বিত হয়। বৈদিক সূত্রে বর্ণিত অনুষ্ঠানসকলের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা নাই, কিন্তু তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সজ্জিত হইয়াছে। "সূত্র" শব্দের অর্থ সীবন-তন্তু—যাহা দ্বারা বৈদিক অনুষ্ঠান সকল একত্রিত গ্রথিত হইয়াছিল, তাহাই সূত্র। স্মৃতির সৌকর্য্যবিধানের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে এত সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, যে অনেক স্থলে ভাষ্য ও টীকা ব্যতীত তাহাদের অর্থবোধ অসম্ভব। এই সংক্ষেপপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিয়া কেহ বলিয়াছেন, নবপুত্রের জন্মে লোকে যেরূপ আনন্দিত হয় ব্যাকরণ-সূত্রকারগণ একটি হ্রস্ব স্বরবর্ণও সূত্র হইতে বর্জন করিতে পারিলে সেইরূপ আনন্দ লাভ করেন।

ঠিক কোন্ সময়ে সূত্র-রচনার সূত্রপাত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে পাণিনি-সূত্র-রচনার পূর্ব্বেও যে অনেক সূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। ম্যাকডনেলের মতে খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ২০০ অব্দের মধ্যে সূত্র-রচনা-রীতি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৈদিক সূত্রগুলি "শ্রৌত সূত্র" নামে অভিহিত। তাহাতে প্রধান যজ্ঞগুলির বিধি বর্ণিত হইয়াছে। গৃহ্য সূত্রাবলীতে গৃহস্থাশ্রমে করণীয় অগ্নি সেবার বিধি আছে। "ধর্ম্ম" সূত্রাবলীতে সদাচার ও ব্যবহার (Law) বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেদের সহিত ধর্ম্ম-সূত্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। "প্রাতিশাখ্য সূত্রে" বেদমন্ত্রের যথাবিধি উচ্চারণ কিরূপে করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম্ম ও প্রাতিশাখ্য সূত্রাবলীর পরবর্ত্তী ব্যাকরণ-সূত্র। পাণিনী সূত্রাবলী সূত্রযুগের মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল। মাক্ষমূলারের মতে বিভিন্ন দর্শনের সূত্রগুলি বুদ্ধের পরে রচিত, কেন না তাহাতে বুদ্ধের নামের উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার মত-খণ্ডনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সূত্রে বিভিন্ন দার্শনিক মত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল মত

যে এই সকল সূত্রেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নহে। তাহাদের উদ্‌ভব হইয়াছিল সূত্র রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হয়তো এক এক দর্শনের উদ্‌ভব হইয়াছিল এবং সূত্রে গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে বহুদিন ধরিয়া তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছিল। তাহারা যে এক জনের মস্তিষ্কপ্রসূত, তাহা নহে। বহু পুরুষ ধরিয়া বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার ফল তাহারা। কবে প্রত্যেক দর্শন প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। অতি প্রাচীন কাল হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ঈশ্বর, জগৎ ও পরকাল সম্বন্ধীয় চিন্তা সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল। এই সকল চিন্তার মধ্যে সাদৃশ্য ও ভেদ উভয়ই ছিল, এই সকল চিন্তাই কালক্রমে বিভিন্ন দর্শনে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়। পরে তাহারা সূত্রে নিবদ্ধ হয়।

প্রাচীন সূত্রগুলির অনেকগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৃহস্পতি-সূত্র বৈথানস-সূত্র ও ভিক্ষু-সূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সূত্রগুলি পাওয়া যায় না। ইহারা ব্যতীতও প্রাচীন দার্শনিক সাহিত্যের এক বৃহৎ অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধ সূত্রগুলিতে ষড়দর্শনের সহিত সূত্রকারগণের যে পরিচয় ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'সূত্র' বলিতে যাহা বুঝায় বৌদ্ধ সূত্রগুলি ঠিক তাহা নহে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রগ্রন্থ দীর্ঘ ও হ্রস্ব রচনার সমষ্টি। সূত্র-রচনা-রীতি উদ্‌ভাবিত হইবার বহু পরে বৌদ্ধ সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে সূত্র শব্দের অর্থেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দীর্ঘ-সূত্রের সমষ্টি বলিয়া ত্রিপিটকের সূত্রাবলীর এক অংশের নাম দীর্ঘনিকায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—দার্শনিক সূত্রগুলিতে প্রত্যেক দর্শনের যে রূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সেই দর্শনের আদিম রূপ নহে। কালক্রমে প্রত্যেক দর্শনেরই রূপান্তর ঘটিয়াছে। অনেক নূতন বিষয় তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সূত্রে নিবদ্ধ হইবার পরে ভাষ্যকারগণের দ্বারাও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক দর্শনই প্রাচীন সংগ্রহকর্ত্তার নামে চলিয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে কনাদ দর্শনের উল্লেখ করা যায়। উক্ত দর্শনের আদিম রূপ প্রশস্তপাদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী বৈশেষিকদিগের হস্তে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র ব্যাস প্রণীত বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক ও অন্যান্য ভাষ্যকারগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাস-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া কার্য্যতঃ নূতন নূতন দর্শন রচনা করিয়াছেন। ভারতের বড় বড়

অনেক দার্শনিক আপনাদিগকে ভাষ্যকাররূপে পরিচিত করিলেও আপনাদিগের রচিত ভাষ্যের দ্বারা অবলম্বিত দার্শনিক প্রস্থানের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। নূতন নূতন টীকাকার বিরুদ্ধবাদীদিগের নূতন নূতন আক্রমণের উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

২

ষড়্‌দর্শন

ভারতের বহু দর্শনের মধ্যে কালক্রমে ছয়টি দর্শন অন্যান্য দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের নাম (১) বৈশেষিক দর্শন, (২) ন্যায়দর্শন, (৩) সাংখ্য দর্শন, (৪) যোগ দর্শন, (৫) পূর্ব্ব মীমাংসা ও (৬) উত্তর মীমাংসা। ইহারা ষড় দর্শন নামে খ্যাত। সকলেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে বলিয়া ইহারা আস্তিক দর্শন। কিন্তু হরিভদ্র রচিত "ষড় দর্শন সমুচ্চয়ে" বৌদ্ধ দর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, পূর্ব্ব মীমাংসা, জৈন দর্শন ও চার্ব্বাক দর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তের নাম নাই। হরিভদ্র জৈন ছিলেন। বোধ হয় ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তের প্রতি তাঁহার বিরাগ ছিল, তাই তাঁহার গ্রন্থে বেদান্তের বর্ণনা করেন নাই। আস্তিক ষড়-দর্শনে বিভিন্ন মত প্রপঞ্চিত হইলেও কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এই সকল মতের মধ্যে আত্যন্তিক বিরোধ নাই। এ সম্বন্ধে মধুসূদন সরস্বতীর মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।* প্রত্যেক দর্শন এক এক ঋষি কর্তৃক উদ্‌ভাবিত বলিয়া খ্যাত। ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং জগৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের মতভেদ হওয়া অসম্ভব। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ বলেন "শিষ্যদিগেকে অধিকার ও জিজ্ঞাসার ভেদ অনুসারে আচার্য্য ঋষিগণ তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশের বিভিন্নতা করিয়াছেন। "অল্পবয়স্ক বালকগণ উপবীত হইয়া আচার্য্য সমীপে বাস করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ আচার্য্য তাহাদিগকে বেদ পাঠ ও গান করাইতে অভ্যাস করাইতেন। ...পরে তাহাদিগকে পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের বিচার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। ...বিদ্যার্থিগণকে মুমুক্ষু করিবার নিমিত্ত বেদপাঠ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহাদিগের অন্তরে জীবতত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব বিষয়ে চিন্তার উদয় হয়, তৎ বিষয়েও অধিকার অনুসারে উপদেশ প্রদান করিতে ত্রুটি করিতেন না।

---

* ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা।

"বুদ্ধিমান বালকদিগের পক্ষে বৈশেষিক দর্শন প্রথম অধ্যয়নোপযোগী। যাহাতে বালকদিগের মনে জাগতিক জ্ঞাতব্য বিষয়সকলের ধারণা উপজাত হয়, তৎরূপে তাহা অতি সরলভাবে বৈশেষিক দর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। জগতের পদার্থ সকল অসংখ্য। তাহাদিগকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া সামান্য, বিশেষ ও সমবায় রূপে ইহাদের সম্বন্ধে এই দর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে। অনন্ত জগতের অনন্ত পদার্থকে এইরূপে ধারণা করিতে শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি প্রশস্ত হইত।

"বুদ্ধির ধারণাশক্তি কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলে তত্ত্ববিদ্যা সম্যক অবগত হইবার নিমিত্ত মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শন পঠিতব্য। ইহা দ্বারা বুদ্ধি এইরূপ পরিমার্জিত হয় যে অতি সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা করিবার তখন সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। প্রমাণের স্বরূপ এবং তাহার নানা প্রভেদ উপদেশ করাই গৌতম সূত্রের উদ্দেশ্য।...বেদের প্রামাণিকতা স্থাপন ও মুক্তির উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়া মহর্ষি যাহাতে শিষ্যের মতি নাস্তিকতার দিকে ধাবিত না হয় এবং মোক্ষ লাভের নিমিত্ত বৈরাগ্যযুক্ত হয়, তৎ বিষয়েও লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হন নাই।... প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত বৈশেষিক দর্শনে যে দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি ষট্‌ পদার্থের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদবলম্বনে প্রমাণবিষয়ক উপদেশের সাহায্যে বঙ্গদেশে পরমাণু-কারণত্ব-স্থাপক 'নব্য ন্যায়' প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই বৈশেষিক জগৎকারণ বাদ বলিয়া এক্ষণে পরিচিত।....অতি প্রাচীনকাল হইতেই এক শ্রেণীর পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাই বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। এতদ্বারা ঋষিদিগের মধ্যে মত ভেদ প্রমাণিত হয় না।"

"বিচার প্রণালী উত্তমরূপে অবগত হইলে পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন পঠিতব্য। এই দর্শন পাঠ করিলে বেদোক্ত সম্যক কর্ম্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। প্রাচীনকালে এই মীমাংসা দর্শন পাঠান্তেই অধিকাংশ বিদ্যার্থী গুরু গৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া....পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতেন।

"বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের উপদেশের সহিত পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের কোনও কোনও উপদেশের বিভিন্নতা আছে সন্দেহ নাই। শব্দকে বৈশেষিক দর্শনে অনিত্য বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব মীমাংসায় ইহাকে নিত্য বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কোনও মত বিরোধ নাই। ....বালকের বুদ্ধিবৃত্তির মার্জনা সহকারে তাহার অধিকারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। দিবা, রাত্র প্রভৃতি ব্যাপার বুঝাইতে সূর্য্যাদি পদার্থ সকল পৃথিবীকে অহরহঃ প্রদক্ষিণ করিতেছে

বলিয়া প্রথমে উপদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইলে এই উপদেশ ভ্রান্ত এবং পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ইহাতে উপদেষ্টাগণের মধ্যে মতবিরোধ কল্পনা করা যেমন অসঙ্গত, দার্শনিকদিগের মধ্যে মত-বিরোধ কল্পনা তদ্রূপ অসঙ্গত।"*

ইহার পরে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে যে আত্যন্তিক বিরোধ নাই, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু এক দর্শনে অন্যান্য দর্শনের মতখণ্ডনের চেষ্টা যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ষড় দর্শনের প্রত্যেকের ক্রমবিকাশে চারিটি ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ক্রমে অসংবদ্ধ অবস্থা—অসংহত শৃঙ্খলাবিহীন মতের সমষ্টি। দ্বিতীয় ক্রমে প্রত্যেক দর্শনের বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংবদ্ধ, এবং তাহাদের সংহতি হইতে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ দার্শনিক প্রস্থানের উদ্ভব। এই অবস্থায় দর্শন সূত্রাবলীতে নিবদ্ধ। তৃতীয় ক্রমে ভাষ্যকারগণ কর্ত্তৃক সূত্রদিগের ব্যাখ্যা, টীকা বৃত্তি প্রভৃতির আবির্ভাব, এবং ভাষ্যকার, টীকাকার ও বৃত্তিকার কর্ত্তৃক দর্শনের অনেক ত্রুটীর সংশোধন এবং নূতন নূতন বিষয়ের অনুপ্রবেশ। প্রত্যেক দর্শনের প্রাচীন সূত্রগুলি যিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নামেই সেই দর্শন চলিয়া আসিতেছে।

৩

ষড়-দর্শনের মধ্যে সাধারণ অংশ

বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা থাকিলেও কতকগুলি বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মিল আছে।

ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের দার্শনিক চিন্তা জাতির সাধারণ জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতেছিল। ভাষা যেমন কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, এই সকল চিন্তাও তেমনি কোনও ব্যক্তিবিশেষে আরোপিত হইত না। সকলের তাহাতে সমান অধিকার ছিল। এই জন্যই কতকগুলি মত সকল দর্শনেই অবলম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি

* ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা—স্বামী সন্তদাস বাবাজী ৩৩১ পৃ

পারিভাষিক শব্দও সকল দর্শনেই ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। আত্মা, পুরুষ, জীব, মায়া, অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দ ষড়দর্শনকারদিগের সৃষ্ট নহে, পূর্ব্বগামী-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই সকল শব্দ ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-সংযুক্ত হইলেও একই উৎস হইতে যে তাহারা গৃহীত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বিভিন্ন দর্শনে যে যে মতের ঐক্য আছে, তাহারাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। বেদ ও উপনিষৎ তাহাদের উৎস। এই সকল মত নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ পুনর্জন্ম, পুনর্ভব বা সংসার-বাদ। মৃত্যুর পরে জীবাত্মা কর্মানুসারে মানুষ, ইতর জীব অথবা উদ্ভিদ দেহে জন্মগ্রহণ করে, এই মত সকল দর্শনেই স্বীকৃত। দ্বিতীয়তঃ আত্মার অমরতা। ইহা এতই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, যে ইহার প্রমাণের জন্য কোনও চেষ্টাই কোনও দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। বার্হস্পত্য দর্শনে মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে বটে, কিন্তু অন্য সকল দর্শনেই ইহা স্বীকৃত। আত্মার অবিনশ্বরতার সহিত জন্মান্তরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং এই জন্মান্তর নানা দুঃখের আকর বলিয়া ইহা হইতে মুক্তিই সকল দর্শনের কাম্য। তৃতীয়তঃ কর্ম্মবাদ। প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক উচ্চারিত বাক্য এবং প্রত্যেক কর্ম্ম ফল প্রসব করে এবং তাহার ফল জীবকে ইহ জন্মেই হউক কি পর জন্মেই হউক ভোগ করিতে হয়। ইহাই কর্ম্মবাদ, সকল দর্শনেই স্বীকৃত। চতুর্থতঃ—জীবন দুঃখময়, এবং দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্ধারণ। দুঃখ-মুক্তিই সকল দর্শনের প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত। এই জন্য অনেকে ভারতীয় দার্শনিক-দিগকে দুঃখবাদী (Pessimist) বলিয়াছেন। কিন্তু এই অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। জীবন দুঃখে পূর্ণ হইলেও ভারতীয় দর্শনে দুঃখ-মুক্তি, স্থায়ী সুখ ও শান্তিলাভের উপায়ের নির্দেশ আছে। মাক্ষমূলার বলেন যাহাদের ভাষায় "অস্তিত্ববান্" বুঝাইতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় (সৎ), তাহাই ব্যবহৃত হয় "শুভ" (Good) বা উৎকৃষ্ট অর্থ প্রকাশ করিতে, তাহারা যে যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাকে নিতান্ত অমঙ্গল স্বরূপ বলিয়া গণ্য করিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। জগতে যে দুঃখ আছে, ইহা সত্য। এই সত্যের জ্ঞান হইতেই ভারতীয় দার্শনিকগণ দার্শনিক গবেষণার প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতে দুঃখের অস্তিত্ব থাকা অনুচিত। তাই কি উপায়ে এই দুঃখ দূর করা যায়, তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। দুঃখ আছে বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের

বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই। তাহারা দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং দুঃখ-মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদ বলা সঙ্গত নহে। পঞ্চমতঃ—ষড়দর্শনের প্রত্যেকেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছে। এই জন্যই ঈশ্বর স্বীকার না করিয়াও সাংখ্য ও পূর্ব্ব মীমাংসা আস্তিক দর্শন বলিয়া পরিগণিত।

৪

বেদের প্রামাণ্য

কিন্তু বেদের প্রামাণ্য-স্বীকারের অর্থ কি? পূর্ব্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসার বেদের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। পূর্ব্ব মীমাংসায় বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। উত্তর মীমাংসায় উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মকে "শাস্ত্র-যোনি" বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ বেদ হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, উক্ত জ্ঞানলাভের অন্য উপায় নাই। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের সহিত বেদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নহে। তাহাতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলেও বেদ দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করা হয় নাই। কিন্তু বেদের প্রামাণিকতা স্বীকারের মূলে এই বিশ্বাস বর্ত্তমান, যে আধ্যাত্মিক অনুভব পরমার্থ-নির্ণয়ে বুদ্ধি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আলোক। নাস্তিকতা-অপবাদ পরিহার ইহার উদ্দেশ্য নহে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা বিশ্ব-সমস্যা-সমাধান-প্রচেষ্টার ফল সন্দেহ-সমাকুল। অন্য দিকে শ্রৌত মীমাংসা ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সার ঊর্দ্ধে অবস্থিত ঋষিদিগের অনুভূতির ফল। এই অনুভূতিও প্রত্যক্ষের অনুভূতি—সর্ব্বসাধারণের অনুভূতি না হইলেও, যাহাদিগের কথা অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই, তাহাদিগের অনুভূতি। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে এই অনুভূতিই (অপরোক্ষ জ্ঞান) প্রমাণ বলিয়া ষড় দর্শনে গৃহীত হইয়াছে।

দুঃখ অজ্ঞান প্রসূত। দুঃখ-মুক্তির উপায় জ্ঞান। এই জ্ঞান বুদ্ধির জ্ঞান নহে। মানবীয় বুদ্ধি জড় দেহের বাধায় সংকীর্ণ। বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া এক প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়; তাহা অব্যবহিত—যুক্তি-তর্কের অতীত জ্ঞান (Supra mental knowledge)। এই জ্ঞানে দেশ-কালের বাধা নাই, দৈহিক ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই, অনুমানের অপেক্ষা নাই, ভ্রম-প্রমাদের অবসর নাই। মানবীয় সংবিদ অপেক্ষা উন্নততর সংবিদের অস্তিত্বে ভারতীয় দার্শনিকগণ বিশ্বাস করিতেন। প্রাণী-সাধারণ সংবিদে ও মানবীয়

সংবিদের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পার্থক্য মানবীয় সংবিদ এবং অতিমানবীয় সংবিদের মধ্যে। এই উচ্চতর সংবিদ লাভ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত, এবং তাহা লাভে সহায়তা করাই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই উচ্চতর সংবিদে বিশ্বাসই বেদের প্রামাণিকতা-স্বীকারের মূলে বর্ত্তমান। দর্শানালোচনা আমাদিগকে সত্যের মন্দিরের নিকটে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠি দর্শনের হাতে নাই। তাহা পাইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন।

বৈদিক ঋষিগণ সাধনা বলে যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই বেদে নিবদ্ধ আছে। এই জন্যই আস্তিক ষড়দর্শনে বেদ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু এই স্বীকৃতি দ্বারা দর্শনকারদিগের স্বাধীন চিন্তা প্রতিহত হয় নাই। সাংখ্য দর্শনে প্রমাণাভাবে "ঈশ্বর অসিদ্ধ" বলা হইয়াছে।

৪

ষড় দর্শনের আবির্ভাবকাল

ষড় দর্শনের আবির্ভাবকাল নিশ্চিত রূপে নির্ধারণ করা দুরূহ। গার্বের মতে সাংখ্য দর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহার পরে যোগ দর্শন, যোগের পরে পূর্ব্ব মীমাংসা ও বেদান্ত, বেদান্তের পরে বৈশেষিক ও ন্যায়। কিন্তু সকলে এই মত গ্রহণ করেন নাই। আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রথমে বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের বর্ণনা করিয়া পরে পূর্ব্ব মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শনের বর্ণনা করিব।



দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈশেষিক দর্শন

১

বৈশেষিক দর্শনের উদ্‌ভাবন করেন মহর্ষি উলুক। ইহার ভাষ্যকার প্রশস্তপাদের মতে মহর্ষি উলুকের প্রকৃত নাম ছিল কাশ্যপ। তিনি কণাদ, কণভুজ ও কণভক্ষ নামেও পরিচিত। ইনি কেবলমাত্র তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন কণাবাদ বা পরমাণুবাদ এই দর্শনের বিশেষত্ব বলিয়া উলুক এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সন্তদাস বাবাজী বলেন "সুকুমারমতি বালকদিগকে জগৎ-তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রথম সোপান বৈশেষিক দর্শন। ....ঈশ্বরের স্বরূপ কি, জীবের স্বরূপ কি, জীব ও ঈশ্বরে কিরূপ সম্বন্ধ, জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, ...এই সকল কঠিন প্রশ্নের বিচার এই দর্শনে নাই। প্রথম শিক্ষার্থী বালকদিগের মনে তাহা সচরাচর উদিতও হয় না। পরন্তু এই সকল প্রশ্নের উদয় হইবার নিমিত্ত যাহাতে বালকদিগের মন ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে থাকে, তদভিপ্রায়ে মহর্ষি কণাদ অতি সহজ উপদেশ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এই দর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ ইহাকে সম্পূর্ণ জগৎ-তত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব-নির্ণায়ক দর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতিবাক্য ও অপরাপর দর্শনের সহিত নানাপ্রকার বিরুদ্ধ মত যুক্তি-বলে স্থাপন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকারদিগের মতই বৈশেষিক মত বলিয়া পরিচিত এবং তাহাই বেদান্ত দর্শনে খণ্ডিত করা হইয়াছে।"

বৈশেষিক দর্শনের বিচার প্রণালী বিশ্লেষণমূলক, (analytic) সংশ্লেষমূলক (Synthetic) নহে। সমগ্র বিশ্বের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা সম্পূর্ণ বর্জিত না হইলেও, ইহার দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক। "বিশেষ" শব্দ হইতে "বৈশেষিক" শব্দ উৎপন্ন। "বিশেষ" "সাধারণের" বিপরীত। জড় জগৎ অসংখ্য পরমাণুর সমবায়। প্রত্যেক পরমাণু এক একটি বিশেষ। প্রত্যেক জীবাত্মাও এক একটি বিশেষ। বিশেষ দ্বারা জগতের ব্যাখ্যার চেষ্টার জন্য এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। শঙ্করাচার্য্য এই দর্শনের অনুবর্ত্তীদিগকে অর্দ্ধ বৈনাশিক বলিয়াছেন। শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগকে বৈনাশিক বলিত। বৈশেষিক দর্শন শূন্যবাদী নহে। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এই দর্শনে

নাই বলিয়া এবং ঈশ্বর বর্জন করিয়া সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকারের মতে এই দর্শনের গতি নিরীশ্বরবাদের দিকে। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য ইহাতে স্বীকৃত। এইজন্য ইহা আস্তিক দর্শনের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা যে নিরীশ্বরতা-প্রবণ তাহাও বলা যায় না। কেননা ইহাতে দুইবার ঈশ্বরের বচন বলিয়া বেদের প্রামাণ্য (তদ্‌বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্), ইহা উক্ত হইয়াছে। তদ্‌বচন=ঈশ্বরের বচন।

২

কাল নির্ণয়

গার্বের মতে বৈশেষিক দর্শন ন্যায় দর্শনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। গৌতম সূত্র ও বাৎস্যায়ন-রচিত তাহার ভাষ্যের উপর বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। অনেকের মতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বৈশেষিক মত উদ্‌ভূত হইয়াছিল। বৈশেষিক দর্শনের অসৎ-কার্য্যবাদ হইতে বৌদ্ধ নির্বাণবাদের উদ্‌ভব হইয়াছিল, এবং জৈন অস্তিকায় ও পরমাণুবাদও বৈশেষিক দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। অনেক জৈন গ্রন্থে এবং ললিতবিস্তরে বৈশেষিক মতের উল্লেখ আছে। "আবশ্যক" নামক এক জৈন গ্রন্থে রোহগুপ্ত নামক এক জৈন বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা বলিয়া লিখিত আছে। রোহগুপ্ত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের লোক। কিন্তু তিনিই বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা, এই দাবির কোনও মূল্য নাই। বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদের এবং জৈন পরমাণুবাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বর্ত্তমান। জৈন মতে পরমাণুদিগের মধ্যে গুণ-ভেদ নাই, সকল পরমাণুই এক প্রকার—সকলেই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শগুণ বিশিষ্ট, এবং কোন পরমারণুরই শব্দ-গুণ না থাকিলেও সকলেই শব্দের উৎপাদনে সমর্থ। বৈশেষিক মতে পরমাণুদিগের মধ্যে গুণভেদ আছে; বায়ু পরমাণুর কেবল স্পর্শগুণ, অগ্নির রূপ ও স্পর্শ, জলের রূপ, রস ও স্পর্শ, এবং ক্ষিতির রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণ আছে। শব্দগুণ ইহাদের কাহারও নাই। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে মহাবীর ও বুদ্ধের অবির্ভাবের সমকালেই (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) বৈশেষিক দর্শনের উদ্‌ভব হইয়াছিল।

৩

বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থাবলী

কণাদের বৈশেষিক সূত্রই বৈশেষিক দর্শনের প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ তাঁহার "পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহ" গ্রন্থে বৈশেষিক সূত্রে নাই এমন অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার উপরে ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়নের প্রভাব সুস্পষ্ট। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রশস্তপাদ বর্ত্তমান ছিলেন।

চন্দ্র-প্রণীত "দশপদার্থশাস্ত্র" আমাদের দেশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চৈনিক ভাষায় তাহার অনুবাদ আছে। এই অনুবাদ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর। রাবণভাষ্য এবং ভারদ্বাজবৃত্তি নামক দুইখানি ভাষ্যের নামও পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থ দুইটি পাওয়া যায় নাই। ব্যোমশেখরের ব্যোমবতী, শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী, উদয়নের কিরণাবলী, এবং শ্রীবৎসের লীলাবতী নামে প্রশস্তপাদের গ্রন্থের চারিখানা টীকা আছে। উদয়নের কিরণাবলী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে, শ্রীবৎসের লীলাবতী একাদশ শতাব্দীতে এবং শ্রীধরের "ন্যায় কন্দলী" দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল। শ্রীধর এবং উদয়ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং "অভাব"কে এক স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শিবাদিত্যের "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন একই দর্শনের অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনের অন্যান্য গ্রন্থের নাম লৌগাক্ষী ভাস্কর রচিত "তর্ক কৌমুদী", শঙ্করানন্দ রচিত "উপস্কার", বিশ্বনাথ রচিত "ভাষা পরিচ্ছেদ," এবং তাহার ভাষ্য "সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী" (১৭ শতাব্দী), জগদীশের "তর্কামৃত" (১৭ শতাব্দী), জয়নারায়ণের "বিবৃতি" (১৭ শতাব্দী)।

৪

বৈশেষিক সূত্র

বৈশেষিক সূত্র দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক আছে। সমগ্র গ্রন্থে ৩৭০ সূত্র। প্রথম অধ্যায়ে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয় পদার্থের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও মন ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যদিগের বর্ণনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও মন, ইন্দ্রিয়ার্থ এবং অনুমান বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নিত্য

ও অনিত্যের ও পরমাণুতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ, এবং যোগ ও মোক্ষের ব্যাখ্যা আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সদাচার ও বৈদিক কর্ম্মের ফল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে পরিমাণ, পৃথকত্ব প্রভৃতি গুণের ব্যাখ্যা আছে। অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুমান ও কার্য্যকারণ তত্ত্ব প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৈশেষিক সূত্রে যে সকল সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, প্রশস্তপাদের গ্রন্থে তাহাদের কতকগুলির কোনও ভাষ্য নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় এইগুলি পরবর্ত্তী কালে গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন কণাদ তিনটি মাত্র পদার্থের উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রশস্তপাদ তাহাতে আর তিনটি যোগ করেন, এবং পরে "অভাব" স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গৃহীত হওয়ায় মোট পদার্থ সংখ্যা সাতে দাঁড়াইয়াছে। মহাদেব রাজারাম বোদাস্ তাঁহার "তর্ক সংগ্রহ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "পরবর্ত্তী বৈশেষিক দর্শনের বিশেষত্ব যে সকল মত—যাহা ন্যায় ও অন্যান্য দর্শনে নাই—তাহা প্রশস্তপাদের গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। কণাদের সূত্রে তাহাদের পাওয়া যায় না।" কণাদের সূত্রাবলী পরিবর্দ্ধিত হইয়া বৈশেষিক দর্শনে পরিণত হইয়াছে।

৫

বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন

সাংখ্য ও যোগ দর্শনের ন্যায় বৈশেষিক ও ন্যায় "সমান" দর্শন। আত্মার গুণ ও প্রকৃতি এবং পরমাণুবাদ উভয় দর্শনে প্রায় একই। কিন্তু পদার্থদিগের শ্রেণী বিভাগ ও স্বরূপ এবং পরমাণুদিগের গুণ সম্বন্ধে পার্থক্যও আছে।

গৌতম সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অনেক বৈশেষিক সূত্র তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে ন্যায় দর্শনের "পূর্ব্ববৎ" ও "শেষবৎ" অনুমানের কোনও উল্লেখ নাই। বৈশেষিক দর্শনে কালকে নিত্য ও জাগতিক পদার্থের উৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই মতের উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্যান্য দর্শনে এই মত গৃহীত হয় নাই। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে পরমাণুবাদের উল্লেখ আছে। নাগার্জুনের "প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রে" কাল সম্বন্ধে বৈশেষিক মতের উল্লেখ আছে। দেশ, পরমাণু ও আত্মা সম্বন্ধে নাগার্জুন যাহা বলিয়াছেন. তাহা হইতে বৈশেষিক দর্শনের সহিত তাঁহার যে পরিচয় ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

অধ্যাপক দাসগুপ্তের মতে বৈশেষিক দর্শন এক সময়ে মীমাংসা দর্শনের এক শাখা ছিল। কণাদ সূত্রের প্রথম সূত্রে ধর্ম্মের ব্যাখ্যাই উক্ত দর্শনের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব মীমাংসার প্রথম সূত্রও "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। পদার্থদিগের স্বরূপ-বর্ণনাই বৈশেষিক দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার পরেই কণাদ্ ধর্ম্ম কি, তাহা বলিয়াছেন। যাহা হইতে ইহকালে অভ্যুদয় এবং পরকালে স্বর্গাদি সুখ-লাভ হয়, এবং যাহা দ্বারা নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ধর্ম্ম। এই উভয়বিধ ধর্ম্মই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, এইজন্যই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। গ্রন্থ শেষে উক্ত হইয়াছে বেদবিহিত কর্ম্মের ফল যেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেখানে পারলৌকিক অভ্যুদয়ই তাহাদের ফল বলিয়া জানিতে হইবে। কেননা বেদ কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। অধ্যাপক দাসগুপ্ত বলেন, "ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, এবং দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মের ব্যাখ্যার পরে "অদৃষ্টের" দ্বারা অনেক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া কণাদ ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার দ্বারা সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যায় না। "অদৃষ্ট" স্বীকার না করিলে অনেক ব্যাপার অব্যাখ্যাত থাকিয়া যায়। এই "অদৃষ্ট", "ধর্ম্ম" অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন হয়। চুম্বক লৌহের দিকে সূচির গতি, (মণিগমনং সূচ্যাভিসর্পণম্—৫।১।১৫), বৃক্ষ-শরীরে জলের অভিসর্পণ (৫।২।৭), অগ্নির উর্দ্ধগমন, বায়ুর তির্য্যক গমন, অণুদিগের আদ্যকর্ম্ম এবং মনের আদ্যকর্ম্ম (৫।২।১৩) সকলই অদৃষ্টকৃত। জীবাত্মার অপসর্পণ এবং উপসর্পণ (দেহান্তর গ্রহণ), ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের সমীকরণ এবং অন্যবিধ সংযোগ (মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশ) অদৃষ্টকৃত (৫।২।১৭)। অদৃষ্ট-ধ্বংস দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। কণাদ-বর্ণিত সকল পদার্থই দৃষ্ট। প্রত্যক্ষ কারণ দ্বারা যে সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যায় না, কণাদের মতে তাহাদের কারণ "অদৃষ্ট"। প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের যাবতীয় জৈব ক্রিয়া, পরমাণুদিগের স্থায়িত্ব, অগ্নি ও বায়ুর স্বাভাবিক গতি, মৃত্যু, পুনর্জীবন এবং মানুষের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন, বিভিন্ন লোকের সৃষ্টি, সকলই "অদৃষ্ট"কৃত। কণাদের দর্শনে অভিজ্ঞতালব্ধ মাত্র কতিপয় তথ্যের বর্ণনা আছে, অবশিষ্ট যাবতীয় ব্যাপারই—যাহা দর্শনের আলোচ্য, সকলই "অদৃষ্ট" কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অদৃষ্টের কারণ-স্বরূপ কণাদ সৎ অথবা অসৎ কর্ম্মের উল্লেখ করেন নাই; উল্লেখ করিয়াছেন বেদ বিহিত কর্ম্মের—স্নান, ব্রহ্মচর্য্য গুরুকুলবাস, বাণপ্রস্থ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি

কর্ম্মের। অশুচি ভক্ষ্য পরিহার করিয়া শুচি ভক্ষ্য গ্রহণে "অদৃষ্ট" দ্বারা অভ্যুদয় হয়। "অদৃষ্ট" দ্বারাই দ্রব্যে আসক্তি উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে দান কিরূপে করিতে হয় এবং কিরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বৈশেষিক মতের সহিত পরবর্ত্তী কালের মীমাংসা দর্শনের মিল আছে। তবে বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য ও নিত্যত্ব, সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বরে অবিশ্বাস, শব্দের নিত্যত্ব আত্মার প্রত্যক্ষানুভূতি বিষয়ে বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের সহিত মীমাংশা দর্শনের মিল নাই। বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য ও নিত্যত্ব বৈশেষিক দর্শনে আলোচিত হয় নাই। কিন্তু যখন ঈশ্বরের কোনও উল্লেখ বৈশেষিক দর্শনে নাই এবং বেদের প্রমাণের উপর অদৃষ্ট-বাদ প্রতিষ্ঠিত, তখন এ বিষয়ে মীমাংসা দর্শনের সহিত কণাদ দর্শনের ভেদ নাই, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবদিগের কর্ত্তৃক বেদ রচিত হইয়াছিল ইহা কণাদ বিশ্বাস করিতেন, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে মীমাংসা দর্শনের সহিত কোনও মতভেদের উল্লেখ কণাদ সূত্রে নাই। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে বেদ কেহ রচনা করে নাই, এই মত কণাদের সময় উদ্ভূত হয় নাই, পরে হইয়াছিল।

উল্লিখিত হেতুতে ডাঃ দাসগুপ্ত অনুমান করেন যে পরবর্ত্তী মীমাংসা দর্শনের মতো বৈশেষিক দর্শনও নিরীশ্বরবাদী দর্শন ছিল, এবং বৈশেযিক দর্শন মীমাংসা দর্শনের এক শাখা ছিল। কিন্তু এই মত সকলে গ্রহণ করেন নাই। "তদ্ বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যং" এই সূত্রে ঈশ্বর স্পষ্টই স্বীকৃত। তৎ-বচন শব্দের "তৎ" শব্দ স্পষ্টই ঈশ্বর বাচক। "তৎ ত্বম্ অসি" "ওঁ তৎ সৎ" প্রভৃতি বাক্যে "তৎ" শব্দ অন্য কোনও অর্থ বহন করে না। সুতরাং বৈশেষিক দর্শন নিরীশ্বরবাদী ইহা বলা যায় না।

৬

বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞান তত্ত্ব

তর্কশাস্ত্রের বিষয় জ্ঞান। বৈশেষিক দর্শনে চারি প্রকার জ্ঞানের কথা আছে—প্রত্যক্ষ, লৈঙ্গিক (আনুমানিক), স্মৃতি এবং আর্ষ। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও সামান্যের ধারণা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে হয়। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের—পরমাণু ও দ্ব্যণুকের—প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। কোনও একটি বস্তু অপর একটি

বস্তুর কার্য্য অথবা কারণ, অথবা সংযোগী, অথবা বিরোধী অথবা সমবায়ী হইলে, একটির জ্ঞান হইতে অপরটির জ্ঞান হয়। যে বস্তুর জ্ঞান হইতে উক্ত সম্বন্ধ বশতঃ অপর বস্তুর জ্ঞান হয় তাহাকে তাহার 'লিঙ্গ' বলে। হেতু, অপদেশ, লিঙ্গ, প্রমাণ, এর চারি শব্দ একার্থবোধক। কারণ যেখানেই এই চারি শব্দের কোনও একটি ব্যবহৃত হয়, সেখানেই "অস্য ইদং" (ইহার ইহা) এই জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ ব্যাপক বস্তুর সহিত ব্যাপ্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞান থাকে। আত্মা ও মনের বিশেষ সংযোগ হইতে স্মৃতি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। (স্বপ্ন ও স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নও এই ভাবে উৎপন্ন হয়)। অবিদ্যা অর্থাৎ দূষিত জ্ঞান উদ্ভূত হয়, ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারের দোষ হইতে। যে জ্ঞান দূষিত নহে, তাহাকে বলে বিদ্যা। ঋষিদিগের এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের যে অলৌকিক অব্যবহিত জ্ঞান হয় তাহাই আর্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞান ধর্ম্ম-বিশেষের অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন হয়। উপমান, ঐতিহ্য এবং শব্দ-জ্ঞান অনুমানলব্ধ। বেদ-বাক্যের প্রামাণ্য এই যে, বেদ ঈশ্বরবাক্য, ঈশ্বরবাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। শব্দ অনিত্য। শব্দ কি দ্রব্য, গুণ অথবা ক্রিয়া, এই প্রশ্নের আলোচনায় সূত্রকার বলিয়াছেন, যে শব্দে যেমন শব্দত্ব আছে, তেমনি শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বও আছে; ইহা উপলব্ধ হয় অর্থাৎ উপলব্ধির বাহিরেও শব্দের অস্তিত্ব আছে। এই জন্য শব্দ দ্রব্য অথবা দ্রব্যাশ্রিত গুণ অথবা কর্ম্ম, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। কিন্তু শব্দ দ্রব্য নহে কেননা ইহা এক দ্রব্য-নিষ্ঠ, একাধিক দ্রব্যের সমবায় জাত নহে। ইহা কর্ম্মও নহে, কেননা শব্দের উৎপত্তি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। সুতরাং ইহাকে গুণ বলিতে হইবে। পরন্তু শব্দ ও কর্ম্মের মধ্যে এই সাদৃশ্য বর্ত্তমান, যে উভয়েই আশুবিনাশী—প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ। শব্দ উৎপত্তিশীল, সুতরাং অনিত্য। শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে বহু যুক্তি থাকিলেও, তাহা সন্দেহের বিষয়। বৈশেষিকের এই মীমাংসা পূর্ব্ব মীমাংসা সিদ্ধান্তের বিপরীত।

শব্দ ও বাক্যের অর্থবোধ হইবার পূর্ব্বে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। শাব্দিক জ্ঞান অনুমান লব্ধ। চেষ্টা, অর্থাপত্তি, সম্ভব (অন্তর্বর্ত্তিতা) এবং অভাবও অনুমানের অন্তর্গত।

স্মৃতিতে পূর্ব্বে অনুভূত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র। আর্ষ জ্ঞানও প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। স্মৃতিকে বাদ দিলে বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানের দুইটি মাত্র উৎস বর্ত্তমান থাকে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

আত্মার জ্ঞান অনুমানলব্ধ। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে অর্থ জ্ঞান হয়, তাহা দ্বারা

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থের অতিরিক্ত পদার্থের (আত্মার) অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ইন্দ্রিয় অথবা দেহকে জ্ঞানের আশ্রয় বলা যায় না। কেননা ইন্দ্রিয় ও দেহ অচেতন। অচেতনের জ্ঞান থাকিতে পারে না। পৃথিবী প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুতে জ্ঞান থাকিলে, তাহাদের কার্য্য ঘটাদিতেও জ্ঞান দেখা যাইত। দেহ ও ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত জ্ঞানের অন্য হেতু দৃষ্ট হয় না। যাহা প্রকৃত হেতু, তাহা পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ হওয়া চাই। যাহা অপ্রসিদ্ধ (সকলের জ্ঞানের বিপরীত) তাহা হেতু হইতে পারে না। যাহার ব্যভিচার লক্ষিত হয় ও যাহা সন্দিগ্ধ, তাহাও হেতু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অশ্বের শৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং "এই জীবের শৃঙ্গ আছে, সুতরাং ইহা অশ্ব"। ইহা অপ্রসিদ্ধ হেতুর দৃষ্টান্ত। এই জীবের শৃঙ্গ আছে, সুতরাং ইহা গো, ইহা অসৎ বা ব্যভিচারী হেতুর দৃষ্টান্ত। কেননা সকল গোরুর শৃঙ্গ থাকে না। অন্য অনেক জন্তুরও শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের সহিত অন্য কোনও বস্তু না থাকিলে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অন্য বস্তুই আত্মা। জ্ঞান আত্মা হইতে ভিন্ন। জ্ঞান আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ (বা হেতু)। কেননা ইন্দ্রিয় ও অর্থে জ্ঞান নাই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যাহা স্বীয় আত্মাতে দৃষ্ট হয়, তাহা পরত্রও দৃষ্ট হওয়ায়, তাহা পরের আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

সংশয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে সূত্রকার বলিয়াছেন যে, যেস্থলে সামান্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে; কিন্তু বিশেষের প্রত্যক্ষ হয় নাই, সেখানে যদি বিশিষ্ট বস্তুর স্মরণ হয়, এবং তথায় তাহা আছে কিনা, সে বিষয়ে অনিশ্চিত জ্ঞান উপস্থিত হয়, তবে তাহার নামই সংশয়।

মিথ্যা জ্ঞান চারি প্রকার—সংশয়, বিপর্য্যয়, অনধ্যবসায় (অনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান) এবং স্বপ্ন। শিবাদিত্যের মতে মিথ্যা জ্ঞান দ্বিবিধ—সংশয় ও ভ্রান্তি। উহ (আন্দাজ) এবং অনিদিষ্ট জ্ঞান এবং গৌণ যুক্তি (indirect reasoning) সংশয়ের অন্তর্গত। দেহের এক বিশেষ অবস্থাতেই স্বপ্নের উদ্ভব হয় বলিয়া শ্রীধর স্বপ্নকে একটি স্বতন্ত্র মিথ্যা জ্ঞান বলিয়াছেন।

আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থ সন্নিকৃষ্ট হইলেও সকল সময়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুতরাং এই তিনটির অতিরিক্ত মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। মন একটি দ্রব্য ও নিত্য। ইহার কোনও অবয়ব নাই বলিয়া ইহা নিত্য। মনের যে কোনও অবয়ব নাই, তাহা যে একটি মাত্র বস্তু, তাহার প্রমাণ এই যে কর্ম্মচেষ্টা বা প্রযত্ন এককালে একটি মাত্র হয়, একাধিক প্রযত্ন এক কালে হইতে পারে না। মনের সাহায্যেই কর্ম্মচেষ্টা হয়। সুতরাং মন এক।

বহু হইলে বহু কর্ম্মচেষ্টা এক কালে হইতে পারিত। এইরূপ বিবিধ জ্ঞানও যুগপৎ উৎপন্ন হয় না। ইহা দ্বারা দেহে মনের একত্ব প্রতিপন্ন হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অচেতন দেহ ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আধার হইতে পারে না বলিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। প্রাণ ও অপান ক্রিয়া, নিমেষ ও উন্মেষ, জীবন, মনের গতি, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন এই সকল আত্মার লিঙ্গ, অর্থাৎ ইহাদের হইতে আত্মার অনুমান হয়। আত্মার অবয়ব নাই বলিয়া আত্মা নিত্য। আত্মা কোনও বস্তুর আশ্রিত গুণ নহে। আত্মার গুণ ও ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং আত্মা দ্রব্য—নিত্য দ্রব্য।

কেহ বলিতে পারেন, যজ্ঞদত্তের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে, তাহার শরীরেরই প্রত্যক্ষ হয়, আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং আত্মার অস্তিত্বের দৃষ্ট লিঙ্গ নাই বলিতে হইবে। "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান দ্বারা এইমাত্র অনুমান করা যায়, যে দৃষ্ট শরীরে জ্ঞান ও প্রযত্নের আশ্রয় কিছু আছে, কিন্তু তাহা কি তাহার অনুমান হয় না। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব "আগমিক" অর্থাৎ বেদ-সিদ্ধ বলিতে হয়। উত্তরে সূত্রকার বলেন "অহং" প্রত্যয় সকলেরই আছে। এই প্রত্যয় শরীরে প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই প্রত্যয় দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এই অহং প্রত্যয়ই আত্মার লিঙ্গ। আত্মা কেবল বেদে উক্ত বলিয়াই গ্রহণীয় নহে। "অহং দেবদত্ত", "অহং যজ্ঞদত্ত", ইত্যাকার জ্ঞান প্রথমে প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষ হওয়ার পরে "অন্বক্ষ" (পশ্চাৎ জ্ঞান) হয়। পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ না হইলে পরে অন্বক্ষ হইতে পারে না। আত্মার লিঙ্গ "অহং প্রত্যয়" উৎপন্ন হইবামাত্র, অহং প্রত্যয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত দৃঢ়, যে আত্মাই যেন দৃষ্ট হইতেছেন, এই প্রকার প্রত্যয় উৎপন্ন হয় এবং অহং ও আত্মা অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। এই অহং প্রত্যয়ের শরীরে উপচার (আরোপ) বশতঃ দেবদত্তের শরীর দর্শন করিয়া প্রকৃত দেবদত্তকে দেখিতেছি মনে হয়। শরীরে অহং বুদ্ধি এত দৃঢ় হয়, যে তাহা যে উপচার, এবং শরীর যে অহং নহে, তাহা বিশ্বাস হয় না (সন্দিগ্ধস্তু উপচারঃ ৩।২।১৩)। মৃত শরীরে অহং বুদ্ধি নাই ; দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন তাহার কোনও অবয়বে অহং বুদ্ধি হয় না। অহং প্রত্যয় কেবল জীবাত্মারই আছে।

যদি বলা যায় আত্মাতে যে অহং বুদ্ধি তাহাই ঔপচারিক, শরীরে অহং বুদ্ধি ঔপচারিক নহে। দেবদত্তের শরীর দেখিয়াই দেবদত্ত যাইতেছে বলা হয়, এখানে শরীরের গমনই আত্মায় আরোপিত হয়। "আমি গৌর" "আমি

কৃশ" যখন বলি, তখন এই অভিমান বা অহংকারের বিষয়ও শরীর, আত্মা নহে। তাহার উত্তরে বলা যায় দেহে এই প্রকার উপচার হয় কিনা, তাহা সন্দেহের স্থল (৩।২।১৬)। দেবদত্তের শরীর প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহার অহং জ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। সুতরাং এই অহং জ্ঞান শরীরাশ্রিত নহে। অহং শব্দের যাহা বাচ্য তাহা শরীর হইতে বিশিষ্ট আত্মা। এই অহং জ্ঞান আত্মায় অবস্থিত এবং স্বতঃসিদ্ধ ও অনুমান-নিরপেক্ষ। ইহা হইতে আত্মার অস্তিত্বের অনুমানও করা যায়।

৭

পদার্থ

"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" (প্রথম সূত্র) বলিয়া সূত্রকার গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। আমি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব। ধর্ম্ম কি? "যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ, স ধর্ম্ম" (২য় সূত্র)। যাহা হইতে অভ্যুদয় (ঐহিক অভ্যুদয়=পার্থিব বৈভব। পারলৌকিক অভ্যুদয়=দেহান্তে স্বর্গাদি সুখ-লাভ) ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি (যাহা হইতে অধিকতর শ্রেয়ঃ অন্য কিছু নাই, সেই মোক্ষ-লাভ) হয়, তাহাই ধর্ম্ম। ইহার পরে বলিয়াছেন "ধর্ম্ম বিশেষ-প্রসূতাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্" (৪র্থ সূত্র)। বেদে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে প্রসূত দ্রব্য-গুণ কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়রূপ পদার্থদিগের সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য ও তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। সূত্রকারের মতে মোক্ষ হয় জ্ঞান হইতে। সেই জ্ঞান পদার্থদিগের সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য ও স্বরূপের (তত্ত্ব) জ্ঞান। কিন্তু সেই জ্ঞান-লাভের উপায় বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। ইহা বলিয়া সূত্রকার পদার্থদিগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনে অস্তিত্ববান যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ আলোচনার প্রচেষ্টা আছে। আমরা যাহা যাহা জানি, তাহাদের বাচক শব্দ ভাষায় আছে। এই সকল শব্দ দ্বারা যাহা যাহা প্রকাশিত হয়, তাহারা এক জাতীয় নহে। দর্শনে বিভিন্ন জাতীয় পদার্থেরই আলোচনা আছে।

পদের যাহা অর্থ—পদের দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয়,—পদ যাহার প্রতীক, তাহাই পদার্থ। বৈশেষিক দর্শনে পদার্থদিগকে প্রথমে ছয় ভাগে বিভক্ত

করা হইয়াছিল—তাহারা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। পরবর্ত্তী বৈশেষিক দার্শনিক শ্রীধর, উদয়ন ও শিবাদিত্য তাহাতে "অভাব" নামে সপ্তম পদার্থ যোগ করিয়াছেন।

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টট্‌ল দশবিধ Categoryর বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল Category সত্তার অতিতম সাবিক রূপ। মনের ভাব প্রকাশ করিতে আমরা বাক্যের ব্যবহার করি। প্রত্যেক বাক্যের দুই অংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যাহার সম্বন্ধে কিছু বলি, তাহাই উদ্দেশ্য, যাহা বলি তাহা বিধেয়। নানা জাতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা কথাই বলা যায়। যাহা যাহা বলা যায়, তাহাদিগকে আরিস্টট্‌ল্ দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীগুলি Category। Categoryগুলি এই: (১) দ্রব্য, (২) পরিমাণ, (৩) গুণ, (৪) সম্বন্ধ, (৫) স্থান, (৬) কাল, (৭) অঙ্গসংস্থান (Posture), (৮) স্বামিত্ব (Property) (৯) ক্রিয়া (১০) নিষ্ক্রিয়তা (Passion)।* আরিষ্টট্‌লের এই বিভাগ "বিধেয়" দিগের বিভাগ। বৈশেষিক দর্শনের শ্রেণী বিভাগ, উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়েরই বিভাগ—যাহার সম্বন্ধে বাক্যে কিছু উক্ত হয়, তাহার সহিত যাহা উক্ত হয়, উভয়েরই বিভাগ—পদ দ্বারা যাহাই সূচিত হউক না কেন, সকলেরই বিভাগ।

পদার্থদিগের মধ্যে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সামান্য ও বিশেষ জ্ঞানের অপেক্ষা করে। বুদ্ধি যে স্থানে গিয়া তদপেক্ষা ক্ষুদ্রে যাইতে ইচ্ছা করে না, তাহাকে বিশেষ বলে, যেমন পরমাণু। আর বুদ্ধির যাহা বিষয়, তাহা যেখানে তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিশেষ বিশেষ অবয়বে অনুগমন করে তাহাকে সামান্য বলে। যেমন গো। গো একটি সামান্য, কেননা 'গো' শব্দ দ্বারা যাহার জ্ঞান হয়, (গো জাতি), তাহার মধ্যে বহু গোরু আছে। যাহা এক স্থানে সামান্য, অন্যত্র তাহা বিশেষ বলিয়া গণ্য হয়। যেমন প্রাণী সামান্যের মধ্যে 'গো' একটি বিশেষ; আবার গাভী বৃষ, বৎস প্রভৃতির তুলনায় 'গো' একটি সামান্য। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব খুব ব্যাপক

---

* Of words expressed without syntax, each signifies either. (1) Substance, (2) or quantity or, (3) quality or, (4) relation or, (5) place, or (6) time, or (7) disposition or (8) appurtenance or (9) action or (10) Sufferring-(Aristotle's Categories ii, 6)

হইলেও কখনও সামান্য কখনও বিশেষ হয়। কিন্তু পরমাণু কখনও সামান্য হয় না। আবার "সত্তা" শব্দ দ্বারা যাহার বোধ হয়, তাহা সর্ব্বদাই সামান্য, তাহা অপেক্ষা ব্যাপকতর কোনও জাতি নাই বলিয়া তাহা কখনও বিশেষ হয় না। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম হইতে 'সত্তা' ভিন্ন, এবং ব্যাপকতর। সত্তা গুণ ও কর্ম্মে আছে, কিন্তু ইহা গুণও নহে কর্ম্মও নহে। (১।২।৯)। ইহা নিত্য এক, ইহার সামান্যও নাই, বিশেষও নাই, সকল পদার্থেই সমভাবে সত্তা বর্ত্তমান। আপত্তি হইতে পারে সত্তাকে যদি সামান্য-বিশেষহীন এক বস্তু বলিতে হয়, তাহা হইলে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মকেও এক বলিতে হয়, কেননা দ্রব্যত্ব সকল দ্রব্যে, গুণত্ব সকল গুণে এবং কর্ম্মত্ব সকল কর্ম্মে সমভাবে বর্ত্তমান, তাহাতে সামান্য বিশেষ নাই। কিন্তু দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পরস্পর হইতে ভিন্ন, পরন্তু সত্তার কোনও ভেদক ধর্ম্ম নাই। ইহা সর্ব্বত্রই অভিন্ন।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মকে কণাদ "অর্থ" বলিয়াছেন। আত্মা ও মনের এক বিশেষ প্রকার সংযোগ হইতে যেমন আত্মার প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি সকল দ্রব্যেরই প্রত্যক্ষ হয়। সামান্য, বিশেষ ও সমবায় বুদ্ধিগ্রাহ্য (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে)। প্রশস্তপাদ বলেন তাহারা "স্বাত্ম সত্ব" (তাহাদের অস্তিত্ব তাহাদের মধ্যেই বর্ত্তমান, বুদ্ধি তাহাদের অস্তিত্বের জ্ঞাপক মাত্র)। তাহারা কার্য্য নহে (অকার্য্য), কারণও নহে (অকারণ); তাহাদের সামান্যত্বও নাই, বিশেষত্বও নাই (অসামান্য-বিশেষ-বত্ব), তাহারা নিত্য, তাহারা "অর্থ" শব্দবাচ্য নহে (অর্থ-শব্দানভিধেয়)। সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ বুদ্ধি।

প্রাচীন বৈশেষিক মতে সকল পদার্থেরই সাধারণ অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব দ্বিবিধ—সত্তা সংবন্ধ এবং স্বাত্ম সত্ব। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের অস্তিত্ব সত্তাসংবদ্ধ; সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের অস্তিত্ব স্বাত্ম সত্ব। ভাষ্যকার মিশ্রের মতে যে অস্তিত্বের ধ্বংস হয়, এবং যাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাই সত্তা-সংবদ্ধ। অর্থাৎ দেশ-কালে অস্তিত্বই সত্তা-সংবদ্ধ অস্তিত্ব। স্বাত্ম-সত্ব অস্তিত্ব দেশ-কাল নিরপেক্ষ। দেশ-কাল-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব, বস্তু-শূন্য অস্তিত্ব এবং কল্পনায় দ্রব্য হইতে যাবতীয় গুণের নিষ্কাশন করিলে যে অস্তিত্ব মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দেশ-কাল-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব। কিন্তু এই অস্তিত্ব দ্রব্য হইতেও অধিকতর সত্য। বৈশেষিক মতে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় দেশকালাতীত এবং কারণহীন।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সৎ, অনিত্য, "দ্রব্যবৎ", কার্য্য, কারণ এবং "সামান্য বিশেষবৎ"। প্রত্যেক দ্রব্য তাহার অংশ ক্ষুদ্রতর দ্রব্যাদিগের সমষ্টি। গুণ

ও কর্ম্মও দ্রব্যাশ্রিত। সুতরাং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সকলই দ্রব্যবৎ। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সকলেরই সামান্য ও বিশেষ উভয়ই আছে। (১।১।৮)। দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়। এক গুণ অপর গুণ উৎপাদন করে। সূত্রের যে রূপ তাহাই তাহার গুণ। সূত্রের রূপ হইতে বস্ত্রের রূপের (গুণের) উৎপত্তি হয়। সত্তা, অনিত্যত্ব, দ্রব্যবত্ত, কার্য্যত্ব, কারণত্ব, সামান্যত্ব ও বিশেষত্ব এই সাত বিষয়ে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে ভেদ নাই। কিন্তু দ্রব্য ও গুণ সজাতীয় বস্তু উৎপাদন করে,—দ্রব্য দ্রব্যের, গুণ গুণের উৎপাদন করে, কিন্তু কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয় না। আবার দ্রব্য তাহার কার্য্যকে বিনাশ করে না। মৃত্তিকা হইতে "কপাল" প্রস্তুত হয়, কপাল হইতে ঘট। কিন্তু মৃত্তিকা কপালকে, এবং কপাল ঘটকে নাশ করে না, এবং ঘট কপালকে, এবং কপাল মৃত্তিকার বিনাশ করে না। কিন্তু গুণ ও কর্ম্মের এই ধর্ম্ম নাই। গুণ স্বীয় কার্য্য ও কারণ উভয়ের বিনাশ করিতে পারে। কর্ম্ম কর্ম্মের বিনাশ করে।

৮

দ্রব্য

ক্রিয়া ও গুণবৎ সমবায়ী কারণ দ্রব্য (১।১।১৫)। দ্রব্য পদার্থ কর্ম্মবৎ ও গুণবৎ, তাহা গুণ ও কর্ম্মের আশ্রয়। "ইহার মধ্যে ইহা আছে", এই জ্ঞান যাহার নিমিত্ত হয়, তাহাকে "সমবায়" বলে। যাহার মধ্যে গুণ থাকে, তাহা গুণের সমবায়ী কারণ।

দুইটি পৃথক বস্তু যদি "যৌথ" ভাবে থাকে, তাহা হইলেও "ইহার মধ্যে ইহা আছে" বলা যায়। যাহা থাকে তাহা আধেয়, যাহার মধ্যে থাকে, তাহা আধার। যেমন দধিভাণ্ডে দধি। কিন্তু এই স্থলে আধার ও আধেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংযোগ সম্বন্ধ; সমবায় নহে। ইহাকে "যুতসিদ্ধভাব" বলে। অযুত-সিদ্ধ বস্তুর মধ্যে যে আধার-আধেয় সম্বন্ধ তাহাই সমবায় সম্বন্ধ। দ্রব্যের গুণ ও কর্ম্মের সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ তাহাই সমবায়। ঘট ও তাহার উপাদান কারণ কপাল উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাও সমবায়। কপাল ঘটের সমবায়ী কারণ। প্রত্যেক দ্রব্য তাহার অবয়ব দ্বারা ঘটিত। অবয়ব দ্রব্যের সমবায়ী কারণ, কিন্তু অবয়বের রূপ অবয়বের আশ্রিত, সমগ্র দ্রব্যাশ্রিত নহে বলিয়া তাহা দ্রব্যের রূপের অ-সমবায়ী কারণ।

বৈশেষিক মতে দ্রব্য বিজ্ঞান বাহ্য। মনের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব আছে। বৈশেষিক দর্শন বাস্তববাদী (Realist)।

দ্রব্য হইতে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, (১।১।১৮)। কর্ম্ম ভিন্নও দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং কর্ম্ম দ্রব্যের উৎপত্তির কারণ নহে। (১।১।২১—২২) একাধিক দ্রব্যের সংযোগে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় (১।১।২৭)। দ্রব্য গুণের আধার, কিন্তু গুণ হইতে স্বতন্ত্র। যখন কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তখন তাহাতে গুণ থাকে না। (আদ্যক্ষণে নির্গুণং দ্রব্যং তিষ্ঠতি)। যদি দ্রব্য ও গুণ এক সঙ্গে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ থাকিত না। গুণের উদ্‌ভব না হইলেও আবার দ্রব্যের দ্রব্যত্ব হয় না, কেননা গুণের আশ্রয়ই দ্রব্য। এই জন্যে বলা হয় গুণের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে অথবা প্রাগভাব সম্বন্ধে দ্রব্য সংবদ্ধ। অর্থাৎ বাস্তব অথবা শক্য গুণের (বর্ত্তমান অথবা ভাবীগুণের) ভিত্তিই দ্রব্য। (সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দ্রব্য অনিত্য (১।১।৮)। ইহা দৃষ্ট দ্রব্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। দ্রব্য দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। যাহা অন্যের উপর নির্ভরশীল তাহা অনিত্য। অবয়বী দ্রব্য অনিত্য। মৌলিক দ্রব্য নিত্য, অনাশ্রিত এবং অন্ত্য বিশেষবৎ অর্থাৎ চরম বিশেষত্ববিশিষ্ট। তাহারা কারণজাত নহে, তাহাদের বিনাশও নাই। অনিত্য দ্রব্য অন্য বস্তু দ্বারা উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হয়।

দ্রব্য সংখ্যা নয়টি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, দিক, কাল, আত্মা ও মন। ইহাদের মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আত্মা ও মন সংখ্যায় বহু। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ স্থানব্যাপী, দূরত্ব ও নিকটত্ব সম্বন্ধবিশিষ্ট, কর্ম্ম ও গতিবিশিষ্ট। কিন্তু আকাশ, দেশ ও কাল সর্ব্বব্যাপী এবং যাবতীয় মূর্ত্ত দ্রব্যের সাধারণ আধার। আত্মা, মন, দেশ, কাল, বায়ু এবং পরমাণু অপ্রত্যক্ষ। যাবতীয় মূর্ত্ত দ্রব্যের পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ আছে। তাহাদের কর্ম্ম ও গতিও আছে। মৌলিক দ্রব্য অথবা তাহাদিগের পারস্পরিক সংযোগ জাগতিক যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের উপাদান কারণ। মন অণুপ্রমাণ; তাহা হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না। আকাশ হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ, মূর্ত্ত ও কার্য্যের কারণ।

অন্ধকার কি দ্রব্য? কণাদ বলেন (৫।২।২০) অন্ধকার "অভাব", দ্রব্যান্তর দ্বারা তেজের আবরণই অন্ধকার। ইহার নিজের কোনও গুণ নাই। মীমাংসক কুমারিল অন্ধকারের বর্ণ (কৃষ্ণ বর্ণ) আছে বলিয়া ইহাকে দ্রব্য বলিয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের গুণ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

আত্মা ও মনঃ সম্বন্ধে বৈশেষিক মত পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। আত্মার জ্ঞান শুধু আগম-লব্ধ নহে, অনুমানলব্ধও বটে। আত্মা ও মন উভয়ই নিত্য। আত্মা যদিও সর্ব্বব্যাপী তথাপি তাহার জ্ঞান, অনুভূতি ও ক্রিয়া দেহের সহিত সংযুক্ত অবস্থাতেই হয়। দেহবিযুক্ত অবস্থায় আত্মার জ্ঞান, অনুভূতি ও ক্রিয়া নাই। "ব্যবস্থা তো নানা" (৩।২।২০) একের জন্ম, অপরের মৃত্যু ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দ্বারা আত্মা যে বহু তাহা প্রমাণিত হয়। শাস্ত্রেও ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন গতির কথা বলিয়া আত্মার বহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীধর বলিয়াছেন "সকল আত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সকল আত্মাই প্রত্যেক শরীরে বর্ত্তমান। কিন্তু প্রত্যেক জীবের অনুভব অন্য জীবের অনুভব হইতে ভিন্ন। প্রত্যেক শরীরের সুখ দুঃখ অন্য শরীরের সুখ দুঃখ হইতে ভিন্ন"। সুতরাং আত্মা বহু। আত্মা অসংখ্য বলিয়া বহু আত্মা মুক্তি লাভ করিলেও সংসারের কখনও নাশ হইবে না। মুক্ত আত্মাগণ পরস্পর হইতে বিভিন্ন। পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। দেহের সহিত আত্মার সংযোগই পরস্পরের মধ্যে ভেদের কারণ। মৃত্যুর পরে মন আত্মার অনুগমন করে, এবং ইহাই ব্যক্তিত্বের হেতু। প্রত্যেক মন অন্যান্য মন হইতে ভিন্ন। যত আত্মা আছে, মনও তত আছে। একই মন এক আত্মার অনুগমন করে বলিয়া তাহার চরিত্রে সমতার সম্ভব হয়; মৃত্যুর পরেও এই সমতা রক্ষিত হয়। জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, যদিও স্বরূপে এক।

কালের লিঙ্গ "অপরস্মিন্ অপরং, যুগপৎ, চিরং, ক্ষিপ্রম্ ইতি কাল লিঙ্গানি (২।২।৬) অর্থাৎ কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ জ্ঞান, জ্যেষ্ঠে জ্যেষ্ঠ জ্ঞান, যুগপৎ জ্ঞান, শীঘ্র ও বিলম্বের জ্ঞান, যাহা হইতে হয়, তাহাই কাল। ইহাদিগের দ্বারা কালের অস্তিত্ব সূচিত হয়। নিত্য বস্তুতে কালের জ্ঞান হয় না। আবার "ইতঃ ইদম্ ইতি যতঃ তদ্দিশ্যং লিঙ্গং (২।২।১০)। অর্থাৎ ইহা হইতে ইহা ও নিকট অথবা দূর, অথবা ইহা হইতে উহা আসিতেছে, ইত্যাদি জ্ঞান দিকের অস্তিত্ব-সূচক। দেশ ও কাল উভয়েই এক মাত্র। ইহাদের বিশেষ নাই। সকল ঘটনাই দেশ ও কালে সংঘটিত হয়। আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্য দেশ ও কালের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহারা যাবতীয় উৎপন্ন বস্তুর সহযোগী কারণ। দিক্ ও কাল উভয়েই "সত্তার" মতোই নিত্য। উভয়েই দ্রব্য। নিত্য বস্তুতে কালের জ্ঞান হয় না। অনিত্য বস্তুতেই কালের জ্ঞান হয়। দিক্

এক হইলেও যে তাহাতে পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি জ্ঞান হয়, তাহার কারণ উপাধিভেদ। সূর্য্যের সঙ্গে সংযোগবশতঃ এই ভেদ জ্ঞান হয়। (২।২।১৪-১৫)।

প্রাকৃতিক ব্যাপারসকলের ব্যাখ্যার জন্য তাহাদের আধারস্বরূপ এক সমগ্র দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। দিক্‌ই সেই সমগ্র দ্রব্য। সকল পরমাণুবাদিগণই শূন্য দেশের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। দেশের সংখ্যা যদি একের অধিক হইত, তাহা হইলে এক দিকের (দেশের মধ্যস্থিত) পরমাণুদিগের সহিত অন্য দিকের পরমাণুদিগের কোনও সম্বন্ধ থাকিত না।

অনিত্য দ্রব্যদিগের যে পরিণাম হয়, কাল তাহার কারণ। কালকর্তৃক এই সকল পরিণাম যে উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। কাল এই সকল পরিণামের আধার—তাহাদের সহিত সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। (৫।২।২৬)। দিক, কাল ও আকাশ সকলেই নিষ্ক্রিয়। তাহারা সর্ব্বব্যাপী। গুণ ও কর্ম্মের সহিত নিষ্ক্রিয় পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়-সম্বন্ধ। সেই সমবায় নিষ্ক্রিয় পদার্থের। তাহা কোনও কর্ম্মের অধীন নহে।

কণাদ-সূত্রে কাল নিত্য দ্রব্য বলিয়া বর্ণিত হইলেও, পরবর্ত্তী কালের বৈশেষিকগণ কালকে জ্ঞানের একটি রূপমাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কালের স্বরূপ কি, ইহাদের মতে তাহা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কালের রূপে রূপায়িত হয়। বিবিধ পরিণামের সহযোগী বলিয়া কাল এক হইলেও বহুরূপে প্রতীত হয়।

দেশের সম্বন্ধ দৃশ্য বস্তুর সহিত। বহু বস্তুর একত্রাবস্থান হইতে দেশের জ্ঞান হয়। কালের সহিত সম্বন্ধ পরিণামের, একটির পরে আর একটির উদ্ভবের অথবা অন্তর্ধানের। কালের সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হয় না, যাহা পরবর্ত্তী, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না। কিন্তু দেশের সম্বন্ধ অনিত্য; দেশের মধ্যবর্ত্তী দ্রব্যদিগের অবস্থানের পরিবর্ত্তন হয়। কালের সহিত সম্বন্ধ গতির, দেশের সহিত স্থিতির। উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ বস্তু না থাকিলে উভয়ের জ্ঞান হয় না।

আকাশ ও দিক এক নহে। আকাশ অবিভাজ্য এক, শব্দ-গুণের আধার। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণ আকাশের নাই। দিক ও কালের মতো আকাশও নিষ্ক্রিয়। যাবতীয় মূর্ত্ত বস্তুর সহিত আকাশ সংযুক্ত। পরমাণুদিগের পরিমাণ নাই, অথচ তাহাদের মিলনে দ্রব্য গঠিত হয়। আকাশ তাহাদিগকে ধারণ করে বলিয়াই ইহার সম্ভব হয়। পরমাণুদিগের অবকাশ আকাশদ্বারা পূর্ণ। আকাশ নিত্য, অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সর্ব্বব্যাপী। সমগ্র দিক আকাশকর্ত্তৃক পূর্ণ। বিভিন্ন বস্তুর অবস্থানের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, যাহাদ্বারা

তাহা রক্ষিত হয়, তাহা দিক, কিন্তু আকাশ নহে। আকাশ স্বতন্ত্র দ্রব্য; তাহার গুণ শব্দ।

নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচ পদার্থকে বলে ভূত। যাহাকে জড় বস্তু বলে, তাহা এই পাঁচ পদার্থের সংমিশ্রণ। ইহারা রসায়ন শাস্ত্রের মৌলিক পদার্থ (Elements) নহে। বর্ত্তমান রসায়ন শাস্ত্রে বহু মৌলিক দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত। জড় বস্তু পাঁচ অবস্থাতে থাকিতে পারে, সেই পাঁচ অবস্থাই পঞ্চ ভূত। পৃথিবী কঠিন অবস্থার নাম, জল তরল অবস্থার নাম, তেজ উজ্জ্বল অবস্থার নাম, মরুৎ বায়বীয় অবস্থার নাম, ব্যোম আকাশিক (Etheric) অবস্থার নাম। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুতের উপাদান সূক্ষ্ম পরমাণু।

ভৌতিক পাঁচটি দ্রব্য—ক্ষিতি, অপ্, তেজ (অগ্নি), মরুৎ ও ব্যোমের (আকাশ) মধ্যে ক্ষিতির গুণ চারিটি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ। জলের গুণ তিনটি—রূপ, রস, স্পর্শ। তেজের গুণ দুইটি—রূপ ও স্পর্শ। বায়ুর গুণ একটি—স্পর্শ, এবং আকাশের গুণ একটি—শব্দ। ক্ষিতির চারি গুণের মধ্যে গন্ধই প্রধান বলিয়া ইহার গুণ শুধু গন্ধ বলিয়া কথিত হয়। জল ও অন্যান্য বস্তুর গন্ধ আছে সত্য, কিন্তু ক্ষিতির কণা তাহাদের সহিত মিশ্রিত বলিয়াই তাহারা গন্ধবান্ হয়। ক্ষিতি-নির্মিত বস্তু ত্রিবিধ—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থ। জলের বিশেষ গুণ রস, তেজের বিশেষ গুণ, রূপ (ঔজ্জ্বল্য), বায়ুর একমাত্র গুণ স্পর্শ। আকাশের গুণ শব্দ।

বায়ু অদৃশ্য। স্পর্শ গুণদ্বারাই তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। দৃষ্ট কোন বস্তু যখন আমাকে স্পর্শ করিতেছে না, তখন যখন স্পর্শ অনুভব করি, তখন দৃষ্ট বস্তু হইতে ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তাহাই বায়ু। ইহা কোনও দ্রব্যাশ্রিত নহে, সুতরাং ইহা গুণ নহে, দ্রব্য। বায়ুর পরমাণুর কোনও অবয়ব দৃষ্ট হয় না; নিরবয়বী দ্রব্য নিত্য। সুতরাং বায়ু নিত্য। বায়ু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আগমসিদ্ধ। (২।১।১৭)

৯

পরমাণুবাদ

উপনিষদে পরমাণুবাদের মূল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে যাবতীয় জড় বস্তু ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি দ্রব্যে গঠিত এবং প্রত্যেকে পরিণামী ও বিভাজ্য বলিয়া বর্ণিত। কিন্তু "সৎ" অপরিণামী ও অবিভাজ্য

বলিয়া বর্ণিত। জৈন দর্শনে পরমাণুবাদ গৃহীত হইয়াছে। আজীবকগণও এই মত স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধ বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিক দর্শনে এই মত স্বীকৃত। পাশ্চাত্তা দেশে পরমাণুবাদ প্রচার করেন লিউকিপ্পাস ও ডেমক্রিটাস্ খৃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে। আধুনিক কালে ড্যাল্টন বিজ্ঞানে এই মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ইহার ভিত্তি বিচলিত হইয়াছে। ইহা পরে বর্ণিত হইবে।

আমাদের জ্ঞাত প্রত্যেক বস্তুই নানা অংশের সমষ্টি এবং অনিত্য। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ নিত্য ও অনিত্য বিভিন্ন অংশের সমষ্টি-রূপে পরিণামী ও অনিত্য, কিন্তু তাহাদের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ অপরিণামী ও নিত্য। আকাশ অবিভাজ্য অপরিণামী ও নিত্য। জড়ের সূক্ষ্মতম অদৃশ্য অংশ অবিভাজ্য, তাহাদিগকে সূক্ষ্মতর অংশে বিভাগ করা অসম্ভব। তাহাদের যদি অবিভাজ্য অংশ না থাকিত, তাহাদের অংশ সকল যদি অনবরত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য হইত, বিভাগের যদি শেষ না থাকিত, তাহা হইলে যাবতীয় জড় বস্তুই অসীমসংখ্যক অংশদ্বারা গঠিত হইত, এবং বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে যে "পরিমাণের পার্থক্য", তাহার ব্যাখ্যা করা যাইত না। জড় বস্তুর বিভাগের যদি শেষ না থাকিত, অসংখ্য অংশে যদি তাহা বিভাজ্য হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক অংশের কোনও পরিমাণ থাকিত না, এবং পরিমাণবিহীন দ্রব্য হইতে পরিমাণের উদ্ভব হইত। অসীম মহত্ত্ব এবং অসীম ক্ষুদ্রত্বের বাস্তবতাই নাই। আমাদের জ্ঞাত যাবতীয় দ্রব্য এই উভয় সীমার অন্তর্বর্ত্তী।

জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশই পরমাণু। তাহারাই উৎপন্ন যাবতীয় বস্তুর উপাদান। তাহারা অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—ক্ষিতি পরমাণু, জল পরমাণু, তেজ পরমাণু ও বায়ু পরমাণু। ক্ষিতি-পরমাণু দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জল-পরমাণু দ্বারা রসনেন্দ্রিয়, তেজ-পরমাণু দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়, এবং বায়ু-পরমাণু দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয় গঠিত। এই জন্যই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়দ্বারা একাধিক গুণের জ্ঞান হয় না। চক্ষুদ্বারা রস, গন্ধ ও স্পর্শের জ্ঞান হয় না, নাসিকাদ্বারা গন্ধ ভিন্ন অন্য কোনও গুণের জ্ঞান হয় না, ইত্যাদি। পরমাণুগণ নিত্য, তাহাদের গুণও নিত্য। বহু পরমাণুর সংযোগদ্বারা গঠিত দ্রব্য অনিত্য, তাহাদের গুণও অনিত্য। অনিত্য পদার্থে যে সকল গুণ দৃষ্ট হয়, তাহাদের কোনটি তাহাদের কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন হয়, কোন কোনটি অগ্নি প্রভৃতি অপর পদার্থসংযোগে উৎপন্ন হয় (পাকজ গুণ)। যেমন

মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটের যে রূপাদি গুণ, তাহা ঘটের অবয়ব কপালাদির রূপাদি গুণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু অগ্নিপক্ক ঘটের গৌরবর্ণ অগ্নিসংযোগে উৎপন্ন। ইহা পাকজ রাসায়নিক ব্যাপারদ্বারা উৎপন্ন। দ্রব্যের হ্রস্ব দীর্ঘাদি পরিমাণ অনিত্য। কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ নিত্য। তাহাকে "পারিমণ্ডল্য" বলে। পারিমণ্ডল্য হ্রস্বও নহে, দীর্ঘও নহে; ইহা নিত্য।

বৈশেষিক মতে ঘট যখন অগ্নিকুণ্ডে স্থাপিত হয়, তখন তাহা পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়। অপক্ক ঘট তখন বিনষ্ট হয়। তাপ-প্রয়োগের ফলে পরমাণুগণ গৌর বর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারা পুনরায় সংযুক্ত হইয়া নূতন ঘটের উৎপাদন করে। ঘটের পরমাণুতে বিশ্লেষণ, পরে পরমাণুদিগের বর্ণ-পরিবর্ত্তন এবং পুনঃ সংযোগ এত দ্রুত সংঘটিত হয়, যে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মতকে "পিলুপাক" বলে। নৈয়ায়িকদিগের মতে ঘটের বর্ণ-পরিবর্ত্তন পরমাণুদিগের বর্ণ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই হয়, উভয়ের মধ্যে কোন কাল-ব্যবধান নাই, অপক্ক ঘটের ধ্বংস হইয়া নূতন ঘটের উৎপত্তি হয় না। এই মতকে "পিঠর পাক" বলে। অপক্ক ঘটের ধ্বংস হইবার পরে যদি পক্ক ঘটের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে পক্ক ঘটকে পূর্ব্ববর্ত্তী অপক্ক ঘট বলিয়া চিনিতে পারা যাইত না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বর্ণের পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোনও ভেদই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাপ-সংযোগে ক্ষিতির এই পরিবর্ত্তন হইলেও, জল, তেজ ও বায়ুর এরূপ কোনও পরিবর্ত্তন হয় না।

যাবতীয় কার্য্য দ্রব্যের গুণ তাহাদের পরমাণুদিগের দ্বারা উৎপন্ন। সকল দ্রব্যের যে পাঁচটি সাধারণ গুণ আছে, পরমাণুদিগের সেই সকল গুণের অতিরিক্ত পরত্ব ও অপরত্ব (Priority and Posteriority) গুণও আছে। এই সকল গুণ ব্যতীত ক্ষিতির বিশিষ্ট গুণ গন্ধ। রূপ, রস ও স্পর্শ, গুরুত্ব ও গতি গুণও ক্ষিতির আছে। জলের বিশেষ গুণ রস। গন্ধ ব্যতীত ক্ষিতির অন্যান্য গুণও জলের আছে। সাধারণগুণগুলি ব্যতীত তেজের স্পর্শ, রূপ, তরলতা ও গতি গুণ আছে। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ ও গন্ধ। পরমাণুতে এই সকল গুণ নিত্য, কিন্তু কার্য্য দ্রব্যে অনিত্য।

পরমাণুর ধ্বংস নাই। তাহাদের দ্বারা গঠিত দ্রব্যের ধ্বংস হয়; কিন্তু পরমাণু অবিনাশী। সৃষ্টির মধ্যে কোনও পরমাণুই অন্য পরমাণুর সহিত অসংযুক্ত অবস্থায় থাকে না, তখন তাহাদের এক প্রকার গতি থাকে। এই গতিকে পরিস্পন্দ বলে। একাকী কোনও পরমাণুর কোনও কার্য্য নাই। দুই পরমাণু সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে দ্ব্যণুক, এবং তিনটি

দ্ব্যণুকের সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে ত্রুটি, ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু বলে। ত্রসরেণুই দৃষ্ট বস্তুদিগের মধ্যে সূক্ষ্মতম। গবাক্ষ-বিবরে প্রবিষ্ট সূর্য্য কিরণে যে সকল সূক্ষ্ম কণিকা দেখা যায়, উহারাই ত্রসরেণু, তাহারাই প্রত্যক্ষের সীমা। পরিমণ্ডলবান দুই পরমাণুর সংযোগে সূক্ষ্ম পরিমাণযুক্ত দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হয়, ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার। সাধারণ নিয়ম এই যে কারণের গুণদ্বারা কার্য্যের গুণ উৎপন্ন হয়। শ্বেতবর্ণের দুইটি পরমাণুর সংযোগে শ্বেতবর্ণের দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। কিন্তু দ্ব্যণুকের "পরিমাণগুণ" পরমাণুতে নাই। "কারণ বহুত্বাচ্চ" (৭।১।৯) এই সূত্রানুসারে কার্য্যের পরিমাণ কারণসকলের পরিমাণ অথবা সংখ্যার উপর নির্ভর করে। দ্ব্যণুক-দিগের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত কার্য্যদ্রব্যের পরিমাণেরও বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক সমগ্র বস্তু কেবল তাহার অংশদিগের সমষ্টি নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পরমাণুর অতিরিক্ত কিছুই থাকিত না—অদৃশ্য পরমাণু ভিন্ন দৃশ্য কোনও দ্রব্য থাকিত না। অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরমাণুদিগের সমবায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, সমষ্টি তাহার অংশদিগের হইতে ভিন্ন (অর্থান্তর)—সুরের সমবায় হইতে তাহাদের সংযোগজাত সংগীত যেমন ভিন্ন। সমষ্টি ও অংশের মধ্যে সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। ন্যায়সূত্র (২।১।৩৫-৩৬)

প্রশস্তপাদের গ্রন্থে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বর্ণনা আছে। ব্রহ্মার একশত বৎসর (সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক দিন) অতীত হইলে, জীবদিগকে কিছুদিনের জন্য শান্তি দিবার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রত্যাহার করেন। প্রথমে আত্মাদিগের মধ্যে যে সংস্কার আছে, তাহাদের কার্য্য স্তব্ধ হয়। পরে জীব-দেহের পরমাণুগণ বিশ্লিষ্ট হয়। যাবতীয় দ্রব্যই পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়। পরমাণুগণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করে। পুণ্য ও পাপের সংস্কারযুক্ত জীবাত্মাগণও বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। পরে ঈশ্বর আবার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে পরমাণুতে শক্তি সঞ্চারিত হয়, পরে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, এবং পূর্ব্বের মতো নূতন জগতের উদ্ভব হয়। প্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা তাঁহার মানস পুত্রদিগের সৃষ্টি করেন। প্রজাপতিগণ, মনুগণ, দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও চতুর্বর্ণের ও অন্যান্য জীবের এইরূপ সৃষ্টি হয়। দিক্, কাল ও আকাশ এই তিন পরম মহৎ দ্রব্যের কিন্তু কোনও বিকার হয় না। তাহারা কল্পে কল্পে একরূপই থাকে। শ্রীধর বলেন নূতন সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। সৃষ্টি-ও-প্রলয়-প্রবাহ অনাদি। একই প্রবাহে সৃষ্টি ও প্রলয় দুইটি ক্রম। জীবদিগের কর্ম্মানুসারে তাহাদের

ভোগের জন্যই নূতন নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাহাদের কর্ম্ম এই সৃষ্টির কারণ। ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই ভোগ্য বস্তু। ব্রহ্মার কর্ম্মফলেরও শেষ আছে। যখন সেই শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার ভোগ্য ব্রহ্মাণ্ডের লয় হয়। কিন্তু ব্রহ্মা ব্যতিরিক্ত অন্যান্য জীবের কর্ম্মফল তখন শেষ না হওয়ায়, তাহাদের ভোগের জন্য নূতন ব্রহ্মা তাহার স্থান অধিকার করিয়া নূতন সৃষ্টি করেন। এইরূপে চিরকাল সৃষ্টি ও প্রলয় চলিতে থাকিবে। পরমাণুগণ নিত্য। সুতরাং তাহাদের ধ্বংস নাই। ত্র্যণুক, দ্ব্যণুকদিগের সংযোগের ধ্বংস হয়। কিন্তু বিশ্লিষ্ট পরমাণুগণ বর্ত্তমান থাকে।

১০
শঙ্করাচার্য্য কৃত পরমাণুবাদের সমালোচনা

(১) দুইটি পরমাণু মিলিয়া একটি দ্ব্যণুকের যখন উৎপত্তি হয়, তখন এই মিলনে কি এক পরমাণুর অংশ-বিশেষ অপর পরমাণুর অংশ-বিশেষের সহিত মিলিত হয়, অথবা সমগ্র দুইটি পরমাণু সমগ্রভাবে মিলিয়া যায়? যদি সমগ্রভাবে মিলন হয়, প্রত্যেক পরমাণু অন্যটির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায় তাহা হইলে উভয়ের মিলনে আয়তনের বৃদ্ধি হইতে পারে না। দ্ব্যণুক পরিমাণে পরমাণু হইতে অধিক হইতে পারে না। সুতরাং স্থূল বস্তুর উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। যদি প্রত্যেক পরমাণুর অংশবিশেষের মিলন হয়, তাহা হইলে পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বৈশেষিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। (ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্য ২।১।২৯)

(২) বিভিন্ন পরমাণুর সংযোগোৎপন্ন যৌগিক দ্রব্যে এমন গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সংযুক্ত পরমাণুদিগের নাই। বৈশেষিক মতে কারণের গুণই কার্য্যে সংক্রামিত হয়। কিন্তু যদিও পরমাণু ও দ্ব্যণুক হইতে চতুরণুর উৎপত্তি হয়, তথাপি পরমাণুর গুণ পরিমণ্ডল এবং দ্ব্যণুকের গুণ হ্রস্ব, চতুরণুতে থাকে না। মহৎ, দীর্ঘ প্রভৃতি নূতন গুণ চতুরণুতে দৃষ্ট হয়। ইহা কিরূপে হয়, তাহার সংগত ব্যাখ্যা নাই। (ব্র, সূত্র ভাষ্য ২।২।১১)

(৩) প্রলয়ের সময় পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় থাকে, সৃষ্টিকালে তাহারা সক্রিয় হয়। কিরূপে হয়, তাহার ব্যাখ্যা বৈশেষিক মতে নাই। যদি জীবের কর্ম্ম অথবা অদৃষ্টই এই সক্রিয়তার কারণ হয়, তাহা হইলে এই অদৃষ্ট কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, জীবকে বা পরমাণুকে? কিন্তু জীবের আশ্রয়ে থাকিলে

পরমাণুতে গতি উৎপন্ন হইবে কিরূপে? যদিবা কোনও প্রকারে গতি উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার কখনও বিরাম হইবে না, সুতরাং আর প্রলয়ও হইবে না। যদি পরমাণুর আশ্রয়ে অদৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে অচেতন বলিয়া ইহা গতি-উৎপাদনে অক্ষম। (ব্র, সূ, ২।২।১২) যদি বলা যায় জীব পরমাণুর মধ্যে থাকে, এবং অদৃষ্ট তথায় তাহার সহিত যুক্ত থাকে, তাহা হইলে অনন্তকাল ধরিয়া গতি চলিতে থাকিবে, প্রলয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। পরন্তু অদৃষ্ট দ্বারা জীবের পুরস্কার ও শাস্তিই নিয়ন্ত্রিত হয়, সৃষ্টি ও প্রলয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই।

(৪) পরমাণুর স্বভাব কি প্রবৃত্তি (ক্রিয়া-পরত্ব), অথবা নিবৃত্তি (নিষ্ক্রিয়তা)? অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই? অথবা উভয়ের কোনটিই নহে? যদি প্রবৃত্তিই উহার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে প্রলয় হইতে পারে না। যদি নিবৃত্তি পরমাণুর স্বরূপ হয় তাহা হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। দুইটি বিরোধী গুণ কখনই পরমাণুর স্বভাব হইতে পারে না। যদি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কোনটিই পরমাণুর স্বভাব না হয় এবং "অদৃষ্ট"ই স্বভাব হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে উল্লিখিত আপত্তি হয়। (ব্র, সূ—২।১।১৪)

(৫) বৈশেষিক মতে পরমাণুগণ নিত্য যদিও তাহাদিগের গন্ধ, রস, রূপ প্রভৃতি গুণ আছে। কিন্তু দেখা যায় যে-সকল বস্তুর রূপাদি গুণ আছে, তাহারা সকলেই অনিত্য। সুতরাং পরমাণুদিগকে অনিত্য বলিতে হইবে। (ব্র, সূ—২।২।১৫)

(৬) ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতের পরমাণুদিগের গুণ সম্বন্ধে দুই প্রকার কল্পনা করা যায়। প্রথমতঃ ক্ষিতির গুণ-সংখ্যা চারি। অপের তিন, তেজের দুই এবং মরুতের এক। যাহার গুণ-সংখ্যা অধিক তাহার আকারও বৃহত্তর স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ক্ষিতি-পরমাণু হইতে জল-পরমাণু সূক্ষ্মতর, এবং জল-পরমাণু হইতে তেজ-পরমাণু সূক্ষ্মতর এবং তেজ-পরমাণু হইতে বায়ু-পরমাণু সূক্ষ্মতর বলিতে হইবে। কিন্তু বৈশেষিক মতে সকল পরমাণুই সূক্ষ্মতম। আর যদি প্রত্যেক ভূতের এক একটি মাত্র গুণ কল্পনা করা যায়—যেমন ক্ষিতির গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ ও বায়ুর স্পর্শ—তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যক্ষ গুণ অস্বীকার করা হয়। (ব্র, সূ ২।২।১৬)

(৭) বৈশেষিক মত কোনও বেদজ্ঞ ঋষি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং এই মত অগ্রহণীয়। (ব্র, সূ—২।২।১৭)

উপরি উক্ত (৫) আপত্তি সম্বন্ধে স্বামী সন্তদাসজী লিখিয়াছেন যে, নিত্য শব্দ কণাদ-দর্শনে "অবিনাশী" অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যে দ্রব্যের উৎপত্তি ও ধ্বংস প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাকেই কণাদ নিত্য বলিয়াছেন। শ্রুতিতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, বায়ু, জ্যোতিঃ অপ ও পৃথিবী সকলই উৎপত্তিশীল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং মহা প্রলয়ে ইহাদের লয় হয়, ইহাও ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং ইহারা নিত্য হইতে পারে না। পরমাণুদিগকে অনাদি, অনন্ত অর্থে নিত্য বলা কণাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তিনি ইহাদিগকে আপেক্ষিক নিত্য বলিয়াছেন, কেননা ইহাদের উৎপত্তি ও নাশ দৃষ্ট হয় না। (দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—প্রথম খণ্ড—৫২ পৃষ্ঠা)।

১১
সাম্প্রতিক বিজ্ঞানে পরমাণুবাদ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ড্যালটন গ্রীক পরমাণুবাদকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীনকালে চারিটি মূল পদার্থ মাত্র স্বীকৃত হইত—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। বর্ত্তমানে ৯০টি মৌলিক দ্রব্যের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। ৯০টি বিশুদ্ধ মৌলিক দ্রব্যের প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য এবং এই সকল অংশের মধ্যে ক্ষুদ্রতম অংশই পরমাণু। বিভিন্ন দ্রব্যের পরমাণুদিগের গুণও বিভিন্ন। বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সংযোগে যৌগিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এই মত বহুদিন ধরিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পরমাণুর অবিভাজ্যত্ব মত খণ্ডিত হইয়াছে, এবং পরমাণুর মধ্যে তাহার দ্বিবিধ উপাদান —প্রোটন ও ইলেকট্রনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রোটন ও ইলেকট্রন তড়িৎকণা—প্রোটন ধনতড়িৎ, ইলেকট্রন ঋণ তড়িৎ। এই তড়িৎ শক্তির আধার স্বরূপ দ্রব্যান্তরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কেন্দ্রীণের চারিদিকে ইলেকট্রনগণ প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। জলজান পরমাণুতে একটি প্রোট্রনের চতুর্দ্দিকে একটি ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। কিন্তু ২০০ প্রোটন ও ১০০ ইলেকট্রনে গঠিত পরমাণুও আছে। পরমাণুদিগের গঠন সৌরজগতের ন্যায়। একাধিক ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষে কেন্দ্রীনের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনগণ যে পরিমাণ স্থান পরমাণুর মধ্যে ব্যাপিয়া আছে, তাহার বহুগুণ স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। পরমাণুর অধিকৃত স্থানের

অধিকাংশই শূন্য, প্রত্যেক জাতীয় পরমাণুর ভার আবিষ্কৃত হইয়াছে। আলোক, তাপ ও শক্তিরও ভার আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পরমাণুর মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি আবদ্ধ আছে তাহার ধ্বংস-ক্ষমতা গত যুদ্ধের সময় প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু পরমাণু বা তাহার উপাদান প্রোটন ইলেকট্রন আজি পর্য্যন্ত অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে নাই। প্রাচীন পরমাণুবাদের মতো আধুনিক পরমাণুবাদও কল্পনার সৃষ্টি। যতদিন পর্য্যন্ত এই মতদ্বারা দ্রব্যের যাবতীয় আচরণের ব্যাখ্যা হয়, ততদিন ইহার সত্যতায় সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না; কিন্তু কোনও ব্যাপার এই মতে ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে, ইহা পরিত্যক্ত হইবে।

১২
গুণ

কণাদ মতে গুণ ১৭টি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন। "দ্রব্যাশ্রয়ী অগুণবান সংযোগ বিভাগেষু অকারণম্ অনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্" (১।১।১৬),—যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, দ্রব্যাশ্রয় ভিন্ন যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহার নিজের কোনও গুণ নাই (গুণের গুণ থাকিতে পারে না), যাহা সংযোগ ও বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ, অর্থাৎ সংযোগ ও বিভাগের কারণ নহে, (সংযোগ ও বিভাগ সাধিত হয় কর্ম্মদ্বারা, গুণদ্বারা নহে) তাহাকে গুণ বলে।

কণাদের ১৭টির সঙ্গে প্রশস্তপাদ আর সাতটি গুণের যোগ করিয়াছেন। তাহারা গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, শব্দ এবং সংস্কার। ইহাদেরও দ্রব্যের বাহিরে অস্তিত্ব নাই। গুণগণ দ্রব্যও নহে, কর্ম্মও নহে। লঘুত্ব, মৃদুত্ব, কঠিনত্ব গুণ নহে, কেননা গুরুত্বের অভাবই লঘুত্ব, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মৃদুত্ব ও কঠিনত্বও স্বতন্ত্র গুণ নহে, তাহারা সংযোগের বিভিন্ন পরিমাণমাত্র। আধুনিক ন্যায়ে পরত্ব, অপরত্ব ও পৃথকত্ব গুণ বলিয়া পরিগণিত হয় না, কেননা পরত্ব ও অপরত্ব দিক্ ও কালের উপর নির্ভরশীল; এবং পৃথকত্ব পারস্পরিক অন্যোন্যাভাবের অতিরিক্ত কিছু নহে। জড়ীয় ধর্ম্ম ও মানসিক ধর্ম্ম উভয়ই গুণের অন্তর্ভুক্ত। গুণও দ্রব্যের ন্যায় নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। নিত্য দ্রব্যের

গুণ নিত্য, অনিত্য দ্রব্যের গুণ অনিত্য। যে সকল গুণ একাধিক দ্রব্যের আশ্রিত, তাহারা সাধারণ গুণ, যাহা একমাত্র দ্রব্যাশ্রিত তাহা বিশেষ গুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, স্বাভাবিক তরলতা, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সংস্কার এবং শব্দ—ইহারা বিশেষ গুণ। ইহাদের দ্বারা এই সমস্ত গুণান্বিত দ্রব্যের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের ভেদ সূচিত হয়। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, উৎপন্ন দ্রবত্ব ও বেগ সর্ব্ব দ্রব্যের সাধারণ গুণ। ইহারা বস্তুনিষ্ঠ (objective) নহে। সংখ্যার অস্তিত্ব বস্তুর মধ্যে নাই। ইহা "বুদ্ধি-নির্মাণ"। একই দ্রব্যকে এক অথবা বহু বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিয়োগ সকল দ্রব্যেরই আছে। দিক্ ও কালের এতৎব্যতীত অন্য কোনও গুণ নাই, কিন্তু আকাশের শব্দ গুণ আছে।

মন মূর্ত্ত দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত। তাহার সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, সংস্কার ও বেগ এই আট গুণ।

আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। গুণদিগের কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং সংস্কার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কতকগুলি গুণ এক-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যেমন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ; কতকগুলি একাধিক-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—যেমন সংখ্যা, আকার, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ এবং বেগ। আত্মার গুণ—জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন—মন-দ্বারা জ্ঞাত হয়। মন আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবিধান করে।

ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ সকলেরই রূপ আছে। জল ও তেজে এই রূপের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু তাপসংযোগে ক্ষিতির পরিবর্ত্তন হয়। বর্ণ সংখ্যা সাতটি—শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত, হরিত, ধূসর ও চিত্র। ক্ষিতি এবং জলের 'রস' গুণ আছে। অন্য কোনও দ্রব্যের নাই। কটু, অম্ল, কসায়, তিক্ত ও মিষ্ট এই পাঁচ প্রকার রস। গন্ধগুণ কেবল পৃথিবীরই আছে। গন্ধ দ্বিবিধ—সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ। শীতল, উষ্ণ এবং না-শীত-না-উষ্ণ-ভেদে স্পর্শ ত্রিবিধ। স্পর্শগুণ দ্রব্যস্থিত তাপকেই লক্ষ্য করে। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ সকলেরই এই গুণ আছে। কাঠিন্য, কর্কশতা, মসৃণতা এবং কোমলতাও স্পর্শগুণের অন্তর্ভুক্ত। শব্দগুণ কেবল আকাশের আছে।

বস্তুর মধ্যে যে গুণের অস্তিত্ববশতঃ আমরা তাহাদিগকে এক, দুই প্রভৃতি রূপে গণনা করি তাহাই সংখ্যা। সংখ্যাদিগের মধ্যে একত্ব নিত্যও বটে,

অনিত্যও বটে, কিন্তু অন্যান্য সংখ্যা অনিত্য। দুই, তিন, চারি প্রভৃতি সংখ্যার ধারণা (এক ব্যতীত অন্যান্য সংখ্যার ধারণা) উৎপন্ন হয় "অপেক্ষা বুদ্ধি" (মনের দোলায়মান অবস্থা) হইতে। সম্মুখে দুইটি ঘট যখন থাকে, তখন মন একটিতে প্রথম আকৃষ্ট হয়। তখন "একের" ধারণা হয়। পরে মন দ্বিতীয়টিতে আকৃষ্ট হয়। তখন মনে হয়, ইহা আর একটি ঘট। তখন দ্বিত্বের জ্ঞান হয়। অন্যান্য সংখ্যার জ্ঞানও এইরূপে উৎপন্ন হয়। এই গুণ যে বস্তুনিষ্ঠ নহে তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

বস্তুর যে গুণবশতঃ তাহাদিগকে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র, দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব বলিয়া বোধ হয়, তাহাই পরিমিতি বা পরিমাণ। অংশহীন পরমাণুদিগের পরিমাণকে বলে "পরিমণ্ডল পরিমাণ"। পরিমণ্ডল নিত্য। ইহা অন্য বস্তুর পরিমাণ উৎপাদনে অসমর্থ। দুইটি পরমাণু-সংযোগে যখন একটি দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, তখন দ্ব্যণুকের পরিমাণকে বলে "হ্রস্ব" পরিমাণ। এই হ্রস্ব পরিমাণ দ্ব্যণুকের উপাদান পরমাণুদ্বয়ের পরিমাণের সমষ্টি নহে। এই পরিমাণ উৎপন্ন হয় সংখ্যাদ্বারা। এইরূপ যখন তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া এক ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়, তখন দ্ব্যণুকদিগের হ্রস্ব পরিমাণদ্বারা ত্র্যণুকের মহৎ গুণের উৎপত্তি হয় না, সংখ্যাদ্বারা হয়। ত্র্যণুক স্থূল। যখন ত্র্যণুকগণ মিলিত হয়, তখন তাহাদের "মহৎ" পরিমাণদিগের সংযোগ হইতেই উৎপন্ন স্থূল বস্তুর পরিমাণ উদ্ভূত হয়, সংখ্যা সেখানে কারণ নহে। ত্র্যণুকদিগের পরিমাণ কেবল "মহৎ" নহে, তাহা "দীর্ঘ"ও বটে। এই দীর্ঘ পরিমাণ ও মহৎ পরিমাণ একত্র অবস্থিতি করে, কিন্তু তাহারা অভিন্ন নহে। দ্রব্যসকল যেমন মহৎ, তেমনি দীর্ঘরূপে প্রকাশিত হয়। দ্ব্যণুকের এবং ত্র্যণুকদিগের সংযোগের ফলে "মহৎ" পরিমাণ এবং "দীর্ঘ" পরিমাণের বৃদ্ধি হয়, এবং সংযোগোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ সংযুক্ত পরমাণুদিগের প্রত্যেকের পরিমাণ হইতে মহত্তর ও দীর্ঘতর। কিন্তু দ্ব্যণুকের "হ্রস্ব" পরিমাণ ত্র্যণুকের "মহৎ" পরিমাণ হইতে যে কম (মহত্ত্বে এবং দৈর্ঘ্যে), তাহা নহে। ইহা এক ভিন্ন প্রকারের পরিমাণ, যাহার নাম "হ্রস্ব"। এই প্রসঙ্গে যে যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার যৌক্তিকতা দুর্বোধ্য। স্থূল দ্রব্যের সহযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ উপাদান-দ্রব্যদিগের পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর, তাহাদিগের অপেক্ষা মহত্তর, দীর্ঘতর ও স্থূলতর হয়। এই হেতুতে হ্রস্বপরিমাণযুক্ত দ্রব্যদিগের সংযোগ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ হ্রস্বতর হইবে, ইহাই আশা করা যায়। কারণের মহত্ত্ব যদি কার্য্যের মহত্ত্বের বৃদ্ধির কারণ হয়,

তাহা হইলে কারণের হ্রস্বত্বও কার্য্যের হ্রস্বত্ব-বৃদ্ধির কারণ হওয়া উচিত। সুতরাং পরমাণুদিগের পরিমণ্ডল পরিমাণ এবং দ্ব্যণুকদিগের হ্রস্ব পরিমাণদিগের সংযোগ হইতে তাহাদের কার্য্যে অধিকতর সূক্ষ্মত্ব এবং ক্ষুদ্রত্ব আশা করা যায়। কিন্তু পরমাণুদ্বয়-গঠিত দ্ব্যণুকে এবং দ্ব্যণুকত্রয়-গঠিত ত্র্যণুকে তাহাদের উপাদান পরমাণু এবং দ্ব্যণুকের পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা মানিতে হইবে যে পরমাণু ও দ্ব্যণুকের পরিমাণ তাহাদের কার্য্যের পরিমাণ উৎপন্ন করে না, তাহাদের সংখ্যাই উৎপন্ন পরিমাণের কারণ।

আকাশ, দিক, কাল এবং আত্মা সর্ব্বব্যাপী। ইহাদের পরিমাণ "পরম মহৎ"। পরমাণু, আকাশ, দিক, কাল, মন ও আত্মার পরিমাণ নিত্য। অনিত্য দ্রব্যদিগের পরিমাণ অনিত্য।

বস্তুর যে গুণবশতঃ প্রত্যেক বস্তু অন্যান্য বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই পৃথক্ত্ব। ইহা ভাব পদার্থ, অভাব নহে।

বস্তুর যে গুণবশতঃ তাহারা সংযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার নাম সংযোগ, এবং যে গুণ সংযোগের বিনাশ সাধন করে তাহা বিয়োগ।

পরত্ব ও অপরত্ব গুণের জন্য দীর্ঘকাল ও স্বল্প কালের, এবং দূরত্ব ও নৈকট্যের ধারণা হয়।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং যত্ন কেবল আত্মারই গুণ।

যে গুণবশতঃ দ্রব্যসকল নিম্নে পড়ে, তাহা "গুরুত্ব"। "স্নেহ" গুণ (তৈলের মত তরলতা) জলের। সংস্কার ত্রিবিধ—(১) বেগ—যাহার ফলে বস্তু বিভিন্ন দিকে চালিত হয়। (২) স্থিতি স্থাপকত্ব যাহার ফলে কোনও বস্তু কোনও কারণে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হয়। এবং (৩) ভাবনা। আত্মার যে গুণের অস্তিত্বশতঃ অনুভূত বস্তুর স্মরণ হয়, এবং তাহা চিনিতে পারা যায়, তাহাই ভাবনা। কণাদের মতে (৯।২।৬) "আত্ম মনসোঃ সংযোগ বিশেষাৎ সংস্কারাৎচ স্মৃতিঃ।" প্রশস্তপাদের মতে ভাবনা আত্মার এক বিশেষ গুণ। ইহা মোহ, দুঃখ এবং জ্ঞানের বিপরীত। ইহার ফলেই দৃষ্ট, শ্রুত এবং অনুভূত দ্রব্য স্মৃতিতে উদিত হয়, ও তাহা চিনিতে পারা যায়।

আত্মার যে গুণ থাকাতে আত্মা সুখভোগ করে ও মুক্তিলাভে সক্ষম হয়, তাহা ধর্ম্ম। যে গুণের ফলে আত্মা দুঃখভোগ করে, তাহা 'অধর্ম্ম'। আত্মা ও অন্যান্য দ্রব্যে যে অপরিজ্ঞাত গুণের অস্তিত্বশতঃ জগৎ সুব্যবস্থিত

আছে, এবং জীবের পাপ ও পুণ্যানুসারে তাহাদের ভোগের ব্যবস্থা জগতে আছে, তাহাই "অদৃষ্ট"। যেখানেই যুক্তিদ্বারা কোন ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যায় না, বৈশেষিক দর্শনে সেইখানেই "অদৃষ্ট" দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা হয়।

১৩

কর্ম্ম

কর্ম্ম শব্দে গতি বুঝায়। ইহা বিশ্বের এক মূল তত্ত্ব—দ্রব্য ও গুণের অতিরিক্ত তত্ত্ব। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন—ইহারা কর্ম্ম। এক চলন অথবা স্পন্দনেরই বিভিন্ন অবস্থায় এই সকল নাম হয় (১।১।৭)। গুণের মত কর্ম্মও দ্রব্যনিষ্ঠ, কিন্তু দ্রব্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ অস্থায়ী। ইহা একটিমাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করে, ইহা নির্গুণ, এবং সংযোগ ও বিভাগের মুখ্য এবং অনপেক্ষ কারণ (১।১।১৭)। ইহা বেগেরও কারণ (১।১।২০), কিন্তু দ্রব্যের কারণ নহে (১।১।২১)। কর্ম্ম কর্ম্মকে বিনাশ করে (কার্য্য বিরোধি কর্ম্ম—১।১।১৪). যেমন উৎক্ষেপণ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে অবক্ষেপণ বিনষ্ট হয়। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয় না। কর্ম্ম দ্বারা সংযোগ ও বিভাগ সাধিত হইতে পারে। ইহারা দ্রব্যের গুণ—কর্ম্ম নহে। ঐ সংযোগ-বিভাগ হইতে অপর কর্ম্মের উদ্ভব হইতে পারে; সংযোগ বিভাগই সেই কর্ম্মের কারণ; সংযোগ-বিভাগের কারণ যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম এই কর্ম্মের কারণ নহে। দ্রব্য ও গুণ যেমন দ্রব্য ও গুণের উৎপত্তি করে, কর্ম্মের সেই গুণ—স্বজাতীয়ারম্ভকত্ব—নাই। দ্রব্য ও গুণের মতো কর্ম্মও সৎ (১।২।৭)। সমস্ত কর্ম্মই অস্থায়ী, এবং তাহার আশ্রয় দ্রব্যের সংযোগ অথবা বিভাগ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গুণের সহিত কর্ম্মের সাধর্ম্য নাই। সংযোগ অথবা বিভাগ উৎপাদন করিয়া উৎক্ষেপনাদি কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহার পরে উৎপন্ন কর্ম্মের কারণ হইতে পারে না। একাধিক দ্রব্যে কর্ম্ম সমবেত নহে। সুতরাং কর্ম্ম বহু দ্রব্যের সামান্য কার্য্য নহে (১।১।২৬)। গুরুত্ব, প্রযত্ন এবং সংযোগ—এই তিনটি হইতে উৎক্ষেপণ রূপ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। গুরুত্বাদি গুণ। সুতরাং বহুগুণ হইতে একটি কর্ম্ম উদ্ভূত হয় (১।১।২৯)।

বহুকর্ম্মদ্বারা সংযোগ ও বিভাগ উৎপন্ন হয় (১।১।৩০)। কর্ম্ম দ্রব্য কিংবা কর্ম্মের কারণ হইতে পারে না (১।১।৩১)।

গুণ কর্ম্মের স্থায়ী লক্ষণ কিন্তু কর্ম্ম অস্থায়ী। দ্রব্যের গুরুত্ব তাহার গুণ, কিন্তু পতন কর্ম্ম – তাহা আপতিক। যে দ্রব্যের যে সকল কর্ম্ম স্থায়ী, তাহারাই গুণ; যাহারা বিনষ্ট হয়, তাহারা কর্ম্ম।

আকাশ, দিক ও কাল অমূর্ত্ত, এবং তাহাদের কর্ম্ম নাই। কোন দিক হইতে লোক আসিলে তাহাতে দিকের কোনও কর্ম্ম নাই (৫।২।২১)। বর্ষাকালে জল হয়, তাহাতে কালের কর্ম্ম নাই। আত্মাকে কণাদ নিষ্ক্রিয় মনে করিতেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

১৪

সামান্য

একই গুণ যখন বহুদ্রব্যের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তখন তাহাকে সামান্য বলে। কিন্তু এই নামকরণ আপেক্ষিক। যখন এই সাধারণ গুণ অন্য শ্রেণীর দ্রব্য হইতে এই গুণান্বিত বস্তুদিগের ব্যবর্ত্তক বলিয়া গণ্য হয়, তখন ইহা হয় "বিশেষ"। কণাদের মতে সামান্য ও বিশেষ "বুদ্ধ্যপেক্ষ" (১।২।৩), তাহারা "বুদ্ধি-নির্ম্মাণ" বা বুদ্ধিসৃষ্ট, বস্তুর মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু প্রশস্তপাদের মত ভিন্ন। তিনি সামান্যকে নিত্য, এবং বহু দ্রব্যের গুণ অথবা কর্ম্মের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সংযোগ এবং দ্বিত্ব বহুবস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ হইলেও নিত্য নহে। আবার আকাশ নিত্য হইলেও বহুবস্তুর সহিত সংবদ্ধ নহে। অত্যন্তাভাব নিত্য, এবং বহু বস্তুর গুণ হইলেও তাহাদের উপাদান নহে। বিশেষও সামান্য নহে; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বিশেষের বিশেষত্ব থাকিত না, এবং সামান্যের সহিত তাহার ভেদ বোধগম্য হইত না। সমবায় ও সামান্যও এক নহে। সামান্যবশতঃ বিভিন্ন পৃথক্ বস্তু এক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। সামান্য এক, নিত্য এবং "অনেকানুগত"। ইহা "স্ববিষয়-সর্ব্বগত" (এক শ্রেণীর সকল বস্তুর মধ্যগত), "অভিন্নাত্মক" এবং "অনুবৃত্তি-প্রত্যয় কারণ" (বস্তুদিগের মধ্যে সাদৃশ্যের উপলব্ধির কারণ)। দ্রব্য গুণও কর্ম্মের সামান্য আছে, কিন্তু সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবের সামান্য নাই। কেননা সামান্য অন্য সামান্যের মধ্যে থাকিতে পারে না। বৃক্ষত্ব

এবং ঘটত্ব উভয়েই সামান্য। উভয়ের মধ্যে সাধারণ কোনও সামান্য থাকিতে পারে না; তাহাদের মধ্যে কোনও সামান্যের কল্পনা করিলে অনবস্থার উদ্ভব হয়।

সামান্য দ্বিবিধ—উচ্চ ও নিম্ন। সর্ব্বাপেক্ষ উচ্চ সামান্য সত্তা, কেননা সকল বস্তুরই সত্তা আছে। সত্তার মধ্যে যাবতীয় বস্তু, সত্তা কাহারও অন্তর্গত নহে। অন্য কোনও বৃহত্তর শ্রেণীর ইহা অন্তর্গত নহে। সত্তাই এক মাত্র যথার্থ সামান্য। অন্ত্যবিশেষগণই (যাহাদের অন্তর্গত অন্য বিশেষ নাই) যথার্থ বিশেষ। সত্তা ও অন্ত্য বিশেষদিগের মধ্যবর্ত্তী সামান্য-বিশেষগণ (যাহারা সামান্যও বটে বিশেষও বটে) ইহাদের অন্তর্গত বস্তুর সংখ্যা সীমিত।

যে সকল শব্দে একই পদার্থ বুঝায়, তাহারা "পর্য্যায়" শব্দ। "সামান্য" ও "জাতি" পর্য্যায় শব্দ। কোনও বস্তুর "জাতি" সেই বস্তুর সহজাত ও নিত্য, কিন্তু তাহার "উপাধি" নৈমিত্তিক ও অস্থায়ী। প্রত্যেক সাধারণ গুণই "জাতি" নহে। অনেক লোক অন্ধ বলিয়া অন্ধত্বকে জাতি বলা যায় না। মানুষেরা সকলে এক "মনুষ্য" জাতির অন্তর্গত। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি নহে, উপাধি মাত্র। কৃষ্ণবর্ণ যেমন মানুষে আছে, তেমনি অনেক পশু ও অনেক জড় দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ জাতি নহে।

প্রশস্তপাদের মতে সামান্যের দ্রব্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। প্রলয়ে যখন সকল দ্রব্যের ধ্বংস হয়, তখনও সামান্যের অস্তিত্ব থাকে। প্রশস্তপাদের সামান্য ও প্লেটোর Ideas এক। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ব্যাখ্যায় কণাদ বুদ্ধির ক্রিয়ার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রশস্তপাদ সামান্যদিগের নিত্যত্ব দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সৃষ্টিকালে সামান্যগণ পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকাশিত হয়। সার্বিক (Universal) ও বিশেষের মধ্যে, "সার" (Essence) এবং অস্তিত্বের (Existence) মধ্যে যে সম্বন্ধ গ্রীকদর্শনে ও স্কলাষ্টিক দর্শনে আলোচিত হইয়াছে, এখানেও সেই সমস্যা। প্লেটোর Ideaগণ নিত্য ও স্বয়ংসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যসকল Ideaদিগের স্বরূপের অংশভাক্ (Participant) হইয়াই স্বীয় স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয়। প্রশস্তপাদের মতও এইরূপ। সার্বিক ও বিশেষের সমস্যা যেমন ইয়োরোপের মধ্যযুগের দর্শনে তেমনি ভারতেও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শন নামবাদী (Nominalist)। বৌদ্ধমতে "সামান্যগণ নাম-মাত্র, তাহাদের বস্তুগত সত্যতা নাই। পৃথক পৃথক বস্তুর মধ্যে সামান্য বলিয়া কোনও গুণের অস্তিত্ব নাই।

সামান্য কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয় না, আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সামান্যের প্রত্যয় গঠন করি। এবং তাহা বাহ্য দ্রব্যে প্রয়োগ করি।

বৌদ্ধমতে সার্বিক ও বিশেষের মধ্যে ভেদ নাই। জয়ন্ত এই মতের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (ন্যায়মঞ্জরী)। বিরুদ্ধবাদীদিগের মতে সার্বিক যখন বিশেষ হইতে ভিন্ন দেশে বর্ত্তমান নাই, তখন সার্বিক ও বিশেষের মধ্যে ভেদ নাই। কিন্তু জয়ন্ত বলেন সার্বিক বিশেষের মধ্যেই বর্ত্তমান। তবে কি সার্বিক সমগ্রভবে প্রত্যেক বিশেষের মধ্যে বর্ত্তমান অথবা অংশতঃ? সার্বিকের যদি অংশ থাকে, তাহা হইলে তাহা নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে সমগ্রভাবেই বিশেষের মধ্যে থাকিতে হইবে। তাহা হইলে অন্য বিশেষে তাহার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। জয়ন্ত বলেন সার্বিক সমগ্রভাবেই বহু বিশেষের মধ্যে যে থাকিতে পারে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। বৌদ্ধেরা বলেন সার্বিক হয় সর্বগত, নতুবা পিণ্ডগত (কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীতে বর্ত্তমান)। যদি সর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে "গোত্ব" অশ্বে, প্রস্তরে এবং অন্যান্য বস্তুতে দেখা যায় না কেন? যদি "স্ব-ব্যক্তি সর্বগত" (স্ব-শ্রেণীর সর্ব্ব ব্যক্তিতে বর্ত্তমান) হয়, তাহা হইলে নবজাত গোবৎসে তাহা কিরূপে দৃষ্ট হয়? গোবৎসের জন্মের পূর্ব্বে তো তাহা সেখানে ছিল না। সার্বিক যখন নিত্য, তখন গোবৎসের জন্মের সঙ্গে তাহাতে তাহার উৎপত্তি হইল, ইহা বলা যায় না। একথাও বলা যায় না যে অন্য দ্রব্য হইতে তাহা গোবৎসে সংক্রামিত হয়। কেননা সার্বিক অমূর্ত্ত, এবং গতিহীন, এবং অন্যত্র হইতে গোবৎসে তাহার সংক্রমণও প্রত্যক্ষ হয় না। যখন ব্যক্তির ধ্বংস হয়, তখন সার্বিকেরও কি ধ্বংস হয়? জয়ন্ত বলেন সার্বিক সকল ব্যক্তির মধ্যেই বর্ত্তমান, যদিও সর্বত্র প্রকাশিত নহে। সার্বিক তাহার বিষয়দিগের মধ্যেই বর্ত্তমান, ইহা সত্য। যখন কোনও বিশেষের উদ্ভব হয়, তখন সার্বিকের সহিত তাহার সম্বন্ধও উদ্ভূত হয়। সার্বিক নিত্য হইলেও কোনও বিশেষের সহিত তাহার সম্বন্ধের উদ্ভব হয়, যখন সেই বিশেষের উদ্ভব হয়।*

কণাদের মতে সামান্য ও বিশেষ "বুদ্ধ্যপেক্ষ" হইলেও তিনি তাহাদিগকে "ভাব" পদার্থ বলিয়াছেন, "অভাব" বলেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে "সম্প্রত্যয়-বাদী" (conceptualist) বলা যায় না। সম্প্রত্যয়বাদে মনের বাহিরে

* (ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, Indian Philosophy, Vol II, Pp. 212-213).

সার্বিকের অস্তিত্ব নাই। কণাদের মতে "সামান্য" যে সকল গুণের সূচনা করে তাহারা বহুবস্তুসাধারণ ও "সৎ"। বহুবস্তুসাধারণ গুণাবলী বুদ্ধি-নিরপেক্ষ। বুদ্ধি তাহাদের আবিষ্কার করে, এই অর্থে তাহারা বুদ্ধ্যপেক্ষ। আমরা যাবতীয় গোরুকে একরূপ করি না, তাহাদের সাদৃশ্য অনুভব করিমাত্র। সার্বিক নিত্য, ইহা সত্য। ব্যক্তির নাশ হয়, কিন্তু জাতির নাশ হয় না। ব্যক্তির পূর্ব্বে সার্বিকের অস্তিত্ব ছিল। প্রশস্তপাদের মতে সার্বিকের সহিত বিশেষের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। কিন্তু কুমারিল ও পার্থসারথি মিশ্রের মতে এই সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ। কুমারিল বলেন "যখন কোনও গোরু আমরা দেখি, তখন আমাদের অনুভব হয় "ইয়ং গৌঃ" (ইহা গোরু), "ইহ গবি গোত্বম্" (এই গোরুতে গোত্ব বর্ত্তমান) নহে। সুতরাং সার্বিকে ও বিশেষে ভেদ নাই, উভয়ে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংবদ্ধ। পার্থসারথি মিশ্র বলেন "যেন সম্বন্ধেন আধেয়ং আধারে স্বানুরূপাম্ বুদ্ধিং জনয়তি, স সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি" (শাস্ত্রদীপিকা)—যে সম্বন্ধবশতঃ আধেয়কর্ত্তৃক আধারে তাহার অনুরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সমবায়। সামান্য বিশেষের সহিত সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ইহার অর্থ এই যে 'গোত্ব" বিশেষ গোরুর মধ্যে গোত্বের জ্ঞান উৎপন্ন করে। বিশেষের মধ্যেই সামান্যের প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং সামান্য ও বিশেষ ভিন্ন নহে। যদি উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইত, তাহা হইলে "ইহা একটি গোরু", ইহা আমরা বলিতে পারিতাম না।

১৫

বিশেষ

যাহার অস্তিত্ববশতঃ বস্তুসকল পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই বিশেষ। বাহ্য জগৎকর্ত্তৃক আমাদের মনে যে সকল সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহাদের কোনটিই অন্য কোনটির সম্পূর্ণ সদৃশ নহে। ইহার কারণ পরমাণুদিগের প্রত্যেকের অন্যান্য পরিমাণু হইতে ভেদ। পরমাণুগণের মধ্যে, আত্মাদিগের মধ্যে ও বিভিন্ন মনের মধ্যে যে পারস্পরিক ভেদ, তাহা সত্য। যোগিগণ পরমাণুদিগের ভেদ দেখিতে পান। কণাদ-সূত্রে সামান্য ও বিশেষ উভয়ই "বুদ্ধ্যপেক্ষ" বলা হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধিতে এই ভেদ দৃষ্ট হয়, বুদ্ধিকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় না। প্রশস্তপাদের মতে নিত্য দ্রব্যের মধ্যে 'বিশেষ' অবস্থিত; এই জন্য এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর ভেদ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল দ্রব্য

তাহাদের অংশদ্বারা গঠিত। এই অংশের সাহায্যেই এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া আমরা জানি। দ্রব্যের বিশ্লেষণদ্বারা যখন তাহার এমন সূক্ষ্ম উপাদান প্রাপ্ত হই, যাহার কোনও অংশ নাই, যাহাদ্বারা তাহাকে অন্য দ্রব্য হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়, তখন অনুমান করিতে হয় যে এতাদৃশ অংশহীন বস্তুর এমন গুণ আছে, যাহা অন্যান্য বস্তু হইতে তাহার ভেদ সংসাধন করে। দেশ, কাল, আত্মা, মন, পরমাণু ও আকাশ, প্রত্যেকের এমন সকল বিশেষ গুণ আছে, যাহা শ্রেণী-সাধারণ গুণ নহে। তাহারা ব্যক্তিনিষ্ঠ, অর্থাৎ একব্যক্তিগত। পরমাণুর সংখ্যা অনন্ত। বিশেষের সংখ্যাও অনন্ত।

বেদান্ত "বিশেষ" স্বীকার করেন না। কুমারিল ও প্রভাকরের অনুবর্ত্তিগণও এই মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক বলেন বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোনও যুক্তি নাই। এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুর ভেদবাচক বলিয়া যদি "বিশেষত্ব" স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল বিশেষত্বদিগের ব্যাবর্ত্তক কি? বিশেষদিগের বিশেষ বিশেষ স্বরূপকেই যদি এই ব্যাবর্ত্তক বলা হয়, তাহা হইলে পরমাণুতেই সেই বিশেষ বিশেষ গুণের আরোপ করিলেই তো চলে। স্বতন্ত্র পদার্থ-কল্পনার প্রয়োজন কি?

১৬

সমবায়

দ্রব্য ও তাহার গুণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় বলে। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও সমবায় (৭।২।২৬)। যে যে পদার্থকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যাহাদের মধ্যে আধার ও আধেয় সম্বন্ধ, "ইহা উহার মধ্যে আছে" এই ধারণার ভিত্তি যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধই সমবায়। কোনও দ্রব্যের মধ্যে যে বিভিন্ন গুণ থাকে, সেই সকল গুণের মধ্যে সম্বন্ধ সমবায় নহে; তাহা সমানাধিকরণ সম্বন্ধ। সেই সকল গুণের অধিকরণ এক, তাই এই নাম। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায় নহে, কেননা অর্থ শব্দের মধ্যে নাই। অর্থের সংকেতই শব্দ। এই সম্বন্ধ সংযোগও নহে। ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে সম্বন্ধও সমবায় নহে, কেননা উভয়ের অধিকরণ আত্মা হইলেও সুখ ধর্ম্মের মধ্যে অবস্থিত নহে। মৃত্তিকার উপরিস্থ ফলের

সাথে মৃত্তিকার সম্বন্ধ সমবায় নহে, কেননা মৃত্তিকা হইতে ফলকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বস্তুর সহিত তাহার অংশের যে সম্বন্ধ, দ্রব্যের সঙ্গে তাহার কর্ম্মের যে সম্বন্ধ, দ্রব্যের সহিত সামান্যের যে সম্বন্ধ, কারণের সহিত কার্য্যের যে সম্বন্ধ, পরমাণুর সহিত "বিশেষত্বের" যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়। সম্বদ্ধ পদার্থ দুইটি মিলিয়া এক পদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়।

সমবায় ও সংযোগ এক নহে। সংযোগ সম্বন্ধ অনিত্য ও আপতিক। তাহা দ্রব্যের গুণ। সংযোগের পূর্ব্বে সংযুক্ত দ্রব্যাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত দ্রব্যাদিগের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য। কর্ম্ম হইতে সমবায়-সম্বন্ধের উদ্ভব হয় না। যাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহাদের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। সংযোগ সম্বন্ধ একই প্রকারের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থিত দুই বস্তুর মধ্যে ঘটে, যখন তাহাদিগকে একত্রিত করা হয়। এই সম্বন্ধ বাহ্য, কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ আভ্যন্তরীণ। টেবিলের উপরিস্থ দ্রব্যের সহিত টেবিলের সম্বন্ধ সংযোগ। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে কোনও সম্বন্ধ ছিল না। সংযোগ এক প্রকার গুণ; এই গুণবশতঃ টেবিল ও তাহার উপরিস্থ দ্রব্য কিছু কালের জন্য সংযুক্ত (যুতসিদ্ধ) বলিয়া প্রতীত হয়। সমবায় সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর মধ্যে থাকে, যেমন দ্রব্য ও গুণ, কারণ ও কার্য্য ইত্যাদি। সমবায়ে সম্বদ্ধ বস্তু দুইটি "অযুত-সিদ্ধ" (অবিচ্ছেদ্য সমগ্র—inseperable whole) রূপে প্রতীত হয়। সমবায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ সংখ্যায় বহু—তাহাদের সমবায়িত্ব ও বহুত্ব উভয় গুণই আছে। সমবায়ের বহুত্ব নাই, ইহা "এক"। ইহার কোনও কারণ নাই। ইহা নিত্য। দ্রব্যের ধ্বংস আছে, সমবায়ের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। কিন্তু সমবায় নিত্য হইলেও, দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্রভাবে ইহার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সমবায়ের জ্ঞান বুদ্ধির অপেক্ষা করে।

শঙ্করাচার্য্য বৈশেষিক সমবায়ের সমালোচনায় বলিয়াছেন "সমবায় যখন একটি সম্বন্ধ, তখন সম্বদ্ধ বস্তু দুইটি হইতে ইহা ভিন্ন, তাহাদের বাহিরে অবস্থিত। এই বাহিরে অবস্থিত সমবায়ের সহিত উক্ত বস্তু দুইটির সম্বন্ধ সংঘটন করিবার জন্য অন্য একটি সম্বন্ধের প্রয়োজন, এবং সেই সম্বন্ধের জন্য দ্বিতীয় আর একটি সম্বন্ধের প্রয়োজন। এইরূপে অনবস্থার উদ্ভব হয়। 'সম্বদ্ধ' বস্তু দুইটির মধ্যে সমবায়ের অবস্থানের জন্য একটি সম্বন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যদি সমবায়ীর মধ্যে

সমবায়ের অবস্থান অন্য সমবায়-সম্বন্ধকৃত না হয়, দুই যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে সংযোগ সম্বন্ধকেও সংযুক্ত দ্রব্যাদিগের সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে। সংযোগ একটি গুণ এবং সংযুক্ত বস্তুর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সংযুক্ত বস্তুদিগের সংযোগের জন্য যদি উক্ত বস্তুদিগের মধ্যে "সংযোগের" "সমবায়" সম্বন্ধে থাকা প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে সমবায়ের আধার বস্তুর মধ্যে সমবায়ের অবস্থানের জন্য এবং উভয়ের সংযোগবিধানের জন্য দ্বিতীয় সমবায় সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই, ইহা বলা বৃথা। সংযোগ একটি গুণ এবং সমবায় "পদার্থ"—উভয়ে এক জাতীয় নহে, ইহা সত্য। কিন্তু সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, তাহা সম্বদ্ধ বস্তুর সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে যে সমবায় সম্বন্ধ আছে, তাহা বলা যায় না। যদি উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ থাকে (বৈশেষিকগণ যাহা স্বীকার করেন) তাহা হইলে কার্য্য ও কারণ স্বরূপে অভিন্ন, ইহা বলাই ভাল। "কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী", ইহার সহিত "উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে," এই উক্তির স্পষ্টতঃই বিরোধ আছে। কারণ কার্য্য হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে সক্ষম, কিন্তু কার্য্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যের উৎপত্তি না হয়, ততক্ষণ কার্য্যের সহিত কারণের কোনও সম্বন্ধেরই সম্ভাবনা নাই, কেননা সম্বন্ধের অস্তিত্বের জন্য দুই বস্তুর প্রয়োজন। সুতরাং কার্য্য ও কারণের মধ্যে কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কোনও সমবায় সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কার্য্যের উৎপত্তির পরে তাহার সহিত কারণের সমবায় সম্বন্ধ হয়, ইহা বলিয়াও লাভ নাই। কেননা বৈশেষিকগণ যদি স্বীকারও করেন যে কারণের সহিত সম্বন্ধের উদ্ভবের পূর্ব্বেও কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে কারণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে হয়, এবং কার্য্য ও কারণের মধ্যে সংযোগ ও বিয়োগ হইতে পারে না, ইহা বলা চলে না। কারণের সহিত সম্বন্ধের উৎপত্তির পূর্ব্বে যদি কার্য্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, তাহা হইলে কার্য্য ও কারণের পরে সংঘটিত সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ নহে। তাহা সংযোগ। প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপত্তির পরেই তাহার নিজের মধ্যে কোনও গতির উদ্ভব না হইলেও সর্ব্বব্যাপী আকাশের সহিত তাহার যে সম্বন্ধের উদ্ভব হয়, সে সম্বন্ধ যেমন সংযোগ, সমবায় নহে, তেমনি কারণের সহিত কার্য্যের যে সম্বন্ধ, তাহাকে বলিতে হইবে সংযোগ। তাহা সমবায় নহে।*

---

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy, Vol. II, ২১৮-১৯ পৃষ্ঠা।

১৭

অভাব

অভাব বা অসৎ পদার্থ চতুর্বিধ : (১) প্রাগভাব (প্রাক্+অভাব)। কোনও বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহার যে অভাব, তাহা প্রাগভাব। যে বস্তু সেই অভাবকালে অনুৎপন্ন, তাহা প্রাগসৎ। (২) যে বস্তু আছে, তাহা যখন বিনষ্ট হয়, এবং তখন তাহার যে অভাব হয়, তাহাকে বলে ধ্বংসাভাব। ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুকে বলে সদসৎ (সৎ+অসৎ)। (৩) যে বস্তু বর্ত্তমানে আছে, তাহা তাহার বর্ত্তমানরূপে সৎ, কিন্তু অন্য রূপে অসৎ। একটি গোরু তাহার গোরূপে সৎ, কিন্তু গোরু ভিন্ন অন্য কোনও রূপই তাহার নাই, সুতরাং গো ভিন্ন অন্যরূপে তাহা অসৎ। সে গো কিন্তু অশ্ব নহে, মহিষ নহে, মেষ নহে, অন্য কিছুই নহে। যখন তাহাকে গো বলি, তখন বলি, সে অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি নহে। (All determination is negation)। এই অভাবকে বলে অন্যোন্যাভাব। (৪) যাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস কখনই সম্ভবপর নহে, এমন যে অসৎ, তাহার নাম অত্যন্তাভাব। তাহা একান্তই অসৎ। কোন অসৎ পদার্থেরই গুণ ও ক্রিয়া নাই। ধ্বংসাভাবে পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের অভাব হয় এবং পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মরণ হইয়া তাহার বিরোধী জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রাগভাবে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ হইতে তৎ-বিরোধী পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মরণ হয়। "গৃহে ঘট নাই" বলিলে—সৎ ঘট গৃহসংযোগে বর্ত্তমান নাই, ইহা বুঝায়। (কণাদ সূত্র ৯।১০)।

বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। অনিত্য পদার্থের যখন ধ্বংস হয়, তখন তাহার অভাব হয়। বৈশেষিক দর্শন অসৎ-কার্য্যবাদী। এই মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অভাব থাকে। আবার সার্বিক সত্তা কোনও বিশেষ গুণযুক্ত হইয়া বিশিষ্ট পদার্থ হইলে, তাহাতে অন্য গুণের অভাব থাকে। পরস্পর বিরুদ্ধ গুণযুক্ত পদার্থও থাকিতে পারে না—বন্ধ্যাপুত্র ও চতুর্ভুজ বৃত্তের কল্পনা অসম্ভব। অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার বৈশেষিক তত্ত্ববিদ্যার অনুযায়ী। অভাব না থাকিলে যাবতীয় দ্রব্যই নিত্য হইত। সাংখ্য মতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কার্য্য কারণের মধ্যে সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশিত ভাবে থাকে। সুতরাং সাংখ্য দর্শনে অভাবের স্থান নাই। প্রাগভাব না থাকিলে সকল বস্তু ও তাহাদের পরিবর্ত্তন অনাদি হইত। অন্যোন্যাভাব আছে বলিয়াই বিভিন্ন

বস্তুর ব্যাবৃত্তি সম্ভবপর। অত্যন্তাভাব না থাকিলে সর্ব্বত্রই সর্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব থাকিত।

বাৎস্যায়নের মতে অভাব দ্বিবিধ—প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব। জন্মের পূর্ব্বে পুত্রের অভাব প্রাগভাব। ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে তাহার অভাব প্রধ্বংসাভাব। বাচস্পতি (১) তাদাত্ম্যাভাব ও (২) সংসর্গাভাব—এই দুই ভাগের কথা বলিয়া পরে সংসর্গাভাবকে (১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংসাভাব এবং (৩) অত্যন্তাভাব বা সমবায়াভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। তাদাত্ম্যাভাবে দুই বস্তুর অভিন্নত্ব অস্বীকৃত হয়—"তদন্যতা" খ্যাপিত হয়। "গৃহে ঘটো নাস্তি" ইহা সংসর্গাভাবের উদাহরণ। এই সকল বিভাগে অসত্তা (অভাব) ও নিষেধের (negation) অর্থের সাংকর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'অভাব'কে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে। "ঘটাভাব" "ঘটের ভাব" হইতে ভিন্ন এবং "ঘটাভাবের অভাবের অভাব" "ঘটাভাবের অভাব" হইতে ভিন্ন। এই রূপে অনবস্থা উপস্থিত হয়। কিন্তু "ঘটাভাবের অভাব" ঘটের "ভাব" হইতে ভিন্ন নহে। অনেক নৈয়ায়িক কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না।

উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকার অভাবের সহিত "নঞ্" এর ছয় অর্থের তুলনা করা যায়।

তৎ-সাদৃশ্যং অভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্‌প্রকীর্ত্তিতা।

তৎসাদৃশ্য, যথা অব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ নহে, ব্রাহ্মণের ন্যায় দৃশ্যমান্)
অভাব—যথা অসুখ।
তদন্যত্ব—যথা অঘট।
তদল্পতা—যথা অনুদরী, অগভীর।
অপ্রাশস্ত্য—যথা অকার্য্য, অদিন (অপ্রশস্ত দিন)
বিরোধ—অসুর।

"অভাব" একটি নৈয়ায়িক পদার্থ (logical category)। ইহার বাস্তব সত্তা (ontological being) না থাকিলেও ভাষ্যকারগণ ইহাতে এক প্রকার সত্তার আরোপ করিয়াছেন। কণাদের মতে "আত্যন্তিক অভাব" ব্যতীত অন্য সকল প্রকার অভাবই কোনও না কোনও ভাবের সহিত সম্বন্ধ আছে। আত্যন্তিক অভাব অর্থহীন।*

---

* আত্যন্তিক অভাব সম্বন্ধে Bergson's Creative Evolution (Chap. IV) দ্রষ্টব্য।

১৮

কার্য্য ও কারণ

কার্য্য ও তাহার কারণের মধ্যে সম্বন্ধ ভারতীয় প্রায় সকল দর্শনেই আলোচিত হইয়াছে। বেদান্ত মতে কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদ নাই। "তদনন্যত্বং আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রঃ সূ ২।১।১৪)। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটাদি দ্রব্য মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মৃত্তিকার বিকার ঘটাদি "বাচারম্ভণ" অর্থাৎ কেবল বাক্যদ্বারা তাহাদের "আরম্ভণ" বা সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকাই সত্য। ঘটকলসাদি যাহা মৃত্তিকার বিকার, তাহা কেবল বাক্যমাত্র। যাহা কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণের সহিত তাহার ভেদ নাই। ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যেও ভেদ নাই। সাংখ্য মতে কার্য্য কোনও নূতন বস্তু নহে। ইহা কারণের নূতন ভাবে প্রকাশ মাত্র। যাহা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না। সুতরাং কার্য্যের অস্তিত্ব এক সময়ে ছিল না, পরে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা হইতে পারে না। কার্য্য কারণের মধ্যে শক্য ভাবে থাকে, পরে সহকারী কারণ সহযোগে বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। তিলের মধ্যে যেমন তৈল বর্ত্তমান, পেষণ দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়, তেমনি প্রস্তরের মধ্যে প্রতি-মূর্ত্তির অস্তিত্ব থাকে, ভাস্করকর্ত্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। এই মতকে সৎকার্য্য-বাদ বলে।

কিন্তু বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন কার্য্যের প্রাগস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহাদের মতে উপাদান সহকারী কারণদিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যের উৎপাদন করে—পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব ছিল না। কার্য্যের উৎপত্তির সঙ্গে কারণের বিনাশ হয়। বস্ত্রের উপাদান সূত্র। সূত্র তন্তুবায় ও তাহার যন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া বস্ত্রের উৎপাদন করে। তখন সূত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, তাহা বস্ত্রে পরিণত হয়। বস্ত্র পূর্ব্বে ছিল না। সূত্ররূপ কারণ হইতে তাহার উদ্ভব হয়। আপত্তি হইতে পারে যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উৎপত্তি যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে শশকেরও শৃঙ্গ বাহির হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা হয়, যাহার অস্তিত্ব নাই, এরূপ সকল বস্তুরই যে উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা নহে; যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার পূর্ব্বে অস্তিত্ব ছিল না, এই মাত্র বলা অভিপ্রেত।

মীমাংসা দর্শনের মতে কারণের মধ্যে এক অদৃশ্য শক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহাদ্বারাই কার্য্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বলেন এই শক্তি দৃষ্টি-

গোচর হয় না এবং ইহার অস্তিত্ব-স্বীকারের যুক্তিও নাই। কার্য্যের উৎপত্তি ব্যাপারের মধ্যে কোন অতীন্দ্রিয় ক্রিয়া আছে, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। অণুদিগের পরিস্পন্দন (molecular movement) দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতা ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কারণের কেবল নিয়ত অর্থাৎ অব্যভিচারী পূর্ব্ববর্ত্তিতা বশতঃই তাহা কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। সেই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা অন্যথা-সিদ্ধিশূন্য হওয়া চাই, অর্থাৎ তাহার কোনও কারণ না থাকা চাই। অন্যথাসিদ্ধিশূন্যতা (unconditionality) এবং নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা (invariable antecedence) উভয়ই কার্য্যকারণ ভাবের জন্য অপরিহার্য্য। কোন কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুর সহিত আগন্তুক সম্বন্ধে অন্য বস্তু থাকিলে, তাহাও উক্ত কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে; কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য নহে বলিয়া তাহা কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল। নিরপেক্ষ নহে—স্বতন্ত্র নহে। কুম্ভকারের যষ্টি ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, কিন্তু ঘটের বর্ণ, আকার বা উপাদান, ঘটের উৎপাদনে যাহার কোনও কাজ নাই, তাহা নিরপেক্ষ (unconditional) নহে বলিয়া ঘটের কারণ নহে আবার কোনও কার্য্যের সহিত উৎপন্ন বস্তু, অথবা উক্ত বস্তুর উৎপত্তির কারণের অন্তর্গত বস্তু উক্ত কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, তাহারা নিরপেক্ষ নহে বলিয়া উক্ত কার্য্যের কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কুম্ভকারের যষ্টি অথবা চক্রদ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা কলসীর নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, তাহা এবং সেই শব্দের কারণ আকাশ ও বায়ু কলসীর কারণ নহে। কারণের কারণকেও কোনও কার্য্যের কারণ বলা যায় না। কুম্ভকারের পিতা কলসীর কারণ নহে। পূর্ব্ববর্ত্তিতা যেমন নিরপেক্ষ তেমনি অব্যবহিত হওয়া প্রয়োজনীয়। আবার যে সকল বস্তু নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে বর্জন করিলেও কার্য্যের উৎপত্তির বাধা হয় না, তাহারাও কারণের মধ্যে নহে।

উপাদান কারণকে সমবায়ী কারণ বলে। সমবায় সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কারণের উপাদান যখন কার্য্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে দৃষ্ট হয়, তখন তাহাকে সমবায়ী কারণ বলে। যেমন বস্ত্রের সমবায়ী কারণ সূত্র, ঘটের মৃত্তিকা। সমবায়ী কারণের মাধ্যমে যাহার ধর্ম্ম কার্য্যে সংক্রামিত হয়, তাহা অসমবায়ী কারণ। যেমন মৃত্তিকার বর্ণ মৃত্তিকার মাধ্যমে কলসীতে সংক্রামিত হয়। মৃত্তিকার বর্ণ কলসীর বর্ণের অসমবায়ী কারণ। সমবায়ী কারণের যে

গুণদ্বারা কার্য্যের গুণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা অসমবায়ী কারণ। কার্য্যের উৎপাদনে উপাদান কারণের যাহা সহায়, তাহা নিমিত্ত বা সহকারী কারণ। কুম্ভকার তাহার যষ্টি ও চক্র কলসের নিমিত্ত এবং সহকারী কারণ।

বৈশেষিক মতে কারণকর্তৃক উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কার্য্য অস্তিত্বহীন। কিন্তু কারণের গুণ কার্য্যের গুণের কারণ। মৃত্তিকার বর্ণ কলসীর বর্ণের কারণ কিন্তু তাপদ্বারা উহার ব্যভিচার হয়। ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম-মাত্র। আর একটি ব্যভিক্রম দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণুদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। দ্ব্যণুক অণুর এবং এসরেণু দ্ব্যণুকের পরিমাণদ্বারা উৎপন্ন হয় না, তাহাদের সংখ্যা-দ্বারা উৎপন্ন হয়।

—— —

তৃতীয় অধ্যায়

(১)

বৈশেষিক চরিত্রনীতি

কণাদ-সূত্রে আছে যে আত্মার সহিত হস্তের সংযোগ এবং আত্মার প্রযত্ন হইতে হস্তে কর্ম্ম উৎপন্ন হয় (৫।১।১)। এই কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম। ইহারই নৈতিক মূল্য আছে। জৈব ব্যাপার সংক্রান্ত কর্ম্মের সহিত ইচ্ছার সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহাদের ভাল মন্দ নাই। ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক কর্ম্ম হিত-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত হয়। সুখ ও দুঃখের অনুভূতির যে প্রতিক্রিয়া মনে উৎপন্ন হয়, তাহাই ইচ্ছা ও দ্বেষ।

"যতো অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ (১।১।২)। যাহা দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে অভ্যুদয়-লাভ হয় এবং যাহা দ্বারা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ধর্ম্ম। ইহলোকে অভ্যুদয়ের অর্থ ধন-মান-খ্যাতি-ও-তজ্জনিত-সুখ-

প্রাপ্তি। পরলোকে অভ্যুদয়ের অর্থ স্বর্গ ও তাহার সুখ-প্রাপ্তি। নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ মোক্ষ। উভয়বিধ ধর্ম্মই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য এবং তত্ত্ব-জ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়। এই তত্ত্ব-জ্ঞান "ধর্ম্ম বিশেষ-প্রসূত", অর্থাৎ তাহার জন্য বিশেষ প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স যখন জীবনের লক্ষ্য, তখন যাহাদ্বারা তাহা লাভ করা যায়, তাহাই সুনীতি-সম্মত কর্ম্ম। বেদে কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দেশ আছে।

ধর্ম্ম শব্দে কেবল বেদবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝায় না। ধর্ম্ম মানুষের এক গুণ অথবা শক্তিও বটে। ধর্ম্ম অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং ফলভোগ সমাপ্ত হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাও ধর্ম্মের বিনাশ হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের শেষ না হইলে মোক্ষ হয় না। ধর্ম্মের যদি বিনাশ না হইত, তাহা হইলে মোক্ষের সম্ভাবনা থাকিত না। যত দিন আমরা ধর্ম্মের পুরস্কার-লাভের জন্য তাহার নিয়ম পালন করি, ততদিন অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইতে পারি, কিন্তু সে ফল চিরস্থায়ী নহে। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারাই কেবল মুক্তি-লাভ হইতে পারে। রাগদ্বেষ-দ্বারা চালিত হইয়া আমরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা অদৃষ্ট-সঞ্চয় করি। তাহার ফলে পুনর্জন্ম হয়। অদৃষ্ট এবং তাহার ফল দেহের সহিত সংযোগই সংসার। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সংসার। কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বিবিধ—জাতি-বর্ণ-দেশ-কাল-নিরপেক্ষ এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থোচিত। প্রথমোক্ত কর্ত্তব্যগুলি এই—(১) শ্রদ্ধা, (২) অহিংসা, (৩) ভূতহিতত্ব (সর্ব্বভূতের প্রতি মৈত্রী) (৪) সত্যবচন, ( ) অস্তেয় (সাধুতা), (৬) ব্রহ্মচর্য্য, (৭) অনুপধা ভাবশুদ্ধি (মনের বিশুদ্ধি), (৮) ক্রোধবর্জন, (৯) অভিসেচন (স্নানশুদ্ধি), (১০) শুচি দ্রব্য-সেবন (শুদ্ধিকারক বস্তুর ব্যবহার), (১১, বিশিষ্ট দেবতা-ভক্তি, (১২) উপবাস, (১৩) অপ্রমাদ।

চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্মও উপদিষ্ট হইয়াছে।

কর্ত্তব্য-পালন হইতে ধর্ম্মের উদ্ভব হয়, যদি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য পালিত হয়, এবং ধন আদি লাভ তাহার উদ্দেশ্য না হয়। "অযতস্য শুচিভোজনাৎ অভ্যুদয়ো ন বিদ্যতে নিয়মাভাবাৎ (বৈ সূ ৬।২।৯)। অসংযত পুরুষ শৌচাচার অবলম্বন করিলেও অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয় না, কেবল শৌচাচার অভ্যুদয়ের হেতু নহে।

বেদবাক্য বুদ্ধিপূর্ব্ব (৬।১।১) অর্থাৎ তাহাতে উপদেষ্টার জ্ঞান প্রকাশিত।

সুতরাং বেদের উপদেশ পালনীয়। কর্ম্মের বিশুদ্ধি সর্বদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুষ্ট লোকের দান গ্রহণ করা উচিত নহে। উত্তম পুরুষের দানগ্রহণে দোষ নাই। নিজে হীনকর্ম্মা হইলে উত্তম পুরুষকে নিজ সঙ্গদ্বারা কলুষিত করিবে না। তপস্যাদ্বারা নিজের পাপ ক্ষালন করিয়া তাহাদের সঙ্গ করিবে। যে সকল বৈদিক কর্ম্ম দৃষ্ট-প্রয়োজনসাধক নহে, তাহারা পরকালে অভ্যুদয় উৎপন্ন করে।

(২)

ঈশ্বর

কণাদ-সূত্রে ঈশ্বরের স্পষ্ট উল্লেখ কোথায়ও নাই। গ্রন্থের আরম্ভে ও শেষে "তদ্‌বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" এই সূত্রটি দুইবার আছে। "তদ্‌বচন" শব্দে "ঈশ্বরের বচন" অর্থ করিয়া অনেকে কণাদ-দর্শনকে ঈশ্বরবাদী বলিয়াছেন। কিন্তু এই দর্শনে জগতের ব্যাখ্যায় কোথায়ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। যেখানে প্রত্যক্ষদ্বারা কোনও ব্যাপারের ব্যাখ্যা হয় না, সেখানে "অদৃষ্ট"দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্বামী সান্তদাসজী বলেন এই দর্শন সুকুমার-মতি বালকদিগের জন্য উদ্দিষ্ট, এবং স্থূল স্থূল ব্যাপারগুলি বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়াই ইহার লক্ষ্য। তাই মহর্ষি কণাদ ঈশ্বরকে জগৎ-স্রষ্টা-রূপে উপস্থাপিত করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বেদবচনের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের মতে বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই। এই দর্শনে জীবাত্মা ও পরমাণু নিত্য ও অসৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত এবং তাহাদের বিভিন্ন অবস্থা "অদৃষ্ট"-জাত। কণাদের শিষ্যগণ অদৃষ্টকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাণুদিগকে জগতের উপাদান কারণ এবং ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন। প্রশস্তপাদ ঈশ্বরকেই জগৎ-কারণ বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার দর্শনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেন নাই। পরবর্ত্তী বৈশেষিকগণ স্পষ্টভাবে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। অচেতন পরমাণুগণ কোনও বুদ্ধিমান পুরুষকর্ত্তৃক চালিত না হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না বুঝিয়া তাঁহারা ঈশ্বরকে পরমাণুতে গতির উৎপাদক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং বেদে ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সার কোনও পরিচয় নাই বলিয়া তাহা এক সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, নির্দোষ, পুরুষ-রচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রলয়ে আত্মাদিগের বুদ্ধি থাকে না। পরমাণুদিগের মধ্যেও এমন কিছু নাই, যাহা হইতে তাহাদের গতির উদ্ভব হইতে পারে। সুতরাং পরমাণুদিগের চালক এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহাদিগকে যথোচিত ভাবে ব্যবস্থিত করিয়া জগৎ-সৃষ্টি করিতে সমর্থ এক পুরুষের অস্তিত্ব এবং পরমাণুদিগের গতির মূলে এক "প্রথম চালক" স্বীকার করিতে হয়। জগতের স্রষ্টা একজন। একাধিক হইলে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইত। ঈশ্বরই শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধের বিধান করিয়াছেন।

ঈশ্বরের দেহ আছে কিনা, ইহার আলোচনায় শ্রীধর বলেন কার্য্য করিবার জন্য দেহের প্রয়োজন নাই। মানুষের দেহ তাহার মধ্যস্থ আত্মাকর্তৃক চালিত হয়, কিন্তু আত্মা নিজে দেহ-হীন। দেহের নিজের কোনও শক্তি নাই, আত্মা হইতেই তাহাতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। তেমনি পরমাণুগণও ঈশ্বরের শক্তিকর্তৃক চালিত হয়।

ইচ্ছা এবং প্রযত্ন দেহ ব্যতীত সম্ভবপর কি না, ইহার আলোচনায় শ্রীধর বলেন, যদি ইচ্ছা ও প্রযত্ন আগন্তুক হয়, তাহা হইলে তাহা দেহ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন স্বাভাবিক (স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ক্রিয়া চ—উপনিষদ্) ও নিত্য। যদি বল ঈশ্বর আপ্তকাম, তাঁহার প্রাপ্তব্য কিছু নাই; তবে তিনি সৃষ্টি করেন কেন? সৃষ্টি করিবার কোনও উদ্দেশ্যই তাঁহার থাকিতে পারে না। শ্রীধর বলেন ঈশ্বরের নিজের জন্য কিছুই করণীয় নাই, সত্য। কিন্তু অন্যের উপকারের জন্য তিনি কর্ম্ম করেন। কর্ম্ম-নিয়ম অনুসারে তিনি জগতে দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখ একান্তই অশুভ নহে। দুঃখও সত্তার এক রূপ, এবং তাহার সাক্ষাৎকার অভিজ্ঞতার পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয়।

বৈশেষিক দর্শনের আদিম অবস্থায় জগৎকে স্বয়ং-পর্য্যাপ্ত যন্ত্র এবং "অদৃষ্ট"-কর্তৃক পরমাণু ও আত্মাগণ পরিচালিত হয় বলিয়া মনে করা হইত। এই মতের ত্রুটি অন্যান্য দর্শনকর্তৃক প্রকাশিত হয়। তখন জগতের বিভিন্ন অচেতন অংশকে একত্র রাখিবার জন্য এক চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন উপলব্ধ হয়, এবং ঈশ্বর স্বীকৃত হন। কিন্তু এই ঈশ্বর পরমাণুদিগের স্রষ্টা নহেন। জীবাত্মাগণ ও পরমাণুগণ তাঁহার মতোই নিত্য, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান এবং বিশ্বশাসন করিতে সমর্থ। তিনি জগতের বাহিরে, তিনি জাগতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগৎকে ছাড়িয়া

দিয়াছেন, তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। জগৎ একটি বিরাট যন্ত্র, যান্ত্রিক নিয়মে চালিত। এই মত পাশ্চাত্য দর্শনের Deism এর সদৃশ। এতাদৃশ ঈশ্বরদ্বারা মানুষের ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না।

(৩)

মোক্ষ

আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থ-সন্নিকর্ষাৎ সুখ দুঃখে। (বৈ সূ ৫।২।১৫)
তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্য দুঃখাভাবঃ স যোগঃ (৫।২।১৬)
অপসর্পণমুপসর্পণমশিত-পীত-সংযোগাঃ
কার্য্যান্তর সংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি। ৫।২।১৭
তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ। ৫।২।১৮

আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের সংযোগ হইতে সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়। বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া মন আত্মাতে অবস্থিত হইলে বিষয়-সন্নিকর্ষের অভাবে শরীরে দুঃখ জন্মিতে পারে না। মনকে আত্মস্থ করাই যোগ। অপসর্পণ (দেহত্যাগ), উপসর্পণ (নূতন দেহে প্রবেশ) গর্ভাবস্থায় অশন ও পান ও অপরবিধ কার্য্য "অদৃষ্ট"দ্বারা কৃত হয়। যোগদ্বারা মন আত্মস্থ হইলে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগের অভাব হয়, এবং ভবিষ্যতে গর্ভে অবস্থান ও জন্ম নিবারিত হয়। ইহাই মোক্ষ।

দুঃখ-নিবৃত্তি এবং জন্ম-মৃত্যু-চক্র হইতে মুক্তিই মোক্ষ। ইহা মোক্ষের অভাববাচক বর্ণনা।

সংসারে জীবাত্মা স্থূল দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে, প্রলয়ে স্থূল দেহের নাশ হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ থাকে। জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অনাদি। আত্মার সহিত অদৃষ্ট চিরকালই সংযুক্ত থাকে। অদৃষ্টকর্ত্তৃক জীবের জন্মের কাল, স্থান, পিতা-মাতা সকলই নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক আত্মা তাহার অতীত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। এই ফলভোগ অব্যবহিত পরবর্ত্তী জন্মে না হইতেও পারে। মোক্ষে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হয়। মোক্ষে আত্মার কোন গুণের সহিত সংযোগ থাকে না, গুণহীন আত্মা মুক্ত আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকে। ইহা স্বাধীনতার অবস্থা, কিন্তু সুখের অবস্থা নহে। নাম-রূপের সহিত সংসর্গ-বশতঃ যে সকল গুণের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগের স্পর্শ হইতে বিমুক্ত হইয়া

আত্মা স্বাধীন হয়—তখন দুঃখ কষ্ট থাকে না। সুখও থাকে না। থাকে কি? একজন সমালোচক (মণ্ডন) লিখিয়াছেন—"বিশেষ-গুণ-নিবৃত্তি-লক্ষণা মুক্তিঃ উচ্ছেদপক্ষাৎ ন ভিদ্যতে।" সকল বিশেষ গুণহীন মুক্তির সহিত উচ্ছেদের (আত্যন্তিক বিনাশের) প্রভেদ নাই। শ্রীধর বলেন আত্মা তখন স্বরূপে অবস্থান করেন। এই স্বরূপ কি? স্বামী সন্তদাসজী বলেন মোক্ষে জীব সর্ব্বজ্ঞও হয়। কিন্তু বৈশেষিক সূত্রে (৩।১।১৮) উক্ত হইয়াছে, "আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ যৎ নিষ্পদ্যতে, তৎ অন্যৎ"—আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ জ্ঞান) তাহা আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থ হইতে ভিন্ন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে যখন আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সংযোগ বিনষ্ট হয়, তখন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং মোক্ষ অবস্থায় আত্মার জ্ঞান থাকিতে পারে না। শ্রীধর বলেন মোক্ষের অবস্থা অচেতন প্রস্তরের অবস্থার মতো। তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞতা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু আত্মা কখনও অচেতন অবস্থায় পরিণত হইতে পারে না। অচেতনে জ্ঞানের শক্যতা নাই, আত্মা চেতন এবং জ্ঞান-লাভে সমর্থ।

(৪)

সমালোচনা

ইহলোকে ও পরলোকে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তিই বৈশেষিক দর্শনের প্রয়োজন। নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি হয় তত্ত্বজ্ঞান হইতে। এই তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয় দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের সম্যক জ্ঞান হইতে। জাগতিক জ্ঞেয় বস্তু সংখ্যায় অনন্ত হইলেও উপরিউক্ত ছয় ভাগে তাহাদিগকে বিভক্ত করা যায়। সুতরাং জগতের স্বরূপের জ্ঞানদ্বারা নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি হয়। তাহার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই। উপাসনা, কর্ম্ম ও ভক্তি নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির জন্য অপরিহার্য্য নহে। ইহাই কণাদের মত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কণাদ অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা এবং মুক্তিদাতা বলিয়াও উল্লেখ করেন নাই, এবং জগতের বিভিন্ন অংশের একত্ব-বিধায়ক রূপেও ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করেন নাই।

আরিস্টটলের পদার্থ-বিভাগের ন্যায় বৈশেষিক পদার্থ-বিভাগও অসম্পূর্ণ। ইহাতে "মূল্য" (Values) এবং "লক্ষ্যের" (উদ্দেশ্য—End) উল্লেখ নাই।

বৈশেষিক দর্শনে অভিজ্ঞতা-লব্ধ যাবতীয় পদার্থকে এক সংহত সমগ্রে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। জাগতিক সকল বিভিন্ন বস্তুর মধ্যগত সম্বন্ধ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিন পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জগতের মধ্যে, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এবং তাহাদের মধ্যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায়-রূপ সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। আমাদের অভিজ্ঞতায় সকল বস্তুই অনিত্য বলিয়া প্রতীত হয়। তাই বৈশেষিক দর্শনে নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ দ্রব্য ও গুণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরমাণু, আত্মা, আকাশ, দিক্, কাল ও মন ইহারা নিত্য। কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন বস্তু (যাহাই কেবল অভিজ্ঞতার বিষয় হয়) সকলই অনিত্য।

বৈশেষিক দর্শনে সম্বন্ধের প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বহুত্ববাদী দর্শনের পক্ষে সম্বন্ধের অস্তিত্ব-স্বীকার অপরিহার্য্য। বাহ্য বস্তুসকলের মধ্যে প্রতীয়মান সম্বন্ধ যদি মনের সৃষ্টি হয়, তাহার যদি প্রকৃত অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে লাইব্‌নিট্‌জের মতো জগৎকে বাতায়নহীন স্বতন্ত্র, পরস্পর-সম্বন্ধবর্জিত মনাদদিগের (Monad) সমষ্টি বলিতে হয়, অথবা বলিতে হয় একমাত্র অসঙ্গ (absolute) ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই।

বৈশেষিক দর্শনে "বিশেষত্বে"র সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই। পরমাণুগণ প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ; তাহাদের সামান্য নাই। কিন্তু এই বিশেষত্ব কি, যাহা প্রত্যেক পরমাণুকে অন্য সকল পরমাণু হইতে পৃথক করে? তাহাদের পরিমাণ "পরিমণ্ডল"। এই পরিমণ্ডল সকল পরমাণুরই আছে। সুতরাং এক পরমাণুর যে অন্যান্য পরমাণুর সহিত কোনও সাদৃশ্যই নাই, তাহা বলা চলে না। পরমাণুদিগের সংযোগ হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুদিগের মধ্যে সংযোগের সম্ভাবনা কোথায়? প্রত্যেক পরমাণু যদি অন্যান্য পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়, তাহা হইলে পরস্পরের সংযোগে এক সংহত বিশ্বের উদ্‌ভব হওয়া অসম্ভব।

বৈশেষিক মতে সামান্য ও বিশেষ বুদ্ধ্যপেক্ষ (বুদ্ধিকৃত), কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। কেননা উভয়ে সমবায়-সম্বন্ধে আবদ্ধ। উভয়ের মধ্যে ভেদ বুদ্ধিকৃত। বুদ্ধির বাহিরে এই ভেদের অস্তিত্ব নাই। অথচ সামান্য-দিগের বিশেষ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। প্রলয়েও তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের উদ্‌ভবের পরে সামান্যাদিগের নিত্যত্ব চলিয়া গিয়াছে। জন্তুদিগের মধ্যে "প্রজাতি"

(species)—যাহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সৃষ্টির ধ্বংস পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত থাকে বলিয়া পূর্ব্বে গণ্য হইত—তাহা Darwin-এর পরে পরিববর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এক শ্রেণীর জীব লক্ষ লক্ষ বৎসরে ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ফলে নূতন শ্রেণীর জীবে পরিণত হয়। ইহাই অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং সামান্যদিগকে নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় বলা যায় না। ইহা সত্ত্বেও প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষদিগের মধ্যে সাধারণ গুণ অভিব্যক্তির প্রত্যেক ক্রমেই সামান্য বলিয়া পরিগণিত।

প্লেটোর সামান্যগণের সত্তা বিশেষের সত্তা হইতে উচ্চতর। তাহারা এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। পৃথিবীতে বিশেষের মধ্যে তাহাদের প্রকাশ অপূর্ণ। বিশেষগণ বিনশ্বর কিন্তু সামান্যগণ অবিনাশী। সামান্যদিগের মধ্যে ক্রমভেদ আছে, নিম্ন হইতে উচ্চতর সামান্য আছে। সকল সামান্য এক Hierarchyতে নিম্ন-উচ্চক্রমে সজ্জিত। বৈশেষিক দর্শনে এতাদৃশ Hierarchyর উল্লেখ নাই।

অভাব ত্রিবিধ—প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। কিন্তু এই ত্রিবিধ অভাবের মধ্যে যাহা সাধারণ, সেই অভাব সামান্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যাবতীয় সামান্যের যাহা সাধারণ গুণ, সেই সামান্য-সামান্যের অস্তিত্বেরও কোনও কথা নাই। কিন্তু "সত্তা"—সামান্যের কথা আছে। "সৎইতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু, সা সত্তা" ১।২।৭। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিনের মধ্যে সত্তা সমানভাবে আছে। কিন্তু "দ্রব্যগুণ-কর্মভ্যো অর্থান্তরং সত্তা" (১।২।৮)—সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম হইতে ভিন্ন। "গুণ-কর্ম্মসু চ ভাবাৎ ন কর্ম্ম ন গুণঃ"—ইহা গুণের মধ্যে যেমন আছে, তেমনি কর্ম্মের মধ্যেও আছে, সুতরাং ইহা কর্ম্মও নহে, গুণও নহে (১।২।৯)। "সামান্য-বিশেষাভাবেন চ" (১।২।১০) ইহার সামান্য ও বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু যাহা সর্ব্ব দ্রব্য, সর্ব্ব গুণ, সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহাকে "সামান্য" না বলিবার কারণ নাই। তাহা মহা সামান্য। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ইহার নিম্নস্থ সামান্য।

বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য গুণের আধার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্র গুণের অস্তিত্ব তাহা হইলে থাকিতে পারে না। কিন্তু গুণ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দ্রব্য থাকিতে পারে, ইহা বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত। সৃষ্টির প্রথমে দ্রব্যে কোনও গুণ ছিল না—ইহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং দ্রব্যের স্বরূপ তাহার দৃশ্যমান গুণ নহে। যে সকল গুণের দ্রব্যে স্থায়িত্ব

বশতঃ কোনও এক বিশিষ্ট দ্রব্য দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাদের সহিত তাহার দ্রব্যত্বের সম্বন্ধ নাই। সেই সকল বিশেষ গুণ সেই দ্রব্যেরই কার্য্য। তবে সেই দ্রব্যত্বের স্বরূপ কি? বিশেষ গুণাবলীর উদ্ভব? কিন্তু দ্রব্য হইতে গুণ ভিন্নজাতীয়। দ্রব্য কিরূপে ভিন্ন জাতীয় পদার্থের উৎপাদন করিতে পারে, এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নাই। দ্রব্যের স্বরূপ (সৃষ্টির প্রথমে গুণের অধিকরণ হইবার পূর্ব্বে দ্রব্যে যাহা ছিল, যাহাদ্বারা অন্যান্য পদার্থ হইতে দ্রব্য ব্যাবৃত্ত ছিল) তাহা হইলে অজ্ঞাত বলিতে হয়। যাহা দ্রব্যে আধেয় গুণাবলীর নিম্নে বর্ত্তমান, তাহা অজ্ঞাত। কিন্তু দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সম্বন্ধ যখন "সমবায়", তখন গুণবর্জিত দ্রব্যের দ্রব্যত্ব থাকে কিরূপে? এই অসংগতি বৈশেষিক দর্শনে বর্ত্তমান।

বৈশেষিক দর্শনের "অদৃষ্ট"-স্বীকারের অর্থ দার্শনিক ব্যাখ্যাদানে অসামর্থ্য।

দিক ও কালের অনুভবের জন্য কোনও ইন্দ্রিয় আমাদের নাই। তাহা হইলেও তাহারা দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, এবং তাহাদের বিজ্ঞান-বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্বন্ধের অনুভব হয়, তাহা হইতেই দেশ ও কালের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে। দেশ ও কালের উপাদানস্বরূপ অবিভাজ্য বিন্দু ও ক্ষণের কথা বলা হয় নাই। উভয়ই অবিভক্ত "এক" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দেশ, কাল ও পরমাণু সকলেই অনুমানলব্ধ। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার বলেন কণাদের মতে দিক্, কাল ও আকাশ একই দ্রব্য। এই দ্রব্যের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রত্যেক কার্য্যের কারণস্বরূপ একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে।

আত্মা ও তাহার গুণ জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়। সুতরাং আত্মা কখনও গুণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মার সুখ, দুঃখ, জ্ঞান প্রভৃতি গুণ যখন অনিত্য, তখন আত্মাকেও অনিত্য বলিতে হয়। বৈশেষিক দর্শনের সমালোচনায় শঙ্করাচার্য্য ইহা বলিয়াছেন। সংবিদ ও জ্ঞান যদি আত্মার গুণমাত্র হয়, তাহা হইলে আত্মার স্বরূপ অজ্ঞাত। জ্ঞানহীন আত্মার উপর জ্ঞানহীন পরমাণুর ক্রিয়ার ফলে জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখাদির উদ্ভব হয়। যখন আত্মা মুক্তিলাভ করে, তখন এই সকল গুণের তিরোভাব হয়, তখন আত্মার কোনও গুণ থাকে না, তাহার কর্ম্মও থাকে না। কি থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। জ্ঞান-ইচ্ছাদি-বিযুক্ত আত্মার সহিত অচেতন পরমাণুর পার্থক্যের উপলব্ধি হয় না।

বৈশেষিক দর্শনে পদার্থদিগের বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এই দর্শনের বিভিন্ন অংশের সমবায়ে সুসম্বদ্ধ এক দার্শনিক প্রস্থান সৃষ্ট হয় নাই। সমগ্র দৃষ্টিতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মদিগকে দেখিবার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। এতাদৃশ দৃষ্টি ভিন্ন সুসম্বদ্ধ দর্শনের সৃষ্টি সম্ভবপর নহে। দেশ, কাল, আকাশ, পরমাণু, আত্মা, মন প্রভৃতি আমাদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন রূপ। অভিজ্ঞতার মধ্যে দ্বিবিধ ভেদ বর্ত্তমান—প্রাকৃতিক ও মানসিক। উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার ব্যাখ্যার জন্য এক সার্বিক চৈতন্য বা সংবিদের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে সে সম্বন্ধের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা হয় না। বৈশেষিক দর্শনের "অদৃষ্ট" দ্বারা ব্যাখ্যার কোনও মূল্য নাই। এক সার্বিক চৈতন্য বিষয়ী-ও-বিষয়-রূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছে, স্বীকার না করিলে জগতের বিভিন্ন বিভাগের ব্যাখ্যা হয় না। বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও, তাঁহাকে জগতের মূলাধার সার্বিক চৈতন্য-রূপে উপস্থাপিত করা হয় নাই। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টাও নহেন। পরমাণুগণ নিত্য। পরমাণু হইতেই জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই। যে অদৃষ্টদ্বারা বৈশেষিক দর্শনে অনেক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের অধীন কিনা, তাহা বলা হয় নাই। বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর অপরিহার্য্য নহেন।

বৈশেষিক দর্শনে উপরি উক্ত ত্রুটিগুলি আছে। কিন্তু সন্তদাসজী বলেন কণাদ তাঁহার দর্শন শিশুদিগের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কঠিন দার্শনিক সমস্যাসকল তিনি আলোচনা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভাষ্যকারগণ এই দর্শনকে সম্পূর্ণ জগৎ-তত্ত্ব-নির্ণায়ক দর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতিবাক্য ও অপরাপর দর্শনের সহিত নানাপ্রকার বিরুদ্ধ মত যুক্তি-বলে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের মতই "বৈশেষিক দর্শন" নামে পরিচিত; তাহাই বেদান্ত দর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে।

———

ন্যায়দর্শন

(১)

বৈশেষিক দর্শনের সহিত সম্বন্ধ

বৈশেষিক ও ন্যায় "সমান তন্ত্র" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উভয়েই বিশ্লেষণ-মূলক দর্শন। উভয়ের আলোচনা-প্রণালী বৈজ্ঞানিক। সাংখ্য ও যোগে সত্ত্ব, রজঃ ও তমকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে জাগতিক বস্তুর বিশ্লেষণদ্বারা পাওয়া যায় না। তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া এবং তাহাদিগেতে জাগতিক গুণের আরোপ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনে জড়বস্তুর বিশ্লেষণদ্বারা লব্ধ তাহাদের সূক্ষ্মতম অংশদিগকে (পরমাণু) জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করিলেও এই দুই দর্শনে যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বিরুদ্ধ মত খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা ও জড় জগৎ উভয়ের অস্তিত্বই অস্বীকৃত হইয়াছিল। যুক্তিদ্বারা বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন উভয়ের অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিকের মধ্যে প্রভেদ এই যে বৈশেষিক দর্শনে বাহ্য জগতের আলোচনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; ন্যায় দর্শনের প্রধান আলোচ্য অন্তর্জগৎ। জ্ঞানের যাহা সাধন—যুক্তি-প্রণালী, তাহাই ন্যায় দর্শনে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাহা যুক্তিদ্বারা সমর্থিত, ন্যায় দর্শনে তাহার সত্যতা স্বীকৃত। ইন্দ্রিয়লব্ধ ও আগম-জ্ঞান উভয়ই ন্যায় দর্শনে যুক্তির আলোকে পরীক্ষিত। দার্শনিক সমস্যা-সকলের যুক্তিদ্বারা পরীক্ষাই ন্যায় দর্শনের বিশেষত্ব। বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকর বলেন ন্যায় দর্শনে যদি কেবল আত্মার স্বরূপ ও মোক্ষেরই আলোচনা থাকিত, তাহা হইলে উপনিষদের সহিত তাহার কোনও প্রভেদই থাকিত না। বাচস্পতি মিশ্রের মতে জ্ঞানের বিষয়দিগের তর্কশাস্ত্রের নিয়ম-দ্বারা পরীক্ষাই ন্যায় দর্শনের উদ্দেশ্য।

(২)

ন্যায় দর্শনের উৎপত্তি

উপনিষদে রাজসভায় পণ্ডিতদিগের মধ্যে দার্শনিক আলোচনার বিবরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতদিগের মধ্যে এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইতে এবং বেদ-বচনের

অর্থ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের মধ্যে 'বিচার এবং পরস্পরকে পরাভূত করিবার প্রচেষ্টা হইতে ন্যায় দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা সম্ভবপর। উপনিষদে তর্কবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়া উল্লিখিত, এবং "বাকোবাক্য" নামে অভিহিত। কিন্তু "ন্যায়" শব্দ অথবা "হেতু বিদ্যা" অথবা "আন্বীক্ষিকী" শব্দ পাওয়া যায় না। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকী (প্রত্যক্ষ ও আগম জ্ঞানের যুক্তি দ্বারা পরীক্ষা), ত্রয়ী (তিন বেদ), বার্ত্তা (কৃষি, গোপালন প্রভৃতি) ও দণ্ডনীতি (শাসন নীতি), এই চারি বিদ্যার উল্লেখ করিয়া পরে সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ইহতে মনে হয় কৌটিল্যের সময় ন্যায়দর্শন আন্বীক্ষিকী নামে পরিচিত ছিল এবং তাহার "ন্যায়" নামের প্রচলন তখনও হয় নাই। কিন্তু জেকবি ইহা হইতে অনুমান করেন যে ন্যায়-সূত্রেরই ঐ সময়ে অস্তিত্ব ছিল না। এই ধারণা ভ্রান্ত। বাৎস্যায়ন ন্যায় বিদ্যা ও আন্বীক্ষিকী যে অভিন্ন, তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাহার সময়ে যে বিদ্যার নাম ছিল ন্যায়, কৌটিল্যের গ্রন্থে তাহারই নাম আন্বীক্ষিকী।

মহাদেব রাজারাম বোদাস্ বলেন আপস্তম্ব (খৃঃ পূ তৃতীয় শতক) "ন্যায়" শব্দ "মীমাংসা" অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। মীমাংসা দর্শনের কতকগুলি গ্রন্থের নামে "ন্যায়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মাধব-প্রণীত "ন্যায় মালা বিস্তার", পার্থসারথি মিশ্রের "ন্যায় রত্নাকর", আপদেবের "ন্যায় প্রকাশ" মীমাংসা দর্শনের গ্রন্থ হইলেও "ন্যায়" নামে অভিহিত। ইহা হইতে বেদবচনের ব্যাখ্যার সহিত ন্যায় দর্শনের উৎপত্তির সম্বন্ধ ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। বেদ-বাক্যের অর্থ-নির্দ্ধারণকে "ন্যায়" বলা হইত। এই অর্থ-নির্দ্ধারণ-রীতি হইতে স্বতন্ত্র ন্যায় দর্শনের উদ্ভব হয়, ইহা মনে করা অসংগত নহে।

আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ (অনু+ঈক্ষ্) প্রত্যক্ষ ও আগম জ্ঞানের পরীক্ষণ। "ন্যায়" শব্দের অর্থও "প্রমাণৈঃ অর্থপরীক্ষণম্" (বাচস্পতি)—প্রমাণ দ্বারা বস্তুর পরীক্ষা। কৌটিল্য-সূত্রে "আন্বীক্ষিকী" প্রথমে চারি বিদ্যার মধ্যে একটি, পরে একটি স্বতন্ত্র দর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে কৌটিল্যের সময় আন্বীক্ষিকীর মধ্যে তর্ক ও অধ্যাত্ম বিদ্যা উভয়ই ছিল। ইহার তর্ক ভাগকে বাৎস্যায়ন একটি "পৃথক প্রস্থান" বলিয়াছেন। তর্ক-ভাগ নীরস। হয়তো এই জন্য ইহাতে অধ্যাত্ম বিদ্যা ভাগ পরে যোগ করিয়া ইহার আকর্ষণ-বৃদ্ধির চেষ্টা হইয়াছিল। গৌতম-সূত্রে তর্করীতির বিস্তৃত

ব্যাখ্যার পরে, গৌতমের দর্শন ও আন্বীক্ষিকী অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

ন্যায় দর্শন তর্ক-বিদ্যা ও বাদ-বিদ্যা নামেও উল্লিখিত হইয়া থাকে। তর্ক ও "বাদের" অর্থ "আলোচনা"—দুই বিরুদ্ধ পক্ষের প্রত্যেকের স্বমত-প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তির অবতারণা। উপনিষদে যেমন এইরূপ আলোচনার কথা আছে, তেমনি প্রাচীন গ্রীসদেশেও এইরূপ তর্ক-বিতর্কের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই আলোচনাকে গ্রীসে Dialectics বলা হইত। এই সকল আলোচনার ফলে যুক্তির নিয়মগুলি ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হয়, এবং বিপক্ষকে পরাজিত করিবার কৌশলও উদ্‌ভাবিত হয়। সক্রেটিস্ সত্য-আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে Dialectics এর ব্যবহার করিতেন। আরিষ্টট্‌ল তাহার Topics এবং Sophistical Refutations গ্রন্থদ্বয়ে তর্কের নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়াছেন।

তর্ক-দর্শনের বিকাশের কয়েকটি ক্রম লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদে যাহা "বাকো বাক্য" নামে উল্লিখিত, তাহাই পরে আন্বীক্ষিকী নামে অভিহিত হয়। মহাভারতে আন্বীক্ষিকীর ও ন্যায়ের স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ আছে। গৌতম-সূত্রে তর্কের সহিত অধ্যাত্ম দর্শনের আলোচনা আছে। প্রাচীন ন্যায়ে তর্কের আলোচনা গৌণ, অধ্যাত্ম আলোচনাই মুখ্য। জৈন ও বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। নব্যন্যায়ে কেবল জ্ঞানেরই আলোচনা আছে। অধ্যাত্ম বিষয় নব্য নৈয়ায়িকগণ পরিহার করিয়াছেন। "লক্ষণ প্রমাণাভ্যাম্ বস্তুসিদ্ধিঃ" তাঁহাদের লক্ষ্য। প্রমাণ (জ্ঞানের সাধন) এবং বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্ধারণেই তাঁহারা মুখ্যতঃ নিযুক্ত। "প্রমেয়ের" আলোচনা তাঁহারা করেন নাই। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা-সম্পাদনে নব্যন্যায়ের তুল্য অন্য কোনও শাস্ত্রই নাই। কিন্তু কোনও দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব তাহাতে মীমাংসিত হয় নাই।

গৌতম-সূত্রের রচনাকাল যাহাই হউক না কেন, ন্যায়দর্শন যে অতি প্রাচীন, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে "বাকোবাক্য" নামে তাহার উল্লেখদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। ন্যায় যে একটি বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহাও পুরাণে লিখিত আছে। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে তর্ক-রীতির বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রহ্মজাল সূত্রে "তক্কী" ও বিমংসি (কূট তার্কিক)-দিগের উল্লেখ আছে। "কথাবস্তু" গ্রন্থে "প্রতিজ্ঞা", "উপনয়", "নিগ্রহ" শব্দের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে "নীতি"

নামে ন্যায় শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। ললিত বিস্তরে "হেতুবিদ্যা" শব্দ "ন্যায়ের" পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। জৈন আগম-শাস্ত্রেও ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের প্রাচীনত্বের পরিচয় আছে।

(৩)

ন্যায়দর্শনের গ্রন্থাবলী

ন্যায়দর্শনের প্রথম গ্রন্থ গৌতমের ন্যায়-সূত্র। এই গ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক। প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে ষোড়শ পদার্থের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয়ের স্বরূপ বর্ণনা এবং "প্রমাণে"র বিরুদ্ধে আপত্তির খণ্ডন আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়, জ্ঞান ও মনের স্বরূপের বর্ণনা, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ইচ্ছা, দুঃখ ও দুঃখ-মুক্তির বর্ণনা আছে। এই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে ভ্রান্তি, ও সমগ্র এবং তাহার অংশের আলোচনাও আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে "জাতি" (অযথার্থ আপত্তি) ও নিগ্রহস্থানের (বিপ্রতিপত্তি = ভুল বুঝা এবং অপ্রতিপত্তি = না বুঝা) আলোচনা আছে। গৌতম তাহার সূত্রে যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিয়াছেন। গৌতম-সূত্র খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর রচনা বলিয়া নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার কতকগুলি সূত্র যে বহু পরববর্ত্তী কালে রচিত, তাহাও নিশ্চিত।

বাৎস্যায়নের ন্যায়-ভাষ্য ন্যায়-সূত্রের বিখ্যাত ভাষ্য। বাৎস্যায়নের গ্রন্থে কতকগুলি সূত্রের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। ইহাদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যের অস্তিত্ব এবং বাৎস্যায়ন যে গৌতমের অব্যবহিত পরবর্ত্তী নহেন, তাহা প্রমাণিত হয়। গৌতমকে বাৎস্যায়ন অতি প্রাচীন ঋষি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নকর্ত্তৃক নাগার্জ্জুনের মত-খণ্ডনের চেষ্টাদ্বারা তিনি যে নাগার্জ্জুনের পরবর্ত্তী, তাহা প্রমাণিত হয়। দিগনাগ বাৎস্যায়নের সমালোচনা করিয়াছেন। এই সকল হইতে বাৎস্যায়নকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

দিগ্‌নাগ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। তাঁহার "প্রমাণ-সমুচ্চয়", "ন্যায় প্রবেশ", "আলম্বন পরীক্ষা" এবং "প্রমাণ শাস্ত্র প্রবেশ" গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। মূলগ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উদ্যোতকরের গ্রন্থে দিগ নাগের মতের উল্লেখ আছে। দিগ্‌নাগ বৌদ্ধ ছিলেন।

উদ্যোতকরের "ন্যায় বার্ত্তিক" (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) গ্রন্থে দিগ্‌নাগকৃত বাৎস্যায়নের বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর আছে। ধর্ম্মকীর্ত্তি তাহার "ন্যায় বিন্দু" গ্রন্থে উদ্যোতকরের সমালোচনার উত্তর দিয়াছিলেন। "বাদ-ন্যায়" নামে ধর্ম্ম-কীর্ত্তির আর একখানা গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থই সম্ভবতঃ উদ্যোতকরের গ্রন্থে "বাদ-বিধি" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অনুমান সত্য হইলে উদ্যোত-কর ও ধর্ম্মকীর্ত্তি সমসাময়িক ছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের পরবর্ত্তী নহেন।

ধর্ম্মোত্তরের "ন্যায় বিন্দুটীকা" নবম শতাব্দীতে রচিত। নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাচস্পতির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায়-শাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম "ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা"। "ন্যায়সূচী নিবন্ধ" এবং "ন্যায় সূত্রোদ্ধার" নামে তাঁহার আর দুইখানা গ্রন্থ আছে। বাচস্পতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রত্ন-কীর্ত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী। রত্নকীর্ত্তির কাল ১০০০ খৃষ্টাব্দ। বাচস্পতি বেদান্ত দর্শন ও সাংখ্য দর্শনের উপরেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি "সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র" এবং "ষড়্‌-দর্শনবল্লভ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

উদয়নের "তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি" বাৎস্যায়নের ভাষ্যের টীকা। তাঁহার "আত্মতত্ত্ব বিবেক" গ্রন্থে তিনি আর্য্যকীর্ত্তি ও অন্যান্য বৌদ্ধ দার্শনিকের সমালোচনা করিয়া আত্মার শাশ্বতত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে তিনি ন্যায় দর্শনের ঈশ্বরবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার অন্য দুইখানি গ্রন্থের নাম কিরণাবলী ও ন্যায় পরিশিষ্ট।

জয়ন্তের "ন্যায় মঞ্জরী" ন্যায়-সূত্রের স্বতন্ত্র ভাষ্য। জয়ন্ত দশম শতাব্দীর লোক। ভাসর্ব্বজ্ঞ "ন্যায় সার" গ্রন্থে সমগ্র ন্যায় দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনিও দশম শতাব্দীর লোক।

বর্দ্ধমানের "ন্যায়নিবন্ধ প্রকাশ" (১২২৫ খৃষ্টাব্দ) উদয়নের "ন্যায়-তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধির" টীকা। বর্দ্ধমানের পিতা গঙ্গেশ নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বর্দ্ধমানের গ্রন্থে গঙ্গেশের মত বর্ণিত হইয়াছে। রুচিদত্তের "মকরন্দ" গ্রন্থ বর্দ্ধমানের গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরবর্ত্তী ন্যায় গ্রন্থসকলে বৈশেষিক পদার্থসকল স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে প্রমেয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের সমন্বয়কারীদিগের মধ্যে বরদারাজার নাম প্রসিদ্ধ। তাঁহার "তার্কিক রক্ষা" এই সম্প্রদায়ের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ (১২শ শতাব্দী)। কেশব মিশ্রের "তর্কভাষা" গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক মত মিশ্রিত (১৩শ শতাব্দী)।

জৈন নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে ভদ্রবাহুর দশ-বৈকালিকা নির্যুক্তি, সিদ্ধসেন দিবাকরের ন্যায়াবতার, মাণিক্যনন্দীর পরীক্ষামুখ-সূত্র, দেবসূরীর প্রমাণ নয়-তত্ত্বালোকালংকার এবং প্রভাচন্দ্রের প্রমেয়-কমল-মার্ত্তণ্ড প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ভদ্রবাহু খৃঃ পূঃ ৩৫৭ অব্দের এবং সিদ্ধসেন দিবাকর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। মাণিক্যনন্দী ম ও অষ্টম শতাব্দীতে এবং দেবসূরী দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। হিন্দু নৈয়ায়িকগণ ধর্ম্ম ও দর্শনের সঙ্গে তর্কশাস্ত্র মিলাইয়া ফেলিয়াছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ধর্ম্ম ও দর্শন হইতে স্বতন্ত্র ভাবে তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া নব্য-ন্যায়ের উদ্ভবের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন।

নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়। তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণি নব্যন্যায়ের প্রধান গ্রন্থ। গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান স্বীয় গ্রন্থে পিতার মত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। জয়দেব তত্ত্বচিন্তামণির যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার নাম "আলোক"। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে "তত্ত্বচিন্তামণি ব্যাখ্যা" নামে গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির ভাষ্য রচনা করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারক চৈতন্য, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, নৈয়ায়িক রঘুনাথ, তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ বাসুদেবের শিষ্য ছিলেন। "দীধিতি" এবং "পদার্থ খণ্ডন" রঘুনাথের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। জগদীশ (ষোড়শ শতাব্দী) এবং গদাধর (১৭শ শতাব্দী) নব্যন্যায়ের বিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন।

(৪)

ন্যায়দর্শনের আলোচ্য বিষয়

"নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়ঃ"—এই শাস্ত্র কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বুদ্ধি মীমাংসায় উপনীত হয়, এই জন্য ইহার নাম ন্যায় (নী ধাতু)। সত্য-নির্দ্ধারণে বুদ্ধি যাহাদ্বারা চালিত হয়, তাহা যুক্তি (argument)। যুক্তি-প্রণালীই ন্যায়দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইংরেজীতে ইহার নাম Logic। Logic চিন্তার বিজ্ঞান (Science of thought) এবং বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (Sciencc of Sciences) বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চিন্তা যথাযথ চালিত না হইলে সত্যে উপনীত হইতে সক্ষম হয় না। সকল মানুষ মরণশীল; ব্যাঘ্র মানুষ নহে। ইহা হইতে যদি মীমাংসা করা যায় যে ব্যাঘ্রের মৃত্যু নাই, তাহা হইলে সে মীমাংসা সত্য হইবে না। কেননা এই মীমাংসায় বুদ্ধি যে পথে উপনীত হয়, তাহা সত্যে পৌছিবার পথ নহে।

সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে চিন্তাকে যে সকল নিয়ম মানিয়া অগ্রসর হইতে হয়, সেই সকল নিয়মই Logicএর আলোচনার বিষয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহাদের নির্দ্ধারণ করাই Logicএর উদ্দেশ্য। এই Logicই ন্যায়। যাবতীয় বিজ্ঞান ন্যায়ের নিয়ম-কর্তৃক শাসিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ন্যায়ের নিয়মানুসারে পরিচালিত না হইলে তাহাদ্বারা সত্যের আবিষ্কার হয় না। তাই Logic সকল বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক—বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। কোনও বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য যে যুক্তির প্রয়োগ হয়, তাহা বৈধ অথবা অবৈধ হইতে পারে। ন্যায় বৈধ যুক্তির বিজ্ঞান। ইহা প্রমাণ শাস্ত্র—সত্য জ্ঞানের বিজ্ঞান। প্রমাণদ্বারা বিষয়ের পরীক্ষা ইহার উদ্দেশ্য। জ্ঞানের জন্য চারিটি পদার্থের প্রয়োজন : (১) প্রমাতা বা জ্ঞাতা, (২) প্রমেয়—জ্ঞানের বিষয়, (৩) জ্ঞান বা প্রমিতি বা প্রমা, (৪) প্রমাণ বা জ্ঞানের সাধন। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—জ্ঞানের মধ্যে এই তিনটি বর্ত্তমান। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে অসাধারণ (unique) সম্বন্ধ, তাহাই জ্ঞান। প্রমাণদ্বারাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধের উৎপত্তি হয়। শিবাদিত্যের মতে যাহা-দ্বারা প্রমা অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রমাণ। জয়ন্তের মতে যাহাদ্বারা বিষয়ের অসন্দিগ্ধ অব্যভিচারিণী উপলব্ধি হয়, তাহাই প্রমাণ। বাৎস্যায়নের মতে যাহাদ্বারা জ্ঞাতা বিষয়ী বিষয়কে জানে, তাহাই প্রমাণ। উদ্দ্যোতকরের মতে "উপলব্ধি-হেতু" প্রমাণ। বিষয়ের সহিত বিষয়ীর, মনের সহিত আত্মার সংযোগ সকল জ্ঞানের জন্যই প্রয়োজনীয়। তাহাছাড়া অন্য যাহার প্রয়োজন, তাহাই উপলব্ধি-হেতু, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণের আলোচনা ন্যূনাধিক পরিমাণে ভারতীয় সকল দর্শনেই আছে। কিন্তু ইহা ন্যায়দর্শনের মুখ্য বিষয়।

আমাদের মনে জগতের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ন্যায়দর্শনে তাহা স্থূলতঃ সত্য বলিয়া স্বীকৃত। ন্যায় মতে সকল জ্ঞানেই "অর্থ-প্রকাশ" হয়। সত্যের অনুসন্ধান মানব-মনের ধর্ম্ম। তাহার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা তাহার মধ্যে বর্ত্তমান। শারীরবিজ্ঞানী যেমন দেহের মধ্যস্থিত জৈব ক্রিয়ার অনুসন্ধান করেন, তেমনি নৈয়ায়িক মনের মধ্যে জ্ঞানোৎপত্তির ক্রিয়ার অনুসন্ধান করেন।

ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটি প্রামাণ স্বীকৃত। পাশ্চাত্য Logicএ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষের আলোচনা হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একটি প্রধান উপায়। অনুমানই ন্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এই জন্য ন্যায়দর্শনের এক নাম হেতু-বিদ্যা। পঞ্চ অঙ্গ (অবয়ব) সমন্বিত অনুমানকেও "ন্যায়" (Syllogism) বলা হয়।

৫

ন্যায়-সূত্রের প্রণেতা

ন্যায়-স্থত্র গৌতম-স্থত্র নামে পরিচিত। মহর্ষি গৌতম এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, বার্তিককার উদ্দ্যোতকর, আচার্য্য শঙ্কর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ন্যায়সূত্রকারকে অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। স্থত্রকার যে গৌতম, গোতম এবং অক্ষপাদ এই তিন নামেই পরিচিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোতম ঋষি স্থত্রকারের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাহার নাম গৌতম বা গোতম। দেবী পুরাণে আছে—

গৌর্বাক্ তয়ৈব তময়ন্ পরান্ গোতম উচ্যতে।
গোতমান্বয়-জন্মেতি গৌতমোঽপি স চাক্ষপাৎ॥

"গোশব্দের অর্থ বাক্। বাকদ্বারা বিপক্ষ পক্ষকে পরাভূত করিয়া তাহাদের চিত্তে খেদ উৎপন্ন করিতেন, এই জন্য তাঁহার নাম গোতম। আবার গোতম বংশে জন্ম বলিয়া অক্ষপাদের নাম গৌতম।

স্কন্দপুরাণে অক্ষপাদকে অহল্যার পতিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষ, ২৬৫) অহল্যার পতির নাম মেধাতিথি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভাস কবির 'প্রতিমা' নাটকে রাবণ অপনাকে ন্যায়শাস্ত্রে মেধাতিথির ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছে দেখা যায়। ইহা হইতে ভাসের সময় মেধাতিথি ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন মেধাতিথিই ছিল ন্যায়-স্থত্রের রচয়িতার প্রকৃত নাম, গোতম ও গৌতম নাম গোত্রানুযায়ী। তাঁহার অক্ষপাদ-নাম-সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে মহর্ষি বেদব্যাস গোতমের শিষ্য হইয়াও ব্রহ্মসূত্রে পরমাণুবাদ খণ্ডন করায় গোতম ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন তিনি আর তাহার মুখ দর্শন করিবেন না। বেদব্যাস তখন তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তাঁহার মত খণ্ডন করিতে তিনি তাঁহার নির্দেশিত পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া গুরুবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, গুরুদ্রোহী হন নাই। গৌতম সন্তুষ্ট হইয়া যোগবলে স্বীয় চরণে চক্ষুসৃষ্টি করিয়া তদ্বারা প্রণত ব্যাসের মুখ দর্শন করিতেন।

এই সকল হইতে অক্ষপাদ গৌতম যে অতি প্রাচীন ঋষি বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ন্যায়সূত্র খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, আধুনিক পণ্ডিতদিগের এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গৌতমের মতই ঐ সময়ে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল অন্য কাহারও দ্বারা, ইহা অসম্ভব নহে।

৬

চরক্ সংহিতা, বৈশেষিক সূত্র ও ন্যায়-সূত্র

অতি প্রাচীন কালে দার্শনিক আলোচনার জন্য আহূত পণ্ডিত-সভার বিবরণ উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল সভায় বিভিন্ন মতের সমর্থক পণ্ডিতগণ সমবেত হইতেন, এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষকে তর্কে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই প্রথা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। যুক্তিসঙ্গত ভাবে তর্ক চালাইবার জন্য তর্কপ্রণালী-শিক্ষার প্রয়োজন হইতে তর্কশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা কেহ কেহ অনুমান করেন। চরক সংহিতায় ও ন্যায়সূত্রে বিপক্ষকে পরাভূত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিতণ্ডা, ছল, জাতি, ও নিগ্রহস্থানের বর্ণনা আছে। ইহা হইতে মনে হয় এই দুই দর্শনের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও এই সকল বিষয় শিক্ষার জন্য গ্রন্থ ছিল। সুবর্ণপ্রভাসূত্রে লিখিত আছে যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ বিপক্ষের সহিত প্রবল ভাবে তর্ক করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য কণ্ঠস্বরের উন্নতি বিধান করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তজ্জন্য দেবী সরস্বতীর উপাসনা করিতেন। চরক ও ন্যায়সূত্রে ভিন্ন ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের বর্ণনা অন্য কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত, প্রয়োজন, প্রতিজ্ঞা ও বিতণ্ডা এই সকল চরক ও ন্যায়সূত্রে প্রায় এক ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু জল্প, ছল, নিগ্রহস্থান প্রভৃতির ব্যাখ্যায় পার্থক্য আছে। কতকগুলি পদ অল্পাধিক বিভিন্ন রূপে উভয় দর্শনে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ন্যায়ের উপমান ও অর্থাপত্তি চরকে উপম্য ও অর্থপ্রাপ্তি। জাতি ও নিগ্রহস্থানের বর্ণনা বাদ দিলে, চরক ও ন্যায়সূত্রের মধ্যে এই সকলের বর্ণনায় বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে করা অসঙ্গত নহে, যে ন্যায়সূত্র ও চরকের পূর্ব্বে এই সকল বিষয়-সম্বন্ধে অন্য গ্রন্থ ছিল।

ন্যায়সূত্রে সৌত্রান্তিকবাদ, বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ এবং সাংখ্য ও চার্বাক মতের খণ্ডন আছে। ইহা বাদে আরও যে সকল বাদের উল্লেখ আছে, অন্যত্র তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৈশেষিক সূত্রে মীমাংসা দর্শনের

উল্লেখ আছে, এবং মীমাংসা দর্শনের সহিত অধিকাংশ বিষয়েই তাহার মিল আছে। শব্দের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে মীমাংসা দর্শনের সহিত ন্যায়সূত্রের বিরোধ, কিন্তু জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য, এবং "অখ্যাতি" বাদ—যাহা লইয়া পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণের সহিত মীমাংসা দর্শনের প্রবল বিরোধ হইয়াছিল—ন্যায়সূত্রে তাহাদের উল্লেখমাত্র নাই। বৈশেষিক সূত্রে যোগের কথা নাই, কিন্তু ন্যায়সূত্রে (৪।২।৩৮-৪২, ৪।২।১০৩) যোগ ও সমাধির ব্যবস্থা আছে। ইহা পরবর্ত্তী কালে ন্যায়সূত্রে সংযোজিত হইয়াছে, কেহ কেহ ইহা বলিয়াছেন।

মনের অস্তিত্ব-অনুমানের কারণ বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনে প্রায় একই। জ্ঞান-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের আবির্ভাব হয় না, জ্ঞান চেষ্টার পরবর্ত্তী। এই জন্যেই মনের অস্তিত্ব উভয় দর্শনে স্বীকৃত। প্রত্যক্ষজ্ঞানের আলোচনায় বৈশেষিক দর্শনে সংস্কার বা "উদ্‌ভূত রূপ তত্ত্বে"র কথা আছে, ন্যায়দর্শনে নাই। ন্যায়দর্শনে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট এই ত্রিবিধ অনুমানের কথা আছে, বৈশেষিক দর্শনে এই শ্রেণী-বিভাগ নাই, কেবল অনুমানের কয়েকটি উদাহরণ আছে। বৈশেষিকে ব্যাপ্তির উল্লেখ নাই, কিন্তু হেতু ও সাধ্যের সাহচর্য্যের উল্লেখ আছে। বৈশেষিকে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলেও "শব্দ" একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। উপমান ন্যায় সূত্রে প্রমাণরূপে গৃহীত। বৈশেষিক সূত্রে তাহার উল্লেখ নাই। ন্যায়-সূত্রে অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং ঐতিহ্য স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গৃহীত না হইলেও, তাহারা স্বীকৃত প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত। বৈশেষিকে তাহাদের উল্লেখমাত্র নাই। বৈশেষিক ও ন্যায় উভয় দর্শনেই "অভাব" প্রত্যক্ষযোগ্য, কিন্তু উভয় দর্শনের আলোচনা-প্রণালী বিভিন্ন। বৈশেষিক বলেন যে-স্থানে কোনও বস্তুর অভাব, সেই স্থানের প্রত্যক্ষ হইতে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায়দর্শনে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে উক্ত হইয়াছে, যে কাহাকেও অ-চিহ্নিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর বলিলে, সে যে যে বস্ত্রে চিহ্নের অভাব প্রত্যক্ষ করে, সেই গুলিই আনে। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ বিশেষ ভাবে আলোচিত, কিন্তু ন্যায়দর্শনে ইহাদের সম্বন্ধে কিছুই নাই। ন্যায়-দর্শনে ইন্দ্রিয়গণের জড়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা আছে, কিন্তু বৈশেষিকে অষ্টম অধ্যায়ে কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের জড়ত্ব-সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ আছে। বৈশেষিকে ঈশ্বরের নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রমাণের চেষ্টা আছে। বৈশেষিক ও ন্যায়-সূত্র, উভয় দর্শনেই পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত, কিন্তু পরমাণুবাদের বিস্তারিত

বর্ণনা ন্যায়-সূত্রে নাই। আত্মার অস্তিত্ব-প্রমাণের জন্য ন্যায়-সূত্র প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের একত্ব এবং প্রত্যভিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়াছে, কিন্তু বৈশেষিক সূত্রে আত্ম-সংবিদের উপরই গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। বৈশেষিক মতে দেহের বন্ধন হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিই মোক্ষ, ন্যায়-মতে দুঃখ হইতে মুক্তিই মোক্ষ বা অপবর্গ।

ন্যায়-সূত্রে সংখ্যার জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু নাই, কিন্তু বৈশেষিক মতে সংখ্যার জ্ঞানের পূর্ব্বে প্রথমে কোনও বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ হয়, তাহার পরে হয় "একত্বের" জ্ঞান। অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে অর্থাৎ একাধিক বস্তুর সহিত এক বস্তুর ভেদ-জ্ঞান হইতে একত্বের জ্ঞান হয়। তাহার পরে হয় দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতির জ্ঞান।

বৈশেষিক সূত্রের "পিলুপাক" সম্বন্ধেও ন্যায় সূত্রে কিছু নাই। বৈশেষিক মতে তাপদ্বারা পরমাণুর বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ এই পরিবর্ত্তন দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকে হয় বলিয়াছেন।

এই সকল ভেদ সত্ত্বেও প্রশস্তপাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাত বৈশেষিক দর্শন এবং উদ্দ্যোতকর-ব্যাখ্যাত ন্যায়দর্শনের মধ্যে সমতা এত অধিক, যে উভয় দর্শন সমান তন্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।*

৭

ন্যায়-দর্শনের প্রয়োজন

ন্যায় দর্শনের প্রয়োজন গ্রন্থের প্রথম সূত্রেই ব্যখ্যাত হইয়াছে। "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়- প্রয়োজন- দৃষ্টান্ত- সিদ্ধান্ত-অবয়ব- তর্ক-নির্ণয়- বাদ-জল্প- বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি ও (১৬) নিগ্রহস্থান—এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয় লাভ হয়। এই নিঃশ্রেয়স কি, তাহা দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে। "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানা-মুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ"—দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান,

* ডাঃ দাসগুপ্তের History of Indian Philosophy Vol. I ৩০১-৩০২ পৃ দ্রষ্টব্য।

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষে উক্ত "মিথ্যাজ্ঞান" দূরীভূত হইলে, তাহার পূর্ব্বে উক্ত "দোষের" নাশ হয়, "দোষের" নাশ হইলে তাহার পূর্ব্বে উক্ত "প্রবৃত্তির" নাশ হয়, "প্রবৃত্তির" নাশ হইলে আর "জন্ম" হয় না, "জন্ম" রুদ্ধ হইলে "দুঃখের" নাশ হয়। ইহাই নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ। অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচি বস্তুতে শুচিজ্ঞান, অনাত্মা বস্তুতে আত্মজ্ঞান, প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান হইতে রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয়। রাগ ও দ্বেষ প্রকাশিত হয় লোভ, মোহ, স্তেয়, লাম্পট্য, হিংসা, প্রভৃতি "দোষে"। রাগ-দ্বেষের ফলে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই "প্রবৃত্তি"। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিনাশের ফলেই জন্ম-নিরোধ ও জন্ম-নিরোধ হইতে দুঃখ-নাশ। দুঃখনাশই অপবর্গ। অপবর্গ-প্রাপ্তির জন্য উক্ত ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। তাহাই ন্যায়দর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বুদ্ধের প্রতীত্য সমুৎপাদে দুঃখের দ্বাদশ নিদানের সহিত ন্যায়দর্শনে দুঃখের নিদানবর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভাব, জাতি ও জরামরণ—ইহারাই বুদ্ধের দ্বাদশ নিদান। ন্যায়দর্শনের মিথ্যাজ্ঞানই বুদ্ধের অবিদ্যা। তাহা হইতে উদ্‌ভূত হয় দোষ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ (আসক্তি বা তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা); দোষ হইতে সৎ ও অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি হইতে জন্ম (বুদ্ধের জাতি), এবং জন্ম হইতে দুঃখ উদ্‌ভূত হয়। বুদ্ধের "ভাব-চক্র" ন্যায়দর্শনের নিদানচক্র হইতে বৃহত্তর, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। গৌতম বুদ্ধ এবং ন্যায়সূত্রকার গৌতমের মধ্যে কে প্রাচীনতর, তাহা নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধের পূর্ব্বেও যে ন্যায়দর্শন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮

পদার্থ

বৈশেষিক মতে পদার্থ সংখ্যা সাতটি—দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। এই সাত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতেই উক্ত মতে নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়। ন্যায় মতে যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়, তাহাদের সংখ্যা ষোলটি—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও

নিগ্রহস্থান। ইহাদের মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয়ই প্রধান, তাহাদের জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স-সাধক, অন্য চৌদ্দটি প্রমাণ ও প্রমেয়ের সহায়ক। বৈশেষিক সাত পদার্থের একটির নামও ন্যায়ের পদার্থ-তালিকার মধ্যে নাই। দুই দর্শনের পদার্থ-বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বৈশেষিক দর্শনে প্রমেয়—অর্থাৎ যে যে বস্তু প্রমাণ-সিদ্ধ, তাহাদের বর্ণনাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রমাণের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। প্রমেয়-নিরূপণই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পরন্তু ন্যায়সূত্রের প্রধান উদ্দেশ্য প্রমাণ-নিরূপণ। যে উপায়ে বস্তুর সত্যজ্ঞান-লাভ হয়, তাহাই প্রমাণ। জ্ঞানের যাবতীয় উৎস অথবা উপায় প্রমাণের অন্তর্গত।

"পদার্থ" শব্দের অর্থ পদের অর্থ অথাৎ পদদ্বারা প্রকাশিত বস্তু। বৈশেষিক সপ্ত পদার্থকে পাশ্চাত্য দর্শনের Category বলা যায়। ইহারা যেমন উদ্দেশ্যে (Subject) আরোপিত হইতে পারে, তেমনি ইহারা উদ্দিষ্ট বস্তুও বটে। কিন্তু ন্যায়ের পদার্থ পদদ্বারা ব্যক্ত হইলেও Category নহে, যদিও পরবর্ত্তী কালের নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগকে বৈশেষিক সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত বলিয়াছেন। হেত্বাভাস, বিতণ্ডা, জল্প, ছল প্রভৃতি কখনও Category হইতে পারে না।

ন্যায়দর্শনকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) জ্ঞান-তত্ত্ব, (২) বাহ্য-জগৎ-তত্ত্ব, (৩) আত্মতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব ও (৪) ঈশ্বর-তত্ত্ব। উপরি উক্ত ষোড়শ পদার্থের বর্ণনার মধ্যে এই সকল তত্ত্ব বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৯

ন্যায়দর্শন বস্তুবাদী

ন্যায় দর্শন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদ (Realism)। যে দার্শনিক মতে বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান-নিরপেক্ষ, এবং জ্ঞাতা কেহ না থাকিলেও বস্তুর অস্তিত্বের হানি হয় না, তাহাই বস্তুবাদ। বস্তুর প্রত্যয় (Idea) অথবা মানসিক রূপ (Image), সুখ-দুঃখের অনুভূতি, ইচ্ছা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক পদার্থ ; ইহাদের মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র, পর্বত, বৃক্ষ, জন্তু প্রভৃতির দ্রষ্টা কেহ না থাকিলেও, তাহাদের অস্তিত্ব থাকে। তাহাদের অস্তিত্ব বিজ্ঞানবাহ্য। এই মতই বস্তুবাদ। বিজ্ঞান-বাদ ইহার বিপরীত। এই মতে বিজ্ঞানের বাহিরে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

সুখ-দুঃখের অনুভূতির যেমন মনের বাহিরে অস্তিত্ব নাই, যাহাকে আমরা বাহ্য বস্তু বলি, তাহাদেরও মনোবাহ্য অস্তিত্ব নাই। ন্যায়দর্শন বস্তুবাদী এবং বাহ্য বস্তুর মনোবাহ্য অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস অনুভব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহার ভিত্তি যুক্তি।

ন্যায়মতে সত্যজ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। কিন্তু সতের (Reality) সত্য জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহার সাধন কি, সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা না জানিলে সত্য জ্ঞান লাভ করা যায় না। ন্যায়ের জ্ঞান-বাদের উপর তাহার বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই জ্ঞান-বাদ কি, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১০

ন্যায় সূত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

গৌতম সূত্র পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং তাহাতে মোট সূত্র সংখ্যা ৫২৮ (পাঠান্তরে ৫২১)। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক আছে। প্রত্যেক দিনের পাঠ্য বিষয়কেই আহ্নিক বলা হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে দশটি আহ্নিক থাকায় তাহা দশদিনের পাঠ্য।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সূত্র সংখ্যা ৪১। প্রথম সূত্রে ১৬ পদার্থের বর্ণনা আছে, এবং তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স-লাভ হয় বলা হইয়াছে। পর সূত্রে অপবর্গের ব্যাখ্যা আছে। তাহার পরে চতুর্বিধ প্রমাণ ও তাহাদের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ৯ সূত্রে ১২ প্রমেয় ও পরবর্ত্তী কয়েক সূত্রে তাহাদের ব্যাখ্য আছে। তাহার পরে সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক ও নির্ণয় এই কয়েকটি পদার্থের ব্যাখ্যা আছে।

দ্বিতীয় আহ্নিকে বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান অবশিষ্ট এই কয়েকটি পদার্থের বর্ণনা আছে। সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণ-সম, সাধ্যসম ও অতীত কাল ভেদে হেত্বাভাস পঞ্চবিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাক্যছল, সামান্যছল, ও উপচারছল এই ত্রিবিধ ছল এবং জাতি ও নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রমাণের বিরুদ্ধ অপত্তি সকল খণ্ডিত হইয়াছে। প্রথমে "সংশয়"-সম্বন্ধীয় আপত্তির পরে বৌদ্ধদিগের প্রমাণ-সম্বন্ধীয় আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে। পরে প্রমাণদিগকেও জ্ঞানের বিষয়

বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শব্দ-প্রমাণ আলোচনা উপলক্ষে বেদের অভ্রান্তত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় আহ্নিকে প্রমাণ যে চারি প্রকারের অধিক নহে, অন্যান্য প্রমাণ উক্ত চারি প্রকারেরই অন্তর্গত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পরে শব্দের অনিত্যত্ব প্রমাণ করিয়া বর্ণাত্মক শব্দ যে বিকারী নহে, তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সন্ধি প্রভৃতি স্থলে শব্দের 'ই-কার স্থানে "য" হয়, ইহাদ্বারা শব্দের বিকারিত্ব প্রমাণিত হয় না, ইহা প্রমাণ করিয়া বিভক্ত্যন্ত শব্দ (পদ) যে আকৃতি, ব্যক্তি ও জাতি (প্রত্যক্ষীভূত আকৃতি, সেই আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাহা যে জাতির অন্তর্গত তাহা), এই ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ করে, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। পরে সমগ্র বস্তু তাহার অংশদিগের সমষ্টিমাত্র নহে, তাহার অতিরিক্ত, ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কালের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় আপত্তিও খণ্ডন করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে "প্রমেয়" সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে, এবং আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অর্থ এই চারিটি প্রমেয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। আত্মা শরীরাতীত ব্যাপক বস্তু, শরীর পার্থিব বস্তু, ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক-প্রাকৃতিক, এবং ভিন্ন ভিন্ন। এক ত্বক্-ইন্দ্রিয়ের অবয়ব নহে, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইহারা ইন্দ্রিয়েরঅর্থ, এবং ইহারা যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশের গুণ তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় আহ্নিকে বুদ্ধি ও মন এই দুই প্রমেয়ের বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে মন ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, এবং সূক্ষ্ম, ব্যাপক বস্তু নহে। প্রত্যক্ষের জন্য ইন্দ্রিয়দিগের সহিত মনের সংযোগের প্রয়োজন। এককালে সকল ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ইহা হইতে মন যে ব্যাপক নহে, ইহা অনুমিত হয়; বুদ্ধিকে আত্মার গুণ বলা হইয়াছে, ইহা আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। আত্মা দেহের অতীত, ভূত-প্রাকৃতিক নহে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ। পূর্বজন্মকৃত পাপ-পুণ্য হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়। চেতনা আত্মার ধর্ম, শরীরের গুণ নহে।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল ও দুঃখ এই পাঁচ প্রমেয়ের বিচার আছে। প্রবৃত্তি ত্রিবিধ—বাগারম্ভ প্রবৃত্তি, বুদ্ধ্যারম্ভ প্রবৃত্তি ও শরীরারম্ভ প্রবৃত্তি। ব্যাখ্যাকারগণ পাপাত্মিকা ও পুণ্যাত্মিকা ভেদে ত্রিবিধ প্রবৃত্তির বহু অবান্তর ভেদের বর্ণনা করিয়াছেন। দোষ ত্রিবিধ—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। প্রেত্যভাব, ফল ও দুঃখের বিচার প্রসঙ্গে বিজ্ঞানবাদ ও সর্ব্বশূন্যবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। আত্মার নিত্যত্ব হেতু জন্মান্তর স্বীকার্য্য।

বর্ত্তমান জন্মের অভিজ্ঞতা দ্বারা শিশুর স্তন্যপান-চেষ্টা ও মৃত্যুভয়ের ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহার পরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার পরে সর্ব্ব-অনিত্যবাদ এবং সর্ব্ব-নিত্যবাদ—এই উভয়বাদ খণ্ডিত হইয়াছে। পরে সর্ব্বনানাত্ববাদ ও সংখ্যৈকান্তবাদ (সকল বস্তু এক) খণ্ডিত হইয়াছে। পরে "ফলে"র বিচারে সূত্রকার প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহজন্মে কৃত কর্ম্মের ফল পরজন্মে উদ্বোধিত হয়, শাস্ত্রের এই বাক্যের বিরুদ্ধ তর্কের সারবত্তা নাই। দুঃখের আলোচনায় সংসার যে দুঃখময়, এবং যাহাকে সুখ বলা হয়, তাহা দুঃখ-মিশ্রিত, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। পরে অপবর্গের ব্যাখ্যা করিয়া, অপবর্গপ্রাপ্তি যে সম্ভবপর, তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চ ভোগ্য-বস্তুর সন্নিকর্ষে রাগ-দ্বেষাদি "দোষ" উৎপন্ন হয়। ইহাদের অনাত্ম-স্বরূপতা অবগত না থাকাতে শরীরে আত্মবুদ্ধি জন্মে। তজ্জন্যই রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হয়। ইহারা অনাত্ম, এই জ্ঞান হইলে শরীরের আত্মবুদ্ধির নাশ হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

শরীরী শরীর হইতে পৃথক। জগৎ সত্য, স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। জগতের অস্তিত্বের বাধক প্রমাণ নাই, এবং বুদ্ধি অলীক পদার্থ নহে, ইহা প্রমাণ করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন "সমাধি-বিশেষাভ্যাসাৎ" (৪।২।৩৭)। এক প্রকার সমাধি হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। স্ত্রীপুত্রাদি ভোগ্য বস্তু সর্ব্বদা চিত্তকে আকর্ষণ করে। ক্ষুৎ-পিপাসাতেও মানুষ কাতর হয়, ইহা সত্য। সমাধিও কঠিন, কিন্তু সাধন-দ্বারা সমাধি সিদ্ধ হয়। বিহিত সাধনের ফল অবশ্যম্ভাবী। অরণ্য, গুহা ও পুলিন প্রভৃতি স্থানে যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য। অপবর্গের জন্য যম, নিয়ম অভ্যাস করিয়া আত্মশুদ্ধি-লাভের জন্য চেষ্টা করিবে, যোগাভ্যাস করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবে, উপযুক্ত পুরুষের নিকট উপদেশ লইয়া তর্কদ্বারা জয়লাভ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানী পুরুষের বাক্যে প্রতিবাদ না করিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিবে। জল্প ও বিতণ্ডার যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, কণ্টকশাখার বেষ্টনদ্বারা বীজকে রক্ষা করিলে যেমন তাহা নির্ব্বিঘ্নে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি আবশ্যকমত জল্প ও বিতণ্ডাদ্বারাও নিশ্চিত তত্ত্বসকল প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে সাধর্ম্ম্যসম প্রভৃতি ২৪ প্রকার "জাতি" ও তাহার উত্তর এবং কথাভাস বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আহ্নিকে স্বীয় প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি ২২ প্রকার নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১১

বৈশেষিকসূত্র এবং ন্যায়সূত্রে পদার্থ-বিভাগ

বৈশেষিক সূত্রানুসারে পদার্থসংখ্যা সাতটি—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। ন্যায়সূত্রানুসারে পদার্থ ষোলটি: (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি ও (১৬) নিগ্রহস্থান। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই দুই দর্শনে পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। ভাষ্যকারদিগের মতে ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থটি বৈশেষিকের সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভূত।

প্রমাণ চারিটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ছয়টি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহারা দ্রব্য। অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞান, উপমান সাদৃশ্যজ্ঞান, শব্দ পদজ্ঞান। অনুমান, উপমান ও শব্দ গুণ। প্রমাণ হয় দ্রব্যের জ্ঞান, নতুবা গুণের জ্ঞান। সুতরাং ন্যায়ের প্রমাণ দ্রব্য ও গুণের অন্তর্গত।

প্রমেয় দ্বাদশটি: (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) মন, (৬) বুদ্ধি, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) ফল, (১০) দুঃখ, (১১) প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম) ও (১২) অপবর্গ। ইহাদের মধ্যে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন দ্রব্য, এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি অর্থ, সুতরাং গুণ। বুদ্ধিও গুণ। প্রবৃত্তি তিন প্রকার—বাক্-প্রবৃত্তি, বুদ্ধি-প্রবৃত্তি ও শরীর-প্রবৃত্তি। বাক্-প্রবৃত্তি বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য শব্দ, সুতরাং গুণ। বুদ্ধি-প্রবৃত্তি—পরের অপকার করিবার ইচ্ছা, লোভ, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি। ইহারা গুণ। শরীর-প্রবৃত্তি—হিংসা, দ্বেষ, আর্ত্তত্রাণ, চৌর্য্য প্রভৃতি কর্ম্ম। দোষ রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রবৃত্তির হেতু; সুতরাং গুণের অন্তর্গত। ফল—সুখ ও দুঃখের সংবেদন—গুণ। দুঃখও গুণ। প্রেত্যভাব—পুনর্জন্ম—দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগ-বিশেষ—গুণ। অপবর্গ—দুঃখ-নিবৃত্তি—অভাবের অন্তর্গত।

সংশয় এক প্রকার জ্ঞান। ইহা গুণের অন্তর্ভূক্ত। প্রয়োজন—কর্ম্মের উদ্দেশ্য—সুখ ও দুঃখাভাব। সুখ গুণ, দুঃখাভাব অভাব।

দৃষ্টান্ত: বৈশেষিকের সপ্তপদার্থের প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত সপ্তপদার্থের অন্তর্গত।

সিদ্ধান্তও সপ্তপদার্থের যে কোনটি হইতে পারে বলিয়া সপ্তপদার্থের অন্তর্ভূক্ত।

অবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচ অবয়ব বাক্য। বাক্য শব্দ। সুতরাং অবয়ব গুণ। তর্ক বা উহ বা আপত্তি মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ, সুতরাং গুণের অন্তর্ভূক্ত।

নির্ণয় একপ্রকার জ্ঞান, সুতরাং গুণ। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা শব্দ বিশেষ, সুতরাং গুণ। হেত্বাভাস অর্থ "দুষ্ট হেতু" অথবা "হেতুর দোষ"। দুষ্ট হেতু ও হেতুর দোষ সপ্ত পদার্থের যে কোনটির অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে। ছল ও জাতি গুণের অন্তর্ভূক্ত। নিগ্রহস্থানের মধ্যে ছয়টি—অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ—অজ্ঞতাসূচক বলিয়া অভাবের অন্তর্গত। অবশিষ্ট পনেরটি (প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞা-বিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, নিরনু্যোজ্যানুযোগ ও অপসিদ্ধান্ত) প্রতিবাদীর বিপরীত জ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া এবং বাক্যস্বরূপ বলিয়া গুণের অন্তর্ভূক্ত।

উপরি উক্ত ব্যাখ্যা সকলের মধ্যে কষ্টকল্পনার অভাব নাই, এবং বৈশেষিক সপ্ত পদার্থের মধ্যে ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভাব সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন।

১২

ন্যায়দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞানের উৎস চারিটি—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান ও (৪) শব্দ।

বিষয়ের প্রকাশকে জ্ঞান (বা বুদ্ধি) বলে। জ্ঞানে বস্তু প্রকাশিত হয়, এবং সেই প্রকাশের "অনুভব" হয়। এই অনুভব কেবল চৈতন্যের পক্ষেই সম্ভবপর। যে বস্তু যাহা, তাহা যদি সেইরূপে প্রকাশিত এবং অনুভূত হয়, তাহা হইলে সেই অনুভব সত্যজ্ঞান। সেই জ্ঞানকে প্রমা বা প্রমিতি বলে। প্রমা নিশ্চিত জ্ঞান। তাহা বিষয়ের অসন্দিগ্ধ যথার্থ অনুভব। যে জ্ঞান নিশ্চিত এবং অসন্দিগ্ধ নহে তাহা অপ্রমা। স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম (বিপর্য্যয়) এবং তর্ক অপ্রমার অন্তর্গত। স্মৃতি প্রমা নহে, কেননা তাহা অতীতে প্রকাশিত প্রমার প্রতিরূপ, কোনও অনধিগত বিষয়ের জ্ঞান নহে। নিশ্চিতির অভাববশতঃ সংশয় প্রমা নহে। ভ্রম এক প্রকার জ্ঞান, কিন্তু সত্যজ্ঞান নহে। কেননা ভ্রমজ্ঞানের সহিত তাহার বিষয়ের স্বরূপের ঐক্য নাই।

রজ্জুতে যখন সর্প-ভ্রম হয়, তখন রজ্জুর স্বরূপের সহিত সেই ভ্রমজ্ঞানের মিল থাকে না। তর্ক প্রমা নহে, কেননা তর্ক জ্ঞানলাভের একটি উপায় হইলেও, নিজে জ্ঞান নহে।

সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে ভেদ নিরূপণের উপায় কি? জ্ঞানের বিষয়ের সহিত যখন জ্ঞানের সমতা থাকে, তখন তাহা সত্য। যখন কোনও বস্তু দেখিয়া তাহাকে সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন সেই বস্তুর স্বরূপের সহিত যদি সেই জ্ঞানের সমতা থাকে, অর্থাৎ সেই বস্তু যদি প্রতীতের অনুরূপ হয়, তাহা যদি সর্পের সকল গুণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞান সত্য। আর যদি সেই বস্তুতে সর্পের সকল গুণ না থাকে, তাহা হইলে তাহা মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু বিষয়ের সহিত জ্ঞানের এই সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য নির্ণয় করিবার উপায় কি? "প্রবৃত্তি সামর্থ্য" ও "প্রবৃত্তি বিসংবাদ" দ্বারা এই সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য নির্দ্ধারিত হয়। অর্থাৎ এই জ্ঞান হইতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যদি সফল হয় (প্রবৃত্তি-সামর্থ্য), তাহা হইলে তাহা সত্যজ্ঞান, আর যদি সে কর্ম্ম বিফল হয় (প্রবৃত্তি-বিসংবাদ্), তাহা হইলে তাহা মিথ্যা। ইহা আধুনিক প্রাগ্‌ম্যাটিক বাদ (Pragmatism)।

১৩

লক্ষ্মণ ও লক্ষ্য

গৌতম সূত্রের প্রথম সূত্রে উল্লিখিত ষোড়শ পদার্থের উল্লেখের পরে তাহাদের লক্ষণের বর্ণনা ও পরীক্ষা করা হইয়াছে।

যে ধর্ম্ম বা গুণের দ্বারা কোনও বস্তুকে অন্যান্য সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া বোঝা যায়, ঐ ধর্ম্ম বা গুণই উক্ত বস্তুর লক্ষণ। উহাই তাহার ব্যাবর্ত্তক বা ভেদক ধর্ম্ম। বস্তুর সংজ্ঞায় (definition) এই লক্ষ্মণের উল্লেখ অপরিহার্য্য। বস্তুর স্বরূপের উল্লেখ না করিয়াও কেবল তাহার এক অসাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া তাহাকে বিশেষিত করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণকর্ত্তৃক বিশেষিত বস্তুকে লক্ষ্য বলে।

লক্ষ্মণ দ্বিবিধ—ব্যবহারসাধক ও ইতরব্যাবর্ত্তক। যে লক্ষ্মণদ্বারা কেবল লক্ষ্যবস্তুর পরিচয় হয়, কিন্তু অন্য বস্তুর সহিত তাহার ভেদ সিদ্ধ হয় না, তাহা ব্যবহারসাধক লক্ষণ। পদার্থের লক্ষণ প্রমেয়ত্ব। যাহার প্রমা হয়, তাহাই পদার্থ। কিন্তু এমন কিছু নাই, যাহা প্রমেয় নয়। সুতরাং এই লক্ষণ-

দ্বারা কোনও ভেদ সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ইহা ব্যবহারসাধক লক্ষণ। কিন্তু "গলকম্বলত্ব" দ্বারা গোরুকে অন্য পশু হইতে পৃথক করা যায়। এই জন্য ইহা 'ইতর-ব্যাবর্ত্তক' লক্ষণ।

লক্ষণের ত্রিবিধ দোষ সম্ভবপর—(১) অতি ব্যাপ্তি (২) অব্যাপ্তি ও (৩) অসম্ভব। কোনও লক্ষণ যদি তাহার লক্ষ্যবস্তু ব্যতীত অন্য বস্তুতেও থাকে তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। লাঙ্গুল গোরুর লক্ষণ বলিলে অতিব্যাপ্তি হয়, কেননা লাঙ্গুল অন্যান্য পশুরও আছে। লক্ষণ যদি লক্ষ্য সকল বস্তুতে না থাকে, তাহা হইলে অব্যাপ্তি দোষ হয়। গোরুর লক্ষণ যদি শ্বেতবর্ণ বলা হয়, তাহা হইলে অব্যাপ্তি দোষ হয়। কাঠিন্যকে যদি ক্ষিতির লক্ষণ বলা হয়, তাহা হইলেও অব্যাপ্তি হয়। কেননা ঘৃত, তৈল প্রভৃতি "ক্ষিতি" হইলেও কঠিন নহে। লক্ষণ যদি লক্ষ্যের অন্তর্গত কোনও বিশেষেই না থাকে, তাহা হইলে "অসম্ভব" দোষ হয়। লাঙ্গুল মানুষের লক্ষণ হইতে পারে না। লক্ষণ-নির্দেশে লক্ষ্যবস্তুর এমন এক বিশেষ গুণের উল্লেখ করিতে হয়, যাহা লক্ষ্যের বাচক পদের বাচ্য সকল বস্তুতে বর্ত্তমান, কিন্তু তাহার বাহিরে কোনও বস্তুতে নাই। ইহার জন্য লক্ষ্য বস্তুর জাতির "(সামান্য)" উল্লেখ করিয়া, পরে তাহার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করিবার জন্য "ইতর" অথবা "ভিন্ন" শব্দ বর্জিত বস্তুর নামের পরে ব্যবহার করিতে পারা যায়। লক্ষণ-নির্ণয়ের ইহা একটি উপায়।

অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই ত্রিবিধ দোষযুক্ত ধর্ম্মগুলি লক্ষণ নহে, ইহারা লক্ষণাভাস। এই তিনটি ব্যতীত "বৈয়র্থ গৌরব" প্রভৃতি আরও অনেক লক্ষণ-দোষের উল্লেখ শাস্ত্রে আছে।

১৪

প্রত্যক্ষ

পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রে জ্ঞানের একতম উৎসরূপে প্রত্যক্ষের বিশেষ আলোচনা নাই। যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা সাধারণতঃ আমরা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করি; এইজন্য প্রত্যক্ষের আলোচনা অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রে ইহার বিস্তারিত আলোচনা আছে। "ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম।" গৌতম সূত্র ১।১।৩)। ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের বিষয় পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইলে, যে জ্ঞান জন্মে, তাহার যে অংশ অব্যপদেশ্য অর্থাৎ পূর্ব্বে অবগত শব্দ-

জ্ঞানোৎপন্ন নহে, তাহা যদি অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক (নিশ্চিত) হয়, তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে।

শব্দ-জ্ঞানে শব্দের যে অর্থ জ্ঞাত ছিল, শব্দ উচ্চারিত হইলে সেই পূর্ব্ব-জ্ঞাত অর্থেরই বোধ জন্মে, নূতন কিছুর জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞান শব্দের ব্যাপার হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই জন্য সূত্রে "অব্যপদেশ্য" (শব্দের দ্বারা অনুৎপন্ন) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মরুভূমিতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ হইতে যে মরীচিকা উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞান অব্যভিচারী নহে, কেননা দৃষ্ট জলের স্থলে উপস্থিত হইলে সে জল আর দৃষ্ট হয় না। সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে। যে জ্ঞানে সংশয় থাকে যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া সর্পের জ্ঞান, তাহাও ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শ জাত হইলেও প্রত্যক্ষ নহে, কেননা তাহা নিশ্চিত জ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষ শব্দে যেমন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শ হইতে জাত জ্ঞান বুঝায়, তেমনি যে ক্রিয়া দ্বারা সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও বুঝায়। আদিতে অক্ষজ জ্ঞান অর্থে প্রত্যক্ষ শব্দ ব্যবহৃত হইলেও, পরে অক্ষজ হউক, না হউক, অব্যবহিত যাবতীয় জ্ঞান বুঝাইতেই এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৫

প্রত্যক্ষের বিবিধ বিভাগ

নানাভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। প্রথমতঃ লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই সন্নিকর্ষ অব্যবহিত ও ব্যবহিত উভয়ই হইতে পারে। অব্যবহিত সন্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষ লৌকিক। অলৌকিক প্রত্যক্ষে এই সন্নিকর্ষ সংঘটিত হয় অস্বাভাবিক উপায়ে।

লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—বাহ্য ও মানস। বাহ্য প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পাঁচ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা। মানসিক অবস্থা ও মানসিক ক্রিয়ার সহিত আত্মার সংযোগ হইতে মানস প্রত্যক্ষ হয়। লৌকিক প্রত্যক্ষ তাহা হইলে হয় ছয় প্রকারের—চাক্ষুষ, শ্রৌত, স্পার্শন, রাসন, ঘ্রাণজ এবং মানস। অলৌকিক প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ—সামান্য-লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ ও যোগজ।

ন্যায় মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টি। তাহাদের মধ্যে বাহ্য ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পাঁচটি, এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন। বাহ্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচ প্রাকৃতিক গুণের প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যেক বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রাকৃতিক জগতের যে উপাদানের গুণ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা দ্বারাই সেই ইন্দ্রিয় গঠিত। সদৃশ বস্তু দ্বারাই সদৃশ বস্তুর জ্ঞান হয়, এই বিশ্বাসই এই মতের ভিত্তি। অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়। সকল জ্ঞানেই মনের সহকারিতা প্রয়োজন—বাহ্য প্রত্যক্ষ ও মানস প্রত্যক্ষ উভয়ত্রই। সাংখ্য, বৈশেষিক ও মীমাংসকগণ মনকে অন্তরিন্দ্রিয়-রূপ স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন না।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ—সামান্য-লক্ষণ, জ্ঞান-লক্ষণ এবং যোগজ। কোন বস্তু দেখিয়া সেই জাতীয় সকল বস্তু-সম্বন্ধে যে সামান্য-জ্ঞান (Conception) জন্মে, তাহা সামান্য-লক্ষণ। অলৌকিক প্রত্যক্ষবলেই গোরু দেখিয়া যে গোজাতির জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা কিরূপে উৎপন্ন হয়? সকল গোরু কেহ প্রত্যক্ষ করে না, অথচ গোরুর যে সামান্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সকল গোরু সম্বন্ধেই সত্য। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলেন। এই জ্ঞানে "গোত্বে"র প্রত্যক্ষ হয়, এবং গোত্বের মাধ্যমে গোজাতি প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। যখন কোনও গোরুকে গোরুরূপে প্রত্যক্ষ করি, তখন তাহার "গোত্ব" প্রত্যক্ষ করি। গোরু এবং প্রত্যক্ষকর্ত্তার মধ্যে এই "গোত্ব" না থাকিলে, গোরুর প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না। গোরুর অব্যবহিত প্রত্যক্ষ সম্ভবপর নহে। গোজাতির এই প্রত্যক্ষ সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ। ইহা অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

যে প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষের বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের অব্যবহিত সংযোগ নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগপ্রাপ্ত অন্য বিষয়ের সহিত সেই অসংযুক্ত বিষয় সংহত, তাহাকে জ্ঞান-লক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। যখন কোনও লৌহ-খণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তাহার রূপের সহিত তাহার কাঠিন্যও প্রত্যক্ষ হয়। পূর্ব্বে যখন লৌহ স্পর্শ করিয়াছি, তখন তাহার রূপের সহিত কাঠিন্যেরও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যক্ষ কালে রূপের সহিত এক সঙ্গে প্রত্যক্ষ হইয়া কাঠিন্য রূপের সহিত সংহত হইয়া গিয়াছে। তাই যখনই তাহার রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তখনই তাহার কাঠিন্যেরও প্রত্যক্ষ হয়। ইহাই জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীকৃত সর্পের জ্ঞানের সহিত তাহার আকৃতি সংহত থাকে বলিয়া তখন রজ্জুতে সর্পের আকার প্রত্যক্ষ হয়; এবং তাহার সহিত সংহত সর্পের অন্যান্য গুণেরও প্রত্যক্ষ

হয়। চন্দন-খণ্ড দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার রূপের সহিত তাহার গন্ধেরও প্রত্যক্ষ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যক্ষ-কালে তাহার গন্ধের সহিত রূপের প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়া তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সঙ্গে (গন্ধ নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হইলেও) তাহার ঘ্রাণেরও প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষুদ্বারাই তাহার রূপ ও ঘ্রাণের উভয়েরই প্রত্যক্ষ হয়। বর্ত্তমান ঘ্রাণ-প্রত্যক্ষের কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘ্রাণের জ্ঞান। তাই এতাদৃশ প্রত্যক্ষকে জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে।

যোগাভ্যাসের ফলে যোগিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও অতীন্দ্রিয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার শক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা যুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এই ক্ষমতা তাঁহাদের সর্ব্বদাই থাকে। যাঁহারা যুঞ্জান অর্থাৎ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা সমাধিদ্বারা এই শক্তি লাভ করেন। ভারতীয় দর্শনে শাস্ত্রের প্রমাণে এই ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। ইহাকে যোগজ অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে।

রঘুনাথ শিরোমণি ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষের মধ্যে সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিচার আছে।

সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদে লৌকিক প্রত্যক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিকাশের পরিমাণই এই বিভাগের ভিত্তি। এতদ্ব্যতীত প্রত্যভিজ্ঞা তৃতীয় প্রকারের লৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকৃত। কোনও বস্তুর বিশেষ গুণযুক্ত রূপে যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সবিকল্প, যেমন নীল পদ্ম নীলগুণযুক্ত রূপে প্রত্যক্ষ হয়। কোনও দ্রব্যের গুণহীন সম্বন্ধ-বর্জিত ভাবে কেবল একটি বস্তুমাত্ররূপে প্রত্যক্ষ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ। সাংখ্য দর্শনে ইহাকে "আলোচন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। "ইহা একটি কিছু" এই মাত্র অনুভবই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ। এই 'একটা কিছুর' জ্ঞান ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সবিকল্প প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। মন যখন কোনও এক বিষয়ের চিন্তায় নিবদ্ধ থাকে, তখন কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত যে ভাসা ভাসা জ্ঞানে সেই বস্তুর অস্তিত্বমাত্র সূচিত হয়, তাহাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ।

প্রত্যভিজ্ঞা কোনও পূর্ব্বে জ্ঞাত বস্তুর সেই বস্তু বলিয়া জ্ঞান। যাহার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহাকে পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু বলিয়া জানাই প্রত্যভিজ্ঞা।

পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণের মতে নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ বাস্তবিক প্রত্যক্ষ নহে, তাহা অনুমান। সবিকল্প প্রত্যক্ষই আত্মার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইতে

তাহার পূর্ব্বে অবিশেষিত নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, ইহা অনুমিত হয়। সবিকল্প প্রত্যক্ষের প্রথম অবস্থা নির্বিকল্প অবস্থা, ইহাই তাঁহাদের মত। তাঁহারা বলেন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে মানস প্রত্যক্ষ নাই। ঘটের প্রত্যক্ষের জন্য ঘটত্বের জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু ঘটত্ব কি জানিতে হইলে ঘটত্বের স্বরূপ—ঘটত্বত্ব—জানা আবশ্যক। আবার ঘটত্বত্ব কি জানিতে হইলে তাহারও পশ্চাতে যাইতে হয়। এই অনবস্থা পরিহার করিবার জন্য বিশেষত্ব বিশেষণ ভাবশূন্য নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের অনুমান করিতে হয়।

কোনও বস্তুর গুণ-বর্জিত অবস্থার প্রত্যক্ষই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ। সম্প্রতীতি (conception), ও বিচার (judgment) সবিকল্প প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে নাই।

সবিকল্প ও নিবিকল্প প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মত ভিন্ন। তাঁহাদের মতে সবিকল্প প্রত্যক্ষ ব্যবহিত (mediate) জ্ঞান। তাহা পূর্ব্বের জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত। কিন্তু নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে পূর্ব্বজ্ঞান নাই—তাহা "কল্পনা-পোঢ়ম্" (কল্পনাবিমুক্ত)। (ধর্ম্মকীর্ত্তির মতে যে মানসিক ক্রিয়াদ্বারা বিষয়ে নাম প্রদত্ত হয়, তাহাই কল্পনা)। প্রত্যক্ষ বিষয়ের সামান্য জ্ঞান (conception), তাহার দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম অথবা নামের জ্ঞান, তাহাতে নাই। তাহাতে আছে কেবল প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের বিশিষ্টতা (idividuality), তাহার "স্ব-লক্ষণ"। যাহার প্রত্যক্ষ হয়, তাহার স্বরূপ অবর্ণনীয়। আমরা তাহার সম্বন্ধে যাহা বলি, তাহা কতকগুলি সম্প্রত্যয় (conception) মাত্র। যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয় (the given), তাহা অনন্যসাধারণ, তাহার সদৃশ অন্য কিছু নাই, তাহা ক্ষণিক। কিন্তু তাহা হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সার্বিক, শ্রেণীর আদর্শস্বরূপ (typical) এবং স্থায়ী। যখনই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় সম্বন্ধে আমরা কিছু বলি, তখনই অন্যের সহিত তাহার সম্বন্ধের সৃষ্টি করি। ফলে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু, যাহা সৎ (real), তাহা বুদ্ধিকল্পিত-গুণ-দ্বারা আবৃত হয়। যে গুঞ্জন শব্দ আমরা শুনিতে পাই, তাহাই সত্য। কিন্তু তাহাকে যখন ভ্রমর-গুঞ্জন অথবা অন্য কিছু বলি, তখন তাহা কল্পনামাত্র। ধর্ম্মোত্তরের মতে নবজাত শিশু যখন দ্বিতীয়বার মাতার স্তনে মুখ দিয়া তাহা চিনিতে পারে, তখন সেই জ্ঞানও তাহার প্রথমবারের মাতৃস্তনের অভিজ্ঞতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাহাও বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে। সবিকল্প প্রত্যক্ষে "সতের" (Real) আকার বিকৃত হয়, তাহা সত্য নহে। "বিকল্পাকারমাত্রং সামান্যম্—অলীকম্ বা"। সার্বিক প্রত্যয় অযথার্থ কল্পনার সৃষ্টি। দিঙ্নাগ

দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়াছেন। বাহ্যবস্তু ক্ষণিক, তাহার জ্ঞান অসম্ভব। "ক্ষণস্য জ্ঞানেন প্রাপয়িতুম অশক্যত্বাৎ।" প্রতি ক্ষণের অনুভব দিয়া সৃষ্টিশীল কল্পনা অতীতকর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট এবং ভবিষ্যতে প্রসারিত একটি শ্রেঢ়ীর সৃষ্টি করে। চিন্তার সৃষ্ট জগৎ অসত্য (অনর্থ)। যাহা "পরমার্থ সৎ" তাহা হইতেছে অনুভূত সংবেদন (Sensation)। এই বৌদ্ধ মত বৌদ্ধদিগের তাত্ত্বিক দর্শনকর্তৃক প্রভাবিত। দিঙ্‌নাগ বিজ্ঞানবাদী। তাঁহার মতে মনের বাহিরে জ্ঞানের সত্যতা নাই। সৎ কি, সে সম্বন্ধে তিনি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। কিন্তু তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ কালে যতই ক্ষণিক হউক না কেন এক প্রকার সতের সাক্ষাৎ আমরা লাভ করি। সৌত্রান্তিক ধর্ম্মকীর্ত্তি মনোবাহ্য সতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা ক্ষণিক বলিয়া তাহাদের জ্ঞান অসম্ভব বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সংবেদন ব্যক্তিগত, এবং সংবেদনের কারণ বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুমানলব্ধ। তাহার অব্যবহিত জ্ঞান অসম্ভব।*

হিন্দু নৈয়ায়িকগণ বৌদ্ধ মতের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। উদ্যোতকরের মতে বিশেষণবর্জিত বিশুদ্ধ অক্ষজ জ্ঞান অসম্ভব। পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যাণ্টও এই কথা বলিয়াছেন। "Perception without notions are blind, and notions without perceptions are empty." প্রত্যক্ষ জ্ঞানে প্রত্যক্ষ ও সম্প্রতীতি (notion) উভয়ই মিশ্রিত। সার্বিকের অস্তিত্ব নাই, তাহা কল্পনাসৃষ্ট, একথা নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে সার্বিক বিশেষের মধ্যে অবস্থিত এবং বিশেষের মতোই সত্য; তাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ। বস্তুর স্বরূপ আমাদের সংবিদে প্রকাশিত। বস্তুর যে সকল সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, তাহারা সংবেদনের উপর বুদ্ধিকর্তৃক স্থাপিত হয় না। তাহারা বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দৃষ্ট হয়। বুদ্ধি তাহাদের আবিষ্কার করে, সৃষ্টি করে না। জ্ঞানে বস্তুর যে সকল সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহা যদি বস্তুর মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে সৎ (noumenon) হইতে প্রতিভাসের (phenomena) পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়। আমাদের জ্ঞানের বিষয় তাহা হইলে সেই বস্তু স্বরূপতঃ যাহা, তাহা হইতে ভিন্ন। তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি তৃতীয় বস্তু (tertium quid)। কিন্তু ন্যায়দর্শনের মতে নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষের

---

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy, Vol II. পৃ ৬-৬২।

মধ্যে স্বরূপগত ভেদ নাই। সবিকল্প প্রত্যক্ষে যে সকল সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহারা শূন্য হইতে হঠাৎ আবির্ভূত হয় না। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব আছে, তাহারা প্রকাশিত হইলেই সবিকল্প প্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়। জয়ন্ত বলেন সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের যাহা বিষয়-বস্তু, তাহা হইতে ভিন্ন নহে। সবিকল্প প্রত্যক্ষে সেই বিষয়-বস্তুর সহিত যে সকল পূর্ব্বানুভূত গুণ ও সম্বন্ধ সংযুক্ত হয়, তাহাতে জ্ঞান-ক্রিয়ার বাধা সৃষ্টি হয় না। পূর্ব্বের নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তুর অনুভব হইয়াছে বলিয়া সবিকল্প প্রত্যক্ষকে মিথ্যা বলার কোনও যুক্তি নাই। সবিকল্প প্রত্যক্ষের বুদ্ধিজাত অংশ বিকল্প (মিথ্যা কল্পনা) নহে। সার্বিক (Universal) অব্যবহিত ভাবেই প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নামমাত্র নহে। নাম না থাকিলেও তাহার বোধ হয়। বস্তুর প্রত্যক্ষের সময় তাহার সার্বিক ও বিশেষ ধর্ম্ম উভয়ই দৃষ্টিগোচর হয়। যখন হস্তের অঙ্গুলিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম এবং প্রত্যেক অঙ্গুলির বিশেষ ধর্ম্ম উভয়েরই প্রত্যক্ষ হয়। কোনও পূর্ব্বে অদৃষ্ট বস্তু দেখিলে নাম না জানিলেও তাহার বিশেষ ধর্ম্মের সহিত সার্বিক ধর্ম্মেরও প্রত্যক্ষ হয়। কেবল বিশেষের ধর্ম্মই প্রত্যক্ষকালে দৃষ্ট হয়, ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে কোনও বস্তুর দ্বিতীয়বার দর্শনের সময় তাহার সহিত প্রথমবার দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনও সম্বন্ধই দৃষ্টিগোচর হইত না। দ্বিতীয়বার দর্শন-কালে প্রথম দর্শনের স্মরণ হইলেও, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায়? সার্বিক ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ তো হয় না বলিয়াছ। প্রথমবারে সার্বিক ও বিশেষ ধর্ম্ম উভয়েরই যদি প্রত্যক্ষ হয়, তবেই দ্বিতীয় দর্শনে প্রথম দর্শনের বিষয় মনে উঠিতে পারে।

বৌদ্ধরাও স্বীকার করেন, যে কোনও বিশেষ বস্তু যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন সার্বিকের একটা জ্ঞান (অনুবৃত্তি জ্ঞান) তাহার সঙ্গে থাকে। কিন্তু এই জ্ঞানের ভিত্তি কি? ঐ বিশেষ বস্তু কি তাহার ভিত্তি, অথবা তাহা হইতে ভিন্ন কিছু? তাহা কি নিত্য অথবা অনিত্য, প্রত্যক্ষযোগ্য অথবা অতীন্দ্রিয়? জ্ঞানে যদি কোনও বিশেষত্ব থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাতেও সেই বিশেষত্ব থাকিবার কথা। "বিষয়াতিশয় ব্যতিরেকেন প্রত্যয়াতিশয়ানুপপত্তেঃ।" বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু না থাকিলে তাহার প্রত্যয়ে অতিরিক্ত কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং সার্বিক বিশেষ হইতে ভিন্ন। তাহা সার্বিক বলিয়া সনাতন, কিন্তু বিশেষ জন্ম ও মৃত্যুর অধীন। প্রত্যক্ষযোগ্য হউক বা না হউক, তাহা সৎ। সবিকল্প প্রত্যক্ষে বিষয়ের

নামের স্মরণ হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শই প্রত্যক্ষের প্রধান কারণ, নামের স্মরণ গৌণ।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়েরই ক্রিয়া আছে। জ্ঞানের মধ্যে একটি সার্বিক অংশ এবং একটি বিশেষ অংশ আছে। সার্বিক অংশ বুদ্ধি হইতে প্রাপ্ত, বুদ্ধি তাহার আবিষ্কার করে। বিশেষ অংশ ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত। বস্তুর সার (Essence)—তাহার সার্বিক রূপ—বুদ্ধিগ্রাহ্য। তাহার বিশেষ রূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। বিশেষ হইতে সার্বিককে পৃথক করা যায় না। তাহারা অবিচ্ছেদ্য।

বৌদ্ধ মতে ক্ষণিক বিশেষই সৎ। প্রতিক্ষণে তাহাদের উৎপত্তি হইতেছে। কাহারও সহিত কাহারও জাতিগত ঐক্য নাই। প্রত্যেকেই নিজের বিশেষ গুণে অন্বিত। একটি হইতে আর একটি সম্পূর্ণ পৃথক। কালে তাহার বিস্তৃতি নাই, তাহা ক্ষণিক। দেশেও তাহার বিস্তৃতি নাই। একটির সহিত আর একটির যে সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই, তাহা কল্পনার সৃষ্টি। তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই। নৈয়ায়িকদিগের মতে বিশেষের মধ্যে বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। বিশেষের আধেয় বহু। বহু-আধেয়সমন্বিত বিশেষ এক (unity in diversity)। এই বিশেষ বহু বিশেষের মধ্যে একটি, এবং এক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। একত্ব ও পৃথকত্ব উভয়েই সমগ্রের অন্তর্গত। বৌদ্ধগণ ইন্দ্রিয়ে যে সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহাকেই কেবল সত্য বলেন। মনের ক্রিয়াবিহীন সংবেদনের জ্ঞানকেই তাহারা সতের জ্ঞান বলেন। কিন্তু সংবেদনগণ মনের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। সংবেদনগণ পৃথক পৃথক ভাবে মনের মধ্যে প্রবেশ করে না। বহুবিধ সংবেদন পরিবৃত হইয়া এক একটি সংবেদন মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং মন তাহাদের অর্থ আপনা হইতেই গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয় হইতে বুদ্ধিকে পৃথক করিয়া লাভ নাই। তাহাদের কার্য্য পরস্পরের পরিপূরক, বিরোধী নহে। উভয়ের সহযোগেই সত্য প্রকাশিত হয়।

ধর্ম্মকীর্ত্তি চতুর্বিধ প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, মানস প্রত্যক্ষ (মনোবিজ্ঞান), স্ব-সংবেদনা এবং যৌগিক প্রত্যক্ষ। "মনোবিজ্ঞান" ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং তাহার সহিত "এক সন্তান"—অর্থাৎ একই ক্রিয়ার অংশ। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শেষ না হইলে "মনোবিজ্ঞানে"র উদ্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার পরিসমাপ্তির পরেই মনে ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন জ্ঞানের যে প্রতিবিম্ব উদিত হয়, তাহাই মনোবিজ্ঞান। সুখ-

দুঃখের অনুভূতি এই মতে স্ব-সংবেদনার অন্তর্ভুক্ত। আত্মার অবস্থার প্রত্যক্ষ হইতে আত্মার জ্ঞান হয়। ইহা আত্মার অব্যবহিত জ্ঞান—আত্মার সাক্ষাৎকার। তাহাতে বুদ্ধির কোনও ক্রিয়া নাই, ভ্রান্তিরও সম্ভাবনা নাই। যাবতীয় মানসিক ব্যাপারের ইহা সহগামী। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণের মতে স্ব-সংবেদনা—আত্মার প্রত্যক্ষ—জ্ঞানোৎপত্তির পরবর্ত্তী। গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলেন, ঘটের প্রত্যক্ষের পরে যখন বলি "আমি জানি ইহা একটি ঘট", তখন স্ব-সংবেদনার উদ্ভব হয়। "ব্যবসায়" অর্থাৎ সবিকল্প প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞানের অনুভবকে অর্থাৎ "আমি এই বস্তু জানি" এই জ্ঞানকে "অনুব্যবসায়" বলে। "ইহা একটি ঘট" এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কিন্তু "আমি জানি ইহা একটি ঘট" এই জ্ঞান অনুব্যবসায়।

কুমারিল ভট্টের মতে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। কোন বস্তুর যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহার প্রত্যক্ষত্ব হইতে অনুমান হয় যে জ্ঞান (cognition) হইয়াছে। জৈন ও বেদান্তী এবং কোনও কোনও বৌদ্ধ মতে জ্ঞানেরও জ্ঞান হয়, কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক মতে জ্ঞান কখনও আপনাকে বিষয়ে পরিণত করিতে পারে না, এবং জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান পর-প্রকাশক, স্ব-প্রকাশক নহে। অন্য আর একটি জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ হয়। (জ্ঞানং জ্ঞানান্তর-বেদ্যং প্রমেয়ত্বাৎ পটাদিবৎ) এই মতের সমালোচনায় জৈনগণ যাহা বলেন, তাহা এই :

(১) সুখের যখন অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতির সঙ্গেই সুখের জ্ঞান হয়, অন্য সুখদ্বারা তাহার জ্ঞান হয় না। ঈশ্বরের জ্ঞান সেই জ্ঞানদ্বারাই জ্ঞাত হয়, তাহার জন্য দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ আত্মাকর্ত্তৃক যখন কোনও বিষয় জ্ঞাত হয়, তখন সেই বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গেই আত্মার জ্ঞান (Self-consciousness) হয়। তাহা না হইলে একটি জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, তাহার জন্য তৃতীয় জ্ঞানের প্রয়োজন, এইরূপ অনবস্থা চলিবে।

(২) ঈশ্বরে দুইটি জ্ঞান স্বীকার (এক জ্ঞানে বিশ্ব পরিজ্ঞাত, দ্বিতীয়ে এই বিশ্বজ্ঞানের জ্ঞান) অনাবশ্যক। প্রশ্ন করা যাইতে পারে দ্বিতীয় জ্ঞানের কোনও জ্ঞান হয় কি না? যদি হয়, তাহা হইলে, হয় দ্বিতীয় জ্ঞানকর্ত্তৃকই সেই জ্ঞান হয়, নতুবা তাহার জন্য তৃতীয় এক জ্ঞানের প্রয়োজন। যদি অন্য এক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অনবস্থা চলিবে। যদি দ্বিতীয় জ্ঞান-কর্ত্তৃকই তাহা জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানে প্রথম জ্ঞানের জ্ঞান হইবার

বাধা কি? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বরের জ্ঞান আপনাকে জানে, বিশ্বকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা আপনাকে জানে। ঐশ্বরিক ও মানবীয় জ্ঞানে এ বিষয়ে কোনও ভেদ নাই। সংবিদের স্বরূপই আপনার সহিত অন্য বস্তু প্রকাশিত করা। সংবিদ স্ব-পর-প্রকাশক।

(৩) মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জৈনগণ স্বীকার করেন না। সুতরাং অনু-ব্যবসায়ে আত্মার সহিত মনের সংযোগ তাঁহারা অস্বীকার করেন এবং অনুব্যবসারের কোনও প্রমাণ নাই বলেন।

(৪) এক জ্ঞান যদি জ্ঞানান্তরের বিষয় হয়, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানের যতক্ষণ অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ দ্বিতীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। আবার প্রথম জ্ঞানের শেষ হওয়ার পরেও জ্ঞানান্তরের উদ্‌ভব হওয়া অসম্ভব। তখন যাহা নাই, তাহার জ্ঞান হইবে কিরূপে?

(৫) দ্বিতীয় জ্ঞান যদি অন্য জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে অনবস্থা হইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে যে জ্ঞান কাহারও কর্তৃক জ্ঞাত হয় নাই, তাহা কিরূপে অন্য জ্ঞানের জ্ঞাতা হইতে পারে, এই প্রশ্ন উঠিবে। তাহা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আমার জ্ঞান অন্য অপরিচিত ব্যক্তির জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে।

(৬) ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সেই জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়দিগের জ্ঞান হয় না। সুতরাং কথিত দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞান না হইলেও তাহাদ্বারা প্রথম জ্ঞান জ্ঞাত হইতে পারে। এই যুক্তি উত্থাপিত করিয়া লাভ নাই। কেননা এই যুক্তি-বলে প্রথম জ্ঞান জ্ঞাত না হইয়াও বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে। (প্রমেয় কমল-মার্ত্তণ্ড—ডাঃ রাধাকৃষ্ণের গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

প্রত্যভিজ্ঞা সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রভাকরের মতে প্রত্যভিজ্ঞা অংশতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অংশতঃ স্মৃতিজ্ঞান। বৌদ্ধ মতে ইহা প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির মিশ্রণ—কেবল প্রত্যক্ষও নহে, কেবল স্মৃতিও নহে। কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ ইহার কারণ নহে; কেননা অতীত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগ অসম্ভব। পূর্ব্বে ঘটিত ইন্দ্রিয়-বিষয়-সংযোগ হইতে উদ্‌ভূত জ্ঞানের সংস্কারও ইহার কারণ নহে, কেননা প্রত্যভিজ্ঞাকালে বস্তুকে "ইদম্" (এই) বলিয়া জ্ঞান হয়। অতীত ও বর্ত্তমানের মিশ্রণও প্রত্যভিজ্ঞা নহে। কেননা অতীতের ক্রিয়া বর্ত্তমানের ক্রিয়া হইতে ভিন্ন এবং তাহাদের ফলও ভিন্ন। যদি প্রত্যভিজ্ঞাকে একমাত্র ক্রিয়া বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়টি কি? তাহা অতীতের ঘটনা

নহে। তাহা হইলে স্মৃতির সহিত তাহার পার্থক্য থাকিত না। তাহা ভাবী কোনও ঘটনা যদি হইত, তাহা হইলে, তাহাকে কল্পনা বলিতে হইত। ইহা বর্ত্তমানের বিষয় নহে। কেননা ইহাতে এক বর্ত্তমান বিষয়ের সহিত অতীত এক বিষয়কে অভিন্ন গণ্য করা হয়। ইহাতে ভূত, বর্ত্তমান ও ভাবী কালে অবস্থিত কোনও বস্তুর জ্ঞান হয়—তাহাও বলা যায় না। সেইজন্য নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রত্যভিজ্ঞা এক প্রকার বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ, ইহাতে অতীতদ্বারা বিশেষিত বর্ত্তমান বিষয়ের জ্ঞান হয়। যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে পূর্ব্বে দৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান হয়। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে স্মৃতি ও অনুমান থাকে। কিন্তু স্মৃতি ও অনুমান প্রত্যক্ষের সহকারী মাত্র, ইন্দ্রিয়ে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রত্যক্ষের মুখ্য অংশ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইতে যে কোনও মানসিক অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহার মধ্যে স্মৃতি ও অনুমান মিশ্রিত থাকিলেও, তাহা প্রত্যক্ষই।

গৌতম সূত্রানুসারে প্রত্যক্ষে ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। ভ্রান্ত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না। প্রত্যেক প্রত্যক্ষে থাকে (১) প্রত্যক্ষের বিষয় (২) আত্মা (৩) বাহ্য ইন্দ্রিয় (৪) অন্তরিন্দ্রিয় মন ও (৫) বাহ্য সহকারী কারণ, যেমন দর্শনক্রিয়ার বেলায় আলোক। ইহাদের কোনও একটির কার্য্যে গলদ ঘটিলে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়। প্রত্যক্ষের বিষয় গতিশীল হইলে, অথবা ভিন্ন বস্তুর সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলে (যেমন শুক্তি ও রজত) ভ্রমের উদ্ভব হইতে পারে। আলোক যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জ্বল না হইলে দৃষ্টিভ্রম হয়। মন অন্য বিষয়ে নিযুক্ত থাকিলে অথবা আত্মায় ভাবের প্রাবল্য ঘটিলে ভ্রম হয়। ইন্দ্রিয়-পীড়াগ্রস্ত হইলেও ভ্রম হয়।

১৬

স্বপ্ন

ন্যায় মতে দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়ায় বাধা এবং পূর্ব্বকৃত পাপ ও পুণ্য হইতে স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। ভাবী বিষয়ের স্বপ্ন বিদেহ আত্মাগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

বৈশেষিক সূত্র মতে স্বপ্ন স্মৃতির ন্যায় আত্মা ও মনের এক বিশিষ্ট প্রকারের সংযোগ এবং সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নদর্শনও একই কারণ হইতে উদ্ভূত হয়। অদৃষ্টও (ধর্ম্ম—পাপ ও পুণ্য) ইহার কারণ (৯।২।৬-৯)। প্রশস্তপাদের মতে যখন ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত থাকে এবং তাহাদের কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন মন-কর্ত্তৃক স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। স্বপ্ন

আভ্যন্তরীন প্রত্যক্ষ, পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতার সংস্কার। দৈহিক ক্রিয়ার গোলমাল এবং অদৃষ্টকর্ত্তৃক স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। শ্রীধরের মতে কেবল মন-কর্ত্তৃকই স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। উদয়ন বলেন স্বপ্ন-কালেও বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়াশীল থাকে। প্রভাকরের মতে অতীত অভিজ্ঞতাই স্বপ্ন-কালে আত্মার সম্মুখে পুনরাবির্ভূত হয়, কিন্তু স্মৃতিভ্রংশ হেতু অতীতের স্মৃতি বলিয়া বোধ হয় না, পরন্তু বর্ত্তমান ও বাস্তব বলিয়া মনে হয়।

১৭

অনুমান

প্রত্যক্ষের পরে দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমান। প্রত্যক্ষের পরবর্ত্তী বলিয়া এই প্রমাণের নাম অনুমান (অনু=পশ্চাৎ)। পর্ব্বতে প্রথমে ধূম প্রত্যক্ষ করিবার পরে তাহাতে অগ্নির জ্ঞান হয়। নদীতে জলের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার পরে আমরা পূর্ব্বে ঘটিত বৃষ্টির জ্ঞান লাভ করি। যেখানে এক বস্তুর মধ্যে এমন একটি চিহ্ন (লিঙ্গ) দৃষ্ট হয়, যাহার সহিত অন্য এক বস্তুর অব্যভিচারী সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) বর্ত্তমান, সেইখানে সেই চিহ্ন হইতে যে দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের সাধনই অনুমান।

অনুমানের জন্য তিনটি পদের (terms) এবং তিনটি বাক্যের প্রয়োজন। পর্ব্বতে অগ্নির অনুমানে অগ্নি অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু ধূম প্রত্যক্ষ। ধূম হইতে অপ্রত্যক্ষ অগ্নির জ্ঞানের জন্য ধূম এবং অগ্নির মধ্যে অব্যভিচারী সাহচর্য্যের প্রয়োজন। ধূমের প্রত্যক্ষ হইবার পরে ধূম ও অগ্নির মধ্যে যে অব্যভিচারী সাহচর্য্য সম্বন্ধ আছে, তাহার স্মরণের প্রয়োজন। এই সম্বন্ধের জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতা-জাত। এই স্মৃতির ফলে পর্ব্বতে অপ্রত্যক্ষ অগ্নির জ্ঞান হয়। এই স্থানে পর্ব্বত হইতেছে পক্ষ বা অপ্রধান পদ (minor term), অগ্নি সাধ্য বা প্রধান পদ (major term), ধূম লিঙ্গ। ইহাকে হেতু বা সাধনও বলে। ইহা মধ্যবর্ত্তী পদ (middle term)।

স্বর্ণদ্বারা অলংকার নির্ম্মিত হয়, মৃত্তিকাদ্বারা ঘট নির্ম্মিত হয়। স্বর্ণ ও মৃত্তিকা বিশেষ রূপ ধারণ করিলে অলংকারও ঘটে পরিণত হয়। সুতরাং স্বর্ণ ও মৃত্তিকা অলংকার ও ঘট হইতে অধিকতর ব্যাপক। অলংকার তাহার ব্যাপক স্বর্ণের ব্যাপ্য, এবং ঘট তাহার ব্যাপক মৃত্তিকার ব্যাপ্য। স্বর্ণ ও মৃত্তিকা অলংকার ও ঘটের উপাদান কারণ। অলংকার স্বর্ণের "কার্য্য", ঘট মৃত্তিকার "কার্য্য"। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের জ্ঞানকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান প্রমাণের ভিত্তি।

কোনও বস্তু অপর বস্তুর কার্য্য অথবা কারণ অথবা সহযোগী, বিরোধী অথবা সমবায়ী হইলে, একটির জ্ঞান হইতে অপরটির জ্ঞান হয়। যাহার জ্ঞান হইতে অন্যটির জ্ঞান হয়, তাহাকে বলে লিঙ্গ, এবং অপরটিকে বলে লিঙ্গী। (বৈশেষিক সূত্র ৯।২।১)। লিঙ্গ হইতে লিঙ্গীর জ্ঞান অনুমান। আরোহিক এবং অবরোহিক (Induction and Deduction) উভয় জ্ঞানই অনুমান। অনুমানের পূর্ব্বে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে অনুমান হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে ভেদ এই : (১) অনুমান নানাবিধ, কিন্তু অলৌকিক, যোগজ প্রত্যক্ষ ব্যতীত সকল প্রত্যক্ষই এক প্রকার। (২) প্রত্যক্ষের বস্তু বর্ত্তমান কালে এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিধানে অবস্থিত থাকে। কিন্তু অনুমানের ক্ষেত্র তিন কালেই অবস্থিত হইতে পারে। (৩) অনুমানের জন্য ব্যাপ্তির স্মৃতি আবশ্যক। কিন্তু প্রত্যক্ষে তাহার প্রয়োজন নাই। (উদ্যোতকর)

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে এক জ্ঞান হইতে উৎপন্ন জ্ঞানান্তরই অনুমান। গৌতম সূত্রানুসারে "তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধম্ অনুমানম্—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতো দৃষ্টং (১।১।৫)। অনুমান প্রত্যক্ষপূর্ব্ব। অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ না থাকিলে অনুমান হয় না। পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট, এই ত্রিবিধ অনুমান।

দুইটি বস্তু যদি সহচর হয়, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ যদি এরূপ হয় যে তাহাদের একটি যেখানে থাকে, অন্যটিও সেইখানে থাকে, তাহা হইলে একটিকে দেখিয়া তাহার সহিত অন্যটি আছে, ইহা অনুমান করা যায়। ধূম ও অগ্নির মধ্যে সম্বন্ধ এই রূপ। যেখানে ধূম দেখা যায়, সেখানে অগ্নিও থাকে, ইহা সকল সময়েই দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং দূরস্থিত পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইলে অগ্নি দেখা না গেলেও তথায় যে অগ্নিও আছে, ইহা সকলেরই মনে হয়। এখানে ধূম অগ্নির ব্যাপ্য এবং অগ্নি ধূমের ব্যাপক। অনুমানে প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষের জ্ঞান হয়। উভয়ের মধ্যে সাহচর্য্য সম্বন্ধ থাকিলে যেমন এই জ্ঞান হয়, তেমনি অপ্রত্যক্ষ বস্তু যদি প্রত্যক্ষ বস্তুর কারণ অথবা কার্য্য হয়, তাহা হইলেও প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষের এই প্রকার জ্ঞান হয়। কারণ হইতে কার্য্যের অনুমান, অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতার ফলে এক বস্তু দেখিয়া দ্বিতীয় বস্তুর অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলে। কোনও বস্তুর এক অংশ দেখিয়া সমগ্র বস্তুটির অনুমানকে শেষবৎ অনুমান বলে। সম্ভাব্যমান বহু বস্তুর মধ্যে এক এক করিয়া অন্য সকলকে বর্জন করিয়া

অবশিষ্ট বস্তুর (by elimination) অনুমানকে শেষবৎ বলে। এই অনুমানকে পরিশিষ্যমানও বলে। শব্দ কোন পদার্থ? ইহা কি দ্রব্য, অথবা গুণ অথবা ক্রিয়া, অথবা সামান্য, অথবা বিশেষ অথবা সমবায়? ইহা দ্রব্য নহে, ক্রিয়া নহে, সামান্য নহে, বিশেষ নহে, সমবায় নহে প্রমাণ করিয়া ইহাকে গুণ বলিয়া প্রমাণ করা যায়। এই অনুমান শেষবৎ অনুমান। মেঘ বৃষ্টির কারণ। সুতরাং আকাশে মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান।

কার্য্য হইতে কারণের যে অনুমান তাহা শেষবৎ অনুমান। নদীতে অকস্মাৎ জল বৃদ্ধি দেখিয়া উপরে বৃষ্টি হইয়াছে, এই অনুমান শেষবৎ।

দৃষ্ট বস্তুসম্বন্ধীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া অদৃষ্ট সেই জাতীয় বা অন্য জাতীয় তৎসদৃশ বস্তুর অনুমানকে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান বলে। কার্য্য হইতে কারণের অনুমান এবং কারণ হইতে কার্য্যের অনুমান ভিন্ন অন্য সকল প্রকার অনুমানই সামান্যতোদৃষ্ট। তেঁতুলের রূপ ও রং দেখিয়া তাহার অম্ল আস্বাদের অনুমান সামান্যতো দৃষ্ট। কোনও শৃঙ্গ-যুক্ত জন্তু দেখিয়া তাহার লাঙ্গুলের অনুমানও সামান্যতো দৃষ্ট। বক দেখিয়া তাহার নিকটে জল আছে, এ অনুমানও সামান্যতো দৃষ্ট। দেখা যায় কোনও করণ ভিন্ন কেহ কোনও কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন, এই সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য আত্মার করণের প্রয়োজন। এই করণগুলিই ইন্দ্রিয়। আবার দেখিতে পাওয়া যায় রূপ-রসাদি গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আশ্রয় ভিন্ন গুণ থাকিতে পারে না। সুতরাং ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতির আশ্রয়-স্থানস্বরূপ আত্মা আছে। ইহাই সামান্যতো দৃষ্ট।

প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়-সম্বন্ধে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এক বস্তু এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া তৎপরে অন্য স্থানে দৃষ্ট হইলে, তাহার গতি দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহাকে গতিশীল বলিয়া অনুমান করা যায়। এই রূপে সূর্য্যের গতি অনুমিত হয়। ইহাকে ন্যায় ভাষ্যে সামান্যতো দৃষ্ট বলিলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা কার্য্য হইতে কারণের অনুমান—শেষবৎ অনুমান।

বাৎস্যায়ন উপরি উক্ত ভাবে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়া অন্যবিধ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি বস্তুর মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ যদি থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেখানেই একটি

প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেখানেই যদি অন্যটিও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে তাহাদের একটি প্রত্যক্ষ হইলে অন্যটিও সেখানে আছে, এই অনুমান করা যায়। পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। উপরে যে পরিশিষ্যমান অনুমানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে অন্য সকল বিকল্প বর্জন করিয়া অবশিষ্টের অনুমান হয় বলিয়া উহাকে শেষবৎ বলা যায়।

উদ্যোতকরের মতে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যোতো দৃষ্ট প্রকৃত পক্ষে তিনটি বিভিন্ন অনুমান নহে। একই অনুমানের বিভিন্ন রূপ। (১) পূর্ব্ববৎ অনুমানে যেটি হেতু তাহা যাহা "সাধ্য" (যাহা প্রমাণ করিতে হইবে) তাহার সহিত "পূর্ব্বে" সর্ব্বত্র এক সঙ্গে দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্ববৎ অনুমানের ভিত্তি। শেষবৎ-এর অর্থ এই যে যাহা সাধ্য, তাহা সর্ব্বদাই অন্যান্য (শেষ) ক্ষেত্রে "হেতু"র সহিত একত্র দৃষ্ট হইয়াছে। (৩) সামান্যতো দৃষ্টঃ = সামান্যতঃ + অদৃষ্টঃ। ইহার অর্থ সমান ভাবে অদৃষ্ট। অর্থাৎ হেতু "সাধ্যে"র সহিত ও সাধ্যের "অভাবে"র সহিত উভয়ের সহিত দৃষ্ট হয় না। যেখানে সাধ্য ছিল সেখানে দৃষ্ট হইয়াছে, যেখানে সাধ্য ছিল না, সেখানে দৃষ্ট হয় নাই।

ন্যায়সূত্রে (১।১।৫) "পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টং চ"—ইহার শেষে যে "চ" শব্দ আছে তাহার ব্যাখ্যায় উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে এই সকল অনুমান প্রত্যক্ষ ও আগম বিরোধী হইবে না।

নব্য নৈয়ায়িকগণ স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বিবিধ—অন্বয়-ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। একটি বস্তু থাকিলে অন্যবস্তু যদি তাহার সঙ্গে থাকে (যেমন ধূম ও অগ্নি) তাহা হইলে এই ব্যাপ্তিকে অন্বয় ব্যাপ্তি বলে। দুইটি "অভাব" যদি এরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়, যে এক অভাবের যাহা প্রতিযোগী, তাহা যেখানে দৃষ্ট হয়, সেখানে দ্বিতীয় অভাবের প্রতিযোগী বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে এই ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলে, এবং এই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-মূলক যে অনুমান, তাহাকে শেষবৎ অনুমান বলে। গোত্ব এবং গোত্বাভাব পরস্পরের প্রতিযোগী। ইহাদের একটি যেখানে থাকে, সেখানে অন্যটি থাকিতে পারে না। একটি যেখানে নাই, অপরটি অবশ্য সেখানে থাকিবে। কেননা যে কোনও পদার্থই হউক, হয় তাহা "গো" অথবা গো-ভিন্ন পদার্থ। গো ও নহে, গো-ভিন্নও নহে অথবা তাহা গোও বটে, গো-ভিন্ন পদার্থও

বটে, ইহা হইতে পারে না। অতএব যে পক্ষে (স্থানে) গোত্বাভাব নাই, সেখানে গোত্বাভাবের প্রতিযোগী "গোত্ব" অবশ্য আছে। এইরূপ গলকম্বলত্বের প্রতিযোগী "গলকম্বলত্বাভাব"। গোত্বাভাব ও গলকম্বলত্বাভাবের মধ্যে সম্বন্ধ এই রূপ যে কোন স্থলে গলকম্বলত্বাভাব রূপ অভাবের প্রতিযোগী গলকম্বলত্ব বর্ত্তমান থাকিলে সেখানে গোত্বাভাবের প্রতিযোগী গোত্বের অস্তিত্ব অবশ্য থাকিবে। অর্থাৎ যে স্থানে গলকম্বলত্ব আছে, সে স্থানে গোত্বাভাব নাই, গোত্ব আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা উভয় অভাবের মধ্যে এই সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। গলকম্বলত্বাভাবটি ব্যাপক, গোত্বাভাব তাহার ব্যাপ্য। কেননা গলকম্বলত্বাভাবের অবর্ত্তমানে গোত্বাভাব থাকিতে পারে না। কোনও একটি চতুষ্পদ জন্তু দৃষ্ট হইলে তাহা গো কি না, এই সংশয়-স্থলে তাহার গোত্ব-সাধনের জন্য এই যুক্তি অবলম্বন করা যায়ঃ এই জন্তুর গলকম্বলত্বাভাব দেখা যাইতেছে না। গলকম্বলত্বাভাবের প্রতিযোগী গলকম্বলত্ব দেখা যাইতেছে। সুতরাং গলকম্বলত্বাভাবের সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে স্থিত গোত্বাভাব ইহাতে নাই। গোত্বাভাবের প্রতিযোগী "গোত্ব" আছে। সুতরাং ইহা গো। ইহাই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান। এইপ্রকার বাগাড়ম্বর বর্জন করিয়া সহজ কথায় বলা যায় এই জন্তুতে গলকম্বলত্ব দৃষ্ট হইতেছে। গো ভিন্ন অন্য জন্তুর গলকম্বল নাই, গলকম্বলত্বাভাব আছে। এই জন্তুতে যখন গলকম্বলাভাব নাই, গলকম্বলত্বাভাবের অভাব আছে, তখন ইহা গো, অন্য জন্তু নহে। বাৎস্যায়ন ভাষ্যে "ইহা নয়", "উহা নয়" ইত্যাকার প্রতিষেধপূর্ব্বক অবশিষ্ট এক বস্তুতে অনুমান স্থাপন করাকে ব্যতিরেক অনুমান বলা হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণের ব্যতিরেক অনুমান তাহারই রূপান্তর মাত্র। ইহা যখন সাধ্য ভিন্ন অপর কোনও বস্তু নহে, তখন ইহা গো। ইহাই এই অনুমানের সার। এই ব্যতিরেক অনুমানের মূল প্রতিযোগী-সম্বন্ধ, এবং দুই অভাবের মধ্যে ব্যাপ্তি বিষয়ক জ্ঞান। বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ে যে "অন্যোহন্যাভাব" ও "অত্যন্তাভাব" নামক অভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নব্য নৈয়ায়িকগণ এই প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধের বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তি-জ্ঞানমূলক অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান এবং কেবল ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞানমূলক অনুমান শেষবৎ অনুমান, এবং অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় জ্ঞান-মূলক অনুমান সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান*

---

* স্বামী সন্তদাসজীর দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা প্রথম খণ্ড ৮০-৮২ পৃষ্ঠা।

ন্যায় (Syllogism)

অবরোহিক অনুমান

কোনও বিষয় প্রমাণ করিতে হইলে প্রমেয় ও প্রমাণ সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য আকারে সজ্জিত করিতে হয়। এইভাবে সজ্জিত প্রমেয় ও প্রমাণকে ইংরেজিতে বলে Syllogism। ন্যায় শাস্ত্রে ইহাকে বলে "ন্যায়"। ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব (১) প্রতিজ্ঞা—যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, যেমন "ঐ পর্ব্বতে অগ্নি আছে"। (২) হেতু বা লিঙ্গ। যেমন—"পর্ব্বত হইতে ধূম উঠিতেছে"। (৩) উদাহরণ, যথা "যেখানেই ধূম, সেখানেই অগ্নি, যেমন মহানস" (রন্ধনশালা)। (৪) উপনয় অর্থাৎ যে বাক্য হইতে যে হেতু দ্বারা প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইবে, তাহার অস্তিত্ব বুঝা যায়। যেমন "বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম তাহা পর্ব্বতে বিদ্যমান" (৫) নিগমন বা নির্ণয় অর্থাৎ মীমাংসা-জ্ঞাপক বাক্য, যেমন "সুতরাং ঐ পর্ব্বতে অগ্নি আছে।"

বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্যকার প্রশস্তবাদ এই পাঁচ অবয়বকে ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। (১) প্রতিজ্ঞা, (২) অপদেশ, (৩) নিদর্শন, (৪) অনুসন্ধান ও (৫) প্রত্যাম্নায়। বাৎস্যায়ণ বলেন ন্যায়ের অবয়ব সকলে বিভিন্ন প্রকারের প্রমাণ বর্ণিত হয়। দ্বিতীয় অবয়বে অনুমানের ভিত্তি "হেতু", তৃতীয়ে ব্যাপ্তির ভিত্তি প্রত্যক্ষ উদাহরণ, চতুর্থে উপমান।

প্রতিজ্ঞার দুই অংশ উদ্দেশ্য ও বিধেয়। উদ্দেশ্যের মধ্যে যে বিধেয় আছে, তাহা বলাই প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য। "পর্ব্বতো বহ্নিমান" প্রতিজ্ঞা। পর্ব্বত উদ্দেশ্য (subject), "বহ্নিমান" বিধেয় (predicate)। প্রমাণ করিতে হইবে যে "বহ্নিমত্তা" গুণ পর্ব্বতের আছে। পর্ব্বতকে "পক্ষ" ও "ধর্ম্মী"ও বলে। বহ্নিমান বিধেয়, "সাধ্য" অথবা ধর্ম্ম। ইহাই অনুমেয় অর্থাৎ অনুমানের বিষয়। "ন্যায়ের" উদ্দেশ্য ইহা বলা যে প্রত্যক্ষের বিষয় উদ্দেশ্যে বিধেয়ে বর্ণিত ধর্ম্ম আছে। প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষ-বিরোধী অথবা আগম-বিরোধী হইবে না। দিঙ্‌নাগের মতে যাহার অর্থবোধ হয় না, অথবা যাহা স্ব-বিরোধী অথবা যাহা স্বতঃসিদ্ধ এরূপ বাক্য ন্যায়ের প্রতিজ্ঞা হইতে পারে না। সকল বিচারে প্রথমে প্রতিজ্ঞার "উদ্দেশ্য" বা "পক্ষের" বিশ্লেষণ আবশ্যক। দ্বিতীয় অবয়বে "হেতু" বা "সাধন" বা লিঙ্গ যে পক্ষের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহাই বর্ণিত হয়। অর্থাৎ পক্ষের ধর্ম্ম বর্ণিত হয়। "পর্ব্বতো বহ্নিমান" এই প্রতিজ্ঞার হেতু "ধূমাৎ"—অর্থাৎ "পর্ব্বতো ধূমবান" এই বাক্যে পর্ব্বতের ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। ধূমবান

পর্ব্বতই এখানে পক্ষ। দ্বিতীয় অবয়বে পক্ষের ধর্ম্ম ধূমবত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। "বিধেয়" অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার অস্তিত্ব যাহার মধ্যে সন্দিগ্ধ, সেই উদ্দেশ্যকেই "পক্ষ" বলে। অনুমানের জন্য তিনটি পদের প্রয়োজন—(১) পক্ষ (উদ্দেশ্য) বা অপ্রধান (minor term) পদ। যাহার সম্বন্ধে অনুমান করিতে হইবে; (২) সাধ্য বা প্রধান পদ—যাহা অনুমান করিতে হইবে, এবং (৩) অপ্রধান পদসম্বন্ধে যাহা অনুমিত হয়, তাহার হেতু মধ্যপদ।

কিন্তু পক্ষের (অপ্রধান পদের) মধ্যে মধ্যপদের বিদ্যমানতা হইতে কোনও অনুমান সম্ভবপর হয় না, যদি মধ্যপদ ও প্রধান পদের মধ্যে সার্ব্বিক সম্বন্ধ না থাকে। তৃতীয় অবয়ব "উদাহরণ" দ্বারা এই সার্ব্বিক সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়। ইহাই প্রধান অবয়ব। "যেখানেই ধূম আছে, সেখানেই অগ্নি আছে। যেমন মহানস" এই প্রধান অবয়বই অনুমানের ভিত্তি। কিন্তু এই অবয়বের নাম "উদাহরণ"। মহানসে ধূম আছে, তাহার সঙ্গে বহ্নিও আছে। ইহা একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। ইহা হইতে যেখানেই ধূম আছে, সেখানেই বহ্নি আছে, তাহা প্রমাণিত হয় না। দৃষ্টান্তের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে সর্ব্বত্রই ধূমের সঙ্গে অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকিলেও ধূমের সঙ্গে অগ্নি না থাকা অসম্ভব নহে। সুতরাং যেখানেই ধূম, সেখানেই অগ্নি এই সার্বিক প্রতিজ্ঞার কোনও অচল ভিত্তি নাই। ন্যায়ের তৃতীয় অবয়ব প্রকৃত পক্ষে উপমান। মহানসে ধূমের সঙ্গে বহ্নি থাকে। এই দৃষ্টান্ত হইতে ধূমবান পর্ব্বতেও বহ্নি আছে, অব্যবহিত ভাবেই এই অনুমান করা হয়। এই অর্থে গৌতম সূত্রে তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ বলা হইয়াছে। বাৎস্যায়নের মতও ইহাই। তাহারা মহানসের দৃষ্টান্তকে একটি সাধারণ নিয়মের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সকল অনুমানই বিশেষ হইতে বিশেষে, ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহাদের মত। কয়েকটি বিশেষ বস্তুর মধ্যে যদি একটি সাধারণ ধর্ম্ম থাকে এবং অন্য একটি বা কয়েকটি বিশেষ বস্তুর সহিত যদি তাহাদের আর কয়েকটি ধর্ম্ম সাধারণ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ ধর্ম্মও শেষের বস্তুদিগের আছে। ইহাই সম্ভবতঃ গৌতম ও বাৎস্যায়নের মত। উপমান প্রমাণ হইতেই সম্ভবতঃ ন্যায় দর্শনের "ন্যায়ের" (Syllogism) উদ্ভব হইয়াছিল। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এই ভাবেই অনুমান করি ইহা সত্য। কিন্তু

উপমান দ্বারা প্রকৃত পক্ষে প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হয় না, তাহাদের জন্য সার্বিক বাক্যের প্রয়োজন। লিঙ্গ (হেতু) ও অনুমিত ধর্ম্মের মধ্যে অব্যভিচারী ব্যাপ্তি সম্বন্ধ ব্যতীত কোনও অনুমানই হইতে পারে না। "উদাহরণ" নাম হইতে অনুমান যে আরোহিক ও অবরোহিক (Inductive & deductive) উভয়ই, ইহা প্রমাণিত হয়। দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তির মতে "উদাহরণ" অবয়ব নিষ্প্রয়োজন। তাহা দ্বারা কোনও সার্বিক নিয়ম প্রতিপন্ন হয় না। বরদা রাজার মতে মধ্যপদের পাঁচটি ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক: (১) পক্ষধর্ম্মতা—অপ্রধান পদের (তন্নির্দিষ্ট বস্তুর) মধ্যে তাহার (লিঙ্গের) অবস্থিতি। (পর্ব্বতে ধূম) (২) সপক্ষ-সত্ত্ব—সদৃশ ক্ষেত্রে হেতুর (মধ্যপদ) অবস্থিতি; (৩) বিপক্ষ-সত্ত্ব—বিসদৃশ ক্ষেত্রে হেতুর অনস্তিত্ব (যেমন হ্রদে ধূমের অভাব)। (৪) অবাধিত বিষয়ত্ব—অপ্রধান পদের সহিত সংগতির অভাব না থাকা, এবং (৫) অসৎ প্রতিপক্ষত্ব হেতুর বিরোধী শক্তির অনস্তিত্ব।

অন্নম্‌ভট্টের মতে অনুমান ত্রিবিধ—(১) অন্বয়-ব্যতিরেকী। (২) কেবলান্বয়ী এবং (৩) কেবলব্যতিরেকী। এই ত্রিবিধ অনুমানের উপযোগী মধ্যপদও ত্রিবিধ। অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের মধ্যপদ প্রধানপদের অব্যভিচারী সহচর। যেখানে ধূম, সেখানেই অগ্নি, যেখানে অগ্নির অভাব, সেখানে ধূমেরও অভাব। কেবলান্বয়ী অনুমানের মধ্যপদ কেবল অন্বয়ী, ব্যতিরেকী নহে, যেমন যাহা জ্ঞেয়, তাহা নামদ্বারা বর্ণনা করা যায়। কিন্তু নেতিবাচক বাক্য এখানে প্রয়োজ্য নহে। যাহা নামদ্বারা বর্ণনা করা যায় না, তাহা জ্ঞেয় নহে, এক্ষেত্রে ইহা বলা যায় না। (৩) কেবল ব্যতিরেকী অনুমানে ভাববাচক উদাহরণ সম্ভবপর নহে। যেমন যে সকল বস্তুর জৈবক্রিয়া (animal functions) আছে, তাহাদের আত্মাও আছে, এখানে ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারা যায়, যে যে সকল বস্তুর জৈবক্রিয়া নাই, "যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি" তাহাদের আত্মাও নাই। কিন্তু ইহার ভাবাত্মক দৃষ্টান্ত অপ্রাপ্য, কেননা আত্মা এবং জৈবক্রিয়া-সম্পন্ন বস্তুর ব্যাপ্তি সমান। বেদান্ত পরিভাষার মতে শেষোক্ত প্রকারের ব্যতিরেকী অনুমানকে অর্থাপত্তি বলে, তাহা বাস্তবিক অনুমান নহে। কেননা তাহাতে কোনও সার্ব্বিক তত্ত্ব বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু ন্যায় মতে অভাববাচক সার্ব্বিক (negative universal) হইতে ভাববাচক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।*

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণের ভারতীয় দর্শন—২য় খণ্ড ৭৮—৮০ পৃঃ।

ন্যায়ের চতুর্থ অবয়ব উপনয়ে অপ্রধান পদে হেতুর অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব ব্যক্ত হয়। অস্তিত্ব থাকিলে উপনয় হয় ভাববাচক, অন্যথা অভাববাচক। যেমন পর্ব্বতে ধূম আছে, সুতরাং পর্ব্বত বহ্নিমান ; পর্ব্বতে ধূম নাই, সুতরাং পর্ব্বত বহ্নিমান্ নহে।

ন্যায়ের পঞ্চম অবয়ব নিগমনে প্রথম অবয়বে যাহা প্রামাণ্য, তাহাই প্রমাণিত রূপে ব্যক্ত হয়। যেমন পর্ব্বত বহ্নিমান্।

কোন কোনও নৈয়ায়িক ন্যায়ের উপরি উক্ত পঞ্চ অবয়বের অতিরিক্ত আরও পাঁচ অবয়বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা (১) জিজ্ঞাসা (২) সংশয়, (৩) শক্য-প্রাপ্তি, (৪) প্রয়োজন, ও (৫) সংশয়-ব্যুদাস। বাৎস্যায়ন এই পাঁচটি অবয়বের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে প্রমাণের জন্য তাহাদের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু প্রমাণকালের মানসিক ক্রিয়া তাহাদের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। জিজ্ঞাসার অর্থ প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ অর্থ জানিবার ইচ্ছা, পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গে বহ্নি আছে, অথবা অংশবিশেষে আছে, জানিবার ইচ্ছা। সংশয় হেতু-সম্বন্ধে সংশয় ; যাহা ধূম বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহা কি বাস্তবিক ধূম অথবা অন্য কিছু। "শক্য প্রাপ্তির" অর্থ উদাহরণ বাক্যের প্রতিজ্ঞা-প্রমাণের সামর্থ্য। অগ্নিসম উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ-গোলকের সঙ্গে তো ধূম দেখা যায় না। সুতরাং ধূম কি অগ্নির অব্যভিচারী সহচর? "প্রয়োজনের" অর্থ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য কি? "সংশয়-ব্যুদাসের" অর্থ সকল সন্দেহের নিরসন।

ন্যায়ের পঞ্চ অবয়বের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ অবয়ব অনাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে তিন অবয়বই যথেষ্ট। নাগার্জুন তিন অবয়ববিশিষ্ট ন্যায়ের প্রবর্ত্তন করেন। দিঙ্‌নাগও এই মতাবলম্বী ছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির মতে তৃতীয় অবয়ব উদাহরণেরও প্রয়োজন নাই। পর্ব্বত হইতে ধূম উঠিতেছে, সুতরাং পর্ব্বত বহ্নিমান, ইহাই যথেষ্ট। জৈন মাণিক্যনন্দী এবং দেবসূরীর মতও ইহাই। বেদান্ত পরিভাষার মতে প্রথম তিনটি অবয়ব অথবা শেষ তিনটি অবয়বই যথেষ্ট। বাৎস্যায়ন এবং উদ্দ্যোতকরের মতে যদিও প্রথম ও চতুর্থ অবয়ব প্রমাণের জন্য আবশ্যকীয় নহে, তথাপি বাদানুবাদের (debate) সময় তাহাদের প্রয়োজন আছে। তিন অবয়ব-বিশিষ্ট 'ন্যায়' "স্বার্থানুমানের" জন্য (নিজের জন্য) পর্য্যাপ্ত, কিন্তু "পরার্থানুমানের" জন্য (অন্যকে বুঝাইবার জন্য) পঞ্চ অবয়বের প্রয়োজন।

অনুমানের জন্য অপরিহার্য্য "লিঙ্গপরামর্শ", অর্থাৎ হেতুর যাথার্থ্য নির্ণয়। গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলেন ব্যাপ্তি আনুমানিক জ্ঞানের গৌণ কারণ, লিঙ্গপরামর্শ তাহার করণ বা চরম কারণ।

১৯

পাশ্চাত্ত্য লজিকে ব্যাপ্তি-বিচার

গ্রীক-দার্শনিক আরিষ্টটল "ন্যায়ে"র (Syllogism) মৌলিক তত্ত্ব-স্বরূপ এক স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহা আরিষ্টটলের প্রোক্তি (Dictum) বলিয়া উল্লিখিত হয়। সে উক্তিটি এই—"যাহাই কোনও শ্রেণী-সম্বন্ধে বলা যায়, তাহা ভাববাচক হউক অথবা অভাববাচক হউক, সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের সম্বন্ধে বলা যায়।" মানুষজাতি-সম্বন্ধে যদি বলা যায় যে "মানুষ মরণশীল", তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। যদি বলা যায় "মানুষ অমর নহে", তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে তাহা বলা যায়। দৃশ্যতঃ আরিষ্টটলের প্রোক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। "শ্রেণী" অর্থে যদি কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি বুঝায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তিদিগের দ্বারা সেই শ্রেণী গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই বলা যায়, যাহা সেই শ্রেণী সম্বন্ধে বলা যায়। কিন্তু শ্রেণীর সীমা যদি অনির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে যাহাকে শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া তাহাতে শ্রেণীর গুণ অনুমিত হয়, তাহা বাস্তবিক শ্রেণীর অন্তর্গত কিনা, তাহা দেখিতে হয়। শ্রেণীর গুণ—অর্থাৎ যে যে গুণ থাকিলে কোনও শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হওয়া যায়, তাহাই এখানে দ্রষ্টব্য। সেই জন্যই ন্যায়ের অপ্রধান অবয়বের (Minor Premise) প্রয়োজন।

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই ন্যায়কে পাশ্চাত্য ন্যায় অনুসারে সাজাইলে দাঁড়াইবে :

সর্ব্বে ধূমবন্তঃ পদার্থাঃ বহ্নিমন্তঃ (major premise)
অসৌ পর্ব্বতঃ ধূমবান্ (minor premise)
অতঃ অসৌ পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্॥ (সিদ্ধান্ত)

পাশ্চাত্য লজিকে অনুমান অব্যবহিত ও ব্যবহিত ভেদে দ্বিবিধ। অব্যবহিত অনুমানে কেবল এক বাক্য হইতেই অনুমান করা যায়।

"সকল নর মরণ-ধর্ম্মী" এই বাক্য হইতে "কতকগুলি মরণধর্ম্মী জীব নর", অব্যবহিত ভাবে অনুমান করা যায়। এই ভাবে বাক্যের পরিবর্ত্তনকে "আবর্ত্তন" (Conversion) বলে। ইহাতে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের স্থান পরিবর্ত্তিত হয় এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যাপ্তিরও পরিবর্ত্তন ঘটে।

উপরিউক্ত বাক্যে "নর" পদের ব্যাপ্তি "মরণ-ধর্ম্মী" পদের ব্যাপ্তি হইতে কম বলিয়া "সকল মরণ-ধর্ম্মী জীব নর" এইরূপ অনুমান হইতে পারে না; কিন্তু নঞ্-বাচক "কোন নর অমর নহে" এই অনুমান করা যায়। "কোন কোন জীবের লাঙ্গুল আছে", এই বাক্য হইতে "কোন কোন জীব লাঙ্গুল-হীন নহে", এই অনুমান করা যায়। এই রকম অনুমানকে "ব্যাবর্ত্তন" (obversion) বলে। আবার আবর্ত্তন ও ব্যাবর্ত্তনের সংমিশ্রণে দুই প্রকার মিশ্র অনুমান পাওয়া যায়। তাহাদের একটিকে নিষেধাবর্ত্তন (Conversion by negation) বলে। "সকল পশু স্তন্যপায়ী জীব" হইতে পাওয়া যায় "কোনও অস্তন্যপায়ী জীব পশু নহে"। "স্বার্থমূলক কোনও কার্য্য প্রশংসাযোগ্য নহে" হইতে পাওয়া যায় "সকল প্রশংসা-যোগ্য কার্য্য স্বার্থহীন"।

আর এক প্রকার অব্যবহিত অনুমানকে বলে "বিরুদ্ধাবর্ত্তন" (Coversion by contraposition)। যেমন "সকল মানুষ মরণশীল" হইতে পাওয়া যায় "সকল মৃত্যুহীন সত্ত্ব অমানুষ।"

অন্য এক প্রকার অব্যবহিত অনুমানকে বলে অন্তরাবর্ত্তন (Inversion)। যেমন "কোনও পক্ষী স্তন্যপায়ী নহে" হইতে "কোনও কোনও "অপক্ষী" (পক্ষী ব্যতিরিক্ত জন্তু) স্তন্যপায়ী"।

পাশ্চাত্য লজিকে ব্যবহিত অনুমানে (syllogism) চারিটি (figure) রূপ বর্ণিত হইয়াছে। যেমন—

I

সকল মানুষ মরণধর্ম্মী
সকল রাজা মানুষ
∴ সকল রাজা মরণ-ধর্ম্মী

II

কোনও দেবদূতই মরণধর্ম্মী নহে
সকল মানুষ মরণধর্ম্মী
∴ কোনও মানুষই দেবদূত নহে

III

সকল মানুষ ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানবিশিষ্ট
সকল মানুষ অপূর্ণ
∴ কতকগুলি অপূর্ণ জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বিশিষ্ট

IV

সকল দার্শনিকই মানুষ
কোনও মানুষ পূর্ণ নহে
∴ কোনও পূর্ণ জীব দার্শনিক নহে।

এই সমস্ত রূপের কয়েকটি অলঙ্ঘণীয় নিয়ম এই : (১) প্রত্যেক রূপে তিনটি পদ (terms) এবং তিনটি বাক্য থাকিবে। (২) মধ্যপদের (minor term) ব্যাপ্তি অন্ততঃ এক বাক্যে সামগ্রিক (distributed) হওয়া চাই। তাহা না হইলে অসামগ্রিক মধ্যপদ (undistributed middle) নামক আভাসের উদ্‌ভব হয়। (৩) প্রধান বা অপ্রধান বাক্যে যে পদের ব্যাপ্তি সামগ্রিক নহে, সিদ্ধান্তে তাহার সামগ্রিক ব্যাপ্তি হইতে পারিবে না।

সমস্ত মানুষই প্রাণী
কোন কুকুরই মানুষ নহে,
∴ কোন কুকুর প্রাণী নহে।

এই ন্যায় দোষ-দুষ্ট। কেননা "প্রাণী" পদের ব্যাপ্তি নিগমনে সামগ্রিক, কিন্তু অন্য বাক্যে আংশিক।

(৪) দুইটি বাক্যের অন্ততঃ একটি ভাববাচক (affirmative) হওয়া চাই।

(৫) যদি একটি অবয়ব নঞবাচক থাকে, নিগমন নঞবাচক হইবে। যদি উভয় অবয়ব ভাববাচক থাকে, সিদ্ধান্ত ভাববাচক হইবে।

(৬) দুইটী আংশিক ব্যাপ্তিমূলক অবয়ব হইতে কোনও সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নহে। কেবল একটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যভিচার হইতে পারে। "অধিকাংশ লোকই সৎ," এবং "অধিকাংশ লোকই বুদ্ধিমান"। এই দুই পদ হইতে "কতকগুলি লোক সৎ ও বুদ্ধিমান্ উভয়ই" এই সিদ্ধান্ত অসম্ভব নহে।

(৭) একটি অবয়বের ব্যাপ্তি আংশিক হইলে (Particular premise), সিদ্ধান্তের ব্যাপ্তিও আংশিক হইবে।

(৮) আংশিক ব্যাপ্তিমূলক প্রধান অবয়ব এবং নঞবাচক অপ্রধান অবয়ব হইতে কোনও অনুমান সম্ভবপর নহে।

উপরিউক্ত নিয়মগুলির লঙ্ঘন হইতে বিভিন্ন আভাসের (fallacy) উদ্‌ভব হয়।

উপরিউক্ত চারি আকারের প্রত্যেকের কয়েকটী করিয়া 'বিধা'র বর্ণনা আছে।

চতুর্বিধ প্রথম আকারের (Figure) চারিটি বিধা (Mood) এইরূপ—

I	II
সকল মানুষই বুদ্ধিমান	কোনও মানুষ দেবতা নহে
সকল নরপতিই মানুষ।	সকল নরপতিই মানুষ।
∴ সকল নরপতিই বুদ্ধিমান।	∴ কোনও নরপতিই দেবতা নহে।

III	IV
সকল মানুষই বুদ্ধিমান	কোনও মানুষই দেবতা নহে
কতিপয় প্রাণী মানুষ	কতিপয় প্রাণী মানুষ
∴ কতিপয় প্রাণী বুদ্ধিমান।	∴ কতিপয় প্রাণী দেবতা নহে।

চতুর্বিধ দ্বিতীয় আকারের চারি বিধা :

I	II
কোনও দেবতাই মানুষ নহে	সকল নরপতিই মানুষ
সকল নরপতিই মানুষ	কোনও দেবতা মানুষ নহে
∴ কোনও নরপতিই দেবতা নহে।	∴ কোনও দেবতা নরপতি নহে।

III	IV
কোনও দেবতা মানুষ নহে	সকল দেবতাই মানুষ
কতিপয় প্রাণী মানুষ	কতিপয় প্রাণী মানুষ নহে
∴ কতিপয় প্রাণী দেবতা নহে।	∴ কতিপয় প্রাণী দেবতা নহে।

ষড়্বিধ তৃতীয় আকারের ছয় বিধা :

I	II
সকল মানুষ বুদ্ধিমান	কতিপয় মানুষ নরপতি
সকল মানুষ প্রাণী	সকল মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী
∴ কতিপয় প্রাণী বুদ্ধিমান।	∴ কতিপয় বুদ্ধিমান প্রাণী নরপতি।

III	IV
সকল মানুষ বুদ্ধিমান	কোনও মানুষ দেবতা নহে
কতিপয় মানুষ নরপতি	সকল মানুষ প্রাণী
∴ কতিপয় নরপতি বুদ্ধিমান	∴ কতিপয় প্রাণী দেবতা নহে।

V	VI
কতিপয় মানুষ নরপতি নহে	কোনও মানুষ দেবতা নহে
সকল মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী	কতিপয় মানুষ জ্ঞানবান্ প্রাণী
∴ কতিপয় বুদ্ধিমান প্রাণী নরপতি নহে	∴ কতিপয় জ্ঞানবান্ প্রাণী দেবতা নহে।

পঞ্চবিধ চতুর্থ আকারের বিধা :

I	II
সকল রাজা মানুষ	সকল নরপতি মানুষ
সকল মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী	কোনও মানুষ দেবতা নহে
∴ কতিপয় বুদ্ধিমান প্রাণী রাজা।	∴ কোনও দেবতা নরপতি নহে।

III	IV
কতিপয় জীবন্ত বস্তু মানুষ	কোনও দেবতা মানুষ নহে
সকল মানুষ বুদ্ধিমান বস্তু	সকল মানুষ জীবন্ত বস্তু
∴ কতিপয় বুদ্ধিমান বস্তু জীবন্ত বস্তু।	∴ কতিপয় জীবন্ত বস্তু দেবতা নহে।

V

কোনও দেবতা মানুষ নহে

কতিপয় মানুষ জীবন্ত বস্তু

∴ কতিপয় জীবন্ত বস্তু দেবতা নহে।

এই চারি আকারের অন্তর্গত উনিশটি বিধা মনে রাখিবার সুবিধার জন্য তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে :

প্রথম আকার—(1) Barbara, (2) Celarent, (3) Darii, (4) Ferio.

দ্বিতীয় আকার—(1) Cesare, (2) Camestres, (3) Festino, (4) Baroko.

তৃতীয় আকার—(1) Darapti, (2) Disamis, (3) Datisii, (4) Felapton, (5) Bokardo, (6) Ferison.

চতুর্থ আকার—(1) Bramantip, (2) Camenes, (3) Dimaris, (4) Fesapo, (5) Fresison.

এই সকল নামের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির কোনও অর্থ নাই, তাহারা স্বরবর্ণদিগের বাহন মাত্র। স্বরবর্ণদিগের মধ্যে A, E, I ও O এই চারিটি মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। A ভাব বাচক সার্বিকের প্রতীক। E অভাব বাচক সার্বিকের, I ভাব বাচক বিশেষের এবং O অভাব বাচক বিশেষের প্রতীক।

Syllogism এর এতগুলি রূপদ্বারা বুদ্ধির প্রাখর্য্য সাধিত হইলেও কার্য্য ক্ষেত্রে ইহাদের প্রয়োজন সামান্য। গোম্‌পার্জ (Gomperz) লিখিয়াছেন "এত পরিশ্রম করিয়া আরিষ্টটল চিন্তার এই সকল রূপের উদ্‌ভাবন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে কোনও গ্রন্থেই তিনি তাহাদের ব্যবহার করেন নাই। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তাহার উদ্‌ভাবিত ১৯টি রূপ সামান্য কয়েকটিতে পরিণত করা যায়।"

ন্যায়দর্শনে এই সকল রূপের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু "ব্যাপ্তির" নির্ভুল ব্যবহার দ্বারা সকল ক্ষেত্রেই সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

আরিষ্টটলের Syllogism এর বিশ্লেষণের সহিত ন্যায় দর্শনের বিশ্লেষণের অনেক সাদৃশ্য আছে। আরিষ্টটলের Syllogism এ তিন পদ। ন্যায়দর্শনের ন্যায়েও তিন পদ। এই সাদৃশ্য দেখিয়া ডাঃ সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন Syllogism এর জন্য হিন্দুগণ আরিষ্টটলের নিকট ঋণী। কীথ (Keith) বলেন "কণাদের ও গৌতমের Syllogism ভারতেই উদ্‌ভূত হইলেও, তাহা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত নহে। দিঙ্‌নাগই প্রথমে উপমানের (উদাহরণের) স্থানে সার্বিক সাহচর্য্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্ষেত্রে গ্রীক প্রভাব ছিল, ইহা মনে করা অযৌক্তিক নহে।" দিঙ্‌নাগের দুই শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্য দেব গ্রীক ফলিত জ্যোতিষের সহিত পরিচিত ছিলেন। ভরতশাস্ত্রেও (নাট্যশাস্ত্র) গ্রীক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মাক্ষমূলর ভারতীয় দর্শনের উপর গ্রীক প্রভাব এবং গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় প্রভাব উভয়ই অস্বীকার করিয়াছেন।

(২০)

আরোহিক অনুমান (Induction)

ন্যায়ের প্রধান এবং অপ্রধান দুইটি বাক্যই যদি সত্য হয়, তবেই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অপ্রধান বাক্য অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধান বাক্যের ভিত্তি কি?

সকল মানুষ মরণধর্ম্মী, রাম একটি মানুষ, সুতরাং রামও মরণধর্মী। এই ন্যায়ের দ্বিতীয় অবয়ব অভিজ্ঞতালব্ধ, কিন্তু সকল মানুষই যে মরণ-ধর্ম্মী, তাহা অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত-হওয়া অসম্ভব। ভবিষ্যৎ তো অভিজ্ঞতার বিষয় নহেই, অতীতে যে সকল মানুষ জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেককে মরিতে দেখিয়াছি, অনেকে এখনও বাঁচিয়া আছে। যাহারা মরিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাদের মরণ আমি দেখি নাই। তাহারা যে বাস্তবিক মরিয়াছে, তাহাদের কেহই যে বাঁচিয়া নাই, তাহার প্রমাণ কোথায়? ন্যায়শাস্ত্রে সাধারণ প্রতিজ্ঞার অব্যবহিত জ্ঞানের (Intuition) কথা আছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায় সামান্য-লক্ষণ জ্ঞানকে (সার্বিক জ্ঞান) অলৌকিক প্রত্যক্ষের এক রূপ বলিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের মতে সার্বিকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ধূমবত্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে যাবতীয় ধূমের জ্ঞান হয়। অগ্নি ও ধূমের সার্বিক জ্ঞান "সামান্য-লক্ষণ প্রত্যয়াসত্তি" দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষদ্বারা

আমরা অগ্নি ও ধূমের অব্যভিচারী সম্বন্ধের জ্ঞান প্রাপ্ত হই। এক উদাহরণের বিশ্লেষণদ্বারাই আমরা সার্বিক সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করিতে পারি, এবং সেই ক্ষেত্রে যাহা সত্য, সদৃশ সকল ক্ষেত্রেই তাহা সত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার কারণ তাহাদের স্বরূপের অভিন্নতা। যাহা একবার সত্য হয়, তাহা সর্ব্বকালেই সত্য, কেননা যখন অগ্নি ও ধূমের উল্লেখ করি, তখন কোনও বিশিষ্ট অগ্নি ও ধূমের উল্লেখ করিনা, তখন তাহাদের স্বরূপগত গুণের কথাই আমাদের বাচ্য। তাহাদের স্বরূপ ব্যাপ্তিতে ব্যাপক ও ব্যাপ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এক মাত্র ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলেই সার্বিক সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ করা যায়। প্রথমবারে যদি এই জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে বারংবার প্রত্যক্ষেও সে জ্ঞান হইতে পারে না। এই জ্ঞান বুদ্ধিকর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে। ইহা বিষয়ী অব্যবহিত ভাবে প্রাপ্ত হয়। ইহা ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা হইতে ভিন্ন। পরীক্ষাদ্বারা ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। প্রাকৃতিক প্রত্যেক বস্তু যে নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা, অর্থাৎ তাহার অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ, সেই বস্তুর মধ্যে নিহিত। অব্যবহিত জ্ঞানে তাহা প্রকাশিত হয়। বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম তাহার আগন্তুক-ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে অব্যবহিত জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা বস্তুদিগের মতই সত্য। সার্বিক বাক্যসকল শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদিগের গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। অব্যবহিত জ্ঞানে বস্তুর স্বরূপগত গুণের প্রকাশই তাহাদের ভিত্তি। যখন কোনও সার্বিক বাক্য হইতে কোনও বিশেষ সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন সেই সিদ্ধান্তকে এক হিসাবে প্রধান ও অপ্রধান বাক্যের অতিক্রান্ত বলা যায় (গণনার দিক হইতে)। অন্য হিসাবে (স্বরূপ গুণের দিক হইতে) তাহা তাহার অন্তর্ভুক্ত। ন্যায় মতে সার্বিকগণ (universals) সতের বহির্ভূত নহে। সার্বিক সম্বন্ধও সৎ।

কিন্তু সার্বিক সম্বন্ধ যদি বাস্তবিক সৎ হয়, এবং অব্যবহিত জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আমাদের রচিত সার্বিক বাক্যসকল সকল সময় সত্য হয় না কেন? ইহার কারণ সতের মধ্যে জটিলতা এত অধিক যে সম্বন্ধদিগের মধ্যে ভেদ লক্ষ্য করা অনেক সময় কঠিন হয়। পূর্ব্ব সংস্কার, চিত্তাবেগ, আলস্য ও চিন্তাহীনতার ফলে অসত্য বাক্যদিগকে আমরা অনেক সময় সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। একই কারণে বিশেষ (particular) বাক্যও ভ্রান্ত হইতে পারে। এই জন্যই অব্যবহিত জ্ঞানমূলক সাধারণ প্রতিজ্ঞাসকলের পরীক্ষার প্রয়োজন। অপরীক্ষিত সাধারণ প্রতিজ্ঞা একটি

"মত" (hypothesis) মাত্র। তাহার মূল্য অধিক নহে। পরীক্ষার জন্য ভূয়োদর্শন আবশ্যক। অব্যভিচারী সাহচর্য্য সাধারণ প্রতিজ্ঞার ভিত্তি। যেখানেই অগ্নি সেখানেই ধূমের প্রত্যক্ষ যথেষ্ট নহে; যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূমও আছে কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে। নিয়ত সাহচর্য্যের সহিত অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ থাকিলে, উপাধি-(আগন্তুক) বর্জ্জিত সাহচর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। (যে বস্তু তাহার নিকটস্থ অন্য বস্তুতে তাহার গুণ সংক্রমণ করে, তাহাই উপাধি। উপসমীপবর্ত্তিনি আদধাতি সংক্রাময়তি স্বীয়ং ধর্ম্মং ইতি উপাধিঃ—উদয়ন)। আগন্তুক কারণের বিদ্যমানতা থাকিলেই সিদ্ধান্ত দুষ্ট হয় না। কিন্তু এই কারণ যথোচিত বিবেচিত না হইলে ভ্রান্তি হয়। ধূমের সঙ্গে অগ্নি সকল সময়েই থাকে। কিন্তু কেবল আর্দ্র কাষ্ঠ সংবলিত অগ্নির সঙ্গেই ধূম থাকে। অগ্নি যখন লৌহগোলকে সংশ্লিষ্ট থাকে, তখন ধূম থাকে না। সুতরাং অগ্নির সহিত ধূমের সম্বন্ধ অব্যভিচারী নহে; কিন্তু ধূমের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ অব্যভিচারী। সুতরাং পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমানে ভুল নাই, কিন্তু অগ্নি দেখিয়া ধূমের অনুমান ঠিক নহে।

সার্বিক সম্বন্ধের ধারণা যে অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয় বস্তুদিগের স্বরূপের অভিন্নতার প্রত্যক্ষপূর্ব্ব সম্প্রত্যয় হইতে, দিঙ্‌নাগ্‌ ইহা স্বীকার করেন না। দিঙ্‌নাগের মতে জ্ঞানে বিজ্ঞান-বাহ্য সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় না। সমবায় ও সার (essence), গুণ এবং তাহার আধারের সম্বন্ধ বিজ্ঞান-মাত্র।

২১

কারণ ও কার্য্য—অসৎকার্য্যবাদ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কারণ হইতে কার্য্যের অনুমান "পূর্ব্ববৎ অনুমান"। এই অনুমানের ভিত্তি পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা। কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই পূর্ব্ববর্ত্তিতা নিয়ত। অভিজ্ঞতায় ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। মেঘ বৃষ্টির কারণ। যখনই বৃষ্টি হয়, তাহার পূর্ব্বে আকাশে মেঘ হয়। বিনা মেঘে বৃষ্টি কখনও দৃষ্ট হয় নাই। প্রকৃতির কার্য্য তাহার নিয়মদ্বারা চালিত হয়। এই নিয়মের ব্যভিচার কখনও দেখা যায় না। একটি ঘটনার পূর্ব্বে আর একটি ঘটনা ঘটে, ইহা দেখিয়া উভয় ঘটনার মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধের ধারণা হয়। তাই

আকাশে যখন মেঘ হয়, তখন বৃষ্টি হইবে, এই অনুমান করি। কার্য্যের কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই কারণ-ঘটনা কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অন্বয়-ব্যতিরেকী। কারণ বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি এবং কারণের অভাবে কার্য্যের অনুৎপত্তি, এই উভয় সম্বন্ধই কারণত্বের জন্য দরকার। কিন্তু সকল মেঘ হইতেই বৃষ্টি হয় না, ইহা দেখা যায়। ইহার কারণ কেবল-মাত্র মেঘই বৃষ্টির কারণ নহে। সহকারী কারণ না থাকিলে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। এখানে সহকারী কারণ বাতাসের শৈত্য।

নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্ব-সম্বন্ধ-বিহীনও হইতে পারে—"অন্যথা-সিদ্ধ" হইতে পারে। কুম্ভকারের যষ্টি ঘটের একটি কারণ বটে, কিন্তু সেই যষ্টির বর্ণ ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও কারণত্ব-বর্জিত। কোনও কার্য্যের কারণ-কর্ত্তৃক একই সময়ে উৎপন্ন অন্য কার্য্য পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের কারণ নহে। কুম্ভ-কারের যষ্টিকর্ত্তৃক উৎপন্ন শব্দ ঘটের কারণ নহে।

কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আবির্ভূত হয় না। অভিজ্ঞতায় কেবল কারণের পূর্ব্ববর্ত্তিতা এবং কার্য্যের পরবর্ত্তিতা উপলব্ধ হয়। ইহা হইতে বুদ্ধির সাহায্যে কার্য্য-কারণত্বের জ্ঞান হয়। ন্যায় মতে এক কার্য্যের কারণ এক মাত্র। বিভিন্ন কারণ হইতে এক কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। পিপীলিকাগণ যখন তাহাদের ডিম মুখে করিয়া যাইতে থাকে, দেখা যায়, তখন তাহার কারণ আসন্ন বৃষ্টি, অথবা তাহাদের বাসার ধ্বংস হইতে পারে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে পিপীলিকাদিগের ডিম্ববহন প্রণালী ভিন্ন। এই প্রণালীর ভেদ লক্ষ্য করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুমেয় কারণ একাধিক হইতে পারে না। নদীতে যখন জলোচ্ছ্বাস হয় তখন তাহার কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৃষ্টিপাত এবং নদীর এক অংশে বাঁধের অস্তিত্ব উভয়ই হইতে পারে। কিন্তু জলোচ্ছ্বাসের প্রকৃতি দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন। কার্য্যের বিশেষত্ব হইতে কারণের বিশেষত্ব অনুমিত হয়। কিন্তু কোনও কোনও নৈয়ায়িক একাধিক কারণও স্বীকার করিয়াছেন।

কারণ ত্রিবিধ: (১) উপাদান অথবা সমবায়ী কারণ, (২) অসমবায়ী কারণ, এবং (৩) নিমিত্ত কারণ। বস্ত্রের উপাদান সূত্র তাহার উপাদান কারণ, মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ। বয়ন (সূত্রদিগের সংযোগ) বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ।

সূত্রের বর্ণও রঙ্গীন বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ। উপাদান কারণ দ্রব্য, অসমবায়ী কারণ গুণ বা কর্ম্ম। যে শক্তি দ্বারা কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি

হয়, তাহা নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকারের চক্র ও যষ্টি সহকারী কারণ। আরিষ্টট্‌ল যে তিনপ্রকার কারণের উল্লেখ করিয়াছেন —material, formal, efficient causes—তাহাদের সহিত ন্যায়ের মিল আছে।

উপরিউক্ত তিন কারণ ব্যতীত "করণ" নামক কারণেরও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়গণ "করণ" কারণ। কুম্ভকারের যষ্টি ঘটের "করণ" কারণ। "ব্যাপারবৎ" করণ, অর্থাৎ কার্য্যে ব্যাপৃত (নিশ্চেষ্ট অবস্থায় নহে) "করণ" কারণ মধ্যে গণ্য। কাহারও কাহারও মতে করণ-বস্তু নহে, তাহার সক্রিয়তাই "করণ" কারণ।

পরবর্ত্তী ন্যায়শাস্ত্রে কার্য্যকে "প্রাগভাব-প্রতিযোগী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মত সাংখ্য ও বেদান্তের বিরোধী। ইহাকে "আরম্ভ-বাদ" বা "অসৎকার্য্য-বাদ" বলে। সাংখ্য ও বেদান্ত মতে যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উদ্ভব হইতে পারে না এবং কার্য্য কারণের মধ্যে শক্য ভাবে বর্ত্তমান থাকে, অনুকূল অবস্থায় প্রকাশিত হয়। বীজ বৃক্ষের কারণ। বৃক্ষ শক্য অবস্থায় বীজের মধ্যে থাকে। মৃত্তিকায় বীজ উপ্ত হইলে অনুকূল অবস্থায় বৃক্ষের উদ্গম হয়। ন্যায় ও বৈশেষিক ইহা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে কারণের মধ্যে কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। কার্য্যের উৎপাদন করিয়া কারণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ন্যায়মতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় নিত্য নূতন রূপ উৎপন্ন হইতেছে। বৌদ্ধ মতেও কার্য্যের উদ্ভবের পূর্ব্বে তাহা অস্তিত্বহীন। বেদান্ত ও সাংখ্য মতের সমালোচনায় ন্যায় বলেন, বস্ত্রের উৎপত্তির পূর্ব্বে যদি সূত্রের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব ছিল, তবে তাহা আমরা দেখিতে পাই না কেন? সূত্রগুলি যদি বস্ত্র হইত, তাহা হইলে তাহা আমরা পরিতে পারি না কেন? যদি বল তখন বস্ত্র প্রকাশিত থাকে না, তাহা হইলে বলিব প্রকাশিত না হওয়ার অর্থ যে-রূপে বস্ত্র প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং কার্য্যে লাগিতে পারে, তাহার অভাব। এই অভাবের অর্থ কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার অভাব। যাহা কোনও এক বিশিষ্ট রূপে বর্ত্তমান ছিল না, কারণ দ্বারা তাহারই উৎপত্তি হয়। কারণের সহিত কার্য্যের রূপ, শক্তি এবং অবস্থানের ভেদ থাকে। সাংখ্য মতে জগতের কারণ প্রকৃতি, অদৃশ্য প্রকৃতি হইতে জগৎ উদ্ভূত। সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ যদি সত্য হইত, কারণ ও কার্য্যের মধ্যে যদি ভেদ না থাকিত, তাহা হইলে প্রকৃতির মতই জগৎ অপ্রত্যক্ষ হইত। দুগ্ধ যখন দধিতে পরিণত হয়, তখন দুগ্ধের ধ্বংস হয় না, পরিবর্ত্তন-মাত্র হয়, এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। যখন

এক বস্তুর পরমাণুদিগের নূতন সংস্থানবশতঃ নূতন এক বস্তুর উদ্ভব হয়, তখন পূর্ব্ব বস্তুর অভাব হইতে তাহার ধ্বংস অনুমান করা সংগত। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন যে কারণ-বস্তুর সম্পূর্ণ ধ্বংস হইলে নূতন বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব হয়। সুতরাং কারণ ধ্বংস-প্রাপ্ত না হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহা বলাই যুক্তি-সঙ্গত। নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করিতে কুন্ঠিত। কিন্তু ন্যায় মতে প্রত্যেক বস্তুর উপাদান পরমাণু, এবং পরমাণুগণ নিত্য। কারণ-বস্তুর পরমাণুগণ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং কারণ হইতে কার্য্যের উদভবের সময় কারণের পরমাণুগণের সংস্থানের পরিবর্ত্তন হইয়া সেই পরমাণুদিগের দ্বারাই কার্য্য সাধিত হয়, এবং কারণের রূপের ও গুণের পরিবর্ত্তন হয়, তাহার ধ্বংস হয় না, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই নূতন রূপ ও গুণ সম্পূর্ণ নূতন অথবা তাহারা কারণের মধ্যে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। বৃক্ষের রূপ ও গুণ যদি বীজের মধ্যে শক্য ভাবে না থাকে, তাহা হইলে সে বীজ হইতে বৃক্ষ ভিন্ন অন্য কিছুর উদ্ভব হয় না কেন, এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে নৈয়ায়িক অক্ষম।

ন্যায় দর্শনের আরম্ভবাদের সমালোচনায় সাংখ্য বলেন যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার সৃষ্টি অসম্ভব। কার্য্যের যাহা উপাদান কারণ, তাহা কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ, যেমন তিল ও তৈল। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার সহিত কোনও সম্বন্ধই সম্ভবপর নহে। সুতরাং কার্য্য কারণের মধ্যে থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্যের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, কারণ কার্য্যের উৎপাদন করিতে পারে, ইহা বলা যায় না। কেননা তাহা হইলে যে কোনও কারণ হইতে যে কোনও কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারিত। যদি বল কার্য্যের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও কারণের মধ্যস্থিত এক শক্তিদ্বারা কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই শক্তি যদি কার্য্যের সহিত সংবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কারণের মধ্যে কার্য্যের পূর্ব্বাস্তিত্বই স্বীকার করা হইল। যদি কার্য্যের সহিত সেই শক্তির সংস্পর্শ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদ্বারা কেবল সেই কার্য্যই উৎপন্ন হয় কেন, তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন কার্য্য যদি কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইবে কিসের দ্বারা? ন্যায় বলেন কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কারণ ও কার্য্য রূপে চিনিবার উপায় কি?

মীমাংসা দর্শনের মতে কারণের মধ্যে অবস্থিত এক অদৃশ্য শক্তিদ্বারা কার্য্য উৎপন্ন হয়। ন্যায় ইহা স্বীকার করেন না। ন্যায়-মতে অণুদিগের পরিস্পন্দ (molecular movement) দ্বারা কার্য্যোৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায়। ন্যায় নিষ্ক্রিয় শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোনও কার্য্যের বিভিন্ন কারণের ক্রিয়ার ফলই কার্য্য, এবং এই সকল ক্রিয়া পরিস্পন্দরূপ, তাহারা ব্যক্ত শক্তির ক্রিয়া, অব্যক্ত কিছু নহে। দিক্, কাল, ঈশ্বরেচ্ছা ও অদৃষ্ট, ইহারা "কার্য্যত্ব-প্রয়োজক", অর্থাৎ সকল কার্য্যের সাধারণ কারণ। ইহাদের অতিরিক্ত যে সকল কারণকর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহারা অসাধারণ কারণ। কারণের মধ্যে "কারণ-সামগ্রী"র অতিরিক্ত—অর্থাৎ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সমূহের অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় কিছু নাই, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাদিগের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন ফলের অতিরিক্ত কিছু কার্য্যের মধ্যে নাই।

২২

উপমান

জ্ঞাত কোনও বস্তুর সহিত অজ্ঞাত কোনও বস্তুর সাদৃশ্যের জ্ঞান হইতে অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান লাভ করা যায়। অজ্ঞাত বস্তুর এই জ্ঞানলাভের উপায়কে উপমান বলে। শব্দ ও তাহার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান উপমান প্রমাণ হইতেই লব্ধ হয়। এই প্রকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম উপমিতি।

"গবয়" (বন্য গোরু) শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া অধ্যাপক বলিলেন "গো-সদৃশো গবয়শব্দবাচ্যঃ"—যাহা গোরুর মত, তাহাই 'গবয়' শব্দের অর্থ। ছাত্র ইতিপূর্ব্বে গবয় দেখে নাই, কিন্তু গোরু দেখিয়াছে। পরে একদিন পশুশালায় গিয়া একটি জন্তুতে গোরুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবামাত্র অধ্যাপকের উপদেশ মনে পড়িল—"গোরুর মতো গবয়"। তখন সেই পূর্ব্বে অজ্ঞাত জন্তুকে গবয় বলিয়া চিনিল। এই জ্ঞানের ভিত্তি অজ্ঞাত বস্তুর বর্ণনা, এবং পরে কোনও অজ্ঞাত বস্তুর সহিত সেই বর্ণনার সাদৃশ্যের উপলব্ধি।

ন্যায়দর্শনে ব্যাখ্যাত "উপমান" ভারতীয় সকল দর্শনে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। চার্ব্বাকপন্থিগণের মতে উপমানদ্বারা শব্দের ব্যাপ্তির সত্য জ্ঞান লাভ হয় না। বৌদ্ধদিগের মতে উপমান প্রত্যক্ষ ও অন্যের

সাদৃশ্যের অতিরিক্ত কিছু নহে। সুতরাং ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই। সাংখ্য ও বৈশেষিক উপমানকে অনুমানেরই এক রূপ বলেন। জৈন দার্শনিকের মতে উপমান এক প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা। মীমাংসক এবং বেদান্তী উপমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ন্যায়ের ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন।

পরবর্তী নৈয়ায়িকগণের মতে শব্দের অর্থ শুনিয়া তাহার বাচ্য বস্তুকে তাহার দর্শনকালে চিনিবার জন্য সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়েরই প্রয়োজন। অশ্বের ক্ষুর গোরুর ক্ষুরের মত দ্বিধা বিভক্ত নহে, দেখিয়া অশ্বকে গোরু হইতে ভিন্ন "অশ্ব" বলিয়া চিনিতে পারা যায়। এই ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই উপমান প্রমাণের অন্তর্গত।

অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান-লাভের জন্য উপমান প্রমাণের ব্যবহার হয়।

২৩

শব্দ

আমাদের সকল জ্ঞান কেবল যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে আমরা লাভ করি তাহা নহে। অন্যের অর্জিত জ্ঞান আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। অন্যের উচ্চারিত শব্দ বা বাক্য হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই শাব্দিক জ্ঞান। কিন্তু অন্যের নিকট শ্রুত সকল কথাই সত্য হয় না। তাই যথার্থ জ্ঞানের উৎপাদক শব্দই শব্দ-প্রমাণ। যিনি সত্যবাদী, যিনি সত্যদর্শী, প্রবঞ্চনা যাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ, যাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই এই রূপ ব্যক্তির বাক্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহাই শব্দ প্রমাণ। কিন্তু এতাদৃশ ব্যক্তির বাক্যের অর্থবোধ না হইলে সত্যজ্ঞান হয় না। সুতরাং শব্দ-প্রমাণ হইতে জ্ঞান-লাভের জন্য প্রমাণরূপ বাক্যের অর্থবোধ আবশ্যক।

দৃষ্টার্থ (প্রত্যক্ষ) ও অদৃষ্টার্থ (অপ্রত্যক্ষ) ভেদে শব্দ দ্বিবিধ। দৃষ্টার্থ শব্দ বিশ্বাসযোগ্য লোকের প্রত্যক্ষ বিষয়-সম্বন্ধী বাক্য। আদালতে সাক্ষীর বাক্য, কৃষিজাত দ্রব্য-সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কৃষকের বাক্য, এবং প্রত্যক্ষ বিষয়-সম্বন্ধে বেদের বাক্য। অপ্রত্যক্ষ বিষয়-সম্বন্ধে বেদের, বৈজ্ঞানিকদিগের, মহাপুরুষদিগের ও বিশ্বাসযোগ্য সাধারণ লোকের বাক্য, অদৃষ্টার্থ শব্দ। ঈশ্বর-সম্বন্ধে বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে

মহাপুরুষগণ যাহা বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণু, ইলেক্‌ট্রণ, ইথার প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাব্দ প্রমাণ।

অন্য মতে বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ দ্বিবিধ। বৈদিক শব্দে ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত; সুতরাং তাহা ভ্রমপ্রমাদরহিত। কিন্তু লৌকিক শব্দ সেরূপ নির্ভরযোগ্য নহে। যাহারা সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলেন না, লৌকিক শব্দের মধ্যে কেবল তাঁহাদের বাক্যই গ্রহণযোগ্য।

বৈদিক ক্রিয়াসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে তাহাদের যে সকল ফল প্রত্যক্ষগম্য, তাহারা প্রত্যক্ষীভূত হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় (উপমান প্রামাণ্য) যে ঐ সকল ক্রিয়ার পারলৌকিক ফলসকলও ঘটিবে। মন্ত্রসকল ঔষধির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া বেদের অপরাংশের যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

গৌতম সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে শব্দের অনিত্যত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। (১) শব্দের উৎপত্তি হয়, বিনাশও হয়। শব্দ যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদাই শোনা যাইত। বাৎস্যায়ন বলেন প্রত্যেক শব্দের মধ্যে এক একটি ধ্বনি-শ্রেণী আছে। সেই শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ধ্বনি পরবর্ত্তী ধ্বনিকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। শেষ ধ্বনি অন্য কিছুর বাধা প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। বাচস্পতির মতে আকাশই এই প্রতিবন্ধক। শব্দ আকাশের গুণ। আকাশের যখন স্থূল বস্তুর সহিত সংঘর্ষ হয়, তখন তাহার শব্দ-উৎপাদন-ক্রিয়া স্থগিত হয়। (২) শব্দ "শব্দত্ব"-জাতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অনিত্য। (৩) উৎপন্ন দ্রব্যের অনেক গুণ শব্দে আরোপিত হয়। যেমন গাম্ভীর্য্য, তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া শব্দ অনিত্য। (৪) শিক্ষকের উচ্চারিত শব্দ শিষ্য উচ্চারণ করে। ইহা দ্বারা শব্দের পূর্ব্ব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। শব্দ যখন শ্রুত হয় না, তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে না। (৫) শব্দ স্পর্শযোগ্য নহে, ইহা তাহার নিত্যত্বের প্রমাণ নহে। গতিও তো স্পর্শযোগ্য নহে। কিন্তু গতি অনিত্য।

শব্দের অর্থের স্বরূপ কি? ব্যক্তি অথবা আকৃতি অথবা জাতি? ব্যক্তি নির্দিষ্ট মূর্ত্তি-এবং-গুণ-বিশিষ্ট। বস্তুর বিশেষ গুণই তাহার আকৃতি। জাতি শ্রেণীর সাধারণ গুণ। ন্যায় মতে এই তিনটিই শব্দের বাচ্য, কিন্তু বিভিন্ন পরিমাণে। কার্য্যক্ষেত্রে শব্দদ্বারা আমরা আকৃতিই নির্দেশ করি।

কিন্তু যেখানে ভেদই আমাদের লক্ষ্য, সেখানে "ব্যক্তি" নির্দেশ করি। যখন শ্রেণীর সাধারণ গুণ লক্ষ্য, সেখানে "জাতির" নির্দেশ হয়।

বাৎস্যায়নের মতে বিশেষ বিশেষ গোরুর ধারণার অতিরিক্ত "গোত্বের" ধারণা যখন আমাদের আছে, তখন "গোত্বে"র মনোবাহ্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। উদ্দ্যোতকরের মতে "জাতি" প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মতে কোনও শব্দদ্বারা কোনও ভাবাত্মক বস্তু সূচিত হয় না, সেই শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু ভিন্ন অন্যান্য বস্তুর অভাবমাত্র সূচিত হয়। গো শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তু গো নহে (যেমন অশ্ব, মহিষ ইত্যাদি) তাহাদের "অপোহ" (অভাব) সূচিত হয়। অন্য সকল বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে "গো", তাই উক্ত শব্দের অর্থ "গো" বলিয়া অনুমিত হয়। উদ্দ্যোতকর বলেন কোনও বস্তুর ভাবাত্মক ধারণা না জানিলে তাহার অভাবাত্মক ধারণা করা যায় না। অভাব বাক্যের ভিত্তিস্বরূপ ভাবের প্রয়োজন, অবিশিষ্ট অভাব অর্থহীন—অর্থাৎ শুধু "নাই" শব্দের অর্থ নাই। কোনও বিশেষ বস্তুর অভাব বলিলে তাহার একটি ভাববাচক ইঙ্গিত থাকে।

কেহ কেহ বলেন শব্দ ও তাহার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধের কোনও ধারণা করা অসম্ভব। শব্দ একটি গুণ, শব্দের অর্থ দ্রব্য। গুণ ও দ্রব্যের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ অসম্ভব। শব্দের অর্থও যদি কোনও গুণই হয়, তাহা হইলেও সেই গুণ ও শব্দের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ অসম্ভব, কেননা গুণদিগের মধ্যে সংযোগ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সংযোগ গতি-সাপেক্ষ, কিন্তু শব্দ নিষ্ক্রিয়। আকাশ-বস্তু এবং "আকাশ"-শব্দ উভয়েই নিষ্ক্রিয়। সুতরাং উভয়ের সংযোগ হইতে পারে না। শব্দ ও তাহার অর্থের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ "প্রাপ্তি-লক্ষণ" নহে, ইহা বাৎস্যায়ন স্বীকার করেন, অর্থাৎ শব্দ দ্বারা তাহার অর্থের সৃষ্টি হয় না। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে যে জ্ঞান হয়, তাহা ইন্দ্রিয়কর্তৃক সৃষ্ট, কিন্তু শব্দ হইতে বিষয়জ্ঞান সেরূপ নহে। সেইজন্য শব্দের জ্ঞান ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের মত স্পষ্ট নহে।

শাব্দ জ্ঞানের উৎপত্তি নৈয়ায়িকগণ এইভাবে ব্যাখ্যা করেন: কতকগুলি অর্থবৎ শব্দের সমষ্টিই বাক্য। যখন কোনও বাক্য উচ্চারিত হয়, তখন তাহার অন্তর্গত শব্দদিগের অর্থ বোধগম্য হয়। শব্দ ও এই বোধের সংস্কার স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়। ইহার পরে কোও বাক্যের উচ্চারণ যখন শেষ হয়, তখন এই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, শব্দদিগের অর্থ মানস ক্ষেত্রে উদিত হয়, এবং শব্দার্থদিগের সংযোগ হইতে সেই

উচ্চারিত বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থের বোধ জন্মে। এই ব্যাপারের মুখ্য কারণ প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের মতে শ্রুত শব্দদিগের অর্থের স্মৃতি; কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে শ্রুত শব্দদিগের স্মৃতিই মুখ্যকারণ। বাক্যের অর্থ নির্ভর করে যাহাদের উপর, তাহারা হইতেছে (১) আকাংক্ষা—প্রত্যেক শব্দের অন্য শব্দের জন্য আকাংক্ষা, অর্থাৎ সেই শব্দের সহযোগিতা ব্যতীত অর্থ-প্রকাশে অক্ষমতা, (২) যোগ্যতা অর্থাৎ বাক্যের অন্যান্য শব্দের সহযোগে বাক্যের অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য, (৩) সন্নিধি অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত যে শব্দের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধ, তাহার নিকটে অবস্থান এবং বাক্য-উচ্চারণ কালে এক শব্দের পরে শব্দান্তরের উচ্চারণে বিলম্ব না করা। বাক্যের অন্তর্গত শব্দদিগের মধ্যে যদি অর্থের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে বাক্যের কোনও অর্থই হয় না। "অগ্নিনা সিঞ্চেৎ" (অগ্নি দ্বারা সিক্ত কর) এই বাক্যের কোন অর্থ হয় না। (৪) তাৎপর্য্য-জ্ঞান অর্থাৎ বক্তার উদ্দেশ্যের জ্ঞানও বাক্যের অর্থবোধের জন্য প্রয়োজনীয়। "সৈন্ধব" শব্দের অর্থ দুইটি—অশ্ব ও লবণ। "সৈন্ধবম্ আনয়" বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইলে বক্তা ঘোড়া অথবা লবণ চাহেন, তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

২৪
বেদের প্রামাণ্য

মীমাংসকদিগের মতে বেদ নিত্য। ঋষিগণ বেদমন্ত্রের স্রষ্টা নহেন। ন্যায়-মতে ঈশ্বর বেদের প্রণেতা। সেই জন্যই বেদ ভ্রম-প্রমাদহীন ও নির্ভরযোগ্য। বেদ যে নিত্য নহে, তাহার প্রমাণ স্বরূপে উদয়ন বলেন প্রত্যেক কল্পের অন্তে যখন সৃষ্টির লয় হয়, তখন বেদেরও লয় হয়। বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদেরও বিনাশ হইয়াছিল। বাৎস্যায়ন কিন্তু বলেন যে প্রত্যেক কল্পের আরম্ভে ঈশ্বর-কর্ত্তৃক বেদ পুনরায় সংকলিত হয়। বেদ যে ঈশ্বর-রচিত নৈয়ায়িকগণ বেদবচন দ্বারা তাহা প্রমাণ করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে বেদে এমন সকল বচন আছে, যাহা হইতে বেদ কাহারও প্রণীত বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরই বেদ-প্রণেতা।

শ্রুতিতে (বৃ, আ, ৪।৫।১১) বেদ ঈশ্বর হইতে নিঃশ্বসিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অথর্ববেদে (১০।২৩।৪।৭।২০) আছে যাহা হইতে ঋক্ ও যজুর্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে, সামবেদ যাহার লোম এবং অথর্ববেদ যাহার মুখ—তিনি "স্কম্ভ"। স্কম্ভ শব্দের উদ্দিষ্ট ঈশ্বর। "ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ববেদ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল"।

২৫

অর্থাপত্তি ও অভাব প্রমাণ

মীমাংসকগণ অর্থাপত্তি-নামক এক স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন। বেদান্ত-পরিভাষাতেও অর্থাপত্তি প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

"উপপাদ্য-জ্ঞানেন উপপাদক-কল্পনম্ অর্থাপত্তিঃ" (বেদান্ত-পরিভাষা)। এখানে উপপাদ্য-জ্ঞান করণ, উপপাদক-জ্ঞান ফল। যখন একটি কিছু ব্যতীত কোন বিষয় উপপন্ন হয় না, তখন দ্বিতীয় বিষয়কে উপপাদ্য বলে। যেমন রাত্রিতে ভোজন না করিলে কেহ পীন (স্থূল) হয় না। এখানে পীনত্ব উপপাদ্য, আর যাহার অভাবে এই পীনত্ব হয় না, সেই রাত্রি-ভোজনকে উপপাদক বলে। দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না, অথচ তাহার শরীর স্থূল। রাত্রিতেও যদি সে ভোজন না করিত, তাহা হইলে তাহার শরীর স্থূল হইত না, সুতরাং সে রাত্রিতে ভোজন করে। ইহাই অর্থাপত্তি প্রমাণের দৃষ্টান্ত।

উপরোক্ত উদাহরণকে দুই ন্যায়ে বিভক্ত করা যায়:

(১) যে কখনও আহার করে না, সে স্থূল হইতে পারে না। দেবদত্ত স্থূল, সুতরাং যিনি কখনও আহার করেন না, দেবদত্ত সেই লোক নহেন।

(২) যিনি আহার করেন, তিনি হয় দিবাভাগে নতুবা রাত্রিকালে আহার করেন।

দেবদত্ত দিবাভাগে আহার করেন না, সুতরাং দেবদত্ত রাত্রিকালে আহার করেন।

মীমাংসা দর্শনে এই প্রমাণ বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

বেদান্তে "অভাব" একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে অভাব জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, অভাবের বোধের জন্য স্বতন্ত্র প্রমাণ-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। সত্তার (ভাব) সহিত তাহার অধিকরণের (অবস্থিতির স্থানের) সম্বন্ধ "বিশেষণতা", অর্থাৎ অধিকরণ "ভাব"দ্বারা বিশিষ্ট, সেই স্থান শূন্য নহে, সেই বস্তুকর্তৃক বিশিষ্ট। অনপেক্ষ অভাবের (অর্থাৎ কোনও স্থানে কোনও বস্তুর অভাব নহে, শুধু অভাব=nothing) কোনও ধারণা করাই সম্ভবপর নহে। কোনও স্থানে কোনও বস্তু নাই, যখন বলা হয়, তখন সেই স্থানও যেমন সত্য, যে বস্তু সেখানে নাই, তাহাও তেমনি সত্য। না হইলে সেই শূন্য স্থানের প্রত্যক্ষ

জ্ঞান হইতে সেই বস্তুর অভাবের জ্ঞান অনুভূত হইত না। সেখানে অভাবের যে অনুভব হয়, তাহা আপেক্ষিক, অর্থাৎ সেই অনুভব সেই স্থানের অনুভবের অপেক্ষা করে। অনুমানদ্বারা আমরা বস্তুর অভাবের জ্ঞান লাভ করি। অভাব ভাবের প্রতিযোগী। যাহা আছে এবং যাহা নাই, এই উভয়ের দ্বন্দ্বই অভাব। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তখন প্রবল বাতাস বহিতে থাকিলে, বৃষ্টি হয় না। এই বৃষ্টির অভাব হইতে প্রবল বাতাসের সহিত মেঘের সম্বন্ধের অস্তিত্বের জ্ঞান হয়। প্রবল বাতাসের বাধাবশতঃই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় না। বাতাস না থাকিলে পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িত। দুইটি পরস্পরবিরোধী বস্তুর একটির অভাব দ্বারা অন্যটির ভাব প্রতিপন্ন হয়। দুইটি পরস্পর বিরোধী উভয় বাক্য সত্য হইতে পারে না, মিথ্যাও হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে একটি সত্য, অন্যটি মিথ্যা। একটি বস্তুর ভাব হইতে যখন অন্যটির অভাব আমরা অনুমান করি, তখন তাহা অনুমান মাত্র। যখন কোনও স্থানে কোনও বস্তুর অনুভব হয়, তখন তাহার অভাবের অনুভব হয় না, তখন সেই অভাব জ্ঞানের বিষয় হয় না। প্রদীপের আলোকে যখন কোনও বস্তু দৃষ্ট হয়, তখন যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা নাই বলিয়া গণ্য হয়। তখন মনের ক্রিয়া হয় এইরূপ, যদি উহা (দৃষ্ট বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু) থাকিত, তাহা হইলে তাহা দৃষ্ট হইত। যখন দেখা যাইতেছে না, তখন তাহা নাই। (ব্যাৎস্যায়ন)। প্রশস্তপাদের মতও এইরূপ। কার্য্যের আবির্ভাব যেমন তাহার কারণের অস্তিত্ব প্রকাশ করে, তেমনি তাহার অদর্শন কারণের অনস্তিত্ব প্রকাশ করে। শব্দ হইতেও অভাবের জ্ঞান হইতে পারে।

২৬

তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা

কোনও অজ্ঞাত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিবার উদ্দেশ্যে তাহার সম্বন্ধে যে গবেষণা, তাহাকে তর্ক বলে। তর্ক, উহ, আপত্তি একার্থবোধক। কোনও বস্তু-সম্বন্ধে কোনও কল্পনা করিয়া তাহার সমর্থনের যুক্তির অন্বেষণই গবেষণা। তর্ক অনুমান নহে, সত্য মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য মনের ক্রিয়া। যখন কোনও বস্তুর স্বরূপ-সম্বন্ধে সংশয় জন্মে তখনই আমরা

"তর্ক" অবলম্বন করি। তর্কের ফলে যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তাহাকে "নির্ণয়" বলে।

যখন দুই পক্ষে কোনও বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে, এবং প্রত্যেক পক্ষ তাহার মত যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে, তখন প্রত্যেক মতকে "বাদ" বলে। এক পক্ষের মতে আত্মার অস্তিত্ব আছে, দ্বিতীয় পক্ষের মতে আত্মা বলিয়া কিছু নাই। প্রত্যেকেই তাহার মত প্রমাণের জন্য যুক্তি উত্থাপিত করিলেন। প্রত্যেক মতই বাদ।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ একাদশ প্রকার তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে তর্ক পঞ্চবিধ। তাহাদের মধ্যে প্রধান "প্রমাণ বাধিতার্থ প্রসঙ্গ"। ইহা ব্যতিরেকীমুখী। আত্মার অমরত্ব-সম্বন্ধে তর্কে ইহার রূপ এই প্রকার: আত্মা যদি অমর না হয়, তাহা হইলে তাহার কর্মের ফল ভোগ করিতে পারিবে না, তাহার জন্মান্তর হইতে পারে না, মুক্তি বলিয়া কিছু থাকে না। সুতরাং আত্মা অমর। অন্য চারি প্রকার তর্কের নাম, (১) আত্মাশ্রয়, (ignoratio elenchi) (২) অন্যোন্যাশ্রয়, (৩) চক্রক এবং (৪) অনবস্থা।

বাদ অনেক সময় জল্প ও বিতণ্ডায় পরিণত হয়। জল্পের উদ্দেশ্য তর্কে জয়লাভ। বিতণ্ডায় কেবল বিপক্ষের যুক্তির খণ্ডনের চেষ্টা থাকে, কোনও মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকে না।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে তর্কে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার বাক্যের কদর্থ করার নাম ছল। ছল তিন প্রকার—(১) বাক্‌ছল, (২) সামান্য ছল ও (৩) উপচার ছল। দ্ব্যর্থযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিবার ফলে প্রতিপক্ষ যখন সেই শব্দ এক অর্থে গ্রহণ করে, তখন তাহার অন্য অর্থের উল্লেখ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর ভুল দেখানো বাক্‌ছল। "এই বালক নব কম্বল" বাক্যটি যখন "এই বালকের একটি নূতন কম্বল আছে" এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন ভুল ধরা হয় এই বলিয়া যে "না, না, বালকের নয়টি কম্বল নাই। মাত্র একটি কম্বল আছে।" ("নব" শব্দের অর্থ "নয়" ও "নূতন" উভয়ই হইতে পারে।) ইহাই বাক্‌ছল। যখন কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু-সম্বন্ধে উক্ত বাক্য সমস্ত শ্রেণী-সম্বন্ধে উক্ত বলিয়া গৃহীত হয়, তখন সেই ছলকে বলে "সামান্য ছল"। যেমন "এই ব্রাহ্মণের বিদ্যা ও সদাচার আছে"। এই বাক্যটির পরে বলা হয় "সকল ব্রাহ্মণের বিদ্যা ও সদাচার নাই"। উপচার ছলে রূপক বর্ণনা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয়। "ফাঁসীকাষ্ঠ চীৎকার করিল" শুনিয়া

যখন বলা হয় "ফাঁসীকাষ্ঠ অচেতন, চীৎকার করিতে পারে না। তখন হয় উপচার ছল।

২৭

সংশয়

সংশয়ের উদ্‌ভবের কারণ অনেক। (১) বহু বস্তুর যাহা সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা দৃষ্টিগোচর হইলে সেই ধর্ম্মের ধর্ম্মী কি, সে সম্বন্ধে সংশয় হয়। অন্ধকারে কোনও দীর্ঘ বস্তু দণ্ডায়মান দেখিলে তাহা মানুষ অথবা একটি দণ্ড, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। (২) আবার যখন এমন কোনও গুণ দৃষ্ট হয়, যাহা সাধারণ গুণ নহে, তখনও সংশয়ের উৎপত্তি হয়। যেমন শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এই বিষয়ে সংশয়। শব্দ নিত্য, পরমাণুর গুণ নহে, আবার অনিত্য, মানুষ বা পশুর ধর্ম্মও নহে। (৩) নির্ভরযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মতও সংশয়ের কারণ। এক পণ্ডিত আত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে যাহা বলেন, অন্য পণ্ডিত তাহার বিপরীত কথা বলেন। কোন্ মত সত্য, সে সম্বন্ধে সংশয় হয়। (৪) প্রত্যক্ষে ভ্রান্তির সম্ভাবনা—যেমন যখন জল দৃষ্ট হয়, তখন তাহা সত্য অথবা মরীচিকার মত মিথ্যা, এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। (৫) অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্বের সম্ভাবনা।

কেহ যখন সম্ভাব্য দুই বস্তুর মধ্যে একটিকে বর্জন করিয়া অন্যটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে বলে "উহা" (আন্দাজ)। এই ক্ষেত্রে দুই বিকল্পের মধ্যে একটি অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া প্রতীত হয়।

যখন কোনও বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার নাম মনে করিতে পারিনা, তখনও এক প্রকার সংশয়ের উদ্‌ভব হয়। তাহাকে বলে অনধ্যবসায়। অন্যমনস্কতা-বশতঃ কোনও বস্তু লক্ষ্য না করাও অনধ্যবসায়।

সংশয় অনুমানের পূর্ব্ববর্ত্তী। জ্ঞান যখন স্পষ্ট হয়, তখন সংশয়ের নিরসন হয়। সংশয় ও ভ্রান্তি এক নহে। সংশয় অসম্পূর্ণ জ্ঞান; কোনও বস্তু ইহাও হইতে পারে, উহাও হইতে পারে এই প্রকার জ্ঞান। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানাই ভ্রান্তি।

২৮

স্মৃতি

স্মৃতিতে পূর্বের অনুভব মনে পুনরুদিত হয়। স্মৃতি না থাকিলে সমগ্র অতীত আমাদের মনের বাহিরে পড়িয়া থাকিত। স্মৃতি এক প্রকার সংস্কার-জাত। "আত্ম-মনসোঃ সংযোগ বিশেষাৎ সংস্কারাৎ চ স্মৃতিঃ" (বৈশে সূ—

৯।২।৬) আত্মা ও মনের এক প্রকার সংযোগ ও সংস্কার হইতে স্মৃতির উদ্‌ভব হয়। স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা এক নহে। স্মৃতিতে প্রত্যক্ষ নাই, কেবল সংস্কার; প্রত্যভিজ্ঞায় প্রত্যক্ষের সহিত সংস্কার জড়িত। ন্যায় দর্শনে স্মৃতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত নহে।

২৯

আভাস (Fallacy)

ন্যায় শাস্ত্রে ত্রিবিধ আভাসের উল্লেখ আছে: (১) হেত্বাভাস, (২) পক্ষাভাস ও (৩) দৃষ্টান্তাভাস। ইহাদের মধ্যে হেত্বাভাসই গুরুত্ব পূর্ণ। হেত্বাভাস শব্দের অর্থ যে হেতুর উপর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, তাহা প্রকৃত হেতু বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত না হইলেও হেতু বলিয়া গণ্য। এই হেতু-সংক্রান্ত ভ্রম পরিহার করিতে পারিলে অনুমানে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষ অর্থাৎ অপ্রধান পদের আভাসকে পক্ষাভাস এবং দৃষ্টান্তের আভাসকে দৃষ্টান্তাভাস বলে। ইংরেজিতে Syllogism এর দোষকে বলে Fallacy। Syllogism এর অবয়বগুলির সত্যতার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। সকল মানুষ অমর, যদু মানুষ, সুতরাং যদু অমর। এই Syllogism এর রূপে (form) কোনও ত্রুটী নাই, সুতরাং Syllogismএ ভুল নাই, যদিও তাহার প্রথম অবয়বটি সত্য নহে; কেন না কোনও মানুষই অমর নহে। ন্যায়দর্শনের আভাসগুলির সহিত অবয়বের সত্যতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা প্রত্যক্ষবিরোধী, তাহাকে অবয়ব-রূপে গ্রহণ করা হয় না।

গৌতম সূত্রানুসারে হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার: (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণ-সম, (৪) সাধ্যসম ও (৫) কালাতীত। যে ন্যায়ে প্রযুক্ত হেতু হইতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হইতে পারে, তাহাই সব্যভিচার। শব্দ নিত্য, কেন না ইহা স্পর্শাতীত, যেমন নিত্য পরমানুগণও স্পর্শাতীত। ইহা সব্যভিচারের দৃষ্টান্ত। কেননা জ্ঞানও স্পর্শের অতীত হইলেও নিত্য নহে, অনিত্য। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ ত্রিবিধ সব্যভিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। পর্ব্বতে অগ্নি আছে, কেননা পর্ব্বত জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু পুষ্করিণীও জ্ঞানের বিষয়, যদিও পুষ্করিণী অগ্নির বিপরীত, এবং তাহাতে অগ্নি থাকিতে পারে না। এই হেত্বাভাস সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস। আবার শব্দ নিত্য, কেননা ইহাতে শব্দত্ব (শব্দের স্বরূপ) বর্তমান। এই হেত্বাভাস অসাধারণ সব্যভিচারের দৃষ্টান্ত। শব্দত্ব কেবল শব্দেই বর্তমান বলিয়া এই হেত্বাভাসকে অসাধারণ

সব্যভিচার বলে। প্রত্যেক বস্তুই অনিত্য কেননা সকল বস্তুই জ্ঞানের বিষয়। ইহা অনুপসংহারী সব্যভিচারের দৃষ্টান্ত। এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে। ইহা হইতে বিপরীত সিদ্ধান্তও করা যায়।

(২) যেখানে হেতু সিদ্ধান্তের বিরোধী সেখানে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস। ঘট নিত্য, কেননা ঘটের উৎপত্তি আছে। এখানে ঘট উৎপত্তিশীল বলিয়া তাহা অনিত্য, এই সিদ্ধান্তই সংগত। (৩) যেখানে যাহা সাধ্য, তাহাই ভিন্ন বাক্যদ্বারা হেতু রূপে উপস্থাপিত হয়, সেখানকার হেত্বাভাস প্রকরণ সাম্য। ইহার দৃষ্টান্ত শব্দ অনিত্য, কেননা শব্দে নিত্যত্ব গুণ নাই। (৪) যেখানে হেতুরূপে উপস্থাপিত বাক্যের প্রমাণ আবশ্যক, সেখানে সাধ্যসম হেত্বাভাস; যেমন ছায়া একটি দ্রব্য, কেননা ছায়ার গতি আছে। কিন্তু ছায়ার গতি আছে, ইহা প্রমাণের বিষয়, প্রমাণিত নহে। (৫) অনুপযোগী উপমানের ব্যবহারকে কালাতীত হেত্বাভাস বলে। এই ক্ষেত্রে উদাহরণের কালের সঙ্গে হেতুর কালের সংগতি নাই। যদি কেহ বলেন ঢাকের যষ্টির স্পর্শ হইতে যেমন শব্দের উৎপত্তি হয়, তেমনি আলোক ও যে বস্তুর উপর আলোক পতিত হয়, ইহাদের সংস্পর্শ হইতে বর্ণের উৎপত্তি হয়, সুতরাং শব্দ নিত্য, তাহা হইলে তাহা কালাতীত দোষদুষ্ট। কেননা বর্ণ বস্তুতে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান, আলোকের সংস্পর্শে তাহা প্রকাশিত হয় মাত্র। কিন্তু ঢাকের শব্দ তাহার উপর যষ্টির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। শব্দ উৎপন্ন হয়, বলিয়া তাহা নিত্য হইতে পারে না।

উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের অতিরিক্ত আরও তিন প্রকারের হেত্বাভাসের উল্লেখ নৈয়ায়িকগণ করিয়া থাকেন: (১) সৎ প্রতিপক্ষ (২) অসিদ্ধ ও (৩) বাধিত। যেখানে উপস্থাপিত হেতুদ্বারা সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়, তাহা সৎ-প্রতিপক্ষ। যেমন শব্দ শ্রুতিগ্রাহ্য, সুতরাং নিত্য, এবং শব্দ "কার্য্য" (কারণ হইতে উৎপন্ন) সুতরাং শব্দ নিত্য। এখানে উপস্থাপিত যুক্তি দ্বারা শব্দের অনিত্যত্বই প্রমাণিত হয়। অসিদ্ধ ত্রিবিধ: (১) আশ্রয়াসিদ্ধ, (২) স্বরূপাসিদ্ধ, এবং (৩) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। আকাশপদ্ম অন্যান্য পদ্মের সদৃশ। অন্যান্য পদ্ম সুগন্ধ, সুতরাং আকাশপদ্মও সুগন্ধ। এখানে সুগন্ধের আশ্রয় আকাশপদ্মের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মীমাংসা অসিদ্ধ। শব্দ একটি গুণ, কেননা শব্দ দর্শনযোগ্য। ইহা স্বরূপাসিদ্ধের দৃষ্টান্ত, কেননা শব্দ দর্শনযোগ্য নহে। যেখানে হেতু ও প্রধান পদের সাহচর্য্য অব্যভিচারী ও অপরিহার্য্য নহে, সেখানে ব্যাপতাসিদ্ধ। অগ্নি

ও ধূম সর্ব্বত্র পরস্পরের সহচর নহে। উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহগোলকে অগ্নি বর্ত্তমান, কিন্তু ধূম সেখানে নাই। আর্দ্রকাষ্ঠজাত অগ্নিতেই ধূম থাকে, অন্যত্র নহে। পর্ব্বতে অগ্নি আছে, সুতরাং ধূমও আছে। ইহা ব্যাপ্তিত্বাসিদ্ধির দৃষ্টান্ত।

প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদক বাক্য "বাধিত" হেত্বাভাসের দৃষ্টান্ত। যেমন অগ্নি উষ্ণ নহে, কেননা অগ্নি একটি দ্রব্য।

৩০

জাতি

ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য অবলম্বন করিয়া তর্কে যে দোষোদ্ঘাটন করা হয়, তাহাকে "জাতি" বলে। ইহার নামান্তর "প্রতিষেধ"। জাতি চব্বিশ প্রকার তাহাদের মধ্যে "সাধর্ম্ম্যসমা জাতি" এই প্রকার—

বাদী বলিলেন "শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ"। ঘটের ন্যায় "কার্য্য" বলিয়া শব্দ অনিত্য। এখানে কার্য্যত্ব" হেতু "অনিত্যত্ব" রূপ সত্যের ব্যাপ্য। যুক্তিতে কোনও ভুল নাই, কিন্তু প্রতিবাদী "জাতি" অবলম্বন করিয়া বলিলেন "কার্য্যত্ব বিষয়ে যেমন ঘটের সহিত শব্দের সাধর্ম্ম্য আছে, তেমনি অমূর্ত্তত্ব বিষয়ে শব্দের আকাশের সহিত সাধর্ম্ম্য আছে। সুতরাং শব্দ আকাশের মতো নিত্য। এখানে অমূর্ত্তত্ব নিত্যত্বের বাপ্য নহে। তবুও আকাশের সহিত সাধর্ম্ম্য হইতে এই প্রতিবাদ "সাধর্ম্ম্যসমা জাতি"। আবার প্রতিবাদী যদি বলেন শব্দে অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য কার্যত্ব যেমন আছে, তেমনি ঘটের বৈধর্ম্ম অমূর্ত্তত্বও আছে। এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকা যদি সম্ভবপর হয়, তবে অনিত্যত্বের বিপরীত ধর্ম্ম নিত্যত্ব সম্ভবপর হইবে না কেন? ইহা "বৈধর্ম্ম্যসমা জাতি"।

৩১

নিগ্রহস্থান

"বিপ্রতিপত্তিঃ অপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং" (গৌ সূ, ১।২।১৯) নিগ্রহ অর্থাৎ পরাজয়ের স্থল দুইটি—বিপ্রতিপত্তি (বিপরীত বুঝা) এবং অপ্রতিপত্তি (না বুঝা)। কেহ কোনও বাক্য বলিলে, তাহার প্রতি অযথা আপত্তি উত্থাপন করা, অথবা তাহা একেবারে বুঝিতে না পারা প্রমাণিত হইলে,

তাহা পরাজয়ের স্থান। তাহাই নিগ্রহস্থান। যাহাদ্বারা বাদী অথবা প্রতিবাদীর অজ্ঞতা, সংশয় অথবা বিপরীত নিশ্চয় প্রকাশ পায়, তাহাই নিগ্রহস্থান। যেমন বাদী বলিলেন "শব্দঃ অনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ, ঘটবৎ" শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ঘটের মতো অনিত্য। প্রতিবাদী বলিলেন জাতি (সামান্য) তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়াও নিত্য। তবে শব্দ কেন নিত্য হইবে না। ইহার উত্তরে বাদী যদি বলেন, যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়াও "সামান্য" নিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দ ও ঘটও নিত্য হইতে পারে।

এখানে বাদী স্বীয় দৃষ্টান্ত ঘটের নিত্যত্ব স্বীকার করায় তিনি প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত স্বপক্ষ ত্যাগ করিলেন। এজন্য প্রতিজ্ঞাহানিরূপ নিগ্রহস্থান হইল।

নিগ্রহস্থান ২৬ প্রকার। সকলের পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব।

৩২

প্রমা

প্রমা শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। যাহা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়, তাহা প্রমেয়। ন্যায়-দর্শনের প্রথম সূত্রে প্রমার প্রয়োজন বিবৃত হইয়াছে। এই প্রয়োজন নিঃশ্রেয়সাধিগম। প্রমালাভ হয় প্রমাণের সাহায্যে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ। ইহাদের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, ন্যায়-মতে তাহা সত্য।

বৌদ্ধ মাধ্যমিক মতে আমাদের জ্ঞানের কোনও মূল্যই নাই। বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। আমাদের চিন্তার মধ্যে এত বিরোধ বর্ত্তমান, যে তাহাকে সত্য বলিয়া মনে করা যায় না। এই মতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, সকলই শূন্য। বাৎস্যায়ন ইহার খণ্ডনে বলেন মাধ্যমিকগণ এ বিষয়ে নিশ্চিত মত পোষণ করেন যে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সুতরাং কিছুর অস্তিত্ব নাই, অন্ততঃ এই বিষয়ের যে নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভবপর, তাহা তাহারা স্বীকার করেন। সুতরাং আমাদের চিন্তার মধ্যে সত্যতা নাই, ইহা সত্য নহে। কিছুরই অস্তিত্ব নাই, একথাও সত্য নহে।

ইহা যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে ইহার বিপরীত বাক্য সত্য। অর্থাৎ ইহা সত্য, যে প্রমাণলব্ধ বস্তুর অস্তিত্ব আছে, প্রমাণ-দ্বারা সত্য-লাভ হয়। যিনি ইহা অস্বীকার করেন তাহার অস্বীকৃতির হয় কোনও প্রমাণ আছে, নতুবা নাই।

যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার কথার কোনও মূল্য নাই। যদি প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে প্রমাণদ্বারা যে সত্য লাভ করা যায়, তাহা তিনি স্বীকার করেন। কোনও বিষয় ব্যতীত চিন্তা হয় না। সুতরাং চিন্তা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। আবার বিষয়ও চিন্তার উপর নির্ভরশীল, কেননা চিন্তা না থাকিলে বিষয়ের অস্তিত্বও থাকিত না। চিন্তা ও বিষয় পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এ সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলেন, বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া তোমরা বল বস্তুর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বস্তুর বিশ্লেষণ যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বোধগম্য হয় না, একথা সত্য নহে। আবার বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বোধগম্য নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বস্তুর বিশ্লেষণই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং চিন্তাদ্বারা বস্তুর বিশ্লেষণ করা যায় স্বীকার করিয়া বস্তুর স্বরূপ বোধগম্য নহে, ইহা বলা স্ববিরুদ্ধ উক্তি। ন্যায়দর্শন-মতে জ্ঞানদ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

অনুভবের বিষয় বিজ্ঞানমাত্র, অনুভবের বাহিরে তাহার বিষয়ের অস্তিত্ব নাই, বিজ্ঞানবাদীদিগের এই মত ন্যায়দর্শনে খণ্ডন করা হইয়াছে। স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয়, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার অনুভব হয় না বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুকে অসত্য বলা হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অস্তিত্ব না থাকিলে স্বপ্ন-জগতেরও অস্তিত্ব থাকিত না। বিভিন্ন কারণ হইতে বিভিন্ন স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। বাহ্য জগতের অস্তিত্ব না থাকিলে সত্য ও মিথ্যার ভেদ বোঝা যাইত না। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উপর আমাদের কর্তৃত্ব নাই। আমাদের ইচ্ছামত তাহার উৎপত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর স্পর্শ হইতেই সেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে এই জ্ঞানের কোনও ব্যাখ্যা করা যাইত না।

ক্ষণিকবাদও ন্যায়দর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। বস্তুর অস্তিত্ব যে ক্ষণিক, ন্যায় তাহা স্বীকার করেন না। জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাই যদি জ্ঞানের কারণ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষণিকবাদে যে বিষয়কর্তৃক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষণমাত্র স্থায়ী। যে ক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষণেই তাহার বিষয় অন্তর্হিত হয়। কিন্তু যাহা জ্ঞাতার সম্মুখে বর্ত্তমান, তাহার জ্ঞানই সম্ভবপর। যাহা বর্ত্তমান নাই, তাহার জ্ঞান সম্ভবপর নহে। বিষয়ের অন্তর্দ্ধান ও জ্ঞানোৎপত্তি এক ক্ষণেই হয়, ইহা বলিয়া লাভ নাই, কেননা যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, জ্ঞানের সময় তাহা বর্ত্তমান বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। তাহা বর্ত্তমান নাই, তাহা

অতীত বলিয়া কখনও বোধ হয় না। দ্রব্য ক্ষণিক হইলে অনুমানও সম্ভবপর হয় না। উদ্দ্যোতকর এই যুক্তির সমর্থনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই: শব্দ অনিত্য, কেননা ঘটের ন্যায় শব্দ উৎপত্তিশীল। এই দৃষ্টান্তে ঘটে অনিত্যত্ব এবং উৎপত্তিশীলত্ব উভয়ই থাকা আবশ্যক। অনিত্যত্বের অর্থ ধ্বংসাভাব, এবং উৎপত্তিশীলত্বের অর্থ প্রাগভাব। ঘট যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব উভয়েই একসঙ্গে কিরূপে তাহাতে থাকিতে পারে? আবার কারণ কার্য্যের আধার বলিয়া উভয়েরই এক সময়ে থাকা আবশ্যক। কিন্তু উভয়েই ক্ষণিক হইলে, তাহা অসম্ভব হয়।

যাহার সত্য অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রধান লক্ষণ এই যে তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাতার জ্ঞান-নিরপেক্ষ। তাহার অনুভব কাহারও হউক বা না হউক, তাহাতে তাহার অস্তিত্বের হানি হয় না। কিন্তু যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা কল্পনার সৃষ্টিমাত্র, তাহা কল্পনা-সাপেক্ষ। অনুভবের জন্য তাহার বিষয় বস্তু আবশ্যক। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্বের জন্য অনুভবের অপেক্ষা নাই। ন্যায়-মতে বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় রূপে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণের অপেক্ষা করে।

ন্যায়-দর্শনের প্রথম সূত্রে যে তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা আছে, সেই তত্ত্ব কি? তত্ত্ব (তৎ+ত্ব) বস্তুর স্বরূপ। বাৎস্যায়ন বলেন "যাহার সত্তা আছে, তাহার অস্তিত্ব, এবং যাহার সত্তা নাই, তাহার অনস্তিত্বই বস্তুর তত্ত্ব। অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আছে, এরূপ কোনও বস্তু যখন অস্তিত্ববান্ বলিয়া অনুভূত হয়, এবং অনুভূত হয় ইহা স্বরূপতঃ যাহা সেইরূপে (যথাভূত ভাবে), তাহার বিপরীত রূপে নয়, তখন যাহা এইরূপে অনুভূত হয় তাহাই সেই বস্তুর স্বরূপ। আবার যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা যখন অস্তিত্বহীন বলিয়া অনুভূত হয়, তাহার বিপরীত অর্থাৎ অস্তিত্ববান বলিয়া অনুভূত হয় না, তখন যাহা এইরূপে অনুভূত হয়, তাহাই সেই বস্তুর স্বরূপ।" বস্তু স্বরূপে যাহা নয়, সেইরূপে তাহার যে জ্ঞান তাহাকে অপ্রমা, ভ্রম অথবা মিথ্যা জ্ঞান বলে। শুক্তিকে রজত বলিয়া জ্ঞান অপ্রমা। অপ্রমা জ্ঞানের অভাব নহে, বাস্তব ভ্রম। বাক্যের বিধেয় বাক্যের উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে কিছু ব্যক্ত করে। যাহা ব্যক্ত হয়, উদ্দেশ্যের স্বরূপের সহিত তাহার ঐক্য হইলে বাক্য হয় সত্য বা যথার্থ। ঐক্য না হইলে তাহা মিথ্যা।

জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ কি, নৈয়ায়িকগণ

তাহার আলোচনা করিয়াছেন। ঘট-বিষয়ক জ্ঞান ও ঘটের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সমবায় সম্বন্ধ নহে। কেননা উক্ত জ্ঞান ঘটের গুণ নহে, আত্মার গুণ। ইহা সংযোগ সম্বন্ধও নহে, কেননা সংযোগ সম্বন্ধ কেবল দ্রব্যদিগের মধ্যেই ঘটে, কিন্তু জ্ঞান গুণ, দ্রব্য নহে। কিন্তু সম্বন্ধটি নিশ্চয়ই আছে। তাহা না থাকিলে কোনও বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞান সত্য কিনা বুঝিবার উপায় থাকিত না। কোনও বস্তুর জ্ঞানের একমাত্র নিয়ামক কারণ সেই বস্তুর "স্বরূপ"। এই সম্বন্ধকে বলে "স্বরূপ সংবন্ধ", "সংবন্ধান্তরেণ বিশিষ্ট প্রতীতি জময়নাযোগ্যত্বং" অর্থাৎ যেখানে অন্য কোনও সংবন্ধ দ্বারা (সমবায় বা সংযোগ) বিশিষ্ট জ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব, সেখানে জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের সম্বন্ধই স্বরূপ-সংবন্ধ। এই সম্বন্ধ অসাধারণ (unique, Sui generis)। অন্য কোথায়ও এই সম্বন্ধ নাই। জ্ঞানের ক্রিয়া, অথবা কোনও মানসিক অবস্থা জ্ঞানের বিষয় নহে। যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান, সেই বাহ্যবস্তুও সেই জ্ঞানের বিষয় নহে; সেই বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহাই জ্ঞানের বিষয়। বাহ্য বস্তু যদি জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে তাহাই জ্ঞানে প্রকাশিত হইত, কোনও ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিত না। আমরা যখন কোনও বস্তু চিন্তা করি, তখন সেই বস্তু আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে না। জ্ঞানের বিষয় যদি মানসিক অবস্থা মাত্র হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞানবাদকেই সত্য বলিতে হইত। জ্ঞানের বিষয় বাহ্য বস্তুও নহে, মানসিক বস্তুও নহে, তাহা বাহ্য বস্তুর স্বরূপ। স্বপ্নেও বস্তুর স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই বলিয়া মনে করি, কিন্তু সেই বিশ্বাস ভুল বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হয়। যাহাকে "স্বরূপ" বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক তাহার স্বরূপ কি না, তাহা জ্ঞানক্রিয়াদ্বারা প্রকাশিত হয় না; জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য নাই। জ্ঞানের অনুভবের মধ্যে তাহার বিষয় নাই, বিষয়ের অনুভব আছে। সেই অনুভবের মধ্যে ভ্রান্তি সম্ভবপর। জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। সূর্য্যকে গতিশীল বলিয়া যে জ্ঞান হয়, প্রমাণদ্বারা তাহার ভ্রান্তি বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু এক প্রমাণ অন্য প্রমাণের বিষয় হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, যে তুলাদণ্ড দ্বারা অন্য বস্তুর ওজন করা হয়, তাহা যেমন অন্য তুলাদণ্ডে তুলিত হইতে পারে, তেমনি এক প্রমাণ প্রমাণান্তরের বিষয় হইতে পারে। বুদ্ধি এক প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন। কিন্তু বুদ্ধি কি, তাহার যখন জ্ঞান হয়, তখন তাহা প্রমেয় হয়। প্রমাণের জন্য প্রমাণান্তরের

প্রয়োজন নাই, ইহা বলা যায় না। কেন না তাহা হইলে জ্ঞানের বিষয়েরও প্রমাণের প্রয়োজন নাই বলা যায়, এবং প্রমাণের কোনও আবশ্যকতাই থাকে না। কোনও জ্ঞানের সত্যতা যদি অন্য জ্ঞানদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, শেষোক্ত জ্ঞানের সত্যতা জ্ঞানান্তর দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে অনবস্থার উদ্‌ভব হয়। এই আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন এই আপত্তির বিশেষ গুরুত্ব নাই। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা প্রমাণদিগকে স্বীকার করিয়া লই, এবং এক প্রমাণ দ্বারা অন্য প্রমাণের সত্যতা প্রমাণেরও কোনও প্রয়োজন অনুভব করি না। যেখানে স্পষ্ট জ্ঞান হয়, যেমন হস্তের আমলকী ফল, সেখানে জ্ঞানের সত্যতা-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই আমাদের হয় না। যেখানে সন্দেহ হয়, সেখানেই জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন হয়। জ্ঞানান্তরের সাহায্যে যখন সন্দেহ দূর হয়, তখন অন্য প্রমাণের আর প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয়দিগের সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞান না থাকিলেও, তাহাদিগের দ্বারা আমরা অন্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করি। অন্য উপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগের জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু অন্য বস্তুর জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়দিগের জ্ঞান অনাবশ্যক।

আমাদের জ্ঞানের সহিত তাহার বিষয়ের সংগতি আছে কি না, তাহা তৎক্ষণাৎ আমরা জানিতে পারি না। সকল জ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক। যাহা কাম্য ও যাহা অকাম্য তাহার জ্ঞান হইলে কর্ম্মের উদ্‌ভব হয়। জ্ঞাতা আত্মা চিন্তার নিষ্ক্রিয় আধার নহে। সুখজনক বস্তু লাভ করিবার জন্য এবং দুঃখজনক বস্তু পরিহারের জন্য আত্মা উৎসুক। জীবনযাত্রার জন্য চিন্তার প্রয়োজন আছে। জ্ঞান হইতেই কর্ম্মের উদ্‌ভব হয়। জ্ঞান হইতে উদ্‌ভূত কর্ম্ম যখন সফল হয়, তখন সেই জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। আমাদের জ্ঞানের "প্রবৃত্তি-সামর্থ্য" দ্বারা অর্থাৎ সকল কর্ম্ম-উৎপাদনের সামর্থ্যদ্বারা আমাদের জ্ঞানের সহিত তাহার বিষয়ের সংগতি প্রমাণিত হয়। আমাদের জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংগতি-সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ-সাদৃশ্য সম্বন্ধ না হইতেও পারে।

যখন আমরা একটি ঘোড়া দেখি তখন প্রথমে ঘোড়ার আকারের জ্ঞান হয়। মনে হয় ইহা একটি ঘোড়া। কাছে গিয়া জন্তুটিকে স্পর্শ করিয়া যখন জীবশরীরের স্পর্শ লাভ করি, তখন প্রথম জ্ঞানকে সত্য মনে করি। আর যদি সেরূপ স্পর্শানুভূতি না হয়, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞান মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। দূরে জল দেখিয়া নিকটে গেলাম। জল স্পর্শ করিয়া বাস্তবিক জল বুঝিয়া পান করিলাম, পিপাসা শান্ত হইল, আমার প্রয়োজন সাধিত হইল এবং

আমার লব্ধ জ্ঞান সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সত্য জ্ঞান সফল কর্ম্মের পথে চালিত করে। ভ্রান্ত জ্ঞান যে পথে চালিত করে, সে পথে কর্ম্ম বিফল হয়। এই Pragmatic মত স্থায়-দর্শনের মতে সত্যের কষ্টি। "অবিসম্বাদকং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানম্।...প্রদর্শিতার্থং প্রাপয়ৎ সম্বাদকম্ উচ্যতে।" কর্ম্মের ফল যে জ্ঞানের বিরোধী নহে, তাহাই সম্যক্ জ্ঞান। যাহা দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয়, তাহা সংবাদক জ্ঞান। বৌদ্ধ মতেও অর্থ-সিদ্ধি বা অর্থ-ক্রিয়া-সামর্থ্যকে সত্যের কষ্টি বলিয়া স্বীকৃত।

বাচস্পতি এবং উদয়নের মতে কয়েক প্রকারের জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য আছে। ভ্রম এবং অসংগতি-হীন অনুমান এবং মৌলিক সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত উপমানলব্ধ জ্ঞাম স্বতঃ প্রমাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শাব্দিক জ্ঞানের এই প্রামাণ্য নাই। উদয়নের মতে অনু-ব্যবসায়, এবং বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষে কেবল সত্তার জ্ঞানেরও (অবিশিষ্ট সত্তাজ্ঞান, ধর্ম্মীজ্ঞান) স্বতঃপ্রামাণ্য আছে।*

---

* এই সঙ্গে স্পিনোজার নিম্নোক্ত মত তুলনীয় :

প্রত্যয় তাহার বিষয় হইতে ভিন্ন। বিষয় বাহিরে, মন অন্তরে অবস্থিত। প্রত্যয়ের কাজ বিষয় ও তাহার সার-সম্বন্ধে মনকে সচেতন করা। বৃত্তের কেন্দ্র ও পরিমাপ আছে, বৃত্তের প্রত্যয়ের তাহা নাই। অথচ বৃত্তের যাবতীয় গুণ তাহার প্রত্যয় মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। কিন্তু প্রত্যয় ও বিষয় ভিন্ন হইলেও একস্থানে তাহাদের সংযোগ আছে। বিষয়ের সার (essense—স্বরূপ) বস্তুতঃ বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত হইলেও, তাহার মানসিক আকার মনের মধ্যেও বর্ত্তমান, ইহাই প্রত্যয়। প্রত্যয় ও বিষয় এক জাতীয় নহে। উভয়ের গুণের মধ্যেও সমতা নাই। প্রত্যয় যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাই তাহার সত্যতার প্রমাণ। প্রমাণান্তরের প্রয়োজন নাই। একই "সার" প্রত্যয় ও বিষয়ের মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়া উভয়ের মধ্যে মিল। প্রত্যয়ের সার ও তাহার বিষয়ের সার এক ও অভিন্ন। বিষয় হইতে তাহার সার মনে সংক্রামিত হয়। কিন্তু সকল প্রত্যয়ের মধ্যে বস্তুর সার সমপরিমাণে থাকে না। স্বপ্নে যে সকল প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তাহাতে সকল সময়ে বিষয়ের সার থাকে না। সত্য প্রত্যয় হইতে কাল্পনিক প্রত্যয়ের পার্থক্য এই : সত্য প্রত্যয়ের লক্ষণ স্পষ্টতা (clearness), বিশিষ্টতা (distinctness) এবং আধেয়ের ঔজ্জ্বল্য (luminousness of contents), ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা। যে প্রত্যয় স্পষ্ট এবং অন্যান্য প্রত্যয়ের সহিত যাহার সীমারেখা সুনির্দিষ্ট, তাহাই সত্য। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (গ্রন্থকার রচিত) ২য় খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা।

৩১

অপ্রমা—সংশয়, ভ্রম, বিপর্য্যয়

যাহা প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহা অপ্রমা। সাধারণ কথায়, যাহা নাই, তাহা আছে মনে করাই অপ্রমা। যাহা একখণ্ড রজ্জুমাত্র, তাহার সর্পরূপে প্রতীতি, যে সর্প সেখানে নাই, সেখানে তাহার অস্তিত্বের প্রতীতি অপ্রমা। স্বপ্নে যেখানে যাহা দৃষ্ট হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে তাহার অস্তিত্ব নাই। এই অস্তিত্ব-জ্ঞান অপ্রমা। প্রমার ন্যায় অপ্রমারও যে অস্তিত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ন্যায়-মতে আমাদের অভিজ্ঞতায় যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা সত্য। তাহার মনোবাহ্য অস্তিত্ব আছে, তাহা মনের সৃষ্টি নহে, বিজ্ঞানমাত্র নহে। অপ্রমার আলোচনায় নৈয়ায়িকদিগকে এই মতের সংকোচ-বিধান করিতে হইয়াছে। ভ্রমের ক্ষেত্রে যাহা অনুভূত হয়, তাহার মনোবাহ্য অস্তিত্ব নাই, তাহা বিজ্ঞানমাত্র, ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে।

ন্যায়-মতে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়, সে জ্ঞান সত্য, কিন্তু যখন তাহা পাওয়া যায় না, তখন তাহা মিথ্যা। মরুভূমিতে দূরে জলের প্রতীতি হইল, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখা গেল সেখানে কেবল বালুকা, জল নাই। সেখানে পূর্ব্ব প্রতীতি অপ্রমা, তাহা মিথ্যা। অপ্রমা, ভ্রম, বিপর্য্যয় প্রভৃতি শব্দ জ্ঞান-সম্বন্ধেই প্রচুর হইতে পারে, বস্তু সম্বন্ধে নহে। রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া পরে যখন দেখি সে বস্তু রজ্জু, সর্প নহে, তখন আমার অনুভবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, সর্পের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না। কোনও বস্তু যাহা, অন্যরূপে তাহার অনুভবকে বলে অন্যথা-খ্যাতি। অন্যথা-খ্যাতি অপ্রমা।

সৌত্রান্তিক মতে ভ্রমকালে কোনও বাহ্য বস্তুর উপর যে রূপ আরোপিত হয়, সেই রূপ তাহার বাস্তবিক নাই, তাহা মিথ্যা। ইহা জ্ঞানের এক আকার। এখানে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত। যোগাচার মতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, ইহার কারণ অনাদি অবিদ্যা। এতাদৃশ বাহ্য বস্তুর উপর জ্ঞানের আকার আরোপই (জ্ঞানাকারস্য আরোপঃ) অপ্রমা। এই আকার যে মিথ্যা, তাহা অন্য জ্ঞান-দ্বারা এবং আরোপিত আকারের ফলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের বিফলতাদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। এই মতের নাম "জ্ঞানাকার খ্যাতি"। যোগাচার মতে আত্মা, জ্ঞান ও

জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে ভেদ নাই। নৈয়ায়িকগণ বলেন এই মত যদি সত্য হইত, তাহা হইলে শুক্তিতে রজতভ্রমের সময় ইহা রজত এই জ্ঞান হইত না, "আমি রজত" এই জ্ঞান হইত। যোগাচার মতে প্রমা ও অপ্রমার ভেদের ব্যাখ্যা হয় না। কেননা এই মতে বাহ্য বস্তুর বাহ্য অস্তিত্ব নাই, তাহা বিজ্ঞানমাত্র। ভ্রমও এক প্রকার বিজ্ঞান।

মাধ্যমিক বৌদ্ধদিগের মতে সকলই অসৎ, সতের অস্তিত্ব নাই। বাহ্য ও আন্তর উভয় প্রত্যক্ষই ভ্রান্ত। আমাদের জ্ঞান-যন্ত্র এরূপ ভাবে গঠিত, যে অসৎ রজত সৎ-রূপে প্রতিভাত হয়। নৈয়ায়িক বলেন বাহ্য কিছু যদি ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণ না হয়, তাহা হইলে এক ভ্রম হইতে ভ্রমান্তরের কোনও ভেদ থাকে না। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাদ্বারা কোনও কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে ভ্রম-প্রত্যক্ষের যাহা বিষয়—রজ্জুতে সর্প, এবং শুক্তিতে রজত—তাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, তাহা সদসৎবিলক্ষণ, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন এবং অনির্বচনীয়। বন্ধ্যাপুত্র অথবা চতুষ্কোণ বৃত্ত শব্দমাত্র, (শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তু-শূন্য বিকল্পঃ যোগসূত্র)। তাহার কোনও অর্থ নাই; কিন্তু রজ্জুতে সর্পের রূপ এবং শুক্তিতে রজতের রূপ প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং তাহারা যে একেবারে অসৎ তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই সর্প ও রজত-জ্ঞান পরে বিরুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া, ঐ জ্ঞানকে সত্যও বলা যায় না। এইজন্য সর্প ও রজতের প্রতীতির স্বরূপ অনির্বচনীয়। এই প্রতীতির কারণ অবিদ্যা। পূর্ব্ববর্ত্তী সর্প ও রজত জ্ঞানের সংস্কারের সাহায্যে অবিদ্যা কর্তৃক এই প্রতীতির সৃষ্টি হয়। এই প্রতীতির সময়ে মনের সম্মুখে সর্প ও রজতের রূপ উপস্থিত হয়, এবং যতক্ষণ ভ্রমজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তাহারা উপস্থিত থাকে। ইহার খণ্ডনের জন্য নৈয়ায়িক বলেন, ইহা যদি সম্ভবপর হয়, যেখানে সর্প ও রজতের অস্তিত্ব নাই, সেখানে সর্প ও রজতের মনের সম্মুখে উপস্থিতি যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, যে দ্রব্যের প্রত্যয়ই আমাদের মনের মধ্যে আছে, তাহাই তো আমরা দেখিতে পাইতে পারি, এবং প্রত্যক্ষীভূত বস্তু ও তাহার প্রত্যয়ের মধ্যে কোনও ভেদই থাকে না।

প্রভাকরের মতে যখন শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, তখন শুক্তির সহিত রজতের যে রূপ স্মৃতিতে রক্ষিত থাকে, তাহার পার্থক্যের বোধ হয় না বলিয়াই আমরা শুক্তিকে রজত বলি। পরে যখন শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন যে পূর্ব্ব জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নহে, তখন

প্রত্যক্ষ বিষয়ের সহিত (শুক্তির সহিত) স্মৃতিতে রক্ষিত রজত-জ্ঞানের পার্থক্য উপলব্ধ হয়। এই মতকে অখ্যাতি অথবা বিবেকাখ্যাতি বলে। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন ভ্রান্ত জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ রজতেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় (রজতের রূপই ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হয়), রজতের স্মৃতির জ্ঞান (representation) হয় না। তখন বোধ হয় যে রজত মনের সম্মুখে উপস্থিত আছে, পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীকৃত এবং বর্ত্তমানে স্মৃতিতে উদিত বিষয় বলিয়া মনে হয় না। ভ্রান্ত জ্ঞানের সময় প্রত্যক্ষ ও স্মৃত জ্ঞানের মধ্যে ভেদ-জ্ঞানের অভাব হইতে কোনও কর্ম্মের উদ্ভব হইতে পারে না। পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীভূত রজতের স্মৃতির অস্পষ্টতা কিরূপ (যাহার ফলে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষীভূত রজতের সহিত তাহার ভেদ লক্ষিত হয় না) তাহারও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং বর্ত্তমান প্রত্যক্ষই যে ভ্রান্তি-দুষ্ট, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

ন্যায়ের অন্যথা-খ্যাতিবাদের সমালোচনায় অদ্বৈতী বলেন স্থানান্তরে ও কালান্তরে অবস্থিত রজত প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, কেননা তাহা বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্ত্তমান নাই। তাহার স্মৃতি মনে উদিত হয় যদি বলা হয়, তাহা হইলে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান-কালেও অগ্নির স্মৃতি মনে উদিত হয় বলা যায়, এবং তাহা হইলে অনুমানের কোনও প্রয়োজনই থাকে না। আবার প্রত্যক্ষের বিষয় শুক্তি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্ত্তমান। তাহা আপনাকে রজতে পরিণত করিতে পারে না। যদি বলা যায় শুক্তি কিছু ক্ষণের জন্য রজতে পরিণত হয়, তাহা হইলে অন্য লোকও তাহাতে রজতই দেখিতে পাইত।

৩৪

প্রাকৃতিক জগৎ

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের জগৎ-তত্ত্ব এক প্রকার। গৌতম সূত্রের প্রথম সূত্রে যে ষোড়শ পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়। ইহাদের মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয়ের জ্ঞানই নিঃশ্রেয়সের হেতু; অপর পদার্থগুলির জ্ঞান প্রমাণ ও প্রমেয়ের জ্ঞানের সাহায্যের নিমিত্ত।

ন্যায় মতে, প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ১২টি: (১) আত্মা, (২) দেহ, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ বা ইন্দ্রিয়-বিষয়, (৫) জ্ঞান, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি (ক্রিয়া), (৮) দোষ (মনের ত্রুটী), (৯) প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম), (১০)

ফল (সুখ-দুঃখ-বোধ), (১১) দুঃখ, এবং (১২) অপবর্গ বা মুক্তি (১।৩।৯)। এতদ্ব্যতীত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবও প্রমেয়ের অন্তর্গত।

সকল প্রমেয়ই প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্গত নহে। আত্মা, আত্মার গুণ জ্ঞান, এবং মন ভৌতিক পদার্থ নহে। তাহারা প্রাকৃতিক জগতের বহির্ভূত। দেশ ও কাল যদিও ভৌতিক দ্রব্য নহে, তথাপি তাহারা প্রাকৃতিক জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। আকাশ পঞ্চভূতের একটি এবং প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্গত। কিন্তু আকাশ হইতে কোনও বস্তু উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহা কোনও বস্তুর কারণ নহে। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রাকৃতিক জগতের উপাদান। এই চারিভূতের উপাদান পরমাণু। পরমাণুগণ নিত্য এবং অপরিণামী। আকাশ (ইথার), দিক্ (দেশ) ও কাল নিত্য ও অসীম। ইহারা প্রত্যেকে এক বস্তু। বহু আকাশ, বহু দিক, বহু কাল নাই। চারি ভূতের পরমাণু-নির্ম্মিত সকল দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্গত। দ্রব্যদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ, জীব-দেহ ও উদ্ভিদ-দেহ, এবং ইন্দ্রিয়, আকাশ এবং অভৌতিক দিক ও কাল, তাহাদের বিবিধ সম্বন্ধ এবং দৃশ্যমান পরিণাম সকলই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই সকল বস্তুর স্বরূপ-সম্বন্ধে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। ন্যায়দর্শনে এ সম্বন্ধে বৈশেষিক মত সত্য বলিয়া গৃহীত।

৩৫

কাল

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের অনুভবের জন্য যেমন আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় আছে, কালের অনুভবের জন্য সেরূপ কোনও ইন্দ্রিয় নাই। কোনও কোনও নৈয়ায়িকের মতে কাল অভিজ্ঞতার এক রূপ (ইহা ক্যাণ্টেরও মত), এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে ইহা অনুভূত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য-রূপে অনুভূত হয়। আমরা দ্রব্যদিগকে বর্ত্তমান কালে অবস্থিত রূপে প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং দ্রব্যের সহিত কালেরও অনুভব হয়, বলা যায়। প্রত্যেক বস্তুই কালে অবস্থিত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, যদিও স্বতন্ত্র ভাবে কাল কখনও অনুভবের বিষয় হয় না। ঘটনা ও কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধরূপে ভিন্ন পূর্ব্ব ও পরের কোনও অর্থ হয় না। দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য-রূপে অনুভূত হয় বলিয়া, কালও একটি দ্রব্য।

মাধ্যমিক দার্শনিকদিগের মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ-নিরপেক্ষ বর্ত্তমান

কালের অস্তিত্ব নাই। যাহা বর্ত্তমান কালের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই অতীত, যাহা বর্ত্তমান কালের পরবর্ত্তী তাহা ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ ও অতীতকে বাদ দিয়া "বর্ত্তমানে"র কোনও অর্থ হয় না। বাৎস্যায়ন বলেন এই মত ভ্রান্ত। দিক ও কালের ভেদ লক্ষ্য না করার জন্য এই ভ্রমের উদ্ভব হয়। বিরুদ্ধবাদী-দিগের মতে কোনও দ্রব্যের পতন-কালে এক নির্দিষ্ট ক্ষণে যতটুকু স্থান পতন্ত দ্রব্য অতিক্রম করিয়াছে, এবং যতটুকু অতিক্রম করিতে অবশিষ্ট আছে, তাহাদের মধ্যে এমন কোনও স্থান নাই, যাহা বর্ত্তমান কালে অতিক্রান্ত হইতেছে, বলা যায়। যতটুকু স্থান অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইতে অতীতের ধারণা এবং যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতে ভবিষ্যতের ধারণা হয়। এমন কোনও তৃতীয় স্থান নাই, যাহা হইতে বর্ত্তমান কালের ধারণা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দিক্ দ্বারা কাল প্রকাশিত হয় না। কালের প্রকাশক "ক্রিয়া"। যখন পতন-ক্রিয়ার শেষ হয়, তখন অতীত কালের ধারণা হয়; যখন পতন-ক্রিয়া আরম্ভোন্মুখ, তখন ভবিষ্যৎ কালের ধারণা হয়; আর যখন পতন ক্রিয়া চলিতে থাকে, তখন বর্ত্তমান কালের ধারণা হয়। অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় বিন্দুতেই দ্রব্যটি ক্রিয়া-বর্জিত। কিন্তু তাহার পতন-ক্রিয়া চলিতে থাকে যখন দেখিতে পাই, তখন ক্রিয়ার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে। এই সম্বন্ধই বর্ত্তমান কালে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা হইতেই অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ধারণা হয়। বর্ত্তমান কালের অস্তিত্ব না থাকিলে তাহা সম্ভবপর হইত না। আবার কালে অবস্থিত দ্রব্যেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। বর্ত্তমান কাল না থাকিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না। সুতরাং বর্ত্তমান কাল গণিতের বিন্দুর মত বাস্তব অস্তিত্বহীন বস্তু নহে, তাহা কালের একটু অংশ, এবং তাহার নির্দিষ্ট স্থিতি আছে।

৩৬

ক্ষণিকবাদ খণ্ডন

বাৎস্যায়ন ক্ষণিকবাদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে জগতে যে সকল দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায়, তাহারা অনিত্য। কিন্তু পরমাণু, আকাশ, দিক্ ও কালের উৎপত্তিও নাই বিনাশও নাই। ক্ষণিকত্ব যেখানে দেখা যায়, সেখানে তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু প্রস্তরখণ্ডে তাহা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রস্তরকে ক্ষণিক বলা যায় না। বারংবার প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহার স্থায়িত্ব প্রতিপন্ন হয়। সকল বস্তু অসৎ। এই মত বাৎস্যায়ন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন মতে অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। কারণের ধ্বংস না হইলে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। অঙ্কুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বীজের ধ্বংস হয়। ইহার উত্তরে বাৎস্যায়ন বলেন যে বস্তুর ধ্বংস হইয়াছে, তাহা হইতে কিছুরই উদ্ভব হয় না। বীজের ধ্বংস যদি অঙ্কুরের কারণ হইত, তাহা হইলে যখন বীজ নানা অংশে খণ্ডিত হয়, তখনই অঙ্কুরের আবির্ভাব হইত, কিন্তু তাহা হয় না। বীজের খণ্ডিত অংশসকল পুনরায় মিলিত হইয়া নূতন পদার্থে পরিণত হইবার পূর্ব্বে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। সুতরাং অঙ্কুরের কারণ অভাব নহে, বীজের অংশদিগের পুনর্গঠনই তাহার কারণ।

কার্য্য-কারণের নিয়ম অস্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং জগদুৎপত্তির কারণ নিশ্চয় আছে। যদৃচ্ছা হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না।

৩৭

জীবাত্মা ও মুক্তি

জীবাত্মা-সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে বহু বাদ প্রচলিত আছে। চার্বাক মতে চৈতন্য-গুণযুক্ত দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত কোনও আত্মার অস্তিত্ব নাই। ইহা জড়বাদ। বৌদ্ধ মতে জীবাত্মা বিজ্ঞান-সন্ততি মাত্র। বিজ্ঞানের আধার স্বতন্ত্র কোনও দ্রব্য নাই। অদ্বৈত বেদান্ত-মতে সর্ব্ব দেহে একমাত্র আত্মা বর্ত্তমান। আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। তাহার পরিণাম নাই। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীবাত্মা চৈতন্যমাত্র নহে। তাহা "অহমার্থ জ্ঞাতা", অহং পদবাচ্য চৈতন্যময় পুরুষ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে আত্মা এক অসাধারণ দ্রব্য। অন্য কোনও দ্রব্যের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, ইহারা আত্মার গুণ। আত্মার এই সকল গুণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, এবং প্রাকৃতিক কোনও দ্রব্যের এই সকল গুণ নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বর্ত্তমান। প্রত্যেক আত্মার জ্ঞান ও অনুভব অন্যান্য আত্মার জ্ঞান ও অনুভব হইতে ভিন্ন। আত্মা অবিনাশী ও নিত্য। ইহা অসীম ও বিভু (সর্ব্বস্থানব্যাপী), দেশ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। জীবদেহ ও তাহার ইন্দ্রিয়দিগকে আত্মা বলা যায় না। চৈতন্য জড়দেহ ও ইন্দ্রিয়ের গুণ নহে। দেহ অচেতন, তাহাতে বুদ্ধিও নাই। কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ। ইহাদের উদ্ভব ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। মন আত্মা নহে। আত্মার মনন-কার্য্যের সাধনই মন। মন পরমাণু-গঠিত জড় পদার্থ। বুদ্ধি যদি মনের গুণ হইত, তাহা হইলে যোগীদিগের যোগ-প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা করা যাইত না।

আত্মা ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং ইন্দ্রিয়োপলব্ধির ঐক্য-বিধান করে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বোধ আত্মাকর্তৃক একত্রিত ও সংবদ্ধ হয়। চক্ষু শুনিতে পায় না, কর্ণ দেখিতে পায় না। আত্মা যদি ইন্দ্রিয়দিগের হইতে ভিন্ন ও তাহাদের অতীত না হইত, তাহা হইলে যে আমি এখন এক বস্তু দেখিতেছি, সেই আমিই যে সেই বস্তুর কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি, এই জ্ঞান সম্ভবপর হইত না। ইন্দ্রিয়গণ করণ, সুতরাং তাহাদের কর্ত্তা আছে। ইন্দ্রিয়গণ জড়, তাহাদের চৈতন্য নাই। দৃষ্ট বস্তু ও চক্ষু উভয়েরই যখন ধ্বংস হয়, তখনও আমি যে দেখিয়াছি, এই জ্ঞান থাকে। এই জ্ঞান দৃষ্ট বস্তু অথবা ইন্দ্রিয়ে হইতে পারে না। যখন দেহের বিনাশ হয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, মনের ক্রিয়া থাকে না, তখনও আত্মার অস্তিত্ব থাকে।

আত্মা বুদ্ধি নহে, উপলব্ধি (বোধ) নহে, জ্ঞানও নহে। বুদ্ধি অনিত্য, আত্মা নিত্য। নদী-প্রবাহের সহিত সংবিদের তুলনা করা যায়। সংবিদে এক অবস্থার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তিরোধান হয়। জ্ঞানের বিষয় শব্দের ন্যায় ক্ষণিক হউক, অথবা ঘটের ন্যায় কিছুকাল স্থায়ী হউক, জ্ঞান অস্থায়ী। বিষয়ের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব-হেতু জ্ঞানের আপেক্ষিক স্পষ্টতা হয়, কিন্তু তাহার ফলে জ্ঞান চিরস্থায়ী হয় না। পূর্ব্ব পরিচিত বস্তু চিনিতে পারার শক্তি (প্রত্যভিজ্ঞা) বুদ্ধিজাত নহে। বুদ্ধি দ্রব্য নহে, জ্ঞাতাও নহে। ইহা আত্মার গুণ। আত্মা সুখদুঃখের ভোক্তা, সর্ব্বদ্রষ্টা এবং সর্ব্বানুভাবী। আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, ও জ্ঞান, এই ছয়টি আত্মার লিঙ্গ বা চিহ্ন। ইহাদের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। (গৌতম সূত্র—১।১।১০)

কোনও কোনও প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতে আত্মার অব্যবহিত জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ অসম্ভব। তাহাদের মতে আত্মার উপরি উক্ত লিঙ্গ সকল হইতে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারাও তাহার অস্তিত্ব সমর্থিত হয়। এক স্থির আত্মা স্বীকার না করিলে ঐ সকল লিঙ্গের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করা যায় না। কোনও বস্তু পাইবার যখন ইচ্ছা হয়, তখন তাহা সুখজনক বলিয়াই এই ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহা যে সুখজনক তাহা জানিলাম কিরূপে? পূর্ব্বে নিশ্চয়ই তাহা হইতে সুখ পাইয়াছি। সেই সুখের স্মৃতিই এই ইচ্ছার জনক। অথবা ঐ বস্তুর সদৃশ অন্য বস্তু হইতে সুখ পাইয়াছি; এই জ্ঞানই ঐ ইচ্ছার হেতু। সুতরাং এক স্থায়ী আত্মা পূর্ব্বে ঐ বস্তু অথবা তৎসদৃশ বস্তু হইতে সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কোনও বস্তু

প্রাপ্ত হইলে যখন সুখ হয়, তখন ঐ বস্তু পূর্ব্বে সুখ উৎপন্ন করিয়াছে। এই জ্ঞানই তাহার হেতু। এই পরিচিন্তনমূলক জ্ঞানের জন্যও এক স্থায়ী আত্মার প্রয়োজন। এক জনের অভিজ্ঞতা যেমন অন্যে স্মরণ করিতে পারে না, তেমনি দেহ ও ইন্দ্রিয়, যাহারা শারীরিক অবস্থার সমষ্টি মাত্র, অথবা মন যাহা মানসিক অবস্থার প্রবাহ মাত্র, ইহারা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের হেতু হইতে পারে না।

পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয় বলিয়াছেন। আত্মা ও মনের সংস্পর্শ হইতে এই প্রত্যক্ষ হয়। ইহার ফলে "আমি আছি" এই জ্ঞান হয়। ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু অন্য নৈয়ায়িকদিগের মতে আত্মার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আত্মার গুণ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভূতির মাধ্যমেই আত্মার জ্ঞান হয়। "আমি জ্ঞানবান", "আমি সুখী", এই ভাবেই আত্মার জ্ঞান হয়। "জ্ঞানবান" ও "সুখী" আত্মার বিশেষণ, তাহাদেরই জ্ঞান হয়, আত্মার জ্ঞান হয় না। মানসিক অবস্থার মধ্যে আত্মার উপস্থিতির জ্ঞানই "আত্ম-সংবিদ" বা আত্ম-জ্ঞান। এইরূপ ব্যবহিত ভাবে স্বকীয় আত্মার জ্ঞান হইলেও অপরের আত্মার জ্ঞান তাহাদের দৈহিক ক্রিয়াদি হইতে অনুমিত হয়। এই সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা-রূপে চেতন আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

উদ্দ্যোতকর বলেন আত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। "অহম্" প্রত্যয়ের যাহা বিষয়, তাহাই আত্মা। বিভিন্ন জ্ঞানকে আমার নিজের জ্ঞান বলিয়া অনুভবদ্বারা আত্মার স্থায়িত্ব প্রমাণিত হয়। কোনও বস্তু জানিবার ইচ্ছা হইবার পরে আমরা তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করি, এবং তাহার পরে তাহা কি, তাহা জানি। যাহার জানিবার ইচ্ছা, তাহারই চিন্তন এবং পরে তাহারই জ্ঞান। ইহার দ্বারা এই তিন ব্যাপারে একই কর্ত্তার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, তাহার স্মরণ হয়। কোনও দ্রব্য দেখিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হই, তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করি, পরে তাহা প্রাপ্ত হই। একই আত্মা এই সকলের ভিত্তি। আত্মা যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয় এক একটি স্বতন্ত্র বস্তু হইত। প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবপর হইত না। সংবিদে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যদি সংবেদন ও সুখদুঃখের বোধ ভিন্ন আর কিছু না থাকিত, তাহা হইলে কোনও অবস্থাকে আমার অথবা অন্যের বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত না। অন্যের অনুভব আমার অনুভব নহে, কেননা আমার আত্মা তাহার আত্মা হইতে ভিন্ন। আত্মা না থাকিলে

এই ভেদ থাকিত না। স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, আত্মানুস্মরণ, সহানুভূতি, অন্য পুরুষের সহিত সম্বন্ধের জ্ঞান, ইচ্ছা, আত্মখ্যাপন এই সকল দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

চৈতন্য যদি দেহের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে দেহের প্রত্যেক অংশে এবং তাহার জড়ীয় উপাদানে চৈতন্য থাকিত। দেহের উপাদানদিগের যদি চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে ব্যক্তির চৈতন্য এই সকল বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন চৈতন্যের সমষ্টি বলিতে হয়। দেহের যদি চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে সকল জড় পদার্থের চৈতন্য আছে। দেহাতিরিক্ত চৈতন্য যদি না থাকে, তাহা হইলে নৈতিক নিয়মের কোনও অর্থ নাই। ক্ষণে ক্ষণে দেহ পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং পরজন্মে নূতন দেহে পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের পাপ প্রবেশ করিবার হেতু থাকে না। চৈতন্য যদি দেহের স্বরূপ হইত, তাহা হইলে দেহ কখনও চৈতন্য-বিচ্যুত হইত না। মৃত দেহ অসম্ভব হইত। মূর্চ্ছাকালেও চৈতন্য দেখা যায় না। কোনও দ্রব্যের যতদিন অস্তিত্ব থাকে, ততদিন তাহার বর্ণ থাকে। চৈতন্য যদি দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে যতদিন দেহ থাকিত, ততদিন চৈতন্যও থাকিত। চৈতন্য যদি দেহের আগন্তুক গুণ হয়, তাহা হইলে এই চৈতন্যের কারণ দেহ হইতে ভিন্ন। আবার যে বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, চৈতন্য তাহার গুণ হইতে পারে না। যাহা বস্তুকে জানে, তাহার গুণই চৈতন্য। চৈতন্য যদি দেহের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে তাহা অন্যের প্রত্যক্ষ হইত। দেহ চৈতন্যের প্রকাশের যন্ত্র বা সাধন। "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্" (১।১।১১)—চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের আশ্রয়ই শরীর। শরীরদ্বারা আত্মা স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে। আত্মা প্রাণ হইতে ভিন্ন। আত্মার সহিত দেহের এক প্রকার সম্বন্ধের নাম প্রাণ।

আত্মা নিষ্কল, তাহার অংশ নাই। ন্যায়-মতে যৌগিক দ্রব্য বিনশ্বর, কিন্তু যাহা নিরংশ (বিভিন্ন অংশের সমষ্টি নহে) তাহাই নিত্য। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহা বিভিন্ন অবয়বের সংযোগে গঠিত হয় এবং সেই সকল অবয়ব বিযুক্ত হইলে তাহার বিনাশ হয়। আত্মা নিরবয়ব ও শাশ্বত। ইহার আদি নাই, অন্তও নাই। আদি থাকিলে অন্তও থাকিত। আত্মার সীমাবদ্ধ পরিমাণ নাই; যাহাই সীমিত তাহারই অংশ আছে, ও তাহা নশ্বর। আত্মা হয় পরমাণু-পরিমাণ অথবা অসীম। কোনও মধ্যম পরিমাণ ইহার নাই। ইহা পরমাণু-পরিমাণ হইলে, ইহার বুদ্ধি, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ প্রত্যক্ষ হইত না, এবং সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত অনুভবশক্তির ব্যাখ্যা করা যাইত না।

মধ্যম পরিমাণ হইলে আত্মা দেহ হইতে হয় বৃহত্তর নতুবা ক্ষুদ্রতর হইত, দেহ ব্যাপিয়া থাকিতে পারিত না। ইহা যদি দেহের সমান হইত, তাহা হইলে জন্মের পরে দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে ইহা সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইতে পারিত না, জন্ম হইতে জন্মান্তরে ইহার আকার পরিবর্ত্তিত হইত। সুতরাং আত্মাকে বিভু বলিতে হইবে। মনের আনবিক পরিমাণবশতঃই আত্মা সকল দ্রব্য এক সঙ্গে জানিতে পারে না। প্রত্যেক আত্মার একটি করিয়া মন। মনেই কৃত-কর্ম্মের সংস্কার সঞ্চিত হয়।

জীবাত্মার সংখ্যা অনন্ত। তাহা না হইলে, কেবলমাত্র এক আত্মার অস্তিত্ব থাকিলে প্রত্যেক মানুষই অন্য মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি জানিতে পারিত। যখন এক জনে সুখ কিংবা দুঃখ অনুভব করিত, তখন সকলই তাহা অনুভব করিত।

চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নহে। আত্মায় উদ্‌ভূত জ্ঞান-প্রবাহের শেষ আছে। উদ্দ্যোতকর বলেন "আত্মার দেহে অবস্থিতি-কালের শেষ জ্ঞানের বিনাশ হয়, যখন তাহার পুণ্য বা পাপ-রূপে অবস্থিতির কোনও কারণ থাকে না; অথবা কালের শক্তিতে তাহা বিনষ্ট হয় (কাল পাপ-পুণ্যের ফল নষ্ট করিতে সক্ষম), অথবা শেষ জ্ঞানের সংস্কার-উৎপত্তির ফলে সেই জ্ঞান বিনষ্ট হয়। চৈতন্যের আধার আত্মা। আত্মার শেষ জ্ঞানের বিনাশ হইতে অনুমিত হয়, যে চৈতন্যবিহীন হওয়াও আত্মার পক্ষে সম্ভবপর। প্রকৃতপক্ষে ন্যায়-মতে আত্মা একটি জড় তত্ত্ব, যাহা চৈতন্যবিশিষ্ট হইতে পারে। চৈতন্য আত্মার একটি গুণ, জাগ্রৎ অবস্থায় মনের সহিত আত্মার সংযোগের ফলে ইহার উৎপত্তি হয়। এই গুণ সর্ব্বদা আত্মায় থাকে না। কিন্তু চৈতন্য আত্মা ভিন্ন অন্যত্র থাকিতে পারে না, যেমন দীপশিখার ঔজ্জ্বল্য দীপশিখা ব্যতীত থাকিতে পারে না। নৈয়ায়িকগণ বিষয়ী ও বিষয়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। নির্দিষ্ট স্থানে ভিন্ন চৈতন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং বিশুদ্ধ চৈতন্য—আধারবিহীন চৈতন্যের অস্তিত্ব নাই। আত্মা জ্ঞান নহে, জ্ঞাতা, অহংকারাশ্রয় ও ভোক্তা।

আত্মা নিত্য। মাঝে মাঝে তাহা স্বকর্ম্মের অনুরূপ দেহের সহিত সংযুক্ত হয়। অদৃষ্ট-প্রভাবে দেহ গঠিত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল দেহ। প্রত্যেক মানুষকে যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে, এবং যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে ইহবে, তাহার উপযোগী দেহ সে প্রাপ্ত হয়। উদ্দ্যোতকর বলেন যে পিতামাতার কর্ম্ম এবং পুত্রের কর্ম্ম উভয়েই মাতৃগর্ভে পুত্রের দেহের

উৎপাদক। দেহের সহিত আত্মার সংযোগের আরম্ভই জন্ম, এবং বিয়োগ মৃত্যু।

সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাণুদিগের মধ্যে এক প্রকার চেষ্টার উদ্ভব হয়। তাহার ফলে তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন জড় দ্রব্যের উৎপত্তি করে। সেই সময়ে আত্মাদিগের মনেও সদৃশ চেষ্টার উদ্ভব হয়। তাহার ফলে আত্মাদিগের পূর্ব্বজন্মে কৃত কর্ম্মের অনুরূপ গুণের উদ্ভব হয়। এই সকল গুণ একাধিক জন্মের কর্ম্মের ফল। প্রত্যেক জীবন অতীত ও ভাবী বহু জীবনের একটি অংশ মাত্র।

৩৮

প্রেত্যভাব বা পুনর্জন্ম

চার্বাক দর্শন ব্যতীত ভারতীয় অন্য সকল দর্শনেই জন্মান্তর স্বীকৃত। ন্যায় দর্শনে জন্মান্তরের প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহারা এই:

(১) শিশুগণ জন্মের অত্যল্প কাল মধ্যেই সুখ ও দুঃখ-বোধের চিহ্ন প্রকাশ করে। তাহাদিগের হাসি ও কান্নাকে পদ্মফুলের পাপ্‌ড়ীর প্রস্ফুটিত ও মুদিত হওয়ার মতো প্রকৃতির যান্ত্রিক নিয়মের ফল বলা যায় না। অনুকূল বেদনায় হাসি ও প্রতিকূল বেদনায় কান্না পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসের ফল। শিশুর দুগ্ধ-পানের ইচ্ছার সহিত চুম্বক লৌহের লৌহ-আকর্ষণের তুলনা খাটে না, কেননা মানবশিশু লৌহের মত নির্জীব বস্তু নহে। অন্যান্য দ্রব্য তাহাদের গুণের সহিত যেমন উৎপন্ন হয়, ইচ্ছাগুণসমন্বিত শিশুও তেমনি উৎপন্ন হয়, এই যুক্তির মূল্য নাই। কেননা ইচ্ছা গুণমাত্র নহে, তাহা পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতার ফল। নিঃসম্বল অবস্থায় আমরা জন্মগ্রহণ করি না। পূর্ব্বজন্মে অর্জিত অভ্যাস এবং কিছু কিছু স্মৃতি লইয়া আমরা পৃথিবীতে পুনরায় আসি।

বাৎস্যায়ন বলেন সদ্যোজাত বৎসের যে স্তন্যপান-প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার কারণ স্তন্যপানের অভিলাষ। পুনঃ পুনঃ স্তন্যপান যে করে নাই, তাহার এরূপ অভিলাষ সম্ভবপর নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে শিশু পূর্ব্ব-জন্মে স্তন্যপান করিয়াছিল। "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ" (গৌ সূ ৩।১।২৫) এই সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলেন, জীব রাগযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পরেই জীবে রাগানুবন্ধ দৃষ্ট হয়। রাগ বা আসক্তির কারণ পূর্ব্বে অনুভূত বিষয়ের অনুচিন্তন। সুতরাং ইহা হইতেও পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব বুঝা

যায়। ইহজন্মে অনুভূত হয় নাই এরূপ বিষয়েও শিশুর হর্ষ, শোক ও ভয় দেখা যায়, অনুস্মরণ ভিন্ন ইহা সিদ্ধ হয় না। আবার অনুস্মরণ পূর্ব্ব অভ্যাস ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। যদি পূর্ব্বজন্ম থাকে তবেই এই পূর্ব্বাভ্যাস সম্ভবপর হয়।

(২) সুনীতির দিক হইতেও পূর্ব্ব জীবনের সমর্থন পাওয়া যায়। মৃত্যুতেই যদি আত্মার বিনাশ হয়, তাহা হইলে, "কৃতহানি ও অকৃতাভ্যুপগম" হয়—অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে কৃত কর্ম্ম বিনষ্ট হয়, পরজন্মে তাহার ফলভোগ হয় না, এবং পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম কৃত হয় নাই (পূর্ব্বজন্মই নাই বলিয়া) বর্ত্তমান জন্মে তাহার ফলভোগ হয়। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার ভাগ্যের ব্যাখ্যার জন্য পূর্ব্বজন্ম, এবং বর্ত্তমান জন্মে কৃত কর্ম্মের ফলভোগের জন্য ভবিষ্যৎ জন্ম স্বীকার করিতে হয়। যখন পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ শেষ হয়, কোনও পাপ বা পুণ্য ফলভোগের জন্য অবশিষ্ট থাকে না, তখনই মোক্ষ হয়। মোক্ষের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে যাবতীয় কর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়।

ন্যায় দর্শনে সূক্ষ্ম শরীরের কথা নাই। কর্ম্মের সংস্কার মনে রক্ষিত হয়।

৩৯

মোক্ষ

দুঃখ হইতে মুক্তিই মোক্ষ। মোক্ষে ভয় থাকে না, তাহা অবিনশ্বর পূর্ণ শান্তি ও পবিত্রতার অবস্থা। মোক্ষই অপবর্গ, মোক্ষই নিঃশ্রেয়স। ইহা আত্মার বিনাশ নহে, বন্ধের বিনাশ। সুখের সহিত সর্ব্বদাই দুঃখ থাকে। সুখ দুঃখের মতই উৎপত্তিশীল। মোক্ষ সুখের অবস্থা নহে। মোক্ষ অনন্ত সুখের অবস্থা হইলে, তাহার জন্য এক অবিনশ্বর দেহের প্রয়োজন হইত; কেননা দেহ ব্যতীত ভোগের সম্ভব হয় না। ন্যায়-মতে মুক্তি-অর্থে সমস্ত কর্ম্ম-চেষ্টা-ও-চৈতন্যহীন দেহ-বিযুক্ত অবস্থা। সুষুপ্তির অবস্থার সহিত মোক্ষের সাদৃশ্য আছে। এই জ্ঞানহীন, সুখহীন অবস্থাকে নৈয়ায়িকগণ অতি মহৎ বলিয়া গণ্য করেন, কেননা আত্মা তখন বিভুত্ব প্রাপ্ত হয়, যদিও তখন তাহাতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও কামনা থাকে না। বাৎস্যায়ন বলেন মুক্তিতে আত্মা যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ নাই, যুক্তিও নাই। যত দিন দেহের সহিত আত্মা যুক্ত থাকে, ততদিন দুঃখ-মুক্তি অসম্ভব, কেন না দেহস্থ ইন্দ্রিয়দিগের সহিত দুঃখজনক বিষয়ের সংস্পর্শ নিবারণ করা অসম্ভব। এই সংযোগ যখন ছিন্ন হয়, তখন দুঃখের সহিত সুখের অনুভবেরও নিবৃত্তি হয়। তখন জ্ঞান ও চৈতন্যও থাকে না। সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানহীন অবস্থাই মোক্ষের অবস্থা। এই

দুঃখ-নিবৃত্তি সাময়িক নহে, মোক্ষে সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এই অবস্থাই বেদে অভয়, অজর ও অমৃত্যুপদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মোক্ষের জন্য আত্মার স্বরূপের ও অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন। আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, মন হহে—এই জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞান-লাভের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। ইহাদের দ্বারা আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান হয়, মিথ্যা জ্ঞান তিরোহিত হয়, এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ—এই ত্রিবিধ "দোষ"-জাত কর্ম্ম-প্রবৃত্তির ধ্বংস হয়। যখন কামনা ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তখন কোনও কর্ম্ম ফলোদ্দেশ্যে কৃত হয় না, এবং তাহার ফল উৎপন্ন হয় না। অতীতে কৃত কর্ম্ম যখন ফল উৎপাদন করিয়া নিঃশেষ হয়, তখন আর জন্ম হয় না। জন্ম-নিরোধের অর্থ দেহ-সম্বন্ধের এবং তজ্জাত দুঃখকষ্টের নিবৃত্তি।

৪০

ঈশ্বরবাদ

বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তাহাতে "তৎ বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (তাঁহার বাক্য বলিয়া বেদ প্রমাণ) এই সূত্রটি দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে। সূত্রের ভাষ্যকারগণ ইহা ঈশ্বরবোধক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আরও কয়েকটি সূত্রে তাঁহারা ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন। ন্যায়-সূত্রে ঈশ্বরের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এবং ন্যায়-সূত্রের ভাষ্যকারগণ বিস্তারিত ভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন পদার্থের জ্ঞান-লাভ ও তাহার ফল মুক্তি-প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না।

ন্যায়-সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এইভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফলাদর্শনাৎ (৪।১।১৯)। জগতের কারণ ঈশ্বর। জীবের কর্ম্মফল তাহার আয়ত্ত নহে। কর্ম্মফল যাহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন জীব কর্ম্ম না করিলে ফল উৎপন্ন হয় না, সুতরাং কর্ম্মই তাহার ফলের উৎপাদক। ঈশ্বর-স্বীকারের প্রয়োজন কি? "ন পুরুষ-কর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ" (৪।১।২০)। উত্তরে সূত্রকার বলেন "তৎ কারিতত্বাৎ অহেতুঃ" (৪।১।২১)। কর্ম্ম বিষয়ে জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই। কর্ম্ম ঈশ্বর-কর্তৃক কারিত, অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া জীব কর্ম্ম করে। সুতরাং কর্ম্মকে তাহার ফলের হেতু বলা যায় না। যে শক্তিদ্বারা জীব কর্ম্ম করে, তাহা ঈশ্বরের অধীন।

ঈশ্বরের জগৎ-স্রষ্টৃত্ব-সম্বন্ধে আপত্তি হয় "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টক-তৈক্ষ্ণ্যাদি-দর্শনাৎ" (৪।১।২২)। নিমিত্তের অভাবেও বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে। কণ্টকের অগ্রভাগ কেহ সূক্ষ্ম করিয়া দেয় না। তাহা আপনা হইতেই সূক্ষ্ম হয়। উত্তরে সূত্রকার বলেন "অ-নিমিত্ত-নিমিত্তত্বাৎ ন অনিমিত্ততঃ।" অনিমিত্তকে তুমি বস্তুর উৎপত্তির নিমিত্ত বলিতেছ। কিন্তু নিমিত্ত-অভাবে কোনও বস্তুর উৎপত্তিই হইতে দেখা যায় না। কণ্টকের উদাহরণ অপ্রযোজ্য। কেননা কণ্টকের তীক্ষ্ণতার নিমিত্ত আছে কি না, তাহাই বিচার্য্য। তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করিতে পার না। "নিমিত্তা নিমিত্তয়োরর্থান্তর ভাবাদপ্রতিষেধঃ" (৪।১।২৪)। নিমিত্ত ও অনিমিত্ত ইহাদের একটি না হইলে অন্যটি হইবে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে অনিমিত্ত উৎপত্তি দেখা যায় না। সুতরাং জগৎ সনিমিত্ত। ঈশ্বরই জীবের নিমিত্ত।

ভাষ্যকারগণ ঈশ্বরাস্তিত্বের নিম্নলিখিত প্রমাণ দিয়াছেন: (১) জগতের যাবতীয় বস্তু অবয়ববিশিষ্ট অর্থাৎ অংশ-সমবায়ে গঠিত। এই অংশদিগের সংযোগের কর্ত্তা ঈশ্বর। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর "অবান্তর মহত্ত্ব" আছে অর্থাৎ তাহারা অসীম নহে, পরমাণুর মত সূক্ষ্মও নহে। দিক্, কাল, আকাশ ও আত্মা অসীম, তাহাদের অংশ নাই সেইজন্য তাহারা নিত্য। তাহাদের উৎপত্তি হয় না। পরমাণুগণ যৌগিক পদার্থ নহে বলিয়া তাহাদেরও উৎপত্তি নাই, অন্য যাবতীয় দ্রব্য অবয়বী এবং সসীম আয়তন-বান্ বলিয়া সৃষ্ট। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি বহু সংখ্যক উপাদানের সমবায় গঠিত। এই সকল উপাদান যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, তাহাদের দ্বারা এই সকল দ্রব্যের সৃষ্টির জন্য একজন বুদ্ধিমান কর্ত্তার প্রয়োজন। এই কর্ত্তা পুরুষ। উপাদান-পরমাণুদিগের সম্বন্ধে সকল জ্ঞান না থাকিলে তিনি তাহাদিগের দ্বারা কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার কোনও উদ্দেশ্য না থাকিলেও তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ক্ষমতাও তাঁহার না থাকিলে সৃষ্টি হয় না। সুতরাং জগৎ-সৃষ্টির জন্য জ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতি-সম্পন্ন এক পুরুষের প্রয়োজন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ না হইলে অসংখ্য সূক্ষ্ম পরমাণুদ্বারা এই বিরাট জগতের সৃষ্টি করিতে পারিতেন না।

(২) এ জগতে বিভিন্ন লোকের ভাগ্য বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী। ইহার কারণ অদৃষ্ট—অর্থাৎ আমাদের ইহজন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মের ফল। প্রত্যেকে স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে বাধ্য। ইহা ঋত—নৈতিক জগতের অখণ্ডনীয়

নিয়ম। প্রত্যেক কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হয়। নৈতিক কর্ম্মের ফল শাস্তি বা পুরস্কার —দুঃখ অথবা সুখ। কিন্তু কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হয় কিরূপে? বহুকাল ব্যবধানের পরে কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিরূপে ইহা সংঘটিত হয়? যৌবনে পাপ করিয়া বার্দ্ধক্যে তাহার ফল ভোগ করে। পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ এই জন্মে হয়। ইহার উত্তর এই, সৎকর্ম্মের ফল পুণ্য-রূপে এবং অসৎ কর্ম্মের ফল পাপ-রূপে সঞ্চিত হয়। এই পাপ ও পুণ্যই অদৃষ্ট। কিন্তু অদৃষ্ট তো বুদ্ধিমান পুরুষ নহে। ইহা দ্বারা কিরূপে পাপের ফল দুঃখ এবং পুণ্যের ফল সুখের উৎপত্তি হইতে পারে? ন্যায়-দর্শন মতে এক বুদ্ধিমান পুরুষ কর্ত্তৃক অদৃষ্ট চালিত হইয়া ফলের উৎপত্তি করে। তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর। পুণ্যের সহিত সুখের সংযোগ এবং পাপের সহিত দুঃখের সংযোগ Kant-এর মতেও ঈশ্বর-কৃত।

(৩) বেদের প্রামাণ্য দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বেদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ পদার্থের কথা আছে। প্রত্যক্ষ বস্তু-সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, পরীক্ষাদ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। এই হেতুতে বেদের অন্যান্য উক্তিকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সসীম জীবের পক্ষে বেদ-রচনা অসম্ভব। সুতরাং বেদকর্ত্তা একজন অসীম জ্ঞানবান পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

(৪) শ্রুতিতে ঈশ্বরের কথা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা, সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্য ঈশান, সর্ব্বস্য অধিপতিঃ" (৪।৪।২২)। "স বা মহান্ অজ আত্মা অন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ" (এই মহান্ অজ আত্মা অন্নদাতা ও ধনদাতা ইত্যাদি)। বহু স্থানে শ্রুতিতে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে।

উদয়ন তাঁহার কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নিম্নলিখিত শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন:

কার্য্যায়োজন ধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ
বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্ববিদ্ অব্যয়ঃ।

কার্য্য, আয়োজন, ধৃতি প্রভৃতি, এবং পদ, শ্রুতির প্রত্যয়, বাক্য, বিশিষ্ট সংখ্যা অব্যয় বিশ্ববিদের (ঈশ্বরের) অস্তিত্বের প্রমাণ। জগৎ বিবিধ উপাদানে গঠিত কার্য্য, সুতরাং তাহার কর্ত্তা আছে। যাহার স্বরূপের কোনও কারণ নাই, তাহা কার্য্য হইতে পারে না। জগতের কর্ত্তা এক বুদ্ধিমান্ পুরুষ—ইচ্ছা, চিকীর্ষা ও উপায়-জ্ঞানসমন্বিত পুরুষ। যে উপায়ে জগতের উপাদানদিগের

দ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা তিনি অবগত আছেন। জগতে সন্নিবেশ-বিশিষ্টতা (design)—যেখানে যে উপাদানের প্রয়োজন, সেখানে তাহার সন্নিবেশ—হইতে তাহার কর্ত্তা-স্বরূপ বুদ্ধিমান এক পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। দুই পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপাদন "আয়োজন"। ইহার জন্য বুদ্ধিমান্ কর্ত্তার প্রয়োজন। এই বিশ্ব ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিধৃত (ধৃতি), জগতের ধ্বংসকর্ত্তা ও তিনি। পরম্পরাগত শিল্পের (পদ) আবিষ্কারের জন্য বুদ্ধিমান পুরুষের (ঈশ্বরের) প্রয়োজন। শ্রুতির প্রামাণ্য ঈশ্বর হইতেই প্রাপ্ত (শ্রুতেঃ প্রত্যয়ঃ)। ঈশ্বর বেদকর্ত্তা বলিয়া শ্রুতি হইতে সত্য জ্ঞান লাভ হয়। শ্রুতিতেই ঈশ্বরের কথা আছে। বেদ বাক্যের সমষ্টি, সেই সকল বাক্যের বক্তা ঈশ্বর। দ্ব্যণুকে পরমাণু দুইটির পরিমাণ (পরিমণ্ডল) দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ নহে, তাহার কারণ "দুই" এই "সংখ্যা"।

উদয়ন বলেন ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। ইহা তাঁহার অনস্তিত্বের কারণ নহে। প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় যদি অপ্রত্যক্ষ হয় তবে অপ্রত্যক্ষতাদ্বারা তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন।

ন্যায়ের ঈশ্বর সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ পুরুষ। তাহাতে অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান এবং প্রমাদের অস্তিত্ব নাই। তিনি পুণ্য ও জ্ঞানের আধার। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান। তিনি আপ্তকর্ম্মফল—অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মের যাবতীয় ফল তাঁহার অধিগত। তিনি পিতার মতো সকল জীবের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বদাই বর্ত্তমান বলিয়া তাঁহার স্মৃতি অথবা অনুমানের প্রয়োজন নাই। যোগিগণ যে জ্ঞান যোগবলে প্রাপ্ত হন, সাধারণ মানব যাহা ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বরে তাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তাঁহার অভিলাষ আছে, বিশুদ্ধ বাধাহীন বুদ্ধি ও শাশ্বত আনন্দ তাহাতে সদা বর্ত্তমান। মানুষের মনে যে সকল ভ্রান্ত জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহাও তিনি অবগত আছেন।

সকল কর্ম্মই দুঃখজনক। দোষই (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) কর্ম্মের জনক। ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত কিছুই নাই। তবে তিনি সৃষ্টি করিলেন কিসের জন্য? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন মানবের প্রতি অনুকম্পাই সৃষ্টির কারণ। কিন্তু জগৎ তো দুঃখের আগার। তাহাতে অনুকম্পার পরিচয় কোথায়? ইহার উত্তর—নিরবচ্ছিন্ন সুখ বস্তুর স্বরূপের প্রতিকূল। বিভিন্ন সৃষ্ট জীবের সৎ ও অসৎ কর্ম্মের ফলের মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। ঈশ্বর যদি জীবের কর্ম্মফল দ্বারা চালিত হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? উদয়ন

বলেন ইহাতে ঈশ্বরের স্বাধীনতার অপহ্নব হয় না, কেননা কর্ম্মফল তাঁহারই স্বেচ্ছাকৃত। ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবের সুখ নহে, তাহাদিগের আত্মিক বিকাশ। আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের পরিপূরণ-ক্ষেত্রই এই জগৎ। দুঃখদ্বারা চরিত্রের বিশুদ্ধি এবং ত্যাগদ্বারা পূর্ণতা সাধিত হয়।

ন্যায় দর্শনের ঈশ্বরবাদের সমালোচনায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে যখনই কোনও বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে নৈয়ায়িকগণ অক্ষম হন, তখনই তাঁহারা "অদৃষ্টে"র আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরমাণুর গতি, অগ্নির ঊর্দ্ধগতি, চুম্বককর্তৃক লৌহাকর্ষণ সকলই তাঁহারা "অদৃষ্ট"-কৃত বলেন। ইহাতে তাঁহাদের ব্যাখ্যার অসামর্থ্যই প্রমাণিত হয়।

নৈয়ায়িকগণ জগৎকে "কার্য্য" বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার কারণরূপে ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু জগৎ যে কার্য্য, তাহা যে কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই তো প্রমাণের বিষয়। জাগতিক বস্তুসকল উৎপন্ন হয়। তাহাদের ধ্বংসও হয়। ইহাও অভিজ্ঞতার বিষয়। কিন্তু তাহা দ্বারা সমগ্র জগৎই যে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রমাণিত হয় না। দিক্, কাল, পরমাণু প্রভৃতি তো ন্যায়-মতে নিত্য। সমগ্র জগতের নিত্যত্বে বাধা কোথায়?

প্রত্যেক কার্য্যের যে নিমিত্ত কারণ থাকিতেই হইবে, তাহার নিশ্চিতি কি? কার্য্য-কারণ নিয়ম সামুদ্পাদিক জগতের নিয়ম। তাহার বাহিরে এই নিয়মের প্রয়োগ হইতে পারে না। জগতের বহিঃস্থ জগৎ-কারণের জ্ঞানলাভ মানব-বুদ্ধির সাধ্য নহে। শঙ্কর বলেন এই জগৎ স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ, আপনা হইতেই আছে, অথবা কোনও কারণকর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যদি কারণ স্বীকার করিতে হয় তবে সেই কারণের কারণও স্বীকার করিতে হয়। ইহার পরে ক্রমাগতঃ পশ্চাৎ দিকে যাইতে হয়। ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে সৃষ্টি করিল কে? সাংখ্য-মতে কেহ জগতের সৃষ্টি করিয়াছে ইহা বিশ্বাস অপেক্ষা জগৎ আপনা হইতেই আছে বিশ্বাস করা কঠিন নহে।

জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বরের শরীর আছে কি না এই প্রশ্ন কেহ কেহ উত্থাপন করিয়াছেন। যদি তাঁহার দেহ থাকে, তাহা হইলে তিনি অদৃষ্টের অধীন, কেননা সকল শরীরই অদৃষ্টকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শরীরবান্ যাবতীয় বস্তুই সৃষ্ট। সূক্ষ্ম পরমাণু ও পুণ্য-পাপের উপর তাহাদের কোনও কর্তৃত্ব নাই। অবিনশ্বর দেহ কিরূপ, সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কোন কোনও নৈয়ায়িকের মতে ঈশ্বর দেহহীন হইলেও সৃষ্টি করিতে সমর্থ। আবার কেহ কেহ বলেন

আমাদের অদৃষ্টের ফলে ঈশ্বরের শরীর উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও পরমাণু-দিগকেই ঈশ্বরের দেহ বলা হয়। কখনও বা আকাশ তাঁহার দেহ বলিয়া উক্ত হয়। দেহহীন হইয়াও ঈশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে প্রথমে জগতের উপাদান সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাদ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করেন, ইহা বলিতেও বাধা নাই।

ন্যায়ের ঈশ্বর সৃষ্টি-ও-প্রলয়-কর্ত্তা হইলেও তিনি জগতের বাহিরে অবস্থিত এবং জগৎ হইতে ভিন্ন। জগতের উপাদান অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, বাহ্য সূত্রে গ্রথিত। ঈশ্বর এই সকল উপাদানের—পরমাণুদিগের—স্রষ্টা নহেন। তাহাদিগের দ্বারা তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করেন, এই অর্থেই তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। জীবাত্মাগণ নিত্য, তাহারা ঈশ্বর সৃষ্ট নহে। ঈশ্বর জগতের প্রাণ নহেন, জগতে অনুস্যূত থাকিয়া তিনি জগৎ পরিচালনা করেন না। তিনি অনন্ত হইলেও জগতের বাহিরে অবস্থিত। আবার জগৎও অন্তহীন। দুই অসীমের প্রত্যেকে অন্যটি কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহারা অসীম হইতে পারে না। প্রত্যেক আত্মাই এক সময়ে মুক্তিলাভ করিবে। সকল আত্মা যখন মুক্ত হইবে তখন সংসারেরও লয় হইবে। যাহার অন্ত আছে, তাহার আদিও আছে। সুতরাং জীবসমন্বিত জগতের আদি ছিল স্বীকার করিতে হয়, শূন্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে বলিতে হয়। ঈশ্বর মানবের প্রতি প্রীতিবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ কি? পরমাণুগণ ও মানবাত্মা, উভয়েই যদি নিত্য হয়, এবং তাহাদের পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফল যদি এই জগৎ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোথায়? সুতরাং হয় ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, নতুবা জীবাত্মা ও পরমাণুগণ উভয়ই ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিতে হইবে। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা এই ভাবেরই দ্যোতক। ন্যায়মতে জীবাত্মাগণ ও পরমাণুগণ ঈশ্বরের মতোই নিত্য ও অনাদি। ন্যায়-শাস্ত্রে ঈশ্বরে ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত একত্ব-লাভের কথা তাহাতে নাই।

৪১

নব্য ন্যায়

বঙ্গদেশে ষড়দর্শনের মধ্যে ন্যায়দর্শনের চর্চ্চাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। গত কয়েক শত বৎসরে নবদ্বীপে ও অন্যত্র বহু বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা

করিয়াছেন। নব্যন্যায় বলিয়া পরিচিত ন্যায়দর্শনের আবির্ভাব হয়, মিথিলায়। তথা হইতে ইহা বঙ্গদেশে আনীত হয়।

ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, ন্যায় কুসুমাঞ্জলি, আত্ম-তত্ত্ব-বিবেক এবং কিরণাবলী-প্রণেতা উদয়নাচার্য্য নব্যন্যায়ের উদ্ভবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম কিংবা একাদশ শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাবকাল। উদয়নের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, আত্ম-তত্ত্ব-বিবেক এবং কিরণাবলীতে নব্য-ন্যায়ের বীজ নিহিত ছিল। উদয়ন মিথিলাবাসী ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে মিথিলাতেই গঙ্গেশ উপাধ্যায় আবির্ভূত হইয়া নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া নব্য ন্যায়ের অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান পিতার তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মিথিলায় সে গ্রন্থের বহুল প্রচার হয়। ইহার পরে বহু নৈয়ায়িক পণ্ডিত মিথিলায় আবির্ভূত হইয়া ন্যায় দর্শনের বিস্তারসাধন করেন। রুচিদত্ত-রচিত "প্রকাশ" নামক তত্ত্বচিন্তামণির টীকা দাক্ষিণাত্যে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। স্মার্ত্ত পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্র ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে নব্য ন্যায়চর্চ্চা প্রথমে নবদ্বীপে আরব্ধ হয়। কথিত আছে মিথিলার নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র নবদ্বীপের বাসুদেব কৃতবিদ্য হইয়া দেশে ফিরিবার সময় ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকখানা পুঁথি সঙ্গে আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া তিনি তত্ত্বচিন্তামণি চারিখণ্ড এবং কুসুমাঞ্জলির কারিকাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

এই কিংবদন্তী সত্য কিনা বলা যায় না। আধুনিক এক লেখকের মতে বাসুদেব (সার্ব্বভৌম) পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন না, এবং তাঁহার বহু পূর্ব্বে নবদ্বীপে নব্য ন্যায়চর্চ্চা আবদ্ধ হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম ষড়দর্শনে কৃতবিদ্য ছিলেন এবং "তত্ত্বচিন্তামণি ব্যাখ্যা" এবং বেদান্তগ্রন্থ "অদ্বৈত-মকরন্দের" টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পুরীধামে চলিয়া যান শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের সমকালে। পুরী হইতে পরে তিনি বারাণসী গিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে তাঁহার "তত্ত্বচিন্তামণি ব্যাখ্যা" রচিত হইয়াছিল।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি। কেহ কেহ চৈতন্য-

দেবকেও সার্ব্বভৌমের ছাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে পুরীতেই চৈতন্যদেবের সহিত সার্ব্বভৌমের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় পণ্ডিত বাংলাদেশে গত সহস্র বর্ষের মধ্যে আবির্ভূত হন নাই। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের কয়েকখানার নাম নিম্নে লিখিত হইল: (১) প্রত্যক্ষমণি দীধিতি (দীধিতি=আলোক), গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকা, (২) অনুমান দীধিতি, (৩) শব্দমণি দীধিতি, (৪) পদার্থ-খণ্ডন, (৫) নঞবাদ, (৬) আখ্যাতবাদ। 'পদার্থখণ্ডনে' শিরোমণির কয়েকটি সিদ্ধান্ত এই:

(১) দিক, কাল ও আকাশ ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থ নহে।

(২) ঈশ্বরে মহৎ পরিমাণ নাই।

(৩) মন ত্রসরেণু হইতে অতিরিক্ত নহে।

(৪) পরমাণু ও দ্ব্যণুকের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই।

( ) দ্রব্যাদি পঞ্চ ভিন্ন "বিশেষ" নামক পৃথক ভাব-পদার্থ নাই।

(৬) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও কর্ম্ম অব্যাপ্যবৃত্তি।

(৭) সত্ত্ব, গুণত্ব ও অনুভবত্ব জাতি নহে।

(৮) অত্যন্তাভাবের অভাব ভাবস্বরূপ নহে, পরন্তু অতিরিক্ত।

(৯) ক্ষণ, স্বত্ব, কারণত্ব, শক্তি, কার্য্যত্ব, সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়তা প্রভৃতি গুণাদি ভিন্ন অতিরিক্ত পদার্থ।

(১০) সমবায় এক নহে নানা এবং সমবায়ত্ব অখণ্ডোপাধি।*

গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রধানতঃ চারি প্রমাণেরই আলোচনা করিয়াছিলেন, তাত্ত্বিক দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা তাঁহার গ্রন্থে নাই। কিন্তু রঘুনাথ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কয়েকজন নৈয়ায়িক তাত্ত্বিক বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার (ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ) ও গদাধর ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী (১৭শ শতাব্দী) নব্য ন্যায়ের দেশ-বিশ্রুত অধ্যাপক ছিলেন। জগদীশের অনুমান-দীধিতির টীকাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রত্যক্ষ দীধিতি টীকা, সর্বশক্তি প্রকাশিকা, তর্কামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। গদাধর মূল তত্ত্ব চিন্তামণির টীকা, প্রত্যক্ষ দীধিতি টীকা, নঞবাদ ব্যাখ্যা, কুসুমাঞ্জলি টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

---

* বাঙ্গালীর শাশ্বত অবদান (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) পৃ—৮৪।

৪২

পরিসমাপ্তি

ন্যায় দর্শনের জ্ঞানবাদ দর্শনের ইতিহাসে তাহার প্রধান দান। ইহার উপরেই এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় দর্শন ধর্ম্মমূলক ও যুক্তিবর্জ্জিত বলিয়া একটা অপবাদ আছে। ন্যায়দর্শন এই অপবাদের প্রতিবাদ। ন্যায় দর্শনের জ্ঞানবাদ ভারতীয় অন্যান্য দর্শনেও ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। উপনিষদে যে "বাকোবাক্য" শাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, গৌতমের ন্যায়সূত্র তাহারই বিকশিত রূপ। সত্যের সমস্যা-সমাধানে ন্যায় দর্শনে তর্কের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, এবং যুক্তিদ্বারা তাহার দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু পারিভাষিক শব্দ ন্যায়দর্শনে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাহারা অন্যান্য দর্শনে গৃহীত হইয়াছে। "চক্রক" (argument in a circle), "সাধ্যসম" (Petitio Principii), অন্যোন্যাশ্রয় (mutual dependence), "অনবস্থা" (Infinite regress) প্রভৃতি শব্দ ন্যায় দর্শনের আবিষ্কার।

ব্যবহারিক জগতের ব্যবহারিক জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্ম ও দর্শনের সমস্যা সমাধান করা যায়, এই বিশ্বাস ন্যায় দর্শনের ভিত্তি। এই বিশ্বাসের যেমন মূল্য আছে, ইহার ত্রুটীও আছে। সাধারণ লোক বাহ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কেননা ইন্দ্রিয়ে ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি সকল সময়ে সত্য হয় না। সাধারণ লোকে তাহার নিজের অস্তিত্বেও দৃঢ় বিশ্বাসী। কিন্তু তাহার এই "নিজ"—তাহার আত্মা—উপলব্ধির বিষয় কখনও হয় না। সতের মধ্যে সত্তার পরিমাণ ভেদ (degree of reality) সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হয় না। বিশ্বের কারণ-সম্বন্ধেও সাধারণ লোকে ব্যবহারিক জ্ঞানেরই ব্যবহার করে। চেয়ার, টেবিল, ঘড়ি প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য যেমন বুদ্ধিমান মানুষের প্রয়োজন হয়, তেমনি আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত এই বিশ্ব ও তন্মধ্যস্থ জীবদেহ-নির্ম্মাণের জন্যও এক বুদ্ধিমান্ কৌশলী পুরুষের প্রয়োজন। এই যুক্তির অনুসরণে ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগতের মূলে উপাদানের বহুত্ব কল্পিত।

দর্শনের অভিব্যক্তির ইতিহাসে ন্যায় দর্শন একটি উল্লেখযোগ্য ক্রম। কিন্তু এই দর্শন এক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন নহে। ইহার স্থান বেদান্তের

নিম্নে। কেহ কেহ সাংখ্যের নিম্নেও ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ ন্যায় দর্শনের তাত্ত্বিক অংশ সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

ন্যায় মতে মন একটি দ্রব্য—প্রমেয়দিগের অন্তর্গত। ইহা প্রলয়কালীন পার্থিব পরমাণুর ন্যায় নিত্য। মনের অবয়ব নাই। ইহা অতি সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্রতম পরিমাণ-বিশিষ্ট। কোনও বিশেষ গুণ ইহার নাই। ইহা উৎপত্তিশীল। মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ব্যতীত জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। পরমাণু-পরিমাণবৎ মন একসঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইতে পারে না। ইহা অত্যন্ত বেগশালী—ইহার মত বেগ অন্য কোনও বস্তুর নাই। কিন্তু একাধিক বস্তুর জ্ঞান এক সময়ে হয় না।

মন অস্পর্শ কিন্তু সর্ব্বদাই ক্রিয়াবান্। প্রত্যেক শরীরে একটি করিয়া মন। যত জীব তত মন—সুতরাং মন অসংখ্যেয়। সকল মনই এক প্রকার।

মনের আলোচনায় কেহ কেহ কায়বূহের কথা তুলিয়াছেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হইতে বহু জন্মের প্রয়োজন। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন যিনি বিলম্ব সহ্য করিতে অনিচ্ছুক, তিনি যোগবলে বহু শরীর সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মের ফল ভোগ ত্বরান্বিত করেন। এই রূপ সৃষ্ট শরীরদিগকে "কায়বূহ" বলে। প্রশ্ন উঠিয়াছে কেবল শরীরসৃষ্টি দ্বারাই তো ভোগ সম্পন্ন হয় না—প্রত্যেক শরীরের জন্য এক একটি মন চাই। মন যদি নিত্য পদার্থ হয় তাহা হইলে তাহা সৃষ্টি করা তো সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত বহু জীব মুক্তি লাভ করিয়াছে, এবং এই সকল মুক্ত জীবের মন শরীরাভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। মুমুক্ষু যোগী যোগ-বলে তাহার সৃষ্ট শরীরদিগের সহিত এই সকল মনের সংযোগ বিধান করেন। মন-সম্বন্ধে এই মত গ্রহণ যোগ্য নহে।

ন্যায় মতে আত্মা ও মনের সংস্পর্শ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিরূপে হয়, তাহা দুর্বোধ্য। ন্যায় মতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নহে। মন ও জড় পদার্থ, পরমাণু পরিমাণ। বাহ্য বস্তুর বাহ্য ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মন আত্মাকে স্পর্শ করে, ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মন ও আত্মার এই সংস্পর্শের প্রকৃতি বোঝা কঠিন। তাহা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তির ধারণা করা আরও কঠিন। জড় মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে কিরূপে চৈতন্যের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা দুর্বোধ্য।

আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, বাহ্য জগতের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। এই চৈতন্য সকল সময় আত্মায় থাকে না।

সুষুপ্তিতে আত্মা চৈতন্যহীন হয়। মূর্চ্ছাকালেও চৈতন্য থাকে না। অথচ বাল্য হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা আমাদের একত্ব অনুভব করি। ইহার ব্যাখ্যার জন্য স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই আত্মা যদি মাঝে মাঝে চৈতন্য বিযুক্ত হয়, তাহা হইলে এই একত্বের অনুভব সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ চৈতন্যহীন আত্মা ও জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নাই। সুষুপ্তিতে আত্মা যদি অচেতন পদার্থে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার স্মৃতি রক্ষিত হইবে কোথায়? মনেরও তো চৈতন্য নাই। সুষুপ্তি কালে তাহারও ক্রিয়া থাকে না। এরূপ অবস্থায় স্মৃতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। চৈতন্য যদি আত্মার স্বরূপ না হয়, মনের যাবতীয় অবস্থার সাক্ষী না হয়, তাহা হইলে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা হয় না। সুষুপ্তিতে যদি চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে তখন যে চৈতন্য ছিল না, ইহা জানিতে পারা সম্ভবপর হয় কিরূপে? সুতরাং আত্মাকে অবিচ্ছেদ্য চৈতন্য-স্বরূপ বলিতে হইবে। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব স্বীকারেরই প্রয়োজন নাই। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, বাহ্য বস্তুও অচেতন। উভয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে চৈতন্যের উৎপত্তি যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আত্মার কার্য্য মস্তিষ্কের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয় বস্তু স্বীকারের প্রয়োজন কি? ন্যায় দর্শনে আত্মাকে অজড় বলা হইয়াছে, সত্য। মানসিক অবস্থার প্রবাহ হইতে আত্মা ভিন্ন। আত্মা নিত্য কিন্তু মানসিক অবস্থা সকল ক্ষণস্থায়ী। তাহারা আত্মার উপরিভাগে ভাসমান, আত্মা তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু আত্মাতে জ্ঞান, ইচ্ছাদি আছে বলিয়াই তাহা জড় হইতে ভিন্ন। তাহা যদি তাহার স্বরূপগত না হয়, তাহা হইলে মানসিক ব্যাপারদিগের ব্যাখ্যার জন্য তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ন্যায়ের আত্ম-তত্ত্বের সমালোচনায় লিখিয়াছেন: আত্মাকে যদি চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে সংবিদের ব্যাখ্যা কঠিন হইয়া পড়ে। দুইটি অচেতন পদার্থের -আত্মা ও জড়ের—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলরূপে সংবিদকে একটি তৃতীয় বস্তু (tertium quid) বলিয়া—প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভূত এক প্রকার জ্যোতি (mechanical glow) বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। আত্মা যদি স্বরূপতঃ চৈতন্য-স্বরূপ না হয়, এবং তাহার উপর বাহ্য জগতের ক্রিয়া হইতে তাহাতে যদি চৈতন্যের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে জড়বাদ ও ন্যায়-মতের মধ্যে কোনও পার্থক্যই থাকে না। চৈতন্য মস্তিষ্কের ক্রিয়ার উপজাত (by product) নহে, শুধু ইহা বলিয়া লাভ

নাই। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্রাকৃতিক নিয়মে শাসিত জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সদৃশ কিছুই নাই। জড় ও অজড় বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া কিরূপে হইতে পারে, তাহা বোঝা যায় না। যখন কোনও জড়ীয় ব্যাপার হইতে আমরা মানসিক অবস্থায় উপনীত হই, তখন এক জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশ অন্য জগতে উপনীত হই। দুইটি অচেতন বস্তুর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইতে (আত্মা ও মন) চৈতন্য অতিরিক্ত-সমুৎপাদরূপে (Epi-phenmenon) উৎপন্ন হয়, ইহা কোনও যুক্তি নহে। আত্মা অসীম ও নিরবয়ব, মন আণবিক ও নিরবয়ব। ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার ধারণা কিরূপে সম্ভবপর হয়? আত্মা অসীম। এই অনন্ত বিস্তারিত আত্মায় যখন চৈতন্যের উদ্ভব হয়, তখন এই সমগ্র আত্মাই কি তাহার আধার অথবা তাহার বিশিষ্ট (শরীর) অংশ তাহার আধার? প্রথম বিকল্প গ্রহণীয় নহে, কেননা তাহা হইলে সকল বস্তুই একই সময়ে আত্মার সম্মুখে উপস্থিত হইত? দ্বিতীয় বিকল্পও অগ্রাহ্য, কেননা আত্মার অংশ নাই। পাপ ও পুণ্যের কথা বলা নিরর্থক। সমুদ্র, আকাশ, নদী অথবা পর্ব্বতের জ্ঞানের সঙ্গে পাপ পুণ্যের সম্বন্ধ কি? শংকর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক আত্মাই যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন এক আত্মার মন অন্যান্য যাবতীয় আত্মার সহিত সংযুক্ত বলিতে হইবে। তাহা হইলে সকল আত্মার জ্ঞান অভিন্ন হওয়া উচিত, এবং সকল আত্মারই প্রত্যেক আত্মার মধ্যে অবস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। এই সর্ব্বব্যাপী আত্মা তাহা হইলে একই স্থানে অবস্থিত বলিয়া মানিতে হইবে।...জড়বাদে পরমাণু অথবা ইলেক্‌ট্রনাদিগের অন্ধ নৃত্য হইতে বুদ্ধির উদ্ভব হয়। জড়বাদের অপবাদ পরিহার করিতে হইলে সংবিদের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, এবং আত্মাকে সর্ব্বদা ক্রিয়াবান চিন্ময় পদার্থ (spirit) বলিয়া গণ্য করিতে হয়—যদিও তাহার ক্রিয়া-সম্বন্ধে সর্ব্বদা আমরা সচেতন নহি। শুধু জ্ঞানের ও স্মৃতির ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নহে। বিস্মৃতি এবং মিথ্যাত্বের ব্যাখ্যারও প্রয়োজন।"

আত্মা চেতন, দেহ অচেতন। উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সম্ভব হয় কিরূপে? ন্যায় বলেন আত্মা ও বাহ্য জগতের মধ্যে মন সেতু-স্বরূপ। মন উভয়ের সংযোগ বিধান করে (ক্যাণ্টের কালরূপ Schemaর মতন ?)। একদিকে ইন্দ্রিয়দিগের সহিত, অন্যদিকে আত্মার সহিত মন সংযুক্ত। ঈশ্বরের শক্তি দ্বারাই ইহা সংসাধিত হয়। দে-কার্ত্ত ও ইহার ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কথা বলিয়াছিলেন (Deus Ex machina)। ন্যায়-মতে দেহ ও আত্মা ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধে সংযুক্ত। আত্মা দেহ হইতে বিযোজ্য হইলেও উভয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধ নহে। চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়ার্থের আশ্রয় শরীর আত্মার সর্ব্ববিধ ভোগের সাধন। শরীর আত্মার যন্ত্র। সুতরাং জড় হইতে আত্মার মূল্য অধিক। ন্যায় মতে বুদ্ধি আত্মার গুণ কিন্তু স্বরূপ-গুণ নহে। আত্মার উপর বাহ্য বস্তুর ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন। কিন্তু বুদ্ধি সকল ব্যবহারের পূর্ব্ববর্ত্তী (সর্ব্ব ব্যবহার হেতু)। বুদ্ধি বিনা কোনও অনুভবই হয় না। সুতরাং অভিজ্ঞতা হইতে—আত্মার উপর বাহ্য জগতের ক্রিয়া হইতে—বুদ্ধির উদ্ভব হইতে পারে না। বুদ্ধি অভিজ্ঞতার জননী, তাহার সন্তান নহে।

বুদ্ধি বা সংবিদ্ সর্ব্বজীব-সাধারণ, তাহা এক। স্বরূপতঃ এক জীবাত্মার বুদ্ধি হইতে অন্য জীবাত্মার বুদ্ধির কোনও ভেদ নাই। শংকর বহু আত্মার পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ন্যায় মতে ঈশ্বরের পার্শ্বে জীবাত্মারও বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে। শংকরের মতে জীবাত্মার অস্তিত্ব মায়িক, ন্যায়-মতে সত্য। মুক্তির পরে জীবের সংবিদ থাকে না, কিন্তু জীব পরম শান্তি লাভ করে। আত্মা অবিনশ্বর। কিন্তু এই অবিনশ্বরতার মূল্য কতটুকু? চৈতন্যহীন জ্ঞানহীন অস্তিত্বের কোনও মূল্যই নাই। সেই অস্তিত্বের যে শান্তি, তাহা শ্মশানের শান্তি, জড় প্রস্তরের শান্তি। প্রস্তর খণ্ডের সুখ-দুঃখ নাই। মানুষ সুখ-দুঃখের অধীন হইলেও, আত্মা প্রস্তর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সে দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য প্রস্তর হইতে চাহে না, কিন্তু এই প্রস্তরত্ব—শিলাত্বই—ন্যায়ের মুক্তি। তাই নৈষধকার পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন—

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতষাং
গোতমং তম্ অবেত্যৈবং যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥

যিনি মুক্তির জন্য রচিত শাস্ত্রে মুক্তিকে শিলাত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই গোতমকে এইরূপ জানিয়া যাহা মনে কর তিনি তাহাই। (গোতম=গোতম ঋষি। গো-তম=শ্রেষ্ঠ গোরু) ন্যায় মতে ঈশ্বর শিল্পীমাত্র, (Demiurge), তিনি জগতের উপাদানদিগকে যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু উপাদানদিগের সৃষ্টি করেন নাই। জগতের উপাদান পরমাণুগণ নিত্য। ঈশ্বর জগতের বাহিরে অবস্থিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন বটে, যে দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধও তাহাই। কিন্তু এই বাদ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। গীতার ঈশ্বরবাদে এই মত পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে।

———

পূর্ব্বমীমাংসা

১

উৎপত্তি ও প্রয়োজন

ষড় দর্শনের মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অন্য পাঁচ খানি দর্শনের আয়তন যত বড়, তাহা অপেক্ষাও এই দর্শন বৃহত্তর।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি কর্ম্মের বিষয় বিবৃত আছে। যাগ-যজ্ঞের প্রত্যেক অঙ্গ বিচার করিয়া ইহাদের প্রধান অপ্রধান ভাব-নিরূপণ-পূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্ম সকলের "অপূর্ব্ব" নামক শক্তির উৎপাদন-ক্ষমতা মীমাংসা দর্শনে অবধারিত হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মের পুত্রকলত্রাদি ঐহিক সম্পদ উৎপাদন-সামর্থ্য ব্যতীত স্বর্গফল প্রদান করিবার সামর্থ্যও আছে। এইজন্য দ্বি-জাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) মাত্রের পক্ষেই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিবেন ও অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিবেন এবং গৃহস্থাশ্রমে বৈদিক বিধি অনুসারে ব্রহ্মের প্রকাশমূর্ত্তি অগ্নিকে গৃহে স্থাপিত করিয়া চিরজীবন তাহার সেবা করিবেন। প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচস্নানাদি সমাপন-পূর্ব্বক পরিবারস্থ সকলে গৃহে স্থাপিত অগ্নির নিকট উপস্থিত হইবেন এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। পরে গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে পুনরায় অগ্নি সমীপে উপস্থিত হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। ইহারই নাম অগ্নিহোত্র। প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে প্রত্যেক দ্বিজাতী গৃহস্থ দর্শ পৌর্ণমাস যাগ সম্পন্ন করিবেন। এই যাগে পক্ষকাল মধ্যে কৃত পাপের জন্য গৃহস্থ অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, অনাবৃত পদে বনে গিয়া যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক মস্তকে বহন করিয়া গৃহে আনিবেন, স্বামী-স্ত্রী পবিত্র তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞীয় পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পুরোহিত ও বন্ধুবর্গের সহিত যজ্ঞ করিবেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যজ্ঞের ব্যবস্থাও আছে। এই সকল যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠানের জন্য মহর্ষি জৈমিনি বেদবাক্য সকলের প্রকৃত মর্ম্মবোধের সৌকর্য্যের নিমিত্ত তদুপযোগী নিয়ম সকল মীমাংসাদর্শনে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

মীমাংসা শব্দ 'মন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মন্ ধাতুর অর্থ চিন্তা করা, চিন্তা দ্বারা যুক্তি-সংগত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করা। পূর্ব্বমীমাংসায় বেদ-মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যার জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলীর এবং কর্ম্মকাণ্ডের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী। যৌবনে গৃহস্থাশ্রমে কর্ম্মকাণ্ডে উপদিষ্ট যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমে বেদের শেষভাগ জ্ঞানকাণ্ডের (বেদান্তের) অনুশীলন করিতে হইত। এই জন্য কর্ম্মকাণ্ডের দর্শনের নাম পূর্ব্বমীমাংসা। জ্ঞানকাণ্ডের দর্শনের নাম উত্তরমীমাংসা।

বৈদিকযুগে যজ্ঞ দ্বিজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের উপর এত গুরুত্ব আরোপিত হইত এবং অন্যান্য কর্ম্ম অপেক্ষা যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক বিবেচিত হইত যে, 'যজ্ঞ' বুঝাইতে সাধারণতঃ "কর্ম্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইত। তাই বেদের যজ্ঞভাগের নাম কর্ম্মকাণ্ড। যজ্ঞের সংখ্যা ও জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠানের জন্য ঋত্বিক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কোনও কোনও যজ্ঞ বৎসরকালব্যাপী, কতকগুলি বহুবৎসরব্যাপীও ছিল। বেদের ব্রাহ্মণভাগে এই সকল যজ্ঞের বিধি বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণভাগের উদ্ভবের পূর্ব্বেও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। কথিত আছে, বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের প্রচারের জন্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ববেদ প্রদান করেন। কালক্রমে প্রত্যেক বেদের নানা শাখার উৎপত্তি হয় এবং মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধেও মতভেদ উদ্ভূত হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কুলে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান-প্রণালী বিভিন্ন হইয়া পড়ে। বিভিন্ন ব্রাহ্মণে বর্ণিত যজ্ঞবিধির মধ্যেও ভেদ দৃষ্ট হয়। তখন বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মণের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন বংশে অবলম্বিত প্রথার সহিত ব্রাহ্মণে উপদিষ্ট বিধির সামঞ্জস্য-বিধানের সমস্যা উত্থিত হয়। এই সমস্যা-সমাধানের জন্যই মীমাংসা-শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। তত্ত্বালোচনা মীমাংসা-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও প্রসঙ্গতঃ কতকগুলি দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল এবং বাহ্য জগতের স্বরূপ, আত্মা, বেদের প্রামাণ্য ও প্রমাণ প্রভৃতির আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়াছিল। যজ্ঞ-প্রবৃত্তি ও যজ্ঞফলে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ এবং মন্ত্রের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই সকল আলোচনা মীমাংসা-শাস্ত্রে আছে বলিয়া ইহা দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। শব্দ ও বাক্যের অর্থের ব্যাখ্যার জন্য মীমংসা দর্শনে যে সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বর্ত্তমানকাল

পর্য্যন্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য তাহারা অবলম্বিত হইতেছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত হিন্দু আইন মীমাংসা-শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। মীমাংসা-সূত্র মহর্ষি জৈমিনি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। জৈমিনির মীমাংসাসূত্রের পূর্ব্বেও বেদব্যাখ্যার নিয়মাবলী প্রচলিত ছিল। জৈমিনির সূত্রে তাহারা সুশৃঙ্খল ভাবে সংকলিত হইয়াছে। সূত্রকার জৈমিনি ব্যাস-শিষ্য জৈমিনি কিনা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জৈমিনি-সূত্রের মধ্যে অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী মীমাংসকের নাম পাওয়া যায়, যাহাদিগের গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সূত্রাবলী কতটা জৈমিনি-রচিত, কতটা পূর্ব্ববর্ত্তী মীমাংসকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। জৈমিনির সংকর্ষণ খণ্ড (বা দেবতা খণ্ড) পূর্ব্ব-মীমাংসার অংশ।

ন্যায় ও যোগসূত্রের সহিত জৈমিনির যে পরিচয় ছিল, সূত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে বৌদ্ধমতের সমালোচনা আছে বলিয়া ইহা বৌদ্ধ-মতের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। জৈমিনি-সূত্রের পাঁচ স্থানে বাদরায়ণের নাম আছে। আবার বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের দশটি সূত্রে জৈমিনির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই দশটির মধ্যে নয়টিতে আলোচিত বিষয়ের আলোচনা মীমাংসাসূত্রে দেখা যায় না। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ব্রহ্মসূত্রে যে জৈমিনির নাম পাওয়া যায়, তিনি মীমাংসা-সূত্রকার জৈমিনি নহেন। আবার কেহ কেহ বলেন, জৈমিনি-রচিত কতকগুলি গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মীমাংসাসূত্রের স্থানে স্থানে সূত্রকার বাদরায়ণের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

কাহারো কাহারো মতে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে জৈমিনির আবির্ভাব অসম্ভব।* কেহ কেহ তাহাকে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত করিয়াছেন।†

২

গ্রন্থাবলী

মীমাংসাসূত্রের প্রধান ভাষ্যকারের নাম শবর। ভর্ত্তৃমিত্র, ভবদাস, হরি এবং উপবর্ষ নামে আরও চারিজন ভাষ্যকারের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের ভাষ্য পাওয়া যায় নাই। ইহাদের কয়েকজন যে শবরের পূর্ব্ববর্ত্তী,

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ Indian Philosophy Vol. II, P. 376.

† ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তের History of Indian Philosophy Vol. I, P. 370.

ইহা সম্ভবপর। ডাঃ গঙ্গানাথ ঝার মতে শবর খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭ অব্দে জীবিত ছিলেন। প্রচলিত এক শ্লোকে রাজা বিক্রমাদিত্য শবরস্বামীর ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভজাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ডাঃ ঝার মতের ভিত্তি এই শ্লোক। (কাহারো কাহারো মতে বিক্রমাদিত্যের কাল ৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দ)। অন্যান্য যে সকল মীমাংসাগ্রন্থ আছে, শবরের ভাষ্যই তাহাদের ভিত্তি। শবর-ভাষ্যের বার্ত্তিককার সুবিখ্যাত কুমারিল ভট্ট (৭ম শতাব্দী) পরবর্তী সাহিত্যে কুমারিল ভট্ট, ভট্টপাদ ও বার্ত্তিককার নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার মত ভট্টমত নামে খ্যাত।

বিধি-বিবেক ও মীমাংসানুক্রমণি নামক গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা মণ্ডন মিশ্র কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। তিনি কুমারিলের বার্ত্তিকের দ্বিতীয় ভাগ তন্ত্র-বার্ত্তিকের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মণ্ডন মিশ্র শঙ্করাচার্য্যের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। মণ্ডনের পত্নী উভয়ভারতী এই তর্কে মধ্যস্থ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

শবরের অন্য একজন টীকাকার প্রভাকর। প্রভাকরের টীকার নাম "বৃহতী"। কেহ কেহ বলিয়াছেন প্রভাকর কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে "অত্রতু নোক্তং তত্রাপি নোক্তং, ইতি পৌনরুক্তং", এই বাক্যের অর্থ কুমারিল প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। বাক্যের সরল অর্থ "এখানেও উক্ত হয় নাই, সেখানেও উক্ত হয় নাই, এই জন্য পুনরুক্তি হইয়াছে"। এই অর্থ স্ববিরোধ-দুষ্ট। কুমারিল যখন উক্ত বাক্যের অর্থ-সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন প্রভাকর বলিলেন, ইহার অর্থ "অত্র তুনা উক্তং" (এখানে "তু" শব্দ দ্বারা উক্ত), "তত্র অপিনা উক্তং" (সেখানে অপি শব্দ দ্বারা উক্ত), "ইতি পৌনরুক্তং" (এই জন্য পুনরুক্তি)। প্রভাকরের ব্যাখ্যা শুনিয়া কুমারিল এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। আবার এরূপ প্রবাদও আছে যে, প্রভাকর কুমারিলের মতের এত কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন যে, কুমারিল শ্লেষ করিয়া তাহাকে "গুরু" নামে উল্লেখ করিতেন। এই "গুরু" নাম হইতে প্রভাকরের মত "গুরুমত" নামে পরিচিত হইয়াছে। প্রভাকরের গ্রন্থ "বৃহতী"তে কুমারিলের মতের উল্লেখ নাই। কিন্তু কুমারিলের গ্রন্থে প্রভাকরের নাম না থাকিলেও প্রভাকরের মতের সদৃশ মতের উল্লেখ আছে। এই জন্য কেহ কেহ প্রভাকরকে কুমারিলের পূর্ব্ববর্তী বলেন, এবং তিনি যে কুমারিলের শিষ্য ছিলেন, তাহা স্বীকার করেন না। "বৃহতী"র রচনা-রীতিও তাহারা কুমারিলের রচনা রীতি হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে করেন।

মীমাংসা-দর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য কতকগুলির গ্রন্থের নাম (১) পার্থ-সারথি মিশ্র-রচিত (৯ম শতাব্দী) শাস্ত্রদীপিকা, তন্ত্ররত্ন ও ন্যায়-রত্নাকর। সকল গ্রন্থই কুমারিলের মতানুসারে লিখিত। (২) সুচরিত মিশ্রের কাশিকা (৩) সোমেশ্বর-রচিত ন্যায়সুধা (৪) রামকৃষ্ণ ভট্টের যুক্তিস্নেহ-পূরণী-সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা (শাস্ত্রদীপিকার এক অংশের টীকা) (৫) সোমনাথের ময়ূখমালিকা (শাস্ত্রদীপিকার অন্যান্য অংশের টীকা) (৬) মাধব-রচিত ন্যায়মালাবিস্তার (৭) শঙ্কর ভট্টের সুবোধিনী (৮) শালিকনাথের ঋজুবিমলা (বৃহতীর টীকা) ও প্রকরণ-পঞ্জিকা (৯) ভবনাথের নয়-বিবেক (১০) অপ্পয় দীক্ষিতের বিধি-রসায়ন (কুমারিলের খণ্ডন) (১১) আপদেবের (১৭শ শতাব্দী) মীমাংসা-ন্যায়-প্রকাশ (১২) লৌগাক্ষী ভাস্করের অর্থসংগ্রহ (১৩) খণ্ডদেবের (১৭ শতাব্দী) ভাট্টদীপিকা ও মীমাংসা-কৌস্তুভ।

৩

মীমাংসাসূত্রে আলোচিত বিষয় (সংক্ষিপ্তসার

মীমাংসা-সূত্র দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের চারিটি করিয়া পাদ। "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"—গ্রন্থের প্রথম সূত্র, ধর্ম্মই মীমাংসা-সূত্রের আলোচ্য বিষয়। অন্য সকল তাহার আনুষঙ্গিক। দ্বিতীয় সূত্রে ধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহা বলা হইয়াছে। "চোদনা-লক্ষণোঽর্থঃ ধর্ম্মঃ"—চোদনা (কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা) এবং অর্থ (অভ্যুদয়) ধর্ম্মের লক্ষণ। যে সকল বৈদিক শব্দ দ্বারা কার্য্যে প্রেরণা সূচিত হয়, সেই সকল বিধি-জ্ঞাপক শব্দ দ্বারা যে যে কর্ম্ম বুঝায়, যাহারা কর্ম্মকর্ত্তার অভ্যুদয় ও সুখের জনক অথচ অন্যের দুখের হেতু নহে বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারা ধর্ম্ম। চতুর্থ সূত্রে আছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে ধর্ম্ম যে কি, তাহা জানা যায় না। বিধি-মূলক বৈদিক বাক্যই ধর্ম্ম সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ। এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন করিয়া পরে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র, স্মৃতি, নামধেয় প্রভৃতি পদের প্রামাণ্য আলোচিত এবং শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য, ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন, নিত্য ও কাম্য অনুষ্ঠানের পার্থক্য এবং "অপূর্ব্ব" প্রভৃতির আলোচনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য প্রভৃতির এবং তাহাদের মধ্যে প্রতীয়মান বিরোধের স্থলে প্রত্যেকের গুরুত্বের আলোচনা। তাহার পরে প্রতিপত্তি কর্ম্ম, অনারভ্যাধীত, প্রযাজ প্রভৃতির জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং যাজ্ঞিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব্যাখ্যাত

হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রধান অনুষ্ঠান এবং তাহার অনুষঙ্গী অন্য অনুষ্ঠানের উপর প্রভাব, "জুহুর" ফল এবং রাজসূয় যজ্ঞের অঙ্গীভূত অক্ষ-ক্রীড়াদির ফল আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়দিগের মধ্যে আছে শ্রুতির বিভিন্ন বাক্যের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম, যজ্ঞের বিভিন্ন অংশের ক্রম, শ্রুতির শব্দদিগের শক্তি এবং যজ্ঞে তাহাদের ব্যবহারের ক্রম। ষষ্ঠ অধ্যায় যজ্ঞ-সম্পাদনের অধিকারী ব্যক্তিদিগের ও তাহাদের দায়িত্বের উল্লেখসহ যজ্ঞের জন্য বিহিত কোনও দ্রব্যের অভাব হইলে তাহার স্থলে দ্রব্যান্তরের উপযোগিতা, প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান, সত্রের উপকরণ, বিভিন্ন যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতির বর্ণনা আছে। সপ্তম অধ্যায়ে বেদমন্ত্রের স্পষ্ট নির্দ্দেশ অথবা "নামধেয়" বা লিঙ্গ অনুসারে এক যজ্ঞের ব্যবস্থা অন্য যজ্ঞে অবলম্বনের রীতি আলোচিত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট লিঙ্গ অনুসারে, অথবা প্রধান লিঙ্গ অনুসারে কোথায় এক যজ্ঞের ব্যবস্থা যজ্ঞান্তরে অবলম্বিত হইতে পারে এবং কোথায় পারে না, তাহার আলোচনা আছে। নবম অধ্যায়ে এক উপলক্ষে ব্যবহার্য্য সাম ও মন্ত্র অন্য উপলক্ষে ব্যবহার করিতে হইলে তাহাদের কি ভাবে নূতন উপলক্ষের উপযোগী করিয়া লইতে হয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে যে যে ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুষ্ঠান বিনা তাহার পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান হইতে পারে না এবং যে যে ক্ষেত্রে কোনও কোনও অনুষ্ঠানের ফল অন্য অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাদের বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে তন্ত্র অর্থাৎ একাধিক কর্ম্মকে এক কর্ম্মের অন্তর্ভুক্তি এবং আবাপ অর্থাৎ এক কর্ম্মের একাধিক বার অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রসঙ্গ এবং তন্ত্র কর্ম্ম সমুদয় আলোচিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত বিষয়গুলির সহিত দর্শনের সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু উপরি উক্ত বিষয় সকল ব্যতীত কয়েকটি অধ্যায়ে আনুষঙ্গিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক আলোচনাও আছে।

৪

প্রমাণ

মীমাংসাদর্শন বস্তুবাদী। বাহ্যবস্তু সংবিদে স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়, তাহার অস্তিত্ব এই দর্শনে স্বীকৃত। মীমাংসাদর্শনে মায়াবাদের স্থান নাই।

জৈমিনি সূত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত। প্রভাকর উপমান ও অর্থাপত্তিকেও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহ্য ও স্মৃতিকে স্বীকার করেন নাই।

প্রত্যক্ষ

বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিবার জন্য মীমাংসাদর্শনে বিস্তারিতভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি ও তাহার স্বরূপ, সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ, এবং বিবিধ প্রমাণের আলোচনা করা হইয়াছে।

মীমাংসাদর্শনের মতে অব্যবহিত এবং ব্যবহিত ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। কোন বিষয়-সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান, যাহা জ্ঞানান্তর দ্বারা বাধিত হয় না, এবং ইন্দ্রিয়ের দোষ অথবা অন্য কোনও দোষ (যেমন যুক্তির দোষ) হইতে যাহার উৎপত্তি হয় না, তাহাই প্রামাণিক জ্ঞান।

অব্যবহিত জ্ঞানের বিষয় সৎ বস্তু—যাহার অস্তিত্ব আছে, এমন বস্তু, যাহা "বস্তু-শূন্য বিকল্প" নহে, এমন বস্তু। সৎ বস্তুর সহিত যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনও একটির এবং মনের সংস্পর্শ হয়, তখন আত্মার মধ্যে ঐ বস্তুর অব্যবহিত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যখন কোন বস্তুর সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয়, তখন প্রথমে কেবল সেই বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞানমাত্র হয়, সেই বস্তুর গুণের জ্ঞান হয় না। এই প্রাথমিক অনির্দিষ্ট অব্যবহিত জ্ঞানের নাম নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞান (আলোচন জ্ঞান)। পরবর্তী ক্রমে ঐ বস্তুর সহিত পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর সাদৃশ্য ও ভেদ স্মৃতিতে উদিত হয়, এবং সেই বস্তুটি কি, অর্থাৎ তাহার গুণ, নাম, শ্রেণী প্রভৃতির জ্ঞান হয়। এই নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানকে সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলে।

প্রত্যক্ষের প্রথম ক্রমে বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান না হইলেও যে জ্ঞান হয়, তাহার মধ্যে পরবর্ত্তী ক্রমে সেই বস্তু-সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। বাহ্য জগৎ হইতে যাহা প্রথমে ইন্দ্রিয়ে সংক্রমিত হয়, পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া মন সেই বস্তুর বিস্তৃততর জ্ঞান লাভ করে, কাল্পনিক কোনও গুণ তাহাতে আরোপ করে না।

প্রভাকর এবং কুমারিল উভয়েই জ্ঞানের সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদ স্বীকার করেন। কুমারিলের মতে প্রত্যেক বস্তু তাহার সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের আধার। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে যদিও বস্তুর সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান থাকে না, তথাপি তাহাতে বিশেষ বস্তুটাই গৃহীত হয়। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের হেতু বিশেষ বিশ্লেষ বস্তু। সবিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর সামান্য এবং বিশেষ ধর্ম্মসকল পরিস্ফুট হইয়া জ্ঞানের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন বিষয়ের সংস্পর্শ হইলে প্রথমে সকল সম্বন্ধ-বর্জিতভাবে বিষয়টি গৃহীত হয়। তখন

ধর্ম্মী ও তাহার ধর্ম্মের মধ্যে ভেদ, এবং সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের ভেদ উপলব্ধ হয় না। এই ভেদ দ্বিতীয় ক্রমে পরিস্ফুট হয়। নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ প্রথমে না হইলে পরে সবিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। কেন না সবিকল্প প্রত্যক্ষের অর্থ ধর্ম্মী ও তাহার ধর্ম্মের মধ্যে ভেদের জ্ঞান। ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার জ্ঞান ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের জ্ঞানের অপেক্ষা করে। নির্বিকল্প জ্ঞানে এই জ্ঞান অস্ফুটভাবে না থাকিলে, সবিকল্প জ্ঞানে তাহাদের স্ফুটীকরণ সম্ভবপর হয় না। সবিকল্প জ্ঞানে সেই জ্ঞানের বিষয় বস্তুটি কোন শ্রেণীভুক্ত, তাহার নাম কি, তাহার স্মরণ হয়, এবং প্রত্যক্ষের বিষয় বস্তুতে তাহা আরোপিত হয়। নির্বিকল্প জ্ঞানে সেই শ্রেণী ও নাম যদি অপ্রকটভাবে না থাকে, তবে তাহাদের স্মৃতিই হইতে পারে না। সুতরাং নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর শ্রেণী, নাম ও গুণ সকল অপ্রকট অবস্থায় থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

কুমারিলের মতে বস্তুর জ্ঞান তাহার নামের অপেক্ষা করে না। "গো"-সামান্য সকল সময় "গো" শব্দের আকারে জ্ঞানের বিষয় হয় না। নবজাত শিশুর জ্ঞানের সহিত নির্বিকল্প জ্ঞানের সাদৃশ্য আছে। শিশুর "আলোচন" জ্ঞানে বিশেষ বস্তু তাহার সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্ম-বর্জিতভাবে মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। নির্বিকল্প জ্ঞানও এইরূপ। কিন্তু প্রভাকর বলেন নির্বিকল্প জ্ঞানে বস্তুর সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্ম উভয়েরই জ্ঞান থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয় বস্তু যে কোনও বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত, সেই জ্ঞান হয় না। অন্য বস্তুর সহিত তুলনার ফলেই এক বস্তু, এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জ্ঞাত হয়। সেই শ্রেণীর অন্যান্য বস্তুর সহিত সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতেই প্রত্যক্ষের বিষয় বস্তু সেই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জ্ঞাত হয়। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্ম উভয়ই বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা প্রত্যক্ষ বস্তুর ধর্ম্মরূপে গৃহীত হয় না। সবিকল্প জ্ঞানে প্রত্যক্ষের বিষয় বস্তুর সদৃশ অন্যান্য বস্তুর স্মরণ হয়, এবং বস্তুটি সেই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। প্রভাকরের মতে সবিকল্প প্রত্যক্ষের সহিত স্মৃতি জড়িত থাকে, কিন্তু এই স্মৃতি প্রত্যক্ষের বিষয় বস্তুর স্মৃতি নহে; অন্যান্য যে সকল বস্তুর সহিত তাহা তুলিত হয়, তাহাদের স্মৃতি। তাহাদ্বারা জ্ঞানের সত্যতার হানি হয় না।

অবয়ব ও অবয়বী

জাতি ও ব্যক্তি

সবিকল্প প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষ বস্তুর "জাতি-"র জ্ঞান এবং নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে তাহার অভাব, ইহাই উভয় প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ বলা যাইতে পারে। জাতি ও ব্যক্তি এবং অবয়বী ও অবয়বের সমস্যা-সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে বহু আলোচনা হইয়াছে। জাতির আলোচনার পূর্ব্বে প্রভাকর অবয়বী ও অবয়বের সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছেন; যাহার অবয়ব বা অংশ আছে, তাহাই অবয়বী। অবয়বী সমগ্র বস্তু, অবয়ব তাহার অংশ। স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী প্রভাকরের মতে, আমাদের আত্মার মধ্যে এবং সংবিদে যাহা স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হয়, তাহার অস্তিত্ব প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্থূল বস্তু-সকল সংবিদে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পরমাণুগণ স্থূল বস্তুর উপাদান বা সমবায়ী কারণ। পরমাণুদিগের সংযোগ অসমবায়ী কারণ। এই সংযোগবশতঃ অবয়বী বস্তু তাহার অবয়বদিগের হইতে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। কিন্তু সমগ্র বস্তুর প্রত্যক্ষ হইবার পূর্ব্বে তাহার অবয়বদিগের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নহে। কুমারিলের মতে আমরা যে দৃষ্টি কোণ হইতে কোনও বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তদনুসারে সেই বস্তুকে হয় অবয়বের সমষ্টি অথবা একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ অবয়বী ও অবয়ব-সমষ্টি অভিন্ন। কিন্তু যখন অংশের উপর বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন বস্তু অবয়ব-সমষ্টি, এবং যখন অবয়বদিগের একত্ব ও সমগ্রের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন অবয়বী বলিয়া অনুভূত হয়।

কুমারিল ও প্রভাকর উভয়েই জাতির বস্তুত্ব স্বীকার করেন, এবং তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় বলেন। বৌদ্ধ মতে সামান্য বিকল্পাকার মাত্র অর্থাৎ কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। কুমারিল ও প্রার্থসারথির মতে প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যক্ষের সময়ে তাহা বিশেষ জাতিভুক্তরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং জাতি (সামান্য) প্রত্যক্ষের বিষয় ও তাহার বাস্তব সত্তা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষে অনুবৃত্তি (সমীকরণ—assimilation) এবং ব্যাবৃত্তি (discrimination) উভয়ই থাকে। অনুবৃত্তি জাতির বস্তুত্বের অপেক্ষা করে। জাতির যদি অস্তিত্বই না থাকে, তবে প্রত্যক্ষের বস্তু কিসের অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হইবে? অনুমানও জাতির অস্তিত্বের অপেক্ষা করে।

বৌদ্ধেরা বলেন জাতি যখন ব্যক্তি হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত হয় না, তখন তাহার বস্তুত্ব আছে বলা যায় না, কিন্তু "যৎ বস্তু, তৎ ভিন্নং অভিন্নং বা ভবতি" (যাহা বস্তু তাহা ভিন্ন বা অভিন্ন), এই মতে জাতির অস্তিত্ব স্বীকৃত। বস্তু একটি জাতি। তাহাই ভিন্ন অথবা অভিন্ন। জাতি নিরবয়ব—অংশহীন। তাহা প্রত্যেক দ্রব্যে সমগ্ররূপে অবস্থিত, অথবা সকলের মধ্যে সমষ্টিরূপে অবস্থিত, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। জৈনগণ বলেন, যে জাতি ও সাদৃশ্য অভিন্ন, তাহা ঠিক নহে। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা বলিতাম, "ইহা গোরুর মত", "ইহা গোরু" বলিতাম না। আর জাতি না থাকিলে সাদৃশ্যও থাকে না, কেননা সাধারণ ধর্ম্মযুক্ত বস্তুদিগকেই সদৃশ বলে।

কুমারিলের মতে জাতি বিশিষ্ট বস্তু হইতে ভিন্ন নহে। উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। আমাদের প্রয়োজন অনুসারে জাতি অথবা ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টির বিষয় হয়। জাতিকে "আকৃতি"ও বলে। আকৃতি শব্দের অর্থ গঠনের আকার নহে। ইহার অর্থ একধর্ম্মত্ব। কেননা আত্মার মতো অজড় বস্তুরও আকৃতি আছে। বস্তুর গঠনাকার নশ্বর, কিন্তু তাহার জাতি নশ্বর নহে। জাতির নাম আকৃতি, যাহা সকল ব্যক্তির ধর্ম্ম তাহাই আকৃতি। যাহা সকল ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ, এবং যাহাদ্বারা সকল ব্যক্তিতে প্রযোজ্য প্রত্যয় গঠিত হয়, তাহাই আকৃতি। পার্থ সারথি বলেন জাতি ব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ব্যক্তির মধ্যে জাতির প্রত্যক্ষ হইত না। "ইয়ম্ গৌঃ" (ইহা গোরু) এই বাক্যের মধ্যে "ইহা"-জ্ঞানের (ইয়ং বুদ্ধি) সহিত "গোবুদ্ধি" আছে। ইয়ংবুদ্ধির বিষয় ব্যক্তি। গোবুদ্ধির বিষয় জাতি। দুই বুদ্ধি ভিন্ন, কিন্তু উভয়ে একই বিষয়ের মধ্যে বর্ত্তমান। প্রত্যক্ষের এই দ্বিরূপ-দ্বারা বিষয়ের জাতিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব উভয়ই ব্যক্ত হয়। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় ভেদ ও অভেদ উভয়েরই বোধ হয়। ঐ ভেদ ও অভেদ পরস্পরের বিরোধী নহে। একই বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগের সহিত ঐ ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধ।

প্রভাকরের শিষ্যগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে একই জ্ঞান-ক্রিয়ায় জাতি ও ব্যক্তির ভেদ ও অভেদ উভয়ই জ্ঞাত হইতে পারে না। যখন জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে ভেদের জ্ঞান হয়, তখন জাতি ও ব্যক্তি পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়াই জ্ঞাত হয়। যখন জাতি ও ব্যক্তির অভেদের জ্ঞান হয়, তখন হয় জাতি অথবা ব্যক্তির জ্ঞান হয়। এই ক্ষেত্রে জাতি অথবা ব্যক্তি হইতে দুইটি জ্ঞানের—জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের, এবং তাহাদের অভেদের জ্ঞানের—উদ্ভব

হইতে পারে না। জাতির পক্ষে ব্যক্তির সহিত তাহার অভেদের জ্ঞান অথবা ব্যক্তির পক্ষে, জাতির সহিত তাহার অভেদের জ্ঞান উৎপন্ন করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ভেদ ও অভেদের জ্ঞান এক জ্ঞানদ্বারা উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না। অন্যপক্ষ এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন দুই বিষয়ের জ্ঞান হইলেই যে তাহাদের ভেদের জ্ঞান হইতেই হইবে, তাহা নহে। যখন কোনও জাতির এক ব্যক্তি প্রথম দৃষ্ট হয়, তখন তাহার মধ্যে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহাদের ভেদ প্রত্যক্ষ হয় না। যখন উক্ত জাতির দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয়, তখন প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে তাহার সাদৃশ্যের উপলব্ধি হয় এবং তাহারা এক জাতিভুক্ত বলিয়া জ্ঞান হয়, এবং তাহার সঙ্গে উভয়ের ভেদেরও উপলব্ধি হয়। সুতরাং দুই বিষয়ের জ্ঞান হইতে যে তাহাদের ভেদেরও জ্ঞান হইবে, তাহা বলা যায় না। একটি বস্তুর জ্ঞান-কালে যে অন্য বস্তুর সহিত তাহার অভেদের জ্ঞান হয়, তাহা নহে। দূরে অবস্থিত কোনও বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে, তাহা মানুষ অথবা একটা খুঁটি, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

জাতি নিত্য, ব্যক্তি অনিত্য। এই হেতু প্রভাকর-পন্থিগণ উভয়ের অভেদ স্বীকার করেন না। উভয়ে যদি অভিন্ন হইত, তাহা হইলে জাতি অনিত্য এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন হইত, এবং ব্যক্তিই নিত্য এবং বহুর মধ্যে সাধারণ হইত। ইহার উত্তরে পার্থ সারথি বলেন যৌগিক বস্তু কোন কোনও বিষয়ে নিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে অনিত্য হইতে পারে, কোন কোনও বিষয়ে অন্যান্য বস্তুর সহিত অভিন্ন এবং অন্যান্য বষয়ে ভিন্ন হইতে পারে।

নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় কুমারিলও প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন, কেননা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার পরেই প্রত্যভিজ্ঞা হয়। পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া না থাকিলে প্রত্যভিজ্ঞা হয় না।

মীমাংসকগণ সুখ, দুঃখ প্রভৃতির মানস প্রত্যক্ষ হয়, ইহা স্বীকার করিলেও জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। এক জ্ঞান তাহাদের মতে, জ্ঞানান্তরের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞান ভিন্ন মনের অন্যান্য ক্রিয়ার মানস প্রত্যক্ষ হয়।

স্বপ্নে যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা বাহ্য বস্তু। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু স্বপ্নকালে উপস্থিত থাকে না বটে, কিন্তু যাহা পূর্ব্ব দৃষ্ট, তাহার সংস্কারই স্বপ্নে উদ্বোধিত হয়। স্বপ্নকালে আত্মার সহিত মনের সংযোগ থাকে। এই সংযোগ ছিন্ন হইলে সুষুপ্তি হয়, তখন স্বপ্ন থাকে না। কুমারিলের মতে সুষুপ্তিতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তখন স্বপ্নের উৎপত্তি অসম্ভব।

মীমাংসকগণ যোগবলে ভূত ও ভবিষ্যৎ এবং দূরবর্ত্তী বস্তুর জ্ঞানলাভ সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করেন না। কেননা এই সকল ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান কেবল বেদ হইতেই লাভ করা যাইতে পারে।

অনুমান

যখন দুইটি বস্তুর মধ্যে এমন স্থায়ী সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, যে তাহাদের একটির প্রত্যক্ষ হইলে, অন্যটির প্রত্যয় মনে উদিত হয়, তখন শেষোক্ত জ্ঞানকে অনুমান বলে। শবরের মতে প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট এবং সামান্যতো দৃষ্ট ভেদে অনুমান দ্বিবিধ। যখন দুইটি প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যে অব্যভিচারী সম্বন্ধ (যেমন ধূম ও অগ্নি) দৃষ্ট হয়, তখন একটি হইতে অন্যটির অনুমান প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট। যখন দুই বস্তুর মধ্যগত সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু সামান্যভাবে জ্ঞাত হয়, তখন যে অনুমান হয় তাহা সামান্যতো দৃষ্ট (যেমন আকাশে সূর্য্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি হইতে সূর্য্যের গতির অনুমান)।

প্রভাকর ও কুমারিল অনুমানের "ন্যায়ের" (syllogism) কেবল তিন অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন: প্রতিজ্ঞা, প্রধান অবয়ব ও অপ্রধান অবয়ব। মীমাংসকদিগের মতে অনুমানের বিষয় দ্বিবিধ—দৃষ্ট-লক্ষণ (যাহার লক্ষণ প্রত্যক্ষ, যেমন ধূম ও অগ্নি) এবং অদৃষ্ট-লক্ষণ (যাহার লক্ষণ অপ্রত্যক্ষ, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি ও অগ্নি।)

উপমান

ন্যায় দর্শনে উপমান-প্রমাণ স্বীকৃত। মীমাংসাদর্শনেও উপমান প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। মীমাংসামতে উপমান হইতে তখনই জ্ঞানের উদ্ভব হয়, যখন পূর্ব্বে যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বস্তু বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ হয়। তখন পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু যে বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর সদৃশ, এই জ্ঞান হয়। যেমন কেহ বনে গবয় (নীল গাই) দেখিয়া নিজের গৃহের গোরুর সহিত তাহার সাদৃশ্য অনুভব করে। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। ইহা স্মৃতির জ্ঞানও নহে, কেননা যদিও এই জ্ঞানের জন্য পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর স্মৃতির প্রয়োজন, তথাপি সেই স্মৃতির মধ্যে সাদৃশ্য-জ্ঞান নাই। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের সহিত পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের তুলনা হইতে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান অনুমানও নহে। বেদান্তী বলেন "এই গবয় আমার গৃহের গোরুর সদৃশ" হইতে "আমার গৃহের গোরু এই গবয়ের সদৃশ" এই জ্ঞান পাইতে

হইলে, "কোনও বস্তু যাহার সদৃশ, তাহা সেই বস্তুর সদৃশ", এইরূপ আর একটি অবয়বের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাস্তবিক "আমার গৃহের গোরু গবয়ের সদৃশ", অনুমানে এই অবয়ব ব্যবহৃত হয় না। শব্দ প্রমাণ হইতেও এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। এই জন্য উপমান এক স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

"গবয় গোরুর সদৃশ" কাহারও নিকট ইহা কেহ শুনিবার পরে, যখন সে বনে গবয়ের সাক্ষাৎ পায়, তখন সেই জন্তুর সহিত গোরুর সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাকে গবয় বলিয়া জানিতে পারে। ইহার আলোচনায় ন্যায়দর্শন বলেন, যে গবয় দেখিয়া যখন উক্ত ব্যক্তি তাহার সহিত গোরুর সাদৃশ্য উপলব্ধি করে; তখন সেই সাদৃশ্য-জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং সেইরূপ সাদৃশ্য-যুক্ত জন্তু গবয়, এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় পূর্ব্বে সে যাহা শুনিয়াছিল (গবয় গোরুর সদৃশ) তাহার স্মরণ হইতে, এবং সেই জন্তুটিই যে গবয়, এই জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান হইতে অনুমান। সুতরাং এই জ্ঞান নূতন কোনও প্রমাণ হইতে উদ্ভূত নহে।

উপমান-প্রমাণ দ্বারা সাদৃশ্যের জ্ঞান হয়। সাদৃশ্য প্রভাকরের মতে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, গুণ নহে। গুণের কোনও গুণ থাকিতে পারে না, কিন্তু গুণদিগের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিতে পারে। সাদৃশ্যকে সামান্যও বলা যায় না, কেননা সামান্যের অর্থ এমন কিছু, যাহা বহু বিশেষের মধ্যে এক ও অভিন্ন (যেমন গোরুদিগের গোত্ব)। সামান্য অভিন্নতা নহে। এই জন্যই প্রভাকর সাদৃশ্যকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কুমারিলের মতে সাদৃশ্য একটি গুণ।

শবর স্বামী উপমানকে একটু ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যের মধ্যে যে আত্মা আছে, এই জ্ঞানের প্রমাণ "উপমান"। আমি যেমন আমার আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করি, সেইরূপ অন্যেও তাহাদের আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে। এই প্রকার যুক্তিকেই শবর স্বামী উপমান বলেন। শবরের মতে "কোনও জ্ঞাত বস্তুর সদৃশ বলিয়া কোনও অপ্রত্যক্ষ বস্তুর যে জ্ঞান তাহাই উপমান"। শবর সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিকেই উপমান বলিয়াছেন।

অর্থাপত্তি

যাহা স্বীকার না করিলে কোনও একটি অপ্রত্যক্ষ ব্যাপারের ব্যাখ্যা হয় না, তাহার স্বীকৃতিকে অর্থাপত্তি বলে। অনুমানের সহিত অর্থাপত্তির প্রভেদ এই যে অর্থাপত্তিতে প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সহিত সংশয় জড়িত থাকে,

সেই সংশয় বিদূরিত হয় কেবল অন্য একটি ব্যাপারের (অপ্রত্যক্ষ) স্বীকৃতি দ্বারা। অনুমানে সংশয়ের কোনও স্থান নাই। ইহা প্রভাকরের মত। কুমারিল বলেন দুইটি সামঞ্জস্যবিহীন তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান অর্থাপত্তির কাজ। কিন্তু অনুমান যে সকল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই।

দেবদত্ত দিনের বেলায় আহার করে না, অথচ দেবদত্ত স্থূল হইতেছে। ইহার ব্যাখ্যার জন্য দেবদত্ত রাত্রিতে আহার করে, স্বীকার করিতে হয়। দিনে অনাহার ও দেবদত্তের স্থূলত্ব সামঞ্জস্য বিহীন। এই দুই তথ্যের মধ্যে অর্থাপত্তি-দ্বারা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। অর্থাপত্তি আমরা দৈনিক জীবনে অনবরত ব্যবহার করি। রাম জীবিত আছে জানি, অথচ তাহার গৃহে গিয়া তাহাকে পাইলাম না; তখন ভাবিলাম সে বাহিরে গিয়াছে। ইহা অর্থাপত্তি। মুদ্রিত গ্রন্থে একটি বাক্যের কয়েকটি শব্দ নাই। সেই শব্দ কয়েকটি পূরণ করিয়া বাক্যের অর্থ বুঝিলাম। ইহা অর্থাপত্তি।*

অনুপলব্ধি

কুমারিলের মতে "অনস্তিত্বের" অব্যবহিত জ্ঞান "অনুপলব্ধি" হইতে হয়। এইজন্য অনুপলব্ধিও একটি প্রমাণ। গৃহের মধ্যে ঘট নাই ইহা (ঘটের অভাব) জানিতে পারি কিরূপে? ইন্দ্রিয়দ্বারা এই অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। কেননা ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্শ হইবার তখন কিছুই নাই। ঘটের জ্ঞানের অভাব হইতে এই জ্ঞান হয়, ইহাই কুমারিল ও অদ্বৈতবাদীদিগের মত। ঘট দেখিতে পাইতেছি না ইহা হইতে ঘরে ঘট নাই, এই জ্ঞান হয়, এবং ঘটের প্রত্যক্ষের অভাব হইতে তাহার অনস্তিত্ব অনুমিত হয়—ঘটের অনস্তিত্ব অনুমানের বিষয়—ইহা বলা যায় না। কেননা প্রত্যক্ষের অভাবের সঙ্গে যদি

---

*বেদান্ত পরিভাষা বলেন, "উপপাদ্য-জ্ঞানেন উপপাদক-কল্পনম্ অর্থাপত্তিঃ। ...যেন বিনা যৎ অনুপপন্নং, তৎ তত্র উপপাদ্যং; যস্য অভাবে যস্য অনুপপত্তিঃ, তৎ তত্র উপপাদকম্"। যথা রাত্রি ভোজনেন বিনা দিবা অভুঞ্জানস্য পীনত্বম্ অনুপপন্নং ইতি, তাদৃশং পীনত্বং উপপাদ্যং। যথা বা রাত্রি ভোজনস্য অভাবে তাদৃশপীনত্বস্য অনুপপত্তিঃ, ইতি রাত্রি ভোজনং উপপাদকম্। রাত্রি ভোজন-কল্পনা-রূপায়াং প্রমিতৌ "অর্থস্য আপত্তিঃ কল্পনা" ইতি ষষ্ঠী সমাসেন অর্থাপত্তি-শব্দো বর্ত্ততে। কল্পনাকরণে পীনত্বাদিজ্ঞানে তু "অর্থস্য আপত্তিঃ কল্পনা যস্মাৎ" ইতি বহুব্রীহি সমাসেন বর্ত্ততে।"

বেদান্ত পরিভাষার মতে অর্থাপত্তি দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থপত্তি ও শ্রুতার্থপত্তি। সম্মুখে রজত বলিয়া প্রতিপন্ন একটি দ্রব্যে যখন "ইহা রজত নহে" বলিয়া

অনস্তিত্বের অব্যভিচারী সম্বন্ধ থাকিত, তবেই এই অনুমান সম্ভবপর হইত। অর্থাৎ আমরা যদি জানিতাম যে যখনই বস্তুবিশেষের প্রত্যক্ষ হয় না, তখনই তাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহা হইলেই গৃহে ঘট না দেখিয়া, "তাহা নাই" অনুমান করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইলে যাহা প্রতিপাদ্য তাহাই স্বীকার

তাহার রজতত্ব নিষিদ্ধ হয়, তখন রজত-খণ্ডের সদ্‌ভিন্নত্ব বা সত্যত্বের অত্যন্তাভাব কল্পনা করা হয়। ইহাই দৃষ্ট অর্থাপত্তি। আবার যেখানে শ্রুত বাক্যের অর্থ-জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়ার ফলে অন্য অর্থ কল্পনা করিতে হয়, সেখানে শ্রুত অর্থাপত্তি। তরতি শোকং আত্মবিৎ (যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি শোক অতিক্রম করেন) এখানে "শোক" শব্দদ্বারা "বন্ধন" অর্থ প্রতীত হয়। কিন্তু জ্ঞানদ্বারা বন্ধন-নিবৃত্তি অনুপপন্ন বলিয়া "বন্ধন" যে মিথ্যা, তাহাই কল্পনা করিতে হয়। ইহাই শ্রুতার্থপত্তি। আবার "দেবদত্ত গৃহে নাই" শুনিয়া দেবদত্তের গৃহে অবিদ্যমানতা ও বাহিরে বিদ্যমানতা কল্পনা করিতে হয়।

শ্রুত অর্থাপত্তি দ্বিবিধ—অভিধানানুপপত্তি, অভিহিতানুপপত্তি। যেখানে বাক্যের এক অংশ শুনিয়া অন্য অংশ কল্পনা করা হয়, সেখানে অভিধানানুপপত্তি। যেমন "দ্বার" এই শব্দ শুনিয়া "রুদ্ধ কর" এই পদ ধরিয়া লইতে হয়। আবার "বিশ্বজিৎ যজ্ঞদ্বারা যাগ করিবে", এখানে "যজ্ঞ" ক্রিয়ার কর্তা "স্বর্গকামী ব্যক্তি" অধ্যাহার করিতে হয়। যেখানে বাক্যের অর্থদ্বারা অবগত অর্থ অনুপপন্ন হয় বলিয়া অন্য অর্থের কল্পনা করিতে হয়, সেখানে হয় অভিহিতানুপপত্তি। "স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ দ্বারা যাগ করিবে", এখানে ক্ষণিক যাগ দ্বারা স্বর্গলাভ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যজ্ঞ হইতে স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী কালে "অপূর্ব্ব"-নামক ফলের কল্পনা করিতে হয়।

অর্থাপত্তি-প্রমাণ অনুমান-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা ইহা অন্বয়ী অনুমান ও ব্যতিরেকী অনুমান এই দুইটির কোনটির মধ্যেই পড়ে না। "যেখানে স্থূলত্ব সেখানেই রাত্রি ভোজন" হয় না। বেদান্ত পরিভাষার মতে "ব্যতিরেকী অনুমান" বলিয়া কোনও অনুমানই নাই। সুতরাং অর্থাপত্তিকে ব্যতিরেকী অনুমানও বলা যায় না।

সুতরাং অর্থাপত্তি স্থলে "অনুমান করিলাম", এইরূপ অনুব্যবসায় হয় না। "ইহা দ্বারা কল্পনা করিলাম" এই অনুব্যবসায় হইবে।

ন্যায়দর্শনে ব্যতিরেকী অনুমানের যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা অর্থাপত্তির উদাহরণ। "পৃথিবী অন্য সকল বস্তু হইতে ভিন্ন, কেননা ইহার গন্ধ আছে।" অন্য সকল বস্তু হইতে ভিন্নতা ভিন্ন গন্ধবত্ব হইতে পারে না—ইহা অর্থাপত্তি, ব্যতিরেকী অনুমান নহে।

করিয়া লওয়া হইত। উপমানদ্বারাও ঘটের অভাবজ্ঞান ব্যাখ্যা করা যায় না। ঘটের অভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাখার জন্য অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অনুপলব্ধি সকল ক্ষেত্রেই বস্তুর অভাবের প্রমাণ হইতে পারে না। অন্ধকারে গৃহ মধ্যস্থ বস্তু দেখা যায় না, পরমাণুও দর্শনযোগ্য নহে। পাপ, পুণ্য প্রভৃতিও দেখা যায় না। তাহাদের অনুপলব্ধিদ্বারা তাহাদের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। সুতরাং "যোগ্যানুপলব্ধি"ই প্রমাণ, সকল অনুপলব্ধি প্রমাণ নহে।

প্রভাকর অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে যেনও স্থানে কোনও বস্তু থাকিলে যদি তাহা প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে সেইখানে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলে সেখানে শূন্যস্থানের অস্তিত্ব অনুমিত হয় মাত্র। যখন ঘট যেস্থানে ছিল, সেই স্থান প্রত্যক্ষ করি, এবং সেস্থানে কোনও ঘট দেখিতে পাই না, তখন ভাবি সেখানে ঘট নাই। ঘট যেখানে অবস্থিত ছিল, তাহার জ্ঞান (শূন্যস্থানের) ঘটের অনুপলব্ধি। কুমারিল বলেন যেখানে ঘট ছিল, সে স্থানে ঘট না থাকিলেও পুস্তকাদি দ্বারা তাহা পূর্ণ হইতে পারে। সে স্থান শূন্য না হইলেও ঘটের অভাব অনুভূত হয়। যদি বলা যায় ঘটবিহীন স্থানের অনুভব আমাদের হয়, তাহা হইলে "নেতি জ্ঞানে"র (negative knowledge) অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। যখন ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, তখন সেই ঘট-কর্তৃক অধিকৃত স্থানেরও প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং কেবল স্থানের প্রত্যক্ষ ঘটের অভাবের জ্ঞান দিতে পারে না। এই জন্য ঘটাভাব-জ্ঞানকালে তাহার অধিকৃত স্থান অভাবযুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই অভাবের জ্ঞান আবশ্যক।

শব্দ ও প্রমাণ

বেদ

ধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয় করাই মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। অন্যান্য প্রমাণও প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, এবং ধর্ম্মনির্ণয়ে তাহাদের উপযোগিতা নাই। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যে স্বর্গে যায়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, অনুমানাদি অন্য প্রমাণও নাই। তাহার একমাত্র প্রমাণ বেদ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যে ধর্ম্মের প্রমাণ হইতে পারে না, ইহা প্রদর্শন করাই মীমাংসাদর্শনে সেই সকল প্রমাণের আলোচনার উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মের অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বেদের দুই অঙ্গ। যাহা ব্রাহ্মণ নহে, তাহাই মন্ত্র; যাহা মন্ত্র নহে, তাহাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণে যাহা আছে, তাহা বিধি ও অর্থবাদ। বিধি অংশই বেদের সারভাগ। বিধি "চোদনা-লক্ষণ", অর্থাৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তনামূলক। কল্যাণজনক ফলের উৎপাদক বলিয়া, কতকগুলি কর্ম্মের উপদেশই বিধি। অর্থবাদ ব্যাখ্যামূলক। ব্যাখ্যা ব্যতীত উপদিষ্ট কর্ম্মের প্রশংসাও অর্থবাদে আছে। যাহা কর্ম্মের সহিত সম্পর্কহীন, জৈমিনির মতে তাহা মূল্যহীন। সেই জন্যই বেদের সকল অংশই যে কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, জৈমিনি তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ — এই পাঁচ ভাগে মীমাংসকগণ বেদকে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবিহীন বস্তুর যে জ্ঞান শব্দ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই শব্দজ্ঞান। এই সকল শব্দ বেদের শব্দ অথবা মানুষ-কর্ত্তৃক উচ্চারিত শব্দ হইতে পারে। যাহারা বিশ্বাসযোগ্য, তাহাদের শব্দ প্রমাণিক। কিন্তু বেদবাক্যের প্রমাণের প্রয়োজন নাই। লৌকিক কোনও জ্ঞান পরবর্ত্তী জ্ঞানকর্ত্তৃক বাধিত হইলে তাহা অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু বেদে যাহা আছে, তাহা কখনও অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

বেদ অপৌরুষেয়। বেদ কেহ রচনা করে নাই। তাহা সনাতন, তাহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা নাই। বেদের শব্দাবলী নিত্য, সেই জন্য বেদ নিত্য। শব্দের সহিত তাহার অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। এই সম্বন্ধ মানুষের সৃষ্ট নহে। এই সম্বন্ধ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। নূতন কোনও শব্দ শুনিয়া যখন কেহ সেই সম্বন্ধ (শব্দের অর্থ) বুঝিতে অক্ষম হয়, তখন অর্থবোধের জন্য প্রয়োজনীয় সহকারী কারণের অভাবই সেই অক্ষমতার কারণ, শব্দের সহিত তাহার অর্থের সম্বন্ধহীনতা নহে। আলোকের অভাবে চক্ষু যদি দেখিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে চক্ষু দেখিতে পায় না, ইহা সেই অক্ষমতার কারণ নহে। যে সহকারী কারণের অভাবে শব্দ ও তাহার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, তাহা হইতেছে কোনও বিশেষ শব্দ যে বিশেষ অর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, তাহার জ্ঞানের অভাব। এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা-লভ্য। শব্দের প্রকাশ-ক্ষমতা তাহার স্বরূপগত। ঘট আদি সাধারণ বস্তুসম্বন্ধে ইহা একান্ত সত্য। এই সকল শব্দের সঙ্গে তাহাদের অর্থের সম্বন্ধ মানুষের সৃষ্ট নহে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির নাম (Proper Names) মানুষের দেওয়া। শব্দ ও তাহাদের বাচ্য বস্তু উভয়ই নিত্য এবং অনাদিকাল হইতে মানুষ এক বস্তু বুঝাইতে একই নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

অনাদিকাল হইতে মানুষ একই বস্তু বুঝাইতে একই শব্দের ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, ইহা সত্য নহে। একই বস্তুর নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। স্বামী সন্তদাস বলেন, ইহা সংস্কৃত শব্দ-সম্বন্ধে সত্য এবং সংস্কৃত ভাষায় শব্দদিগের সহিত তাহাদের অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। বৈদিক শব্দ-সকল তাহাদের অর্থের সংকেত। সেই সংকেত অনাদি কাল হইতে প্রচলিত এবং স্বাভাবিক। "কোন কোনও মূর্ত্তি এমন ভীষণ ও বিকট যে, তাহা দর্শন করিবামাত্র সকল প্রাণীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। যাহারা মূক ও কথা কহিতে পারে না এবং বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন অথবা অঙ্গভঙ্গীদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করে, তাহারা যদি ভীষণ ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটি ভীষণ মূর্ত্তি অন্য কাহাকেও প্রদর্শন করে, তবে ইহা সংকেত ব্যবহার করা হইল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সেই সংকেতটি স্বয়ং ও নিজ শক্তি-প্রভাবে দ্রষ্টার মনে ভয় উদ্রেক করিতে সমর্থ। অতএব সংকেত হইলেও ইহা স্বাভাবিক সংকেত বলিয়া গণ্য হয়। সংস্কৃত শব্দসকলও এইরূপ। ইহারা যে অর্থ-প্রকাশের নিমিত্ত সংকেত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারা পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাভাবিক সংকেত। ইহাদের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা স্বাভাবিক সম্বন্ধ, কাল্পনিক সম্বন্ধ নহে। শ্রীভগবান বেদব্যাসও যোগসূত্রের সমাধিপাদের ২৭ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে ইহাই অবধারণ করিয়াছেন।"

প্রভাকরের মতে প্রত্যেক ধ্বনির নির্দ্দিষ্ট আকার আছে। আকারহীন অস্পষ্ট (indistinct) ধ্বনি নাই। প্রত্যেক ধ্বনিই বর্ণমালার কোনও না কোনও আকারে প্রকাশিত হয়। যে সকল বর্ণদ্বারা কোনও শব্দ গঠিত হয়, শব্দ তাহাদিগের হইতে ভিন্ন নহে। যে ক্রমে বর্ণ-ধ্বনি কর্ণে শ্রুত হয়, তাহাদ্বারা শব্দ নিয়ন্ত্রিত হয়। শব্দে প্রত্যেক বর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যক্ষ হয়। সেই সকল প্রত্যক্ষ একটির পরে একটি এত দ্রুত হয় যে, একটি মাত্র প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইয়াই তিরোহিত হয়, কিন্তু তাহার সংস্কার রাখিয়া যায়। শব্দের অন্তর্গত বর্ণদিগের সংস্কার মিলিত হইয়া সমগ্র শব্দের প্রত্যক্ষের উৎপত্তি করে। সমগ্র শব্দেরই অর্থপ্রকাশক শক্তি আছে। শব্দের শক্তি উদ্ভূত হয় বর্ণদিগের শক্তি হইতে। সেইজন্য বর্ণদিগের শক্তিই শাব্দিক জ্ঞানের কারণ বলিয়া উক্ত হয়। শব্দের অর্থজ্ঞান ইন্দ্রিয় হইতে হয় না। ইন্দ্রিয়গণ বর্ণদিগকে উপস্থিত করে, বর্ণদিগেরই অর্থ-উৎপাদিকা শক্তি। শব্দ-জ্ঞানের কারণ বর্ণ। শব্দের অর্থপ্রকাশক শক্তি স্বাভাবিক। আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি, প্রত্যেক শব্দেরই স্বাভাবিক অর্থ আছে।

কুমারিল ও প্রভাকর "স্ফোটে"র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। প্রত্যেক শব্দের উচ্চারিত-ধ্বনি-নিরপেক্ষ অপ্রকাশিত রূপকে "স্ফোট" বলে।

শব্দের নিত্যতা ও বেদের নিত্যতা-সম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি মীমাংসকগণ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল শব্দই মানুষের মুখে উচ্চারিত হয় এবং উচ্চারিত হইবামাত্রই বিনষ্ট হয়, সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে জৈমিনি বলেন, উচ্চারণদ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষই হয়, সৃষ্টি হয় না। উচ্চারণের পরে শব্দ তাহার অপ্রকাশিত রূপে ফিরিয়া যায়, ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। জগতে অপ্রত্যক্ষ বস্তু অনেক আছে। শব্দ যে ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহারই উৎপত্তি ও নাশ আছে। শব্দের নাশ নাই। একই শব্দ একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক বিভিন্ন স্থানে উচ্চারিত হয়। শব্দ নিত্য ও সর্ব্বত্রস্থায়ী হইলে, ইহা সম্ভবপর হইত না। এই আপত্তির উত্তরে জৈমিনি বলেন, একই সূর্য্য একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। তাহাতে তাহার নিত্যত্বের হানি হয় না। সেইরূপ একই শব্দ বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক বিভিন্ন স্থানে উচ্চারিত হইলেও তাহাতে তাহার নিত্যত্বের হানি হয় না। শব্দের পরিবর্ত্তন হয়, শব্দ নিত্য হইলে পরিবর্ত্তন হইত না, ইহার উত্তরে জৈমিনি বলেন, কোনও শব্দেরই পরিবর্ত্তন হয় না। এক শব্দ অন্য শব্দের স্থান গ্রহণ করে মাত্র। উচ্চারণকারীদিগের সংখ্যা অনুসারে শব্দের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তাহা নিত্য হইতে পারে না। ইহার উত্তরে জৈমিনি বলেন, উচ্চারিত ধ্বনিরই হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

জৈমিনি শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণের জন্য নিম্নলিখিত যুক্তি সকল উপস্থাপিত করিয়াছেনঃ (১) শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাহা নিত্য। শব্দ প্রকাশিত করিবার জন্য ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ধ্বনি শব্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা প্রকাশ কারবার জন্য কোনও চেষ্টা হইতে পারে না। (২) যখনই কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়, তখনই তাহা এক অভিন্ন-শব্দরূপে গৃহীত হয়। "গো" শব্দ তিন বা চারিবার উচ্চারিত হইলে, একই শব্দ তিন বা চারিবার উচ্চারিত হইল, আমরা বলি, তিন বা চারিটি শব্দ উচ্চারিত হইল, বলি না। (৩) অনিত্য বস্তুর ধ্বংসের কারণ থাকে, কিন্তু শব্দের ধ্বংসের কোনও কারণ দেখা যায় না। বায়ুর স্পন্দনে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়, তাহা যে শব্দের প্রকাশক, তাহা হইতে ভিন্ন। (৪) শব্দের নিত্যত্ব-সূচক অনেক বাক্য বেদে আছে।

শব্দ জাতিবাচক, ব্যক্তিবাচক নহে। "একটি গো আনয়ন কর" যখন

বলি, তখন নির্দ্দিষ্ট কোনও "গো"র কথা বলি না, "গো"ত্ব-সমন্বিত যে কোনও "গো"-র কথা বলি। শব্দ যদি ব্যক্তিত্বের বাচক হইত, তাহা হইলে জাতিবাচক প্রত্যয় (যেমন 'গো') অসম্ভব হইত। কোনও শব্দদ্বারাই কোনও জাতিভুক্ত সকল ব্যক্তি সূচিত হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সেই জাতির অন্তর্গত যাবতীয় ব্যক্তির সকল শক্তিই সেই শব্দ কর্ত্তৃক সূচিত হইত। কোনও শব্দদ্বারা কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি সূচিত হয় না, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ব্যক্তি-দিগের মৃত্যু এবং নূতন ব্যক্তিদিগের উদ্ভবের সঙ্গে শব্দের পরিবর্ত্তন হইত। শব্দ যদি একমাত্র ব্যক্তির বাচক হইত, তাহা হইলে অর্থের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধও থাকিত না এবং সেই শব্দ কোন ব্যক্তির বাচক, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইত, কখনও অসম্ভব হইত। শব্দ যদি বহু ব্যক্তির বাচক হইত, তাহা হইলেও তাহার সহিত তাহার অর্থের নিত্য সম্বন্ধ থাকিত না, কেননা, সেই সকল ব্যক্তি সকল স্থানে এক সময়ে থাকিতে পারে না। 'স্বরূপ' নিত্য বলিয়াই নিত্য শব্দের সহিত তাহার সম্বন্ধ সম্ভবপর। শব্দ ও তাহার অর্থ নিত্য হইলেও, তাহাদের ভ্রান্ত প্রত্যয় আমাদের থাকা অসম্ভব নহে। সেরূপ স্থলে আমাদের উচ্চারিত বাক্যে ভুল থাকিতেও পারে। কিন্তু বেদ-বচনে এরূপ ভুল থাকার সম্ভাবনা নাই।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাদ বেদান্ত দর্শনেও স্বীকৃত, কিন্তু ন্যায় দর্শনে অস্বীকৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িকগণ বলেন (১) বেদ কোনও পুরুষকর্ত্তৃক রচিত, এই সম্বন্ধে ঐতিহ্য নাই, কিন্তু মীমাংসকগণ বলেন এই ঐতিহ্য গত প্রলয়ে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে। (২) বেদ-রচয়িতার নাম কস্মিন কালে কাহারও স্মৃতিতে ছিল না ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব। (৩) বেদের বাক্য ও লৌকিক বাক্য একই ধর্ম্মান্বিত। (৪) বেদ গুরুর নিকট হইতে শিষ্য শিক্ষা করেন। ইহা বর্ত্তমান প্রথা। ইহা হইতে অনাদি কাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে—বেদের কখনো সৃষ্টি হয় নাই—ইহা স্বীকার করা যায় না। অন্যান্য গ্রন্থও তো গুরুর নিকটই শিষ্য শিক্ষা করে। তাহা হইলে তাহাদিগকেও অনাদি বলিতে হয়। (৫) বেদ পুরুষের রচিত, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। (৬) ধ্বনি নিত্য নহে। বর্ণধ্বনি শুনিয়া তাহা পূর্ব্বশ্রুত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা পূর্ব্বশ্রুত ধ্বনির সহিত বর্ত্তমানে শ্রুত ধ্বনির অভিন্নতা অথবা ধ্বনির নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না। পূর্ব্বশ্রুত ধ্বনি ও বর্ত্তমানে শ্রুত ধ্বনি এক জাতি-ভুক্ত, ইহাই মাত্র প্রমাণিত হয়।

বেদ ঈশ্বর-প্রণীত নহে। বেদ অনাদি, চির-বর্ত্তমান, নিত্য। তাহার

প্রণয়নের অপেক্ষা নাই। ঈশ্বর অশরীরী। বাক্য-উচ্চারণের উপযোগী কোন করণ তাঁহার নাই। বৈদিক শব্দরাজি তিনি উচ্চারণ করিবেন কিরূপে? বেদ-প্রচারের জন্য তিনি মানবরূপ ধারণ করেন, যদি বলা যায়, তাহা হইলে দেহের পরিচ্ছিন্নতা তাঁহার থাকিবে এবং তাঁহার বাক্যের প্রামাণ্য থাকিবে না। বেদ কোনও পুরুষকর্তৃক—ঐশ অথবা মানবীয় পুরুষকর্তৃক—রচিত, এরূপ ঐতিহ্যও নাই। জগৎ কালে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও বেদের নিত্যত্বের বাধা হয় না, কেননা প্রত্যেক কল্পের প্রারম্ভে স্রষ্টা পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বেদ স্মরণ করেন, এবং তাহা শিক্ষা দেন, ইহা বলা যায়। বেদমন্ত্র-রচয়িতা ঋষিদিগের নাম বেদে আছে। ইহা দ্বারা বেদ যে মনুষ্য-রচিত, তাহা প্রমাণিত হয়। এই আপত্তির উত্তরে মীমাংসক বলেন, ঋষিগণ বেদের রচয়িতা নহেন। তাঁহারা উত্তম রূপে বেদমন্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও অন্যকে শিক্ষ দিয়াছিলেন। বেদ ঈশ্বরের অথবা ঋষিদিগের আয়ত্তাধীন নহে। ঋষিগণ সত্যের জ্ঞানলাভ করিয়া তাহা বিতরণ করেন। বেদে ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, ইহাদ্বারা তাহার নিত্যত্ব বাধিত হয়। এই আপত্তির উত্তরে মীমাংসক বলেন, বৈদিক মন্ত্রে প্রাকৃতিক ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল ঘটনা অনাদি কাল হইতে ঘটিয়া আসিতেছে। কোনও বিশেষ ঘটনা বেদে বর্ণিত হয় নাই। যে সকল নাম বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা মরণশাল কোন লোকের নাম নহে। "বিশ্বামিত্র" শব্দের অর্থ বিশ্বের মিত্র। তিনি কোনও ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন। মীমাংসকগণ আরও বলেন, বেদে যে সকল অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের ফল বর্ণিত হইয়াছে (যেমন স্বর্গবাস), সেই সকল অনুষ্ঠানের সহিত তাহাদের ফলের সম্বন্ধ যে কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ঔষধি-সেবন করিলে পীড়ার শান্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা কেহ দেখে নাই। সুতরাং কেহ বেদ রচনা করিয়াছে, ইহা বলা যায় না। চার্ব্বাকপন্থিগণ বেদকে শঠের রচনা বলিয়াছেন। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে কেহই বেদপাঠের কষ্ট স্বীকার করিত না। মানুষের রচনায় ভ্রমপ্রমাদ থাকা সম্ভবপর, কিন্তু বেদে সেরূপ কিছুই নাই। ইহাও বেদের প্রামাণিকতার প্রমাণ। বেদ হইতে যে জ্ঞানলাভ হয়, অন্য কোনও প্রমাণদ্বারা সে জ্ঞান লাভ করা যায় না। ইহা হইতেও বেদের প্রামাণিকতা অনুমিত হইতে পারে।

মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। মীমাংসকদিগের কেহ কেহ পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাদের মতে পরমাণুর উপাদান

দ্বারা জগৎ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম হইতে "অপূর্ব্ব" নামে এক শক্তি উদ্‌ভূত হয়। এই শক্তিই কর্ম্মের ফল উৎপাদন করে।

৫

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যের উপর মীমাংসাদর্শন প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের প্রামাণ্যের অর্থ জ্ঞানের সত্যতা-সম্বন্ধে নিশ্চিতি। মীমাংসাদর্শন-মতে স্মৃতি ব্যতীত অন্য সকল প্রকার জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ জ্ঞান নিজে, অন্য প্রমাণ নাই। অন্য প্রমাণের অপেক্ষাও তাহার নাই। কিন্তু নৈয়ায়িক বলেন, এই স্বতঃপ্রামাণ্যের অর্থ কি? কোনও বিশেষ অবস্থায় কোনও বিশেষ জ্ঞানের যে উৎপত্তি হয়, তাহা সত্য। কিন্তু সেই জ্ঞানই তাহার সত্যতার প্রমাণ, এই কথার অর্থ কি? কোনও বস্তুর সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইলে এক বিশিষ্ট বর্ণের বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই সংস্পর্শ হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহার সহিত সেই বস্তুর সংস্পর্শ নাই। জ্ঞান মানসিক ব্যাপার, তাহা দ্বারা তাহার বিষয়ের বাহ্যিক অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে কিরূপে? মনে যে বর্ণবিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি হয়, সেই বর্ণবিশিষ্ট কোনও বস্তু যে মনের বাহিরে আছে, তাহার নিশ্চিতি কি? অন্য কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারাও কোনও জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য প্রমাণিত হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, এই মাত্র আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। কিন্তু সেই জ্ঞানের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহা হইতে তাহার বিষয়ের যে অস্তিত্ব আছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। জ্ঞানের উৎপত্তিই যদি তাহার সত্যতার প্রমাণ হয়, তাহা হইলে কোনও জ্ঞানকেই মিথ্যা বলা যায় না। মরীচিকাও তাহা হইলে মিথ্যা নহে। কিন্তু মরীচিকার অনুসরণ করিয়া যখন আমরা জল দেখিতে পাই না, তখন মরীচিকার জ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। কোনও জ্ঞানের উদ্ভবের পরে যখন তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কর্ম্ম করি, তখন সেই কর্ম্ম প্রত্যাশিত ফল উৎপন্ন করিলে, সেই জ্ঞান সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কার্য্যক্ষেত্রে কোনও জ্ঞানের প্রয়োগে যখন ঈপ্সিত ফল-লাভ হয়, তখনই তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য নাই। জ্ঞানের সহিত তাহার বিষয়ের সংবাদ (মিল) যখন কর্ম্মদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, তখনই তাহার প্রামাণ্য হয়। ন্যায়দর্শনের এই মতের মূলে আছে এই বিশ্বাস যে, জ্ঞান উৎপন্ন হয় বাহ্যিক কারণদ্বারা। কিন্তু ইহা অনুমানমাত্র। বাহ্য কারণ হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা অভিজ্ঞতার

বিষয় নহে। জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্রই আমরা তাহার বিষয় বাহ্য বস্তুর (বাহ্য বস্তুরূপে প্রতীত বস্তুর) অস্তিত্ব অবগত হই। জ্ঞানে ঐ বস্তুর অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়, কিন্তু ঐ বাহ্য বস্তুদ্বারা যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করি না, ইহা অনুমানমাত্র। অন্য বস্তু প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বরূপ। অন্য কোনও ব্যাপারের সহিত জ্ঞানের সাদৃশ্য নাই। বস্তুর সহিত জ্ঞানের সাদৃশ্যের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের সহিত পরবর্ত্তী জ্ঞানের সাদৃশ্য। বাহ্য বস্তুর সহিত অব্যবহিত সংস্পর্শ আমাদের কখনও হয় না—জ্ঞানের সাক্ষ্য হইতেই বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোনও প্রমাণ নাই। ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু প্রকাশিত হয়, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা-দ্বারা সেই সকল বস্তুদ্বারা যে তাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাণিত হয় না। জ্ঞানে কেন বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ হয়, তাহা আমরা জানি না। জ্ঞানে বাহ্য বিষয়ের প্রকাশ হয়, এই মাত্র আমরা জানি; কেন হয়, তাহা জানি না। যাবতীয় বাহ্য প্রকাশই জ্ঞানের অপেক্ষা করে। ইহাই জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য। জ্ঞানের কার্য্য প্রকাশ করা। এই প্রকাশন ও জ্ঞান, উভয়ের মধ্যে এমন কিছু নাই, প্রকাশনের জন্য জ্ঞান যাহার অপেক্ষা করে। কেবল উৎপত্তিতে নহে, কার্য্যেও (জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিবার সময়) জ্ঞান অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না। উদ্‌ভূত জ্ঞান সত্য জানিয়াই আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। স্বকার্য্য-করণে ইহাই জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য। মীমাংসাদর্শনের মতে জ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার স্বতঃ প্রামাণ্যের উদ্‌ভব হয়, যদিও পরবর্ত্তী জ্ঞানদ্বারা তাহার অপ্রামাণ্য প্রমাণিত হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানের উৎপত্তি-কালে তাহার সত্যতার যে বোধ হয়, কোনও ইন্দ্রিয়ের দোষ দৃষ্ট না হইলে এবং পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতায় কোনও বাধক জ্ঞানের উৎপত্তি না হইলে, সেই বোধের সত্যতা-সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করিবার কারণ নাই। সুতরাং স্মৃতি ব্যতীত অন্য সকল জ্ঞানই পরবর্ত্তী জ্ঞান দ্বারা বাধিত না হইলে সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। স্মৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতা ও তজ্জাত সংস্কারের অপেক্ষা করে। সুতরাং তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য থাকিতে পারে না।

কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তি যদি আপনা হইতেই হয়, তাহার যদি অন্য কোনও কারণ না থাকে, তাহা হইলে গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানের উৎপত্তির হেতু কি? মীমাংসাদর্শনে ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের যে সংস্পর্শ হয়, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই সংস্পর্শ স্বীকার করিলে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিভিন্ন বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা বলিতে

বাধা থাকে না। কিন্তু ইহা উপরে ব্যাখ্যাত মীমাংসা-মতের সহিত সঙ্গত হয় না, সেই জন্য ন্যায়দর্শনের ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-মত পরিবর্ত্তিত আকারে মীমাংসাদর্শনে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানের স্বতঃ উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তির মধ্যে যে বিরোধ, তাহা মীমাংসকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মীমাংসকদিগের মতে ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব এবং তাহাদিগের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ, অথবা বিষয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইবার বিশেষ শক্তি অনুমানের বিষয়, প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। জ্ঞানের উৎপাদনে বিষয়ের কার্য্য জ্ঞানোৎপত্তির সময় প্রত্যক্ষ হয় না। জ্ঞানোৎপত্তির পরে আমরা ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের অনুমান করি। একমাত্র স্মৃতির বেলায় জ্ঞান অন্য কারণের অপেক্ষা করে দেখা যায়। সুতরাং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ জ্ঞানোৎপত্তির আনুষঙ্গিক কারণ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তি ও তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অব্যবহিত এবং অন্য-নিরপেক্ষ।

মনের এবং ইন্দ্রিয়দিগের অস্তিত্ব কিরূপে অনুমিত হয়, সে সম্বন্ধে প্রভাকরের মত এই :

আমাদের বিষয়-জ্ঞান এক প্রকারের নহে ; তাহা এক ভাবে উৎপন্ন হয় না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সকল জ্ঞানই আত্মার মধ্যে আবির্ভূত হয়। আত্মাকে জ্ঞানের সমবায়ী কারণ (উপাদান কারণ) মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য অসমবায়ী কারণেরও প্রয়োজন। অসমবায়ী কারণ হয় সমবায়ী কারণ অথবা তাহার কারণের মধ্যে থাকে। কিন্তু আত্মা নিত্য ও স্বয়ম্ভু, তাহার কোনও কারণ নাই। সুতরাং জ্ঞানের যাহা অসমবায়ী কারণ, তাহা আত্মার মধ্যেই অবস্থিত বলিতে হয়। ন্যায়-মতে নিত্য বস্তুতে গুণের উদ্ভব অন্য বস্তুর সহিত সংস্পর্শ ভিন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান যখন একপ্রকার গুণ, তখন তাহার উৎপত্তির জন্য অন্য বস্তুর সহিত আত্মার সংস্পর্শের প্রয়োজন। কিন্তু যে যে দ্রব্যের সহিত আত্মার সংস্পর্শ হয়, তাহারা যে অন্য পদার্থের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার প্রমাণ নাই। সুতরাং তাহাদিগকেও নিত্য বলিতে হয়। দিক্, কাল ও পরমাণু নিত্য দ্রব্য। দিক্ ও কাল সর্ব্বব্যাপী এবং তাহাদের সহিত আত্মার সংস্পর্শ অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং জ্ঞানের সাময়িক উৎপত্তি দিক্ ও কালের সহিত আত্মার সংস্পর্শদ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং একপ্রকার পরমাণুর সহিত সংস্পর্শই জ্ঞানোৎপত্তির অসমবায়ী কারণ। এই পরমাণুকে "মন" বলা যায়। মন আপনা হইতে

জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতির উৎপত্তি করে। কিন্তু তাহার রূপ, রসাদি গুণ নাই বলিয়া আত্মার এই সকল গুণের প্রত্যক্ষের কারণ তাহা হইতে পারে না। আত্মাকর্তৃক এই সকল গুণের প্রত্যক্ষের জন্য, এই সকল গুণ যাহাদের আছে, এমন করণসকলের প্রয়োজন। রূপের প্রত্যক্ষের জন্য এমন করণের প্রয়োজন, রূপ যাহার বিশেষগুণ। রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষের জন্য এমন করণসকলের প্রয়োজন, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যাহাদের বিশেষ গুণ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বকের বিশেষ গুণ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। কিন্তু মন ব্যতিরেকে এই সকল ইন্দ্রিয়ের কোনটিই কর্ম্ম করিতে পারে না। সেইজন্য প্রথমে (১) বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, পরে (২) ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের গুণের, পরে (৩) মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের এবং তাহার পরে (৪) মনের সহিত আত্মার সংস্পর্শের প্রয়োজন।

প্রভাকরের মত এই। কিন্তু কুমারিল এ সম্বন্ধে কোনও সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়দিগকে একপ্রকার ক্রিয়া বলা যাইতে পারে, অথবা বিষয়ের সংস্পর্শে না আসিয়া তাহাকে প্রকাশ করিবার শক্তিযুক্ত দ্রব্য, অথবা বিষয়ের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের প্রকাশক দ্রব্য বলিয়াও গণ্য করা যাইতে পারে। শেষোক্ত মতই তাঁহার মনঃপূত।

৬

জ্ঞানের স্বরূপ

প্রভাকর

জ্ঞান একটি অনন্যসাধারণ পদার্থ। 'জ্ঞান' শব্দ হইতে তাহার একটি অর্থ বোধগম্য হয়; কিন্তু তাহা কি, বর্ণনা করা সহজসাধ্য নহে। জ্ঞান যে কেবল মানুষেরই আছে তাহা নহে। পশু-পক্ষীদিগেরও জ্ঞান আছে। কিন্তু পশু-পক্ষীদিগের জ্ঞান কি রকম, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান আমাদিগের নাই। জ্ঞান কি দ্রব্য? অথবা গুণ, অথবা ক্রিয়া? প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দজ্ঞান ভিন্ন স্মৃতিও এক প্রকার জ্ঞান। মীমাংসা-দর্শনে জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।*

---

* চণ্ডীতে আছে—

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলং।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ॥

কেবল মানুষই যে জ্ঞানবান তাহা নহে, পশুপক্ষী প্রভৃতিরও জ্ঞান আছে। মৃগপক্ষীদিগের যে জ্ঞান, মনুষ্যদিগেরও সেই জ্ঞান। মনুষ্যদিগের যে জ্ঞান তাহাদিগেরও তাহাই।

কিন্তু পশুপক্ষীদিগের জ্ঞান কি রকম, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান আমাদিগের নাই। জ্ঞান কি দ্রব্য? অথবা গুণ, অথবা ক্রিয়া? প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দজ্ঞান ভিন্ন স্মৃতিও এক প্রকার জ্ঞান। মীমাংসা-দর্শনে জ্ঞানের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রভাকরের মতে প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, তিনেরই এক সঙ্গে জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে 'ত্রিপুট সংবিৎ' বলে। জ্ঞাতা ও জ্ঞাত বস্তুর সহিত জ্ঞানও আপনি প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় কেবল যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশিত হয় তাহা নহে, জ্ঞাতার জ্ঞানও প্রকাশিত হয়। 'অহম্ ইদং জানামি'—এই জ্ঞানে তিনটি বস্তুর অব্যবহিত জ্ঞান হয়; যথাঃ (১) অহম্ (বিষয়ী)-এর জ্ঞান (অহংবিত্তি), (২) ইদম্ (ইহা, বিষয়)-এর জ্ঞান (বিষয়বিত্তি), (৩) বিষয় জ্ঞানের বোধ (স্ব-সংবিত্তি)। প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর জ্ঞান ও জ্ঞানের বোধ সংযুক্ত থাকে। এই জ্ঞানের বোধ (আমি জানিতেছি, এই বোধ) স্ব-সংবিত্তি।

প্রত্যেক জ্ঞানে—তাহা প্রত্যক্ষ, আনুমানিক অথবা শাব্দিক যাহাই হউক না কেন—মনের মাধ্যমে আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। কিন্তু বিষয়ের অব্যবহিত জ্ঞান সকল ক্ষেত্রে হয় না; স্মৃতি ও অনুমান-জ্ঞানে তাহাদের বিষয় সংবিদের সম্মুখে অব্যবহিত ভাবে উপস্থিত থাকে না। কিন্তু এই গৌণ জ্ঞান (স্মৃতি ও অনুমান) সংবিদের সম্মুখে অব্যবহিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। 'আমি জানিতেছি যে আমি জানিতেছি'—এই জ্ঞান হয়। জ্ঞানের জ্ঞান অব্যবহিত ভাবেই হয়। জ্ঞান আলোক-সদৃশ; তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান স্বতঃ-জ্ঞাত, কিন্তু জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞাত বিষয় আলোকের ন্যায় স্বপ্রকাশ নহে। তাহাদের প্রকাশের জন্য অন্য আলোকের প্রয়োজন। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কিন্তু তাহা বিষয়-রূপে জ্ঞাত হয় না, তাহা অন্য জ্ঞানদ্বারাও জ্ঞাত হয় না। জ্ঞান বিষয় নহে। সুখ ও দুঃখের ন্যায় জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান যদি বিষয়রূপে জ্ঞাত হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন হইত, এবং অনবস্থার উদ্ভব হইত।

শবর স্বামীর মতে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। এই মতের সহিত প্রভাকরের মতের মিল নাই। সেই জন্য প্রভাকর বলেন, জ্ঞান যদিও আপনা হইতেই জ্ঞাত হয়, তথাপি তাহার উপস্থিতি অনুমান-দ্বারা জ্ঞাত হয়। কোনও বিষয়ের যখন জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান হইতে আমরা অনুমান করি, যে আমাদের সেই জ্ঞান হইয়াছে। এই অনুমানলব্ধ জ্ঞান

'প্রমেয়' (সত্য জ্ঞানের বিষয়) হইলেও 'সংবেদ্য' (পূর্ণভাবে জ্ঞাত) নহে। যখন বিষয়ের রূপ প্রকাশিত হয়, তখন সেই জ্ঞানকে 'সংবেদ্য' বলে। এই সংবেদ্য কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সম্বন্ধেই হয়। জ্ঞানের কোনও রূপ নাই, সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। তাহার অস্তিত্ব কেবল অনুমিতই হইতে পারে। অনুমানদ্বারা তাহার বিষয়ের রূপ অথবা আধেয়ের জ্ঞান হয় না, কেবল বিষয়ের অস্তিত্বের জ্ঞানই হয়। জ্ঞান আত্মার পরিণাম। কুমারিল এবং প্রভাকর উভয়ের মতেই জ্ঞান অনুমানের বিষয়, প্রত্যক্ষের বিষয় নহে।

জ্ঞানের বহিঃস্থ কোনও কিছুর উপর তাহার প্রামাণ্য নির্ভর করে না। জ্ঞানের বাহিরে কোনও বস্তুই পাওয়া যায় না। যাবতীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বাহ্য জগতে কর্মের প্রবর্তনা দান করে। এই প্রবর্তনার শক্তিই জ্ঞানের প্রামাণ্যসাধক। কোনও বিষয় যে-জ্ঞানে গৃহীত হয়, তাহা অপ্রামাণিক হইতে পারে না। জ্ঞানের যদি স্বতঃপ্রামাণ্য না থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে কোনও বিশ্বাসই আমাদের হইত না। জ্ঞানের প্রামাণিকতার ধারণা অন্য কিছু হইতে উদ্ভূত হয় না।

প্রভাকরের মতে প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। অনুভূতি (যেমন প্রত্যক্ষে হয়) বা অব্যবহিত জ্ঞান প্রামাণিক। স্মৃতি অপ্রামাণিক, কেননা পূর্ববর্তী জ্ঞান না থাকিলে স্মৃতি হয় না। যে জ্ঞানের সঙ্গে তাহার বিষয়ের সম্বন্ধ গৌণ বা ব্যবহিত, তাহা অপ্রামাণিক। প্রভাকরের মতে জ্ঞানের বিষয়ের পূর্ববর্তী জ্ঞানের অভাবই তাহার প্রামাণ্যের 'কষ্টি'। কুমারিলের মতে এই পূর্ববর্তী জ্ঞানাভাব ব্যতীত অন্য জ্ঞানের সহিত অসংগতির অভাবও জ্ঞানবিশেষের প্রামাণিকতার 'কষ্টি'।

বিপর্যয় ও মিথ্যা জ্ঞান এক নহে। সকল জ্ঞানই স্বপ্রকাশ এবং যথার্থ। যখন শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, তখন 'ইহা রজত', এই জ্ঞান মিথ্যা নহে, কেননা তখন রজতের প্রত্যয় ও মনের সম্মুখে বর্তমান 'ইহা'র মধ্যে ভেদের অনুপলব্ধিই ভুলের কারণ। যাহা প্রত্যক্ষ (ইহা) তাহার সহিত স্মৃতিতে রক্ষিত যে রজতের প্রত্যয়, তাহা আমরা মিশাইয়া ফেলি। যাহা সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই জ্ঞানের বিষয়। যখন বলি 'ইহা রজত', তখন যাহা সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহা শুক্তি নহে, তাহা রজত (রজতের প্রত্যয়)। শুক্তি সেখানে উপস্থিত থাকে না, সুতরাং শুক্তিকে যে রজত বলিয়া বুঝি তাহা নহে, রজতের যে প্রত্যয় মনে আছে, তাহার সহিত প্রত্যক্ষ 'ইহা'র মিল নাই। প্রত্যক্ষ

যাহা, তাহা পরে শুক্তি বলিয়া অবধারিত হয়। এই ভ্রমের কারণ 'অখ্যাতি' —অর্থাৎ সংবিদের সম্মুখে যাহা উপস্থিত আছে, তাহার সহিত স্মৃতিতে যাহা আছে, তাহার পার্থক্যের জ্ঞানের অভাব। যাহা প্রত্যক্ষ—'ইহা', এবং যাহার স্মরণ হয়—'রজত', উভয়ই সত্য, কিন্তু উভয়ে যে ভিন্ন, সেই বোধের এখানে অভাব। এই বোধের অভাবের কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দোষ, এবং শুক্তি ও রজতের সাদৃশ্য হইতে পূর্ব জ্ঞাত রজতের সংস্কারের উদ্ভব।

এই 'অখ্যাতি'-বাদের সমালোচনায় বিরুদ্ধ পক্ষ বলেন, যাহা প্রত্যক্ষ ও যাহার স্মরণ হয়, তাহা যদি সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্বই তো নাই। যদি উভয়ই সংবিদের সম্মুখে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যে ভেদ তাহা দৃষ্ট হইবে না, ইহা অসম্ভব। যত ক্ষণ ভুল থাকে, তত ক্ষণ প্রত্যক্ষ 'ইহা' সংবিদের সম্মুখে বর্তমান থাকে; তাহা স্মৃতি নহে, তাহা প্রত্যক্ষ শুক্তি। তাহা সত্ত্বেও কিরূপে রজতের স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়াও সংবিদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে আবির্ভূত হয়, তাহা দুর্বোধ্য।

জ্ঞান-সম্বন্ধে প্রভাকরের মত সন্তোষজনক নহে। জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্যের অর্থ—কোনও জ্ঞানের সত্যতা তাহার আবির্ভাবদ্বারাই প্রমাণিত হয়। যে বস্তু সম্মুখে দেখিতেছি, তাহার যে জ্ঞান হয়, তাহার সত্যতার প্রমাণ এই যে সেই জ্ঞান হইতেছে, সেই বস্তু সম্মুখে দেখিতেছি। কিন্তু এই জ্ঞান অব্যবহিত ভাবে উৎপন্ন হইলেও ইন্দ্রিয়দোষ বশতই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, সকল সময় সত্য হয় না। কোনও বস্তুর জ্ঞানের জন্য তাহার সম্মুখে অবস্থিতি ভিন্ন অন্য সহকারী কারণও আছে, যেমন যথেষ্ট আলোকের বর্তমানতা। তাহা ভিন্ন জ্ঞাতার মনোযোগেরও প্রয়োজন। জ্ঞাতার সম্পূর্ণ মনোযোগ জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত না হইলে সত্য জ্ঞান হয় না। জ্ঞান যদি স্বতঃপ্রমাণ হইত, তাহা হইলে কোনও জ্ঞানকেই মিথ্যা বলা যাইত না।

জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিতেও বাধা আছে। সংবিদের সম্মুখে কিছু অবস্থিত থাকিলেই তাহার জ্ঞান হয়, ইহা সত্য; কিন্তু সে জ্ঞান সকল সময় স্বতঃই উৎপন্ন হয় না, তাহা উৎপন্ন করিতে কারণান্তরের প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাহার বিষয়বস্তুর ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্তমান থাকা আবশ্যক। স্মৃতিজ্ঞানে সেই জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কারণের প্রয়োজন। জ্ঞানের যাহা অবরোধক, তাহার অপসারণও আবশ্যক।

সূর্যরশ্মি স্ব-প্রকাশ, তাহা সকল বস্তুকে প্রকাশিত করে; কিন্তু তাহার

প্রকাশের জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। তাহা উৎপন্ন করিতে হয় না; কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তি আছে, এবং তাহা স্বতঃই উৎপন্ন হয় না। যাহার উৎপত্তির কারণ আছে, তাহাকে স্ব-প্রকাশ বলা যায় না। প্রভাকর বলিয়াছেন, প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ায় বিষয়, বিষয়ী এবং বিষয়ের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন কোনও বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতার যে জ্ঞান হয়, তাহার প্রমাণ নাই। সেই জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাতার অস্তিত্ব অনুমিত হয়, কেননা জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় বস্তু কাহার নিকট প্রকাশিত হইবে? কিন্তু জ্ঞাতা তখন প্রকাশিত হন, ইহা বলা যায় না। যিনি জ্ঞাতা, তাহাকে আমরা প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় জানিতেছি, ইহা বলা যায় না। 'বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ?' (বৃহদারণ্যক)—বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে?

জ্ঞানের উৎপত্তির পরে পরিচিন্তনের ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না। পরিচিন্তনে জ্ঞানের একজন জ্ঞাতা আছে, ইহা মনে হয়, তখন বিষয় ও বিষয়ী উভয়ের চিন্তাই মনে উদিত হয়। জ্ঞাতাকে বর্জন করিয়া জ্ঞাত বস্তুর চিন্তা করা যায় না, ইহা সত্য; কিন্তু কোনও বস্তুকে জ্ঞাত বলিয়া চিন্তা না করিয়াও তাহার চিন্তা করা যায়। পরিচিন্তনে জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুই প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের মতে 'আমি জানি' ইহা না জানিয়া আমরা কিছুই জানিতে পারি না। 'আমি জানি' এবং 'আমি জানি যে আমি জানি', এই দুইটার মধ্যে কোনও ভেদ প্রভাকর স্বীকার করেন না। জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের প্রকাশরূপেই জ্ঞাত হইবে, বিষয়ের প্রকাশরূপে নহে। তাহা হইলে বিজ্ঞানবাদ (Subjective Idealism) আসিয়া পড়ে। তাহা পরিহারের জন্য প্রভাকর বলেন যে জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইলেও অনুমানদ্বারা লভ্য।

শবর স্বামীর মতে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। প্রভাকরের মতের সহিত এই মতের সংগতি নাই। প্রভাকর জ্ঞানকেই চরম সত্য এবং বিষয়ী ও বিষয়ের অর্থ জ্ঞানের মধ্যে নিহিত বলিয়াছেন। তাহার মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের বহিঃস্থ কিছুদ্বারা উৎপন্ন হয় না। ইহার অর্থ জ্ঞানে বাহ্য বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় না, এবং তাহা বাহ্য বস্তুদ্বারা উৎপন্ন হয় না। তাহার মতের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি বিজ্ঞানবাদে।

প্রভাকর জ্ঞানের স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, তাহার আবির্ভাবে যদি অন্য কিছুর অপেক্ষা না থাকে, বিষয়ের সহিত জ্ঞাতাও যদি জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একই

বস্তুর বিভিন্ন অংশ, এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাই জ্ঞান। কিন্তু প্রভাকর তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এই সম্বন্ধ এক অনন্যসাধারণ সম্বন্ধ। জ্ঞাতা এই জ্ঞানে স্পষ্ট প্রকাশিত হন না, তাঁহার অনুমান হয়; এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধরূপ জ্ঞানও অনুমানগম্য, প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। বিষয়েরই কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।*

৭

কুমারিলভট্টের জ্ঞানবাদ

কুমারিলের মতে আত্মার ক্রিয়াদ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞানোৎপত্তির ফলে 'বিষয়' প্রকট হয়, কিন্তু উৎপন্ন জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান-ক্রিয়ার মধ্যে থাকে (১) জ্ঞাতা (২) জ্ঞেয় (৩) জ্ঞানের করণ ও (৪) জ্ঞানের ফল অর্থাৎ জ্ঞেয়ের জ্ঞাততা।

জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু জ্ঞানের ফল হইতে (জ্ঞেয় বিষয়ের প্রাকট্য বা জ্ঞাততা হইতে) জ্ঞানের অনুমান হয়। জ্ঞান-ক্রিয়ায় জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে এক প্রকার সম্বন্ধের উদ্ভব হয়। সেই সম্বন্ধ-সৃষ্টিতে জ্ঞাতার ক্রিয়া থাকে। এই সম্বন্ধ আছে বলিয়া জ্ঞানের উৎপত্তিতে কর্তার (জ্ঞাতার) ক্রিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ মানস প্রত্যক্ষে অনুভূত হয়, এবং এই সম্বন্ধ হইতে জ্ঞানের অনুমান হয়। সংবিদ্ (consciousness) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগসাধক তৃতীয় বস্তু। যাঁহারা বলেন, জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের

* পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক স্পিনোজা 'আত্মসংবিদে'র আলোচনায় জ্ঞানের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। স্পিনোজার মতে 'সৎ' (Substance)-এর দুই গুণ: ব্যাপ্তি (Extension) ও চিন্তা (Thought)। বাহ্যজগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তু ব্যাপ্তির বিকার, এবং অন্তর্জগতে জ্ঞান, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি চিন্তার বিকার। প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর একটি প্রত্যয় (Idea) চিন্তার জগতে বর্তমান। মানুষের দেহ একটি যৌগিক বস্তু। চিন্তার জগতে তাহার যে প্রত্যয় বর্তমান, তাহাই মন। মন দেহের বিভিন্ন অবস্থার প্রত্যয়ের সমবায়। যখন কেহ কোনও বস্তু দর্শন করে তখন সেই বস্তুর প্রত্যয় মনের (দেহের প্রত্যয়) অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই প্রত্যয়ই সেই বস্তুর জ্ঞান। সেই প্রত্যয়ের সঙ্গে আবার চিন্তার জগতে তাহার (সেই প্রত্যয়ের) একটি প্রত্যয় উদ্ভূত হয়। এই দ্বিতীয় প্রত্যয় সেই জ্ঞানের জ্ঞান। দ্বিতীয় প্রত্যয়েরও আর একটি প্রত্যয় উদ্ভূত হয়, তাহা সেই জ্ঞানের জ্ঞান। এই প্রত্যয়-শ্রেণী অনন্ত পর্য্যন্ত চলিতে থাকে; এবং উহাদের সমষ্টিই আত্মজ্ঞান। স্পিনোজার এই মতের মধ্যে জ্ঞাতার কোনও কথা নাই। 'আমি জানি' এই জ্ঞান এক সমুৎপাদ। তাহা জ্ঞানের অন্তর্গত। জ্ঞাতাকে জ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না, যদিও তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

মধ্যে যে সম্বন্ধ উদ্‌ভূত হয়, তাহা মানস প্রত্যক্ষে অনুভূত হয়। 'আমি ঐ ঘট জানি'—ইহা আমরা বলিতে পারিতাম না, যদি জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞাত বিষয়ের সম্বন্ধ এবং জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আমরা জানিতে না পারিতাম। এখন বিবেচ্য—জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, এবং জ্ঞানের বিষয় সংবিদ্‌কর্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সংবিদ্‌ ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় কিসের দ্বারা? একই জ্ঞানে বিষয়-জ্ঞান ও এই সম্বন্ধের জ্ঞান হইতে পারে না। কেননা এই জ্ঞানোৎপত্তির সময় এই সম্বন্ধের উদ্‌ভবই হয় নাই। জ্ঞানই এই সম্বন্ধ। তাহার উৎপত্তির পরে তাহার সহিত সংবিদের সম্বন্ধ হয়। যখন কোন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখন তাহার বিষয় প্রকাশিত হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সেই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহা প্রথমে বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া পরে বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রকাশ করে, ইহা বলা যায় না। জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যে স্বপ্রকাশ, তাহাও বলা চলে না। তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এই জন্য কুমারিল-শিষ্যগণ আত্মা এবং বিষয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা মানস-প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলেন। তাই মানস-প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। *

জ্ঞানে জ্ঞেয়ের এক বিশেষ রূপ (অতিশয়) জ্ঞানকর্তৃক সৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ত্রিতয়প্রতিভাসবাদিগণকেও (যাঁহারা জ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন) এই অতিশয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক-দর্শনের অনুগামিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে জ্ঞানে বিষয়ের রূপান্তর হয় না। জ্ঞানগম্যতা বিষয়ের গুণ নহে। ইহা জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মধ্যে অনন্যসাধারণ সম্বন্ধ (স্বরূপ সম্বন্ধ)। কুমারিল জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন না। বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন। তাঁহার অনুবর্তিগণ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। জ্ঞান প্রত্যক্ষযোগ্য হইলে, তাহা জ্ঞানের বিষয় এবং সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষের জন্য অন্য এক জ্ঞানের প্রয়োজন। তাহাতে অনবস্থার উদ্‌ভব হয়। তাঁহাদের মতে জ্ঞান অনুমানগম্য। কুমারিল 'প্রমা'র (যথার্থ জ্ঞানের) স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন। জ্ঞানের উৎপত্তি ইন্দ্রিয় অথবা অনুমান হইতে হইতে পারে, কিন্তু ইহা আপনিই বিষয় প্রকাশিত করে, এবং তাহার স্বতঃপ্রামাণ্যের বোধ উৎপাদন করে। যত ক্ষণ

* শাস্ত্রদীপিকা ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের গ্রন্থে উদ্ধৃত।

পর্য্যন্ত জ্ঞান-বিরোধী কিছু আবিষ্কৃত না হয় (যেমন ইন্দ্রিয়ের দোষ, অপটুতা প্রভৃতি), ততক্ষণ জ্ঞানের সত্যতায় কোন সন্দেহ আমাদের থাকে না।

কুমারিলের মতে শুক্তিতে রজত-জ্ঞান জ্ঞান-রূপে প্রামাণিক, জ্ঞাতার মনে সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। পাণ্ডুরোগে যে কোন বস্তু পীতরূপে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ চক্ষুতে পীতরস; চক্ষু পীতবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া বাহিরের বস্তু পীতরূপেই দৃষ্ট হয়। তখন যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ যাহা জ্ঞানে আবির্ভূত হয়, তাহা বস্তুতঃ পীতবর্ণ। সন্দিগ্ধ জ্ঞানে যখন দূরে দৃষ্ট দীর্ঘাকার পদার্থ কোন মানুষ অথবা অন্য কোন দীর্ঘাকার বস্তু—এই সন্দেহ হয়, তখন শুধু দীর্ঘ আকারই জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং তখন মনে দীর্ঘাকারবিশিষ্ট দুই বস্তুর স্মরণ হয়।

অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা অজ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের কারণ। জ্ঞানের অপ্রামাণ্য ত্রিবিধ: (১) মিথ্যা জ্ঞান, (২) অজ্ঞান এবং (৩) সংশয়। সন্দিগ্ধ এবং মিথ্যা জ্ঞান ভাববাচক বস্তু; তাহার উৎপত্তি হয় দোষযুক্ত কারণ হইতে। অজ্ঞানে জ্ঞানোৎপত্তির কারণের অভাব।

এই সকল আলোচনায় 'প্রামাণ্য' শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেক জ্ঞানই (সত্য হউক, মিথ্যা হউক) জ্ঞানরূপে প্রামাণিক, কেননা যে রূপেই তাহা প্রকাশিত হউক, সেই রূপেই তাহার অস্তিত্ব আছে। ভ্রান্তিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান এই অর্থে প্রামাণিক। দ্বিতীয় অর্থে কার্য্যকালে যে জ্ঞান কার্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাই প্রামাণিক (pragmatic) এবং যাহা উত্তীর্ণ হয় না, তাহা অপ্রামাণিক।

৮

দৃষ্টি-বিভ্রম (Illusion)

সকল জ্ঞানেরই যদি স্বতঃপ্রামাণ্য থাকে, তাহা হইলে ভ্রান্তি কি ?

জৈন মতে যে জ্ঞান আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য অব্যবহিত ও অপরিহার্য্য উপায়, তাহাই প্রামাণিক। যতক্ষণ কোন জ্ঞানের বিরোধী কিছু দৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ তাহা সত্য। যে জ্ঞানে বস্তুদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা হইতে ভিন্ন সম্বন্ধে বস্তুর প্রকাশ হয়, তাহা মিথ্যা। যখন অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, তখন যে স্থানে সর্পের অস্তিত্ব নাই, সেই স্থানের সম্পর্কে সর্প দৃষ্ট হয় বলিয়া সেই জ্ঞান মিথ্যা। যাহা তথ্য, তাহা হইতে ভিন্ন রূপে দেখাই মিথ্যা জ্ঞান। এই মতকে সৎখ্যাতি বলে।

উপরোক্ত মত ব্যতীত ভ্রান্তি-সম্বন্ধে তিনটি মত আছে: (১) আত্মখ্যাতি, (২) বিপরীত খ্যাতি অথবা অন্যথাখ্যাতি এবং (৩) অখ্যাতিবাদ।

বিপরীত বা অন্যথাখ্যাতি ন্যায় বৈশেষিক ও যোগদর্শনে স্বীকৃত; আত্মখ্যাতি বৌদ্ধদিগের মত এবং অখ্যাতি মীমাংসা ও সাংখ্যদিগের মত।

বৌদ্ধগণ বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান-প্রবাহ ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। এই বিজ্ঞান-প্রবাহ তাহার স্বীয় নিয়ম-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেই নিয়মানুসারে কখনও সত্য জ্ঞান, কখন ও মিথ্যা জ্ঞানের উদ্ভব হয়; তাহাতে বিজ্ঞান-বাহ্য কোন বস্তুর ক্রিয়া নাই। বিজ্ঞান-বাহ্য কিছু থাকিলেও, একটি বিষয় হইতে কখনও সত্য জ্ঞান, কখনও মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তির কোন হেতু নাই। জ্ঞানপ্রবাহের মধ্যেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের উদ্ভব এবং তাহাদের সংযোগ হয়। সত্য ও মিথ্যা উভয় জ্ঞানেই ইহা ঘটে।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে বাহ্যকারণরহিত জ্ঞান হইতে যদি জ্ঞাতা ও ভ্রান্ত জ্ঞান উদ্ভূত হইত, তাহা হইলে 'ইহা রজত' এই প্রত্যক্ষ হইত না, 'আমি রজত' ইহাই প্রত্যক্ষ হইত। 'বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই এবং আভ্যন্তরীণ জ্ঞান বাহ্যবস্তু-উদ্ভূত বলিয়া প্রতীত হয়'—এ মতেরও কোন ভিত্তি নাই।

মীমাংসা দর্শনের অখ্যাতিবাদ মতে শুক্তিতে যখন রজত জ্ঞান হয়, তখন শুক্তির বিশেষ ধর্ম্মসকল লক্ষিত হয় না এবং শুক্তির কোনও জ্ঞানই তখন হয় না। সুতরাং শুক্তিকে আমরা তখন রজত-রূপে দেখি, ইহা বলা যায় না। তখন যে যে ধর্ম্ম শুক্তি ও রজত উভয়েরই আছে, তাহারাই কেবল লক্ষিত হয়, এবং শুক্তি ও রজতের মধ্যে ভেদ-সূচক ধর্ম্মগুলি দ্রষ্টার প্রত্যক্ষ হয় না; ইহার ফলেই রজতের জ্ঞান হয়। মনের ত্রুটিবশতঃ শুক্তি ও রজতের সাধারণ ধর্ম্মগুলিদ্বারা উদ্বোধিত রজতের স্মৃতি যে স্মৃতিমাত্র—ইহা যে অতীতে কোনও সময়ে দৃষ্ট রজতের স্মৃতিমাত্র, সম্মুখে বর্ত্তমান রজত নহে, তাহা মনে হয় না, এবং অতীতে দৃষ্ট রজত এবং সম্মুখে বর্ত্তমান শুক্তির মধ্যে ভেদ-জ্ঞানের অভাবের ফলেই ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। এই ভ্রান্তিতে স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ প্রতীতি উভয়ই মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইহা রজতের সত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলেও রজতের স্মৃতি এবং সম্মুখে বর্ত্তমান শুক্তির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধ হয় না বলিয়া এই ভ্রান্ত জ্ঞানের আবির্ভাব-কালে ইহা সত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মতোই মনে হয়। সত্য জ্ঞানের ফলে দ্রষ্টার আচরণ যাহা হয়, ভ্রান্ত জ্ঞানের ফলেও তাহাই হয়, উভয় ক্ষেত্রেই দ্রষ্টা দৃষ্ট বস্তু ভূমি হইতে হস্তে তুলিয়া লয়। প্রভাকরের এই মতের সহিত কুমারিলের মতের

বিরোধ নাই। কুমারিল আরও বলেন যে দ্রষ্টার নিকট এই ভ্রান্ত জ্ঞান যে কোনও সত্য জ্ঞানের মতোই প্রামাণিক রূপে উদ্‌ভূত হয়। ভ্রান্তি পরে ধরা পড়ে সত্য, কিন্তু মীমাংসা-মতে যখন কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ত্রুটি ধরা পড়ে, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান অপ্রামাণিক বলিয়া বর্জিত হয়, কিন্তু সেই ভ্রান্ত জ্ঞানের উৎপত্তি-কালে তাহার প্রামাণিকতার বাধা তাহাতে হয় না। মীমাংসা-দর্শনের মতে উৎপত্তি-কালে সকল জ্ঞানই প্রামাণিক। এইজন্যই শুক্তিতে রজত-জ্ঞান উৎপত্তি-কালে প্রামাণিক। অখ্যাতিবাদ জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের সহিত সংগতিপূর্ণ। এই মত অনুসারে শুক্তিতে রজত-জ্ঞান কোন ভাববাচক ভ্রান্ত জ্ঞানের ফল নহে, ইহা অভাবসূচক এবং মনের ত্রুটিবশতঃ বোধের অভাবের ফল। শুক্তিতে যে রজত-জ্ঞান হয়, তাহার উপাদান দুইটি—সম্মুখে বর্ত্তমান শুক্তি এবং পূর্ব্বে দৃষ্ট রজতের স্মৃতি, এবং যদিও উপাদান দুইটির মিশ্রণের ফল হয় ভ্রান্তি, তথাপি উপাদান দুইটিই সত্য, উভয়েই মনের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে, এবং উভয়ের সংমিশ্রণের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে প্রামাণিক জ্ঞানের সকল লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে, কেননা জ্ঞানের প্রামাণিকতার লক্ষণ হইতেছে কর্ম্মে প্রেরণা-দানের শক্তি। সংশয়িত স্থলে—যেমন যখন কোনও দীর্ঘাকার দ্রব্য দৃষ্ট হয়, এবং ইহা মানুষ অথবা খুঁটি, এই সন্দেহ হয়, তখন যাহা মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা একটি দীর্ঘাকার দ্রব্য। ইহা প্রামাণিক। কিন্তু ইহার পরে যখন দুইটি বিভিন্ন স্মৃতি (মানুষ এবং খুঁটি) মনে উদিত হয়, তখনই সংশয়ের উদ্‌ভব হয়। সুতরাং সন্দিগ্ধ ক্ষেত্রেও যে জ্ঞানটুকু উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রামাণিক বলিতে হইবে।*

৯

পূর্ব্বমীমাংসায় তত্ত্ববিজ্ঞান

মীমাংসা-দর্শন বস্তুবাদী এবং বহুত্ববাদী। এই মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়, তাহাদের সত্য অস্তিত্ব আছে। তাহাদের অস্তিত্ব ক্ষণিক নহে। বৌদ্ধ শূন্যবাদ মীমাংসা-দর্শনে প্রত্যাখ্যাত, বেদান্তের মায়াবাদও অস্বীকৃত। বহুবস্তুসমন্বিত বাহ্য জগৎ সত্য, তাহার অস্তিত্ব মায়িক নহে, ইহাই মীমাংসা দর্শনের মত। প্রত্যক্ষ বিষয় ব্যতীত মীমাংসা-দর্শনে আত্মা, দেবতা, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকৃত, এবং বেদবিধি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানের

* History of Indian Philosophy, Das Gupta—pp. 384-389.

কর্তব্যতা উপদিষ্ট। জীবাত্মার সংখ্যা বহু, তাহারা নিত্য। জগতের উপাদান-সকলও নিত্য, জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা কর্ম্মের নিয়মকর্তৃক শাসিত।

জগতে আছে ত্রিবিধ বস্তু—(১) ভোগায়তন জীবদেহ, (২) দেহ-সংশ্লিষ্ট ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ, এবং (৩) ভোগ্য বিষয়। দেহদ্বারা জীবগণ কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে। ইন্দ্রিয়গণের-সাহায্যে এই ভোগ সাধিত হয়। ভোগ্য বিষয় সুখ ও দুঃখ উভয়েরই জনক।

মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, মীমাংসকদিগের কেহ কেহ পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু পরমাণু-উপাদানদ্বারা জগৎসৃষ্টির জন্য যে ঈশ্বরের প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। কর্ম্মের শক্তিদ্বারাই পরমাণুগণ নিয়ন্ত্রিত। জীবদিগের কর্মানুযায়ী ভোগের জন্য যেরূপ জগতের প্রয়োজন, কর্ম্মের শক্তিতেই সেরূপ জগৎ সৃষ্ট হয়।

মীমাংসা-দর্শন প্রত্যক্ষবাদী নহে অপ্রত্যক্ষ বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিকতা মীমাংসকগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা বৈদিক জ্ঞানকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনের সহিত মীমাংসা-দর্শনের বিশেষ পার্থক্য নাই। জাতি, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভাকর ও কুমারিলের মত প্রায় এক প্রকার, কোন কোন বিষয়ে কুমারিল ন্যায়দর্শন অপেক্ষা সাংখ্য-দর্শন কর্তৃক অধিকতর প্রভাবিত। হিন্দু দর্শনসকলের মধ্যে সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনই কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (physics) একটা চিত্র তাত্ত্বিক দর্শনের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনে অল্প পরিবর্ত্তিত আকারে ইহা গৃহীত হইয়াছে। কুমারিল ও প্রভাকর বৈশেষিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রায়শঃ গ্রহণ করিয়াছেন। মীমাংসা দর্শনে অনুশিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠানের সহিত ন্যায়-বৈশেষিকের মত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু জ্ঞান-সম্বন্ধে ন্যায়-দর্শনের সহিত মীমাংসা-দর্শনের মিল নাই। মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল বেদের স্বতঃ-প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করা। ঈশ্বর হইতে বেদের প্রামাণ্য উদ্‌ভূত নহে, এবং অন্য প্রমাণদ্বারাও বেদের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মীমাংসা প্রথমেই সকল জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে কিরূপে ধর্ম্ম অর্জন করা যায়, তাহা ঐ সকল প্রমাণদ্বারা জানা যায় না; কেননা ধর্ম্ম এমন কোন বিদ্যমান বস্তু নহে, যাহার জ্ঞান অন্য প্রমাণদ্বারা লাভ করা যায়। পরন্তু কেবল

বেদের আদেশ-পালনদ্বারাই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জ্ঞানের জন্য বেদের শব্দ-প্রমাণই আমাদের একমাত্র উপায়; অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছিল, কারণ তাহা ব্যতীত অনেক বৈদিক বাক্যের অর্থ বোধ করা দুঃসাধ্য। অন্য সকল দর্শনে সৃষ্টি-ও-প্রলয়-বাদ অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিপ্রলয় স্বীকার করিলে বেদের নিত্যত্ব থাকে না, এইজন্য মীমাংসা-দর্শনে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বই এইজন্য মীমাংসা-দর্শনে অস্বীকৃত।

পদার্থ-বিচার

মীমাংসা দর্শনে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত। বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে আত্মার সংস্পর্শ হইতে তাহার জ্ঞান হয়। বাহ্য বস্তু বিজ্ঞানমাত্র নহে, বিজ্ঞান-বাহ্য। জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য জ্ঞানের বিষয়ের সত্যতা-সূচক। জ্ঞান নিরালম্ব নহে। জগৎ প্রতিভাসমাত্র নহে। জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে বিষয়ের অস্তিত্ব আছে।

প্রভাকর দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, পরতন্ত্রতা, শক্তি, সাদৃশ্য এবং সংখ্যা, এই আট পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। পরতন্ত্রতা ও বৈশেষিক সমবায় অভিন্ন। সামান্য সৎ পদার্থ। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সামান্য পূর্ণ ভাবে অবস্থিত, এবং তাহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়। ব্যক্তির বাহিরে সামান্যের অস্তিত্ব নাই। প্রভাকর মহা সামান্য বা সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কেননা তাহার জ্ঞান আমাদের নাই। প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ-সত্তা বা বিশিষ্ট গুণ আছে, তাহা কেবল "সৎ"-মাত্র নহে। গুণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুর উপলব্ধি হয় না। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ। যখন কোনও ব্যক্তির উদ্ভব হয়, তখন জাতির সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়, এবং এক নূতন সমবায়-সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। যখন কোনও ব্যক্তির ধ্বংস হয়, তখন সমবায়-সম্বন্ধও বিনষ্ট হয়। নশ্বর বস্তুর মধ্যে অবস্থিত সমবায় অনিত্য। যত বস্তু আছে, তত সংখ্যক সমবায় আছে। যাহার মধ্যে সমবায় অবস্থিত তাহার প্রকৃতি অনুসারে ইহা প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ, উৎপন্ন অথবা অনুৎপন্ন। দ্রব্য, গুণ; কর্ম্ম ও সামান্য হইতে যে সামর্থ্যদ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহার সাধারণ নাম "শক্তি"। শক্তি অদৃশ্য, কিন্তু অনুমানগম্য। নিত্য বস্তুর শক্তি নিত্য, অনিত্য বস্তুর শক্তি অনিত্য। সাদৃশ্য ও জাতির স্বরূপ অভিন্ন নহে, কেননা সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের অপেক্ষা করে। ইহা জাতির মধ্যে অবস্থিত। "গোজাতি অশ্বজাতির সদৃশ" যখন বলি, তখন জাতির মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তাহাই বলি। প্রত্যক্ষ দ্বারা সাদৃশ্যের জ্ঞান

হয় না। অনুমান, সাক্ষ্য এবং উপমানদ্বারা সাদৃশ্যের জ্ঞান হয়। শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যা স্বতন্ত্র পদার্থ, অন্য কোনও পদার্থের রূপ নহে। মীমাংসাদর্শনে বিশেষকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, কেননা ইহাদ্বারা এক একটি বিশেষ গুণমাত্র ব্যক্ত হয়। অভাবের অবস্থিতি দেশের মধ্যে। তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

কুমারিল পদার্থদিগকে ভাব ও অভাব এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। অভাব চতুর্বিধ: প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব। ভাবপদার্থ চতুর্বিধ: দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সামান্য। শক্তি ও সাদৃশ্য দ্রব্যের অন্তর্গত। শক্তি দ্রব্যের ধর্ম্ম, তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। বস্তুর সহিত তাহার উৎপত্তি হয়। সংখ্যা একটি গুণ। সহজ ও আধেয় (স্বাভাবিক ও উৎপন্ন) ভেদে শক্তি দ্বিবিধ। সাদৃশ্য একটি গুণ—বহু বস্তুর একধর্ম্মত্ব। ইহা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কেননা সাদৃশ্যের বিভিন্ন পরিমাণের অনুভব হয়। যে বস্তুর মধ্যে সমবায় অবস্থিত, সমবায় তাহা হইতে ভিন্ন নহে। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেই সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু অবিচ্ছেদ্য বস্তুদিগের মধ্যে সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়, যেমন জাতি ও ব্যক্তির মধ্যের সম্বন্ধ। ইহার ধারণা অসম্ভব। কুমারিলের মতে জাতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়।

প্রভাকরের মতে অন্ধকার আলোকের অভাবমাত্র। কিন্তু কুমারিল অন্ধকারকে ও শব্দকেও দ্রব্য বলেন। প্রভাকর বলেন অন্ধকার যদি দ্রব্য অথবা গুণ হইত তাহা হইলে দিবা ভাগেও প্রত্যক্ষ হইত। কুমারিল বলেন নীলবর্ণ অন্ধকারের গুণ, এবং অন্ধকার গতিশীল।

যাহার মধ্যে গুণের অবস্থিতি, তাহাই দ্রব্য। কুমারিলের মতে দ্রব্য এগারোটি—ক্ষিতি,অপ,তেজ, মরুৎ, ব্যোম, আত্মা, মন, কাল ও দিক, অন্ধকার ও শব্দ। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রত্যক্ষের বিষয়। দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ও প্রত্যক্ষযোগ্য। অন্য দ্রব্যগুলি অনুমানগম্য, প্রত্যক্ষ হয় না। শব্দ গুণের আধার-রূপে আকাশের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আকাশে অগ্নিকণার অস্তিত্ববশতঃ তাহা সাদা বলিয়া প্রতীত হয়।

আত্মা

যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ও তাহার ফলভোগের জন্য দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রয়োজন। আত্মা না থাকিলে যজ্ঞই বা কে করিবে, স্বর্গেই বা যাইবে কে? সুতরাং মীমাংসা-দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি

হইতে আত্মা ভিন্ন। আত্মা নিত্য, বিভু এবং বহু। প্রত্যেক দেহে একটি করিয়া আত্মা। শবরস্বামী জ্ঞাত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মা স্বসংবেদ্য (আপনা কর্তৃক জ্ঞেয়) কিন্তু অন্যকর্তৃক অদ্রষ্টব্য ও অদর্শয়িতব্য। শবর-মতে আত্মা ও সংবিদ (consciousness) অভিন্ন। তিনি বলিয়াছেন, 'জ্ঞানাতিরিক্তঃ স্থায়ী জ্ঞাতা বর্ত্ততে'—জ্ঞানের অতিরিক্ত স্থায়ী জ্ঞাতা আছেন। সেই জ্ঞাতা আপনাকে জানেন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

নিদ্রাকালে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু আত্মা থাকে। বুদ্ধি যদি আত্মার নিত্য সহচর হইত, তাহা হইলেও তাহারা যে অভিন্ন, তাহা বলা যাইত না। ইন্দ্রিয়গণ নষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, দেখা যায়। ইন্দ্রিয়ে অনুভূত বিষয়-সকলের একত্ব-বিধান আত্মাকর্তৃক সাধিত হয়। সকল জ্ঞানেই আমরা জ্ঞাতাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করি। দেহের উপাদানসকল অচেতন; তাহাদের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। দেহ তাহার অতিরিক্ত আত্মার উদ্দেশ্যসাধক, এবং আত্মাকর্তৃক চালিত। স্মৃতিদ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আত্মার পরিণাম হয়. কিন্তু সকল পরিণামের মধ্যে আত্মা বর্তমান থাকে। জ্ঞান আত্মার গুণ। আত্মা দ্রব্য। কর্ম্মের ফলভোগের সময় সেই ফল-কারক কর্ম্মের স্মৃতি আমাদের থাকে না। ইহাদ্বারা আত্মার নিত্যত্ব খণ্ডিত হয় না। কর্ম্মের ফলভোগের জন্য স্থায়ী কর্ম্মকর্তার প্রয়োজন। তাহা স্বীকার না করিলে কর্ম্মবাদের কোন অর্থই হয় না। বৌদ্ধগণ কর্ম্মফলের এবং পুনর্জন্মের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। সূক্ষ্ম শরীরদ্বারা ইহার ব্যাখ্যা হয় না। যে বিজ্ঞানপ্রবাহের কথা বৌদ্ধগণ বলেন, তাহা দ্বারা আত্মা, সংবিদ্, কামনা, স্মৃতি, সুখ ও দুঃখের ব্যাখ্যা করা যায় না। শরীরের বিভিন্ন অংশে যে পরিণাম ঘটে, আত্মা তাহা অবগত হন। সুতরাং আত্মা অণুপরিমাণ নহেন। আত্মা বিভু এবং একটির পরে অন্য একটি দেহধারণে সক্ষম। আত্মার শক্তিদ্বারাই দেহ চালিত হয়। আত্মা বহু। তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা হইত না। শরীরের ক্রিয়াদ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। অন্য আত্মার অস্তিত্বও অন্য দেহের ক্রিয়া হইতে অনুমিত হয়। এক সূর্য্য হইতে জলে বহু প্রতিবিম্ব-সূর্য্যের উদ্ভব হয়—এই দৃষ্টান্তদ্বারা আত্মা যে এক ও অদ্বিতীয় তাহা প্রমাণিত হয় না; কেননা জলে বিভিন্ন প্রতিবিম্বের ভিন্ন ভিন্ন গুণ তাহাদের আধার ভিন্ন ভিন্ন জলাশয় হইতে উদ্ভূত হয়। এই উপমা আত্মার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে

বিভিন্ন দেহে আত্মা-প্রতিবিম্বের ভিন্ন ভিন্ন গুণ দেহ হইতে উদ্‌ভূত হয়, বলিতে হয়। কিন্তু সুখ-দুঃখ অচেতন দেহের গুণ হইতে পারে না। সুখ-দুঃখ আত্মার গুণ, সুতরাং আত্মাকে এক ও অদ্বিতীয় বলা যায় না।

প্রভাকরের মতে আত্মা স্বরূপতঃ জ্ঞানহীন কিন্তু কর্ত্তা, ভোক্তা ও বিভু। আত্মাকে জ্ঞান-স্বরূপ বলা যায় না। "আমি জানি" এই জ্ঞানের আশ্রয়রূপে আত্মা প্রতীত হয়, জ্ঞান-রূপে প্রতীত হয় না। আত্মা জ্ঞান, ক্রিয়া, সুখ ও দুঃখাদি গুণের আশ্রয়। আত্মার স্থায়িত্বের অব্যবহিত জ্ঞান হয় না। প্রত্যভিজ্ঞা হইতে তাহার স্থায়িত্ব অনুমিত হয়। আত্মা স্থায়ী না হইলে পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছি, এখন তাহাকে দেখিতেছি, এই জ্ঞান হইতে পারিত না।

আত্মা বিভু, তাহার পরিণাম নাই। আত্মা স্বপ্রকাশ নহে। আত্মা স্বপ্রকাশ হইলে সুষুপ্তিতেও জ্ঞান হইত। "আমি ঘটটি জানি" এই জ্ঞান স্বপ্রকাশ। এই জ্ঞানে ঘট বিষয়-রূপে এবং আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানের আধাররূপে আত্মা অব্যবহিত ভাবে জ্ঞাত হয়। সকল জ্ঞানেই আত্মা প্রকাশিত হয়। যে জ্ঞানে দেহের জ্ঞান নাই তাহাতেও আত্মা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রকাশে আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হয় না, জ্ঞানের কর্ত্তারূপে প্রকাশিত হয়, তাহার কর্ম্ম (বিষয়) রূপে নহে। জ্ঞান-ক্রিয়ার ফল (স্বফল) আত্মায় উৎপন্ন হয় না, এবং আত্মা কখনও বাহ্য অথবা আন্তর (মানস) জ্ঞানের বিষয় হয় না। বিষয়-জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রভাবে আত্মার জ্ঞান হয় না। আত্মা সকল জ্ঞানের কর্ত্তা, কিন্তু কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই হইতে পারে না। আত্মা জ্ঞানহীন হইলেও কর্ত্তা, ভোক্তা ও বিভু। ইহা দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, সর্ব্বজ্ঞানে প্রকাশিত ও নিত্য। ইহা অণুপ্রমাণ নহে। প্রত্যেক আত্মা তাহার অতীত কর্ম্মকর্তৃক গঠিত দেহের মধ্যে যাহা সংঘটিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্য দেহে যাহা ঘটে, তাহা জানিতে পারে না। প্রত্যেক দেহে এক একটি আত্মা বর্ত্তমান। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা সৎ-মাত্র রূপে, এবং সকল বস্তুর সম্মিলিত জ্ঞানের আশ্রয় রূপে বর্ত্তমান থাকে। তখন তাহার সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকে না; কেননা দেহের মধ্যে ভিন্ন সুখ-দুঃখের প্রকাশ হয় না। আত্মা কোনও কারণ হইতে উদ্‌ভূত নহে বলিয়া অমর।

কুমারিলের মতেও আত্মা নিত্য বিভু ও সংখ্যায় বহু, কিন্তু আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ। সকল আত্মাই জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া উপনিষদে আত্মা এক ও

অদ্বিতীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ এবং জ্ঞানের আশ্রয়। জ্ঞান আত্মার পরিণাম। অহংপ্রত্যয় হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আত্মা মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। ঘট-প্রত্যক্ষের মতো আত্মার অব্যবহিত প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু অন্যের প্রত্যক্ষ হয় না। আত্মা জ্ঞানের কর্ত্তা ও বিষয় উভয়ই। আত্মার মধ্যে দুইটি অংশ আছে—একটি দ্রব্য, (অচিৎ অংশ) অন্যটি বোধ। দ্রব্য অংশ জ্ঞানের বিষয়। বোধ অংশ জ্ঞানের কর্ত্তা। প্রভাকরপন্থীদিগের মত ইহার বিরোধী। তাহাদের মতে আত্মার দ্রব্যাংশ যদি অচেতন হয়, তাহা হইলে তাহা আত্মাই নহে। দ্রব্যাংশ বাদ দিলে থাকে বোধ অংশ। ইহা জ্ঞানের কর্ত্তা ও বিষয় উভয়ই হইতে পারে না। আত্মার দ্রব্যত্ব যদি বোধের বিষয় হয়, তাহা হইলে আত্মা জ্ঞাতা হইতে পারে না, কেননা দ্রব্য রূপে ইহা ঘটেরই সদৃশ।

জ্ঞান যদি আত্মারই হয়, তাহা হইলে আত্মাকে অচেতন বলা যায় না। আত্মার অচিৎ অংশ সম্ভবতঃ অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণদ্বারা আত্মার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। আত্ম-সংবিদে আত্মা বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই বলিয়া আত্মার মধ্যে বোধ ও অবোধ উভয়ই আছে, ইহা বলা যায় না। আত্মা জ্ঞানের কর্ত্তা ও বিষয় উভয়ই বলিলে কোনও স্ববিরোধ হয় না। প্রভাকর যখন বলেন জ্ঞান-ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হয়, তখন তাহার অর্থ আত্মাও বোধের বিষয়। প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মৃতিতে বিষয়ই জ্ঞানে আবির্ভূত হয়, বিষয়ী হয় না। জ্ঞানের বিষয়রূপে জ্ঞাত আত্মাই প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মৃতিতে বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। প্রত্যভিজ্ঞায় পূর্ব্বের প্রত্যক্ষকর্ত্তা ও বর্ত্তমান প্রত্যক্ষকর্ত্তা অভিন্ন। এই জ্ঞানে আত্মা যদি জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান-ক্রিয়ার কোনও বিষয় থাকে না, কিন্তু বিষয়হীন জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। বিষয়ের জ্ঞানে জ্ঞাতারূপে আত্মারও জ্ঞান হয়।

কুমারিল পন্থীদিগের মতে প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়াতেই যে আত্মা প্রকাশিত হয়, তাহা নহে। যখন "ইহা ঘট" বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন "এই ঘট আমি জানি" এই জ্ঞান সকল সময় হয় না। বিষয়বৃত্তি কালে (বিষয় জ্ঞানে) আত্মা সেই জ্ঞানের বিষয় অথবা কর্ত্তা রূপে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু কখনও কখনও বিষয়-জ্ঞানের সহিত "অহংপ্রত্যয়ের"ও উদ্ভব হয়। এই জ্ঞানের বিষয় আত্মা। বিষয়-জ্ঞানের কর্ত্তা সকল সময়েই বিষয়-জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত থাকে, কিন্তু তাহা সকল সময় প্রকাশিত হয় না। আত্ম-সংবিদেই কেবল

তাহা প্রকাশিত হয়, কিন্তু আত্মসংবিদ বিষয়-সংবিদ নহে। বিষয়-সংবিদ অপেক্ষা উচ্চতর সংবিদ আত্ম-সংবিদ।

প্রভাকর আত্মা ও সংবিদ এক বলিয়া গণ্য করেন না বলিয়াই আত্মা স্ব-প্রকাশ নহে বলিয়াছেন। কিন্তু আত্মাই জ্ঞাতা (প্রমাতা), এবং প্রভাকর সংবিদকেই জ্ঞাতা বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতেও আত্মা ও সংবিদ অভিন্ন। সালিকানাথ আত্মাকে স্ব-প্রকাশ বলিয়াছেন, এবং বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানে বিষয় আত্মারই প্রতীতি হয় বলিয়াছেন। তিনি আত্মাকে বোধের অচিৎ আশ্রয় বলেন না। তাহার মতে জ্ঞান আত্মার পরিণাম। সুতরাং আত্মার স্বরূপই বোধ, তাহা না হইলে জ্ঞান আত্মার পরিণাম হইতে পারে না।

১০

অপূর্ব্ব

কর্ম্ম ও তাহার ফলের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কিন্তু এই ফল কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা দেখা যায় না। প্রাকৃতিক জগতে কারণের অব্যবহিত পরে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, কিন্তু কার্য্যের উৎপাদক কোনও শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না। পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফল কর্ম্মের অব্যবহিত পরেই উৎপন্ন হয় না। না হইলেও ফলের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। বহুকাল পরে এই ফল উৎপন্ন হইতে পারে, আবার শীঘ্রও হইতে পারে, ইহ জন্মে হইতে পারে, পরজন্মেও হইতে পারে। "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ করিলে মৃত্যুর পরে স্বর্গভোগ হয়। আবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে ইহ লোকে পুত্রলাভ হয়। কিন্তু কিরূপে কৃত কর্ম্ম হইতে বহুকাল পরে তাহার ফল উৎপন্ন হয়, তাহা বোঝা যায় না। যাহা আজি শেষ হইয়া গেল, বহুকাল পরে তাহা কিরূপ সক্রিয় হইয়া ফল উৎপাদন করিতে পারে, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। কর্ম্ম শেষ হইয়া গেলেও জৈমিনির মতে তাহা এক শক্তির উৎপাদন করিয়া যায়। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অদৃশ্য শক্তির উৎপত্তি হয়। জৈমিনি তাহার নাম দিয়াছেন "অপূর্ব্ব"। অপূর্ব্বই কর্ম্মের পরবর্ত্তী অবস্থা। এই অবস্থায় বহুকাল থাকিয়া কর্ম্ম তাহার ফল উৎপাদন করিতে পারে। ইহা হইতেই ফল উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম ও তাহার ফলের সংযোগ সূত্র অপূর্ব্ব। ফলতঃ কর্ম্মের বিনাশ হয় না। ফলোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা অপূর্ব্ব নামক অদৃশ্য শক্তি রূপে বর্ত্তমান থাকে। ইহা স্বীকার না করিলে ফলোৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন ফল ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ এক অভিন্ন কারণ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। বেদপ্রমাণে অপূর্ব্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

কুমারিল ভট্টের মতে কর্ম্মের পরেই অপূর্ব্বের উৎপত্তি হয়। অপূর্ব্বের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে বেদে। অর্থাপত্তিদ্বারা অপূর্ব্বের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অপূর্ব্ব স্বীকার না করিলে বেদের অনেক বচনের ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদ্বারা এক শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই শক্তি যজ্ঞকর্ত্তার মধ্যে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থান করে। মৃত্যুর পরে সেই শক্তিদ্বারা যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রভাকরের মত ভিন্ন। তাঁহার মতে অপূর্ব্ব আত্মার মধ্যে থাকিতে পারে না, কেননা আত্মা বিভু ও নিষ্ক্রিয়। কর্ম্মকর্তৃক কর্ত্তার মধ্যে কোনও শক্তির উদ্ভব প্রভাকর স্বীকার করেন না। "অপূর্ব্ব"নামা শক্তি যে যজ্ঞদ্বারা উৎপন্ন হয়, প্রত্যক্ষ অনুমান ও বেদদ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় না। সূত্রে ফলোৎপত্তির অব্যবহিত কারণকে "কার্য্য" বলা হইয়াছে। এই "কার্য্য" কর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কেননা কর্ম্ম ফলের অব্যবহিত কারণ নহে। এই "কার্য্যের" ব্যাখ্যায় প্রভাকর যাহা বলিয়াছেন, তাহা সহজবোধ্য নহে।

ন্যায়দর্শনে অপূর্ব্ব"-বাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেক সময় কারণ বস্তুর বর্ত্তমানতা সত্ত্বেও কার্য্যের উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। বীজ দগ্ধ হইলে তাহা হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। এখানে বীজের মধ্যে যে অদৃশ্য কারণ-শক্তি থাকে তাহা নষ্ট হওয়ার ফলেই অঙ্কুর হয় না। এই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অঙ্কুরের অনুৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। এই যুক্তির উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, বাধা না থাকিলেই কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, বাধা থাকিলে হয় না। সুতরাং কোনও শক্তির অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, "যখন কার্য্যের উৎপত্তির জন্য কারণের অতিরিক্ত আরও কিছু (বাধার অভাব) তোমাদের মতেও স্বীকার করিতে হয়, তখন "শক্তি" স্বীকার করিতে বাধা কি?"

শঙ্করের মতে "অপূর্ব্ব" অনাত্ম বস্তু, আত্মিক বস্তুকর্তৃক পরিচালিত না হইলে ইহা যথোচিত ফল উৎপাদন করিতে পারে না। যদি বল অপূর্ব্ব-নীতি অনুসারে ঈশ্বরই ফল প্রদান করেন, তাহা হইলে বেদান্তের কর্ম্মবাদই তোমরা গ্রহণ করিলে।

১১

মীমাংসা দর্শনে চরিত্রনীতি

বৈদিক সাহিত্যে কর্ম্ম শব্দ বৈদিক যাগ যজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির সামাজিক আচরণ বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় "চরণ" শব্দ। যাহার আচরণ উত্তম, তিনি "রমণীয়-চরণ", যাহার আচরণ অধম তিনি "কপূয়-চরণ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "রমণীয়-চরণাঃ রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে ব্রাহ্মণ-যোনিং, ক্ষত্রিয়-যোনিং, বৈশ্য-যোনিং বা। কপূয়-চরণাঃ কপূয়াং যোনিং আপদ্যন্তে শ্ব-যোনিং বা শূকর-যোনিং বা চণ্ডাল-যোনিং বা।" যাহাদের আচরণ উৎকৃষ্ট, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যোনি প্রাপ্ত হয়। যাহাদের আচরণ নিকৃষ্ট তাহারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডাল যোনি লাভ করে।

কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ, তাহা নির্দ্ধারণ করা এবং সৎ কর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্মের মুলতত্ত্বের, অর্থাৎ কেন কোনো কর্ম্ম সৎ এবং কোনো কর্ম্ম অসৎ, তাহার অনুসন্ধান চরিত্র-নীতির উদ্দেশ্য। বেদ বলিয়াছেন সৎ কর্ম্মের ফল সদ্‌গতি, অসৎ কর্ম্মের ফল অসদ্‌গতি। ইহাই সৎ ও অসৎ কর্ম্মের মূলতত্ত্ব। মীমাংসা দর্শনেরও এই মত।

"ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ সৎ কর্ম্মের প্রেরণা দেয় যে সকল বেদ-বাক্য ("চোদনা লক্ষণ" বাক্য)। সেই ধর্ম্মের ব্যাখ্যাই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। আমাদের বহিঃস্থ শাস্ত্রকর্ত্তৃক আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদিষ্ট হয় বলিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানের উৎস আমাদের বাহিরে। কিন্তু আমাদের অন্তরেও ইহার এক উৎস আছে। বাহ্য শাস্ত্রকর্ত্তৃক যাহা উপদিষ্ট হয়, অন্তরে তাহা অনুমোদিত। তাই এতাদৃশ কর্ত্তব্য-পালনের ফল সুখ।

পূর্ব্বমীমাংসা মতে সুখই মানুষের কাম্য। কিন্তু এই সুখ এই জীবনের সুখ নহে। পরকালের সুখের জন্য ইহকালের সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়। ধর্ম্ম সুখের সোপান। বেদ-বিধি অমান্য করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বেদেই সৎ কর্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতিতেও সৎ কর্ম্ম বর্ণিত আছে। কিন্তু বেদের সহিত স্মৃতির বিরোধ-স্থলে স্মৃতি বর্জনীয়। সৎ অসৎ বিচারে সদাচার অর্থাৎ সাধুদিগের আচরণও প্রমাণ বলিয়া গণ্য। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে কৃত কর্ম্ম ধর্ম্ম নহে।

যাহারা মুক্তিকামী, তাহাদের করণীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্যবস্থিত হইয়াছে। সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম। বিশেষ উপলক্ষে করণীয় কর্ম্ম নৈমিত্তিক। এ সকল কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। করিলে পুণ্য নাই। না করিলে

প্রত্যবায়। কাম্য ফল-প্রাপ্তির জন্য কাম্য কর্ম্মের ব্যবস্থা। যেমন স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান। কাম্য কিছু না থাকিলে এই সকল কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। বেদে যে সকল কর্ম্ম নিষিদ্ধ, তাহা করিলে নরকভোগ হয়। কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে কামনা হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফলে মুক্তি হয়।

শূদ্রের বেদ-পাঠে অধিকার নাই। এই জন্য জৈমিনি যাগ-যজ্ঞেও তাহাদের অধিকার নাই বলিয়াছেন। কিন্তু বাদরির মতে সকলেরই যজ্ঞে অধিকার আছে।

কর্ম্ম উদ্‌ভূত হয় প্রবৃত্তি হইতে। প্রভাকর কর্ম্মের ছয়টি ক্রমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন: প্রথমে কার্য্যতা-জ্ঞান বা কর্ত্তব্যতাবোধ। কোনও কার্য্য করণীয়, এই জ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ "চিকীর্ষা" অর্থাৎ সেই কার্য্য করিবার ইচ্ছা। তৃতীয়তঃ "কৃতি-সাধ্যতা জ্ঞান" অর্থাৎ অভীপ্সিত কর্ম্ম অসাধ্য নহে, সাধ্য, এই জ্ঞান। চতুর্থতঃ "প্রবৃত্তি" অর্থাৎ সেই কর্ম্ম-সাধনের দিকে মনের গতি। পঞ্চমতঃ চেষ্টা। ষষ্ঠতঃ ক্রিয়া। কাম্য কর্ম্মে কাম্য ফল ভাবী সুখের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। অন্য কর্ম্মে কর্ত্তব্যতা-বোধই প্রবল। বৈদিক যজ্ঞে বেদ-বিধির "শাব্দিক ভাবনা" বা শব্দ-শক্তিদ্বারা ফল-লাভের উদ্দেশ্যে কর্ত্তার কর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

ইচ্ছার স্বাধীনতা মীমাংসা দর্শনে স্বীকৃত। কর্ম্মবাদের সহিত স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধ নাই। কুমারিলের মতে বেদ-বিধি স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া সকলেরই অনুসরণীয়। সমাজ-চেতনা বেদ-বিধির অনুকূল। কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সমাজ-মঙ্গল অথবা অন্যের সুখের দিকে না চাহিয়া বেদ-বিধির অনুসরণ করাই উচিত। মহাজনেরা ধর্ম্মের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুমারিল বুদ্ধের অহিংসাবাদের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বেদ-নিন্দার নিন্দা করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে সত্য মিথ্যার সহিত মিশ্রিত। সেই জন্য তিনি "শ্ব-চর্ম্ম নিক্ষিপ্ত ক্ষীরের" সহিত (কুকুরের চর্ম্মনির্ম্মিত আধারের দুগ্ধের সহিত) বৌদ্ধ ধর্ম্মের তুলনা করিয়াছেন।

মীমাংসকগণ মুখ্যতঃ যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বেদে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও তপস্যার কথাও আছে। নির্দিষ্ট নিয়মে যজ্ঞ-সম্পাদনের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অধিক নহে। "ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে ক্রিয়মাণ কর্ম্মই নিঃশ্রেয়সের হেতু", একজন মীমাংসক (লোগাক্ষী ভাস্কর) ইহা বলিয়াছেন।* ইহকালে ও পরকালে সুখলাভের ইচ্ছাদ্বারা স্বার্থপরতা সংকুচিত হয় না। যজ্ঞদ্বারাও অন্তরের মলিনতা বিদূরিত না হইতে পারে।

---

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণের গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১২

নিঃশ্রেয়স

জৈমিনি সূত্রে মোক্ষের কথা নাই। শবর স্বামীও মোক্ষের কথা বলেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ সংসার হইতে বিমুক্তির কথা বলিয়াছেন। বারংবার জন্ম গ্রহণ এবং মৃত্যুই সংসার এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীনতাই বন্ধ। প্রভাকরের মতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই জন্মের কারণ এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আত্যন্তিক বিলোপই মুক্তি। বৈদিক যজ্ঞের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি এবং তজ্জনিত সুখ হয়। কিন্তু স্বর্গ-ভোগ চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গভোগের পরে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সংসারের সুখ দুঃখ-মিশ্রিত। তাই এই সুখ-দুঃখ হইতে মুক্তির এবং নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়। সুখকামনাকৃত কর্ম্মই জন্ম-মৃত্যুর হেতু। যখন বোধগম্য হয় যে সকল পার্থিব সুখই দুঃখ-মিশ্রিত, তখন পার্থিব জীবনের উপর বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও সুখের অভিলাষে কৃত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা হয়। ফলাভিসন্ধি বর্জন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্পাদনের ফলে সঞ্চিত কর্ম্মের ধ্বংস হয় এবং মৃত্যুর পরে কর্ম্মবন্ধন-মুক্ত ব্যক্তির আর জন্ম হয় না। তাহার মোক্ষ হয়। ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত দেহদ্বারাই আত্মা সংসারে আবদ্ধ থাকে। পুনর্জন্ম বন্ধ হইলে সংসারের সহিত এই বন্ধন ছিন্ন হয়।

কিন্তু মোক্ষে আত্মার অবস্থা কিরূপ হয়? মীমাংসাদর্শন-মতে সংবিদ (বোধ) ও অন্যান্য মানসিক অবস্থা আত্মার স্বরূপ-গত নহে। দেহ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ের সহিত আত্মার সংযোগ হইতেই সংবিদ ও মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়। মুক্ত আত্মা দেহ-বিযুক্ত হওয়ায় ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত তাহার সংযোগও ছিন্ন হয়। সুতরাং তখন তাহার সংবিদ থাকে না। সুতরাং মোক্ষে আত্মার আনন্দ ভোগ নাই। আনন্দ নহে, দুঃখ-নিবৃত্তিই মোক্ষ। মোক্ষে আত্মা তাহার স্বরূপে, সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থায়, অবস্থান করে। তখন "আত্মা কেবল সৎ-স্বরূপ" কিন্তু সংবিদ-হীন।

১৩

মীমাংসাদর্শনের নিরীশ্বরবাদ

পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনে বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত, এই সকল দেবতার তুষ্টির জন্য যজ্ঞের ব্যবস্থা। কিন্তু বেদে আছে "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। এক সৎকেই বিপ্রগণ বহু নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মীমাংসা-দর্শনে এই

"এক সতের" কথা নাই। যজ্ঞে ঈশ্বরের স্থান নাই, তাই মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। বেদ ধর্ম্মের নির্দেশ করিয়াছেন। এই বেদ যে ঈশ্বরকৃত, মীমাংসাদর্শন তাহা স্বীকার করেন নাই। যজ্ঞফল-দানের জন্যও মীমাংসা ঈশ্বরের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। "অপূর্ব্ব"দ্বারাই যজ্ঞফল উৎপন্ন হয়, বলিয়াছেন। জৈমিনি ঈশ্বরের কথা বলেন নাই। কিন্তু তিনি ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছেন কি?

অধ্যাপক মাক্সমূলার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে জৈমিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। বেদান্ত-সূত্রে বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মই কর্ম্মফলদাতা। কিন্তু জৈমিনির মতে কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হয় "অপূর্ব্ব"-কর্ত্তৃক। জৈমিনি আরও বলিয়াছেন যে মানুষের পাপ ও পুণ্যের ফল ঈশ্বর নিজেই দান করেন বলিলে তাঁহাকে পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতার দোষে দোষী করা হয়। তাহা অপেক্ষা কর্ম্মের নিজের শক্তিতেই তাহার ফল উৎপন্ন হয়, এবং জগতের নৈতিক শাসনের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই, ইহা বলাই ভাল। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে জৈমিনি পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতার অপবাদ হইতে ঈশ্বরকে মুক্ত করিবার জন্যই কর্ম্মফলের সহিত তাঁহার সংশ্রব স্বীকার করেন নাই, ঈশ্বরকে অস্বীকার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু জৈমিনি-সম্বন্ধে ইহা সত্য হইলেও, পরবর্ত্তী মীমাংসকদিগের সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না। তাঁহারা বলিয়াছেন কোনও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষ অনুমান ও বেদ কিছু দ্বারাই ঈশ্বর প্রমাণিত হন না। বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্মপ্রবাহ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মীমাংসাদর্শনে সৃষ্টি ও প্রলয় অস্বীকৃত। বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব অবিচ্ছেদে চিরকালই আছে। ঈশ্বর কোনও এক সময়ে প্রলয়ে আত্মাদিগকে সুপ্ত করিয়া পরে আবার তাহাদিগকে জাগরিত করিতেছেন, ইহা মনে করিবার কোনও হেতু নাই। প্রভাকরের মতে জগতের বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি ও বিলয় থাকিলেও সমগ্র জগৎ আদি ও অন্তহীন। পিতামাতা হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, কোনও ঈশ্বরকে তাহাদিগের সৃষ্টি করিতে দেখা যায় না। পরমাণুগণ যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চালিত হয়, তাহা মনে করিবার কারণও নাই। কেননা আমাদের আত্মাই যে আমাদের দেহ চালিত করে তাহা আমরা অনুভব করি। পরমাণুগণ তো ঈশ্বরের দেহ নয়। ঈশ্বরের দেহ আছে, যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের কর্ম্ম তাহার চেষ্টার ফল, এবং এই চেষ্টা যদি নিত্য

হইত, তাহা হইলে পরমাণুগণও সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল হইত। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বুদ্ধিমান জীবেরই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। ঈশ্বর যত বড় হউন, তাঁহার পক্ষে অন্যের ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান-লাভ অসম্ভব। তাঁহার ইন্দ্রিয়ের ও মনের বাহিরে যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, তাঁহার নিজের ইন্দ্রিয় ও মনদ্বারা তাহা জানিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

ন্যায়দর্শন মতে বেদ ঈশ্বর-রচিত। কুমারিল বলেন ঈশ্বর-কৃত বেদ যদি বলে যে জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাহা হইলে তাহার মূল্য কি? ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির সাক্ষী কে আছে? ঈশ্বরের যদি কোন জড় দেহ না থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই তাঁহার হইতে পারে না। যদি তাঁহার জড় দেহ থাকে, তাহা হইলে তাহা সৃষ্টি করিল কে? তাহার সৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রয়োজন। তাহার দেহ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহার উপাদান কি? ক্ষিতি ও অন্যান্য উপাদানগুলি তো চিরকাল হইতে নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে যদি জড়ের অস্তিত্ব থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য বস্তুও যে ছিল তাহা অস্বীকার করিবার কারণ কি? দুঃখ-পূর্ণ জগৎ-সৃষ্টিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি ছিল? কর্ম্মের পূর্ব্বে তো সৃষ্টি হয় নাই। অতীতের কর্ম্ম সৃষ্টির পরবর্তী। সুতরাং তাহাদ্বারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা যায় না। সৃষ্টির পূর্ব্বে অনুকম্পারও কারণ নাই। সুতরাং জীবের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। অনুকম্পাই যদি কারণ হইত, তাহা হইলে দুঃখী জীবের সৃষ্টি হইত না। ঈশ্বর তো সর্ব্বশক্তিমান। দুঃখের সৃষ্টি না করিয়া জীব-সৃষ্টিতে তাঁহার কোনও বাধা ছিল না। যদি তাঁহার শক্তিকে বাধা দিবার কিছু থাকে, তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন। সৃষ্টি যদি ঈশ্বরের লীলা হয়, তাহা হইলে তাঁহারও ক্লান্তি আছে স্বীকার করিতে হয়। ক্লান্তি-নাশের জন্যই তো লীলা। তাঁহার জগৎ-ধ্বংসের চেষ্টাই বা কেন? আর তাহার কথাই বা বিশ্বাস করিব কেন? জগৎ সৃষ্টি না করিয়াও দম্ভ-ভরে তিনি আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া জাহির করিয়া থাকিতে পারেন। পরমাণুগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা চালিত হয়, যদি বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছার উদ্ভব হয় কিরূপে বলিতে হইবে। তাহার কারণ যদি "অদৃষ্ট" হয়, তাহা হইলে অদৃষ্টই তাহাদের গতির কারণ বলিতে বাধা কি?

প্রভাকর ও কুমারিল দেবতাদিগের যে দেহ আছে, তাহা স্বীকার করেন না। বেদে যেখানে দেবতাদের দেহের কথা আছে, তাহা অর্থবাদমাত্র, প্রশংসামাত্র। আমাদের কর্ম্মের ফলের জন্য দেবতাদের অপেক্ষা নাই।

কর্ম্ম-ফল-দানের জন্য তাহাদের দেহ আছে, সুতরাং তাহাও বলা যায় না। প্রাচীন মীমাংসকগণ দেবতাদিগের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ মন্ত্রের শক্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যই উৎসুক ছিলেন। তাঁহাদের মতে যজ্ঞ-কর্ত্তার দেবতাদিগের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নাই। মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণেই তাহাদের মন আবদ্ধ রাখিতে হইবে। মন্ত্র বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিয়া দেবতার নামে যজ্ঞীয় দ্রব্য উৎসর্গ করিলেই ফল উৎপন্ন হইবে। দেবতাদিগের প্রতি ভক্তির কথা নাই। যাহার নাম মন্ত্রের মধ্যে সম্প্রদান কারকে উল্লিখিত, তিনি দেবতা। "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে ইন্দ্রই দেবতা। ইন্দ্রের প্রতি ভক্তির কথা নাই। মন্ত্রের শক্তিতেই যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিলেও মীমাংসা দর্শন যে দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, তাহাও অসংশয়ে বলা যায় না। মন্ত্রের মধ্যেই দেবতাদের অধিষ্ঠান, মন্ত্রের বাহিরে তাঁহাদের অস্তিত্ব সংশয়ের স্থল। বেদের মন্ত্রে যজ্ঞ-স্থলে দেবতার অধিষ্ঠানে দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। মীমাংসকগণের মনে সংশয়ের উদয় হয় 'একই সময় বিভিন্ন স্থানের যজ্ঞে দেবতাগণ উপস্থিত থাকিতে পারেন কিরূপে' ? এই সকল কারণে মীমাংসা দর্শনকে বহুদেববাদী বলা যায় কি না, তাহাও সন্দেহ-স্থল। বেদের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য মীমাংসকগণ ঈশ্বরকে বর্জন করিয়াছিলেন এবং দেবতাদিগকেও সন্দেহের বিষয়ে পরিণত করিয়াছেন।

মীমাংসা দর্শনের এই পরিণতি পরবর্ত্তী কালের মীমাংসকদিগের মনঃপূত হয় নাই। অচেতন "অপূর্ব্ব" হইতে যে সংগতি-পূর্ণ ফলের উৎপত্তি হইতে পারে না, কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিয়া ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। এই ঈশ্বর কর্ম্মের অধীন নহেন। কর্ম্মের নিয়মে ঈশ্বরের একরূপতারই প্রকাশ। সপ্তদশ শতাব্দীতে আপদেব ও লৌগাক্ষী ভাস্কর ঈশ্বর-প্রীতির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি হয় বলিয়াছিলেন। পরে বেদান্ত দেশিক "সেশ্বর মীমাংসা" নামক গ্রন্থও লিখিয়াছেন। কুমারিল ঈশ্বরাস্তিত্বের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির প্রয়োগ করিয়াও লিখিয়াছিলেন : শব্দ ব্রহ্মেতি যৎচেদম শাস্ত্রং বেদাখ্যং উচ্যতে

তদপি অধিষ্ঠিতং সর্ব্বং একেন পরমাত্মনা। (তন্ত্রবার্ত্তিক)

যে বেদশাস্ত্রকে শব্দ ব্রহ্ম বলা হয়, তাহা পরমাত্মাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। কুমারিলই শিবকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন :

বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী দিব্যচক্ষুষে

শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তি-নিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে। (শ্লোক বার্ত্তিক)

কুমারিল আরও লিখিয়াছিলেন :

প্রায়েণৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তী কৃতা।
তাম্ আস্তিক পথে কর্ত্তুং অয়ম্ যত্নঃ কৃতো ময়া।

মীমাংসা দর্শন "লোকায়ত" দর্শনে পরিণত হইয়াছিল। কুমারিল তাহাকে আস্তিক পথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদ-পথে আনিবার চেষ্টাই এই চেষ্টা। কিন্তু শিবের প্রণামের সহিত ঈশ্বরাস্বীকৃতির সংগতি হয় না। তাই দ্বিতীয় শ্লোক যজ্ঞের স্তুতি বলিয়া অনেকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম শ্লোকের পরমাত্মার সঙ্গে সংগতি কোথায়? কুমারিল স্বীকার করিয়াছেন যে মুক্তির জন্য কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়েরই প্রয়োজন। এই স্বীকৃতি তাঁহার ঈশ্বর-স্বীকৃতির সূচক। কিন্তু উপাসনাও এক প্রকার কর্ম্ম এবং তাহা উপযোগী ফল উৎপাদন করে বলিয়া এই স্বীকৃতির মূল্যহ্রাস করা হইয়াছে। "সর্ব্বসিদ্ধান্ত সার" গ্রন্থে কুমারিলকে বৈদান্তিক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও হইয়াছে।

পরিসমাপ্তি

মীমাংসাদর্শনের দার্শনিক মূল্য অধিক নহে। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলে বিভিন্ন ভাষায় একই বস্তুর বিভিন্ন নাম হইত না। কালক্রমে শব্দের অর্থ-পরিবর্ত্তন ও হইত না। শব্দ অর্থ-প্রকাশের সংকেত মাত্র। কোনও বুদ্ধিমান পুরুষ ব্যতীত এই সংকেত ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। সংকেত বুদ্ধিগ্রাহ্য। বেদের শব্দরাশির অর্থ যদি কোনও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধিতে না থাকে, তাহা হইলে তাহা মানুষের সৃষ্টি বলিতে হয়।

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রতিবাদ। বস্তুর বাহ্য অস্তিত্বের প্রমাণ জ্ঞান। অনুকূল অবস্থায় উপযুক্ত কারণের সদ্‌ভাবে যে জ্ঞান হয় তাহা সত্য। তাহা না হইলে বিজ্ঞানবাদই সত্য হইত।

কর্ম্মের ফল-উৎপাদনের শক্তি "অপূর্ব্ব"। বেদের ঋতকর্ত্তৃক প্রাকৃতিক ও নৈতিক উভয় জগৎ বিধৃত। এক জগতের কর্ম্ম অন্য জগতে ফল উৎপন্ন করে, কিরূপে আমরা জানি না। ফিস্‌টে (Fichte) এই কথা বলিয়াছেন। মীমাংসার ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হইলেও উভয় জগতের মধ্যে এই সম্বন্ধ অনস্বীকার্য্য।

সাংখ্য দর্শন

১

উপক্রমণিকা

সাংখ্য শব্দ সংখ্যা শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। যে দর্শনে তত্ত্ব-সংখ্যা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই সাংখ্য। আবার সংখ্যা অথবা প্রসংখ্যান শব্দের অর্থ আত্ম-তত্ত্ব-কথন। যে দর্শনে আত্ম-তত্ত্ব-সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই সাংখ্য। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় "সাংখ্য" শব্দ সাংখ্য মত ও সাংখ্য-মতাবলম্বী লোক, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

সাংখ্য-দর্শন মহর্ষি কপিল-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রখ্যাত, এবং কাপিল দর্শন নামেও পরিচিত। মহর্ষি কপিল কে এবং কোন্ যুগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতে তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহাকে আদি বিদ্বান্ বলা হয়। কথিত আছে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নির্গুণ পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং সেই-জন্য তাঁহার নাম আদি বিদ্বান্। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে উদ্ধৃত এক শ্লোকে আছে, আদি বিদ্বান্ মহর্ষি কপিল (কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইলেও) আসুরির প্রতি করুণাবশতঃ নির্ম্মাণচিত্তে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে সাংখ্য-তন্ত্র বলিয়াছিলেন।* রামায়ণে কপিলমুনি-কর্ত্তৃক সগরবংশ-ধ্বংসের বিবরণ আছে। কাহারও কাহারও মতে তিনি ব্রহ্মার পুত্র। ভাগবত মতে তিনি বিষ্ণুর এক অবতার, দেবহুতির গর্ভসম্ভূত। কেহ কেহ তাঁহাকে অগ্নির অবতারও বলিয়াছেন। মহর্ষি কপিল স্বীয় শিষ্য আসুরিকে যে তন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, আসুরি তাহাই স্বশিষ্য পঞ্চ-শিখকে উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এক আসুরির উল্লেখ আছে। তিনি ও সাংখ্যপ্রবক্তা আসুরি সম্ভবতঃ অভিন্ন। সাংখ্যতত্ত্ব আর্য্যসমাজে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। আর্য্যসন্তানের পক্ষে প্রত্যহ পিতৃপুরুষের তর্পণ বিহিত। পিতৃপুরুষদিগের তর্পণের পূর্ব্বে

---

* আদি বিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ ১।২৫ সূত্রের ভাষ্য।

সনক, সনন্দ ও সনাতনের সঙ্গে কপিল, আসুরি বোঢ়ু ও পঞ্চশিখেরও তর্পণ করিতে হয়।* ইহা হইতে আর্য্য-সমাজের উপর সাংখ্যদর্শনের প্রভাব অনুমান করিতে পারা যায়। গৌড়পাদ তাঁহার সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে সাংখ্যাচার্য্য বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সাত জনের নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সনক, সনন্দ, সনাতন ও বোঢ়ুর ঐতিহাসিকতা ও দার্শনিক মত-সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

সাংখ্যদর্শনের গ্রন্থাবলী

সাংখ্য-দর্শন-সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য: (১) ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, (২) সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র, (৩) তত্ত্ব-সমাস, (৪) বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্য-তত্ত্ব-কৌমুদী, (সাংখ্য-কারিকার ভাষ্য)। (৫) বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য ও সাংখ্য-সার, (৬) গৌড়পাদ-রচিত সাংখ্য-কারিকা-ভাষ্য, (৭) নারায়ণ-রচিত সাংখ্য-চন্দ্রিকা, (৮) চরক-সংহিতা, (৯) পতঞ্জলির যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য, (১০) বাচস্পতি মিশ্র-রচিত ব্যাসভাষ্যের টীকা তত্ত্ব-বৈশারদী, (১১) বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিক (১২) ভোজবৃত্তি এবং (১৩) মহাভারতের অন্তর্গত অনুগীতা (আশ্বমেধিক পর্ব্ব), পঞ্চশিখ-জনদেব-সংবাদ (শান্তিপর্ব্ব), (১৪) অনিরুদ্ধ-রচিত সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্য, (১৫) সীমানন্দ-রচিত সাংখ্য-তত্ত্ব-বিবেচন, (১৭) মহাদেব-রচিত সাংখ্যসূত্র-বৃত্তিসার, (১৮) নাগেশরচিত লঘুসাংখ্যসূত্র-বৃত্তি।

কাল নির্ণয়

সাংখ্য-কারিকা, সাংখ্য-প্রবচনসূত্র ও তত্ত্ব-সমাস গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে কোনটিই যে মহর্ষি কপিল-প্রণীত নহে, ইহাই পণ্ডিতদিগের অভিমত। কিন্তু সাংখ্য-দর্শন যে অতি প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ওয়েবরের মতে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাংখ্য-দর্শন প্রাচীনতম। মহাভারতে সাংখ্য ও যোগ-দর্শন সনাতন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগবত-পুরাণে আছে যে সাংখ্য-দর্শনের অতি সামান্য অংশই বর্ত্তমান আছে, অধিকাংশই কালবশে নষ্ট হইয়াছে (কাল-বিপ্লুত)। সাংখ্য-শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ যে বিনষ্ট হইয়াছে, বিজ্ঞান ভিক্ষুও তাহা বলিয়াছেন।

---

* সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধের পূর্ব্বে যে সাংখ্য-দর্শন ও যোগ-দর্শন প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অধ্যাপক গার্বের মতেও কপিল বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও কপিল বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত আছে। খৃঃ পূর্ব্ব ৬২৩ অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম। তাহার অন্ততঃ এক শত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে যে কপিলের দর্শন প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতে খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দের পূর্ব্বে আসুরি বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্চশিখ ছিলেন আসুরির শিষ্য। সুতরাং তিনিও খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে বাধা নাই।

সাংখ্য-কারিকা, সাংখ্য-প্রবচনসূত্র ও তত্ত্ব-সমাস এই তিন গ্রন্থের মধ্যে সাংখ্য-কারিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মাধবাচার্য্যের (১৩৫০ খৃঃ অঃ) সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে সাংখ্য-সূত্র ও তত্ত্ব-সমাসের উল্লেখ নাই। একাদশ শতাব্দীতে রচিত আলবেরুণির ভারত-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা ও তাহার গৌড়পাদ-রচিত ভাষ্যের সহিত আলবেরুণির যে পরিচয় ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু সাংখ্য-সূত্র ও তত্ত্ব-সমাসের সহিত যে তাঁহার পরিচয় ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। বাচস্পতি মিশ্র-রচিত সাংখ্য-কারিকার ভাষ্য সাংখ্য-তত্ত্ব-কৌমুদী নবম শতাব্দীর গ্রন্থ। তাঁহাতে সাংখ্য-সূত্র ও তত্ত্ব-সমাসের উল্লেখ নাই। বিজ্ঞান ভিক্ষুর সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্য ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়। তাহার পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনিরুদ্ধ উহার এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে রচিত সাংখ্য-সূত্রের কোনও ভাষ্য নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত গুণরত্নের গ্রন্থেও এই দুই গ্রন্থের উল্লেখ নাই। এই সকল কারণে সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরে রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বাচস্পতি মিশ্রের ভাষ্য রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে যে সাংখ্য-কারিকার অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে চীন দেশে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরমার্থ নামে এক বৌদ্ধ-প্রচারক চীন দেশে গমন করিয়া চৈনিক ভাষায় "সুবর্ণ-সপ্ততি-শাস্ত্র" নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সাংখ্য-কারিকার অনুবাদমাত্র। সুবর্ণসপ্ততিশাস্ত্র নাম হইতে মনে হয় তখন সাংখ্য-কারিকায় সত্তরটি কারিকা ছিল। সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সাংখ্য-কারিকা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়। অনেকের মতে ইহা প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। সাংখ্য-কারিকার ৭০ ও ৭১ কারিকায় আছে "মুনি কপিল এই পবিত্রতম শাস্ত্র অনুকম্পাবশতঃ আসুরিকে দান করিয়াছিলেন এবং আসুরি

পঞ্চশিখকে দান করিয়াছিলেন, পঞ্চশিখ এই শাস্ত্র "বহুধা" করিয়াছিলেন। শিষ্যপরম্পরা-ক্রমে ঈশ্বরকৃষ্ণ ইহা প্রাপ্ত হন, এবং ইহার সিদ্ধান্ত সম্যক অবগত হইয়া আর্য্যাকারে (আর্য্যা = ছন্দ বিশেষ) প্রকাশিত করেন।" ৭২ কারিকায় আছে, ষষ্টিতন্ত্রের (সাংখ্য দর্শনের) সমগ্র অর্থ সাংখ্য-কারিকার ৭০ কারিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল আখ্যায়িকা ও পরবাদ (মতান্তর) বর্জ্জিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে সাংখ্য-দর্শনের নাম ছিল ষষ্টি-তন্ত্র এবং তাহাতে ৭০টি কারিকা ছিল।

মাক্ষমূলার লিখিয়াছেন, পরমার্থকর্ত্তৃক অনূদিত সাংখ্য-কারিকার প্রথম কারিকার ভাষ্যে আছে, "কপিল এক ঋষি ছিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে ধর্ম্ম-প্রজ্ঞা-বৈরাগ্য-ও-মোক্ষ-সমন্বিত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আসুরিনামা এক ব্রাহ্মণকে সহস্র বৎসর যাবৎ দেবারাধনা করিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণ, তুমি কি গৃহস্থের অবস্থায় সন্তুষ্ট আছ ?" সহস্র বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় আসুরিকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আসুরি বলিয়াছিলেন যে তিনি গৃহস্থের অবস্থাতে সন্তুষ্ট আছেন। ইহার পরে আবার যখন তিনি আসুরির নিকট আসেন, তখন আসুরি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।" এই আখ্যায়িকা হইতে পরমার্থ যে কপিল ও আসুরিকে অতি প্রাচীন ঋষি বলিয়া মনে করিতেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ লিখিয়াছেন, যে চীনদেশে প্রবাদ আছে যে বিন্ধ্যবাসনামা এক ব্যক্তি বার্ষগণ্য-রচিত এক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করেন। বিন্ধ্যবাস ও সাংখ্য-কারিকা-রচয়িতা যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সাংখ্য-দর্শন-সম্বন্ধে সাংখ্য-কারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চীনদেশীয় প্রবাদ অনুসারে বিন্ধ্যবাস বসুবন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী। বসুবন্ধুর গ্রন্থে সাংখ্য-কারিকার দ্বিতীয় কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছিল। বসুবন্ধু চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরকৃষ্ণ তৃতীয় শতাব্দীতে সাংখ্যকারিকা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে।

চরক-সংহিতা সাংখ্য-কারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী। ম্যাকডনেল সাহেবের মতে চরক-সংহিতা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার রচনাকাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ও চরক-সংহিতায়

চতুর্বিংশতি তত্ত্বমাত্র স্বীকৃত, প্রধান স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। উভয়ের মতেই অব্যক্ত আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে আত্মারই গুণ বলিয়াছেন*। মহাভারতে আছে—সাংখ্যবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ চতুর্বিংশ-তত্ত্ব-বাদী, কেহ কেহ পঞ্চবিংশ-তত্ত্ব-বাদী, কেহ কেহ ষড়্‌বিংশ-তত্ত্ব বাদী। চতুর্বিংশতি ও পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব-বাদী উভয়েই "অব্যক্ত" স্বীকার করেন, কিন্তু পঞ্চশিখের মত বলিয়া যাহা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষের অবস্থাবিশেষই অব্যক্ত।†

ইহা হইতে মনে হয় ঈশ্বর কৃষ্ণের পূর্ব্বে সাংখ্য দর্শনের এক শাখা প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথকত্ব স্বীকার করিতেন না। পুরুষই ত্রিগুণযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করেন, ইহাই ছিল তাঁহাদের মত। ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন সূরি লিখিয়াছেন, মৌলিক্য সাংখ্যগণ প্রত্যেক আত্মার জন্য পৃথক প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। উত্তর সাংখ্যগণ সর্ব্বাত্মক নিত্য এক প্রধান স্বীকার করেন। প্রতি পুরুষে যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রধান থাকে, তাহা হইলে এক নিত্য প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকে না। ইহা হইতেও মনে হয় মৌলিক্য সাংখ্যগণ চতুর্বিংশ তত্ত্ববাদী ছিলেন।‡

বিজ্ঞানভিক্ষু যে সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পঞ্চম অধ্যায়ে বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডন (পরবাদ) এবং চতুর্থ অধ্যায়ে দৃষ্টান্তমূলক কয়েকটি কাহিনী আছে। যে পরবাদ ও আখ্যায়িকা সাংখ্য-কারিকা হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাই ইহাতে আছে। এই গ্রন্থকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত মনে করিবার কারণ উপরে বর্ণিত হইয়াছে। বালশাস্ত্রীর মতে সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত এবং বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্রগুলি রচনা করিয়া নিজেই তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। মাক্ষমূলর এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে সাংখ্য-সূত্রাবলীর অনেকগুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। তাহাতে বিজ্ঞানভিক্ষু ২১৪টি সূত্র সংযুক্ত করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু যাবতীয় সূত্রই যে তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ইহাদের

---

* সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্তস্যৈব কীর্ত্তিতাঃ।

† পঞ্চজ্ঞঃ পঞ্চকৃৎ পঞ্চগুণঃ পঞ্চশিখঃ স্মৃতিঃ। পুরুষাবস্থমব্যক্তং পরমার্থং ন্যবেদয়ৎ। (মহা—১২।৩২০।১২)

‡ এই প্রসঙ্গে ভিষগাচার্য ৺জ্যোতিষ চন্দ্র সরস্বতী সাংখ্যাচার্য-বিরচিত চরকসংহিতায় প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

মধ্যে যেমন কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, বার্ষগণ্য, ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত সূত্র আছে, তেমনি হয়তো দুই একটি বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত সূত্রও থাকিতে পারে। সাংখ্য-কারিকায় ঈশ্বর-সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রটি আছে সাংখ্য-প্রবচনসূত্রে। সাংখ্য-কারিকা সম্পূর্ণ দ্বৈতমূলক, কিন্তু সাংখ্য-সূত্রের সহিত অদ্বৈত ঈশ্বরবাদের বিরোধ নাই। গার্বে লিখিয়াছেন "সাংখ্য-সূত্রকার অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, যে সাংখ্য-দর্শনের সহিত সগুণ ঈশ্বর-বাদ, ব্রহ্মের নিবিশেষ একত্ব, ব্রহ্মের আনন্দ-রূপত্ব, এবং স্বর্গলোকে নিঃশ্রেয়স্-প্রাপ্তির বিরোধ নাই।" গার্বের মতে সংখ্য-সূত্রের উপর বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু ঈশ্বর-বাদী। তিনি ঈশ্বর-বাদের সহিত সাংখ্য-দর্শনের ভেদ লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানামৃত নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্যও রচনা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যের শেষে তিনি লিখিয়াছেন—"মহর্ষি কপিল বেদান্তসাগর মন্থন করিয়া অমৃতদ্বারা সাংখ্য-কূপসকল পূর্ণ করতঃ ঋষিদিগকে সেই অমৃত পান করাইয়াছিলেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন "কপিলমূর্তি ভগবান বিষ্ণু লোক-হিতের জন্য সাংখ্য-শাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কোন কোনও বেদান্তী বলেন সাংখ্য-শাস্ত্রকার কপিল বিষ্ণু নহেন, তিনি অন্য ব্যক্তি, অগ্নির অবতার। প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যকার কপিলই বিষ্ণুর অবতার।" সাংখ্য-দর্শন আদিতে নিরীশ্বর ছিল, অথবা বৌদ্ধ প্রভাবে উহা নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনাযোগ্য।

অধ্যাপক মাক্ষমুলার তত্ত্ব-সমাসকেই প্রাচীন কাপিলসূত্র বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, প্রাচীন ভারতে সকল শাস্ত্রই সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। সুতরাং সাংখ্য-দর্শনও যে ব্রহ্ম-সূত্র, জৈমিনি-সূত্র প্রভৃতির মতো সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছিল, ইহা খুবই সম্ভবপর। সে সূত্রগুলি কোথায় গেল? সাংখ্য-কারিকা যে সেই প্রাচীন সূত্রাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত, গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বিজ্ঞান ভিক্ষু যে তত্ত্ব-সমাসকে সাংখ্যকারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকা পাঠ করিয়া তাহাই ধারণা হয়। সাংখ্য-সূত্র ও তত্ত্বসমাস, সাংখ্য-কারের এই দুইখানা গ্রন্থ রচনা করিবার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা তত্ত্বসমাসে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই সাখ্য-সূত্রে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও "তত্ত্ব-সমাসে" কতকগুলি নূতন পারিভাষিক শব্দ আছে, এবং তাহার উপক্রমণিকার ভাষা আধুনিক কালে রচিত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে, তথাপি মাক্ষমুলার

সূত্রাকারে লিখিত এই গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন কাপিলসূত্রগুলি সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়াছেন।

তত্ত্ব-সমাসে পুরুষকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাই ছিল প্রাচীন সাংখ্য মত এবং সে মত নিরীশ্বর ছিল না। নিরীশ্বর বলিয়া চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ মত যে সমাজে ঘৃণার সঙ্গে বর্জ্জিত হইয়াছিল, নিরীশ্বর হইলে সাংখ্য-বাদ সেই সমাজে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইত না।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে যে সাংখ্যদর্শন বিবৃত আছে, তাহার বক্তা কপিল। মাতা দেবহূতিকে কপিল সাংখ্য-দর্শনের যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই উক্ত স্কন্ধে বর্ণিত আছে। তথায় কপিল বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু ভাগবত অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন।

সাংখ্য-দর্শনের মূল

সাংখ্য-দর্শনের মূল উপনিষদের মধ্যে নিহিত। কঠোপনিষদের ১৩।১০-১১ শ্লোকে সাংখ্য-দর্শনের পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয়, মন, বুদ্ধি, মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ এই পঞ্চদশ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬।১৩ শ্লোকে "সাংখ্যযোগাধিগম্য" শব্দের উল্লেখ আছে। উক্ত উপনিষদের ১।৪ শ্লোকে প্রকৃতিকে একনেমি, ত্রিবৃত, অর্থাৎ তিনগুণযুক্ত, ষোড়শান্ত অর্থাৎ ষোড়শ বিকারযুক্ত (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত), পঞ্চাশৎ অরযুক্ত (পঞ্চ বিপর্য্যয়, অষ্টবিংশ অশক্তি, নব তুষ্টি ও ও অষ্ট সিদ্ধি), বিংশতি প্রত্যর-যুক্ত (দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়), ষট্‌ অষ্টকযুক্ত—অষ্টপ্রকৃতি (ভূমি, আপ, অনল, বায়ু, খ, মনঃ বুদ্ধি, অহংকার), অষ্ট ধাতু, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, অষ্ট ভাব, অষ্টদেব, অষ্টগুণ—বলা হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকেও সাংখ্যশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ পঞ্চ চিত্তবৃত্তি, পঞ্চ বিপর্য্যয় আদি উক্ত হইয়াছে। ১।১০ শ্লোকে প্রকৃতিকে "প্রধান" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ৪।১০ শ্লোকে প্রকৃতিকে মায়া বলা হইয়াছে।

মৈত্রায়ণী উপনিষদে তন্মাত্র, তিনগুণ, পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদের উল্লেখ আছে। মৈত্রায়ণী উপনিষদের কাল এখনও নির্ণাত হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধ যুগের পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিয়াছেন। কিন্তু কঠ ও শ্বেতাশ্বতর যে বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপনিষৎ হইতে উদ্‌ভূত হইলেও আধুনিক সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরের কথা নাই এবং তাহা নিরীশ্বর দর্শন বলিয়া পরিচিত। সাংখ্য মত যখন প্রথম দর্শনের আকারে প্রকাশিত হয়, তখন তাহার কি রূপ ছিল, তাহা অনিশ্চিত। অধ্যাপক রিচার্ড গার্বে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকাকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়াছেন। চরক-সংহিতাও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া (৭৭ খৃঃ অঃ) অবধারিত হইয়াছে। চরক-সংহিতায় সাংখ্য-দর্শনের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত সাংখ্য-কারিকার বহু পার্থক্য আছে। মহাভারতেও সাংখ্যদর্শনের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাদের সহিত সাংখ্য-কারিকার মিল নাই। অধ্যাপক ডাঃ দাসগুপ্ত বলেন "বাসিলিএফ্ তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, যে বিন্ধ্যবাসী নামক এক ব্যক্তি সাংখ্য-দর্শনকে তাঁহার স্বকীয় মতের অনুরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। টীকা কুমুর মতে বিন্ধ্যবাসী ও ঈশ্বরকৃষ্ণ একই ব্যক্তি।" গার্বে ঈশ্বর-কৃষ্ণকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। সুতরাং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সাংখ্য নবরূপ গ্রহণ করে, ইহা বলিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বে সাংখ্যের রূপ কি ছিল, চরক-সংহিতা ও মহাভারত হইতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

তাহার মূল উপনিষদে প্রোথিত হইলেও সাংখ্যদর্শন উপনিষদ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

চরক সংহিতায় সাংখ্যদর্শন

চরক-সংহিতায় যে সাংখ্য-মত বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান কালে প্রচলিত সাংখ্য-মতের অনেক বিষয়ে মিল নাই। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্রের উল্লেখ নাই, পঞ্চ তন্মাত্রের স্থলে আছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ। পঞ্চভূত ও চেতনার সমবায়ই পুরুষ। কেবল চেতনা-ধাতুকেও কেহ কেহ পুরুষ বলেন। আবার মন, দশ, ইন্দ্রিয়, দশ ইন্দ্রিয়ার্থ ও অষ্টধাতুক প্রকৃতির সমবায়কেও কেহ কেহ পুরুষ বলেন। প্রকৃতিকে অষ্টধাতুক বলা হইয়াছে—অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চ (সূক্ষ্ম) অন্ধ ধাতু। মন অতিসূক্ষ্ম, অণুপরিমাণ। মনের কার্য্যের জন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের প্রয়োজন। মনের সহিত ইন্দ্রিয়দিগের সংযোগ না হইলে, কোনও জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। মনের ক্রিয়া দ্বিবিধ—ঊহ এবং বিচার। ইন্দ্রিয় হইতে অনির্দ্দিষ্ট

সংবেদন-গ্রহণ "উহ", এবং সংবেদন হইতে প্রত্যয়-গঠন "বিচার"। ইহার পরে বুদ্ধির কার্য্য আরব্ধ হয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ (স্থূল ভূত) দশ ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, অহংকার, মহৎ, প্রকৃতি—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমবায়ই পুরুষ। কর্ম্ম, কর্ম্মফল, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, অজ্ঞান, জীবন, মৃত্যু সকলই এই সমবেত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের। এতদ্‌ব্যতীত পুরুষেরও অস্তিত্ব আছে। পুরুষ না থাকিলে জন্ম, মৃত্যু, বন্ধ ও মোক্ষও থাকিত না। আত্মা কারণরূপে বিদ্যমান না থাকিলে প্রকাশমূলক জ্ঞানালোকের কোনও ব্যাখ্যা করা যাইত না। তাই পুরুষকে চরক পরমাত্মা বলিয়াছেন। পরমাত্মা অনাদি ও স্বয়ম্ভূ, তাহার কোনও কারণ নাই। পুরুষের স্বরূপগত সংবিদ নাই। ইন্দ্রিয়দিগের মনের সহিত সংযোগবশতঃ পুরুষ সংবিদ-বিশিষ্ট হয়। জ্ঞান, অনুভূতি অথবা কর্ম্ম এই সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। চরকের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন। প্রকৃতির বিকারসকল ক্ষেত্র এবং অব্যক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ। (অব্যক্ত অস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞং ঋষয়ো বিদুঃ)। অব্যক্ত ও চেতনা এক ও অভিন্ন। অনভিব্যক্ত চেতনা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়দিগের উদ্‌ভব হয়। প্রলয়ে এই সকল সৃষ্টি প্রকৃতিতে বিলীন হয়। নূতন সৃষ্টিকালে অব্যক্ত পুরুষ হইতে আবার বুদ্ধি প্রভৃতি অভিব্যক্ত হয়। নূতন সৃষ্টি ও জন্মমৃত্যু-চক্র রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়ার ফল। যাঁহারা এই দুই গুণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাঁহারা জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন। পুরুষের সহিত সংযোগ না হইলে, মনের ক্রিয়া হয় না। পুরুষই প্রকৃত কর্ত্তা। পুরুষ স্বকীয় ইচ্ছানুসারে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পুরুষের ইচ্ছা অন্য কোন কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পুরুষ সুখদুঃখ ভোগ করে না। পুরুষাধিষ্ঠিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব-সমবায় সুখদুঃখ ভোগ করে। সুখ-দুঃখ ভোগ হইতে তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণার উদ্‌ভব এবং তৃষ্ণা হইতে আবার সুখ-দুঃখের উদ্ভব হয়। সুখ-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ। মন, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থদিগের সহিত পুরুষের সংযোগের ফলে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়। মনকে যখন স্থির ভাবে পুরুষের প্রতি নিবদ্ধ করা যায়, তখন সুখদুঃখ-বোধ থাকে না। তাহাই যোগের অবস্থা। সকল বস্তুই কারণ-কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়, সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, কিছুই আত্মাকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয় না। সকলই দুঃখময়, কিন্তু কিছুই আত্মারূপী "আমার" নহে, ইহাই সত্য জ্ঞান। এই জ্ঞান হইলে যাবতীয় জ্ঞান ও সুখ-দুঃখ বিলয়প্রাপ্ত হয়। তখন আত্মার অস্তিত্বের কোনও চিহ্নই থাকে না। এ অবস্থা বর্ণনাতীত।

এ অবস্থাকে "ব্রহ্মভূত" বলা হইয়াছে। ইহাই সাংখ্যদিগের অপবর্গ। এই চরম অবস্থায় "সমূল সর্ব্ববেদনা, সমজ্ঞা-জ্ঞানবিজ্ঞান অশেষে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত হয় (সমজ্ঞা=লৌকিক কীর্ত্তি)। ইহার পরে ব্রহ্মভূত ভূতাত্মা উপলব্ধ হয় না, তাহার কোনও চিহ্নও থাকে না। ব্রহ্মই ব্রহ্মবিদ্‌দিগের গতি। তাহা অক্ষর ও অলক্ষণ।"

চরক সংহিতায় বিবৃত সাংখ্যমতের স্থূল মর্ম্ম এই : (১) মনের শুভ অবস্থাসকল সত্বগুণের চিহ্ন ও অশুভ অবস্থাসকল রজঃ ও তমঃ গুণের চিহ্ন; (২) ইন্দ্রিয়সকল ভৌতিক : (৩) অব্যক্ত অবস্থাই পুরুষ; (৪) অব্যক্তের সহিত তাহা হইতে উদ্‌ভূত অন্যান্য তত্ত্বের সমবায় হইতে জীবের উৎপত্তি, (৫) মোক্ষ ঐকান্তিক বিনাশ অথবা যাবতীয় লক্ষণ-বিহীন নির্ব্বিশেষ সত্তার সমতুল্য। এই অবস্থার নাম ব্রহ্মভাব। এই অবস্থায় সংবিদ থাকে না, কেন না পুরুষের সহিত তাহা হইতে উদ্‌ভূত বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতির সংযোগ হইতেই সংবিদের উদ্ভব হয়।

মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্য

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম পর্ব্বাধ্যায়ে পঞ্চশিখ-জনদেব-সংবাদ, সাংখ্য-যোগ-কথন ও জনক-পঞ্চশিখ-সংবাদ-শীর্ষক তিন অধ্যায়ে সাংখ্য-দর্শনের কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। চরকের বর্ণনার সহিত মহাভারতের কোনও কোনও বর্ণনার মিল আছে। পঞ্চশিখ বলিয়াছেন "অধ্যাত্ম-চিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র সংযোগকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর ঐ ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা যখন দেহাদি হইতে ভিন্ন, তখন দেহাদির নাশ-নিবন্ধন তাঁহার নাশ হইতে পারে না" পঞ্চশিখ অব্যক্তকে বলিয়াছেন "পুরুষাবস্থ"। "পুরুষাবস্থ অব্যক্ত" অর্থ পুরুষকর্ত্তৃক অধ্যুষিত অথবা চৈতন্যস্বরূপ প্রকৃতি। আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে চরক ও পঞ্চশিখের যুক্তি অভিন্ন।

অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ের কয়েকটি অধ্যায়েও সাংখ্যদর্শন বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে মহত্তত্ত্বকে সর্ব্বব্যাপী পুরাতন পরমপুরুষ বলা হইয়াছে।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত বলেন "ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ের" ভাষ্যকার গুণরত্ন (চতুর্দ্দশ শতাব্দী) সাংখ্যদর্শনের দুইটি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন—মৌলিক্য এবং উত্তর। প্রথম বিভাগের মতানুসারে প্রত্যেক পুরুষের সহিত স্বতন্ত্র 'প্রধান' যুক্ত থাকে (মৌলিক্য সাংখ্যা হি আত্মানং আত্মানং প্রতি পৃথক প্রধানং বদন্তি)। এই মত চরকবর্ণিত সাংখ্য-মত বলিয়া মনে হয়। এই জন্য

আমার বিশ্বাস এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শৃঙ্খলাবদ্ধ সাংখ্য মত।" দাশগুপ্ত আরও বলেন, মহাভারতে (১২।৩১৮) তিন প্রকার সাংখ্য মতের উল্লেখ আছে। (১) এক মতে তত্ত্বসংখ্যা ২৪টি। (২) দ্বিতীয় মতে তত্ত্বসংখ্যা ২৫টি এবং (৩) তৃতীয় মতে ২৬টি। শেষোক্ত মতে পুরুষ ও প্রকৃতির অতিরিক্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত, এবং পরমেশ্বরই ষড়বিংশ তত্ত্ব। ইহার সহিত যোগশাস্ত্রের মিল আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মত মহাভারতের এই অধ্যায়ে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত আসুরির মত সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মত। চরক (৭৮ খৃঃ অঃ) ঈশ্বরকৃষ্ণের মতের উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারাও এই কথা প্রমাণিত হয়।

মহাভারতে সাংখ্যমত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের কোন্ অধ্যায় কখন রচিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু চরকের কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গার্ব্বে সাংখ্যকারিককে প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিলেও কেহ কেহ ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত বলিয়াছেন। উহা যে চরক-সংহিতার পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং চরক সংহিতায় বর্ণিত সাংখ্য মত যে সাংখ্যকারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পতঞ্জলির যে চরকসংহিতার সহিত পরিচয় ছিল, তাহা যোগসূত্রের একটি সূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় (১।১৯)।

ষষ্টিতন্ত্র

"ষষ্টিতন্ত্র" নামে সাংখ্যশাস্ত্র-সমন্ধে একখানা প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় পাওয়া যায়। শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্য ষষ্টিতন্ত্রকে বার্ষগণ্য-রচিত বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার সাংখ্য-কারিকার ভাষ্যে "রাজবার্ত্তিক"হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে সাংখ্য-কারিকায় ৬০টি বিষয়ের বর্ণনা আছে বলিয়া সাংখ্যকারিকাই ষষ্টিতন্ত্র নামে পরিচিত ছিল।

কিন্তু দাশগুপ্ত বলেন, যে অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় ষষ্টিতন্ত্রে বর্ণিত বিষয়াবলীর যে বর্ণনা আছে, রাজবার্ত্তিকের বর্ণনা হইতে তাহা ভিন্ন। অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় বর্ণিত সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত এবং তাহা পঞ্চরাত্র বৈষ্ণব মতের সদৃশ। উক্ত সংহিতায় আরও লিখিত হইয়াছে, যে কপিলের মত ছিল বৈষ্ণব মত। বিজ্ঞান ভিক্ষুও তাঁহার "বিজ্ঞানামৃত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে সাংখ্যদর্শন আদিতে সেশ্বর ছিল এবং নিরীশ্বর সাংখ্য "প্রৌঢ়িবাদ" মাত্র। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, জগতের ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকার যে

অনাবশ্যক, তাহাই প্রদর্শন করা। কিন্তু মহাভারতে স্পষ্ট আছে, যে সাংখ্য এবং যোগের মধ্যে পার্থক্য এই, যে সাংখ্য নিরীশ্বর, যোগ সেশ্বর। কিন্তু মহাভারতের কোন্ অংশ কখন রচিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ষষ্টিতন্ত্রে বর্ণিত বিষয়-সম্বন্ধে বিবিধ বর্ণনা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে, যে প্রাচীন ষষ্টিতন্ত্র পরবর্ত্তী কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। গুণরত্ন সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে "ষষ্টিতন্ত্রোদ্ধার" উল্লিখিত হইয়াছে। ষষ্টিতন্ত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

অধ্যাপক দাসগুপ্তের মতে অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় উল্লিখিত ষষ্টিতন্ত্রকে যদি কপিল প্রচারিত দর্শন হইতে অভিন্ন মনে করা যায়, তাহা হইলে কপিলের দর্শন সেশ্বর ছিল, ইহা বলা যায়। আসুরি সেই দর্শনেরই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু পঞ্চশিখ যে মত প্রচার করেন, তাহা প্রাচীন মত হইতে ভিন্ন। মহাভারতে পঞ্চশিখের মতের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা নাই। সাংখ্যকারিকায় আছে, পঞ্চশিখকর্তৃক আসুরি-প্রচারিত তন্ত্র "বহুধা কৃতম্" হইয়াছিল। "বহুধা কৃতম্" এর অর্থ কি? তিনি কি একাধিক গ্রন্থে সাংখ্যদর্শনের বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন? বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের মধ্যে অধিকাংশই সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, যে কপিলের মত ছিল সেশ্বর, কিন্তু পঞ্চশিখ সে দর্শন হইতে ঈশ্বর বর্জন করিয়াছিলেন (যদিও তিনি অব্যক্তকে পুরুষাবস্থ বলিয়াছিলেন)। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সাংখ্য মত পাতঞ্জল দর্শনে রক্ষিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামেই পরিচিত। পঞ্চশিখের সাংখ্য তাহা হইলে প্রাচীন সেশ্বর সাংখ্য ও আধুনিক নিরীশ্বর সাংখ্যের মধ্যবর্ত্তী। আধুনিক সাংখ্য এই দর্শনের তৃতীয় রূপ।

সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন

সাংখ্যকার বলেন জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ হইতে মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন।

দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, অধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শারীরিক পীড়াজনিত দুঃখ ও মানসিক দুঃখ আধ্যাত্মিক, পার্থিব প্রাণীজাত দুঃখ আধিভৌতিক এবং দৈবকারণজাত দুঃখ আধিদৈবিক। মানব-জীবনে দুঃখ ও যেমন আছে তেমনি সুখও আছে, সত্য। কিন্তু সুখ অস্থায়ী, ক্ষণিক, দুঃখ শাশ্বত। দুঃখ জগতের একটা উপাদান। সুতরাং জগতের সকলই দুঃখ-মিশ্রিত। এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় সাংখ্য-দর্শনে বর্ণিত আছে।

কিন্তু দুঃখ-নিবৃত্তির দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ) ও আনুশ্রবিক (বৈদিক) উপায় তো রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও নূতন উপায় অনুসন্ধানের কি প্রয়োজন? সাংখ্যকার বলেন, দৃষ্টও আনুশ্রবিক উপায়দ্বারা দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। রোগমুক্তির জন্য ঔষধি আছে সত্য, কিন্তু রোগ একবার শান্ত হইয়া পরে আবার অক্রমণ করে। সকল রোগও ঔষধিদ্বারা শান্ত হয় না। রোগের ঔষধ তবুও কিছু আছে, কিন্তু শোকের ঔষধি কোথায়? বলিতে পার পার্থিব জীবনে দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ-লাভের উপায় না থাকিলেও, মৃত্যুর পরে দুঃখহীন হইবার উপায় তো বেদে বর্ণিত আছে। সেই উপায় অবলম্বন করিয়া—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিয়া—তো স্বর্গলাভ করা যায়। "অপাম সোমং, অমৃতা অভূম" (আমরা সোমপান করিয়া অমর হইব), এ কথা বেদে নাই কি? আর যে সুখ দুঃখ-যুক্ত নহে, যাহা দুঃখকর্তৃক গ্রস্ত নহে, যাহা অনন্তর (অর্থাৎ যাহার পরে দুঃখ আবির্ভূত হয় না), যাহা অভিলাষমাত্রেই উপনীত হয়, তাহাই স্বর্গসুখ। সে সুখ যদি বৈদিক উপায় অবলম্বন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে উপায়ান্তরের অন্বেষণের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই, যে স্বর্গ হইতেও পুণ্যক্ষয়ে পতন হয়। বৈদিক কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গসুখলাভ হয়, তাহা ক্ষয় ও অতিশয়-যুক্ত। তাহাদ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক বিনাশ হয় না। দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য দুঃখের মূল-উৎপাটনের প্রয়োজন। সেই মূলোৎপাটনের উপায় সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। সে উপায় হইতেছে ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞএর বিজ্ঞান।

জীবনের দুঃখময় মূর্ত্তি যে কেবল সাংখ্যকারই দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। গৌতম বুদ্ধও দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার উপায়-আবিষ্কারের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। গ্রীক পণ্ডিত সাইলেনাস্‌কে মিদাস্‌ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মানবের পক্ষে পরম মঙ্গল কি? তখন সাইলেনাস বলিয়াছিলেন, যাহা মানবের পরম মঙ্গল তাহা তাহার অনধিগম্য; তাহা হইতেছে জন্মগ্রহণ না করা। তাহার পরেই যাহা তাহার শ্রেয়স্কর, তাহা হইতেছে যত শীঘ্র সম্ভব মরিয়া যাওয়া। কিন্তু মৃত্যুতেই তো দুঃখের শেষ হয় না। জীব তো অমর। মৃত্যুর পরে যে দুঃখ হয়, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি?

জার্মান দার্শনিক সোপেনহরও দুঃখের মূর্তি দেখিয়াছিলেন। অনবদ্য ভাষায় তিনি সেই দুঃখের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতের মূলে

আছে "ইচ্ছা"। 'ইচ্ছা' যত চায়, তত পায় না। তাই দুঃখ। দুঃখের ঐকান্তিক বিনাশ করিতে হইলে ইচ্ছার বিনাশ চাই। ইচ্ছা বিনষ্ট হইলে মানবজাতিরও বিনাশ হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখেরও ঐকান্তিক বিনাশ হইবে। ইহার জন্য তিনি স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ ও সন্তানোৎপাদন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

সাংখ্যকার যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ক্রমশঃ আমরা তাহা দেখিতে পাইব। সে উপায়ে দুঃখ-নিবৃত্তি হইলেও, তাহার সহিত যে দুঃখাসংভিন্ন অবিনশ্বর পরমানন্দ লাভ হয় না, তাহাও দেখিতে পাইব।

২

সৎকার্য্যবাদ

সাংখ্যদর্শন বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহার কার্য্যকরণ-তত্ত্ব বোঝা প্রয়োজনীয়। কার্য্য ও তাহার কারণের মধ্যে ভেদ নাই, এ বিষয়ে বেদান্ত ও সাংখ্য একমত। বাহ্যতঃ বিভিন্ন দৃষ্ট হইলেও, কার্য্য ও কারণ বস্তুতঃ অভিন্ন। কার্য্য নূতন কিছু নহে, কারণ হইতে স্বতন্ত্র নূতন সৃষ্ট অথবা উদ্ভূত কোনও পদার্থ নহে; ইহার আবির্ভাব নূতন হইলেও কারণের মধ্যে ইহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। কার্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে কারণের বিনাশ হয় না, তাহা অগোচর হয় মাত্র।

(১) কার্য্য যদি পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে তাহার আবির্ভাব অসম্ভব হইত। কেননা অসতের উৎপত্তি কখনও হয় না। আকাশ-কুসুমের উৎপত্তি হয় না। নীল বর্ণকে কোনও উপায়েই পীত বর্ণ করা যায় না। (২) আবার উপাদান হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। উপাদান সৎ, কার্য্যও সৎ। উপাদানের মধ্যে কার্য্য থাকে; উপাদানের সহিত কার্য্য অভিন্ন। (৩) তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তু হইতেই প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন হইতে পারিত। তাহা হয় না, কেন না কোন বস্তু যাহার সহিত অভিন্ন, তাহাই কেবল তাহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। (৪) কোনও বস্তুর শক্যতা অনুসারেই তাহাদ্বারা তথাকথিত অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়। কোনও বস্তু যাহা উৎপাদন করিতে অশক্ত, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না। (৫) কার্য্য কারণাত্মক। কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে। কারণ সৎ এবং তাহা হইতে অভিন্ন কার্য্যও সৎ। তন্তু (সূত্র) হইতে পট (বস্ত্র) ভিন্ন নহে। যে যে বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে

না। যাহা কারণের মধ্যে নিহিত ও গূঢ়, তাহার প্রকাশই কার্য্য—শক্য অবস্থা হইতে বাস্তব অবস্থায় পরিণতি।

সাংখ্যদর্শনের এই মত বৈশেষিক, ন্যায় ও বৌদ্ধ দর্শনের বিরোধী। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে উপাদান-কারণের মধ্যে নিহিত শক্তির সঙ্গে অন্য শক্তির সমবায়দ্বারা কারণের ধ্বংস এবং কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এই মতকে আরম্ভবাদ বলে।

সাংখ্য-মতে উপাদান ও নিমিত্ত ভেদে কারণ দ্বিবিধ। নিমিত্ত কারণের শক্তি উপাদানকে পরিবর্ত্তিত করে, এবং উপাদান তখন কার্য্যে পরিণত হয়। তিলকে তেলে পরিণত করিবার জন্য পীড়নের প্রয়োজন, ধান্যকে তণ্ডুলে পরিণত করিবার জন্য অবঘাতের প্রয়োজন।

কার্য্য কারণের মধ্যে শক্যরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, সেই শক্যতার বাস্তবতা-প্রাপ্তির বাধা অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত, কারণ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। এই বাধা-বিদূরণের জন্য নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন। কার্য্যের উদ্ভবের ফলে কারণের গুণের পরিবর্ত্তন হইলে, তাহাকে বলে ধর্ম্মপরিণাম। যখন বস্তুর শক্যতা বাস্তবে পরিণত হয়, এবং পরিবর্ত্তন কেবল তাহার বাহ্যরূপেরই হয়, তখন লক্ষণ-পরিণাম হয়। কেবল কালের গতি হইতে যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে অবস্থা-পরিণাম বলে। জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কিছুই স্থির নহে। নদীর জলধারা অনবরত বহিয়া যায়। একই স্রোতে কেহ দুইবার অবগাহন করিতে পারে না, কেননা স্রোতঃও যেমন বহিয়া যায়, অবগাহকও তেমনি পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তন-স্রোতের মধ্যে অবস্থিত মানবমন পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কার্য্য-কারণের নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারে।

সাংখ্যের এই সৎকার্য্যবাদ তাহার জগতের ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হইয়াছে। যে জগৎ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান ছিল; তাহা ও প্রকৃতি অভিন্ন। প্রকৃতির মধ্যে ছিল না, এমন কিছুর উদ্ভব হয় নাই। প্রকৃতি জগতের অতীত অবস্থা। অন্তিমে জগৎ আবার সেই অবস্থাতেই ফিরিয়া যাইবে। সাংখ্যদর্শনে কোনও পদার্থেরই আত্যন্তিক বিনাশ স্বীকৃত হয় না। "নাশঃ কারণলয়ঃ" (সাং সূ ১।১২১), অর্থাৎ নাশশব্দের অর্থ কারণে বিলীন হওয়া। যাহা অতীত হইয়াছে, তাহা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকেনা, তাহা তাহার কারণের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইহার প্রমাণ যোগিগণ এই অতীত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

যোগিগণের প্রত্যক্ষ অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ উৎপত্তি ও বিনাশ বলিয়া কিছু নাই, আছে পদার্থের ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা। যখন কার্য্য উৎপন্ন হয়, তখন তাহার কারণ অবস্থান্তর-পরিণাম প্রাপ্ত হয়। (বিজ্ঞানভিক্ষু)

বৃটিশ দার্শনিক হিউম কার্য্য ও কারণের মধ্যে কালিক পারম্পর্য্য-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পান নাই। কারণের পরে কার্য্য আবির্ভূত হয়, ইহাই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু কিরূপে হয়? কারণের মধ্যগত কোনও শক্তি কার্য্যের উৎপত্তি করে কিনা, তাহা দেখিতে পাই না। সাংখ্যকার কারণ ও কার্য্যের মধ্যে "উপাদান নিয়মের" অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন (সাং সূ ১।১১৫)। যদি পারম্পর্য্য ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ কারণ ও কার্য্যের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বাধ্য-বাধকতা থাকিত না।

৩

সাংখ্যে প্রমাণ

সাংখ্য মনন-শাস্ত্র এবং প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার দাবী। তাই প্রথমেই ইহাতে বিবিধ প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে। "প্রমা" শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান, নিশ্চিত জ্ঞান। যাহা দ্বারা প্রমা লাভ করা যায়, তাহাই প্রমাণ।

সাংখ্যশাস্ত্রে ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত—দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ, অনুমান বা যুক্তি এবং আপ্তবচন বা আগম। এই তিনটি দ্বারা সমস্ত প্রমাণ সিদ্ধ হয়। প্রমাণ হইতেই প্রমেয়-সিদ্ধি হয়।

ইন্দ্রিয়জ নিশ্চিত জ্ঞানই দৃষ্ট প্রমাণ। "ব্যাপ্য" বস্তুর জ্ঞান হইতে যে ব্যাপক বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমান প্রমাণ বলে। পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং পর্ব্বত বহ্নিমান। এই অনুমানে বহ্নি ব্যাপক, ধূম ব্যাপ্য। যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নি থাকে। বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না। কিন্তু ধূম না থাকিলেও বহ্নি থাকিতে পারে। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। এই ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের নাম ব্যাপ্তি। অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাপ্য বস্তু দৃষ্ট হইলে, তাহা হইতে ব্যাপক বস্তু অনুমিত হয়।

কিন্তু ব্যাপ্য ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, কেবল একবার মাত্র দেখিয়া সে সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। ইহা পুনঃ পুনঃ দর্শনের অপেক্ষা করে।

চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। অনুমানকে তিনি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কেননা যে ব্যাপ্যত্বের উপর অনুমান প্রতিষ্ঠিত, তাহা অসিদ্ধ। চার্ব্বাকের যুক্তি-খণ্ডনের জন্যই সাংখ্যকার বলেন, ব্যাপ্য ও ব্যাপক সম্বন্ধ তো কেবল একবারের সাহচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বহু বার সেই সম্বন্ধ প্রত্যক্ষীভূত হইলে এবং কখনও ব্যভিচার দৃষ্ট না হইলেই তবে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়। ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়ের মধ্যে যদি অব্যভিচারী ধর্ম্মসাহিত্য অর্থাৎ সহচার সম্বন্ধ থাকে—যেখানে ব্যাপ্য সেইখানেই ব্যাপক এবং যেখানে ব্যাপক সেইখানেই ব্যাপ্য—এই সম্বন্ধ যদি থাকে, অথবা ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়ের একটি যদি সর্ব্বদাই অন্যের সহচারী হয়, (শেষোক্তটি প্রথমোক্তটির নিত্য সহচারী না হইলেও) তাহা হইলেই এই সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে। ব্যাপ্তি অন্য একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। অর্থাৎ সাধ্য ও সাধন উভয়ের অতিরিক্ত কোনও তত্ত্ব নহে। স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিলে ব্যাপ্তিত্বের আশ্রয়-স্বরূপ এক স্বতন্ত্র বস্তুর কল্পনা করিতে হয়; এরূপ কল্পনার হেতু নাই।

ব্যাপ্তি যদি স্বতন্ত্র কোনও তত্ত্ব না হয়, তবে তাহার স্বরূপ কি? কোন কোনও আচার্য্য বলেন, ব্যাপ্য বস্তুর স্বকীয় শক্তি হইতে উদ্ভূত এক প্রকার বিশেষ শক্তিই ব্যাপ্তি। এই মতে ব্যাপ্তি একটি ভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু ব্যাপ্তি যদি ব্যাপ্যের স্বকীয় শক্তি হয়, তাহা হইলে যত দিন ব্যাপ্যের অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন ব্যাপ্তিরও অস্তিত্ব থাকিবে। ইহা কিন্তু সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয় না। দেশান্তরগত ধূম অগ্নির ব্যাপ্য নহে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে ধূমের উৎপত্তিকালেই তাহাতে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকে।

পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন, যে দুইটি বস্তু যখন পরস্পরের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধযুক্ত হয়, যে একটি অপরটির আধেয় এই প্রকার এক শক্তি আবির্ভূত হয়, তখন তাহাকে ব্যাপ্তি বলে। বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতিতে প্রকৃতির ব্যাপ্তি আছে, কেন না বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি প্রকৃতির আধেয়। ইহার প্রতিবাদে কেহ কেহ বলেন, আধেয়-শক্তি নামক এক শক্তি-কল্পনার প্রয়োজন কি? ব্যাপ্তিকে ব্যাপ্যের স্বরূপশক্তি বলিলেই হয়। কিন্তু স্বরূপশক্তি বলা যায় না, বলিলে পুনরুক্তি দোষ হয়। প্রথমতঃ এই শক্তি যদি ব্যাপ্যের স্বরূপগত হয়, তাহা হইলে অপরের সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হউক বা না হউক, তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইবে। সুতরাং সম্বন্ধপাত করিয়া প্রকাশিত হয়, ইহা বলা পুনরুক্তিমাত্র। দ্বিতীয়তঃ যদি আধেয় ভাব বস্তুর স্বরূপগতই হয়, তবে এক বার মাত্র ধূমের দর্শনেই অগ্নিজ্ঞান হওয়া উচিত, অনুমানের

নিমিত্ত মহানস প্রভৃতি স্থলে পূর্ব্বে ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধ-প্রত্যক্ষের কোনও প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমানেও কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না, এবং প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানকে একটি প্রমাণ বলা পুনরুক্তিমাত্রে পরিণত হয়। তাহা হইলে বস্তুর ব্যাপ্য-ব্যাপক বিশেষণেরও কোন সার্থকতা থাকে না। বিশেষণ যদি বস্তুর স্বরূপগত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রয়োগ নিরর্থক।

পল্লব বৃক্ষের আধেয়। এই আধেয়তা যদি পল্লবের স্বরূপশক্তি হইত, তাহা হইলে বৃক্ষ হইতে পল্লব যখন ছিন্ন হয়, তখনও তাহাতে এই শক্তি থাকিত। কিন্তু ছিন্ন পল্লবে বৃক্ষের সহিত আধেয় ভাব থাকে না। বস্তুতঃ আধেয় শক্তি ও নিজশক্তি উভয়ের অর্থ একই। যে যুক্তিতে আধেয় শক্তি সিদ্ধ হয়, তদ্বারা নিজশক্তিও সিদ্ধ হয়।

অনুমান ত্রিবিধ। লিঙ্গ বা হেতুর জ্ঞান হইতে যে লিঙ্গী অর্থাৎ হেতুমৎ বিষয়ের জ্ঞান, তাহাই অনুমান প্রমাণ। ত্রিবিধ অনুমানের নাম—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট। আপ্তশ্রুত আপ্তবচন বা আগম। আপ্ত পুরুষ অর্থাৎ ছল, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি দোষে যিনি দূষিত নহেন, তাঁহার নিকট যাহা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় জ্ঞান হয়, তাহাই আপ্তবচন।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়; অন্তরিন্দ্রিয় মন। এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ বা দৃষ্ট প্রমাণ। মানসিক ব্যাপার সকল অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয়।

ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যাহা বর্ত্তমান নাই, যুক্তিদ্বারা তাহার জ্ঞানলাভ করা যায়। যুক্তিই অনুমান প্রমাণ। পূর্ব্ব দৃষ্ট বিষয়-সম্বন্ধে যে অনুমান, তাহা পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্ব-যুক্ত)। যেখানেই পূর্ব্বে ধূম দেখা গিয়াছে, সেখানেই অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়াছে। সুতরাং পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তথায় বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান। এখানে অনুমান পূর্ব্বগত অভিজ্ঞতার সহিত সংযুক্ত এবং অগ্নি অপ্রত্যক্ষ হইলেও, প্রত্যক্ষ ধূম হইতে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ধূম ও অগ্নি অভিজ্ঞতার মধ্যে সহভাবী। আবার আকাশে কৃষ্ণ মেঘ দেখা গেলে সম্ভাব্য বৃষ্টি অনুমান করা যায়। এখানেও কৃষ্ণ মেঘ ও বৃষ্টি অভিজ্ঞতার মধ্যে সহভাবী।

দুইটি বস্তু যদি অসহভাবী হয়, অর্থাৎ কখনও একসঙ্গে অবস্থান করিতে পারে না এরূপ হয়, যেখানে একটি থাকে, অন্যটি সেখানে থাকে না এবং যেখানে একটি থাকে না, সেখানে অন্যটি থাকে, তাহা হইলে একটির অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব হইতে যে অনুমান করা যায়, সেই অনুমানকে শেষবৎ (শেষ

অর্থাৎ নিষেধযুক্ত) অনুমান বলে। ইহা ব্যতিরেকমুখী যুক্তি। গন্ধ ক্ষিতির একটা গুণ। যেখানে গন্ধ সেখানেই ক্ষিতি। সুতরাং কোনও বস্তুর মধ্যে (যেমন জলের মধ্যে) যদি গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সে বস্তু ক্ষিতি নহে, এই অনুমান শেষবৎ। যে বস্তুর যে যে গুণ আছে, তাহাদিগের হইতে ভিন্ন অবশিষ্ট গুণ তাহার নাই, এই অনুমানও শেষবৎ (এখানে শেষ = অবশিষ্ট)। কোনও বস্তুতে বর্ত্তমান গুণ ভিন্ন অন্য গুণ তাহাতে নিষিদ্ধ। যেমন গন্ধ ক্ষিতির গুণ। এক খণ্ড মৃত্তিকার মধ্যে যে রূপ, রস, শব্দ ও স্পর্শ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ক্ষিতির গুণ নহে। সুতরাং সেই মৃত্তিকার সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত আছে। এই প্রকার অনুমানও শেষবৎ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—বৈশেষিক মতে এই ছয়টি পদার্থ। শব্দ কোন্ পদার্থ স্থির করিতে হইলে, শব্দ দ্রব্য নহে, কর্ম্ম নহে, সামান্য নহে, বিশেষ নহে, সমবায় নহে, ইহা প্রমাণ করিয়া অবশিষ্ট যে গুণ পদার্থ থাকে, তাহাই শব্দ, এইরূপ সিদ্ধান্ত 'শেষবৎ'।

(সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান দৃষ্ট হইতে অদৃষ্ট বস্তুর অনুমান। দৃষ্ট বস্তু-সম্বন্ধীয় ব্যাপ্তি জ্ঞান-অবলম্বনে, অদৃষ্ট তজ্জাতীয় বা তৎসদৃশ জাত্যন্তরীয় বস্তুবিষয়ে যে অনুমান হয়, তাহাকে "সামান্যতো দৃষ্ট" অনুমান বলে। যেমন কর্ত্তা কোন করণ ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না। করণ-সাহায্যেই কর্ত্তা কর্ম্ম সম্পাদন করেন, ইহা সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয়। পরন্তু দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতিও কার্য্য। অতএব এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা পুরুষেরও এমন করণ আছে, যদ্বারা তিনি দর্শন, শ্রবণাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। ইন্দ্রিয়সকলের অস্তিত্ব এইরূপে সাধিত হইলে, ইহা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয়।) এইরূপে রূপ, রস প্রভৃতি গুণ ঘটাদি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিও গুণ। অতএব ইহাদেরও আশ্রয়স্বরূপ আত্মা আছেন। এইটিও সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের দৃষ্টান্ত। দুইটি বস্তু একজাতীয় বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে, তন্মধ্যে একটির কোনও একটি বিশেষ অব্যভিচারী অবস্থা দৃষ্ট হইলে, ঐ অবস্থা সজাতীয় অপর বস্তুরও আছে এই অনুমান হয়। ইহাই সাধারণতঃ সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের স্বরূপ। এক বস্তু এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া তৎপরে দেশান্তরে দৃষ্ট হইলে, তাহার গমন-কার্য্য দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহাকে গতিশীল বলিয়া অনুমান করা যায়, যেমন দেশ হইতে দেশান্তর-প্রাপ্তি হেতু সূর্য্যের গতি অনুমিত হয়। এই প্রকার যে অনুমান, তাহাকেও একপ্রকার সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলিয়া

ন্যায়দর্শন-ভাষ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে কার্য্য হইতে কারণের অনুমান, অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থে অনুমান—"শেষবৎ অনুমান"।

আপ্তবচন বা শব্দ প্রমাণ

দর্শন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে প্রত্যাদেশ অথবা আপ্তবচনের স্থান নাই। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে আপ্তবচন প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। এই আপ্তবচনকে "শব্দও" বলা হইয়াছে। ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষশূন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক উপদেশের নাম "শব্দ প্রমাণ"।

শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ। অর্থ বাচ্য, তাহা ব্যক্ত হয় শব্দদ্বারা, শব্দ বাচক। তিন প্রকারে এই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। প্রথমতঃ—আপ্তোপদেশ। কোনও অভ্রান্ত পুরুষ একটি বস্তু দেখাইয়া বলিলেম "ইহার নাম ঘট"। তখন "ঘট" শব্দের বাচ্য যে ঐ বস্তু, তাহা বোঝা গেল। দ্বিতীয়তঃ—বৃদ্ধ ব্যবহার। যে ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতেও এই জ্ঞান হয়। যখন একজন বলিল, "গোরু আনয়ন কর," এবং অন্য একজন একটি চতুষ্পদ লাঙ্গুল-বিশিষ্ট জন্তু আনিয়া উপস্থাপিত করিল, তখন ঐ চতুষ্পদ লাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তুটিই যে "গোরু", সেখানে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির সেই জ্ঞান জন্মে। তৃতীয়তঃ—প্রসিদ্ধপদসামানাধিকরণ্য। একজন বলিল "বালকটি আম খাইতেছে।" উপস্থিত অন্য একটি বালক "বালক" শব্দের ও "খাইতেছে" শব্দের অর্থ জানিলেও "আম" কখনও দেখে নাই বলিয়া "আম" শব্দের অর্থ জানে না। না জানিলেও "বালকটি আম খাইতেছে" এই বাক্যের শব্দগুলির সমন্বয় করিয়া বুঝিল, বালকটি যাহা খাইতেছে, তাহারই নাম "আম"। এই ত্রিবিধ উপায়ে শব্দ ও অর্থের জ্ঞান জন্মে।

বেদ শব্দরাশির সমষ্টি। বৈদিক বাক্যসকল কেবল কর্ম্মে নিয়োগের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয় নাই। বৈদিক সকল বাক্যেই আদেশ নাই এবং বৈদিক বাক্য কেবল কার্য্যবোধক নহে। বৈদিক বাক্যে কার্য্য ও সিদ্ধ পদার্থ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দের লৌকিক ব্যবহারে ব্যুৎপন্ন লোকের লৌকিক ব্যবহার অনুসারেই বেদার্থের প্রতীতি হয়।

কিন্তু বেদ যদি অপৌরুষেয় হয় অর্থাৎ কোনও পুরুষকর্ত্তৃক রচিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে লৌকিক শব্দের অর্থগ্রহণের যে ত্রিবিধ উপায়ের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা কি বেদ-সম্বন্ধে খাটে? বেদে বর্ণিত দেবতা, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি সকলই তো অতীন্দ্রিয়। এরূপ স্থলে লৌকিক ব্যবহারদ্বারা বেদার্থ-জ্ঞান হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার

বলিতেছেন, এ যুক্তি ঠিক নয়। কেননা বেদোক্ত বিষয় অতীন্দ্রিয় নহে। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগাদিরূপ যে যজ্ঞদানাদিকর্ম্ম, তাহারা প্রকৃষ্ট ফল দান করে বলিয়াই তাহারা স্বরূপতঃ ধর্ম্ম। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অতীন্দ্রিয় বলা যায় না। দেবতা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও সামান্য রূপে প্রতীতি হইতে পারে।

যদিও বেদ অপৌরুষেয়, তথাপি অর্থবিষয়ে বেদবাক্যের এক স্বাভাবিক শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই বৃদ্ধপরম্পরাক্রমে তাহাদের অর্থ গৃহীত হয় এবং প্রত্যেক শব্দের অর্থ অন্য শব্দের অর্থ হইতে বিভিন্ন বলিয়া শিষ্যদিগকে উপদিষ্ট হয়। বেদবাক্যের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি উপদেশ পরম্পরায়-ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বরূপার্থ প্রকাশ করে।

বেদোক্ত বিষয়ের অতীন্দ্রিয়ত্ব-সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে প্রত্যক্ষের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়বিধ পদার্থের জ্ঞানই বাক্য-দ্বারা সিদ্ধ হয়। দেবতা-দিগের সাধারণ ধর্ম্মদ্বারা তাঁহারা জ্ঞানগম্য হইতে পারেন।

বেদ নিত্য নহে। কেননা তাহার উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে আছে। শ্রুতিতে আছে, "স তপঃ অতপ্যত, তস্মাৎ ত্রয়ো বেদাঃ অজায়ত।"—(তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যা হইতে তিন বেদের জন্ম হইয়াছিল।)

কিন্তু নিত্য না হইলেও বেদ পৌরুষেয় নহে। কেননা বেদের কর্ত্তা কোনও পুরুষ নাই ও হওয়া সম্ভবপর নহে। মুক্তই হউন আর অমুক্তই হউন, কোনও পুরুষই বেদের কর্ত্তা হইতে পারেন না। জীবন্মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ বটেন, কিন্তু তিনি বীতরাগ বলিয়া এই কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে না। অমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বেদরচনা তো সম্ভবপরই নহে। অঙ্কুরাদি কোনও পুরুষদ্বারা উৎপন্ন না হইলেও, তাহারা যেমন নিত্য নহে, বেদও সেইরূপ নিত্য নহে। অঙ্কুরাদিতে পুরুষত্বের আরোপ করিলে অর্থাৎ তাহারা পুরুষকর্তৃক সৃষ্ট বলিলে, তাহাতে প্রত্যক্ষের বাধা হয়, কেননা বীজ হইতে স্বভাবতঃই অঙ্কুরোদ্ভব হইতে দেখা যায়। কোন পুরুষকে অঙ্কুরোৎপাদন করিতে দেখা যায় না। কোনও বস্তুর কর্ত্তা অদৃষ্ট হইলেও, সেই বস্তু কোনও কর্ত্তাকর্তৃক বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে, এই জ্ঞান যদি হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুকে পৌরুষেয় বলা যায়। সুতরাং কোনও বস্তুকে যদি পৌরুষেয় বলিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হওয়া চাই। সুতরাং কেবল কোনও পুরুষকর্তৃক উচ্চারিত হইয়া থাকিলেই কোনও বস্তুকে পৌরুষেয় বলা যায় না। বেদ বুদ্ধিপূর্ব্বক উৎপন্ন নহে। ইহা নিঃশ্বাসের ন্যায় অদৃষ্টবশতঃ স্বয়ম্ভু হইতে স্বয়ং আবির্ভূত

হইয়াছে। ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক, সুতরাং অপৌরুষেয়। শ্রুতিতে আছে "তস্য এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ, যৎ ঋগ্বেদ ইত্যাদি।" বেদের এমন স্বাভাবিক শক্তি আছে, যাহাদ্বারা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঐ শক্তি মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্যই নিখিল বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য।

শব্দ অনিত্য

স্বয়ম্ভু হইতে নির্গত হইলেও বেদ নিত্য নহে। শব্দও নিত্য নহে। কেননা শব্দ যে উৎপত্তিশীল, তাহা প্রত্যক্ষ হয়। বর্ণও নিত্য নহে। 'গ'বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া ইহা 'গ'বর্ণ বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সত্য, কিন্তু এই প্রত্যভিজ্ঞা হইতে বর্ণের নিত্যত্ব-অনুমান সঙ্গত হয় না। 'গ'-ধ্বনি তাহার উচ্চারণের সঙ্গে উৎপন্ন হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ। প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারা সজাতীয়ত্বেরই উপলব্ধি হয়, অভিন্নতা উপলব্ধ হয় না। 'গ'-ধ্বনি শুনিয়া পূর্ব্বে যে 'গ'-ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল, এই ধ্বনি তাহার সজাতীয়, এই মাত্র উপলব্ধি হয়। যদি বলা যায় পূর্ব্বশ্রুত 'গ'-ধ্বনির সহিত বর্ত্তমানে শ্রুত 'গ'-ধ্বনির অভিন্নতা উপলব্ধ হয় এবং ইহা দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে "এই সেই ঘট" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা ঘটাদি পদার্থেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়।

স্ফোট

শব্দ স্ফোটাত্মক নহে। 'কলস' শব্দে তিনটি বর্ণ আছে। এই তিন বর্ণের সংযোগের দ্বারা গঠিত শব্দের অতিরিক্ত 'কলস'-রূপ অখণ্ড একটি শব্দের অস্তিত্ব আছে, ইহা কেহ কেহ বলেন। এতাদৃশ অখণ্ড শব্দকে স্ফোট বলে। ক, ল, স এই তিন বর্ণের প্রত্যেকের অর্থোৎপাদিকা শক্তি নাই। ইহারা একসঙ্গে উচ্চারিত হইতে পারে না, পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারিত হয়। সুতরাং ইহাদের মিলনও অসম্ভব। সুতরাং যে "কলস" শব্দ অর্থবোধ জন্মায়, ঐ বর্ণদিগের হইতে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, ইহাই কাহারও কাহারও মত। কিন্তু শব্দের বর্ণদিগের অতিরিক্ত ও তাহা হইতে পৃথক্ "স্ফোটের" অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, যেমন ঘটের বিভিন্ন অবয়ব হইতে পৃথক কোনও ঘটের অস্তিত্ব নাই। কারণ ক, ল ও স এই তিনটি বর্ণ অর্থব্যঞ্জক "কলস" শব্দের অঙ্গীভূত রূপে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু প্রত্যেক বর্ণ হইতে পৃথক রূপে অস্তিত্ববান্ কোনও স্ফোটের প্রতীতি হয় না।

স্ফোট-সম্বন্ধে মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বিস্তৃত আলোচনা আছে। তিনি বলেন পাণিনি তাঁহার শব্দানুশাসনে যে "শব্দে"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ব্রহ্ম। যে সনাতন 'শব্দ' স্ফোট নামে অভিহিত, (পাণিনির

ব্যাকরণে কিন্তু স্ফোট শব্দ পাওয়া যায় না), যাহা নিষ্কল (অংশহীন), তাহাই জগতের কারণ, তাহাই ব্রহ্ম। ভর্তৃহরির ব্রহ্মকাণ্ড হইতে মাধব নিম্নলিখিত শ্লোক স্বীয় মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দ-তত্ত্বম্ যদক্ষরং।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যথা॥

আদি ও অন্তহীন ব্রহ্মই সনাতন শব্দতত্ত্ব এবং এই শব্দতত্ত্বরূপী ব্রহ্মই বস্তুরূপে পরিণত হন, তাহা হইতেই জগতের অভিব্যক্তি হয়। মাধব বলেন, স্ফোটাখ্য নিরবয়ব নিত্য শব্দ ব্রহ্মই। নবপ্লেটনিক দর্শনের Logos এর সহিত স্ফোটের যে সাদৃশ্য আছে, তাহা সুস্পষ্ট।

সাংখ্য স্ফোটের প্রতীতি হয় না বলিয়াছেন। কিন্তু মাধব বলেন, স্ফোটের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়। "গো"শব্দ উচ্চারিত হইলে শ্রোতা এই শব্দকে তাহার মধ্যগত বর্ণদ্বয় হইতে ভিন্ন বলিয়াই উপলব্ধি করেন। যদি বলা হয় যে শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে এই সকল বর্ণ মিলিত-ভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানোৎপাদন করে এই প্রশ্ন উঠে। বর্ণদিগের মিলন তো অসম্ভব, কেননা প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারিত হইবামাত্রই অন্তর্হিত হয়, পরে উচ্চারিত বর্ণ কাহার সঙ্গে মিলিত হইবে? স্বতন্ত্র ভাবেও তাহারা জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারে না। কেননা শব্দের অন্তর্ভুক্ত কোনও বর্ণই সেই শব্দের অর্থ-বোধ জন্মাইতে সক্ষম নহে। বর্ণগুলি মিলিত অথবা পৃথক অবস্থায় যখন অর্থবোধ জন্মাইতে অক্ষম, তখন অর্থবোধ জন্মাইতে অন্য কিছুর অস্তিত্বের প্রয়োজন। ইহাই স্ফোট। যদিও বর্ণদিগের দ্বারাই স্ফোট প্রকাশিত হয়, তথাপি তাহা বর্ণদিগের হইতে ভিন্ন।

কিন্তু শব্দের সহিত তাহার অর্থের সম্বন্ধ যে ব্যবহার হইতে উদ্ভূত (conventional), পাণিনি তাহা বলিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে একই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে বহু শব্দের সহিত প্রত্যেক অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টিদ্বারা প্রমাণিত হয়, যে অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ মানুষ-সৃষ্ট ও ব্যবহার-জাত।

শব্দের নিত্যত্ববাদিগণ বলেন, অন্ধকারে অবস্থিত ঘট যেমন দীপালোকদ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র, দীপালোককর্তৃক ঘট উৎপন্ন হয় না, তেমনি শব্দ ধ্বনিদ্বারা

প্রকাশিত হয় মাত্র, তৎদ্বারা উৎপন্ন হয় না। শব্দ পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ প্রকাশের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ও নিত্য।

ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেন, সৎকার্য্যবাদ অনুসারে সকল কার্য্যই তো তাহার কারণের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। এই অর্থে যাবতীয় কার্য্যবস্তুই নিত্য। অসতের উৎপাদন অসম্ভব। এই অর্থে শব্দের প্রকাশের পূর্ব্বেও শব্দ বর্ত্তমান। সকল বস্তুই এই অর্থে নিত্য। সুতরাং শব্দের নিত্যত্বের মধ্যে বিশেষত্ব নাই। যাহা অবিসংবাদিত, তাহা সাধন করাকে "সিদ্ধসাধন" বলে। শব্দের নিত্যত্ব-সিদ্ধান্ত সুতরাং সিদ্ধসাধন মাত্র।

সাংখ্যের আপ্তবচন শ্রুতি বা বেদ। ইহাই শব্দ-প্রমাণ। বেদ অপৌরুষেয় হইলেও অনিত্য। সাংখ্য মতে শব্দ-প্রমাণের স্থান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপরে, কেন না বেদ স্বতঃপ্রমাণ (সাং সূ—৫।৫১), কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমানে ভ্রম সম্ভবপর। সাংখ্যের দার্শনিক মত বিবেচনা করিলে তাহার বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। মনে হইতে পারে যে এই স্বীকৃতি আন্তরিক নহে। কিন্তু ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। বহু স্থলে সাংখ্য সূত্রে শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত-স্থাপনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে ন্যায় ও শ্রুতি উভয়েরই উল্লেখ আছে—(১।৩৬)। সূত্রকার যে শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, ১।১৪৭ সূত্রে তাহার প্রমাণ আছে। এই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন শ্রুতিসিদ্ধ বিষয়ের অপলাপ কখনও দৃষ্ট হয় নাই (প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়)। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চভূত হইতে উদ্ভূত। এই মতের খণ্ডনের জন্য সূত্রকার শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। ১।৭৩, ১।৮৩, ১।১৫৪, ২।২২, ৩।১৫, ৩।৮০, ৪।২২ সূত্রে শ্রুতি প্রমাণস্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সাংখ্য অবশ্য স্বীয় মতানুসারেই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মাক্ষমূলার বলিয়াছেন, যে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও সাংখ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের বিরোধী। সাংখ্যোক্ত ত্রিবিধ বন্ধের মধ্যে দাক্ষিণাবন্ধ একটি। মাক্ষমূলার দক্ষিণাবন্ধের অর্থ বুঝিয়াছেন—ব্রাহ্মণদিগকে দান হইতে যে বন্ধের উদ্ভব হয়, সেই বন্ধ। এই অর্থ সঙ্গত কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে "ইষ্টাপূর্ত্তেন দাক্ষিণকঃ। পুরুষ-তত্ত্বানভিজ্ঞঃ হি ইষ্টাপূর্ত্তচারী, কামোপহতমনা বধ্যতে ইতি।" ইষ্টাপূর্ত্ত হইতে দাক্ষিণ বন্ধের উৎপত্তি হয়। যিনি পুরুষতত্ত্ব অবগত নহেন, তিনিই

ইষ্টাপূর্ত্তচারী ও কামোপহত-মনা হইয়া বন্ধপ্রাপ্ত হন। বৈদিক যাগযজ্ঞের ফলকে বিনশ্বর বলিলেও, তাহার কোনও মূল্য নাই এবং তাহা অজ্ঞতা-প্রসূত, একথা সাংখ্য বলেন নাই। ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধেও কোন কথা সাংখ্যদর্শনে নাই। দক্ষিণা বন্ধের অর্থ যদি যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রদত্ত দক্ষিণা হইতে উদ্ভূত বন্ধই হয়, তাহা হইলেও সে বন্ধ দক্ষিণাগ্রাহক ব্রাহ্মণেরই, দক্ষিণাদাতার নহে। সুতরাং তাহাদ্বারা দক্ষিণাদান নিন্দিত হয় নাই। দক্ষিণাজীবী ব্রাহ্মণেরও বন্ধ হয়, ইহাই বলা সাংখ্যের উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিশেষ বিদ্বেষ সূচিত হয় না।

৪

প্রকৃতি

দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য জগতের ব্যাখ্যা করা। ত্রিবিধ প্রমাণের বর্ণনা করিয়া সাংখ্য জগতের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাংখ্য মতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে প্রকৃতি হইতে। ইংরেজী Nature শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সাংখ্যের প্রকৃতি তাহা নহে। এই প্রকৃতি কি? সাংখ্যদর্শনের মতে জগৎ কেহ সৃষ্টি করে নাই; জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে এক অব্যক্ত উৎস হইতে। সেই উৎসের নাম প্রকৃতি, প্রধান বা অব্যক্ত। যাহা ব্যক্ত নহে, মানুষের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত নহে, তাহাই অব্যক্ত। প্রকাশিত না হইলেও তাহার অস্তিত্ব অনুমানগম্য। প্রকৃতি শব্দের অর্থ যাহা বিশিষ্ট প্রকারে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়। জগৎ-রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়া জগতের উৎসের নাম প্রকৃতি। 'প্রধান' শব্দের অর্থ যাহাকর্ত্তৃক জগৎ যথাযথ স্থাপিত হয়। এই প্রকৃতি অন্য কিছুর কার্য্য নহে, ইহার কোনও কারণ নাই, কোনও মূল নাই, ইহা অমূল।" মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং"—সাংখ্য সূত্র ১।৬৭।

ইহা নিত্য ও স্বয়ম্ভূ (causa sui)—নিজেই নিজের কারণ, অনাদি। এই জন্য ইহাকে মূল প্রকৃতি বলে। অব্যক্ত হইলেও ইহার অস্তিত্ব যে আছে, যুক্তিদ্বারা তাহা জানা যায়। অতি দূরে বা অতি নিকটে অবস্থিত ও অতি সূক্ষ্ম বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। কোনও বস্তু ও দ্রষ্টার মধ্যে দৃষ্টির ব্যাঘাতক কিছু যদি থাকে (যেমন প্রাচীরাদি), তাহা হইলে সে বস্তুও দর্শনগোচর হয় না। ইন্দ্রিয়-বিকলতা ও অন্যমনস্কতাবশতঃ বস্তুর জ্ঞান হয় না। যখন এক বস্তুকর্ত্তৃক অন্য বস্তু অভিভূত হয় (যেমন তারকাদিগের

জ্যোতিঃ সূর্য্যকিরণকর্ত্তৃক অভিভূত হয়) তখনও অভিভূত বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। আবার সমানাভিহার হইলে, অর্থাৎ একপ্রকার বহু বস্তু একত্র মিশ্রিত হইলে, জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়; কেননা এইরূপ মিশ্রিত দ্রব্যাদিগের মধ্যে কোনও একটিকে ধরিতে পারা যায় না। প্রকৃতি অতি সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না। প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই বলিয়া যে তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা নহে। তাহার কার্য্য হইতে তাহার উপলব্ধি হয়। মহৎ প্রভৃতি (পরে ব্যাখ্যাত) প্রকৃতিরই কার্য্য। তাহারা প্রকৃতির সরূপও বটে, বিরূপও বটে।

নিম্নলিখিত যুক্তিদ্বারা সাংখ্য প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন :—

(১) এই জগৎ কার্য্য (অর্থাৎ কারণ হইতে উদ্ভূত)। কার্য্য কারণের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে থাকে। সুতরাং জগৎরূপ কার্য্য তাহার কারণের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান ছিল। জগৎ যদি সূক্ষ্মভাবে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহার উদ্ভব সম্ভবপর হইত না। কেননা যাহা নাই, তাহা অসৎ। অসৎ জগৎকে 'সৎ' করা, অর্থাৎ তাহাকে অস্তিত্ব দান করা, সম্ভবপর হইত না। জগতের সূক্ষ্ম কারণই প্রকৃতি।

(২) উপাদান ব্যতীত কার্য্য হয় না। সৎ উপাদান হইতেই কার্য্য সম্ভবপর। সুতরাং যে উপাদান হইতে জগৎ উদ্ভূত, তাহা জগতের উদ্ভবের পূর্ব্বে ছিল। তাহাই প্রকৃতি।

(৩) যদি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারিত, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ বস্তুর উদ্ভবই সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং জগতের উদ্ভব হইয়াছে তাহার উদ্ভবের পূর্ব্বে বর্ত্তমান কোনও বস্তু হইতে। সেই বস্তুই প্রকৃতি।

(৪) যাহা শক্য, তাহার উৎপাদনে যাহা সমর্থ, তাহা হইতেই তাহার উৎপত্তি হয়। সুতরাং জগতের উৎপাদনে যাহা সমর্থ ছিল, তাহা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতিই জগৎ-উৎপাদনে সমর্থ বস্তু।

(৫) কার্য্যের স্বরূপ তাহার কারণ হইতে অভিন্ন। জগৎরূপ কার্য্য সৎ, তাহার কারণ প্রকৃতিও সৎ।

(৬) জগতে বহু বস্তু আছে। তাহারা ভেদযুক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন। এই সকল বিভিন্ন বস্তু পরিমিত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ। এই সকল পরিমিত বস্তু এক অপরিমিত কারণ হইতেই উদ্ভূত হইতে পারে। সেই কারণই প্রকৃতি। আবার জাগতিক বস্তুসকল পরস্পর হইতে ভিন্ন হইলেও কয়েকটি বিষয়ে

তাহাদের মধ্যে সমতা আছে (সকলই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণবিশিষ্ট)। এই সমন্বয় হইতে তাহারা যে এক মূল কারণ হইতে উদ্ভূত, তাহা অনুমিত হয়। তৃতীয়তঃ প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয় শক্তি হইতে। সুতরাং এই অসংখ্য-বস্তুসমন্বিত জগৎ এক অপরিমেয় শক্তি হইতে উদ্ভূত, ইহাও অনুমান করা যায়। চতুর্থতঃ কার্য্য ও তাহার কারণের মধ্যে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্য-বস্তু কারণ হইতে বিভক্ত হইয়া পৃথক রূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই জগৎ-রূপ কার্য্য তাহার উৎপাদনে সমর্থ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়। পরিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কার্য্যবস্তু কারণবস্তুর সহিত অবিভক্তভাবে মিলিত হইয়া লয়-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে সমগ্র বিশ্বের এক অব্যক্ত কারণ আছে, যাহা হইতে জগৎ ব্যক্ত হয়, এবং পরিণামে যাহাতে লীন হইয়া অবিভক্ত ভাবে তন্মধ্যে অবস্থিতি করে। সেই অব্যক্ত কারণই প্রকৃতি।

জাগতিক সকল ব্যক্ত পদার্থই হেতুমৎ অর্থাৎ কারণ হইতে উদ্ভূত। তাহারা অনিত্য, অব্যাপী অর্থাৎ পরিমিত স্থানব্যাপী, সদাক্রিয়াশীল, অনেক অর্থাৎ বহুসংখ্যক, স্বকীয় কারণের আশ্রিত ও তাহার চিহ্ন, সাবয়ব অর্থাৎ দেশ অথবা কালব্যাপী অঙ্গযুক্ত এবং পরতন্ত্র অর্থাৎ অন্যের অধীন। অব্যক্ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার কোনও কারণ নাই, তাহা নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, এক, অনাশ্রিত, কারণহীন, নিরবয়ব ও স্বতন্ত্র। ইহা প্রকৃতির নেতিবাচক বর্ণনা। পাতঞ্জল দর্শনের ২।১৯ সূত্রের ভাষ্যে তাহাকে "নিঃসত্তাসত্তং, নিঃসদসৎ, নিরসৎ, অব্যক্তং, অলিঙ্গং" বলা হইয়াছে। যাহার সত্তাও নাই, অসত্তাও নাই, তাহাই নিঃসত্ত-সত্তা। যাহা সৎও নহে অসৎও নহে, তাহা নিঃসদসৎ। যাহা অসৎ নহে, তাহাই নিরসৎ। তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত, এবং তাহা অলিঙ্গ অর্থাৎ তাহা কাহারও লিঙ্গ অর্থাৎ কার্য্যরূপ চিহ্ন নহে। প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থায় একটি উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে উদ্দেশ্য হইতেছে পুরুষের অর্থসাধন। অব্যক্ত অবস্থাও পুরুষার্থসাধক হইলেও, সে অবস্থায় প্রকৃতির কোন কার্য্যই থাকে না। কোন কার্য্য থাকে না বলিয়া তাহা নিঃসত্তা, কিন্তু তাহা অভাব পদার্থ নহে। তাই নিঃসত্তা-সত্ত ও নিঃসদসৎ। তাহা যে অস্তিত্ববিহীন নহে, তাহাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য আবার তাহাকে নিরসৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদ্বারা প্রকৃতির স্বরূপ বোঝা যায় না। সাংখ্য প্রবচন সূত্রে আছে "সত্ত্ব-রজ-স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" (সাং সূ-১৷৬১)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি।

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী কিন্তু প্রলয়াবস্থায়—জগতের উদ্‌ভবের পূর্ব্বে ও জগতের লয়ের পরে—এই তিনগুণের কোনও কার্য্য থাকে না। তখন তাহারা পরস্পরের কার্য্যের প্রতিরোধ করে মাত্র। তখন তাহাদের অন্যূন ও অনতিরিক্ত অবস্থা ; তখন তাহারা কেহ ন্যূন, কেহ অধিক হইয়া পরস্পর সংহত থাকে না, এবং তাহাদের কোনও কার্য্য হয় না। * সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বলিতে কি বুঝায়, এবং তাহাদের সাম্যাবস্থাই বা কাহাকে বলে এখন আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি না হইলে প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয় না। কেন এই বিচ্যুতি হয়, তাহারও আমরা অনুসন্ধান করিব।

ত্রিগুণ

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইলে তাহা হইতে যে সকল পদার্থ উদ্‌ভূত হয়, তাহারা সকলই এই তিন গুণান্বিত প্রকৃতির বিকার। গুণ শব্দের অর্থ কি? বৈশেষিক দর্শনের মতে সপ্ত পদার্থের মধ্যে গুণ একটি পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থ। ইহাদের মধ্যে গুণ দ্রব্যাশ্রিত। দ্রব্য হইতে বিচ্যুত গুণের অস্তিত্ব নাই। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কি এইরূপ গুণ? জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই তিন গুণ বর্ত্তমান। এই সকল বস্তু ও প্রকৃতি কি গুণদিগের আশ্রয় স্থান? বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বৈশেষিক দর্শনের গুণ নহে, কেননা তাহাদের সংযোগ ও বিভাগ আছে। লঘুত্ব, চলত্ব, ও গুরুত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মও আছে। এই শাস্ত্রে এবং শ্রুতি প্রভৃতিতে 'গুণ' শব্দ পুরুষের উপকরণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরুষরূপ পশুর বন্ধক ত্রিগুণাত্মক মহদাদি রজ্জু-নির্ম্মাতা অর্থে গুণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।" বিজ্ঞান ভিক্ষুর এই অর্থই যে ঠিক, তাহা গুণদিগের বিভিন্ন ধর্ম্মের বর্ণনা হইতেই উপলব্ধ হয়। "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্, চলম্ অবষ্টম্ভকঞ্চ রজঃ, গুরু বরণকমেব তমঃ"। এই সূত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর বিভিন্ন গুণ বর্ণিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ যদি বৈশেষিক গুণ হইত, তাহা হইলে তাহাদের আবার গুণের বর্ণনা সম্ভবপর হইত না। গুণের আবার গুণ কি? সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্রব্য (Subtle Substance)। কিন্তু তাহারা এক একটি মাত্র নহে। সত্ত্ব একটি মাত্র দ্রব্য নহে, রজঃ একটি

---

* "আসীৎ ইদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণম্ অপ্রতর্ক্যং অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।" মনু সংহিতায় বর্ণিত এই অবস্থাই প্রকৃতির অবস্থা।

দ্রব্য নহে, তমঃও একটি নহে। অসংখ্য সত্ত্ব, অসংখ্য রজঃ ও অসংখ্য তমঃ আছে।* সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শ্রেণীর দ্রব্যের সাধারণ নাম। এই তিন শ্রেণীর অসংখ্য বস্তুর সমবায় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, যখন তাহাদিগের দ্বারা কোনও কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তখন সেই সাম্যাবস্থাপন্ন সমবায়কে বলে প্রকৃতি। এই সাম্যাবস্থা প্রলয়ের অবস্থা। তাহার সহিত আমাদের পরিচয় নাই। যে তিন গুণের অবিরাম ক্রিয়া হইতে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের নিষ্ক্রিয় অবস্থার জ্ঞান আমাদের নাই। কিরূপে সেই নিষ্ক্রিয় অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু সাম্যাবস্থায় সত্ত্বদিগের, রজঃদিগের ও তমঃদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। তাহাদের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম হইতে তাহারা বিচ্যুত হয় না। তাহাদের পরস্পরের শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই তাহাদের কোনও ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। এই পারস্পরিক প্রতিরোধের প্রণালী কি, তাহা আমরা অবগত নহি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত অবলম্বন করিয়া আমরা এক প্রলয়াবস্থার বা সাম্যাবস্থার কল্পনা করিতে পারি। জগতের উপাদান পরমাণু। প্রোটন ও ইলেকট্রণ রূপ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তাড়িতকণার সমবায়ে পরমাণু গঠিত। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে প্রোটন সংখ্যা ও ইলেকট্রণ সংখ্যা সমান। অনেক পরমাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তাহাদের প্রোটন ও ইলেকট্রণগণ তেজঃরূপে বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে (Radiations)। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন সূর্য্যের মধ্যে পরমাণুগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার ফলেই তাহা হইতে তেজ বিকীর্ণ হইতেছে। কল্পনা করা যাইতে পারে এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের যাবতীয় পরমাণু এইভাবে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের প্রোটন ও ইলেকট্রণগণ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া নির্বিশেষ প্রৈতিরূপে অনন্ত আকাশে বিক্ষিপ্ত হইবে। তখন তাহাদের দ্বারা আর কোনও কার্য্য হইবে না। এই অবস্থাই প্রলয়। প্রৈতির (Energy) এই অসংবদ্ধ অবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহার কোন কার্য্যই থাকিবে না। যদি কোনও কারণে—সর্ব্বশক্তিমান কোনও পুরুষের ইচ্ছাবশতঃই হউক অথবা কোনও আকস্মিক কারণবশতঃই হউক—প্রৈতি এই অসংহত অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারে, যদি আবার ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রোটন ইলেকট্রণের উদ্ভব করিতে পারে, তবেই পুনরায় সৃষ্টির সম্ভব হইবে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন

---

*History of Indian Philosophy by Das Gupta. vol. I, 244. pp.

একদিকে যেমন প্রোটন ও ইলেকট্রণের ধ্বংস হইতেছে, তেমনি অসীম বিশ্বের এক দূরতম প্রদেশে হয়তো নূতন প্রোটন ও ইলেকট্রণের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু ইহা অনুমানমাত্র, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। প্রলয়ে বিশ্বের সমগ্র শক্তি প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইলেও, তাহা নিষ্ক্রিয়, তাহার কার্য্য-ক্ষমতা অন্তর্হিত। তাহার মধ্যে কোনও ভেদ নাই। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ একত্র থাকলেও তাহাদের মিলন হয় না, মিলিত হইয়া তাহারা এক বস্তুতে পরিণত হয় না। পরস্পরের উপর তাহারা ক্রিয়াশীল। কিন্তু পরস্পরের অভিভব-চেষ্টা ভিন্ন অন্য ক্রিয়া তাহাদের হয় না।

প্রকৃতি এবং গুণদিগের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আমরা জানিনা। সৃষ্টির মধ্যে আমরা গুণের কার্য্য দেখিতে পাই, তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই আমরা জানিতে পারি না। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে ষষ্টিতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত এক শ্লোকে আছে—

গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি,
যৎ তু দৃষ্টিপথম্ প্রাপ্তং, তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্।

গুণদিগের পরমরূপ দৃষ্টিপথে পড়ে না। দৃষ্টিপথে যাহা পড়ে, তাহা মায়ার মতো, তুচ্ছ। এখানে যাহা দৃষ্টিপথে পড়ে, তাহাকে "মায়া" বলা হয় নাই— "মায়া ইব" অর্থাৎ "মায়ার মতো", "যেন মায়া" ইহাই বলা হইয়াছে। কেননা তাহারা সকলই বিনাশশীল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিবিধ দ্রব্যের যাহা গুণ বা ধর্ম্ম, তাহাই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা কি ?

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ প্রীতি-অপ্রীতি-বিষাদাত্মক, তাহারা প্রকাশশীল, প্রবৃত্তিশীল (ক্রিয়াশীল) ও নিয়মশীল (সংযমনশীল)। ইহারা সকলেই অন্যোন্যাভিভব-বৃত্তি, অন্যোন্যাশ্রয়-বৃত্তি, অন্যোন্যজনন-বৃত্তি এবং অন্যোন্য-মিথুন-বৃত্তি (সাং কা ১২)।

সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক, ইহা সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত। রজঃ উপষ্টম্ভক অর্থাৎ অপরের প্রবর্ত্তক এবং চল অর্থাৎ চঞ্চল বা পরিণামশীল। তমঃ গুরু অর্থাৎ জড়ত্ব-বা-আলস্যজনক, এবং আবরক অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হইলেও, সকলে মিলিত হইয়া অর্থসাধন (পুরুষার্থ সাধন করে), যেমন প্রদীপের বর্ত্তি (সলিতা) ও তৈল অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশরূপ উদ্দেশ্য সাধন করে। (সাং কা ১৫)। এই দুইটি কারিকা হইতে পাওয়া গেল, সত্ত্ব প্রকাশিত হয় প্রীতি ও প্রকাশে এবং তাহা লঘু। আমাদের অন্তরে যে প্রীতিভাব (সুখ) উৎপন্ন হয় তাহা যেমন, তেমনি কোনও বস্তু যে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়

অর্থাৎ জ্ঞানগোচর হয়, তাহাও সত্ত্বগুণ হইতেই হয়। লঘুত্বও সত্ত্বের একটি গুণ। লঘুত্ব গুরুত্বের বিরোধী। বস্তুর লঘুত্ব সত্ত্বগুণেরই কার্য্য। অগ্নিশিখা যে উর্দ্ধগামী, তাহার কারণ অগ্নির মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য। বায়ু যে তির্য্যকগামী, তাহার কারণও বায়ুর মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য। ইন্দ্রিয়দিগের পটুতাও (ত্বরিত-বোধ-জনন-শক্তি) সত্ত্বগুণের আধিক্যজাত। তমঃ গুরু বলিয়া তাহার ফল মন্দতাজনক।

আবার রজঃর লক্ষণ অপ্রীতি (দুঃখ), অবসাদনাশ ও চঞ্চলতা। তাহা ক্রিয়াশীল ও চঞ্চল। সত্ত্ব ও তমঃ নিষ্ক্রিয় বলিয়া স্বকায় কার্য্যসাধনে অসমর্থ। তাহারা রজঃকর্ত্তৃক উত্তম্ভিত (উত্থাপিত) হইয়া অবসাদ হইতে নিবর্ত্তিত এবং স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। রজঃ স্বয়ং চঞ্চল অথবা স্পন্দনশীল। সে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। তাই সত্ত্ব ও তমঃকে চালিত করে। রজঃ তাহাদের সহচর বলিয়াই সত্ত্ব ও তমঃ স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও ক্রিয়াবৎ হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অবিনাভাবে সম্বদ্ধ। ইহাদের কেহই অন্য দুইটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। গুণত্রয়ের কার্য্য-প্রবৃত্তি রজঃর প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হয়।

তমঃ গুরুঃ আবরক ও সংযমনশীল। সত্ত্ব লঘু, তমঃ তাহার বিপরীত গুরু। সত্ত্ব প্রকাশশীল, তমঃ প্রকাশের প্রতিবন্ধক। সত্ত্ব ও রজঃর কার্য্য তমঃ নিয়ন্ত্রিত করে, এইজন্য তমঃ নিয়ামক বা সংযমনশীল। যখন পুরুষের প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক হয়, তখন তমঃর প্রবৃত্তি (প্রতিবন্ধক-বৃত্তি) শমিত হয়। অশ্ব স্বভাবতঃ চঞ্চল, কিন্তু রথীর প্রয়োজনানুসারে কখনও সারথিকর্ত্তৃক রথচালনে নিযুক্ত হয়, আবার কখনও সংযত হয়। সেইরূপ প্রবৃত্তিশীল রজোগুণও যখন পুরুষের প্রয়োজন না থাকে, তখন তমোগুণাবৃত হইয়া নিশ্চল অবস্থান করে। এই জন্যই তমঃকে নিয়ামক বলা হইয়াছে। (ন্যায়পঞ্চাননের টীকা)। সত্ত্ব ও রজঃর ক্রিয়া এইভাবে তমঃ-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরস্পরের অভিভব করা গুণত্রয়ের স্বভাব। তাহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি অন্য দুই গুণের বৃত্তিকে অভিভূত করিয়া আবির্ভূত হয়। সত্ত্বের বৃত্তি প্রকাশ বা জ্ঞানের আবির্ভাবের সময় রজঃ ও তমঃর বৃত্তি অভিভূত থাকে; রজোগুণের বৃত্তি চেষ্টার আবির্ভাবের সময় সত্ত্ব ও তমঃর বৃত্তি অভিভূত থাকে; এবং যখন তমঃর জড়তা আবির্ভূত হয়, তখন সত্ত্ব ও রজঃর প্রকাশ ও প্রবৃত্তি অভিভূত থাকে। অভিভূত থাকে বটে, কিন্তু অন্য দুই গুণকে আশ্রয় না করিয়া

কোনও গুণই কার্য্য করিতে পারে না। কোনও গুণই অন্য দুইটিকে বর্জ্জন করিয়া কোনও কার্য্য করিতে সক্ষম নহে।

গুণগণ পরস্পরকে পরিণামিত করে। এক গুণ হইতে অন্য গুণ উৎপন্ন হয় না। ব্যক্ত বস্তুর মতো গুনগণ "হেতুমৎ" অর্থাৎ কারণ হইতে উদ্‌ভূত নহে। কিন্তু প্রত্যেক গুণের যে পরিণাম হয়, তাহা অন্য গুণকর্তৃক সংঘটিত হয়। সত্ত্বগুণের পরিণাম যে জ্ঞান, তাহা রজোগুণকর্তৃক তমোগুণের জড়তাকে বিদূরিত করিবার ফল। এই রূপেই গুণগণ পরস্পরকে পরিণামিত করে।

গুণগণ পরস্পরের সহচর; তাহারা অবিনাভাববর্ত্তী। অর্থাৎ তাহারা পরস্পরের সঙ্গে ভিন্ন থাকিতে পারে না। রজো-গুণের মিথুন (সহচর) সত্ত্ব, সত্ত্ব গুণের মিথুন রজঃ, আবার সত্ত্ব ও রজঃ উভয়ে তমোগুণের মিথুন। সত্ত্ব ও রজঃ উভয়েরই মিথুন রজঃ। এই তিন গুণ প্রথমে কখন মিলিত হইল, তাহা কেহ জানে না। তাহাদের বিয়োগও উপলব্ধ হয় না। শুদ্ধ সাত্ত্বিক, শুদ্ধ রাজসিক, শুদ্ধ তামসিক কিছু নাই। প্রত্যেক কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ আছে। তবে কোনওটিতে বেশী কোনওটিতে কম পরিমাণে। সত্ত্বপ্রধান জ্ঞানের মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা তমোগুণের ফল। তাহার পরিণাম অর্থাৎ জ্ঞান অগ্রসর হইতে হইতে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা রজোগুণের ফল। কোন জ্ঞানই স্থির অথবা সম্পূর্ণ জড়তাহীন নহে। অবিনাভাব-সম্বন্ধে আবদ্ধ গুণদিগের অসংযুক্ত অবস্থা হইতে সংযুক্ত অবস্থা-প্রাপ্তিও যেমন দেখা যায় না, তেমনি তাহাদিগকে বিযুক্ত অবস্থাতেও পাওয়া যায় না।

ত্রিগুণের ব্যাখ্যা করিতে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার Positive Science of the Hindus প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: "প্রত্যেক সমুৎপাদ (Phenomenon) ত্রিবিধ মৌলিক উপাদানদ্বারা গঠিত—বুদ্ধিগ্রাহ্য সার (intelligible essence), প্রৈতি (energy) ও ভর (mass)। যাহাদ্বারা কোনও বস্তু বুদ্ধির নিকট আপনাকে প্রকাশিত করে, তাহাই তাহার সার। বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা এই প্রকারে প্রকাশিত হয় না। সার তিন উপাদানের মধ্যে একটি মাত্র। ইহার ভরও নাই, ভারও নাই। ইহা কিছুকে বাধাও দেয় না, নিজে কোনও কর্ম্মও করিতে পারে না। বস্তুর সারই সত্ত্ব। ইহার পরে তমঃ— ভর, নিশ্চেষ্টতা, জড় উপাদান। ইহা যেমন গতির, তেমনি সচেতন পরিচিন্তনেরও (conscious reflection) বাধা উৎপাদন করে। কিন্তু বুদ্ধি-উপাদান

(Intelligence stuff) এবং জড় উপাদান কোনও কার্য্য করিতে পারে না এবং স্বতঃ কিছু উৎপাদন-চেষ্টাও ইহাদের নাই। রজঃই সমস্ত কার্য্য করে—রজঃই প্রৈতি-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব। রজঃ জড়ের বাধা জয় করে এবং বুদ্ধির ক্রিয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা সরবরাহ করে।"

প্রত্যেক বস্তুই, তাহা ভৌতিক হউক অথবা আধ্যাত্মিক হউক, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন উপাদানে গঠিত। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেক ভৌতিক বস্তুর মূল উপাদান পরমাণু অথবা তন্মধ্যস্থ প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণ। প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণদিগের বিভিন্ন সংখ্যায় সমবায়দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর পরমাণু গঠিত। সাংখ্যের মতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের যে সমবায়, তাহাও তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণে সমবায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্রব্য এবং তাহারা যে সংযোগ ও বিভাগ-যোগ্য, ইহা আমরা পাইয়াছি। সুতরাং তাহাদিগকে অতি সূক্ষ্ম কণা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই কণা কিন্তু জড়কণা নহে—particles of matter নহে। তাহার স্বরূপ কি তাহা আমরা জানি না। এইটুকু বুঝিতে পারা যায়, যে প্রত্যেক শ্রেণীর বস্তুতে সূক্ষ্মকণাসকল বিভিন্ন পরিমাণে—বিভিন্ন সংখ্যায়—সমবেত হয় এবং প্রত্যেক গুণের পরিমাণ অনুসারে বস্তুর ধর্ম্মের বিভেদ দৃষ্টিগোচর হয়। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে স্বচ্ছতার (transparency) পরিমাণ-ভেদ আছে। যাহার স্বচ্ছতা অধিক, তাহার মধ্যে সত্ত্বের পরিমাণ অধিক। আধ্যাত্মিক বস্তু সকলই ভৌতিক বস্তু হইতে স্বচ্ছতর। তাহাদের মধ্যে সত্ত্বের পরিমাণ আরও বেশী। ভৌতিক বস্তুদিগের মতো আধ্যাত্মিক সকল বস্তুর মধ্যে—বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভাবাবেগ সকলের মধ্যে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বিভিন্ন পরিমাণে বর্ত্তমান। যেমন কোনও কোনও ভৌতিক বস্তুর মধ্যে রজোগুণের আধিক্য, তেমনি ইচ্ছার মধ্যে ও জ্ঞানের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, মোহের মধ্যে তমোগুণের। পুরুষই একমাত্র বস্তু যাহার মধ্যে গুণের অস্তিত্ব নাই।

গুণত্রয়ের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় যুক্তি

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের "পরম রূপ" আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, তাহাদের ধর্ম্ম ও লক্ষণসকল সাংখ্যাচার্য্যগণকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারি না, তাহারা যে বাস্তবিকই আছে, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ কি?

আধুনিক বিজ্ঞানে বিবিধ শ্রেণীর জড়দ্রব্যের বিশ্লেষণ করিয়া জড়জগতের মৌলিক উপাদান-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। সেই চেষ্টার ফলে বহু প্রকারের পরমাণুদ্বারা জড়জগৎ নির্ম্মিত বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অবধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমাণুগণও যে মৌলিক পদার্থ নহে, তাহা পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং প্রোটন, ইলেক্‌ট্রণ, নিউট্রণ, পজিট্রণনামা তাড়িত-কণা সকল এখন উহাদের মূল উপাদান বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ কোনও রাসায়নিক অথবা তাদৃশ অন্য কোনও বিশ্লেষণদ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা বাহ্য ও আন্তর জগতের রূপের ও গুণের বিশ্লেষণ করিয়া এই তিন গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পরমাণুকে তাঁহারা নিত্য ও অখণ্ড বলিয়া গণ্য করেন নাই (সাং সূ ৫।৮৭-৮৮)।

আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইহাদের বিষয়। ইহারা হয় সুখকর, নতুবা দুঃখকর অথবা মোহকর (অর্থাৎ উদাসীন)। সুতরাং সুখ, দুঃখ ও মোহকে মৌলিক গুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জগৎকে সর্ব্ববৈশিষ্ট্যবর্জ্জিতরূপে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্যে যদি এক এক করিয়া তাহা হইতে সমস্ত গুণ নিষ্কাশিত (abstract) করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট থাকে গতি, জড়তা ও সত্তা। সত্তা বা অস্তিত্ব সর্ব্ব-বস্তুসাধারণ সামান্য। সকল বস্তুই সত্তাবান্। সত্তার সহিত অন্যান্য গুণের সংযোগ হইলে অবিশেষ হইতে বিশেষের উদ্ভব হয়। অবশ্য বিশেষত্ববর্জ্জিত কিছুই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। না হইলেও সর্ব্ববৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত এক অবস্থার কল্পনা করা যায়। বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত অবস্থাই শুদ্ধ সত্ত্ব। সতের ভাবই সত্ত্ব। সৎ শব্দ অস্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আবার যাহা সৎ, তাহার সত্তা নির্ভর করে জ্ঞানে তাহার প্রকাশের উপর। যাহার অস্তিত্ব জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই—অন্ততঃ তাহা আছে, মনে করিবার কারণ নাই। তার পরে বস্তুর জড়তা—বৈজ্ঞানিকগণ জড়তাকে (inertia) বা ভরকে (mass) জড়ের মৌলিক লক্ষণ বলিয়াছেন। বস্তুসকল স্বভাবতঃ নিশ্চেষ্ট ; কিন্তু যদি একবার তাহাতে গতি সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে গতিরোধক কিছু না থাকিলে তাহা অনবরত চলিতে থাকিবে। জগতের সর্ব্বত্রই গতি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে গতির জনক কিছু প্রকৃতির মধ্যে আছে, ইহা অনুমান করা যায়। যাহা জড়তার নিবর্ত্তক তাহাই রজঃ। রজঃ যেমন জড়তা দূর করে, তেমনি সত্ত্বকে মলিনও করে। এই জন্যই তাহার নাম রজঃ। রজঃ শব্দের অর্থ ধূলি, যাহা অন্য দ্রব্য মলিন করে। তমঃ

শব্দের অর্থ অন্ধকার। এই শব্দবাচ্য গুণ মুখ্যতঃ অবসাদ বা নিশ্চেষ্টতা-ব্যঞ্জক হইলেও, ইহা সত্ত্ব ও রজঃকে আবরণ করিয়া তাহাদের প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া ইহার নাম তমঃ।

বাহ্য ভৌতিক জগতে প্রকাশবত্তা, ক্রিয়াবত্তা এবং নিশ্চেষ্টতা এই তিন ধর্ম্ম প্রত্যেক বস্তুরই আছে, ইহা আমরা দেখিতে পাইলাম। অন্তর্জগতেও যত ভাব আছে, তাহারাও এই তিন ধর্ম্মযুক্ত। জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, তেমনি তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে, এবং তাহা কখনও সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া তাহার প্রতিবন্ধকও আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। হর্ষ, শোক ও মোহ, রাগ, দ্বেষ ও ঔদাসীন্য প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ভাবও ঐ তিন ধর্ম্মযুক্ত। সুতরাং বলা যায়, সমস্ত অস্তিত্ববান পদার্থেরই—সমস্ত ভাবপদার্থেরই—প্রকাশবত্তা, ক্রিয়াবত্তা এবং নিশ্চেষ্টতা এই তিন ধর্ম্ম আছে। এই তিন ধর্ম্ম পরস্পরের বিরোধী। সুতরাং তাহারা একই মূল পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয় প্রত্যেক ভাবপদার্থের তিন উপাদান আছে—এক উপাদান প্রকাশক, দ্বিতীয় উপাদান চেষ্টাজনক এবং তৃতীয় উপাদান নিশ্চেষ্টতাজনক। যে উপাদান প্রকাশক, সাংখ্যকার তাহাকে সত্ত্ব বলিয়াছেন; যে উপাদান চেষ্টাজনক, তাহাকে বলিয়াছেন রজঃ, এবং যে উপাদান নিশ্চেষ্টতাজনক, তাহাকে বলিয়াছেন তমঃ।

আমরা দেখিতে পাই যাহা প্রকাশক, তাহা প্রীতি অথবা সুখজনক, যাহা চেষ্টাজনক, তাহা দুঃখেরও জনক, এবং যাহা নিশ্চেষ্টতাজনক, তাহা মোহ অথবা ঔদাসীন্যজনক। তাই সাংখ্যকার জগতের তিন উপাদান স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন নামে বিশেষিত করিয়াছেন এবং সত্ত্বকে বলিয়াছেন প্রীত্যাত্মক (সুখস্বরূপ), রজঃকে বলিয়াছেন অপ্রীত্যাত্মক (দুঃখ-স্বরূপ) এবং তমঃকে বলিয়াছেন বিষাদাত্মক (মোহ-স্বরূপ), এবং প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং নিয়ম (সংযমন) যথাক্রমে তাহাদের স্বভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (সাং কা—১২)।

ভৌতিক স্থূল পদার্থের দুইটি ধর্ম্ম প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—ভর (Mass) এবং প্রৈতি (Energy)। কিন্তু তাহাদের প্রকাশশীলতা—জ্ঞানে প্রকাশিত হইবার শক্যতাও একটু চিন্তা করিলেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। আমাদের মনঃ প্রত্যেক জড়বস্তুর প্রতিবিম্ব-গ্রহণে সক্ষম, ইহাই জড়ের প্রকাশশীলতার প্রমাণ। অন্তর্জগতে এই প্রকাশশীলতা যে পরিমাণে বর্ত্তমান, বাহ্যজগতে অবশ্য তাহার পরিমাণ অনেক কম। অন্তর্জগতে তমঃ

গুণ অপেক্ষাকৃত কম। মনঃ অতিশয় চঞ্চল এবং চিন্তায় যাহা প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা সীমাবদ্ধ। সত্ত্ব গুণের প্রভাবে যাবতীয় বস্তুই চিন্তায় প্রকাশিত হইতে পারিত। পারে না, তাহার কারণ মনের মধ্যে বর্ত্তমান সত্ত্ব গুণের বিরোধী শক্তি তমঃ ও রজঃ। আমাদের পরিজ্ঞাত সকল বস্তুই যে সর্ব্বদা আমাদের মনের সম্মুখে থাকে না, চেষ্টা করিয়া স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া যে তাহাদিগকে মনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়, তাহার কারণ এই তমঃ। সুতরাং ভৌতিক ও মানসিক সকল পদার্থই ত্রিগুণান্বিত। সকলেই ত্রিগুণ হইতে উদ্ভূত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্রব্য, বিজ্ঞান ভিক্ষুর এই ব্যাখ্যা সকল ব্যাখ্যাকার গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ যদি বৈশেষিক গুণ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রকৃতিরূপ দ্রব্যাশ্রিত বলিতে হইবে। প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি যখন ঘটে, তখনই সৃষ্টি হয়। সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি গুণদিগের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য ভিন্ন হইতে পারে না। ন্যূনাধিক্য গুণদিগের পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা হইতে উৎপন্ন। কিন্তু স্বাভাবিক গুণের ন্যূনাধিক্য কিরূপে হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না, এবং তাহাদের পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টায় অর্থও বুঝিতে পারা যায় না। তার পরে প্রকৃতি এক বা বহু, এই প্রশ্ন উঠে। যদি এক হয়, তাহা হইলে তাহাতে কখনও একগুণের আধিক্য, কখনও অন্যগুণের আধিক্য কিরূপে হয়, তাহাও দুর্ব্বোধ্য। যদি বহু হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রকৃতিই ত্রিগুণান্বিত, এবং তাহাতে গুণদিগের পরিমাণ অভিন্ন। তাহাদিগের সমবায়ে উৎপন্ন বস্তুদিগের মধ্যে গুণদিগের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য-প্রাপ্তিও দুর্ব্বোধ্য। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক স্পিনোজার Substance এর গুণ দুইটি—ব্যাপ্তি ও চিন্তা। বস্তুতঃ Substance এ অসংখ্য গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদিগের মধ্যে দুইটিই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু তাহাদের পরিমাণের তারতম্য হয় না। প্রত্যেক বস্তুই একদিক হইতে ব্যাপ্তিগুণ-যুক্ত, অন্যদিক হইতে চিন্তাগুণ যুক্ত। গুণ দুইটি Substance এর দুইটি বিভাব (aspect)। Substance এর Mode বা বিকারস্বরূপে যে অসংখ্য বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহাদের মধ্যে এই দুই গুণ সমানভাবে বর্ত্তমান। ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সাংখ্যের গুণদিগকে বৈশেষিক গুণ ধরিলে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির উদ্ভবের ব্যাখ্যা সুবোধ্য হয় না। বিভিন্ন বস্তুতে কিরূপে বিভিন্ন গুণের আধিক্য বা ন্যূনতা হয়, তাহা বোঝা যায় না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, যাহা হইতে ভৌতিক জগৎ ও মনোজগৎ উভয়ই উদ্ভূত হয়, তাহা কি ভৌতিক পদার্থ, অথবা মানসিক পদার্থ ? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের 'পরম রূপ' কি, তাহা আমরা জানি না। পরে আমরা দেখিতে পাইব প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি হয় মহৎ অথবা বুদ্ধিরূপে। মহৎ হইতেই ভৌতিক ও মানসিক যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং ভৌতিক পদার্থনিচয়, বিজ্ঞান যাহাকে জড়বস্তু বলে, তাহা নহে। মনোজগৎ ও ভৌতিক জগতের মধ্যে আত্যন্তিক বিসদৃশতাও নাই। একই মূল উপাদানে উভয় জগৎ নির্ম্মিত। ভৌতিক জগৎ মনোজগৎ অপেক্ষা স্থূলতর, এই প্রভেদ উভয় জগতের মধ্যে বর্ত্তমান। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে মনঃ ও বুদ্ধি বলিতে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাহা বুঝায়, সাংখ্যশাস্ত্রে তাহা বুঝায় না। সাংখ্যশাস্ত্রে মনঃ ও বুদ্ধি অচেতন। পরে আমরা ইহার আলোচনা করিব। কিন্তু অচেতন হইলেও চেতন পুরুষের "ঈক্ষা" বশতঃ বুদ্ধি সচেতনের গুণ প্রাপ্ত হয় এবং এই সচেতনত্ব-প্রাপ্ত বুদ্ধি হইতেই পরিণামে যখন পঞ্চভূতের উদ্ভব হয়, তখন ভৌতিক জগৎ যে মনঃ ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্রজাতীয় পদার্থ নহে, তাহা নিশ্চিত। সাংখ্যদর্শন জড়বাদী নহে।

৫

পুরুষ

জড়বাদিগণ জড় (matter) দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করেন। যে সমস্ত ব্যাপারকে মানসিক ব্যাপার বলা হয় (mental phenomena), সে সকলই তাহাদের মতে জড়কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। জড় হইতে ভিন্ন মনঃ অথবা আত্মা বলিয়া কোনও বস্তু তাহাদের মতে নাই। এ পর্য্যন্ত আমরা সাংখ্যদর্শনের যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা হইতে মনে হইতে পারে, সাংখ্যকারও জড়বাদী, তিনি অচেতন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক দ্রব্যদিগের দ্বারা এই জগতের ভৌতিক ও মানসিক যাবতীয় ব্যাপারের ব্যাখা করিতে চান। মানসিক ভাবগুলিও যখন অচেতন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণময়, তখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যদর্শনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অতীত, তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ-ভিন্ন-ধর্ম্মান্বিত আর এক শ্রেণীর দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত। ইহাদের নাম পুরুষ। ইহাদের বর্জ্জন করিয়া জগতের ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

"পুরুষ" শব্দ উপনিষদেও ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরিতে,—অর্থাৎ দেহের

মধ্যে শয়ন করিয়া যিনি আছেন, তিনিই পুরুষ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অচেতন, কিন্তু পুরুষ চেতন, সংখ্যায় অনন্ত, তাহার কোনও গুণ নাই, তাহা শুদ্ধ চিৎমাত্র। জৈন দর্শনে আত্মার যে সমস্ত গুণের বর্ণনা আছে—অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্য্য—সাংখ্যের পুরুষে তাহাদের কিছুই নাই। সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ। বেদান্তে আত্মাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না। কেননা আনন্দ ও সুখ অভিন্ন। সাংখ্য-মতে সুখ প্রকৃতির, পুরুষের নহে। বেদান্তের আত্মা একমাত্র, সাংখ্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

বুদ্ধি অহংকার, মনঃ ও তাহাদের কার্য্য প্রকৃতির অন্তর্গত, পুরুষের নহে। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কোনও কার্য্য করে না; তাহা দ্রষ্টামাত্র, দৃশ্য হইতে স্বতন্ত্র। অন্তঃকরণে যাহা যাহা উদিত হয়, বস্তুর রূপ, তাহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ প্রভৃতি সকলই দৃশ্য—পুরুষ তাহা দর্শন করে মাত্র। এই দর্শনের ফলেই প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, কিন্তু তাহা অচেতন, পুরুষের মধ্যগত নহে। ইন্দ্রিয়-দ্বার-পথে যাহাই মনঃ ও বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হয়, তাহা সকলই অনাত্মিক, সমস্তই অচেতন। পুরুষ না থাকিলে এই সকল মানসিক প্রতিবিম্ব অনুভূত হইত না। কিন্তু তাহারা প্রকৃত পক্ষে সচেতন (Conscious States) নহে; দ্রষ্টার দৃষ্টি তাহাদের প্রতি পতিত হয় বলিয়া তাহারা অনুভূত হয়। আমাদের মনের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমরা পুরুষের সাক্ষাৎ পাই না। আমাদের প্রতীতি (perception), সম্প্রতীতি (Conception), অনুভূতি (Feeling) এবং কৃতির (Conation) তলদেশে কোনও স্থায়ী পুরুষের সাক্ষাৎ আমরা পাই না। এই অনুসন্ধানকারী "আমি" ও পুরুষ নহে। এই "আমি"র জ্ঞান প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, যদিও এই জ্ঞানের স্ফুরণের জন্য পুরুষের দৃষ্টি অপরিহার্য্য। কিন্তু দ্রষ্টার দর্শন হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা দ্রষ্টাকে স্পর্শ করে না, যদিও তাহা "আমার জ্ঞান" এই ধারণা উৎপন্ন করে। সুখ দুঃখ প্রকৃতির, পুরুষের নহে—যদিও "আমি-সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি", এই জ্ঞান হয়।

"সদা প্রকাশ-স্বরূপ" পুরুষের পরিণাম নাই। ইহা আলোক-স্বরূপ। ইহার আলোকেই প্রকৃতি আলোকিত হয় এবং তাহার অস্তিত্বের জ্ঞান হয়। জ্ঞানের যাবতীয় রূপের মধ্যে পুরুষের "দৃষ্টি" বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাকে দেখা যায় না। তাহার অস্তিত্ব কেবল অনুমানদ্বারা জানিতে পারা যায়।

ক্যাণ্ট Empirical self এবং Transcendental self নামে দুইটি "আমি"র (অতীন্দ্রিয় ও প্রত্যক্ষ) কথা বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ "আমি" অতীন্দ্রিয় "আমি"র উপরি ভাগ। বস্তুতঃ দুইটি "আমি" নাই। উপরি ভাগে যে আমি, তাহা তাহার তলস্থ অতীন্দ্রিয় "আমি" হইতে উদ্‌ভূত। যে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ "আমি"তে দৃষ্ট হয়, "আমি"র অনুভূতি পর্য্যন্ত, তাহাদের সমস্তই উপরি ভাগের ব্যাপার। সে সমস্ত ব্যাপারকে সচেতন বলা হয় এবং বাহ্য ভৌতিক বস্তুদিগের হইতে তাহারা ভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। সাংখ্য শাস্ত্রেও দুইটি "আমি"র কথা আছে ; একটির নাম "অহংকার", দ্বিতীয়টির নাম পুরুষ, কিন্তু তাহারা বিভিন্ন। অহংকারের উৎপত্তি প্রকৃতি হইতে। পুরুষ তাহা হইতে একান্ত ভিন্ন। অহংকার সচেতন বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাহা অচেতন। চেতন পুরুষের দৃষ্টি-পাতেই তাহা সচেতন বলিয়া অনুভূত হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে Mind (মনঃ) ও Soul (জীবাত্মা) সমার্থক। তাহা ভৌতিক দ্রব্য (matter) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা মানসিক বা আত্মিক ব্যাপার। তাহা ভৌতিক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। মনঃ ও ভৌতিক দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা লইয়া পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বহু দিন যাবৎ আলোচনা চলিতেছে। এক পক্ষ বলেন মনঃ ও জড় বস্তু যখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন-জাতীয় পদার্থ, তখন উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। অথচ দেখা যায় মনঃ জড়বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতেছে। ইহা দেখিয়া মনের উপর জড়ের ক্রিয়া আছে মনে হয়। আবার ইচ্ছাদ্বারা দেহ চালিত হইতেছে দেখিয়া জড়ের উপর মনের ক্রিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। এই জন্য অনেক দার্শনিক মনে করেন প্রকৃত পক্ষে মনঃ ও জড় পদার্থের মধ্যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। উভয়ে একজাতীয় বস্তু। কেহ বলেন জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহা মানসিক পদার্থ। কেহ বলেন মনও জড় পদার্থ। সাংখ্য তাহা স্বীকার করেন না। সাংখ্যের মতে বুদ্ধি, মনঃ ও অহংকার সকলই অচেতন —বাহ্য বস্তুর সজাতীয়। কিন্তু পুরুষ চেতন ও তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইতে পারে না, কেন না, বিজাতীয় পদার্থদিগের সংযোগ অসম্ভব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুরুষের প্রতিবিম্ব বুদ্ধির উপর পতিত হয় বলিয়াই বুদ্ধি সচেতন বলিয়া প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। সাংখ্য মতে অচেতন প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ (বা সংঘর্ষ ?) না ঘটিলে জ্ঞান ও অনুভূতির উদ্‌ভব হইতে পারে না।

জার্মান দার্শনিক ফিসটে দ্বিবিধ দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে "অহং"ই একমাত্র বস্তু। এই অহমের মধ্যে সংবিদ্ নাই। তাহা অসীম। অনন্তে প্রসারিত হইবার সময় তাহার মধ্যে এক বাধার (anstoss) উদ্ভব হয়। এই বাধার সংঘাতের ফলে অহমের মধ্যে সংবিদের উদ্ভব হয়।

সাংখ্যের পুরুষ চৈতন্য-স্বরূপ। সে চৈতন্যকে সংবিদ (Consciousuese) বলা যায়, কিন্তু তাহা জ্ঞান নহে, তাহা আত্ম-সংবিদও (Self-conscious-nese) নহে, তাহা জ্ঞানের শক্যতা মাত্র। জ্ঞানের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু পুরুষে তাহা নাই। প্রকৃতির সহিত পুরুষের তথাকথিত সংযোগ বা সংঘাত হইতে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদযুক্ত আত্মসংবিদ-সমন্বিত জ্ঞানের উদভব হয়। প্রকৃতির সহিত সংযোগের ফল পুরুষের স্বাধীনতা ও বিভুত্বের অপহ্নব। জগৎ যে দুঃখময় রূপে প্রতীত হয়, হয়তো ইহাই তাহার কারণ। কিন্তু এই সংযোগও সাংখ্যমতে প্রকৃত নহে, কল্পিত। প্রকৃতির উপর পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতনকেই সংযোগ বলা হয়। কিন্তু তাহাদ্বারা প্রকৃত পক্ষে পুরুষের কোনও পরিণামই সংঘটিত হয় না।

পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই দেশ ও কালের অতীত নিরবয়ব পদার্থ। সুতরাং উভয়ের সংযোগ দেশিক ও কালিক সংযোগ নহে। জ্ঞানের মধ্যে তাহাদের সংযোগ সাধিত হয়। পুরুষের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হইলে "আমি দেখিতেছি" এইরূপ যে অনুভব হয়, তাহাই সংযোগ। পুরুষ দেশ-কালের অতীত, কিন্তু বিভু অর্থাৎ সর্ব্বত্রব্যাপী।

পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাখ্যকার যে সকল যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারা এই :—

ব্যক্ত ও প্রধান (অব্যক্ত প্রকৃতি) উভয়ই সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মক। তাহারা উভয়েই পরস্পর হইতে অবিবিক্ত বা অবিচ্ছিন্ন। (মহৎ, অহংকার প্রভৃতি সকলই প্রধানাত্মক, তাহারা সকলেই বিষয়—জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং বিজ্ঞানমাত্র নহে, যাহা বৌদ্ধেরা বলেন, তাহা নহে, (বিজ্ঞান-বাহ্য।) তাহারা সামান্য অর্থাৎ সাধারণ, সকলের পক্ষেই একরূপ। (বিজ্ঞানমাত্র হইলে, প্রত্যেকের বিজ্ঞান অন্যের বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন হইত। বিজ্ঞান সাধারণ নহে) উভয়েই অচেতন ও বিকারশীল। পুরুষ উহাদের বিপরীত। কিন্তু কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যও পুরুষ ও প্রধানের মধ্যে আছে। উভয়েই হেতু-হীন, উভয়ই নিয়ত। আবার ব্যক্ত যেমন বহু, পুরুষও তেমনি বহু।

যখন দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি বস্তু সংহত অর্থাৎ মিলিত হইয়া

কার্য্য করিতেছে, তখন দেখা যায় তাহারা অন্য এক পদার্থের প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যেই কার্য্য করিতেছে। সুতরাং যখন আমরা দেখি নানাবিধ পদার্থে গঠিত আমাদের দেহ এবং তন্মধ্যস্থ ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ও অহংকার মিলিত হইয়া জ্ঞান, সুখ-দুঃখানুভূতি এবং চেষ্টা উৎপাদন করিতেছে, তখন এই মিলিত কার্য্য ইহাদের অতিরিক্ত কোনও পদার্থের প্রয়োজন-সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা অনুমান করা যায়। সেই পদার্থই পুরুষ।

জগতে দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক বস্তুর বিপরীত অন্য বস্তু আছে। সুখের বিপরীত দুঃখ, জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান, পুণ্যের বিপরীত পাপ, স্থূলের বিপরীত সূক্ষ্ম। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে অচেতন ত্রিগুণের বিপরীত বস্তুও আছে। সুতরাং চেতন পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ।

যাহার অধিষ্ঠানবশতঃ দেহ বুদ্ধি-অহংকার-মনঃ-বিশিষ্ট হইয়া চেতন পদার্থরূপে প্রতীত হয় এবং যাহার অভাবে দেহ বুদ্ধি-অহংকার-ও-মনঃ-বিহীন হইয়া অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই পুরুষ।

সুখ ও দুঃখ ভোগ্য পদার্থ। অনুকূল বলিয়া সুখের এবং প্রতিকূল বলিয়া দুঃখের বেদন অনুভূত হয়। এই ভোক্তার ভাব প্রকৃতির নহে। তাহার জন্য অন্য এক পদার্থের প্রয়োজন। সেই পদার্থই পুরুষ।

অনেকের কৈবল্য-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কৈবল্যের অর্থ বুদ্ধি প্রভৃতির সম্যক নিরোধ। এই প্রবৃত্তি বুদ্ধ্যাদির হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র কেহ আছেন, যিনি বুদ্ধি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী। তিনিই পুরুষ। বুদ্ধিই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে কৈবল্যের অর্থ হইত আত্মনাশ। কিন্তু আত্মনাশ কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না।

ভূতদিগকে পৃথক করিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্যে চৈতন্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহাদের মধ্যে চৈতন্য নাই। পঞ্চভূত মিলিত হইলে যে দেহাদি উৎপন্ন হয়, তাহাতে যে চৈতন্য দেখা যায়, তাহা ভূতের চৈতন্য নহে। কেন না সেই সকল ভূতের প্রত্যেকের মধ্যে চৈতন্য নাই। তাহা যদি না থাকে, তবে তাহারা মিলিত হইলে চৈতন্য আসিবে কোথা হইতে? সে চৈতন্য পুরুষের। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ।

ইন্দ্রিয়াদি করণমাত্র, তাহারা জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। যিনি দ্রষ্টা, তিনি আত্মা।

দেহ যতদিন থাকে, ততদিন তাহার স্বভাবের অন্যথা হয় না। দেহের যদি স্বাভাবিক চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে সুষুপ্তি ও মরণরূপ চৈতন্যাভাব

তাহাতে ঘটিত না। সুতরাং চৈতন্য দেহের নয়, পুরুষের—চৈতন্য যাহাতে স্বাভাবিক।

যে যে দ্রব্যে সুরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের মাদক শক্তির অভাব থাকিলেও, তাহাদের মিলন হইতে মাদকশক্তি উদ্‌ভূত হয়। সেইরূপ ভূতদিগের কাহারও মধ্যে চৈতন্য না থাকিলেও, তাহারা মিলিত হইলে চৈতন্যের উদ্‌ভব হইতে পারে, ইহা বলা যায় না। যে যে বস্তু মিশাইয়া মদ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে মাদকশক্তি আছে বলিয়াই মিলিত মাদকদ্রব্যে মাদকশক্তি আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রত্যেক ভূতে যে সূক্ষ্মরূপে চৈতন্য আছে, ইহার প্রমাণ নাই।

আত্মার অস্তিত্ব শ্রুতি-প্রমাণ-সিদ্ধ। আত্ম-প্রতীতি হইতেও পুরুষের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ইহার বাধক প্রমাণ নাই।

আবার "ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি।" (সাং সূ—৬।৩) অর্থাৎ আমার বুদ্ধি, আমার দেহ প্রভৃতি স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ দ্বারাও দেহ প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষের অস্তিত্ব অনুভূত হয় বলিয়া জানা যায়।

রাহুর শির ভিন্ন অন্য কোনও অঙ্গ নাই। শিলাপুত্রও (নোড়া) একখণ্ড প্রস্তরমাত্র। যখন রাহুর শরীর অথবা শিলাপুত্রের শরীর বলা হয়, তখন ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইলেও, রাহুর শিরই রাহু, সেই শির হইতে স্বতন্ত্র কোনও রাহু নাই, এবং শিলাপুত্রের শরীর হইতে স্বতন্ত্র কোনও শিলাপুত্র নাই। সুতরাং "আমার দেহ", "আমার বুদ্ধি" যখন বলা হয়, তখনও যে আমি ও আমার দেহ এবং বুদ্ধি এক নহে, ইহা বল কিরূপে? এই প্রশ্ন যদি করা হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তর হইবে, যে রাহু ও শিলাপুত্র যে রাহুর শির ও শিলাপুত্রের শরীর হইতে অভিন্ন, তাহা প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু পুরুষ ও তাহার দেহ এবং বুদ্ধি যে অভিন্ন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। রাহুর শির ও শিলাপুত্রের শরীরের মধ্যে আমার শির ও আমার শরীর এরূপ বোধ নাই।

ষড়দর্শন সমুচ্চয়ে (মণিভদ্র) আছে কাপিল দর্শনে আত্মা অমূর্ত্ত, চেতন, ভোগী, নিত্য, সর্ব্বগত, অক্রিয়, অকর্ত্তা, নির্গুণ ও সূক্ষ্ম।* প্রচলিত সাংখ্য মতে কিন্তু আত্মা প্রকৃতপক্ষে ভোগী কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। ইহা পরে আলোচিত হইবে।

---

* অমূর্ত্তশ্চেতনো ভোগী নিত্যঃ সর্ব্বগতোঽক্রিয়ঃ
অকর্ত্তা নির্গুণঃ সূক্ষ্ম আত্মা কাপিলদর্শনে।

পুরুষের স্বরূপ প্রকৃতির স্বরূপের সম্পূর্ণ বিপরীত (ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াৎ)। (১) প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ সচেতন। (২) প্রকৃতি সক্রিয় ও অনবরত পরিণামশীল, পুরুষ নিশ্চেষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়। (৩) প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিত। পুরুষ নির্গুণ। (৪) প্রকৃতি বিষয়, দৃশ্য; পুরুষ জ্ঞাতা, দ্রষ্টা। পুরুষ ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধির অতীত, দেশ ও কালের অতীত, কারণ-তত্ত্বের অতীত। পুরুষের কোনও উৎপাদক কারণ নাই; কোনও কার্য্যও পুরুষকর্তৃক কৃত হয় না। পুরুষ অখণ্ড এক—যুতসিদ্ধাবয়ব এক, অথবা অযুতসিদ্ধাবয়ব এক নহে, অখণ্ড অবিভাজ্য এক। বনের মধ্যে বহু বৃক্ষলতা থাকিলেও তাহা এক বন। বৃক্ষলতাগণ একত্র অবস্থিত হইলেও তাহাদের একত্ব-সাধক কিছু নাই। তাহাদের একত্ব যুতসিদ্ধাবয়ব একত্ব। পুরুষের একত্ব সেরূপ নহে। জীবদেহ নানা অঙ্গের সমষ্টি। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া এক উদ্দেশ্যসাধন করে। তাহাদের একত্ব অযুতসিদ্ধাবয়ব। পুরুষের একত্ব সেরূপও নহে। পুরুষের কোনও অবয়ব নাই, অঙ্গ নাই। তাহা অবিভাজ্য। অব্যক্ত প্রকৃতিরও অবয়ব নাই, কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ রূপ তিন অঙ্গ আছে, যাহারা মিলিত হইয়া এক বিশেষ উদ্দেশ্য—পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ —সিদ্ধ করে।

পুরুষ শুদ্ধ চিৎ বা চৈতন্য। কিন্তু তাহার মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈত ভাব নাই। জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের দ্বৈত আছে বুদ্ধির মধ্যে। সেই জ্ঞান আমিত্বমূলক। প্রত্যেক জ্ঞানই "আমার" এই অনুভূতি-সংবলিত। এই জ্ঞানের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়-ভেদ আছে। কিন্তু শুদ্ধ চিৎস্বরূপ পুরুষে সে ভেদ নাই। তাহার 'অহং' বোধও নাই।

পুরুষ নির্ব্বিকার। তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। দেশ ও কালের ধারণা তাহাতে প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং তিনি সর্ব্বব্যাপী, বিভু, অথবা অনন্তকালব্যাপী, ইহা বলা তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত হয় না। জন্ম, মৃত্যু, সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি কাল ও দেশবাচী শব্দ তাহাতে প্রযোজ্য নহে।

বেদান্তের আত্মা ও সাংখ্যের পুরুষের ধারণার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় ধারণা সম্পূর্ণ এক নহে। বেদান্তের আত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি সাংখ্যের পুরুষে আনন্দ নাই। বেদান্তে একাধিক আত্মা নাই, সাংখ্যের পুরুষ সংখ্যায় অনন্ত। বেদান্তের আত্মা জ্ঞানস্বরূপ (সত্যং জ্ঞানং অনন্তং), কিন্তু সাংখ্যের পুরুষে চৈতন্য থাকিলেও জ্ঞান নাই। সাংখ্যের পুরুষের দৃষ্টিবশতঃ বুদ্ধিতে জ্ঞানের মধ্যে

ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, জ্ঞানের সেই সমস্ত উপাদান অচেতন, পুরুষের মধ্যে তাহারা নাই।

পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সাংখ্যে যে সকল যুক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারা এই :—

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু ও করণ ভিন্ন ভিন্ন, একসঙ্গে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। ইহাদ্বারা পুরুষ যে বহু, তাহা প্রমাণিত হয়। পুরুষ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রধান এক; সুতরাং তাহার বিপরীত পুরুষ নিশ্চয়ই বহু। পুরুষের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। জন্ম-মৃত্যু পুরুষের নহে, দেহের। পূর্ব্বে অসংবদ্ধ, পরে সংহতি-বিশিষ্ট দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও বেদনার সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ আবির্ভূত হয়, তাহাই জন্ম; অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সহিত সম্বন্ধই জন্ম। আর এই সম্বন্ধ-পরিত্যাগই মরণ। পুরুষের ভোগই যখন প্রকৃতির অভিব্যক্তির লক্ষ্য, তখন পুরুষ যদি এক হইত, তাহা হইলে অসংখ্য দেহ-সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন থাকিত না। আবার এতাদৃশ জন্ম ও মরণ যেমন সকল দেহের এক সঙ্গে হয় না, তেমনি যত দিন দেহ বর্ত্তমান থাকে, তত দিন প্রত্যেক দেহস্থিত করণদিগের (বুদ্ধি, অহংকার, মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) প্রবৃত্তিও একসঙ্গে হয় না। এই সকল দেহে অধিষ্ঠিত পুরুষ যদি একমাত্র হইত, তাহা হইলে একই সময়ে বিভিন্ন দেহে করণদিগের বিভিন্ন ক্রিয়া দৃষ্ট হইত না। এই সকল ক্রিয়া অনেক সময় বিপরীতমুখী। পুরুষ একমাত্র হইলে ক্রিয়ার এই বৈপরীত্য থাকিত না।

আবার দ্রষ্টা যখন ত্রিগুণান্বিত প্রধানের বিপরীত এবং প্রধান যখন এক, তখন দ্রষ্টা যে বহুসংখ্যক, তাহা বলিতেই হইবে। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়ের অর্থ তিন গুণের অন্যথাভাব। কোন কোনও সত্ত্বনিকায় (প্রাণীসমূহ) সত্ত্ববহুল (অর্থাৎ সত্ত্বগুণের আতিশয্যবান্), যেমন উর্দ্ধস্রোতঃ ত্রিকালজ্ঞ দেবতা প্রভৃতি; কেহ কেহ রজোবহুল, যেমন মানবগণ; আবার কেহ কেহ তমোবহুল, যেমন তির্য্যগযোনিগণ। এতাদৃশ ত্রৈগুণ্যের অন্যথাভাব সম্ভবপর হইত না, যদি পুরুষ একমাত্র হইত।"

"ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়" দ্বারা যে পুরুষের অস্তিত্ব ও বহুত্ব প্রমাণিত হইল, সেই পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ এবং তৎকর্ত্তৃক তাহার ভোগ সম্ভবপর কিনা, ইহা পরে আমরা দেখিতে পাইব।

সাংখ্যমতে পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু নাই। অথচ জীবের পুনর্জন্ম সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত এবং জন্মচক্র হইতে মুক্তিলাভই সাংখ্যের পরম পুরুষার্থ। এই পুনর্জন্ম হয় জীবের, পুরুষের নহে। এই জীবতত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে। তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ বোঝার প্রয়োজন।

৬

মহতের অভিব্যক্তি

পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে অভিব্যক্তি এক বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া আছে। সাংখ্যদর্শনও অভিব্যক্তির দর্শন। ইহার সহিত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অভিব্যক্তির বিরোধ না থাকিলেও, ইহা ভিন্ন প্রকারের। ইমানুএল ক্যাণ্ট সূক্ষ্ম নীহারিকা হইতে জগতের উদ্‌ভব হইয়াছে, বলিয়াছিলেন। নীহারিকা অনিবিড়-সন্নিবিষ্ট পরমাণু-পুঞ্জের সমবায়। সাংখ্য মতে বর্ত্তমান জগৎ যে প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভূত তাহাও সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ নামক অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের সমবায়। তাহারা পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, মন ও বুদ্ধি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলত্বপ্রাপ্তিই সাংখ্যের অভিব্যক্তি। এই স্থূল কার্য্য। জগৎ সূক্ষ্মরূপে তাহার কারণ প্রকৃতির মধ্যে ছিল, তাহা হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই সাংখ্য মত। প্রকৃতি হইতে এক দিকে যেমন জ্ঞানের করণদিগের, তেমনি জ্ঞানের বিষয়েরও উদ্‌ভব হইয়াছে।

জগৎ আদিতে কি অবস্থাপন্ন ছিল, ইহা জানিতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানব-মন উৎসুক। সাংখ্যের মতে জগতের সৃষ্টি হয় নাই, তাহার উপাদান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ চিরকালই বর্ত্তমান আছে। তবে এক সময় ছিল, যখন তাহারা অব্যক্ত ছিল, জগৎরূপে প্রকাশিত হয় নাই। জগৎরূপে তাহাদের ব্যক্ত হওয়াই সৃষ্টি। কিন্তু ব্যক্তি বা সৃষ্টি একবারমাত্র হয় নাই। সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি। তাহার আদি নাই ; অন্ত কোনও দিন আসিবে কিনা, কে জানে ?

বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্বে যে প্রলয়াবস্থা ছিল, তাহা ছিল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। তখন এই স্থূল জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ রূপে সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল। এই প্রলয়াবস্থা হইতে বর্ত্তমান জীবসমন্বিত জগতের উদ্‌ভব হইয়াছে। এই উদ্‌ভব হইয়াছে ক্রম অনুসারে। ক্রমানুসারে উদ্‌ভবই অভিব্যক্তি। সৃষ্টি ও প্রলয় যখন আদিহীন, তখন প্রথম সৃষ্টি কি ভাবে ও কখন হইয়াছিল, সে প্রশ্নের অবকাশ নাই।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে যে অভিব্যক্তির কথা বলে, তাহার কোনও লক্ষ্য আছে, এ কথা বলে না ; যদিও সরল হইতে জটিলের দিকে এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে এ পর্য্যন্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাংখ্যকার অচেতন প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত (immanent) এক লক্ষ্যের বা উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যের জ্ঞান প্রকৃতির নাই, কেমনা প্রকৃতি অচেতম। না থাকিলেও প্রকৃতির যাবতীয় কার্য্য এমন ভাবে চলে, যাহাতে তাহার মধ্যে অনুস্যূত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও অপবর্গসাধন। পুরুষ তাহাকে ভোগ করিবে, ইহাই প্রকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট উদ্দেশ্য। ভোগ অর্থে কেবল সুখ-দুঃখের ভোগ নহে ; "জানা"ও একপ্রকার ভোগ। এই ভোগদ্বারাই পুরুষের বন্ধন হয় ; সেই বন্ধন হইতে তাহার মুক্তি-সাধনও প্রকৃতির উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

উদ্দেশ্য আছে, অথচ সেই উদ্দেশ্যের জ্ঞান নাই, অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ক্ষুদ্র বটবীজ হইতে যে বৃহৎ বটবৃক্ষের উদ্‌ভব হয়, আম্রবৃক্ষ উদ্‌ভূত হয় না, ইহা তো দেখিতে পাওয়া যায়। বটবীজ তো জ্ঞানহীন। তবুও মৃত্তিকার মধ্যগত বটবীজের প্রত্যেক ক্রমিক পরিবর্ত্তন বটবৃক্ষের দেহের গঠনের উপযোগী হইয়াই সংঘটিত হয়, ইহাই বটবীজের "প্রকৃতি"।

কেহ কেহ বলিবেন বটবীজের নিজের মধ্যে কোনও সচেতন উদ্দেশ্য যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার বহিঃস্থ কোনও জ্ঞানময় পুরুষে সেই উদ্দেশ্য আছে ; ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বটবীজ আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে পরিণামিত করেন। সাংখ্যকার বলিবেন, এতাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। প্রকৃতির বাহিরে যে সকল পুরুষ আছে, তাহাদেরও এরূপ কোনও উদ্দেশ্য নাই। তাঁহারা ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ কোনও পুরুষও নাই। জগতের অভিব্যক্তির মূলে যে উদ্দেশ্য আছে, তাহার ধারক কোনও সচেতন জ্ঞানবান্ পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই।

সাংখ্যমতে অভিব্যক্তির ক্রম এইরূপ—

মূল প্রকৃতি কোন পদার্থের বিকার নহে। মহৎ অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সাতটি যেমন প্রকৃতি তেমনি বিকৃতি। অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার মহৎ, মহতের বিকার অহংকার, অহংকারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র, এই অর্থে মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র বিকৃতি। প্রত্যেকটি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীর বিকার। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকে আবার তাহার পরবর্ত্তীর কারণ। এই জন্য তাহাদিগকে

প্রকৃতিও বলা হয়। সুতরাং সাতটি "প্রকৃতি-বিকৃতি।" ইহাদের পরে ১৬টি —পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং উভয়-সাধারণ মনঃ এবং পঞ্চ স্থূল ভূত, এই ষোলটি—কেবল বিকার। তাহারা অন্য কিছুর কারণ নহে, তাহাদিগের হইতে অন্য কিছুই উদ্ভূত হয় না। তার পরে পুরুষ। পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। অর্থাৎ পুরুষ যেমন কিছুর কারণ নহে, তেমনি তাহার কোনও কারণও নাই। প্রকৃতির মতই স্বয়ম্ভু (Causa sui) ও অনাদি।

আদিতে সত্ত্ব-রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা—যাহার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহংকার; অহংকার হইতে এক দিকে পঞ্চতন্মাত্র, অন্যদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র হইতে স্থূলভূতগণ। এতৎ ব্যতীত পুরুষ। এই পঞ্চবিংশসংখ্যক "গণ"।* এই পঁচিশটি পদার্থ মাত্র জগতে আছে; ইহাদের অতিরিক্ত কোনও পদার্থই নাই। ইহারা দ্রব্য। ন্যায়দর্শন মতে দ্রব্য সংখ্যা নয়টি—পঞ্চভূত ও দিক্, কাল. মনঃ ও আত্মা। ইহাদের মধ্যে পঞ্চভূত, মনঃ ও আত্মা সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত। দিক্ ও কাল সাংখ্যমতে স্বতন্ত্র দ্রব্য নহে—তাহারা আকাশ-প্রকৃতিভূত প্রকৃতির গুণ বিশেষ। (দিক্-কালাবাকাশাদিভ্যঃ। সাং-সূ—২।১২)। দিক্ ও কাল আকাশের গুণ। এই জন্যই তাহারা আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য—নিত্যত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্বই বিভুত্ব।

অধ্যাপক দাসগুপ্ত বলেন—প্রলয়ান্তে যখন সৃষ্টি আরব্ধ হয়, তখন সমগ্র প্রকৃতি মহৎরূপে ব্যাকৃত হয় না। প্রকৃতি অসীম, তাহার একটি অংশমাত্র ব্যাকৃত হয়। অসীমের একটি অংশ তাহার বাহিরে গেলেও, অসীম অসীমই থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির ব্যাকৃত অংশ তাহার বাহিরে যায় না; প্রকৃতির মধ্যেই বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতির অংশবিশেষের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেও, অবশিষ্ট অংশ সাম্যাবস্থাতেই থাকে। মহতের যখন আবির্ভাব হয়, তখন মূল প্রকৃতির আয়তন সংকুচিত হয় না। আবার মহৎ হইতে যখন অহংকারের উদ্ভব হয়, তখন যদিও মহতের অন্তর্গত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণকণাদিগের একাংশ অহংকারে রূপান্তরিত হয়, তথাপি তাহাদ্বারা মহতের পরিধির হ্রাস হয় না। অনন্ত অব্যক্ত হইতে নূতন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কণিকা আসিয়া অহংকারে পরিণত মহৎকণিকাদিগের স্থান পূর্ণ করে।

---

* "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান্, মহতো অহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়ম্ ইন্দ্রিয়ং মনশ্চ। তন্মাত্রেভ্যঃ, স্থূল ভূতানি, পুরুষ, ইতি পঞ্চবিংশতিঃ গণঃ। সাং সূত্র—১।৬১।

এইরূপে সমগ্র অভিব্যক্তিক্রম চলিতে থাকে। যখন অভিব্যক্তির শেষ ক্রম উপস্থিত হয়, তখন তত্বান্তর পরিণাম হয় না—এক তত্ত্ব হইতে তত্বান্তরের উদ্‌ভব আর হয় না। তখন কেবল ভৌতিকও রাসায়ণিক পরিবর্ত্তনবশতঃ বস্তুর গুণের ব্যতিক্রম হয়।*

ডাঃ শীল লিখিয়াছেন, যে সাংখ্যের অভিব্যক্তি হইতেছে সাম্যাবস্থার মধ্যেই বৈষম্যের আবির্ভাব, অবিশেষের মধ্যে বিশেষের বিকাশ, অযুতসিদ্ধের (Incoherent) মধ্যে যুতসিদ্ধের (Coherent) উদ্‌ভব। ইহা বিভিন্ন অংশের সমবায় হইতে কোনও সমগ্র বস্তুর উদ্‌ভব নহে। আবার সমগ্র বস্তুর মধ্যে তাহার বিভিন্ন অংশের বিকাশও নহে। অপেক্ষাকৃত অল্প বৈশিষ্ট্য-প্রাপ্ত, অল্পনির্দ্দিষ্ট, অল্প-সংহত অবস্থা হইতে অধিকতর বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত, অধিকতর নির্দ্দিষ্ট, অধিকতর সমগ্রতার বিকাশই অভিব্যক্তির ক্রম। প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াই এই সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

অসীম প্রকৃতির এক অংশমাত্র ব্যাকৃত হইয়া জগতে পরিণত হয়। ইহার অর্থ প্রকৃতি যেমন জগদ্রূপে পরিণত, তেমনি জগদতীত। চরক-সংহিতা মতে অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষ। এই পুরুষ যেমন জগতে অনুস্যূত (immanent) তেমনি জগদতীত (transcendent)।

প্রকৃতির প্রথম সন্তান মহৎ। মহৎ শব্দের অর্থ বৃহৎ। মহৎ শব্দ মহ ধাতু হইতে উদ্‌ভূত হইলে, উহার অর্থ হইতে পারে পূজনীয়। (মহ্=পূজা করা)। অমরকোষে এক মহস্ শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে "উৎসব"। আর এক "মহস্" শব্দ আমরা পাই সপ্তব্যাহৃতির মধ্যে (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং)। ৺উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় আদিম বৈদিক ভাষায় প্রচলিত এক মহস্ বা মঘস্ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অর্থ জ্যোতিঃ। অমরকোষে মহস্ শব্দের এক অর্থ "তেজঃ" বলিয়া লিখিত আছে।

মহৎ শব্দ বৃহৎ অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, শ্রেষ্ঠ অর্থেও তেমনি ব্যবহৃত হয়। সাংখ্যদর্শনে "মহৎ" শব্দ বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বুদ্ধি সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক জ্যোতিঃ-স্বরূপ। এই জন্যই সম্ভবতঃ বুদ্ধিকে মহৎ বলা হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াও বুদ্ধি মহৎ নামের যোগ্য।

পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধি আত্মারই ধর্ম্ম। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে তাহাকে প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভূত বলা হইয়াছে। প্রকৃতি অচেতন! সুতরাং বুদ্ধিও অচেতন।

---

* History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 250.

চেতন পুরুষের প্রতিবিম্ব তাহার উপর পতিত হইলে তাহাতে চেতনের ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়।

৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় মহৎকে প্রকৃতির বিকার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে "প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ সাধিত হইলে অর্থাৎ জ্ঞ-জ্ঞেয় নামক সাক্ষাৎকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে যে আদিম বীজস্বরূপ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সাংখ্যেরা তাহাকে বলেন মহৎ। জ্ঞানের সেই আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, যে সম্প্রতি তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন।" তিনি আরও লিখিয়াছেন "সাংখ্যেরা যে সৃষ্টির কথা বলেন, তাহা বৈদিক সৃষ্টি নহে, দার্শনিক সৃষ্টি। তাহা স্থূলভূতের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা। সাংখ্যের মতে প্রত্যেক মানুষ আপন স্থূলভূতের (অর্থাৎ সংসারের) সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি যে অলীক সূর্য্যকে দেখিতেছে বলিয়া মনে কর, তাহা তোমার সৃষ্টি নয় ত কাহার সৃষ্টি? তুমি মরিয়া গেলে আর সে সূর্য্য কোথায় থাকিবে? এমন কি তুমি চক্ষু মুদিলে সে সূর্য্য বিলুপ্ত হয়। প্রত্যেক নরনারীর আত্মায় প্রকৃতি সংযোগ জন্য যে প্রথম জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহার নাম "মহৎ"; তাহা প্রকৃতই তোমার আমার বুদ্ধি।" শ্রদ্ধাস্পদ বটব্যাল মহাশয়ের এই মতকে পাশ্চাত্য দর্শনে Solipsism বলে। কিন্তু ইহা যে সাংখ্যমত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ সাংখ্যদর্শনের কোনও ভাষ্যকার এই ভাবে মহতের ব্যাখ্যা করেন নাই। সাংখ্য প্রকৃতিকে ও তাহা হইতে উদ্ভূত মহৎ, অহংকার, মন প্রভৃতি সকলকেই দ্রব্য বলিয়াছেন। বুদ্ধিকে কিরূপে দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু সাংখ্য মতে বুদ্ধি দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সাংখ্য বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বুদ্ধি, মনঃ ও অহংকার যেমন দ্রব্য, পঞ্চতন্মাত্র ও স্থূলভূতগণও তেমনি দ্রব্য। তাহারা প্রত্যয় বা বিজ্ঞানমাত্র (Ideas) নহে। বুদ্ধি হইতে তাহারা উদ্ভূত সত্য; কিন্তু বুদ্ধিও দ্রব্য। বুদ্ধির উপাদান সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বাহ্য দ্রব্যেরও উপাদান। সুতরাং বাহ্যদ্রব্যদিগকে প্রত্যয় বা বিজ্ঞানমাত্র মনে করিবার সংগত কারণ নাই। তাহারা বাস্তব (real) পদার্থ—বিজ্ঞানবাহ্য। কোনও বুদ্ধিতে তাহাদের জ্ঞান না হইলেও তাহাদের অস্তিত্বের অন্যথা হয় না।

বটব্যাল মহাশয় "মহৎ"কে ব্যক্তির বুদ্ধি বলিয়াছেন। সাংখ্যকারিকার ভাষ্য ও টীকাকারের মতও তাহাই মনে হয়। কিন্তু মহৎ যদি ব্যষ্টিবুদ্ধি হয়, এবং ব্যষ্টিবুদ্ধি হইতে যদি প্রত্যেক মনুষ্যের অহংকার ও মনের উদ্ভব

হয়, এবং ব্যষ্টি অহংকার হইতে যদি পঞ্চতন্মাত্র ও স্থূলভূতের উদ্‌ভব হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের জ্ঞাত বাহ্য জগৎ অন্যের জ্ঞাত জগৎ হইতে ভিন্ন হইবার কথা। পঞ্চতন্মাত্রগণ ও স্থূলভূতগণ যদি একই উৎস হইতে উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের অহংকার হইতে উদ্‌ভূত তন্মাত্রগণ এবং সেই তন্মাত্রগণ হইতে উদ্‌ভূত স্থূলভূতগণ, অন্যের অহংকার হইতে উদ্‌ভূত তন্মাত্র ও তাহাদিগের হইতে উদ্‌ভূত স্থূলভূত হইতে ভিন্ন বলিতে হইবে। সুতরাং সকল মনুষ্যের গ্রাহ্য এক অভিন্ন জগতের সম্ভাবনা থাকে না। সাংখ্যদর্শনে প্রত্যেক মনুষ্যের জগৎকে অন্য মনুষ্যের জগৎ হইতে পৃথক বলিয়া কোথাও গৃহীত হয় নাই। এই জন্য সাংখ্যের 'মহৎ'কে ব্যষ্টিবুদ্ধি না বলিয়া সমষ্টিবুদ্ধি বলাই সংগত। এই সমষ্টিবুদ্ধিই হিরণ্যগর্ভ। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকো আসীৎ। স দধার পৃথিব্যং দ্যাম্ উত ইমাং" (ঋগ্বেদ)। বেদান্তী বলেন "যা প্রথমজস্য হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ, সা সর্ব্বাষাং বুদ্ধীনাং প্রথমা প্রতিষ্ঠা, সেহ মহান্ আত্মা ইত্যুচ্যতে।" প্রথমজাত হিরণ্য-গর্ভের বুদ্ধি যাবতীয় বুদ্ধির প্রথম প্রতিষ্ঠা, তাহাই মহান্ আত্মা বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। কঠোপনিষদের "মনসস্তু পরা বুদ্ধি, বুদ্ধেরাত্মা মহান্ ততঃ"—এখানেও বুদ্ধির (ব্যষ্টিবুদ্ধির) পরে মহান্ আত্মার কথা বলা হইয়াছে। এই মহান্ আত্মাই হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মা—জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই সাংখ্যের মহৎ।

বুদ্ধি অধ্যবসায়। অধ্যবসায় শব্দের অর্থ নিশ্চিত জ্ঞান। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন "অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবতোঃ অভেদ-বিবক্ষয়া।" অর্থাৎ অধ্যবসায় বুদ্ধির ক্রিয়ারূপ। ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ অভিন্ন বলিয়াই অধ্যবসায় ও বুদ্ধি অভিন্ন। তাহার পরে বলিয়াছেন "সর্ব্বো ব্যবহর্ত্তা আলোচ্য, মত্বা, অহমত্র অধিকৃত, ইতি অধ্যবস্যতি। ততশ্চ প্রবর্ত্ততে, ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্।" অর্থাৎ সকলেই বস্তুদিগকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিয়া, পরে মনন করিয়া, তাহার পরে ইহা আমারই এই অভিমান করিয়া, তাহার পরে "ইহা আমার কর্ত্তব্য" এই অধ্যবসায় করে এবং তাহার পরে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তু "সম্মুগ্ধ"রূপে গৃহীত হয়। সেইরূপ জ্ঞানই "আলোচন"। তাহার পরে মনের সঙ্কল্প বিকল্প, তাহার পরে অহংকার ও সর্ব্বশেষে বুদ্ধির নিশ্চয় জ্ঞান হয়। ইহা হইতে দেখা যায়, বুদ্ধি যদি ব্যষ্টিবুদ্ধি হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়, মনঃ ও অহংকারের পরে তাহার আবির্ভূত হইবার কথা। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ভেদ অনুভূত না হইলে, অধ্যবসায় ক্রিয়া

হওয়া অসম্ভব। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিরাগ ও ঐশ্বর্য্য এবং তাহাদের বিপরীত, অধর্ম্ম অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য, ইহারাও বুদ্ধির বিভিন্ন রূপ। (সাং সূ—২৩) ইন্দ্রিয়, মন ও অহংকারের পূর্ব্বে ইহাদের আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। সুতরাং মহৎকে ব্যষ্টি-বুদ্ধি বলিয়া গণ্য করিলে অসংগতির উদ্ভব হয়। এই জন্ম প্রকৃতি হইতে যে বুদ্ধির উদ্ভব হয়, সেই বুদ্ধি অথবা মহৎকে বিষয় ও বিষয়ীর ভিত্তি বৈশ্বিক (Cosmic) বুদ্ধি বলিয়া গণ্য করাই সংগত। এই মহৎদ্বারা অন্ধতমসাবৃত প্রকৃতি আলোকিত হয়, জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য হয়। তাহার পরে অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যষ্টিবুদ্ধিসহ অহংকার, মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির আবির্ভাব হয়। ইহা স্বীকার না করিলে ব্যষ্টি জ্ঞানের ক্রম বোধগম্য হয় না।

কিন্তু বিশ্ববুদ্ধির সহিত সংযুক্ত কোনও বিশ্ব-পুরুষের অস্তিত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্য সূত্রের "ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (৩।৫৭) সূত্রে যে ঈশ্বর স্বীকৃত, যিনি সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা (৩।৫৬) বলিয়া বর্ণিত, সাংখ্য কারিকায় তাঁহার উল্লেখ নাই। তিনি জন্ম ঈশ্বর, নিত্য ঈশ্বর নহেন, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাও নহেন। কিন্তু মনুসংহিতা "আসীদিদং তমোভূতং" ইত্যাদি শ্লোকে (১।৫) প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া পর শ্লোকেই "মহাভূতাদি ইদং ব্যঞ্জয়ন্" (মহৎ, অহংকার হইতে মহাভূতগণ পর্য্যন্ত সকল বস্তুর স্থূলরূপে প্রকাশক) "স্বয়ম্ভু ভগবানের" আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন। চরক-সংহিতায় সাংখ্যদর্শনের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও এক পরমাত্মার কথা আছে। প্রাচীন সাংখ্যে যে এক পরমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইত, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

প্রকৃতি অসীম, পুরুষও অসংখ্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে "স্বয়ম্ভু ভগবান্" পুরুষ, সমষ্টি বুদ্ধি বা মহৎ সহ ব্যষ্টি বুদ্ধিদিগের সহিত অহংকার, মনঃ, ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও মহাভূতদিগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদুর্ভূত হন, ইহা স্বীকার না করিলে সাংখ্যদর্শনের মধ্যে যে অসংগতি আছে, তাহা দূরীভূত হয় না। বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র ও স্থূলভূতদিগের কালিক ক্রমে একটার পরে আর একটার উদ্ভবের কল্পনা না করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ অভিব্যক্ত জীবের বিশ্লেষণদ্বারা প্রাপ্ত মনে করিলেই এই অসংগতি দূরীভূত হয়।

সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি। সুতরাং প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কিছুরই কল্পনা করা যায় না। সৃষ্টি বলিতে বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভই বুঝিতে হয়। এই সময়ে যখন মহতের উদ্ভব হয়, তখন রজঃ ও তমঃকে সত্ত্ব অভিভূত করিয়াছে। এই অবস্থায়, পূর্ব্বকল্পের পুরুষদিগের যে সকল বুদ্ধি প্রলয়ে লীন ছিল, তাহারা

উদ্বুদ্ধ হয় এবং যাবতীয় অবিদ্যাচ্ছন্ন বুদ্ধিদিগকে ধারণ করিয়া মহৎ আবির্ভূত হয়। মহতের মধ্যে সকল ব্যষ্টিবুদ্ধিই বর্ত্তমান, কিন্তু এই সমষ্টি-বুদ্ধি ব্যষ্টি-বুদ্ধিদিগের সমষ্টি হইতে বৃহত্তর। সর্ব্ব ব্যষ্টি বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা-ভূমিকে মহৎ এবং ব্যষ্টি বুদ্ধিকে বুদ্ধি বলাই সংগত। মহৎই বিভু, ব্যষ্টি বুদ্ধি বিভু নহে। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বে অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায় চত্বারিংশ অধ্যায়ে আছে "ইহ লোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরম পুরুষ মহৎ তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন...তিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থান করেন, এবং সৃষ্টিকালে বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকেন।" *

মহৎ তত্ত্ব ও গায়ত্রী মন্ত্রের "সবিতুঃ বরেণ্যংভর্গঃ" এক বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। মহাভারতের অন্যত্র প্রকৃতিকে "পুরুষাবস্থা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং গায়ত্রীর সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ ও মহৎ তত্ত্বকে এক বলিলে প্রাচীন সাংখ্য মতের সহিত বিরোধ হয় না। মহৎ শব্দের অর্থ অমরকোষে 'বৃহৎ' বলিয়া লিখিত আছে। 'মহ' ধাতুর এক অর্থ পূজা করা, সুতরাং মহৎ শব্দে পূজনীয় (বরেণ্যং) বুঝায়। মহৎ শব্দের অন্য অর্থ জ্যোতিঃ, তেজঃ, বর্চ্চ। সুতরাং "বরেণ্য ভর্গ" ও মহৎ শব্দ সমার্থক। "বরেণ্যং ভর্গঃ" = পূজনীয় জ্যোতিঃ-স্বরূপ মহৎ। এই জ্যোতিঃ বুদ্ধির জ্যোতিঃ, তমোভূত প্রকৃতির তমোনাশক জ্যোতিঃ। †

মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব—৩০৩) বশিষ্ঠের এই উক্তি আছেঃ "পণ্ডিতেরা নারায়ণকে হিরণ্যগর্ভ বলেন। তিনি আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি হইতে মহৎ তত্ত্বের উদ্ভব হয়।" যিনি সকল ব্যষ্টি বুদ্ধির প্রতিষ্ঠাভূমি, তাঁহার নিকট হইতে যাবতীয় জীব তাহাদের বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হিরণ্যগর্ভই সমষ্টি বুদ্ধি। আমার বুদ্ধি, তোমার বুদ্ধি, রামের বুদ্ধি, শ্যামের বুদ্ধি সকল বুদ্ধিই হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির অন্তর্গত। কঠোপনিষদের ৩।১০।১১ শ্লোকে যে "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ"র কথা আছে, তিনি মহৎ তত্ত্ব। উক্ত বল্লীর ৬ শ্লোকে "সত্ত্বাৎ অধি মহান আত্মা" অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ মহৎ তত্ত্বের কথা আছে, এবং ৭ম শ্লোকে অব্যক্তের পরে "ব্যাপক, অলিঙ্গ পুরপুরুষে"র কথা আছে।

---

* কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ১৮৩৬ পৃঃ।

† যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন (ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ), সেই দেবতার ভর্গঃকে (যাহা সূর্য্যের ও বরেণ্য) ধ্যান করি—গায়ত্রী।

মহৎ বা বুদ্ধির স্বরূপ কি? অহংকার-বিযুক্ত মহতের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর-ভেদ নাই। যতক্ষণ অহংকারসহ বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ উদ্ভূত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে জ্ঞান বলা যায় না। কিন্তু এই ভেদ তাহার মধ্যে শক্যভাবে প্রথম হইতেই বর্ত্তমান এবং অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্রের উদ্ভব ও মহতের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত হয়। এই অহংকার বিশ্ব-অহংকার।

বুদ্ধি

বুদ্ধির নিকট ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় উপস্থিত করে; তাহার পর বুদ্ধি তাহাদিগকে পুরুষের সমক্ষে প্রদর্শন করে। পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে ভেদ, তাহা বুদ্ধিদ্বারাই জানা যায়। বুদ্ধির ক্রিয়া-সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকায় উক্ত হইয়াছে পুরুষের সমস্ত উপভোগ – ইষ্ট ভোগ, অনিষ্ট ভোগ উভয়ই—বুদ্ধি সিদ্ধ করে। আবার বুদ্ধিই প্রধান ও পুরুষের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদও প্রকাশ করে। বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ ভোগসাধনও যেমন হয়, তেমনি ভোগনিবৃত্তিও হইতে পারে। সমস্ত পুরুষার্থ বুদ্ধিদ্বারাই সিদ্ধ হয়।

পুরুষকে সাক্ষী ও দ্রষ্টা উভয়ই বলা হইয়াছে। পুরুষ যদি সর্ব্বসাক্ষী হয়, তাহা হইলে তাহার একরূপতা থাকে কিরূপে? সাংখ্য সূত্রে (১।১৬১) আছে। "সাক্ষাৎ সম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্" অর্থাৎ পুরুষের সাক্ষিত্ব—"সাক্ষাৎ" সম্বন্ধ কেবল বুদ্ধির সহিত। যিনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, তিনিই সাক্ষী। যে দৃষ্টিতে দ্রষ্টা ও দৃষ্টের মধ্যে ব্যবধান থাকে না, তাহাই সাক্ষাৎ দৃষ্টি (বিজ্ঞান ভিক্ষু)। এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পুরুষের কেবল বুদ্ধির সহিতই হইতে পারে। সুতরাং পুরুষ কেবল বুদ্ধিরই সাক্ষী, অন্য বস্তুদিগের দ্রষ্টামাত্র।

বুদ্ধির মধ্যে সত্ত্বগুণের বিশেষ আধিক্য এইজন্য বুদ্ধি অনেক পরিমাণে পুরুষের সদৃশ। এই জন্যই পুরুষের প্রতিবিম্বধারণে বুদ্ধি সমর্থ হয়। বুদ্ধি অচেতন হইলেও পুরুষের প্রতিবিম্ব যখন তাহার উপর পতিত হয়, তখন চেতনের মত হয়। প্রকৃতির স্বভাব হইতে পুরুষের স্বভাব ভিন্ন বলিয়া পুরুষের এইরূপ স্বভাব সিদ্ধ হয়: (১) সাক্ষিত্ব, (২) কৈবল্য, (৩) মাধ্যস্থ্য, (৪) দ্রষ্টৃত্ব, (৫) অকর্ত্তৃত্ব। পুরুষ নিঃসঙ্গ, উদাসীন (সুখ ও দুঃখে), অকর্ম্মা (প্রবৃত্তিহীন, নিবৃত্তিহীনও বটে) এবং দ্রষ্টা ও সাক্ষী। দ্রষ্টৃত্ব ও সাক্ষিত্বের ভেদ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ। সুতরাং বুদ্ধির সহিত পুরুষের অব্যবধানে সংযোগ সম্ভবপর কিনা, তাহা বিবেচ্য।

সাংখ্যদর্শনের সহিত পাতঞ্জল দর্শনের তত্ত্ববিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। পাতঞ্জল দর্শনে আছে সমাধিকালে দ্রষ্টা স্বরূপে—শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন। বুদ্ধির সহিত তখন তাহার কোনও সংস্পর্শ থাকে না। অন্যান্য সময়ে "পুরুষের বৃত্তিসারূপ্য হয়"। (বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র (১।৪)। ইহার ব্যাস ভাষ্যে আছে "ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ, তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ"—অর্থাৎ ব্যুত্থান (সমাধি হইতে উত্থিত অবস্থান) কালে চিত্তবৃত্তির সহিত পুরুষবৃত্তি অভিন্ন। ইহার পরে পঞ্চশিখের—"একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্" এই সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সূত্রের অর্থ "লৌকিক দৃষ্টিতে দর্শন (চৈতন্য) ও খ্যাতি (বুদ্ধি বৃত্তি) এক বলিয়া প্রতীতি হয়।" ইহার পরে ভাষ্যে আছে "চিত্তং অয়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ।" শান্ত ঘোর ও মূঢ় এই তিনটি চিত্তের বৃত্তি। বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ চিত্তের যে পরিণাম হয়, তাহাই চিত্তবৃত্তি। স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম স্থাপিত হইলে জবাকুসুমের রাগে স্ফটিক রঞ্জিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধির সহিত পুরুষের সন্নিধান ঘটিলে বুদ্ধির বৃত্তিসকল পুরুষে সমারোপিত হয়। ইহার ফলে "আমি শান্ত", "আমি দুঃখিত", "আমি মূঢ়" বুদ্ধিতে এই সকল অধ্যবসায় হয়। যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখকে মলিন দেখিয়া "আমি মলিন" মনে করিয়া বুদ্ধি দুঃখিত হয় (বাচস্পতি)। পাতঞ্জল দর্শনের "চিতেঃ অপ্রতিসংক্রমায়াঃ তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধি-সংবেদনং।" (৪।২২) এই সূত্রেও পুরুষের বৃত্তি-সারূপ্য বর্ণিত হইয়াছে। চিতি অর্থাৎ পুরুষের প্রতিসংক্রম অর্থাৎ অন্যত্র গমন নাই। চিৎরূপ বলিয়া পুরুষ অন্যকর্তৃক অসংকীর্ণ। চিত্ত পুরুষের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া তাহার আকার প্রাপ্ত হয়। নির্মল চন্দ্র নিশ্চেষ্ট থাকিলেও তাহার প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইয়া যেমন সমল ও সচল দৃষ্ট হয়, তেমনি চিতির প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত চিত্ত (বুদ্ধি + মনঃ + অহঙ্কার) নিশ্চল পুরুষকে ক্রিয়াবান্ রূপে প্রকাশিত করে। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি লিখিয়াছেন "চিত্ত পুরুষের সহিত সংযুক্ত নহে, পুরুষের সন্নিহিত। এই সন্নিধান দৈশিক ও কালিক নহে, কেননা দেশ ও কালের সহিত পুরুষের কোনও যোগ নাই। এই সন্নিধি যোগ্যতা-লক্ষণ—অর্থাৎ যোগ্যতাই এই সন্নিধির লক্ষণ। এই যোগ্যতা কি? বাচস্পতি বলেন—'পুরুষের ভোক্তৃশক্তি আছে, চিত্তের আছে ভোগ্যশক্তি। শব্দাদি আকারে যাহাই পরিণত হয়, তাহাই ভোগ্য। ভোগ যদিও শব্দাদি-আকারা চিত্তবৃত্তি, চিত্তের ধর্ম্ম, তথাপি চৈতন্য ও চিত্তের অভেদ-সমারোপ-বশতঃ—বৃত্তিসারূপ্যবশতঃ—এই ভোগ পুরুষের বলিয়া উক্ত হয়। সেইজন্য

চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগ না হইলেও চিত্তকর্তৃক কৃত উপকারের ভোগ (পুরুষকর্তৃক) যেমন সিদ্ধ, তেমন তাহার অপরিণামিতাও সিদ্ধ। "প্রকৃত ভোগ" না হইলেও "ভোগ করিতেছি" এই বোধ উৎপাদন করিবার সামর্থ্যকেই বাচস্পতি "যোগ্যতা" বলিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা পুরুষের ভোক্তৃত্বের ব্যাখ্যা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। পুরুষের সহিত বুদ্ধির দৈশিক ও কালিক কোনও সম্বন্ধ নাই। উভয়ে ভিন্নজাতীয় পদার্থ। পুরুষের প্রতিবিম্ব এ অবস্থায় বুদ্ধির উপর পতিত হওয়ার সম্ভাবনা কি? বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের আধিক্য যতই হউক না কেন, তাহা কখনও চিৎ পদার্থে পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং চিতির প্রতিবিম্ব বুদ্ধির উপর কিরূপে পতিত হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিগম্য হয় না। এই প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও ইহার ফলে বুদ্ধি কিরূপে চেতনবৎ হয়, চৈতন্যের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাও বোঝা যায় না। চন্দ্র ও জল উভয়ই জড়বস্তু। সুতরাং একের অন্যের ধর্ম্ম পাওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু চন্দ্রকিরণ জলের উপরে পতিত হইলে জল উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় মাত্র, তাহার গুণের পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তদ্বারা বুদ্ধির চেতনত্ব-প্রাপ্তি বোধগম্য হয় না। সাংখ্য সূত্রে ইহার ব্যখ্যার জন্য উপমার প্রয়োগ করা হইয়াছে। অয়স্কান্ত মণির সন্নিধিমাত্রই যেমন শল্যাদির নিষ্কর্ষণ হয়, (অয়স্কান্ত = চুম্বক লৌহ। কোথাও লৌহ শলাকা বিদ্ধ হইলে চুম্বক লৌহ-বিদ্ধ অঙ্গের সন্নিকটে স্থাপন করিলে লৌহ শলাকা বাহির হইয়া আসে) তেমনি পুরুষের সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মহৎতত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়। পুরুষের সংকল্পদ্বারা হয় না। এই অর্থেই পুরুষ এই জগতের কারণ। এই অর্থে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বর্ত্তমান। এই কর্ত্তৃত্ব যে কেবল আদি পুরুষেরই (হিরণ্যগর্ভের) আছে, তাহা নহে। সকল পুরুষেরই আছে। অন্তঃকরণ পুরুষ-কর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত হয় বলিয়া অন্তঃকরণকে পুরুষ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বলা যায়। যেখানে অন্তঃকরণ সেখানেই পুরুষের অস্তিত্ব। অন্তঃকরণকর্ত্তৃক উপলক্ষিত, অর্থাৎ অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষই "জীব" শব্দ বাচ্য (বিজ্ঞান ভিক্ষু ১।৯৭ সূত্রের ভাষ্য)। তপ্ত লৌহ যেমন অগ্নিকর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত, অন্তঃকরণও তেমনি পুরুষকর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত। এই উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণ চেতনবৎ প্রতীত যয়। ইহাই অন্তঃকরণে পুরুষের অধিষ্ঠান। সুতরাং অন্তঃকরণকে ঘটাদির মতো অচেতন বলা যায় না। কিন্তু এই উজ্জ্বলতা হইতে পুরুষের সহিত অন্তঃকরণের সংযোগ অনুমান করাও যায় না। অন্তঃকরণে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাদ্বারাই অন্তঃকরণের উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়।

পুরুষচৈতন্য অন্তঃকরণে সংক্রামিত হয় না—যেমন অগ্নির প্রকাশাদি লৌহে-সংক্রামিত হয় না। অন্তঃকরণের সহিত পুরুষের যে এই বিশেষ প্রকারের সংযোগ, তাহা যেমন অন্তঃকরণে পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতনের হেতু, তেমনি পুরুষেও অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব-পতনের হেতু। বুদ্ধিতে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা পুরুষের আপনাকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে (বুদ্ধৌ চৈতন্য-প্রতিবিম্ব চৈতন্য-দর্শনার্থং, মুখপ্রতিবিম্ববৎ—বিজ্ঞান ভিক্ষু সাং সূ—১।৯৯) বুদ্ধিতে এই প্রতিবিম্ব চিৎ-ছায়াপত্তি, চৈতন্যাধ্যাস, চিদাভাস প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়। চৈতন্যে বুদ্ধির যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা বুদ্ধিতে আরূঢ় বিষয়ের সহিত বুদ্ধির ভান বা প্রকাশ। বুদ্ধিতে যে সকল বস্তু গৃহীত হয়, বুদ্ধিতে তাহাদের আকার প্রতিবিম্বিত হয়, অথবা বুদ্ধি তদাকারে আকারিত হয়। তাহা হইলেও বুদ্ধি অচেতন বলিয়া তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধিতে হয় না। জ্ঞানের জন্য চৈতন্যের প্রয়োজন। চৈতন্যরূপী পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত এবং বিষয়াকার-সমন্বিত বুদ্ধি পুরুষে প্রতিবিম্বিত না হইলে এই জ্ঞান হয় না। কিন্তু এই জ্ঞান পুরুষের পরিণাম নহে। পুরুষ অপরিণামী, অপ্রতিসংক্রম। সেই জন্যই জ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্য বুদ্ধি ও পুরুষ উভয়ত্রই প্রতিবিম্বপাত স্বীকৃত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র যে "যোগ্যতা"র কথা বলিয়াছেন, তাহাদ্বারা যদি পুরুষের ভোগের ব্যাখ্যা করিতে হয়, বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগ না হইলেও বুদ্ধিতে তাহার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহার ফলে বুদ্ধিতে প্রকাশিত সকল পদার্থের ভোগ করিবার যোগ্যতা যদি পুরুষের থাকে, তাহা হইলে মোক্ষ অবস্থাতেও এই যোগ্যতার ফলে পুরুষের ভোগ হইতে পারে। এই যুক্তিতে বিজ্ঞান ভিক্ষু বাচস্পতির মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পুরুষ কর্তৃত্বহীন। কর্ম্ম যাহা, তাহা বুদ্ধিতেই করে; কিন্তু পুরুষ তাহার ফল উপভোগ করে। রাজা যেমন অন্যকৃত অন্ন উপভোগ করেন, পুরুষও তেমনি বুদ্ধিকৃত কর্ম্মের ফল উপভোগ করেন।

দেহ ও আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ। এইরূপ বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে, ইহা দর্শনের এক পুরাতন প্রশ্ন। পাশ্চাত্য দর্শনে সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক জি'উলিংক্স বলিয়াছেন, ঈশ্বর সর্ব্ব শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া আত্মা ও দেহের মধ্যে সংযোগ-সাধন করেন। যখন কোনও বাহ্য দ্রব্য আমাদের ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানোৎপাদন ক্রিয়া উৎপন্ন করে, ঈশ্বরই তখন আমাদের আত্মায় তাহার উপযোগী জ্ঞানের সৃষ্টি করেন। যখন আমাদের মধ্যে কোনও ইচ্ছা উদ্ভূত হয়, ঈশ্বর তখন আমাদের

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই ইচ্ছানুসারে চালিত করেন। সাংখ্য মতে দেহ একটি স্বতশ্চালিত যন্ত্র। ইহার মধ্যে যে সকল ক্রিয়া হয়, তাহার জন্য দেহের অধিষ্ঠাতা চিৎস্বরূপ কোনও পুরুষের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যতক্ষণ পুরুষের সহিত বুদ্ধির পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত উপায়ে সংযোগ সাধিত না হয়, ততক্ষণ বুদ্ধির যাবতীয় প্রক্রিয়াই অচেতন ক্রিয়ামাত্র থাকে। পুরুষের সহিত সংযোগ হইলেই তাহারা অনুভূতি জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি শব্দবাচ্য হয়।

বুদ্ধি যাহা পুরুষের নিকট উপস্থিত করে-বিষয়াকারে আকারিত বুদ্ধি-প্রতিবিম্ব—পুরুষ তাহা ভোগ করে। কিন্তু সেই ভোগদ্বারা পুরুষের পরিণাম হয় না, তাহার শুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। "আমি সুখী", "আমি ভোগী", "আমি দুঃখী" প্রভৃতি যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরুষ-কর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত বুদ্ধির জ্ঞান। তাহা অবিদ্যা। এই অবিদ্যা জন্মে জন্মে সঞ্চিত হয়। পুরুষ যদি এমন উপায় অবলম্বন করিতে পারে, যাহাতে বুদ্ধি তাহার সান্নিধ্যে আসিতে না পারে, তাহা হইলেই এই অবিদ্যা অথবা মিথ্যা জ্ঞানের বিনাশ হয়, এবং তাহা হইতে যে দুঃখরূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়, (তাহা পুরুষকে প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করুক বা না করুক তাহা অমঙ্গলই) সেই অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। সে উপায় হইতেছে জ্ঞান—পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র ও মুক্ত—এই জ্ঞান। কিন্তু "আমি শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র", এই জ্ঞান পুরুষের হওয়া সম্ভবপর কি ? এ জ্ঞানও তো পুরুষের প্রতিবিম্বধারী বুদ্ধির। পুরুষের মধ্যে আমিত্ব নাই। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই, যে মহতের যে অংশ ব্যক্তিগত বুদ্ধি, যাহা বিশেষ বিশেষ পুরুষের সন্নিধানে স্থিত ও তাহার সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত, এবং সেই সেই পুরুষ-কর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত, তাহারই বন্ধন এবং তাহারই মুক্তি হয়। পুরুষ নিত্য অপরিণামী—তাহার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। যে দুঃখত্রয়াভিঘাতের কথা সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য সূত্রের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের নহে। সে দুঃখবোধ সত্য, তাহা পুরুষেরই হউক, অথবা প্রকৃতিরই হউক। তাহা অমঙ্গল (Evil)। সুতরাং তাহার উচ্ছেদের প্রয়োজন আছে। তাহার উচ্ছেদের জন্যই সাংখ্য শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বুদ্ধি, অহংকার ও মন—এই তিনটি অন্তঃকরণ। অন্তরিন্দ্রিয় মন ও দশ বহিরিন্দ্রিয় এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই প্রধান।

ভৃত্যবর্গের মধ্যে যেমন একজন শ্রেষ্ঠ ভৃত্য থাকে তদ্রূপ স্বয়ং করণ হইলেও মন অপর ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু মনের সহিত যুক্ত না হইলে কোনও ইন্দ্রিয়ই পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে না। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এখানে মন

শব্দ বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনকে অখিল সংস্কারের আধার বলা হইয়াছে। কিন্তু মন যদি বুদ্ধির অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে অখিল সংস্কার থাকা সম্ভবপর হয় না। বুদ্ধিই সকল করণে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্য তাহার ক্রিয়া সর্ব্বত্রই দেখা যায়। যাবতীয় সংস্কারের আধার বুদ্ধি, মনও নহে, ইন্দ্রিয়গণও নহে। ইন্দ্রিয়গণ যে সংস্কারের আধার নহে, তাহার প্রমাণ এই যে লোকের দৃষ্টি অথবা শ্রবণাদি শক্তি নষ্ট হইয়া গেলেও পূর্ব্বদৃষ্ট পূর্ব্বশ্রুত প্রভৃতি বিষয়ের স্মৃতি থাকে। যদি ইন্দ্রিয়গণই সংস্কারের আধার হইত, তাহা হইলে তাহাদের নাশের সঙ্গে সংস্কারের নাশ হইত। মন যে সংস্কারের আধার নহে, তাহার প্রমাণ এই যে তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে যখন অহংকার ও মনের লয় হয়, তখনও স্মৃতি থাকে। পরিশেষে স্মৃতিরূপ বৃত্তি হইতেও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা অনুমান করা যায়। "স্মৃতি" শব্দের অর্থ এখানে চিন্তনরূপা বৃত্তি। যাহাকে 'ধ্যান' বলে, তাহাই চিন্তা। সকল বৃত্তির মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এই চিন্তাবৃত্তির আধার বলিয়া বুদ্ধিই সকল করণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সাং সূ ২।৪৩)।

কিন্তু চিৎ-স্বরূপ পুরুষকে চিন্তাবৃত্তির আশ্রয় না বলিয়া বুদ্ধিকে তাহার আশ্রয় বলিবার কারণ কি? ইহার উত্তর—পুরুষ কুটস্থ—তাহার স্বতঃসিদ্ধ চিন্তাবৃত্তি নাই। আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে, চিন্তাবৃত্তি, সংস্কারাধারত্ব প্রভৃতি যদি বুদ্ধিরই হইল, তাহা হইলে অন্যান্য করণের অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে বুদ্ধি এই সকল করণের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে অক্ষম। ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধি তাহার কর্ম্মের দ্বারাই অর্জিত। সেইজন্য তাহার বুদ্ধি তাহার অর্থসাধনের জন্যই চেষ্টা করে। সংসারে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, যে যাহা অর্জ্জন করে, তাহা তাহারই কাজে লাগে। পুরুষ কূটস্থ; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নিজে কোনও কর্ম্ম করে না, ইহা সত্য। কিন্তু তাহার ভোগসাধক কর্ম্মের স্বামী পুরুষই গণ্য হয়। যেমন রাজা নিজে যুদ্ধ না করিলেও জয় পরাজয় তাহারই হয়। কেহ কেহ বলেন বুদ্ধিতে পুরুষের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, কর্ম্ম তাহারই। তাহা ঠিক নহে। প্রতিবিম্বের তো বাস্তব অস্তিত্ব নাই; সুতরাং তাহা দ্বারা কর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ম্ম ও ভোগ যদি প্রতিবিম্বেরই হয়, তাহা হইলে পুরুষ-কল্পনার প্রয়োজন কি? ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত।

বুদ্ধি, অহংকার, মন, বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহারা সকলেই করণ, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা পুরুষের অর্থ সিদ্ধ হয়। পুরুষার্থসাধক বলিয়া সকল করণই সমান হইলেও, সকলের মধ্যে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, যেমন রাজকর্ম্ম-

চারিগণ রাজভৃত্য বলিয়া সকলেই সমান হইলেও মন্ত্রীই সকলের মধ্যে প্রধান। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, এই জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে বুদ্ধিকেই মহৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু কঠোপনিষদে যাহাকে মহান্ আত্মা বলা হইয়াছে, তিনি বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। (বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ)। এই মহান্ আত্মা সর্ব্বব্যষ্টি বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বলিয়া মহান্। তিনি মহনীয় অর্থাৎ বরণীয়। তিনি জ্যোঃতি-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানময়। তিনি শুধু মহান্ নহেন, মহান আত্মা। অত্ ধাতু হইতে আত্মা শব্দ নিষ্পন্ন। অত্ ধাতুর অর্থ জানা। জ্ঞান যাহার স্বরূপ, তিনিই আত্মা। মহান্ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, তিনি বরণীয়, তিনি সর্ব্ব-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। কূটস্থ পুরুষের—নির্গুণ ব্রহ্মের—প্রকাশিত রূপ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক পুরুষ অনাদিকাল হইতে একটি স্বতন্ত্র লিঙ্গ শরীরের সহিত সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেক লিঙ্গ শরীরের বিশেষত্ব আছে। তাহার বিশেষত্বই তাহার পুরুষের বিশেষত্ব। কিন্তু পুরুষ অসঙ্গ। লিঙ্গ শরীরের সহিত তাহার প্রকৃত সংযোগ থাকিতে পারে না। অসংখ্য পুরুষ সকলেই একরূপ, তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। সুতরাং যে কোনও পুরুষের সহিত যে কোনও লিঙ্গ শরীর যুক্ত হইবার বাধা নাই। বুদ্ধি যখন কর্ম্মার্জিত (সাং সূ—২।৪৬) এবং কর্ম্ম যখন পুরুষের নহে, পুরুষের বলিয়া কল্পিত হয় মাত্র, তখন কেন যে অনাদিকাল হইতে লিঙ্গ-শরীর-সমন্বিত এক এক বুদ্ধি এক এক পুরুষের বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার সন্তোষজনক কোনও কারণ নাই। লিঙ্গ শরীরের সহিত পুরুষের সংযোগ প্রকৃত, কর্ম্মও পুরুষের, ইহা স্বীকার করিলে উপরি উক্ত আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য তাহা স্বীকার করেন না।

যে প্রতিবিম্ববাদ-দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষু জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। বুদ্ধি অচেতন। পুরুষে পতিত তাহার প্রতিবিম্বও নিশ্চয়ই অচেতন। সুতরাং পুরুষের সহিত বুদ্ধির সংস্পর্শ যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির প্রতিবিম্বের সহিত পুরুষের সংস্পর্শ কিরূপে হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ পুরুষ যখন দেশকালের অতীত। আবার চিৎস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিম্ব কিরূপ, তাহা বোঝাও সহজ নহে। ইহা কি পুরুষের Double? যাহা হউক এই প্রতিবিম্ব হয় চেতন, নতুবা অচেতন। চেতন যদি হয়, এবং তাহাদ্বারা বুদ্ধিতে চৈতন্যের সঞ্চার যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পুরুষকর্ত্তৃকই বা তাহা সম্ভবপর নহে কেন? এই প্রতিবিম্ব-কল্পনা তাহা হইলে নিরর্থক। আর

পুরুষের প্রতিবিম্ব যদি অচেতন হয়, তাহা হইলে তাহাদ্বারা বুদ্ধির চৈতন্য অথবা চেতনের মত প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব। কেন না প্রতিভান তো বুদ্ধির নিজের নিকটই। বুদ্ধি চেতনে পরিণত না হইলে, তাহাকে চেতন বলিয়া মনে করিবে কে? সাংখ্য তাঁহার পুরুষকে মন, বুদ্ধি ও অহংকার হইতে এত বিভিন্ন বলিয়াছেন, যে তাহাকে Transcendental self বলিয়া মনে করিলেও, বুদ্ধি, মন ও অহংকার দ্বারা তাহার বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না।

অহংকার

প্রকৃতি হইতে মহৎ অভিব্যক্ত হয়; মহৎ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে ষোড়শ-সংখ্যক গণ (পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়); এবং সেই গণের অন্তর্গত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূতের উদ্ভব হয়। মহৎ সংবিদ, কিন্তু আত্মসংবিদ্ (Self-Consciousness) নহে। ইতর জীব-জগতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের জন্তুদিগের মধ্যে আত্মসংবিদ্ আছে কিনা, অনিশ্চিত; নিম্নস্তরে যে নাই তাহা নিশ্চিত। আত্মসংবিদের সাক্ষাৎ পাই মানুষের মধ্যে। আত্মসংবিদহীন জ্ঞানের প্রথম অবস্থা মহৎ। ইহা জ্ঞানের প্রথম উন্মেষের অবস্থা। "আমার জ্ঞান" এই বোধ সেই জ্ঞানের মধ্যে নাই। এই রূপেই প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান প্রথম আবির্ভূত হয়। বিশ্ব মহতের (Cosmic Consciousness) আবির্ভাবের পরে, তাহার মধ্যে অহংকারের বিকাশ হয়। এই অহংকারও বিশ্ব অহংকার—সমষ্টি বুদ্ধির মধ্যে সমষ্টি অহংকার। উভয় হইতে বিশ্ব আত্মজ্ঞানের (Universal Self-Consciousness) আবির্ভাব হয়।

অভিমানই অহংকার। অহংকার হইতে দ্বিবিধ সর্গ (সৃষ্টি) হয়—একাদশ গণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও উভয়-সাধারণ মন) ও পঞ্চ তন্মাত্র।

বিশ্ব বুদ্ধি ও বিশ্ব অহংকারের মধ্যে ব্যষ্টি বুদ্ধি ও ব্যষ্টি অহংকার বিকাশিত হয়। অহংকার প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আছে। অতি নিম্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে ব্যক্তভাবে না থাকিলেও বীজরূপে আছে।

সৎকার্য্যবাদ মতে কার্য্য কারণের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবে থাকে। সুতরাং মহতের মধ্যেই অহংকার সূক্ষ্ম ভাবে থাকে, পরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বিশ্ব অহংকার প্রকাশিত হইবার পরে তাহা ব্যষ্টি বুদ্ধির মধ্যে বিকশিত হয়।

ইহাকে "অস্মিতা" বলে। ইহার দুই রূপ—অহন্তা ও মমতা। "ইহা আমি" এই বোধ "অহন্তা"; "ইহা আমার" এই বোধ "মমতা"। দেহে আত্মবোধ অহংকারেরই ফল। পুরুষ নিশ্চেষ্ট, কিছুই করে না, কিন্তু প্রকৃতির গুণই সকল কর্ম্ম করে, অহংকারবিমূঢ় আত্মা আপনাকে তাহাদের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে (গীতা)। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তির হেতু প্রকৃতি। কিন্তু সুখ ও দুঃখের যে ভোগ, তাহার ভোক্তৃত্ব পুরুষের। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু পুরুষ কর্ম্ম যেমন করে না, ভোগও তেমনি করে না। অহংকারই এই ভোক্তৃভাবের কারণ (গীতা)।

অহংকারের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? বাহ্য ইন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় ও তন্মাত্র হইতে তাহাদের কারণভূত অহংকারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ১।৬৩ সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু অহংকারের স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চতন্মাত্র সকলই দ্রব্য। সুতরাং অহংকারও দ্রব্য, দ্রব্যের গুণ নহে। "অহংকারশ্চ অভিমানবৃত্তিকং অন্তঃকরণ-দ্রব্যং, নতু অভিমানমাত্রং, দ্রব্যস্য এব লোকে দ্রব্যোপাদানত্বদর্শনাৎ।" অর্থাৎ অভিমান অহংকারের বৃত্তি। অহংকার অন্তঃকরণ-দ্রব্য, কেবল অভিমান নহে। দ্রব্য হইতেই কেবল দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। পঞ্চতন্মাত্র যখন দ্রব্য, তখন তাহাদের কারণ অহংকারও দ্রব্য। আবার সুষুপ্তিকালে অহংকারের বৃত্তি অভিমানের নাশ হয়। অহংকার যদি অভিমান মাত্র হইত, তাহা হইলে তাহার নাশের সঙ্গে তাহা হইতে উদ্ভূত পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াদি ও পঞ্চভূতেরও নাশ হইত।

বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে বুদ্ধি, অহংকার ও মন, এই তিনটি অন্তঃকরণ। ইহারা জ্ঞানের করণ। প্রকৃতপক্ষে ইহারা এক হইলেও বৃত্তিভেদে ভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। বাঁশ একটি, কিন্তু তাহার অনেক পর্ব্ব থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বকে যেমন পরবর্ত্তী পর্ব্বের কারণ বলা হয়, তেমনি অহংকারকে মনের এবং বুদ্ধিকে অহংকারের কারণ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ভিক্ষু বশিষ্ঠ-সংহিতা হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে চিত্ত, চেতঃ ও মনঃ অন্তঃকরণ-বৃক্ষের বিভিন্ন বৃত্তি মাত্র, অন্তঃকরণের অবস্থা-ভেদ মাত্র। সাংখ্যশাস্ত্রে চিন্তাবৃত্তি-রূপী চিত্ত বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত, অহংকারও বুদ্ধির অন্তর্গত।

পুরুষ অসংখ্য। তাহারা অনাদি। সাংখ্যদর্শনে এই সকল পুরুষের ধারক কোনও এক অসীম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে, সকল পুরুষই সাংখ্য মতে বিভু। সুতরাং "ঈশ্বরাণাং পরমো মহেশ্বর"-রূপ অনন্ত পুরুষের সহিত অন্য পুরুষদিগের সম্বন্ধ কি, সাংখ্যদর্শনে সে প্রশ্ন উঠে না। সাংখ্যের সকল

পুরুষই অসঙ্গ, কাহারও সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধই নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রত্যেক পুরুষের সহিত প্রকৃতির সঙ্গ-প্রাপ্তি হয়, এবং প্রত্যেক পুরুষের সহিত স্বতন্ত্র-বুদ্ধি ও স্বতন্ত্র অহংকার সংযুক্ত হয়। এই সকল ব্যষ্টি-বুদ্ধির সহিত সমষ্টি-বুদ্ধি-রূপ মহত্তের সম্বন্ধ কি, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি সমষ্টি-বুদ্ধি হইতেই আগত হয়। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"। যিনি বাহ্য জগতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ-রূপে প্রকাশিত, অন্তর্জ্জগতে আমাদের বুদ্ধি-রূপেও তিনিই প্রকাশিত। আমাদের বুদ্ধি তাঁহার বুদ্ধিরই অন্তর্গত, তিনিই আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করেন। বিভিন্ন সংস্কারযুক্ত বিভিন্ন বুদ্ধির গতি বিভিন্ন দিকে। পরস্পর বিভিন্ন-দিকগামী বুদ্ধিদিগের সেই অনন্ত বুদ্ধির মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু বহুত্ববাদী সাংখ্যের নিকট সে সমস্যা নাই।

অহংকার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। বৈকৃত অহংকার হইতে সাত্ত্বিক একাদশ (ইন্দ্রিয়) উদ্‌ভূত হয়। ভূতাদি নামক অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উদ্‌ভব হয়। ইহা তামস। তৈজস অহংকার হইতে (রাজসিক অহংকার) উভয়ই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সত্ত্ব ও তমঃ নিষ্ক্রিয় বলিয়া রজঃদ্বারা চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গ ও তন্মাত্রদিগের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হয়। অহংকারের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন গুণই বর্ত্তমান। রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব গুণ যখন প্রবল হয়, তখন সেই অবস্থাপন্ন অহংকারকে বৈকৃত বা সাত্ত্বিক অহংকার বলে। যখন সত্ত্ব ও তমঃকে অভিভূত করিয়া রজঃ গুণ প্রবল হয়, তখন সেই অবস্থাপন্ন অহংকারকে রাজসিক অহংকার বলে। আবার তমঃ যখন সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভূত করে, তখন সেই অবস্থার নাম তামস অহংকার। প্রকাশ-স্বভাব ইন্দ্রিয়গণ উদ্‌ভূত হয় বৈকৃত অহংকার হইতে; তমঃ-প্রধান তন্মাত্রগণ উদ্‌ভূত হয় তামস অহংকার হইতে। অহংকার হইতে অন্য কিছুই উদ্‌ভূত হয় না। তবে রাজসিক অহংকারের কার্য্য কি? সত্ত্ব ও তমঃ স্বতঃই নিষ্ক্রিয়, স্বকার্য্য-সম্পাদনে অক্ষম। রজঃ চঞ্চল। রজঃকর্ত্তৃক চালিত হইয়াই সত্ত্ব ও তমঃ তাহাদের কার্য্য করে। উভয়ের কার্য্যের জন্যই রজঃর প্রয়োজন। (বাচস্পতি)। জীবের সমস্ত কার্য্য অহংকার-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ কিছুই করে না। কিন্তু ভোগ হয় পুরুষের। অহংকারের উদ্দেশ্যই পুরুষের ভোগসাধন করা। ভোগ উৎপন্ন হয় অহংকারের কার্য্যদ্বারা। যে অহংকার যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আমিত্ব জ্ঞান উৎপাদন করে, এবং তাহার সহযোগে

"অহন্তা" ও "মমতা" জ্ঞান উৎপন্ন করে, সেই অহংকারের কার্য্যদ্বারাই সেই পুরুষের ভোগ হয়। জাগতিক সমস্ত কার্য্য বৈশ্বিক অহংকারদ্বারাই কৃত হয় ; ঈশ্বর-কর্তৃক নহে, কেননা এরূপ ঈশ্বরের কোনও প্রমাণ নাই।

উপনিষদে আছে "অহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়"। এই যে সৃষ্টি, ইহা অহংকার-পূর্ব্বিকা সৃষ্টি। এই সৃষ্টির পূর্ব্বেই এক বিশ্ব অহংকার উদ্‌ভূত হইয়াছিল। তিনিই বহু হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। আমিত্ব-জ্ঞান না হইলে সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সাংখ্য বলেন, এই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নহেন। তবে এই অহংকারের উদ্‌ভব হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন—অদৃষ্টবশতঃই অহংকারের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতিতে যে বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তাহার অন্য কোনও কারণ নাই। কর্ম্ম হইতে তাহার উদ্‌ভব কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থা উপস্থিত হয় (বিজ্ঞান ভিক্ষু)।

অহংকারদ্বারা জগৎ-সৃষ্টি হয়। কিন্তু জগতের পালন-কার্য্য করে কে? ইহার উত্তরে—"মহতো অন্যাৎ"…সাং সূ ৬।৬৬। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন এই সূত্রের অর্থ অহংকারকৃত সৃষ্টি ও সংহার ব্যতীত অন্য কার্য্য অর্থাৎ জগতের পালন-কার্য্য মহত্তত্ত্ব দ্বারা হয়। মহত্তত্ত্ব উপাধিসমন্বিত হইয়া বিষ্ণু জগতের পালন কার্য্য করেন। মহত্তত্ত্ব-উপাধি-সমন্বিত বলিয়াই বিষ্ণুকে "মহান্, বা পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম" বলে। শাস্ত্রে আছে "যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তৎ মহদাত্মকং", অর্থাৎ যাঁহাকে বাসুদেব বলা হয়, তিনিই মহদাত্মক চিত্ত। সাংখ্য শাস্ত্রে কারণ ব্রহ্ম পুরুষসামান্য, নির্গুণ। সগুণ ব্রহ্ম অস্বীকৃত। সাংখ্যে "কারণ" শব্দে যিনি স্বশক্তি-প্রকৃতিরূপ-উপাধিযুক্ত পুরুষ, অথবা নিমিত্ত কারণ পুরুষ তাঁহাকে বুঝায়। পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, এইজন্য পুরুষ নিমিত্ত কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। "অত্র শাস্ত্রে কারণব্রহ্ম তু পুরুষ-সামান্যং নির্গুণমেব ইষ্যতে, ঈশ্বরানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ কারণশব্দঃ স্বশক্তি-প্রকৃত্যুপাধিকো বা নিমিত্ত কারণতাপরোবা, পুরুষার্থস্য প্রকৃতি-প্রবর্ত্তকত্বাৎ ইতি মন্তব্যং।"

কিন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষুর অর্থ সংগত বলিয়া মনে হয় না। অহংকারের অধীন কার্য্য জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—সকলই। যে ঈশ্বরকে বর্ত্তমান সাংখ্য অস্বীকার করেন, মহতে অধিষ্ঠিত অহংকারই সেই ঈশ্বর। তিনিই স্রষ্টারূপে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি, সংহার-কর্ত্তারূপে রুদ্র ও পালন-কর্ত্তারূপে বিষ্ণু নামে পুরাণে অভিহিত। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্বয়ম্ভূ ভগবান্ মহদাদিসহ

আবির্ভূত হন। "মহতো অন্যৎ"—এই সূত্রের অর্থ মহৎ হইতে অন্যের (অহংকারের) উদ্ভব হয়।*

পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে স্ব-স্বামিভাব (ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব), তাহা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি ও কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। পঞ্চশিখ বলেন, তাহার কারণ অবিবেক। সনন্দনাচার্য্য বলেন লিঙ্গ-শরীরই ইহার কারণ। এই স্ব-স্বামিভাবের উচ্ছেদ-সাধনই পরম পুরুষার্থ। কর্ম্ম, অবিবেক বা লিঙ্গশরীর যাহাই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগের কারণ হউক না কেন, এই সংযোগ ও পুরুষ-প্রকৃতির ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব অনাদি। এই ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবের উচ্ছেদ না হইলে মুক্তি হইতে পারে না। অহংকার না থাকিলে ভোগ হয় না। সুতরাং মুক্তির জন্য অহংকারের বিনাশ করিতে হইবে। সোপেনহর স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-পরিহার-দ্বারা জীব-সৃষ্টিপ্রবাহ নিরুদ্ধ করিয়া দুঃখের বিনাশ-সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। সাংখ্য প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ-বর্জ্জনদ্বারা সৃষ্টির বিনাশ সাধন করিতে চাহিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়গণের অভিব্যক্তি

"ইন্দ্রিয়" শব্দ "ইন্দ্র" শব্দ হইতে উৎপন্ন। বেদে আছে "ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" এখানে ইন্দ্র শব্দের অর্থ আত্মা। আত্মার চিহ্ন বলিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে ইন্দ্রিয় বলে। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে "ইন্দ্রস্য সংঘাতেশ্বরস্য করণং ইন্দ্রিয়ম্"। দেহরূপ সংঘাতের কর্ত্তা যিনি, তাঁহার করণই ইন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদে বাহ্য-ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ। ইহা ভিন্ন আন্তর ইন্দ্রিয় মন। মোট একাদশ ইন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্, ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই সকল ইন্দ্রিয় দৃশ্যমান স্থূল ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়গণ অতীন্দ্রিয়, অজ্ঞ লোকেই তাহাদের অধিষ্ঠানকে ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করে। এই সকল ইন্দ্রিয়শক্তিদিগের মধ্যে ভেদ আছে, তাহারা একই শক্তির বিভিন্ন কার্য্য নহে। মন উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক। মন ভিন্ন কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় কোন কার্য্য করিতে পারে না। মনরূপ ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন শক্তিকে বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়।

ইন্দ্রিয়দিগের উৎপত্তি যে অহংকার হইতে হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রের মতে মনই একাদশক ইন্দ্রিয়। একাদশকের অর্থ একাদশের পূরণ। বৈকৃত অহংকার হইতে মন উদ্ভূত। অন্যান্য দশ ইন্দ্রিয় রাজস অহংকার হইতে উদ্ভূত।

* স্বামী সন্তদাসজীর দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ১ম খণ্ড—৩৯ পৃঃ।

ইন্দ্রিয়দিগের দ্রষ্টৃত্বাদিশক্তি নাই। তাহাদের সাহায্যে দৃষ্টি, শ্রবণ প্রভৃতি হয়। দ্রষ্টা, শ্রোতা প্রভৃতি আত্মা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোহের ও অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্যের মতোই এই দ্রষ্টৃত্ব ও শ্রোতৃত্ব। মন, বুদ্ধি ও অহংকার, এই তিনটি অন্তঃকরণ। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বৃত্তি আছে। কিন্তু পঞ্চপ্রাণ অন্তঃকরণদিগের সাধারণ বৃত্তি।

তিন অন্তঃকরণের বৃত্তি স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত। এই তিন বৃত্তির প্রত্যেকেই অসামান্য, অর্থাৎ ইহারা সকলেই প্রত্যেক অন্তঃকরণের বৃত্তি নহে। কিন্তু প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান নামক পঞ্চ বায়ু প্রত্যেক অন্তঃকরণেরই বৃত্তি—অন্তঃকরণদিগের সাধারণ বৃত্তি। বায়ুর মতো সঞ্চরণশীল বলিয়া পঞ্চপ্রাণকে বায়ু বলে। তাহারা স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে; চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে তাহাদের নাম নাই। তাহারা মন, অহংকার ও বুদ্ধির সাধারণ বৃত্তি। তাহাদের পরিণামদ্বারা শরীরের রক্ষা হয়। পঞ্চপ্রাণও একপ্রকার করণ বলিয়া গণ্য। দেহধারণই তাহাদের কার্য্য। দেহধারণের অর্থ দেহগঠন, বর্দ্ধন ও পোষণ। শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্যদ্রব্যের সমীকরণ, মলবহিষ্করণ প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন, তাহা প্রাণদ্বারাই সম্পন্ন হয়।

পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়দিগের মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ। ভৃত্যগণ যেমন একজন প্রধান ভৃত্যের অধীন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও তেমনি মনের অধীন। মনের শ্রেষ্ঠত্বের অন্য এক কারণ এই, যে তাহা অশেষ সংস্কারের আধার। আমরা যাহা কিছু জানি, ভাবি, করি, অনুভব করি, তাহারা সকলেই মনের উপর একটা দাগ ফেলিয়া যায়। সেই দাগই সংস্কার। এই সংস্কারধারণ ব্যতীত মনের অন্য কার্য্যও আছে। জ্ঞানোৎপাদনে মনের কার্য্য অসাধারণ। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহার কারণ তাহারা মনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। এই জন্যই মনকে উভয়াত্মক বলা হয়। মনের যে রূপ অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের নাই, তাহা হইতেছে "সংকল্প"। বিজ্ঞানভিক্ষু সংকল্প শব্দের অর্থ বলেন চিকীর্ষা। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের মতে ইহার অর্থ "আলোচিতং ইন্দ্রিয়েণ বস্তু ইদম্ ইতি সম্মুগ্ধং, ইদং এবং, ন এবং, ইতি সম্যক্ কল্পয়তি, নিয়ম্য দর্শয়তি, বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবেন বিবেচয়তি ইতি যাবৎ।" বাহ্যবস্তুর সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্পর্শের ফলে প্রথমে বস্তুমাত্রের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ইহা একটি কিছু, এই জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে আলোচন বলে। এইরূপ জ্ঞাত বস্তুকে "সম্মুগ্ধ" বলে। কিন্তু তাহার পরেই সেই ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয়ের মধ্যে বিশেষত্ব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তখন তাহাকে

একটি বিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে হয়; তাহা "ইহা", "উহা" নয়, এইরূপ বোধ হয়। এইরূপ মনের ক্রিয়াই সংকল্প। কিন্তু এই অসাধারণ লক্ষণযুক্ত মনও অন্য ইন্দ্রিয়দিগের সমধর্ম্মী বলিয়া 'ইন্দ্রিয়' নামে খ্যাত। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শরূপে আকারিত হইয়া মন যে নানাত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ তাহার মধ্যস্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হয়। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-রূপ পঞ্চ তন্মাত্রও একই অহংকার হইতে উৎপন্ন হয় এবং গুণের বিভিন্ন পরিণামের জন্য বিভিন্ন হয়।

ইন্দ্রিয়গণ অহংকার হইতে উদ্ভূত, তাহারা ভৌতিক বস্তু নহে। জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগের বৃত্তি "আলোচনমাত্র"। উপরে যাহাকে "সম্মুগ্ধ" বলা হইয়াছে, তাহার দর্শনই "আলোচন"। কোনও একটি বস্তু, এই মাত্র জ্ঞান প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে হয়। তাহার পরে মন সেই সম্মুগ্ধ বস্তুর উপর প্রযুক্ত হইয়া সেই বস্তুর স্বরূপ-নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হয়, এবং বুদ্ধি তাহার নিশ্চিত জ্ঞান-লাভ করে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইতেছে বচন, আদান, বিহরণ, মল-পরিত্যাগ ও আনন্দ। বুদ্ধি, অহংকার ও মন, এই তিন অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-দিগের কার্য্য কখনও কখনও একসঙ্গেই হয়, কখনও বা ক্রমানুসারে হয়। নিবিড় অন্ধকারে বিদ্যুৎ-সম্পাতমাত্র যদি নিকটে কোনও ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যেমন ইন্দ্রিয়ের আলোচন-বৃত্তি হয়, তেমনি মনের সংকল্প, অহংকারের অভিমান এবং বুদ্ধির অধ্যবসায় সকলই যুগপৎ সংঘটিত হয়। দেখিবামাত্রই দ্রষ্টা লম্ফ দিয়া পলায়ন করে। আবার স্তিমিত আলোকে কোনও বস্তু দৃষ্টিপথে পড়িলে, প্রথমে তাহা সম্মুগ্ধ রূপে গৃহীত হয়। পরে তাহার উপর ক্রমে ক্রমে মনের,অহংকারের ও বুদ্ধির ক্রিয়া হয়। অন্তঃকরণের বৃত্তি হয়। পরোক্ষ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে তাহার সঙ্গে কোনও বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি থাকে না। কিন্তু অন্তঃকরণের বৃত্তি তখন প্রত্যক্ষপূর্ব্বিকা, কেন না তখন দৃষ্ট বিষয়ের স্মৃতি হয়, এবং তাহা হইতেই অনুমান সম্ভবপর হয়।

ইন্দ্রিয়গণ অন্য কোনও শক্তিকর্ত্তৃক স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টা পুরুষার্থসাধনের অভিমুখী। ইন্দ্রিয়দিগের বৃত্তি পরস্পরের আকূত-হেতুকা। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আকূত (=অভিপ্রায়) যেন অবগত হইয়াই তাহাদের কার্য্য করিতে চেষ্টা না করিয়া নিজের কার্য্য করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানহীন, তাহাদের প্রকৃতিবশেই এইরূপ কার্য্য হয়। সকল করণের উদ্দেশ্যই পুরুষার্থসাধন। বুদ্ধির নিম্নস্থ করণগণ পরস্পর হইতে পৃথক, তাহাদের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। তাহারা গুণের (সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ) বিশেষ

বিশেষ বিকার। তৈল, বর্ত্তি ও অগ্নি এই তিনের মিলনদ্বারা প্রদীপ যেমন আলোক দান করে, করণগণও তদ্রূপ। তাহারা পুরুষের জন্য সমস্ত অর্থ প্রকাশিত করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে।

তন্মাত্র ও পঞ্চভূত

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটি তন্মাত্র। তন্মাত্র শব্দের অর্থ তৎমাত্র, তাহা মাত্র, তাহার অধিক কিছু নহে। রূপমাত্র, রসমাত্র, গন্ধমাত্র, শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের নানা ভেদ আছে। তন্মাত্রগণ তাহাদের ভেদবিহীন অবিশেষ অবস্থা। প্রত্যেক দ্রব্য হয় শান্ত (সুখকর), নতুবা ঘোর (দুঃখকর), না হয় মূঢ় (মোহকর)। তন্মাত্রগণের এই সকল বিশেষত্ব নাই। তাহারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ গুণের অতি সূক্ষ্ম অবস্থার আশ্রয় দ্রব্য। "গুণস্য অতি সূক্ষ্মরূপেণ অবস্থানং তন্মাত্রশব্দেন উচ্যতে" (গুণদিগের অতি সূক্ষ্ম রূপে অবস্থানই তন্মাত্র)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ যে বৈশেষিক গুণ নহে, দ্রব্য—তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মাত্রগণও দ্রব্য,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যদিগের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতে তাহারা স্থূলতর হইলেও সূক্ষ্ম। অহংকার হইতে একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়দিগের উদ্ভব হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর উদ্ভব-স্থল তন্মাত্রগণও উদ্ভূত হয়। রূপ, রস, গন্ধাদির নানা ভেদ আছে। তাহাদের কোনও রূপটি সুখকর, কোনটি দুঃখকর, কোনটি বা সুখকরও নহে, দুঃখকরও নহে। বিশেষত্ব-প্রাপ্ত হইলেই তাহারা সুখদুঃখাদি উৎপাদন করে। বিশেষত্ব-বর্জিত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শই তন্মাত্র।

তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের অভিব্যক্তি হয়। পঞ্চ তন্মাত্রকে অবিশেষ বলে, এই পঞ্চ হইতে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। পঞ্চ স্থূলভূতকেই বিশেষ বলে। ইহারা শান্ত, ঘোর এবং মূঢ়।

৭

দেশ ও কাল

দেশ ও কাল দর্শনের এক অতি প্রাচীন সমস্যা। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, কিন্তু দেশ ও কালের বোধের জন্য আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই। এইজন্য তাহাদের বাস্তবতা কোনও কোনও দার্শনিক অস্বীকার করিয়াছেন। দেশ ও কালকে অনন্ত বলা হয়, কিন্তু সীমাহীন কোনও বস্তুর ধারণা করা অসম্ভব। ঈশ্বরকে বিভু বা সর্ব্বব্যাপী ও শাশ্বত

বলা হয়, তিনি সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, মনে করা হয়। দেশের সমস্ত অংশই আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত; তাহার মধ্যে পারম্পর্য্য নাই—দেশের সকল অংশই একত্র পাশাপাশি অবস্থিত। সুতরাং সর্ব্বদেশব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ধারণা সম্ভবপর না হইলেও, একটা অস্পষ্ট ধারণা সম্ভবপর। কিন্তু সর্ব্বকালব্যাপিত্বের অর্থ কি? কালকে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। অতীত কাল তো গত ও বিনাশপ্রাপ্ত। তাহার অস্তিত্ব এক সময়ে ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে নাই। ভবিষ্যৎ অনাগত। যতক্ষণ তাহা বর্ত্তমানে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাহারও অস্তিত্ব নাই। আছে শুধু বর্ত্তমান, কিন্তু তাহার অস্তিত্বও সন্দেহ-সংকুল। অলক্ষ্যে প্রতিক্ষণে তাহা অতীতে পরিণত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। কোনও ক্ষণকে বর্ত্তমান বলিবার উপায় নাই। যখনই তাহার বোধ মনে উদিত হয়, তাহার পূর্ব্বেই তাহা অতীত হইয়া যায়। অতীতের অস্তিত্ব নাই, ভবিষ্যতের অস্তিত্ব নাই, বর্ত্তমান বলিয়াও কোনও ক্ষণকে ধরিবার উপায় নাই। এই অবস্থায় কালের বাস্তব অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া স্বাভাবিক। তাই কালের অস্তিত্ব অনেকে অস্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরকে সর্ব্বকালব্যাপী না বলিয়া কালাতীত বলা হইয়াছে। তিনি ত্রিকালাতীত। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই তাঁহার নিকট এক সঙ্গে বর্ত্তমান। তিনি মহাকাল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।১৬) ব্রহ্মের নিম্নে সংবৎসর দিন-রাত্রির সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলা হইয়াছে। (যস্মাৎ অর্ব্বাক্ সংবৎসরঃ অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে)। ইংরাজ কবি ভনের (Vaughan) নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি কবিতায় উপনিষদের এই ভাবই সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

I saw Eternity the other night
Like a great ring of pure and
endless light.
All calm, as it was bright:
And round beneath it
Time in hours, days, years.
Driven by the spheres.
Like a vast shadow moved:
In which the world
And all her train were hurled.

"সেদিন রাত্রিকালে আমি মহাকালকে দেখিয়াছি। শুদ্ধ, অনন্ত, অচঞ্চল, উজ্জ্বল সেই আলোকবৃত্তের অধোদেশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া

ঘণ্টা, দিন ও বৎসরের রূপ ধরিয়া কাল বিরাট ছায়ার মত চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছে। সেই ছায়ার মধ্যে সংসার সাঙ্গোপাঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আছে।"

বৈদান্তিক মতে দেশ-কালের জগৎ প্রাতিভাসিক জগৎ। ব্রহ্ম দেশ ও কাল-কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্ট দেশ ও কালের বাস্তবতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে আমাদের মনই বাহ্য জগতে দেশ ও কালের আরোপ করে। মনের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক বার্গস্ঁ কালপ্রবাহ ও প্রাণকে (Elan Vital) অভিন্ন বলিয়াছেন। স্যামুএল আলেকজাণ্ডার কালকে বিশ্বের চালক শক্তি বলিয়াছেন। তিনি দেশ ও কাল উভয়েরই মনোবাহ্য বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেশ ও কাল উভয়ে মিলিত হইয়া এক বস্তুতে (দেশ-কাল) পরিণত হইয়াছে, এবং এই বস্তু দ্বারাই যাবতীয় বস্তু নিৰ্ম্মিত।

সাংখ্যমতে আকাশ ও তাহার উপাধিদিগের হইতে দেশ ও কালের উদ্ভব হইয়াছে। দিককালৌ আকাশাদিভ্যঃ (সাঃ সূ – ২।১২)। এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু লিখিয়াছেন "নিত্যৌ যৌ দিক্‌কালৌ, তৌ আকাশ প্রকৃতিভূতৌ প্রকৃতেঃ গুণবিশেষৌ এব। অতঃ দিক্-কালয়োঃ বিভূত্বোপপত্তিঃ। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তং বিভুত্বং চ আকাশস্য উপপন্নং। যৌ তু খণ্ডদিক্‌কালৌ, তৌ তু তত্তদুপাধিসংযোগাৎ আকাশাৎ উৎপদ্যেতে ইত্যর্থঃ। আদিশব্দেন উপাধিগ্রহণাৎ ইতি। যদ্যপি তত্তৎ-উপাধিবিশিষ্টাকাশমেব খণ্ডদিক্‌কালৌ, তথাপি বিশিষ্টস্য অতিরিক্ততাভ্যুপগমবাদেন বৈশেষিক নয়ে শ্রোত্রস্য কার্য্যতাবৎ তৎকার্য্যত্বং অত্র উক্তম্।" ইহার অর্থ, যে দিক ও কাল নিত্য, তাহারা আকাশ-প্রকৃতিভূত, প্রকৃতির গুণবিশেষ। ইহা হইতেই দিক ও কালের বিভুত্বপ্রাপ্তি। "আকাশবৎ সর্ব্বগত ও নিত্য," এই শ্রুতিবাক্য হইতে আকাশের বিভুত্ব উৎপন্ন হয়। যে দিক্ ও কাল খণ্ড দিক্-কাল, তাহারা উপাধি-সংযোগবশতঃ আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। সূত্রে আদি-শব্দদ্বারা উপাধির কথাই বলা হইয়াছে। যদিও উপাধি-বিশিষ্ট আকাশই খণ্ড দিক্ ও কাল, তথাপি বিশিষ্ট আকাশ বলিয়া তাহাদিগকে আকাশের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।" বিজ্ঞানভিক্ষু এখানে নিত্য ও খণ্ড দিক্‌কালের মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছেন, সূত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। এই সূত্রের অনিরুদ্ধকৃত ভাষ্যে আছে "তৎ তৎ উপাধিভেদাৎ আকাশমেব দিক্-কাল-

শব্দবাচ্যং। তস্মাৎ আকাশে অন্তর্ভূতৌ।" অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপাধি-ভেদে আকাশই দিক্-ও-কাল-শব্দবাচ্য। ইহারা আকাশের অন্তভূ‌ত। দেশ ও কালের মধ্যে নিত্য ও খণ্ডরূপ দ্বিবিধ ভেদ থাকুক অথবা না থাকুক, আকাশ যখন প্রকৃতির বিকার, তখন দেশ ও কাল প্রকৃতিরই বিকার। সুতরাং তাহারা দ্রব্য। তাহাদের মনোবাহ্য অস্তিত্ব আছে। কিন্তু অন্যত্র বিজ্ঞানভিক্ষু দিক্ ও কালকে বুদ্ধি-নির্ম্মাণ (construction of the mind) বলিয়াছেন। "প্রকৃতির অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে উদ্ভূত যাবতীয় ঘটনার মধ্যগত সম্বন্ধই দেশ ও কাল। প্রত্যক্ষ জগতের যাবতীয় বিষয় দেশ ও কালের সম্বন্ধে আবদ্ধ। অনন্ত কাল ও অসীম দেশের প্রত্যক্ষ প্রতীতি আমাদের হয় না। এইজন্য অনন্ত কাল ও অসীম দেশকে বুদ্ধি-নির্ম্মাণ বলে।"*

সাংখ্যমতে প্রত্যেক ব্যক্ত বস্তু সক্রিয় ও পরিস্পন্দবৎ অর্থাৎ স্পন্দন-বা-গতিযুক্ত। প্রত্যেক বস্তু নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন হয় অতি মন্থর গতিতে, অতি ধীরে—এত ধীরে যে পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। কালের ক্ষুদ্রতম অংশে —অর্থাৎ প্রতিক্ষণে, সমগ্র জগৎ পরিবর্ত্তিত হয়, এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ জগতে দেশ ও কাল সসীম রূপেই প্রতীত হয়। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধে বদ্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়দিগের জ্ঞান হইতে আমরা প্রকৃতির অভিব্যক্তির ক্রম বুঝিবার জন্য এক অন্তহীন কালের কল্পনা করি।

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে আছে "জড়ের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ যেমন পরমাণু, তেমনি কালের ক্ষুদ্রতম অংশ "ক্ষণ"। একটি চলন্ত পরমাণুর এক বিন্দু হইতে পরবিন্দুতে যাইতে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন, তাহাই ক্ষণ। এই ক্ষণের অবিচ্ছেদ প্রবাহ পূর্ব্বাপর ক্রমানুসারে হয়। ক্ষণ এবং তাহাদের পারম্পর্য্যের (sequence) সমবায় হইতে কোনও বস্তু উদ্ভূত হয় না। সুতরাং কালের বাস্তবতা নাই। তাহা মনকর্ত্তৃক সৃষ্ট, "বুদ্ধি-নির্ম্মাণ।" বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতীতি অথবা শব্দের জ্ঞান হইতে কালের জ্ঞান হয়। (বুদ্ধি নির্ম্মাণঃ শব্দ-জ্ঞানানুপাতী)। কিন্তু ক্ষণ ক্রমাবলম্বী, অর্থাৎ পূর্ব্বাপর ক্রমে ব্যবস্থিত এবং তাহার বাস্তবতা আছে। (বস্তুপতিত)। দুইটি ক্ষণের যুগপৎ আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব।

* পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে আছে—

"স খলু অয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্ম্মাণঃ।" ৩,৫২

যখন এক ক্ষণ অন্য ক্ষণের পরে আবির্ভূত হয়, তখন পূর্ব্বাপর ক্রমের উদ্ভব হয়। বর্ত্তমান ক্ষণের মধ্যে একটিমাত্র ক্ষণ বর্ত্তমান, তাহার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোনও ক্ষণের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্ষণের কোনও সমবায়ও নাই। কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্ষণ-পরিণামেরই অন্তর্গত। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষণে সমগ্র জগৎ পরিণামপ্রাপ্ত হয়। "একেন ক্ষণেন কৃৎস্নো জগৎ পরিণামং অনুভবতি।" এই পরিণামের প্রবাহই 'কাল' নামে অভিহিত হয়। সাংখ্য মতে কাল জন্য বস্তু। বিজ্ঞানভিক্ষু যে নিত্য কালের কথা বলিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব নাই। প্রকৃতি হইতে যাহা যাহা উদ্ভূত হয়, সকলই অনিত্য, কালও সেই জন্য অনিত্য।

৮

সাংখ্য-মনোবিজ্ঞান (Psychology)

প্রকৃতির অভিব্যক্তির দুইটি ধারা—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক ধারায় জ্ঞানের করণদিগের—অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণদিগের—অভিব্যক্তি; অন্যধারায় জ্ঞানের বিষয়দিগের অভিব্যক্তি। জ্ঞানের বিষয়দিগের সহিত—গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় বিষয়দিগের সহিত—জ্ঞানের করণদিগের সংযোগ হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এই সংযোগকেই ভগবদ্গীতায় "মাত্রাস্পর্শ" বলা হইয়াছে। মাত্রাস্পর্শ হইতে জ্ঞান ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগই জ্ঞানোৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নহে। এই সংযোগের পশ্চাতে চিৎস্বরূপ পুরুষের অবস্থান না হইলে জ্ঞান হয় না। সুতরাং জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য তিন বস্তুর প্রয়োজন—(১) জ্ঞাতা পুরুষ, (২) জ্ঞানের করণ ও (৩) জ্ঞেয় বিষয়। ইহাদের মধ্যে করণগণ ও জ্ঞেয় বস্তু প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, এবং ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ইহারা সজাতীয়। বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত অহংকার হইতে যেমন বাহ্যকরণ ও মন, তেমনি পঞ্চতন্মাত্রও উদ্ভূত হয়, আর পঞ্চতন্মাত্র হইতেই স্থূলভূত ও স্থূল জগতের যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব। সুতরাং মনোজগৎ ও বাহ্য-জগতের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ নাই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে মন ও জড়বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়। তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কিরূপে হয়, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাহা একটি কঠিন সমস্যা। সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি ও মন এবং বাহ্যজগৎ উভয়েই ত্রিগুণাত্মক ও সমজাতীয় বস্তু বলিয়া উক্ত সমস্যা তাহার নাই। অচেতন বুদ্ধি বাহ্যজগতের প্রতিবিম্ব লাভ করিয়া কিরূপে পুরুষের সান্নিধ্যে চৈতন্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, ইহাই সাংখ্যদর্শনের সমস্যা।

মনের ধর্ম্ম সংকল্প (সাং কা ২৭)। সংকল্প দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, কর্ম্মের মানসের নাম সংকল্প (সংকল্পঃ কর্ম্মণো মানসম্)। দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুমাত্ররূপে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে বিশিষ্ট জ্ঞানে পরিণত করাই সংকল্প। *

ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা বস্তুমাত্রের জ্ঞান—অর্থাৎ ইহা একটা বস্তু, এই মাত্র জ্ঞান। কোন্ বস্তু? তাহার ধর্ম্ম কি? প্রভৃতির জ্ঞান এই জ্ঞানের মধ্যে নাই। এতাদৃশ জ্ঞানে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাকে "সম্মুগ্ধ বস্তু" বলে। ইহার জ্ঞানকে বলে "আলোচন"। ইন্দ্রিয়গণ প্রথমতঃ সম্মুগ্ধ-রূপেই বস্তু গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়-কর্তৃক আলোচিত, বস্তুমাত্র রূপে গৃহীত সম্মুগ্ধ বস্তুর উপর মনের সংকল্পক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। পূর্ব্বের অবিকল্পিত জ্ঞান তখন বিশেষ জ্ঞানে পরিণত হয়। তখন যে জ্ঞান ছিল "ইহা একটা বস্তু" এই মাত্র, তাহা বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানে পরিণত হয়। তখন সেই বস্তুতে বিশেষণ-যুক্ত হয়; ইহা চতুষ্পদ, লাঙ্গুল-বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ প্রভৃতি বিশেষণ-প্রযুক্ত হইয়া তাহা একটি বিশিষ্ট গোরুর জ্ঞানে পরিণত হয়। †

প্রথম নির্ব্বিকল্প জ্ঞানকে আলোচন জ্ঞান বলে। শিশু ও মূকবধিরদিগের জ্ঞানের সদৃশ এই জ্ঞান। ইহা "মুগ্ধবস্তু-জাত জ্ঞান। তাহার পরে বস্তুর ধর্ম্ম, তাহার জাতি প্রভৃতির জ্ঞানসহ যে নিশ্চিত জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কোনও বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সাদৃশ্য ও ভেদ লক্ষ্য করণই সংকল্প।

বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিন অন্তঃকরণ ও তাহাদের সহিত কোনও এক বাহ্যেন্দ্রিয় কোনও প্রত্যক্ষ বিষয়ে যুগপৎ অথবা ক্রমশঃ প্রযুক্ত হইতে পারে। (সাং কা ৩০৭) বাচস্পতি নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তদ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সর্ব্বতোব্যাপী নিবিড় অন্ধকারে সহসা বিদ্যুৎ-প্রকাশ হইলে যদি অতি নিকটে ব্যাঘ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সংকল্প, অহংকারের অভিমান এবং বুদ্ধির অধ্যবসায় (অর্থাৎ ইহা হিংস্র এই নিশ্চিত জ্ঞান) যুগপৎ হইয়া থাকে। দ্রষ্টা তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া

---

* সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রাক্‌গৃহ্ণন্ত্যবিকল্পিতং।
তৎ সামান্য-বিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ। (তত্ত্ব-কৌমুদী)।

† অস্তি হ্যালোচনজ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং।
বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং মুগ্ধবস্তুজং।
ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা। তত্ত্ব-কৌমুদী (২৭)

সে স্থান ত্যাগ করে। আবার মন্দালোকে কিয়ৎ দূরে দণ্ডায়মান পুরুষ প্রথমে সম্মুখ বস্তুরূপে আলোচিত হয়। তাহার পরে কোদণ্ডহস্ত লোকরূপে পরিদৃষ্ট হইলে, তাহাকে দস্যু বলিয়া জ্ঞান হয়। তাহার পরে "আমার দিকে আসিতেছে", এই নিশ্চিত জ্ঞান হইলে দ্রষ্টা পলায়ন করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ-দিগের বৃত্তি এইরূপ। পরোক্ষজ্ঞানে বাহ্যকরণদিগের কোনও ক্রিয়া নাই। না থাকিলেও অন্তঃকরণদিগের বৃত্তি প্রত্যক্ষপূর্ব্বিকা, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, পরোক্ষ জ্ঞানে তাহারই জ্ঞান হয়। অনুমান, আগম এবং স্মৃতিদ্বারাই পরোক্ষ জ্ঞান হয়। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তথায় বহ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। বহ্নি এখানে প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু পূর্ব্বে ধূমের সহিত দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সে সময়ে প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহার জ্ঞান হয়। অভ্যস্ত মন্ত্রের উচ্চারণ-সময়ে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীভূত এবং পঠিত মন্ত্রেরই স্মরণ হয়। এইরূপে আগম হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষীভূত বিষয়েরই জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও অন্তঃকরণের বৃত্তি যুগপৎ অথবা ক্রমশঃ হয়।

অন্তঃকরণ তিনটির যাহা বিষয়, তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেরই ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যকরণদিগের বিষয় কেবল বর্ত্তমান কালে অবস্থিত। বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বিষয় মন, অহংকার ও বুদ্ধির নিকট স্থাপিত করে, তাহারা তাহাদের মধ্যে অবগাহন করে (এবং তাহাদের জ্ঞান লাভ করে)। এই জন্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বার এবং অন্তঃকরণ দ্বারবান। ইন্দ্রিয়দ্বার পথে সমস্ত বিষয় অন্তঃকরণের নিকট উপস্থিত হয়। গ্রামাধ্যক্ষ যেমন গৃহস্থদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরিস্থ বিষয়াধ্যক্ষকে প্রদান করে, বিষয়াধ্যক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষকে প্রদান করে এবং সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজাকে প্রদান করে, তেমনি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ আলোচনা করিয়া মনকে "আলোচন" দান করে, মন সংকল্প করিয়া সংকল্পিত বিষয় অহংকারকে দান করে, অহংকার অভিমান করিয়া অর্থাৎ ইহা আমার মনে করিয়া আলোচিত, সংকল্পিত ও অভিমত বিষয় বুদ্ধিকে দান করে। বুদ্ধি হইতে অধ্যবসায় বা নিশ্চিত জ্ঞান হয়। (তত্ত্ব কৌমুদী ৩৬)

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে বাচস্পতি ও বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বাচস্পতির মতে মনের মাধ্যমেই বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব বুদ্ধির উপর পতিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বুদ্ধি আপনিই বিষয়ের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সাংখ্যকারিকায় মনকে সংকল্পক বলা হইয়াছে। মনের এই ক্রিয়া ব্যতীত জ্ঞান সম্ভবপর নহে।

পাতঞ্জল দর্শনে অহংকার-এবং-ইন্দ্রিয়-সমন্বিত বুদ্ধি চিত্ত নামে অভিহিত। দীপ-শিখার মতো বুদ্ধি অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের আধিক্য। তাহার আধেয় "প্রত্যয়" একটির পর একটি আবির্ভূত এবং বিলীন হইতেছে, এবং পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। পুরুষও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই প্রতিবিম্ব হইতেই পুরুষের ভোক্তৃত্বের উদ্ভব। বুদ্ধি দর্পণ-সদৃশ।

সরোবরে তটস্থিত বৃক্ষগণ যে-রূপ প্রতিবিম্বিত হয়, বুদ্ধি-রূপ দর্পণেও তেমনি সকল বিষয় প্রতিবিম্বিত হয়।* বুদ্ধি এই প্রতিবিম্বনের ফলে বিষয়াকারে আকারিত হয়। যোগবার্ত্তিকের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ-মার্গ। ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত হইয়া চিত্ত বিষয়াকারে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়। (যোগবার্ত্তিক ১।৬।৭) ইন্দ্রিয়-মার্গদ্বারা দেহের বাহিরে গিয়া বিষয়ের সংস্পর্শে চিত্ত বিষয়াকার প্রাপ্ত হউক, অথবা বিষয় বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হউক, তাহার জ্ঞান পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় না। বিষয়াকার-প্রাপ্ত অথবা বিষয়-প্রতিবিম্বসমন্বিত বুদ্ধি যখন পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই জ্ঞান হয়। প্রতিবিম্ববাদ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষবাদের (Representative Perception) সদৃশ। কিন্তু শেষোক্ত মতে জ্ঞান পুরুষেরই—মন ও বুদ্ধি পুরুষেরই অন্তর্গত। সাংখ্য মতে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। "ভোক্তৃ-ভাবাৎ" এই সূত্র হইতে অনুমান করা যায় যে এই জ্ঞান পুরুষের। বুদ্ধি জ্ঞানলাভে পুরুষের করণমাত্র। (সাং সূ ১।১৪৩)। কিন্তু পুরুষ অসঙ্গ, নিত্য, শুদ্ধ (অবিকারী) ও মুক্ত (সাং সূ ১।১৫, ১৯) ইহাও বলা হইয়াছে। তাহা হইলে তাহার প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্য-সম্পর্ক সম্ভবপর হইলেও প্রকৃতির ভোগ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু প্রকৃতির যাবতীয় ক্রিয়াই যখন পুরুষের ভোগ ও পরে কৈবল্যের জন্য, তখন এই ভোগকে কল্পিতমাত্র বলিলে (এই ভোগ বস্তুতঃ প্রকৃতির, পুরুষের নহে বলিলে) কৈবল্যার্থ-সাধনের কোনও প্রয়োজনই থাকে না। সাংখ্য সূত্রে (৩।৬) কিন্তু তাহাই বলা হইয়াছে। "সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাভ্যাম্।" স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ—এই দুইটির কোনটিই পুরুষের নাই। কারণ, পুরুষ নিঃসঙ্গ। বিবেকের উদয় হইলে আত্মা যেরূপ দেহসঙ্গ রহিত, অবিবেক-কালেও তদ্রূপ। বিজ্ঞান ভিক্ষু "দ্বাভ্যাং" শব্দে শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি বুঝায়, বলিয়াছেন।

* তস্মিংশ্চ দর্পণে স্ফারে সমস্তাঃ বস্তুদৃষ্টয়ঃ
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসী ব তটদ্রুমাঃ (যোগবার্ত্তিক—১।৩)

তাহাতেও বিশেষ অর্থভেদ হয় না। কিন্তু অনিরুদ্ধ-কৃত ভাষ্যে এই সূত্রের পাঠ আছে "সম্প্রতি পরিষ্বক্তো দ্বাভ্যাং"। ইহার অর্থ সংসারে জীব স্থূল ও-সূক্ষ্ম-শরীর-যুক্ত হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু অন্যত্র পুরুষকে যে অসঙ্গ ও অপরিণামী বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যে জ্ঞানের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল, তাহার স্বরূপ কি? "জ্ঞান" একটী পদ। ইহার অর্থ আছে, সুতরাং ইহা একটী পদার্থ, সেই পদার্থের স্বরূপ কি? বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে যে সকল পদার্থের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ নাই। তবে জ্ঞান কি "ক্রিয়া" পদার্থের অন্তর্ভুক্ত? ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছেন। (সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম)। জ্ঞান যদি ক্রিয়া হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের মধ্যে তাহা ক্রিয়ারূপে বর্ত্তমান। কিন্তু ক্রিয়া তো কাল-সাপেক্ষ। কালাতীত ব্রহ্মে ক্রিয়া সম্ভবপর হয় কিরূপে? ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান সকলই তো তাঁহার নিকট একসঙ্গে বর্ত্তমান। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু চিৎ ও জ্ঞান সমার্থক নহে। সদ্যোজাত শিশু চিৎ পদার্থ, কিন্তু তাহাতে জ্ঞান নাই, জ্ঞানের শক্যতা আছে। জ্ঞান বলিতে জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব সূচিত হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধকে জ্ঞান বলা যায়। জ্ঞেয়ের অনুভবই জ্ঞান। এই অনুভবই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। ইহা এক অনন্য-সাধারণ বিশেষ সম্বন্ধ। ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নাই। সুতরাং ব্রহ্মের জ্ঞান ব্রহ্মের স্ব-সম্বন্ধী জ্ঞান। ব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানেন (আত্মানং আত্মনা বেত্তি)। ব্রহ্ম নিজের জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু এই জ্ঞান নিত্য বলিয়া তাহার উৎপত্তি নাই, তাহা সদা বর্ত্তমান। ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া তাহা সৎ বস্তু। তাহা নিত্য-আবির্ভূত। কিন্তু মানুষের জ্ঞান কালে আবির্ভূত হয়। এই আবির্ভাবকে উৎপত্তি বলা যায়। ইহা অন্য ঘটনার উপর নির্ভরশীল। সাংখ্যের পুরুষ চিৎ পদার্থ হইলেও তাহাতে বাহ্য পদার্থের জ্ঞান নাই—বাহ্য পদার্থের সহিত তাহার সত্য সংযোগও কখনও হয় না। পুরুষ চৈতন্য পদার্থ সন্দেহ নাই; তাহাতে সংবিদ (Consciousness) আছে। কিন্তু যখন অহংকার নাই, তখন আত্ম-সংবিদ (Self-consciousness) আছে বলা যায় না। জীবের চৈতন্য পুরুষের সহিত প্রকৃতির তথাকথিত সংযোগের ফল। এই সংযোগ বশতঃ অচেতন প্রকৃতিতে বুদ্ধি, অহংকার ও মনের উদ্‌ভবের ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

মানুষের জ্ঞানের যখন উৎপত্তি আছে, তখন তাহার সহিত কালের সম্বন্ধও

আছে। তাহা নিত্য নহে। জ্ঞান বুদ্ধির এক রূপ (অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ)। বুদ্ধি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্রব্য। সুতরাং বুদ্ধিও দ্রব্য। সুতরাং তাহার এক রূপ যে জ্ঞান তাহাকেও দ্রব্য বলিতে হয়। এই দ্রব্যের উদ্ভব হইতে পারিত না, যদি প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ না হইত। পুরুষের আলোকে আলোকিত প্রকৃতিতেই বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। পুরুষ যখন প্রকৃতির সান্নিধ্য হইতে সরিয়া যায়, তখন সে আলোকও নির্বাপিত হয়, জ্ঞানেরও বিনাশ হয়। এই বিনাশশীল বুদ্ধিকে সাংখ্য চেতন বলেন নাই। পুরুষের সংযোগে তাহা চেতনের ন্যায় প্রকাশিত হয় বলিয়াছেন। (সাং কা ২০)। সুতরাং বুদ্ধিকে ও জ্ঞানকে অচেতনই বলিতে হইবে। চেতনের মতো হইলেও তাহা অচেতন। কিন্তু "আমি জানিতেছি" এই বোধ অচেতন হইলেও, যিনি জানেন, সেই "আমি" চেতন অথবা চেতনরূপে প্রতীয়মান পদার্থ।

অসন্নিকৃষ্ট অর্থের পরিচ্ছিত্তি প্রমা, (সাং সূ—১।৮৭) অর্থাৎ যে অর্থ বা বস্তু অব-ধারিত হয় নাই, তাহার পরিচ্ছিত্তি অর্থাৎ অবধারণই প্রমা। এই প্রমার আশ্রয় কে, অর্থাৎ এই জ্ঞান কাহার ? কোনও মতে পুরুষ ও বুদ্ধি উভয়েরই এই জ্ঞান! আবার কেহ কেহ বলেন, এই জ্ঞান শুধু বুদ্ধির। প্রমা যাহাদ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহার নাম প্রমাণ। প্রমাণ ত্রিবিধ। ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রমাতা বা জ্ঞাতা যে পুরুষ, তাহা সাংখ্য সূত্রের "ভোক্তৃভাবাৎ" (১।১৪৩) সূত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পুরুষের এই ভোক্তৃত্ব যে প্রকৃত নহে, তাহাও সাংখ্যকারিকার ৬২ কারিকায় উক্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, বুদ্ধি অহংকার, এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই ত্রয়োদশ করণদ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞানলাভ হয়।

৯

সাংখ্যের চরিত্রনীতি

চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে সাংখ্য শাস্ত্রে বিশেষ আলোচনা নাই। না থাকিলেও উক্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা হইতে চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে সাংখ্যের মতের একটা ধারণা করা যায়। সাংখ্যমতে সুখ পুরুষার্থ নহে। সুতরাং সুখ সুনীতির কষ্টি নহে। লোকহিত সুনীতি-সম্মত হইলেও তাহা সুনীতির গৌণ-কষ্টি মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্বই যখন সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত নহে, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আদেশকে সুনীতির কষ্টি বলা যায় না। ন্যায়ান্যায়-বোধের জন্য মনের কোনও বৃত্তির কথাও (ধর্ম্ম-বিবেকের কথা) সাংখ্য-শাস্ত্রে

নাই। দুঃখের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সাংখ্যের পুরুষার্থ। প্রকৃতির সংসর্গের ফলে পুরুষের বন্ধ ও তাহার স্বাধীনতার সংকোচ হয়। সেই বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতার উদ্ধারই সাংখ্যের পুরুষার্থ—তাহাই অপবর্গ। যে কর্ম্ম এই উদ্দেশ্যের সহায়ক, তাহাই সুনীতি বা ধর্ম্ম, যে কর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক, তাহাই দুর্নীতি বা অধর্ম্ম।

সাংখ্য জগতে এক নৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব (moral order) স্বীকার করেন। সাংখ্যের চরিত্রনীতি কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। ইহজন্মে হউক বা পরজন্মে হউক, কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে। সৎকর্ম্ম বা ধর্ম্মের ফল উর্দ্ধগমন বা স্বর্গবাস, অসৎকর্ম্ম বা অধর্ম্মের ফল অধোগমন বা নরকবাস। কিন্তু কর্ম্মদ্বারা অপবর্গ অর্জিত হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই অপবর্গলাভ হয়। অজ্ঞানের ফল বন্ধ।

কর্ম্ম দ্বারা পুরুষার্থ অর্জিত না হইলেও কর্ম্মের গুণাগুণ-সম্বন্ধে সাংখ্য অন্ধ নহেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বুদ্ধির দুই রূপ। ধর্ম্ম সাত্ত্বিক—জ্ঞানের সহায়ক। অধর্ম্ম তামসিক—জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। (সাং কা ২৩)। যজ্ঞে পশু-হত্যার বিধি আছে। এই জন্য তাহার ফলে স্বর্গবাস হইলেও, সে ফল অশুদ্ধিযুক্ত (সাং কা—২)। তাহা দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। ইষ্টাপূর্ত্ত (যজ্ঞ ও লোকহিতকর বাপী-কূপ-খননাদি) মোক্ষপ্রাপক না হইলেও সাংখ্য দর্শনে নিরর্থক বলিয়া গণ্য হয় নাই। তাহারা চিত্তশুদ্ধিকর এবং গৌণভাবে মোক্ষের সহায়ক, হেয় নহে। তাহারা সুনীতি-সম্মত, তাহারা ধর্ম্ম—পুরুষার্থ সাধনের মুখ্য না হইলেও গৌণ উপায়। সৎকার্য্য ও অসৎ কার্য্য উভয়ের সংস্কারই চিত্তে রক্ষিত হয়, এবং মৃত্যুর পরে জীব চিত্ত সহ জন্মান্তর গ্রহণ করে। কিরূপ যোনিতে জন্মান্তর হইবে, তাহা নির্ভর করে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের উপরে। জন্ম-জন্মান্তরকৃত সৎকর্ম্মের ফলে চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে মোক্ষলাভের পথ পরিষ্কৃত হয়। সুতরাং সৎকর্ম্মের মোক্ষপ্রাপকতা গুণ আছে।

অপবর্গ লাভ হয় যখন সত্ত্বপুরুষান্যতা-খ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই জ্ঞান কেবল গ্রন্থপাঠ বা গুরূপোদেশ দ্বারা লব্ধ হয় না। গুরুর উপদেশ শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য —অর্থাৎ তাহা শুনিয়া মনে তৎসম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাহার সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ধারণা করিতে হয়, এবং তাহার পর সেই পরিজ্ঞাত তত্ত্বের ধ্যান করিতে হয়। ইহার ফলে অপরোক্ষ জ্ঞান-লাভ হয়। কিন্তু চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, তাহাতে এই জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। চিত্তের নির্ম্মলতা-সাধনের জন্য

পাতঞ্জল দর্শন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাকে অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। ঈর্ষ্যা-কালুষ্য-নিবৃত্তি ও সর্ব্বজীবের সহিত সৌহার্দ্দই মৈত্রী! দুঃখার্ত্তের প্রতি অনুকম্পাই করুণা। পরকৃত পুণ্যদর্শনে হর্ষপ্রাপ্তি মুদিতা, এবং পরের পাপের প্রতি ঔদাসীন্য উপেক্ষা। যাবতীয় সুনীতির মূল ইহার মধ্যে নিহিত আছে।

১০

জীব

দেহেন্দ্রিয়-সংরুদ্ধ পুরুষই জীব নামে অভিহিত। বিশিষ্টস্য জীবত্বম্ অন্বয় ব্যতিরেকাৎ সাং সূ—৬।৬৩। এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন—শ্রুতিতে আছে "বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ, স চানন্ত্যায়-কল্পতে", অর্থাৎ কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগকে শতাংশ করিলে, তাহার এক ভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীবও সেইরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ, জীব অনন্ত। এতদনুসারে জীব পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু সাংখ্যের জীব অপরিচ্ছিন্ন। সাংখ্যে ঈশ্বর প্রতিষিদ্ধ এবংসকল পুরুষ একরূপ বলিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদও অসিদ্ধ। এই আশঙ্কার নিরসনের জন্য সাংখ্যকার বলিতেছেন, যে জীবত্ব হইতেছে অহংকারবিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম্ম, কেবল (absolute) পুরুষের ধর্ম্ম নহে। জীব ধাতুর অর্থ—বল-ও-প্রাণধারণ। এই জন্য জীবত্বের অর্থ প্রাণিত্ব। এই প্রাণিত্ব অহংকার-বিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম্ম; কেননা অহংকারযুক্ত পুরুষেরই অতিশয় সামর্থ্য ও প্রাণধারণ দেখিতে পাওয়া যায়। অহংকারশূন্য পুরুষেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় প্রমাণেই জীবকে অহংকারবিশিষ্ট বলিয়া জানা যায়। প্রবৃত্তির হেতু রাগ; অহংকার-কর্ত্তৃক রাগ উৎপন্ন হয়। অহংকার না থাকিলে চিত্তবৃত্তি থাকে না। অন্তঃকরণরূপ উপাধি-বশতঃই জীব পরিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং অন্তঃকরণ-উপাধি-বিশিষ্ট জীব পরমাত্মারূপ কেবল (absolute) পুরুষ হইতে ভিন্ন।

নির্গুণ পুরুষের সহিত প্রকৃতির তথা-কথিত সংযোগ হইতেই বুদ্ধি ও অহংকারসংযুক্ত জীবের উদ্ভব হয়। কিন্তু চিৎ-মাত্র-স্বরূপ পুরুষের সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-স্বভাব প্রকৃতিস্থ অহংকারের সংযোগ কিরূপে ঘটিতে পারে, তাহা দুর্ব্বোধ্য। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক হইলেও, তাহা অচেতনেরই ধর্ম্ম, এবং চৈতন্য অচেতন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেও, বুদ্ধি কিরূপে চৈতন্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। জবাফুলের প্রতিবিম্ব স্ফটিকে

পতিত হইলে স্ফটিক বাস্তবিক রক্তবর্ণ হয় না। অন্যের নিকট রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। চৈতন্যের প্রতিবিম্ব-কর্তৃক বুদ্ধি রঞ্জিত হইলেও তদ্দ্বারা বুদ্ধির স্বধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

প্রত্যেক পুরুষের সহিত যে বুদ্ধি সংযুক্ত থাকে, তাহা অন্যান্য বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল বশতঃই এই ভিন্নতা সংঘটিত হয়। (তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ তদর্থম্ অভিচেষ্টা লোকবৎ—সাং সূ ২।৪৬)। প্রত্যেক বুদ্ধির সহিত তাহার "অবিদ্যা" সংযুক্ত থাকে। কিন্তু পুরুষ নিজে বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। অবিদ্যাবশতঃই পুরুষকে বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। পুরুষ অপরিণামী কিন্তু বুদ্ধিতে অনবরত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, একটির পর একটি মানসিক ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। আমিত্বের বোধদ্বারা এই সকল ভাব সম্বদ্ধ এবং তাহা হইতে একপ্রকার একত্বের উদ্ভব হয়। এই একত্ব কালিক; ইহার মধ্যে অনবরত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু পুরুষ কালাতীত—**transcendent**। পুরুষ প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক জগতের বাহিরে অবস্থিত, কিন্তু জীব প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে তাহার অংশরূপে বর্ত্তমান। জাগতিক বস্তুসকল যেমন অনিত্য, জীবও তেমনি।

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয়, যে সাংখ্য মতে প্রত্যেক পুরুষের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র মন, বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় নির্দ্দিষ্ট আছে। মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনটি অন্তঃকরণ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ বাহ্যকরণ। প্রত্যেক পুরুষের অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং পুরুষের সহিত এই সংমিলিত করণ-দিগের প্রকৃত যোগ থাকুক অথবা না থাকুক, উভয়ের মধ্যে এমন এক সম্বন্ধ বর্ত্তমান যাহার জন্য এই অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণগণ চৈতন্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণগণ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। কোনও আশ্রয় ভিন্ন যেমন চিত্র থাকিতে পারে না, বৃক্ষাদি ব্যতীত যেমন ছায়া থাকিতে পারে না, তেমনি লিঙ্গও "অবিশেষের" আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না (সাং কা—৪১)। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন। যাহা দ্বারা অন্য বস্তুর অস্তিত্ব সূচিত হয়, তাহাই লিঙ্গ। অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণদিগের দ্বারা "প্রধানের" অস্তিত্ব সূচিত হয় বলিয়া ইহারা লিঙ্গ। লিঙ্গের জন্য প্রয়োজন আশ্রয়ের। সেই আশ্রয়ই পঞ্চতন্মাত্র। অন্তরিন্দ্রিয়, বাহ্যেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র-গঠিত শরীর সূক্ষ্ম শরীর নামে খ্যাত। পঞ্চতন্মাত্রগণ বিশেষত্বহীন, তাই অবিশেষ। এই অবিশেষকে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণ

ও বাহ্যকরণগণ থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম্মের ফল সংস্কাররূপে সঞ্চিত থাকে; এবং কর্ম্মের বিভিন্নতার জন্য প্রত্যেক পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর বিভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে সকল পুরুষ এক-প্রকার এবং এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের ভেদ নাই। ভেদ আছে পুরুষদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরদিগের মধ্যে।

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ-সাধনের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তের ফলভূত বিভিন্ন স্থূলদেহ আশ্রয় করিয়া লিঙ্গ শরীর প্রত্যেক দেহে বিভিন্ন নটের ন্যায় ক্রীড়া করে। কেহ বা দেব, কেহ মনুষ্য, কেহ পশু, কেহ বা বনস্পতির দেহ ধারণ করে। প্রকৃতি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগত বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হয়। ভিন্ন ভিন্ন জন্মে স্থূল দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সূক্ষ্ম শরীর একই থাকে এবং তাহাতেই বিভিন্ন জন্মের সংস্কার সঞ্চিত হয়। যত দিন পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন জন্ম ও মৃত্যু চলিতে থাকিবে। জীবজগতের নিম্নতম স্তরে লিঙ্গ-শরীরে তমোগুণেরই আধিক্য থাকে, ফলে তাহাদের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বল্পতা। স্মৃতি ও কল্পনা শক্তি তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। এইজন্য তাহাদের সুখ বা দুঃখ তীব্র হয় না, দীর্ঘকাল স্থায়ীও হয় না। সত্ত্বগুণের স্বল্পতার জন্য পশুদিগের জ্ঞান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের প্রয়োজনের অধিক নহে। মানুষে রজোগুণের প্রাবল্য। উহার ফলে মানব জীবন অশান্ত এবং দুঃখ-মুক্তির উপায়-অন্বেষণে ব্যস্ত। যতদিন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য না ঘটে, ততদিন দুঃখমুক্তি সম্ভবপর নহে। সত্ত্বগুণের যথোচিত আধিক্য হইলে বিবেকের উদ্ভব হয়।

প্রকৃতির অভিব্যক্তি দুইদিকে হয়—ভৌতিক ও মানসিক। একদিকে গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় "বিষয়ের" উদ্ভব হয়, অন্য দিকে "বিষয়ের" গ্রাহক অথবা বিষয়ী বা জ্ঞাতার উদ্ভব হয়। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার তত্ত্ব-বৈশারদীতে (৩৪৭) বলিয়াছেন "গুণদিগের দ্বিবিধ রূপ, ব্যবসেয়াত্মকত্ব অর্থাৎ জ্ঞেয়রূপ এবং ব্যবসায়াত্মকত্ব অর্থাৎ জ্ঞাতারূপ। পঞ্চতন্মাত্র ও ভূতভৌতিক বস্তুসকল গ্রাহ্য বা ব্যবসেয়, বা জ্ঞেয়। অহংকার-সমন্বিত ইন্দ্রিয়গণই গ্রহণস্বরূপ অথবা জ্ঞাতা। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। তবে জ্ঞানের জন্য পুরুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজন। জীবের মধ্যে প্রকৃতির উভয় রূপ মিলিত হইয়াছে। পুরুষ উভয় রূপ হইতে স্বতন্ত্র। কার্য্য প্রকৃতির, কর্ম্মের ফল ভোগও করে প্রকৃতি। সুখ-দুঃখবোধ প্রকৃতির। অবিবেকবশে পুরুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে বলিয়া মনে করে। নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রকৃতির ক্রিয়া দেখিয়া পুরুষ তাহার নিজের স্বভাব ভুলিয়া যায় এবং সে নিজেই চিন্তা করে,

কর্ম্ম করে ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে বলিয়া মনে করে—শরীরকেই নিজের সহিত অভিন্ন মনে করে এবং এইরূপে কালাতীত হইলেও কালের রাজ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু পুরুষের বিষয়-ভোগের অর্থ, বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে, বুদ্ধির প্রতিবিম্ব নিজের মধ্যে গ্রহণ করা মাত্র। "কর্ম্ম করে প্রকৃতি, কিন্তু তাহার ফল ভোগ করে পুরুষ" (অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ) সাং সূ ১।১০৫। এই সূত্রে পুরুষের নিজের ফলভোগের কথা আছে। এখানেও পুরুষের অপরিণামিত্বের আপত্তি উঠিতে পারে। সুতরাং এই ফলভোগও অবিবেক-প্রসূত বলিতে হইবে। যে জন্যেই হউক, সুখ অথবা দুঃখবোধ পুরুষের সহিত এক অজ্ঞাত উপায়ে সংশ্লিষ্ট থাকে। এই সুখ-দুঃখভোগী পুরুষই জীব। যখন সুখ-দুঃখ-ভোগের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়, তখন জীবের বিনাশ হয় এবং পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাই একটির পরে একটি প্রত্যয় মনে উদিত হইয়া বিলীন হইতেছে। এই প্রত্যয়-প্রবাহের মধ্যে কোন প্রত্যয়ের সঙ্গে সুখ, কাহারও সঙ্গে দুঃখ জড়িত থাকে। কোনটি হইতে সুখ বা কিছুই উদ্‌ভূত হয় না। সাংখ্যমতে এই প্রত্যয়-প্রবাহ ত্রিগুণান্বিত প্রকৃতির কার্য্য, পুরুষ তাহাদের উদয় ও বিলয়ের সাক্ষী মাত্র। তাহারা পুরুষের সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। তবুও পুরুষ কেন আপনাকে এই প্রত্যয়-প্রবাহের সহিত অভিন্ন মনে করে এবং তাহাদ্বারা পুরুষের সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা একটি প্রহেলিকা। নানা উপমা দ্বারা সাংখ্যকার ও তাঁহার ভাষ্যকারগণ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবিদ্যা বা অবিবেককে ইহার কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই অবিদ্যা বা অবিবেকের স্বরূপও বোধগম্য হয় না। কাহার অবিবেক? পুরুষ তো চৈতন্যমাত্র। অবিবেক উদ্‌ভূত হয় প্রকৃতি হইতে। যে প্রকৃতি হইতে পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন, যাহার সহিত প্রকৃত সংস্রব পুরুষের কখনও হয় না, তাহা হইতে উদ্‌ভূত অবিবেকের সহিতই বা তাহার সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিতে পারে? 'দেশ' প্রকৃতিসম্ভূত। সুতরাং প্রকৃতির সহিত দেশিক সান্নিধ্যও পুরুষের কখনও ঘটিতে পারে না। তবুও এই অবিবেকবশতঃই পুরুষের বন্ধ হয় বলা হইয়াছে। "বন্ধ" অর্থ এখানে মিথ্যা জ্ঞান এবং তাহার আনুষঙ্গিক দুঃখ। আমি প্রকৃতপক্ষে দুঃখভোগ করিতেছি না, অথচ দুঃখভোগ করিতেছি, এই ভ্রান্ত জ্ঞানই বন্ধ। বাস্তবিক দুঃখ বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহার বোধ হয় প্রকৃতির মধ্যে। পুরুষ তাহার দ্রষ্টা মাত্র তাহার "অহং" জ্ঞান নাই।

অথচ সে নিজে দুঃখভোগ করিতেছে, এই বোধ তাহার হইবে কেন, তাহা বোঝা যায় না। পুরুষের সহিত প্রকৃতির বাস্তব সংযোগ হয়, পুরুষেই অহংকারের উদ্ভব হয় এবং তাহার ফলে প্রকৃতির দুঃখ অবিদ্যাবশে নিজের বলিয়া পুরুষ মনে করে, ইহা সম্ভবপর। কিন্তু উহা স্বীকার করিলে পুরুষের কোনও পরিণাম হয় না, বলা চলে না। "যৎ তটস্থং তু চিদ্রূপং স্ব-সংবেদ্যাৎ বিনির্গতং। রঞ্জিতং গুণরাগেন স জীবো ইতি কথ্যতে" (নারদ পাঞ্চরাত্র), জীবের এই সংজ্ঞায় জীব চিৎকণিকা মাত্র, তাহা সান্ত, বিভু নহে। প্রকৃতিও চৈতন্য হইতে একান্ত ভিন্ন পদার্থ নহে। ইহা স্বীকার করিলে জীবের বন্ধ কি, তাহা বোধগম্য হইতে পারে।

প্রাণ

উপনিষদে প্রাণকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বার্গস্ প্রাণকে (Elan vital) বিশ্বের মূল শক্তি বলিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য মতে প্রাণ "সামান্যকরণ বৃত্তিঃ", অর্থাৎ অন্তঃকরণদিগের সাধারণ বৃত্তি।

প্রাণ পাঁচটি। তাহাদিগকে পঞ্চবায়ু বলিয়া উল্লেখ করা হয়। "বায়ু শব্দ এখানে "শক্তি" বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চপ্রাণের নাম প্রাণ, আপন, সমান, ব্যান ও উদান। ইহারা অন্তঃকরণ তিনটি হইতে উদ্ভূত (অন্তঃকরণ-প্রযত্ন-জন্য)—অন্তঃকরণদিগের ব্যাপার বা কার্য্য। প্রাণগণ দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থিত থাকিয়া দেহকে ধারণ করে। বস্তুতঃ প্রাণ এক। শরীরের বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। সাংখ্যকারিকায় প্রাণদিগকে অন্তঃকরণের বৃত্তি বলিলেও যোগসূত্রের ভাষ্যে বাচস্পতি মিশ্র তাহাদিগকে অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ উভয়েরই বৃত্তি বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়দিগের বৃত্তি দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। রূপ, রস, গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শের "আলোচন" বাহ্য বৃত্তি; আভ্যন্তর বৃদ্ধি হইতেছে "জীবন"। "জীবন" অর্থে "প্রযত্নভেদ"—শরীরস্থ বায়ুর বিভিন্ন "ক্রিয়াজাত ভেদ।" এই ক্রিয়াদ্বারাই শরীর-ধারণ হয় বলিয়া ইহা জীবন শব্দবাচ্য। পঞ্চ প্রাণের মধ্যে মুখ্য প্রাণের কার্য্য মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ ও নিঃসরণ। অপানের কার্য্য অধোমুখ—মলাপনয়ন। ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের সমনয়ন (assimilation) —সমান ভাবে দেহের সর্ব্বত্র নয়ন—সমানের কার্য্য। খাদ্য রসের উর্দ্ধনয়ন উদানের কার্য্য। (পীতং অশিতং উদ্গিরতি এষ বাব উদানং—মৈত্রেয়

উপনিষৎ)। নাড়ীপথে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ (circulation of blood ?) ব্যানের কার্য্য। এই সকল কার্য্য দ্বারা শরীররক্ষা হয়। উহারা সকলেই করণদিগের সাধারণ বৃত্তি। শরীররক্ষার জন্য যাহা যাহার প্রয়োজন, সকলই পঞ্চপ্রাণের দ্বারাই হয়।

১১

সর্গ (সঞ্চর)

সর্গ শব্দের অর্থ সৃষ্টি। মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি, তাহা প্রকৃতিকৃত (প্রাকৃত) সৃষ্টি। মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা লিঙ্গদেহ গঠিত। স্থূলদেহ ব্যতিরেকে লিঙ্গদেহের ভোগ সাধিত হয় না। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও তদ্‌বিপরীত অধর্ম্মাদি ভাবকর্ত্তৃক অধিবাসিত লিঙ্গদেহ এক স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে। প্রাকৃতসর্গ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—লিঙ্গসর্গ ও ভৌতিক সর্গ। ভৌতিকসর্গ ত্রিবিধ—দৈব, মানুষ্য ও তির্য্যকযোনি। দৈবসৃষ্টি আট প্রকার —ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও পৈশাচ। ব্রাহ্ম= ব্রহ্মলোকবাসী। প্রাজাপত্য=প্রজাপতিলোকবাসী। ঐন্দ্র=ইন্দ্রলোকবাসী। পৈত্র=পিতৃলোকবাসী=চন্দ্রলোকবাসী। গান্ধর্ব্ব=গন্ধর্ব্বলোকবাসী। তির্য্যক-যোনি পাঁচ প্রকার—পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর। মৃগ=লোম ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট প্রাণী। (বনমানুষ, মর্কট ও পশু)। পতঙ্গাদি পক্ষীশব্দের এবং সর্প, মৎস্যাদি সরীসৃপ শব্দের অন্তর্গত। তরু, গুল্মলতাদি উদ্‌ভিদ্ এবং গতিহীন জড়বস্তু স্থাবর শব্দের বাচ্য। মনুষ্য-সৃষ্টি এক প্রকার। এই সকলই সংক্ষেপতঃ ভৌতিক সৃষ্টি। ভৌতিক সৃষ্টিকে তন্মাত্র সৃষ্টিও বলে।

প্রাকৃত সর্গ ব্যতীত আর এক প্রকার সর্গের নাম—ভাবসর্গ বা প্রত্যয়সর্গ। ভাব বিনা লিঙ্গ থাকিতে পারে না। বিনা লিঙ্গেও ভাব থাকিতে পারে না। "লিঙ্গ" করণদিগের সমষ্টি। করণদিগের কার্য্যই ভাব। ভৌতিক সর্গ বাহ্য সৃষ্টি, (Objective বা material) ভাবসর্গ বা প্রত্যয়সর্গ আভ্যন্তরীণ সৃষ্টি (Subjective বা Psychological)। লিঙ্গসর্গ ও প্রত্যয়সর্গ, এই এই উভয় সর্গ বিনা অপবর্গের হেতুভূত বিবেক-খ্যাতি উৎপন্ন হয় না। পুরুষের ভোগের জন্য যেমন ভোগায়তন দেহ ও ভোগ্য রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি সূক্ষ্ম দেহ, বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদিগেরও

সৃষ্টি হইয়াছে। অন্তঃকরণ হইতে অষ্টবিধ ভাব সৃষ্ট হয়—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য। ইহারাই প্রত্যয়সর্গ।

ধর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ভাবগুলি যখন সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ হয়, তখন তাহাদিগকে প্রাকৃতিক বলে। যেমন মহর্ষি কপিলের ছিল। যখন তাহারা নৈমিত্তিক অর্থাৎ প্রযত্নজাত হয়, তখন তাহাদিগকে বৈকৃতিক বলে, যেমন বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিদিগের। এই সকল ভাব করণাশ্রয়ী অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠ।

ইহারা বুদ্ধিরই রূপ। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য সাত্বিক এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য তামসিক। ধর্ম্মের অর্থ—দয়া, দান, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান। অধর্ম্ম ইহার বিপরীত—নিষ্ঠুরতা, কার্পণ্য, হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, ইন্দ্রিয়-লিপ্সা, পরদানগ্রহণ, অশুচিতা, অসন্তোষ, তপস্যাহীনতা, স্বাধ্যায়হীনতা এবং নিরীশ্বরতা। জ্ঞান অর্থে বিবেকজ্ঞান। অজ্ঞান অর্থ মিথ্যা জ্ঞান—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। বিষয়ে আসক্তিহীন মনোভাবই বিরাগ। বিষয়ে আসক্তিই অবৈরাগ্য। ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ ইচ্ছার অবিঘাত—অর্থাৎ যেরূপ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ইষ্টসিদ্ধি হয়, তাহা। অনৈশ্বর্য্য তাহার বিপরীত অর্থাৎ যাদৃশ ইচ্ছাদ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হয় না, সেইরূপ ইচ্ছা।

ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবগণের সংস্কার অন্তঃকরণ ধারণ করে এবং তাহারা ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার ফল সংসৃতি অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর। ধর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি লোকে গমন হয়। অধর্ম্মের ফল নরক-প্রাপ্তি। জ্ঞানের ফল অপবর্গ বা মুক্তি। জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞানের ফল বন্ধ। বৈরাগ্যের ফল প্রকৃতি-লয়। রাগের ফল সংসার অর্থাৎ পুনর্জন্মভোগ। ঐশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার অবিঘাত এবং তাহার বিপরীত অনৈশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার বিঘাত হয়। যে জ্ঞানের ফল মুক্তি, তাহা হইতেছে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান—পুরুষ যে বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নহে, এই জ্ঞান। এই জ্ঞানের ফল জীবন্মুক্তি। দেহপাতে এই জ্ঞানের ফলে হয় বিদেহ-কৈবল্য। এই জ্ঞান যতদিন না হয়, ততদিনই প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য চেষ্টা করে। জ্ঞান হইলে প্রকৃতি চেষ্টা হইতে বিরত হয়। "বিবেক-খ্যাতি-পর্য্যন্তং জ্ঞেয়ং প্রকৃতিচেষ্টিতং"। বিবেক-খ্যাতি (বিবেক-জ্ঞান—প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভেদ-জ্ঞান) পর্য্যন্তই প্রকৃতির চেষ্টা চলে।

অজ্ঞান হইতে যে বন্ধ হয়, তাহা ত্রিবিধ—প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক ও

দাক্ষিণিক। যাহারা প্রকৃতিকেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করে, তাহাদের বন্ধ প্রাকৃতিক। যাহারা অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির বিকারভূত, ইন্দ্রিয়, অহংকার এবং বুদ্ধিকে পুরুষ মনে করিয়া তাহাদের উপাসনা করে, তাহাদের বন্ধকে বৈকৃতিক বন্ধ বলে। আর ইষ্টাপূর্ত্ত—অর্থাৎ যাগযজ্ঞ এবং পূর্ত্তকর্ম্ম (কূপ-তড়াগাদি খনন) দ্বারা যে বন্ধ হয়, তাহার নাম দাক্ষিণিক বন্ধ। পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি যাগযজ্ঞ ও সাধারণের হিতকর পূর্ত্তকর্ম্মদ্বারাও বন্ধপ্রাপ্ত হয়। পুরুষ-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তির বৈরাগ্যের ফলই প্রকৃতি-লয়; তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির বৈরাগ্যের ফল তাহা নয়। প্রকৃতি শব্দে এখানে প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহৎ অহংকার, ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলই বুঝায়। যাহারা মহৎ আদির উপাসনা করেন, তাহাদের লয় মহদাদিতে হয়।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও তাহাদের বিপরীত, এবং বিপর্য্যয়. অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি ইহারা প্রত্যয় সর্গ। ইহাদের বহুবিধ ভেদ আছে। বিপর্য্যয়ের অর্থ অবিদ্যা, অজ্ঞান। জ্ঞানের মতো অজ্ঞানও বুদ্ধির ধর্ম্ম। যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা মনে করাই অবিদ্যা। তমঃকর্ত্তৃক অভিভূত বুদ্ধির পরিণামই অবিদ্যা। অশক্তি অর্থ অসামর্থ্য—পদার্থজ্ঞান-উৎপাদনে অথবা ক্রিয়া-উৎপাদনে অসামর্থ্য। ইন্দ্রিয়ের বিকলতা-বশতঃ অশক্তির উদ্ভব হয়। অশক্তিও বুদ্ধিধর্ম্ম। তুষ্টি ও সিদ্ধিও বুদ্ধিধর্ম্ম।

তুষ্টি অর্থে সন্তোষ। মোক্ষ পথে সন্তোষও মোক্ষের বাধাস্বরূপ হয়। সন্তোষ-বশতঃ উদ্যমের অভাব মোক্ষের অন্তরায়। তুষ্টি দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক ও বাহ্য। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রকৃতি-তুষ্টি, উপাদান-তুষ্টি, কাল-তুষ্টি, ভাগ্য-তুষ্টি। পঞ্চ বাহ্য বিষয় হইতে উপরতিজনিত পাঁচটি বাহ্য-তুষ্টি। মোট নয় প্রকার তুষ্টি।

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উপায়-নির্দ্দেশই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। এই উপায়-নির্দ্দেশের জন্য দুঃখের উৎপত্তি বর্ণনার প্রয়োজন হইয়াছে। জগৎ দুঃখময় কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক পদার্থ জগতের উপাদান। তাহাদের সাম্যাবস্থা জগতের অপ্রকাশিত অবস্থা। সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে, মহৎ, অহংকার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। তারপর নানাবিধ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সৃষ্টি। আধিভৌতিক সৃষ্টি হইতেছে সূক্ষ্মদেহ, মাতাপিতৃজ স্থূল দেহ ও অন্যবিধ জড় পদার্থ। আধ্যাত্মিক সৃষ্টির নাম প্রত্যয়সর্গ বা ভাবসর্গ। প্রত্যয়সর্গ মুখ্যতঃ

আটটি—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য। সূক্ষ্ম শরীরেই ইহাদের অবস্থিতি—সূক্ষ্ম শরীর এই সকল ভাব দ্বারা অধিবাসিত। এই সকল ভাব আবার পঞ্চবিপর্য্যয়, ২৮ প্রকার অশক্তি, ৯ প্রকার তুষ্টি এবং অষ্ট সিদ্ধিতে বিভক্ত। এই পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয় সর্গ।

১২

প্রতিসর্গ (প্রতিসঞ্চর)

অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি হয়। প্রথমে মহৎ, পরে ক্রমে ক্রমে অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত আবির্ভূত হয়। অহংকার ত্রিবিধ—বৈকারিক, তৈজস, এবং ভূতাদি। বৈকারিক অহংকার হইতে উদ্‌ভূত হয় ইন্দ্রিয়গণ, ভূতাদি অহংকার হইতে তন্মাত্রগণ। তৈজস অহংকার হইতে নূতন কিছুর সৃষ্টি হয় না। তাহা ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র-সৃষ্টির সহায়ক। তন্মাত্র হইতে স্থূলভূতের উদ্‌ভব হয়। এই ক্রমে প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা সঞ্চর বা সর্গ হয়। প্রতিসঞ্চর বা প্রলয় ইহার বিপরীতমুখী। প্রলয়ে স্থূলভূতগণ তন্মাত্রে বিলীন হয়, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণ অহংকারে, অহংকার বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি অব্যক্তে বিলীন হয়, ধ্বংস কিছুরই হয় না। সকলই অপেক্ষাকৃত স্থূল অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে সর্ব্বকারণ-কারণ প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সৃষ্টি দ্বিবিধ—ভূতসর্গ ও প্রত্যয়সর্গ। প্রত্যয় সর্গ পঞ্চাশ প্রকারের। ইহারা আভ্যন্তরীণ (মানসিক) সৃষ্টি, বুদ্ধি হইতে উদ্‌ভূত। ইহারা বুদ্ধিতে লীন হয়, বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন থাকে একদিকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর সাম্যাবস্থা-রূপ প্রকৃতি, ও অন্যদিকে অসংখ্য পুরুষ। তখন কি প্রকৃতি ও পুরুষের তথাকথিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়?

প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে পুরুষ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। প্রলয়ে যদি এই সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইত, তাহা হইলে সকল পুরুষই তখন মুক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হইত, বলিতে হইবে। মুক্ত পুরুষের অবিদ্যা থাকে না, এবং তাহার পুনরায় বন্ধনও হইতে পারে না। কিন্তু প্রলয়ে অবিদ্যার ধ্বংস হয় না, তাহা প্রকৃতিতে লীন হয় মাত্র। প্রলয়ান্তে তাহা পুনরুত্থিত হয় এবং প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধির সহিত—যাহা প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীন হইয়া সুপ্ত থাকে, তাহার সহিত—যুক্ত হয়। যখন প্রকৃত জ্ঞান হয়, তখন অবিদ্যার বিনাশ হয় এবং পুরুষ প্রকৃতির বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। যে

সকল পুরুষের সেই জ্ঞান হয় নাই, তাহারা প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হয় বলা যায় না।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ অনাদি। সৃষ্টি-প্রবাহ যেমন অনাদি প্রলয়ও তেমনি অনাদি—অর্থাৎ সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে সৃষ্টি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

চিরমুক্ত পুরুষ যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত এই জগদ্ব্যাপারের কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের সংযোগ কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না। যাঁহারা সাধনবলে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিতও বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপারের কোনও সম্বন্ধ নাই। অবশিষ্ট যাবতীয় পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রলয়ে এই সংযোগ, যতদিন প্রলয় থাকে, ততদিনের জন্য হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়। তখন পুরুষের ভোগ থাকে না। কিন্তু সে বিচ্ছেদ স্থায়ী হয় না। প্রলয়ান্তে তাহার বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগের ফলে ভোগ পুনরায় আরব্ধ হয়।

প্রলয়ে প্রকৃতি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। কিন্তু তখন প্রকৃতির ক্রিয়ার ফলে নূতন কিছুর উদ্ভব (বিসদৃশ পরিণাম) হয় না। তখন প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম হয়, অর্থাৎ একই অবস্থা বারংবার উদ্ভূত হয়। কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। প্রলয়কালেও প্রকৃতিতে অনুস্যূত উদ্দেশ্যের (পুরুষের ভোগ-ও-অপবর্গ-সাধন) ব্যতিক্রম হয় না। পুরুষদিগের কর্ম্মের ফলেই প্রলয় হয় এবং প্রলয়কেও সংসার-চক্রের একটি ক্রম বলিতে হইবে। মুক্তিতে মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির ক্রিয়া চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়। সৃষ্টি যেমন পুরুষের প্রভাবের ফল, প্রলয়ও তেমনি প্রকৃতির উপর পুরুষের প্রভাবের ফল। পুরুষের প্রভাবের অর্থ এই যে ত্রিগুণের মধ্যে যে উদ্দেশ্য অন্তঃপ্রবিষ্ট, তাহার ফলে প্রকৃতির যাবতীয় ক্রিয়াই পুরুষের প্রয়োজন-সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদিগের কর্ম্মের ফলোৎপত্তির জন্য যখন নূতন ভোগের অনুৎপত্তির প্রয়োজন হয়, তখনই প্রলয় হয়। জীবের স্বকৃত কর্ম্মের ফলেই তাহার মোক্ষ হয়। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মের ফল-ভোগ-দ্বারাই জীবের অন্তরে বৈরাগ্য-সঞ্চার হয় এবং বৈরাগ্য হইতেই বিবেক-জ্ঞানের উদ্ভব হয়। কর্ম্মফলের পরিপাকের জন্য সময়ের প্রয়োজন। প্রলয়দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূক্ষ্ম ভাবে প্রকৃতির মধ্যে লীন জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার যখন ফলোন্মুখী হয়, তখন আবার নূতন সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধিসহ তাহার লিঙ্গদেহ তখন পুনরুত্থিত হইয়া

তাহাতে সংযুক্ত হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, যে প্রলয়ে পুরুষের সহিত তাহার লিঙ্গদেহের সম্বন্ধের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না—এক অজ্ঞাত উপায়ে পুরুষ ও তাহার লিঙ্গদেহের মধ্যে স্ব-স্বামী সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, যদিও যতদিন প্রলয় থাকে, ততদিন তাহার ফলে পুরুষের ভোগ কিছু হয় না। কিন্তু বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র সকলই যখন বিশ্লিষ্ট ও বিলীন হইয়া ত্রিগুণে পর্য্যবসিত হয়, তখন প্রত্যেক পুরুষের বিশিষ্ট বুদ্ধি অহংকার প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর হয় কিরূপে ? হয়তো ইহারা বিশিষ্ট অবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান থাকে না, কিন্তু কর্ম্মফলে ত্রিগুণের ভাণ্ডার হইতে সংহত হইয়া আবির্ভূত হয়, পুরুষের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্য।

প্রলয়ে স্থূল কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও যাবতীয় ব্যষ্টি অহংকার তাহাদের ব্যষ্টি বুদ্ধির মধ্যে, বুদ্ধি প্রকৃতির মধ্যে লীন হয় অর্থাৎ তাহাদের উপাদান সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে বিশ্লিষ্ট হয়। এইরূপে জীবের লিঙ্গদেহ প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়। লিঙ্গদেহদিগের বাহিরে যে তন্মাত্র ও স্থূল ভূত থাকে, তাহারাও প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন বিষয়ের ও বুদ্ধির অভাবে বিষয়ের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হয় না। বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পুরুষে পতিত হয় না, পুরুষের প্রতিবিম্বও বুদ্ধিতে পতিত হয় না। সুতরাং পুরুষের ভোগ হয় না। প্রলয়ান্তে কিরূপে প্রত্যেক পুরুষের পূর্ব্ব সর্গের বুদ্ধি তাহার অহংকার ও ইন্দ্রিয়াদি সহ পুনর্গঠিত হয়, তাহা দুর্ব্বোধ্য। লিঙ্গদেহের অবিদ্যা ও কর্ম্মের বিনাশ হয় না। এই অবিদ্যা ও কর্ম্মবশতঃই ইহা সম্ভবপর হয়; কিন্তু কোন্ প্রণালীতে হয়, তাহা আমরা জানি না। প্রত্যেক পুরুষের লিঙ্গদেহ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার সহ তাহার সহিত সংসক্ত হয়, ইহা হইতে অনুমান করা যায়, যে অমুক্ত পুরুষদিগের সহিত তাহাদের লিঙ্গদেহের উপাদান-দিগের একটা সম্বন্ধ থাকিয়া যায়, সে সম্বন্ধ যতই ক্ষীণ হউক না কেন। অবিদ্যা ও কর্ম্মই এই সম্বন্ধের ভিত্তি। বুদ্ধিই অবিদ্যা ও সংস্কারের আধার। প্রত্যেক বুদ্ধি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলেও কিরূপে ব্যক্তির অবিদ্যা ও সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রত্যেক পুরুষের সহিত তাহার লিঙ্গদেহের অবিদ্যা ও কর্ম্মের সম্বন্ধ যে বিনষ্ট হয় না, প্রলয়ান্তে তাহার সহিত পূর্ব্বকল্পের লিঙ্গদেহের সংযোগই তাহার প্রমাণ।

১৩

প্রকৃতি-লয়

প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ অনাদি। কিন্তু অনাদি হইলেও এই সম্বন্ধ অন্তহীন নহে। অবিবেক বা অজ্ঞান হইতে এই সম্বন্ধরূপ বন্ধের উৎপত্তি হয়, এবং অবিবেকের নাশ হইলে ইহারও নাশ হয়। পুরুষ তখন স্বরূপে অবস্থান করে। এই স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ বা মুক্তি। যতদিন এই মুক্তি না হয়, ততদিন জীবের সংসৃতি হয়, অর্থাৎ বারংবার তাহাকে দেহ ধারণ করিয়া দেব, মানব অথবা ইতর যোনিতে আবির্ভূত হইতে হয়। বিবেক-খ্যাতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান যখন আবির্ভূত হয়, এবং অবিবেকের নাশ হয়, তখন জীব জীবন্মুক্ত হয়। তখন প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিরূপ পঞ্চ বুদ্ধিবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, এবং তাহার ফলে পুরুষ প্রশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ (সাং সূ ২।৩৪) হয়, অর্থাৎ তাহার উপাধিরূপ যে (বুদ্ধির) প্রতিবিম্ব, তাহার নিবৃত্তি হয় এবং পুরুষ আপনার স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্থূল ও লিঙ্গদেহের নাশ হয় না। প্রারব্ধ-ক্ষয় যতদিন না হয়, ততদিন তিনি স্থূল দেহে অবস্থান করেন। প্রারব্ধের ক্ষয় হইলে তাঁহার স্থূল ও লিঙ্গ উভয় দেহের নাশ হয়। তখন জীবের সম্পূর্ণ বিলোপ হয়। তখন বুদ্ধিসম্বন্ধ-বিচ্যুত পুরুষ বিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করেন। ইহাই মোক্ষ।

মোক্ষ ব্যতীত সাংখ্যশাস্ত্রে "প্রকৃতি লয়" নামে আর এক প্রকার মুক্তির কথা আছে। বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতি-লয় হয়। রজোগুণোদ্ভব রাগ হইতে সংসার (পুনর্জ্জন্ম), অণিমাদি ঐশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার অবিঘাত হয়; অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা, তাহা করা যায়; আর ঐশ্বর্য্যের বিপরীত অনৈশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার বিঘাত হয় (সাং কা ৪৫)। বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতি-লয় হয়। কিন্তু প্রকৃতি-লয়-প্রাপ্তিতে কৃত-কৃত্যতা হয় না। তাহার পরে পুনর্জ্জন্ম হয়; যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি জল হইতে উত্থিত হয় (সাং সূ—৩।৫৪)।

এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু লিখিয়াছেন বিবেক-জ্ঞানের অভাবে যখন প্রাকৃতির উপাসনার ফলে মহদাদিতে বৈরাগ্য জন্মে, তখন প্রকৃতিতে লয় হয়। কিন্তু তাহাতে কৃত-কৃত্যতা হয় না। সংস্কারের নাশ না হওয়ায় ভবিষ্যতে বিবেকখ্যাতিদ্বারা দোষের দাহ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতি-লীন জীবকে জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় পুনরায় আবির্ভূত হইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন বৈরাগের ফল প্রকৃতি-লয়। প্রকৃতি-লয়ে জীব প্রধান, বুদ্ধি,

৩৭

অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রে লীন হয়। তাহার মোক্ষ হয় না। বাচস্পতি মিশ্রের মতে প্রকৃতি শব্দে এখানে প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য মহৎ, অহংকার পঞ্চতন্মাত্রের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও সূচিত হয়। আত্মবুদ্ধিতে ইহাদের মধ্যে যাহাকে যে উপাসনা করে, তাহাতে তাহার লয় হয়। গৌড়পাদ বলেন প্রকৃতি শব্দে এখানে প্রধান, বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র বুঝায়, ইন্দ্রিয় বুঝায় না।

পাতঞ্জল দর্শনেও প্রকৃতি-লয়ের কথা আছে। ১।১৮ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ব্যাখার পরে আছে, "স খলু অয়ং দ্বিবিধঃ, উপায়-প্রত্যয়ঃ ভব-প্রত্যয়শ্চ। উপায়-প্রত্যয়ঃ যোগিনাং ভবতি।" এখানে প্রত্যয় শব্দের অর্থ কারণ। উপায়—শ্রদ্ধা আদি—যাহার কারণ, তাহা উপায়-প্রত্যয়।" "ভব" (অবিদ্যা—জায়ন্তে অস্যাং জন্তবঃ, ইতি ভবঃ) যাহার কারণ, তাহা ভব-প্রত্যয়। ভূতগণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিকারগণ, অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র —এই সকল অনাত্ম বস্তুতে বৈরাগ্য-সম্পন্ন লোকদিগের যে আত্মজ্ঞান, তাহাই ভব বা অবিদ্যা। সেই অবিদ্যার ফলে যে সমাধি, তাহা "ভবপ্রত্যয়" (বাচস্পতি) "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্"। পাতঞ্জল সূত্র—১।১৯। যাহারা বিদেহ এবং যাহারা প্রকৃতি-লয়, তাহাদের সমাধি ভবপ্রত্যয়। বিদেহ অর্থে দেবতা। দেবতা এবং প্রকৃতিলয়দিগের অবিদ্যার নাশ না হওয়ায়, তাহাদের যে সমাধি, তাহা ভবপ্রত্যয়। এখানে "বিদেহ" নামে তৃতীয় প্রকার মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। বাচস্পতি বলেন, প্রকৃতিলীনদিগের মধ্যে যাঁহারা অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতির মধ্যে কোনও একটিতে লীন হন, তাহারা প্রকৃতি-লয়, যাঁহারা পঞ্চ স্থূলভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ বিকারের কোনটিতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহারা বিদেহ।

মোক্ষ চিরস্থায়ী। বিবেক-খ্যাতিজনিত এই মুক্তি নিরবধি। কিন্তু বিদেহ ও প্রকৃতিলীনের মুক্তি সেরূপ নহে। নির্দ্দিষ্ট কালান্তে তাহাদিগকে প্রাদুর্ভূত হইতে হয়। যিনি যে তত্ত্বে লীন, তদনুসারে তাহার মুক্তিকাল নির্দ্ধারিত হয়। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :

দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ।
বৌদ্ধাঃ দশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত-চিন্তকাঃ

ইন্দ্রিয়ের চিন্তা যাহারা করেন, তাহারা দশ মন্বন্তর ইন্দ্রিয়ে লীন থাকেন। যাঁহারা ভৌতিকে লীন, তাঁহাদের প্রকৃতি-লীনত্বের অবধি শত মন্বন্তর।

অহংতত্ত্বে যাঁহারা লীন, তাহাদের অবধি সহস্র মন্বন্তর। মহৎতত্ত্বে লীনদিগের অবধি দশ সহস্র মন্বন্তর। অব্যক্তে লীনদিগের অবধি শতসহস্র মন্বন্তর। যিনি অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ইহাদের কোনও একটিকে আত্মজ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তিনি তাহাতেই লীন হন, এবং তাহার লীন অবস্থা উপরোক্ত ক্রমে স্থায়ী হয়।

উপরে "বিদেহ" শব্দের অর্থ দেবতা বলা হইয়াছে। ভোজরাজের মতে যাঁহারা অনন্দ-সমাধিতে বদ্ধ-ধৃতি হইয়া প্রধান ও পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কার করেন না, তাঁহারা দেহাহংকার শূন্য বলিয়া বিদেহ শব্দ বাচ্য হন। তাহাদিগকেই বিদেহ দেব বা বিদেহলীন দেব বলে। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে শরীর-নিরপেক্ষ যে বুদ্ধিবৃত্তি, তদ্‌যুক্ত মহদাদিই বিদেহ। শ্রীমন্ হরিহরানন্দ আরণ্য বলেন, "স্থূলগ্রহণে সমাপন্ন যোগী বিষয়-ত্যাগে আনন্দলাভ করিয়া যদি বিষয়ত্যাগই পরমপদ জ্ঞান করেন, এবং শব্দাদি গ্রাহ্য বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইয়া তাহাদের (শব্দাদি জ্ঞানের) সম্যক নিরোধ করেন, তখন বিষয়-সংযোগের অভাবে করণবর্গ লীন হইবে, কারণ বিষয় ব্যতীত করণগণ মুহূর্ত্তমাত্রও ব্যক্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা তাদৃশ বিষয়-গ্রহণ রোধ বা অনাস্রবসংস্কার সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে বিলীন-করণ হইয়া নির্ব্বীজ সমাধি-লাভপূর্ব্বক সংস্কারের বলানুসারে অবচ্ছিন্ন কাল, কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভব করেন। ইহারাই বিদেহ দেব।" (পাঃ দঃ ৫৪ পৃঃ)।

কিন্তু প্রকৃতি-লীনদিগের প্রকৃতিতে লীন হওয়ার অর্থ কি? তাহাদের স্থূল শরীরের নাশ হইলেও লিঙ্গদেহের নাশ হয় না। তাঁহাদের লিঙ্গদেহের সহিত পুরুষের তথাকথিত সংযোগেরও বিচ্ছেদ ঘটে না। তাহাদের ব্যক্তিত্বেরও (Personality) নাশ হয় না। পুরুষ অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার প্রভৃতির মধ্যে গিয়া তাহার মধ্যে লীন হয় না। উপরে দশ মন্বন্তর লীন, শত মন্বন্তর লীন প্রভৃতি যে অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, সেই অবস্থায় পুরুষ থাকে না। কেন না বন্ধ বা 'বন্ধ'-বীজ পুরুষের নহে, জীবের। সুতরাং লিঙ্গদেহ-সমন্বিত জীবই লীন হইয়া থাকে। জীব যে প্রকৃতিতে লীন থাকে, তাহা ভিন্ন অন্য প্রকৃতি তাহার লিঙ্গদেহে বর্ত্তমান থাকিলেও নিষ্ক্রিয় থাকে। "লীন" শব্দের এই ভাবে অর্থ করিতে হইবে।

১৪

পরবাদ

বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডন

সাংখ্য সূত্রে যুক্তিদ্বারা বিরুদ্ধ মত খণ্ডিত হইয়াছে। সেই সকল যুক্তি নিম্নে বর্ণিত হইল।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে কোনও কার্য্যেরই স্থিরত্ব নাই। কোনও পদার্থই স্থির নহে। পদার্থ যখনই উৎপন্ন হইতেছে, তখনই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। এই মতে প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা হয় না। যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অথবা স্পর্শ করিয়াছি, তাহাই এখন দেখিতেছি, অথবা স্পর্শ করিতেছি, এই বোধ বা প্রত্যভিজ্ঞা যে হয়, যাহা আমি দেখিয়াছিলাম বা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহা যদি দেখা অথবা স্পর্শমাত্রই বিনষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ শ্রুতি ও ন্যায় উভয়েরই বিরোধী। "সৎ এব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ"—এই শ্রুতি অনুসারে যে জগৎ এখন আছে, তাহা পূর্ব্বেও ছিল। দ্রব্যের ক্ষণিকত্ব-প্রমাণের জন্য ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদিগণ যে দীপশিখার ও নদীপ্রবাহের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন, তাহাদ্বারা ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রদীপের অঙ্গীভূত দ্রব্যাদির এবং নদীজলের কোনও অংশের বিনাশ নাই। এই জন্যই দীপশিখা ও জলপ্রবাহের অবয়ব সকলের মধ্যে সংযোগ-সম্বন্ধের সম্ভব হয় এবং এই সংযোগ-সম্বন্ধবশতঃ দীপশিখা ও জলপ্রবাহের একত্বের জ্ঞান হয়।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদদ্বারা কার্য্য-কারণ-ভাবের ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ ও তাহার কার্য্য হয় যুগপৎ উদ্ভূত হয়, নতুবা একটির পরে আর একটির উদ্ভব হয়। যাহারা একই কালে উদ্ভূত হয়, তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ-ভাব থাকা অসম্ভব। কার্য্যের পূর্ব্বে যে কারণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আবার কারণ উদ্ভূত হওয়ামাত্রই যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে তাহার বিনাশের পরে উৎপন্ন পদার্থের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে উদ্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে থাকিতে যদি তাহার কার্য্যের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানমতে পরে উদ্ভূত বস্তুর যখন

উৎপত্তি হয়, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। একের সত্তায় অপরের সত্তা এবং অসত্তায় অন্যের অভাব হইলেই কার্য্যকারণ ভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার অভাব হইলে কার্য্যকারণ ভাব থাকিতে পারে না।

কারণ ও তাহার কার্য্য দুই ভিন্ন ক্ষণে অবস্থিত। কারণ পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত বলিয়াই তাহার সহিত পরক্ষণে অবস্থিত কার্য্যের সম্বন্ধ কল্পিত হয়—ইহা বলিতে পারা যায় না। কেননা যে ক্ষণে কোনও কার্য্যের উদ্ভব হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণে বহু বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে কারণ বলিবে? সকলেই কারণ হইতে পারে। পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত কোনও বিশেষ বস্তুকে পরক্ষণে অবস্থিত এক বিশেষ বস্তুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার নিয়ম থাকে না।

বাহ্য জগতের প্রতীতি হয়। বিজ্ঞানের যেমন প্রতীতি হয়, বাহ্য জগতেরও তদ্রূপই প্রতীতি হয়। তাহারা বাহিরে অবস্থিত বলিয়াই প্রতীতি হয়। সুতরাং তাহারা বিজ্ঞানমাত্র নহে। বাহ্য জগতের প্রতীতি সত্ত্বেও, তাহার বিজ্ঞান-বাহ্য অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই বলিতে হয়। তাহা হইলে তো সকল জগৎই শূন্য হইয়া পড়ে, এক বিজ্ঞাতামাত্র বর্ত্তমান থাকে।

শূন্যবাদিগণের মতে শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। জগতে যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সকলই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বিনাশই বস্তু-ধর্ম্মবিশিষ্ট, অর্থাৎ বিনাশই একমাত্র সত্য বস্তু। এই শূন্যবাদ "অবুদ্ধ" লোকদিগের "অপবাদ"মাত্র—কুতার্কিক-দিগের প্রলাপমাত্র। কোন বস্তুই যে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তাহার প্রমাণ নাই।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ উভয়েই "সমানক্ষম" অর্থাৎ উভয়ের নিরসন-যুক্তি একই। যে যে যুক্তিতে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের নিরসন করা হইয়াছে, তাহারা শূন্যবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। শূন্যবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি, তাহা ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। শূন্যবাদে প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা হয় না। বাহ্য-প্রতীতি-যুক্তি ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

পুরুষার্থ বলিয়া যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যাহার জন্য সকলে লালায়িত, এই উভয় মতে তাহা অপুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আত্মা ক্ষণিক পদার্থ, সুতরাং তাহার আর মুক্তি কি? আর বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞাতাই যদি একমাত্র থাকে, তাহা হইলে তাহার মুক্তিই বা কি? তাহার অনাদি বস্তু-বিজ্ঞান প্রবাহের পরিহারও অসম্ভব।

জড়বাদ-খণ্ডন

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহ। কেহ কেহ বলেন, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, ও মরুৎ এই চারিভূতেই দেহ নির্ম্মিত। আকাশ কোনও বস্তুর উপাদান নহে। আবার কাহারও কাহারও মতে কেবল পৃথিবীদ্বারাই দেহ গঠিত। অন্য চারিভূত দ্বারা পৃথিবী ভূতের পরিণাম সংঘটিত হয়। আবার কাহারও কাহারও মতে পঞ্চভূতের এক একটি দ্বারা এক এক জাতীয় দেহ গঠিত হয়। অন্য ভূতসকল তাহার সহকারী থাকে মাত্র। যেমন মনুষ্য-দেহ পৃথিবী দ্বারা গঠিত। সূর্য্যাদির শরীর তেজদ্বারা গঠিত।

দেহ হইতে স্বাভাবিক উপায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। ভৌতিক দেহে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বাভাবিক নহে। কেনমা প্রত্যেক ভূতের মধ্যে যখন চৈতন্য নাই, তখন তাহাদের সমবায়ে চৈতন্যের উদ্ভব হইতে পারে না। দেহে যদি চৈতন্য স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে তাহার মরণ ও সুষুপ্তি হইত না। নানা দ্রব্যের মিশ্রণে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাতে মাদকতা দেখা যায় সত্য। কিন্তু মদ্যের উপকরণদিগের প্রত্যেকের মধ্যে মাদকতাশক্তি থাকে বলিয়াই তাহাদের সংমিশ্রণে মাদকতা প্রকট হয়। কিন্তু ভূতে চৈতন্য যে সূক্ষ্মরূপে থাকে, তাহার প্রমাণ নাই।

চৈতন্যময় আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রমাণ করা যায় না। তাহা শ্রুতিপ্রমাণ ও অনুমানদ্বারা সিদ্ধ। জড়বস্তুযোগে কেহ চৈতন্যের উৎপাদন করিয়া আত্মার নাস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই।

আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। আত্মা ও দেহের ধর্ম্মের বিভিন্নতা আছে। দেহ পরিণামী, কিন্তু দেহের মধ্যে যিনি জ্ঞাতারূপে অধিষ্ঠিত, তিনি অপরিণামী।

অদ্বৈতবাদ খণ্ডন

বিভিন্ন জীবের ইন্দ্রিয়গণ একই সময় বিভিন্ন দিকে ব্যাপৃত থাকে। সর্ব্বদেহে যদি একই পুরুষ অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে করণদিগের একই সময়ে বিভিন্ন পথে গমন সম্ভবপর হইত না। পুরুষের ভোগের জন্যই দেহ। দেহেরই জন্ম অর্থাৎ পুরুষের সহিত সংযোগ এবং মৃত্যু অর্থাৎ সেই সংযোগের অবসান। জন্ম ও মৃত্যু বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন সময়ে হয়। পুরুষ যদি এক হইত, তাহা হইলে এই বিভিন্নতা থাকিত না। দেহ পুরুষের ভোগায়তন।

প্রত্যেক আয়তন হইতে যে ভোগ হয়, তাহার ভোক্তা এক জনই হইবে। ভোগায়তন যখন বহু, তখন ভোক্তাও বহু, ইহা অনুমান করা যায়।

উপরি উক্ত যুক্তি ব্যতীত আরও একটি যুক্তি দ্বারা পুরুষ-বহুত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা সাংখ্যদর্শনে আছে। "ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়" অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জীবে ত্রিগুণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাদ্বারা প্রমাণিত হয়, যে এই সকল জীবে বিভিন্ন পুরুষ বর্ত্তমান। কোনও জীব সত্ত্ববহুল, কোনও জীবে রজোগুণের বাহুল্য, আবার কোনও জীব তমঃপ্রধান। পুরুষ যদি একমাত্র হইত, তাহা হইলে এই ভেদ থাকিত না।

নিত্য-ঈশ্বরবাদ-খণ্ডন

যাঁহারা নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য চেষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য চেষ্টার আশ্রয়-স্বরূপ নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করেন। কিন্তু জ্ঞান, ইচ্ছা, চেষ্টা প্রভৃতির নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না। বুদ্ধি বা অধ্যবসায় (নিশ্চিত জ্ঞান), ইচ্ছা, চেষ্টা, ইহারা সকলই অনিত্য। তেজ বহ্নির আশ্রয়। কিন্তু বহ্নি অনিত্য বলিয়া তেজও অনিত্য বলিয়া গৃহীত হয়। সেইরূপ ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি অনিত্য বলিয়া তাহাদের আধারও অনিত্য। অনিত্য জ্ঞান, ইচ্ছাদির দ্বারা নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই প্রমাণ নাই। যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তাহাকে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির আশ্রয় বলা যায় না। জ্ঞান ইচ্ছাদি যদি নিত্যও হয়, তাহা হইলেও তাহাদের আশ্রয় বলিয়া ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টি-ক্রিয়ার সম্ভব হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই, যে যোগসিদ্ধি (অণিমাদি) অস্বীকার করা যায় না। ঔষধাদি সেবনদ্বারা যেরূপ শরীরের শক্তি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ যোগদ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইতে পারে। সেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি-বিষয়ে উপযোগী। যিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য যোগবলে লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করিতে পারেন। ব্রহ্মাণ্ডাদি-সৃষ্টি-সামর্থ্য জন্য (উপার্জ্জনযোগ্য) হইতে পারে।

১৫

সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ

জ্ঞানং মহৎ যদ্ধি জ্ঞানেষু রাজন, বেদেষু ধর্ম্মেষু তথৈব যোগে॥
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধে পুরাণে, সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥

মহাভাঃ শান্তি পর্ব

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, যাবতীয় জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, বেদে, ধর্ম্মে ও যোগে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, যে জ্ঞান বিবিধ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলই সাংখ্যাগত বা সাংখ্যেরই জ্ঞান। কিন্তু এই সাংখ্য যে প্রচলিত সাংখ্যদর্শন নহে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নহেন। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহাদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তঃ।

প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ। সাং কাঃ—৫৬

এই কারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—এই আরম্ভ বা সৃষ্টি প্রকৃতি-কৃত, ঈশ্বরকৃত নহে। মহৎ হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিই প্রকৃতি-কৃত। এই সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্ম নহেন। ইহার যে কারণ নাই, তাহাও নহে। প্রকৃতিই ইহার কারণ। সৃষ্টি যদি অকারণ হইত, তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত ভাব বা অত্যন্ত অভাব হইত, অর্থাৎ তাহা হইলে, হয় তাহাকে নিত্য বলিতে হইত, নতুবা তাহার অস্তিত্বই নাই বলিতে হইত। কিন্তু উৎপত্তি-বিনাশশীল জগৎ নিত্য হইতে পারে না। আবার প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহাও বলা যায় না। চিতিশক্তি অপরিণামী; সুতরাং ব্রহ্মও জগতের উপাদান হইতে পারেন না। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি-কর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না, কেননা ঈশ্বর নির্ব্যাপার (নিষ্ক্রিয়)। তাঁহার পক্ষে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব। প্রত্যেক পুরুষের মোক্ষের জন্যই প্রকৃতি চেষ্টা করে—যেন স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহাই সৃষ্টি।

প্রকৃতি-কর্ত্তৃক যাবতীয় সৃষ্টি হয়, জীব স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। সে ফল কর্ম্মের স্বকীয় শক্তিদ্বারাই উৎপন্ন হয়। কর্ম্মের ফলদাতা কোনও পুরুষ নাই। ইহাই সাংখ্যমত। সুতরাং এই দর্শনে জগদ্ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকারের কোনও প্রয়োজনই নাই। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের কোনও স্থানই নাই। সুতরাং এই দর্শনকেই ভীষ্ম সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে।

সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বর স্পষ্টই অস্বীকৃত হইয়াছেন। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। সাং সূ ১।৯২ (ঈশ্বর অসিদ্ধ—এইজন্য)। ইহার ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান ভিক্ষু লিখিয়াছেন: "ঈশ্বরে প্রমাণাভাবাৎ ন দোষঃ"—ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এই জন্য দোষ হয় না। এই সূত্রটি উত্তরপক্ষ, পূর্ব্বপক্ষের উত্তর। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে এই

সূত্রদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই; ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, ইহাই মাত্র বলা হইয়াছে। যে উপলক্ষ্যে এই সূত্রটি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এই :—

সাংখ্যসূত্রে প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—

যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্ ১।৮৯

যে বিজ্ঞান (বুদ্ধি-বৃত্তি) সম্বদ্ধ (বিষয়ের সহিত) হইয়া সম্বদ্ধ বস্তুর আকার ধারণ করে, তাহাকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। অর্থাৎ বিষয়ের সন্নিকর্ষ-নিমিত্ত বুদ্ধি যে আকার ধারণ করে, বুদ্ধির সেই আকার বা বৃত্তিই প্রত্যক্ষ। কিন্তু ইহাই যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে যোগীদিগের প্রত্যক্ষকে তো প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা যায় না। কেননা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অতীত, অনাগত ও ব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ। তাহাতে বুদ্ধির সহিত প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর সম্বন্ধ কোথায়? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলেন—প্রত্যক্ষের পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যোগীদিগের প্রত্যক্ষ অবাহ্য প্রত্যক্ষ। তাহাতে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের প্রায়োজন নাই। কিন্তু যোগীদিগের প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা যে একেবারেই অপ্রযোজ্য, তাহাও নহে। উৎপত্তি বা বিনাশ প্রকৃতপক্ষে কোনও বস্তুরই হয় না। যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহার কারণে লীন অবস্থায় আছে; যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহাও তাহার কারণে লীন অবস্থায় আছে। এই লীন বস্তুদিগের সহিত যোগীদিগের চিত্তের বাস্তবিকই সম্বন্ধ ঘটে। ইহার পরে যে আপত্তি উঠিতে পারে, তাহার খণ্ডনের জন্যই 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' সূত্রটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর যোগী ও ভক্তগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্র-প্রমাণে জানা যায়। কিন্তু তিনি অতীন্দ্রিয় ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া বুদ্ধি তাঁহার আকার ধারণ করিতে পারে না। এ অবস্থায় তাঁহার প্রত্যক্ষ কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহারই উত্তর—প্রত্যক্ষের বিষয় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও ঈশ্বর আছেন—অপ্রত্যক্ষ রূপে আছেন—এ কথাও বলা হয় নাই। ইহার পরে আছে পুরুষ দ্বিবিধ—মুক্ত ও বদ্ধ। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের পুরুষের অস্তিত্ব নাই। পরে—"উভয়থাপি অসৎকরত্বম্" সাং সূ ১।৯৪। বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ঈশ্বর যদি মুক্ত পুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার স্রষ্টৃত্বাদি থাকে না; কেননা মুক্ত পুরুষে সৃষ্টির প্রযোজক অভিমান ও রাগাদি নাই। যদি বদ্ধ পুরুষ হন, তাহা হইলে মূঢ়ত্ববশতঃ তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদির ক্ষমতা থাকিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ নহে। এই দুই সূত্রদ্বারা

ঈশ্বরের অস্তিত্বই যে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই প্রতীত হয়। তবুও কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, কেবল ইহা বলাই সাংখ্যকারের উদ্দেশ্য, ঈশ্বর নাই, ইহা তিনি বলেন নাই। কেহ কেহ উপরি উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন, মুক্ত ও বদ্ধ উভয়বিধ পুরুষেরই লিঙ্গ শরীর আছে, বলিয়া তাঁহারা প্রত্যক্ষযোগ্য। কিন্তু ঈশ্বরের লিঙ্গ শরীর নাই বলিয়া তিনি প্রত্যক্ষ নহেন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতাই মাত্র ৯৩ ও ৯৪ সূত্রে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় নাই।

ইহার পরেও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহাদের খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে। ঈশ্বর ভক্তগণকে দর্শন দিয়াছেন, এবং তাঁহার দর্শন পাইয়া ভক্তগণ তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন, শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর যদি অসিদ্ধই হন, তাহা হইলে এই সকল শাস্ত্রীয় উক্তির কি হইবে? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলিতেছেন "এই সকল স্তুতি মুক্ত আত্মাদিগের প্রশংসা, অথবা অণিমাদি-সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের উপাসনা; ঈশ্বরের স্তুতি নহে।" যাঁহারা সাংখ্যের নিরীশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, মুক্ত পুরুষগণ গুণসঙ্গাতীত হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হন। পরমাত্মার প্রতি মানসিক গতি ফিরাইবার জন্য মুক্ত পুরুষদিগের স্তুতি করা হইয়াছে। কিন্তু পরমাত্মার কথা সাংখ্য কোথায় বলিলেন, তাহা তাঁহারা বলেন না।

পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় প্রকৃতি কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা সাংখ্য মত। ইহা যদি হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে, ইহাও তো বলা যায়? সাংখ্য এ যুক্তিও স্বীকার করেন নাই। ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—পুরুষের অধিষ্ঠান-বশতঃ প্রকৃতি সৃষ্টি করে, সত্য। কিন্তু সে অধিষ্ঠান সংকল্পপূর্ব্বক অধিষ্ঠান নহে। তাহা সন্নিধানমাত্র। যেমন অয়স্কান্ত মণির (চৌম্বক লৌহের) সন্নিকর্ষ-বশতঃ শল্যবিদ্ধ অঙ্গ হইতে শল্য বাহির হইয়া আসে, (সেখানে অয়স্কান্ত মণির কোনও সংকল্প নাই), তেমনি পুরুষের সন্নিধিমাত্র-দ্বারাই প্রকৃতির মহৎরূপে পরিণাম হয়। এই পরিণামে পুরুষের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। সুতরাং জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কোনও পুরুষের অস্তিত্ব-কল্পনার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর যদি না থাকেন, তবে কর্ম্মের ফল দেয় কে? ইহার উত্তর—ঈশ্বর জগতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ম্মের ফল দান করেন না। কর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারাই তাহার ফল উৎপন্ন হয়। পরে আছে—সংসারে লোকে কর্ম্ম করে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। ঈশ্বর বলিতে তো পূর্ণ

পুরুষ বুঝায়, তাঁহার কিছুরই অভাব থাকিতে পারে না। সাধারণ লোকের মতো কর্ম্ম করিবেন তিনি কিসের অভাবে? ঈশ্বরের নিজের স্বার্থ আছে, যদি বল, তাহা হইলে তিনি তো লৌকিক ঈশ্বর—অর্থাৎ অপূর্ণকাম সুখদুঃখ-যুক্ত শ্রেষ্ঠ মানুষের মত হইলেন। তবুও যদি এরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বল, তাহা হইলে—ঈশ্বর শব্দ একটা পরিভাষামাত্র হইয়া পড়ে, তিনি প্রকৃত ঈশ্বরপদবাচ্য হইতে পারেন না। তাহার পরে, রাগ বা উৎকট ইচ্ছা ব্যতীত তো জগতে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎব্যাপার নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ইষ্টার্থ-সিদ্ধির জন্য উৎকট ইচ্ছা ঈশ্বরে সম্ভবে না। তাঁহার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই। রাগ যদি ঈশ্বরে থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নিত্যমুক্ত বলা যায় না। যদি প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির শক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাদি পুরুষে যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গপ্রাপ্তি হয় বলিতে হইবে। কিন্তু পুরুষ তো অসঙ্গ। যদি বল জগতের সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরের নিজের কোনও কার্য্য না থাকিলেও কেবল তাঁহার সন্নিধিমাত্রেই অয়স্কান্ত মণিকর্ত্তৃক লৌহে গতিশক্তি-সঞ্চারের মতো জগৎব্যাপার নির্বাহিত হয়, তাহা হইলে তো সকল পুরুষকেই ঈশ্বর বলা যায়, কেননা প্রত্যেক পুরুষের সন্নিধিবশতঃই প্রকৃতির ক্রিয়া সংঘটিত হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাইই, অনুমান ও শব্দ প্রমাণও নাই। সম্বন্ধ যদি থাকে তবেই সেই সম্বন্ধ হইতে অনুমান করা যায়। মহদাদি কার্য্য, এবং ঈশ্বর কর্ত্তা বলিতে পার না, কেননা ঈশ্বর অপ্রযোজক অর্থাৎ ক্রিয়াহীন। শ্রুতিও জগৎকে প্রধানেরই কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে, "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।" লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা (সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী) এক অজা (প্রকৃতি) আপনার সরূপ বহু প্রজা সৃষ্টি করেন। সুতরাং শব্দপ্রমাণও ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বের অনুকূল নহে।

ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বের শ্রুতিপ্রমাণ নাই, এই উক্তি নিতান্তই আশ্চর্য্যজনক। "বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ"—তাঁহার স্রষ্টৃত্বের প্রমাণ নাই? যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" শ্লোকটি আছে, তাহার আদ্যন্ত ঈশ্বরের প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। উহার তৃতীয় শ্লোক এই—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

"ধ্যানযোগপরায়ণ ঋষিগণ স্বগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) দ্বারা প্রচ্ছন্ন পরমেশ্বরের আত্মশক্তি দর্শন করিয়াছেন। সেই পরম দেবতাই কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা

প্রভৃতি সৃষ্টির গৌণকারণসমূহকে নিয়মিত করেন।" উক্ত উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

"ঈশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরম দৈবত, পতিদিগের পতি, শ্রেষ্ঠ (হিরণ্যগর্ভ) হইতেও শ্রেষ্ঠতর, চিরবন্দনীয় ভুবনেশ্বর পরমদেবকে আমরা জানি।" সমস্ত উপনিষৎখানি ঈশ্বরের কথায় পূর্ণ। তবুও ঈশ্বরসম্বন্ধে শব্দপ্রমাণ নাই। যে অজার কথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, সেই অজা প্রকৃতিকে উক্ত উপনিষদে 'মায়া' এবং মহেশ্বরকে 'মায়ী' বলা হইয়াছে।

"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥ ৬।১৬

তিনি বিশ্বস্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু, কালের কর্ত্তা, গুণী, সর্ব্ববিৎ, প্রধানের ও জীবাত্মার স্বামী, সত্ত্বাদিগুণের নিয়ন্তা এবং সকলের স্থিতি, বন্ধ ও মোক্ষের কারণ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সকল প্রমাণ-খণ্ডনের চেষ্টা প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের ঈশ্বরাস্বীকৃতিকে প্রৌঢ়িবাদ বা অতিশয়োক্তি বলিয়াছেন।* বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরবাদী। তাঁহার মতে সাংখ্যের ঈশ্বরের অস্বীকৃতি উদ্দেশ্যমূলক। ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য-উৎপাদনের জন্য সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ঈশ্বর স্বীকার করিলে নিত্য ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য সম্ভবে না। নিত্য ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিলে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়া বিবেকাভ্যাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। এই জন্যই সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরের প্রতিষেধ করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতেও সাংখ্যের এই অংশ দুর্ব্বল। দর্শনের উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার। অন্য কোনও উদ্দেশ্য-দ্বারা দার্শনিকের চালিত হওয়া উচিত নহে। সুতরাং অন্য কোনও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া সাংখ্যকার ঈশ্বরসম্বন্ধে সত্যগোপন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর অর্থে সগুণ ব্রহ্ম—জগৎস্রষ্টা, ইচ্ছাময়, সকল কল্যাণগুণের আকর সগুণ ব্রহ্ম। সাংখ্য সগুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই।

---

* প্রৌঢ়িবাদ=Bold ascertion, pompous speech—Monnier Williams.

উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, ইহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব-স্বীকারও সাংখ্য করেন নাই। যদিও তিনি পুরুষের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উপনিষদের ব্রহ্মের বর্ণনার অনুরূপ, তথাপি তাঁহার পুরুষ বহু, কিন্তু ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। সত্য বটে, সাংখ্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদ্বারা পুরুষ-বহুত্ব প্রমাণিত হয় না, জীব যে বহু, তাহাই প্রমাণিত হয়। সাংখ্য-মতে প্রত্যেক পুরুষই বিভু ও অন্যনিরপেক্ষ। তাহারা একরস ও চৈতন্যস্বরূপ। কোনও ভেদই এক পুরুষের সহিত অন্য পুরুষের নাই। কিন্তু দুই বস্তুর মধ্যে যদি কোনও ভেদই না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভিন্ন বলা যায় না। বস্তুতঃ সাংখ্য পুরুষের যে সকল ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা এক অখণ্ড বিভু চিন্ময় ব্রহ্মেই সংগত হইতে পারে। সাংখ্যের পুরুষ—বহুত্ব সাংখ্যদর্শনের পক্ষেও অপরিহার্য্য নহে। কিন্তু সাংখ্য তাহা স্বীকার করেন না।

সাংখ্যের মহৎ সমষ্টিবুদ্ধি অথবা ব্যষ্টিবুদ্ধি, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মহৎকে ব্যষ্টিবুদ্ধি বলিলে যে অসঙ্গতির উদ্ভব হয়, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মহৎ হইতে যদি ভিন্ন ভিন্ন তন্মাত্র ও স্থূল ভূতের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জীবের জগৎ অন্যান্য জীবের জগৎ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে, সর্ব্বজীবসাধারণ এক জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা তাহা হইলে করা যায় না। সুতরাং প্রকৃতি হইতে প্রথম যে মহতের উদ্ভব হয়, তাহা বিশ্ব-বুদ্ধি বা হিরণ্যগর্ভ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতই গ্রহণযোগ্য। মনুসংহিতায় যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এই মতই গৃহীত হইয়াছে। মনু-সংহিতায় আছে, তমোভূত, অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির প্রেরক (তমোনুদঃ) অব্যক্ত, স্বয়ম্ভু, অপ্রতিহত-সৃষ্টিসামর্থ্য (বৃত্তৌজাঃ) ভগবানই অব্যক্তাবস্থাপন্ন আকাশাদি মহাভূত ও মহৎতত্ত্বাদি প্রকাশিত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

> ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ অব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
> মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥ মনুসংহিতা—১।৬
> যোঽসৌ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
> সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়ং উদ্বভৌ॥ মনুসংহিতা—১।৭

ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময়, অচিন্ত্য পুরুষ যিনি ছিলেন, তিনি নিজে মহদাদি কার্য্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

চরকসংহিতায় যে সাংখ্যমতের বর্ণনা আছে, তাহাতে অব্যক্তকে আত্মা বলা হইয়াছে। এই আত্মা পরমাত্মা নামেও অভিহিত হইয়াছেন। চরকমতের সহিত মনুর বর্ণনার বিরোধ নাই। প্রকৃতি হইতে প্রথম আবির্ভূত মহৎই মনুবর্ণিত ভগবান্। সাংখ্য মতে এই মহৎ হইতে যাবতীয় সৃষ্টি হয়; মহতের মধ্যে ইচ্ছা আছে, রজোগুণ অর্থাৎ প্রবৃত্তিও আছে। সুতরাং এই মহৎ বা হিরণ্যগর্ভকে ভগবান্ বা ঈশ্বর বলিতে বাধা নাই।

কিন্তু সাংখ্য-কারিকা ও সাংখ্যসূত্রে মহৎকে বলা হইয়াছে অচেতন; পুরুষের প্রতিবিম্ব ইহার উপর পতিত হয় বলিয়া ইহা চেতনের সাদৃশ্য লাভ করে। বহুসংখ্যক পুরুষের প্রত্যেকেই অসীম, এবং প্রত্যেকের দ্বারাই সমগ্র প্রকৃতি উজ্জ্বলিত হইতে পারে, কিন্তু বিশ্ব-মহতের অধিষ্ঠাতা কোনও পুরুষের কথা সাংখ্যসূত্র বা সাংখ্যকারিকায় নাই। পরন্তু সাংখ্যসূত্রের একাধিক সূত্রে ঈশ্বর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যে মহৎই যে ঈশ্বররূপে স্বীকৃত হইতেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। উপনিষদে মহৎকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; চরকসংহিতায় অব্যক্ত পুরুষ হইতে মহতের উদ্ভব বলা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রেও ইহার সমর্থক প্রমাণ আছে। প্রচলিত সাংখ্যসূত্র হইতে ঈশ্বর-স্বীকৃতিসূচক সূত্রসকল সযত্নে বর্জ্জিত হইলেও, দুই একটি সূত্রে ঈশ্বর-স্বীকৃতির প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন গ্রীসে পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত সকল দার্শনিক মতই পাইথাগোরাসের মত বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, এসকল মতের সকলগুলিই পাইথাগোরাসের মত নহে। তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যদিগের অনেক মতও পাইথাগোরাসের নামে চলিয়া আসিয়াছিল। সাংখ্যসূত্রের সকল সূত্রই কপিলরচিত বলিয়া প্রচারিত হইলেও, ইহার সকল সূত্রই যে কপিল-রচিত নহে এবং অন্যান্য সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতও যে ইহার মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে। অন্য আচার্য্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহাদের মতও সাংখ্যসূত্রে সংগৃহীত হওয়ার ফলে, ভাষ্যকারদিগকে পরস্পরবিরুদ্ধ মতের সমন্বয় করিতে হইয়াছে। তাই বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরবাদী হইলেও, তাঁহার ব্যাখ্যা নিরীশ্বরবাদের সমতুল্য হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ৫৬ ও ৫৭ সূত্রে প্রাচীন সাংখ্যে ঈশ্বরস্বীকৃতির বলবৎ প্রমাণ আছে। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু কষ্টকল্পনার সাহায্যে উক্ত সূত্রদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সূত্রকারের অর্থ ঢাকা পড়িয়াছে। "ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা, মগ্নবৎ উত্থানাৎ। অকার্য্যত্বেঽপি তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ" (সাং সূ ৩।৫৪-৫৫)।

প্রকৃতিলীন হওয়াই কৃতকৃত্যতা নহে। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন জল হইতে উত্থিত হয়, প্রকৃতিলীন ব্যক্তিও তেমনি পুনরুত্থিত হয়। কিন্তু যে প্রকৃতিতে লীন হইয়া গেল, তাহাকে পুনরুত্থাপিত করে কে? প্রকৃতি তো অন্য কোন কারণদ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, পারবশ্যতা-বশতঃই ইহা সম্ভবপর হয়। এখন এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই: "প্রকৃতেঃ অকার্য্যত্বেঽপি, অপ্রের্য্যত্বেঽপি, অন্যেচ্ছানধীনত্বেঽপি তদ্‌যোগঃ পুনরুত্থানৌচিত্যং তল্লীনস্য কুতঃ? পারবশ্যাৎ, পুরুষার্থতন্ত্রত্বাৎ।" প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নহে, তাহার প্রেরক অপর কেহ না থাকিলেও, প্রকৃতি অপরের ইচ্ছাধীন না হইলেও "তদ্‌যোগঃ" অর্থাৎ প্রকৃতিলীন ব্যক্তির উত্থানকার্য্য কিরূপে সম্ভবপর হয়? উত্তর—পরবশতা-হেতু, অর্থাৎ পুরুষার্থসাধনরূপ ধর্ম্ম প্রকৃতির আছে বলিয়া। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে "পারবশ্য" শব্দের অর্থ "লীন পুরুষের বশ্য"।

কিন্তু এইভাবে অর্থ করিবার কোনও সংগত কারণ নাই। অনিরুদ্ধের ভাষ্যে "পর" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "আত্মা"। "অকার্য্যত্বম্‌ অপ্রযোজকত্বম্‌, কিন্তু পরতন্ত্রত্বম্‌ প্রকৃতৌ অস্তি, ইতি তদ্যোগাচ্চ বন্ধনযোগঃ। পর আত্মা কিংরূপ, ইত্যত্র আহ।" অকার্য্যত্ব অর্থাৎ অপ্রযোজকত্ব প্রকৃতির আছে, কিন্তু পরতন্ত্রত্বও আছে। তাহাতেই বন্ধযোগ হয়। "পর" অর্থাৎ আত্মা কিরূপ তাহা সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রে বলিয়াছেন,—"স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা।" (৩।৫৬) তিনি সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু স্পষ্টতঃই কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি "স" শব্দে প্রকৃতিলীন পুরুষকে গ্রহণ করিয়াছেন। "স হি পূর্ব্বসর্গে কারণ-লীনঃ, সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তেশ্বর আদি-পুরুষো ভবতি। প্রকৃতিলয়ে তস্যৈব প্রকৃতিপদপ্রাপ্ত্যৌচিত্যাৎ। (যিনি পূর্ব্ব সৃষ্টিতে কারণলীন ছিলেন, তিনি সর্গান্তরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর আদি-পুরুষ হন, প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হইলে তাঁহারই প্রকৃতি-পদ-প্রাপ্তি হওয়া উচিত।) কিন্তু প্রকৃতিলীন পুরুষ তো একজন মাত্র নহেন। প্রলয়ে মুক্ত পুরুষ ব্যতীত অন্য সকল পুরুষই প্রকৃতিতে লীন হন। সুতরাং "স" শব্দে কোন্‌ লীন পুরুষকে বুঝাইবে? এইরূপ অমুক্ত কোনও পুরুষই প্রকৃতির সৃষ্টি-কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। প্রকৃতির যে বিকারের ফলে তিনি পুনরায় উদ্বুদ্ধ হন, তিনি কখনও সেই বিকারের কর্ত্তা হইতে পারেন না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে সকল পুরুষই চিরকালই নির্লিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সহিত কোনও পুরুষেরই যোগ কখনও হয় না। প্রকৃতিতে লয়

হইতে পারে লিঙ্গশরীরের, পুরুষের প্রতিবিম্ব-গ্রাহী লিঙ্গ শরীরের। প্রলয়াস্তে উদ্বুদ্ধও হয় লিঙ্গশরীরই। যে লিঙ্গশরীরের প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানই হয় নাই, তাহা কখনও সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা হইতে পারে না। প্রকৃতির বিকার লিঙ্গশরীরের সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সূত্রের "সঃ" শব্দ যে প্রকৃতিলীন পুরুষের সূচক নহে, তাহা নিশ্চিত। পূর্ব্ব সূত্রে "পারবশ্য" শব্দের 'পর'ই তাহার লক্ষ্য। পরবর্ত্তী সূত্রে আছে—"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" (৩।৫৭) এবংবিধ ঈশ্বর সিদ্ধ, অসিদ্ধ নহেন। এখানেও বিজ্ঞানভিক্ষু "ঈদৃশেশ্বর" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "প্রকৃতিলীন জন্য ঈশ্বর"। কিন্তু ৫৬ সূত্রের "সঃ" শব্দের লক্ষ্য তৎপূর্ব্ব সূত্রের "পর" শব্দ ধরিলে, "ঈদৃশেশ্বর" শব্দের অর্থ হয় সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বকর্ত্তা, নির্গুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম নিজে কোনও কর্ম্ম করেন না, ইহা সত্য; কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্যে প্রকৃতির প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়, এবং যাবতীয় জ্ঞানের উদ্ভব হয়। সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বকর্ত্তা বলিলে দোষ হয় না। এই ব্রহ্ম-কর্তৃক অনুস্যূত মহৎ সগুণ ঈশ্বর। তাহা হইতে পরবর্ত্তী যাবতীয় সৃষ্টি হয়। মহৎই মহান্ আত্মা, তিনি হিরণ্যগর্ভ। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্।" তিনি ব্রহ্মা। "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমং সম্বভূব। বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" প্রলয়ে তিনি সুপ্ত হন, সর্গে পুনরাবির্ভূত হন। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যক্ত রূপ। তিনিই "সবিতুর্ব্বরেণ্যং।" তিনি "ধিয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ"। প্রাচীন সাংখ্যে তিনি স্বীকৃত ছিলেন। অর্ব্বাচীন সাংখ্য তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

সেশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত পাতঞ্জল সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। ইহা হইতে মনে হয় সাংখ্য বহুল পরিমাণে পাতঞ্জল দর্শনে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার সমাধিপাদের ২৩ সূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধান সমাধিলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে,—"প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ, আবর্জ্জিত ঈশ্বরঃ (সাধকের ভক্তিবশতঃ তাহার অভিমুখীকৃত ঈশ্বর) তম্ অনুগৃহ্ণাতি") তাহাকে অনুগ্রহ করেন।) এই ঈশ্বর প্রধান ও পুরুষের অতিরিক্ত। তিনি ভক্তির বশ। ঈশ্বরের বর্ণনা পরবর্ত্তী সূত্রে আছে। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বর" অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশল ও অকুশল কর্ম্ম, কর্ম্মের বিপাক (কর্ম্মফল), কর্ম্মফলের অনুরূপ আশয় (বাসনা বা সংস্কার)—এই সকল যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অন্যান্য পুরুষ হইতে ভিন্ন, এইরূপ এক পুরুষই ঈশ্বর। "তত্র নিরতিশয়ং

সর্ব্বজ্ঞবীজং" "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ।" ১।২৫—২৬। তাঁহাতে নিরতিশয় জ্ঞান বর্ত্তমান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি তাঁহাতে বিদ্যমান্, তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ। যাঁহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদিগেরও (কপিলাদির) গুরু, তিনি কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন "কৈবল্যপ্রাপ্ত অনেকেই হইয়াছেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়াই কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের সেরূপ কোনও বন্ধন কখনও ছিল না, কখনও হইবেও না।" "স হি সদৈব মুক্তঃ, সদৈব ঈশ্বরঃ"—তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। এই সদা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যে সাধকের চিত্তের অভিনিবেশের ফলে বিবেকসিদ্ধির বাধাসৃষ্টি হইবে, মহর্ষি পতঞ্জলি সে ভয় করেন নাই, তিনি তাঁহার উপাসনার বিধি দিয়াছেন সমাধিলাভের উপায় বলিয়া।

মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বেও (অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে—৪০ অধ্যায়ে) মহত্তত্ত্বের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে মহত্তত্ত্ব ও ঈশ্বর অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তাহাতে আছে "মহত্তত্ত্বের হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্, তিনি সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সকলের হৃদয়েই বিদ্যমান্ আছেন।....ইহলোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরমপুরুষ মহত্তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। তিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মহৎতত্ত্ব বুদ্ধি (ব্যষ্টিবুদ্ধি) হইতে ভিন্ন। তিনি "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ"—মহান্ আত্মা। তিনি নির্গুণ-ব্রহ্মের ব্যক্তরূপ। তিনি ঈশ্বর। ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনা করিলে তিনি সাধকের অনুভবগম্য হন।

অনেকের মতে "তত্ত্বসমাস" সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধে প্রাচীনতম গ্রন্থ। কিন্তু তত্ত্বসমাস বলিতে গেলে একখানি সূচীপত্র মাত্র। ইহাতে ২২টি মাত্র সূত্র। কোনও সূত্রেই ঈশ্বরের কথা নাই। আসুরির নামে প্রচলিত তত্ত্বসমাসের এক ভাষ্য আছে। মহত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে তত্ত্বসমাসের বৃত্তিতে আছে, "অব্যক্তাৎ প্রাক্ উপদিষ্টাৎ সর্ব্বগতপুরুষেণ পরেণ অধিষ্ঠিতাৎ বুদ্ধিরুৎপদ্যতে।" *এই সর্ব্বগত পুরুষই ঈশ্বর। তিনি প্রাচীন সাংখ্যে স্বীকৃত ছিলেন।

* ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাংখ্যপরিচয়ে উদ্ধৃত।

১৯

সাংখ্য ও বেদ

সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, অথচ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, বেদের প্রামাণ্য-স্বীকার সাংখ্যের আন্তরিক নহে। যে দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইত, তাহাই আস্তিক দর্শন বলিয়া প্রাচীন ভারতে গৃহীত হইত। চার্ব্বাকদর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া তাহা ঘৃণার পাত্র ছিল। এই জন্যই মহর্ষি কপিল বেদকে অগ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু তাঁহার দর্শন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন; বেদের প্রমাণের প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নহে. তাহার প্রমাণ সাংখ্য-দর্শনের বহু স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ প্রমাণের আলোচনায় আপ্ত বচন ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে একটি বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে বেদোক্ত মন্ত্রসকলের অর্থ-বোধ হউক বা না হউক, যথাবিধি উচ্চারিত হইলে ঔষধের আরোগ্য-শক্তির মত তাহারা উচ্চারণ-কর্ত্তার জ্ঞান-নির্ব্বিশেষে ফল উৎপাদন করে। ইহাদ্বারা বেদের স্বতঃ-প্রামাণ্য প্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এই স্বতঃ প্রামাণ্য নাই। সুতরাং বেদকে সাংখ্য-শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে উচ্চতর আসন প্রদত্ত হইয়াছে, বলা যায়। বহু সূত্রে সাংখ্য বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনের জন্য উহাকে ন্যায় ও শ্রুতি উভয়েরই বিরোধী বলিয়াছেন। অন্যত্র শ্রুতি-প্রমাণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎকৃষ্টতর বলিয়াছেন: পুরুষের কোনও ধর্ম্ম নাই, ইহা যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রুতিতেও আত্মার নির্গুণত্ব সিদ্ধ। শ্রুতির অপলাপ কথনও সম্ভবপর হয় না। ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক পদার্থ নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সাংখ্য সূত্রে আছে, শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়দিগকে অহংকার হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে।

বেদোক্ত কর্ম্মাদিদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। ১।৮২ সূত্রে ইহা বলিয়া পাছে ইহাদ্বারা বেদবিরোধিতা হয়, এই আশঙ্কায় পর সূত্রে বলিতেছেন শ্রুতিতে যে অনাবৃত্তির কথা আছে, তাহা যাঁহারা বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে আত্মাকে এক ও অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য মতে আত্মা বা পুরুষ বহু। সুতরাং দৃশ্যতঃ সাংখ্যমত শ্রুতি-

বিরোধী, এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য সাংখ্য বলিয়াছেন: আত্মার বহুত্ব অঙ্গীকারদ্বারা শ্রুতি-বিরোধ হইতেছে না, কেননা শ্রুতিতে যে একত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই একত্ব জাতিপর। জাতি শব্দের অর্থ সামান্য বা একরূপতা। সকল পদার্থই আত্মার স-জাতীয়, বিজাতীয় দ্বৈত পদার্থ কিছু নাই, ইহাই শ্রুতির অর্থ। ইন্দ্রিয়গণের অনিত্যতা প্রমাণের জন্যও শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। লিঙ্গদেহের পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণের জন্য বলা হইয়াছে, লিঙ্গদেহ যে অন্নময়, তাহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। ইহাদ্বারা লিঙ্গ-দেহের পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয় এবং বিভুত্ব অপ্রমাণিত হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ মধ্য-বিবেক প্রাপ্ত হন এবং প্রারব্ধবশতঃ তাঁহাদের দুঃখভোগ হইয়া থাকে, "জীবন্মুক্তশ্চ" (২।৭৮) শ্লোকে ইহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে। লিঙ্গ শরীর অণুপরিমাণ, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে। বারংবার শ্রুতিপ্রমাণের উল্লেখদ্বারা সাংখ্য যে বেদের প্রামাণিকতায় আন্তরিক ভাবে বিশ্বাসী, তাহা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু ঈশ্বর-সম্বন্ধে সাংখ্য বেদের প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। ঈশ্বর উপনিষদের সর্ব্বত্র গীত হইয়াছেন। ঈশ্বর উপনিষদের আদি, অন্ত ও মধ্য। বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াও, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, ইহা সাংখ্য কেন বলিলেন, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিয়াছেন, ঈশ্বরের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে চিত্তের অভিনিবেশবশতঃ বিবেকজ্ঞানের বাধা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ঈশ্বর অসিদ্ধ বলা হইয়াছে। ঐ উক্তি যুক্তিসহ নহে। ঈশ্বরকে প্রমাণাসিদ্ধ বলিবার কারণ বৌদ্ধ প্রভাব বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে অস্বীকৃত হইত না, চরক-সংহিতা ও মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্যমত তাহার প্রমাণ। সাংখ্যশাস্ত্র যে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, (কালার্কভক্ষিতং) বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যের ভূমিকায় তাহা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণ যে সাংখ্য-দর্শনের বহুল ব্যবহার করিয়াছিল, পরমার্থকর্ত্তৃক চীনা ভাষায় তাহার অনুবাদ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বৌদ্ধগণ-কর্ত্তৃক সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

২০

সংসৃতি বা জন্মান্তর

যতদিন বিবেকের উৎপত্তি না হয়, ততদিন জীব দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করে। পুরুষের সহিত এই দেহান্তর-গ্রহণের সম্পর্ক নাই। তাহার অবস্থান্তর নাই, পরিণাম নাই। মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই অষ্টাদশ তত্ত্ব লইয়া জীব। পুরুষের আলোকপাতে ইহারা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। যতদিন মোক্ষ না হয়, ততদিন পুরুষের আলোক হইতে ইহা বঞ্চিত হয় না। সাংখ্যদর্শনে জীবের নাম লিঙ্গ। অষ্টাদশ তত্ত্বের সম্মিলনে গঠিত লিঙ্গদেহ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের পূর্ব্বেই উৎপন্ন হয়। এই লিঙ্গের সহিত কোনও এক বিশেষ শরীরের সঙ্গ নাই, অর্থাৎ ইহা সর্ব্বপ্রকার শরীর ধারণেই (দেব, মনুষ্য, তির্য্যক) সমর্থ। ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী; যতদিন না মোক্ষ হয়, ততদিন ইহার বিনাশ নাই। ইহার ভোগ নাই। কেননা ইহা কেবলমাত্র করণশক্তিদিগের সমবায়। ভোগের জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের। পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, লিঙ্গদেহ সেই অষ্টবিধ সংস্কারের দ্বারা অধিবাসিত। এই লিঙ্গদেহই এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে। (সাং কা—৪০) লিঙ্গদেহ আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। (সাং কা—৪১) লিঙ্গ শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর এক নহে। যে শরীর লইয়া জীব স্বর্গ ও নরকে অবস্থান করে, তাহাই সূক্ষ্ম শরীর। তাহা লিঙ্গশরীরের আশ্রয়। উপরিউক্ত কারিকায় সূক্ষ্ম শরীরকে বিশেষ বলা হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীর স্থূলশরীরের ন্যায় ভৌতিক শরীর, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম। তাহা-দ্বারাই ভোগ হয়। তন্মাত্রগণ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সংযোগসাধক।* সূক্ষ্ম করণ-শক্তিদিগের সহিত স্থূল-শরীরের সম্বন্ধের হেতু তন্মাত্রগণ। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সংযোগ তাহাদের দ্বারাই সাধিত হয়; তন্মাত্রগণ অতি সূক্ষ্ম। তাহাদের দেশব্যাপ্তি এত কম যে, নাই বলিলেই চলে। তাহারা কালব্যাপী এবং ক্রিয়াত্মক। তাহাদের অর্দ্ধেক জ্ঞান ও অর্দ্ধেক জ্ঞেয়। তাহারা করণদিগের সহিত এই জন্যই লিঙ্গশরীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত। করণগণ তন্মাত্রের মধ্যে সংগৃহীত। পুরুষার্থই লিঙ্গদেহের অস্তিত্বের হেতু। প্রথমতঃ শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া সুখ-দুঃখভোগ, দ্বিতীয়তঃ বিবেক লাভ করিয়া বিষয়বর্জ্জন, এই দুইটি ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্যই লিঙ্গদেহের নাই। এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া

* শ্রীমৎ হরিহরারণ্য প্রণীত পাতঞ্জল দর্শন ৫৫০ ও ৭৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পর্য্যন্ত লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব থাকে ; উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, তাহা অব্যক্তে বিলীন হয়। কিন্তু পুরুষার্থসাধন লিঙ্গের অভিব্যক্তির প্রধান হেতু হইলেও সহকারী হেতুও আছে। তাহা হইতেছে নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের সহিত সহযোগ। পূর্ব্বে যে অষ্টপ্রকার ভাব বা কর্ম্মসংস্কার উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারাই নিমিত্ত। উক্ত সংস্কারসকল ধারণ করিয়া লিঙ্গদেহ উদ্‌ভূত হয়। সংস্কার দ্বিবিধ—কর্ম্ম-সংস্কার বা কর্ম্মাশয় এবং সুখ দুঃখের সংস্কার বা বাসনা। কর্ম্মশক্তি স্বভাবজাত ; কিন্তু প্রত্যেক কর্ম্মের উপর যেমন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রভাব আছে, তেমনি পূর্ব্বসংস্কারযুক্ত কর্ম্মশক্তির উপরও নূতন কর্ম্মের প্রভাব আছে। প্রত্যেক জন্মে আচরিত কর্ম্মের সংস্কারকর্ত্তৃক প্রভাবিত কর্ম্মশক্তিকে কর্ম্মাশয় বলে।

সুখদুঃখের সংস্কার চিত্তে অঙ্কিত হয়। তাহা স্মৃতিতে উদিত হয়। যে সংস্কারের ফলে তাহাদ্বারা প্রভাবিত বোধ সুখ অথবা দুঃখ রূপে প্রতীত হয়, তাহাই বাসনা। লিঙ্গদেহের মধ্যে কর্ম্মাশয় ও বাসনা উভয়ই থাকে। সংস্কারের অভাব হইলে লিঙ্গ লীন হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেহধারণকে নৈমিত্তিক বলে। পুরুষার্থসাধনের জন্য উদ্‌ভূত লিঙ্গদেহ অষ্টপ্রকার কর্ম্মসংস্কার, কর্ম্মাশয় ও বাসনা কর্ত্তৃক অধিবাসিত হইয়া নটের মতো নানাবিধ শরীর ধারণ করে। সাং কা—৪২ ।

লিঙ্গ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ "ভাবের" উদ্‌ভব হয় না। আবার ভাবসকল না থাকিলে লিঙ্গও থাকিতে পারে না। লিঙ্গ শক্তিরূপ, ধর্ম্মাদি তাহার কার্য্য। এই জন্য লিঙ্গনামক ও ভাব-নামক দ্বিবিধ পদার্থের সৃষ্টি হয়। সাং কা—৫২। প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভূত তত্ত্বসকলের মধ্যে কতকগুলি অবিশেষ (ভেদ-রহিত), কতকগুলি বিশেষ (ভেদযুক্ত)। সূক্ষ্ম শরীর, মাতাপিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত স্থূল শরীর এবং এতদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দ্রব্য—এই ত্রিবিধ বিশেষ। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী ; স্থূল শরীর অচিরস্থায়ী। সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টির আদিতে প্রথম উৎপন্ন হয়। ইহা কার্য্য বস্তু। তাহার কার্য্য সুখদুঃখাদির ভোগ। পরে উৎপন্ন স্থূল শরীরদ্বারা সুখদুঃখের ভোগ হয় না। মৃত শরীরে সুখ-দুঃখের ভোগ নাই। কর্ম্মের ভেদবশতঃ লিঙ্গশরীর নানারূপে প্রকাশিত হয়। সর্গের আদিতে যদিও হিরণ্যগর্ভ-উপাধিযুক্ত একমাত্র রূপ উদ্‌ভূত হইয়াছিল, তথাপি তাহার পরে নানা ব্যক্তি-ভেদ উৎপন্ন হয়। যেমন পিতার এক লিঙ্গদেহ পুত্রকন্যাদির লিঙ্গদেহরূপে নানা অংশে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ। ইহার কারণ অন্যান্য জীবের ভোগের হেতু কর্ম্মাদি—অন্যান্য জীবের কর্ম্মজনিত ভোগের জন্য

তাহাদের বিভিন্ন লিঙ্গদেহ উৎপন্ন হয়। মনু সংহিতায় আছে—সমষ্টি পুরুষের (হিরণ্যগর্ভের) ছয় ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির পরে—

তেষাং তু অবয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।

সেই সমষ্টি পুরুষের অমিততেজ ষড় ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অবয়বসকল স্বকীয় চিদংশসকলের সহিত সংযুক্ত করিয়া সকল ভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অন্যত্র আছে তাঁহার শরীর হইতে সমুৎপন্ন করণসকলের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ তাঁহার গাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, এক হিরণ্যগর্ভ বা মহৎরূপ সমষ্টি বুদ্ধি হইতে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি। মহৎ Cosmic বুদ্ধি, ব্যষ্টি-বুদ্ধি নহে।

লিঙ্গের অধিষ্ঠিত তাহার আশ্রয় সূক্ষ্ম আধারকে দেহ বলে; এবং এই জন্যই সূক্ষ্মদেহ যে স্থূলভূত-নির্ম্মিত আধারে অবস্থান করে, তাহাকেও দেহ বলে। সূক্ষ্ম শরীরকে বলে আতিবাহিক দেহ, স্থূলদেহকে বলে আধিভৌতিক দেহ। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর নামে স্থূল শরীরের অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র দেহ যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে নিরাধার ছায়া যেমন থাকিতে পারে না, প্রাচীর ও পট ব্যতিরেকে যেমন চিত্র থাকিতে পারে না, সেইরূপ স্থূলদেহ ত্যাগ করিবার পরে লিঙ্গের আধারস্বরূপ দেহান্তরের প্রয়োজন। লিঙ্গশরীর মূর্ত্ত বস্তু। মূর্ত্ত বায়ু তো আকাশেই অবস্থিত, তাহার অবস্থানের জন্য পরিচ্ছিন্ন কোনও আধারের প্রয়োজন নাই। তবে লিঙ্গশরীরের জন্য স্বতন্ত্র আধারের প্রয়োজন হয় কেন? ইহার উত্তর লিঙ্গশরীর প্রকাশস্বরূপ। প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য-কিরণ (তরণি) যেমন পার্থিব দ্রব্যের সঙ্গেই দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি সত্ত্বপ্রকাশময় লিঙ্গও ভূতের সঙ্গে যুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। লিঙ্গশরীর অণুপরিমাণ, কিন্তু অত্যন্ত অণু নহে। কেননা তাহা অবয়বযুক্ত বলিয়া উক্ত আছে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে তাহার ক্রিয়া (কৃতি) আছে বলা হইয়াছে। বিভু হইলে তাহার ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না। লিঙ্গশরীর অন্নময় বলিয়াও শ্রুতিতে উক্ত আছে। যাহা অন্নময়, তাহার বিভুত্ব সম্ভবে না। রাজার পাচকগণ রাজার ভোগের উদ্দেশ্যে আহার্য্য প্রস্তুত করিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করে। লিঙ্গদেহও তেমনি পুরুষের ভোগের জন্যই স্থূলদেহে সঞ্চরণ করে।

কেহ কেহ বলেন দেহ পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। কেহ কেহ বলেন ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ এই চারিভূতে দেহ নির্ম্মিত। আর কেহ কেহ বলেন

এক এক দেহ এক এক ভূতে নির্ম্মিত। মনুষ্যদেহ ক্ষিতিভূতে নির্ম্মিত, সূর্য্য-লোকের অধিবাসীদিগের দেহ তেজ-নির্ম্মিত। দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলা যায় না, কেননা এমন বহু দেহ আছে, যাহাতে সকল ভূত উপাদানরূপে নাই। ক্ষিতি উপাদান সকল শরীরেই আছে এবং তাহা অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা অধিক পরিমাণ আছে। অন্যান্য উপাদান ক্ষিতির সহিত সংযুক্ত আছে মাত্র, ক্ষিতিই প্রধান উপাদান।

লিঙ্গদেহকে লোক হইতে লোকান্তরে বহন করিয়া লইয়া যায় বলিয়া সূক্ষ্মদেহকে আতিবাহিক দেহ বলা হয়। লিঙ্গ-দেহেই পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়; তাহার ফলেই ভোগ হয়। লিঙ্গশরীর সর্ব্ব-দেহব্যাপী। লিঙ্গদেহের মধ্যে সকল ইন্দ্রিয়ই আছে। ইন্দ্রিয়গণ স্থূল চক্ষু-কর্ণাদি নহে। তাহারা ইন্দ্রিয়-শক্তি। প্রাণ হইতে দেহের আরম্ভ হয় না। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিনা প্রাণের অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না। প্রাণ ইন্দ্রিয়দিগের বৃত্তিমাত্র। ইন্দ্রিয়ের বিয়োগ হইলে প্রাণেরও বিয়োগ হয়। শরীরে প্রাণ না থাকিলে শরীর পচিয়া যায়। সুতরাং প্রাণ শরীরের পক্ষে আবশ্যক, এবং শরীরের নিমিত্ত কারণও বটে। শরীরে রসসঞ্চারাদি প্রাণেরই কার্য্য। প্রাণ দেহের ধারক। পুরুষ দেহে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিষ্ঠিত না হইলেও, তাহার অধিষ্ঠান ভৃত্যদ্বারা। প্রাণ প্রভৃতি তাহার ভৃত্য। তাহাদের ব্যাপার তাহারই ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ অনাদি। লিঙ্গদেহও সেই জন্য অনাদি। বিবেক-প্রাপ্তির পূর্ব্বে ইহার বিনাশ নাই। স্থূল দেহের বিনাশের পর লিঙ্গদেহই সূক্ষ্ম শরীর সহ অবস্থান করে। লিঙ্গদেহে জন্মজন্মান্তরের সংস্কার ও বাসনা সঞ্চিত থাকে। এই সংস্কার ও বাসনার ফলেই পুনরায় ভোগের জন্য আবার স্থূল-দেহ প্রাপ্তি ঘটে। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্ম জীবদিগের বিভিন্ন গতির কারণ। ধর্ম্মের ফলে ঊর্দ্ধগমন, এবং অধর্ম্মের ফলে অধোগমন হয়। জ্ঞানের ফল অপবর্গ, অজ্ঞানের ফল বন্ধ, বৈরাগ্যের ফল প্রকৃতি-লয়। বিষয়ের প্রতি আসক্তি (রাগ) হইতে সংসৃতি বা জন্মান্তর, ঐশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার সফলতা এবং অনৈশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার বিঘাত হয়। (সাং কা—৪৪-৪৫)। জন্মান্তরের কারণ আসক্তি। যে ধর্ম্মদ্বারা ঊর্দ্ধগমন হয়, তাহা হইতেছে দয়া, দান, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়। ঈশ্বর-প্রণিধানও ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই। ধর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তিবলেই ঊর্দ্ধগমন হয়। সাংখ্য জগতে এক নৈতিক ব্যবস্থার (moral order) অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিতে হইবে। জার্ম্মাণ

দার্শনিক ফিসটে বলিয়াছেন, "জগতের নৈতিক ব্যবস্থাই ঈশ্বর। এই ব্যবস্থার অতিরিক্ত কোনও ঈশ্বরের আমাদের প্রয়োজন নাই। জগতে যে নৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তাহার পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়। এই নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুসারে ব্যতীত কাহারও মস্তক হইতে একটি কেশও স্খলিত হয় না, একটি চাতক পক্ষীরও মৃত্যু হয় না।" * সাংখ্যের প্রকৃতি নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুসারে পরিচালিত, তাহা অন্ধ জড়শক্তির ক্রীড়াভূমি নহে।

সাংখ্যমতে স্বকীয় কর্ম্মফলে জীব যেমন দেবযোনি লাভ করিতে পারে, তেমনি ইতর যোনিতে, এমন কি উদ্‌ভিদ্ যোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে পারে। সাংখ্যসূত্রে ত্রিবিধ দেহের কথা আছে—কর্ম্মদেহ, উপভোগদেহ ও উভয় দেহ। ভোগ বর্জ্জন করিয়া যাহারা পুরুষকারের সাধনা করেন, সেই সাধকদিগের দেহ কর্ম্মদেহ। পশুদেহ ও প্রেতদেহ উপভোগের উপযোগী। তাহারা উপভোগদেহ। মানুষ যেমন ভোগ করে, তেমনি কর্ম্মও করে, মানুষের দেহ উভয়দেহ। মৃত্যুর পরে যে পারলৌকিক দেহ মানুষ প্রাপ্ত হয়, তাহা ভোগদেহ। তাহাতে জীবিতকালের কর্ম্মসকলের সংস্কার সঞ্চিত থাকে; কোনও ফল প্রসব করে না। স্বপ্নাবস্থায় যেমন কোনও কর্ম্ম নাই, কেবল খেলা, পারলৌকিক দেহও তদ্রূপ। ভোগ শেষ হইলে জীব স্থূল লোকে পতিত হয়। পরে পূর্ব্ব সংস্কার লইয়া পিতৃদেহে প্রবেশ করে। অবশেষে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া যথাকালে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু গুণসঙ্গত্যাগী মুক্ত পুরুষদিগের দেহ এই ত্রিবিধ দেহের কোনটিই নহে।

২১

সাংখ্যের অবিবেক ও বেদান্তের অবিদ্যা।

"ন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে।" (সাং সূ-১।১৯)। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পুরুষের বন্ধযোগ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ ব্যতীত হইতে পারে না। "তদ্যোগোহপি অবিবেকাৎ" (সাং সূ ১।৫৫)। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হয় অবিবেকবশতঃ। এই অবিবেক কি? "নঞ"এর নানাবিধ অর্থের মধ্যে অভাব ও বিরোধ দুইটি। সুতরাং অবিবেক শব্দের অর্থ হইতে পারে বিবেকের অভাব অথবা বিবেকের বিরোধী জ্ঞান। প্রকৃতি ও

* গ্রন্থকারের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের ২য় খণ্ড; ৩৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পুরুষের অন্যতা-খ্যাতি বা ভিন্নতার জ্ঞানই বিবেক। পুরুষ বুদ্ধি নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই জ্ঞানই বিবেক। এখানে প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ-সাক্ষাৎকারকে অবিবেক বলা যায় না, কেননা সংযোগের পূর্ব্বে তাহা সম্ভবপর নহে। আবার অবিবেকের অর্থ বিবেকের প্রাগভাব (প্রাক্+অভাব) অথবা অবিবেকাখ্য জ্ঞান-বাসনাও হইতে পারে না, কেননা তাহা বুদ্ধিধর্ম্ম, পুরুষ-ধর্ম্ম নহে। অন্তর্ধর্ম্মী বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগ হয় বলিলে অতি-প্রসঙ্গ দোষ হয়। বুদ্ধি ও পুরুষ অভিন্ন এই জ্ঞানের সংস্কারই অবিবেকাখ্য জ্ঞানবাসনা। বিজ্ঞান ভিক্ষু উপরিউক্ত আপত্তির উত্তরে বলেন, বিষয়তা-সম্বন্ধে অবিবেক পুরুষ-ধর্ম্ম। "প্রকৃতিঃ বুদ্ধিরূপা সতী যস্মৈ স্বামী পুরুষায় তন্নং বিবিচ্য ন দর্শিতবতী, স্ববৃত্তি-দর্শনার্থং তদীয় বুদ্ধিরূপেন তত্রৈব পুরুষে সংযুজ্যতে।" বুদ্ধিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃতি যে স্বামী পুরুষকে স্বীয় তনু প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, স্বকীয় বৃত্তি-প্রদর্শনের জন্য তাহাতেই সংযুক্ত হন। এই অর্থে অতি-প্রসঙ্গ দোষ হয় না। না হউক, কিন্তু পুরুষের বুদ্ধিরূপে কিরূপে প্রকৃতি পুরুষে সংযুক্ত হইতে পারে, তাহাই তো প্রশ্ন।

যে অবিবেককে ১।৫৫ সূত্রে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের কারণ বলা হইয়াছে, তাহাকেই আবার ১।৫৮ সূত্রে পুরুষের সম্বন্ধে "বাঙমাত্র" বা কথার কথামাত্র বলা হইয়াছে। "বাঙমাত্রং নতু তত্ত্বং, চিত্তস্থিতেঃ।" অবিবেক, বন্ধ প্রভৃতির অবস্থান চিত্তে। পুরুষে তাহারা বাঙ্‌মাত্র, তত্ত্ব নহে। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগদ্বারাই অবিবেক বন্ধের কারণ হয়, সাক্ষাৎ কারণ নহে। প্রলয়ে বন্ধ থাকে না। আবার জীবন্মুক্ত পুরুষের অবিবেকের নাশ হইলেও দুঃখভোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে অবিবেক বস্তুতঃ পুরুষের নাই, তাহাই তাহার সহিত প্রকৃতির সংযোগ ঘটাইয়া কিরূপে তাহার বন্ধের কারণ হইতে পারে? পুরুষের ভোক্তৃত্ব এবং প্রকৃতির ভোগ্যত্বের নিয়ামক উভয়ের মধ্যে স্ব-স্বামী ভাব বর্ত্তমান। এই স্ব-স্বামী ভাবকে অথবা কর্ম্মকে উভয়ের সংযোগের কারণ না বলিয়া অবিবেককে সংযোগের হেতু বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে বিজ্ঞান ভিক্ষু—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ-সঙ্গোঽস্য সদসৎ যোনিজন্মসু॥"

ভগবদ্গীতার এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "এই সূত্রে "সঙ্গ" নামক অভিমানকেই সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে। গুণ-সঙ্গরূপ অভিমানই অবিবেক। কর্ম্মাদিকে যে বন্ধের কারণ বলা হয় নাই, তাহার কারণ এই,

যে কর্ম্মাদির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ পরম্পরা-ক্রমিক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে। পুরুষ অবিবেকের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ছেদন করিতে পারে; কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধ ছেদন করিতে হইলে প্রথমে অবিবেককে ছেদন করিতে হয়। এই জন্যই অবিবেককে সংযোগের মুখ্য হেতু বলা হইয়াছে। এই অবিবেক "অগৃহীতা-সংসর্গক উভয় জ্ঞান"—অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান "অগৃহীতা-সংসর্গক" (অগৃহীত অসংসর্গ যাহাতে—অগৃহীত+অসং সর্গক), অর্থাৎ যে জ্ঞানে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে সংসর্গ নাই, এই বোধ নাই। এই অবিবেক অবিদ্যার স্থলাভিষিক্ত। বিবেকের অভাবমাত্র নহে। সাংখ্য সূত্রের (৩।২৪) "বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ" এবং "বিপর্য্যয় ভেদাঃ পঞ্চ (৩।৩৭) সূত্রদ্বয়ে বিপর্য্যয় অথবা মিথ্যা জ্ঞানকেই সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে। পাতঞ্জল সূত্রের "তস্য হেতুঃ অবিদ্যা" (২।২৪) সূত্রে অবিদ্যাকে বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগের কারণ বলা হইয়াছে। অবিবেক যদি বিবেকের অভাব মাত্র হইত, তাহা হইলে "ধ্বান্তবৎ তদুচ্ছিত্তিঃ (সাং সূ—১।৫৬)—অন্ধকারের মত অবিবেকের উচ্ছেদ হয়, এই বর্ণনা-সঙ্গত হইত না। তাহার হ্রাসবৃদ্ধিও হইতে পারিত না। বাসনাখ্য অবিবেক-সম্বন্ধেই এই বর্ণনা সঙ্গত হইতে পারে। "তস্য হেতুঃ অবিদ্যা" এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যেও অবিদ্যা শব্দের অর্থ অবিদ্যা-বীজ বলা হইয়াছে। কেননা জ্ঞানের উৎপত্তি হয় প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের পরে। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন "এই জন্য ব্যাস ভাষ্যে অবিদ্যাকে বিদ্যা-বিরোধী জ্ঞানান্তর বলা হইয়াছে। অবিদ্যা ও অবিবেক উভয়ের যোগ-ক্ষেমতা তুল্য বলিয়া অবিবেকও এক প্রকার জ্ঞান।" কিন্তু জ্ঞান যখন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের পরে উদ্ভূত হয়, তখন এই বিদ্যা-বিরোধী জ্ঞান কিরূপে সংযোগের হেতু হইতে পারে, বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে অবিবেক তিন প্রকারে পুরুষের বন্ধের কারণ হইতে পারে—সাক্ষাৎ ভাবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম-উৎপাদনদ্বারা এবং রাগাদিদ্বারা।

পাতঞ্জল সূত্রে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের স্বরূপ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে: "স্ব-স্বামি-শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধি-হেতুঃ সংযোগঃ" (২।২৩)। স্ব=দৃশ্য=প্রকৃতি। স্বামী=পুরুষ। স্বামী (পুরুষ) দৃশ্যের (প্রকৃতির) দর্শনের জন্য তাহার সহিত সংযুক্ত হন। সেই সংযোগবশতঃ দৃশ্যের যে উপলব্ধি, তাহাই "ভোগ"। দ্রষ্টার স্বরূপের যে উপলব্ধি, তাহা অপবর্গ। সংযোগ "দর্শন"-কার্য্যাবসান, অর্থাৎ "দর্শন" নিষ্পন্ন হইলেই সংযোগের

অবসান হয়। "দর্শন" সংযোগের অবসানের (বিয়োগের) কারণ। "দর্শনে"র বিপরীত "অদর্শন" সংযোগের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "দর্শন" হইতে মোক্ষ হয়। "অদর্শনের অভাব" (দর্শন) হইতে বন্ধের অভাব হয়। বন্ধের অভাবই মোক্ষ। "দর্শনে"র "ভাব" হইতে বন্ধের কারণ "অদর্শনের" "অভাব" বা নাশ হয়. এই জন্য দর্শন-জ্ঞানকে কৈবল্যের কারণ বলা হইয়াছে।" (ব্যাস ভাষ্য)। দর্শনই বিবেক-জ্ঞান ; অদর্শন অবিবেক বা অবিদ্যা। অদর্শনই সংযোগের কারণ। ইহাই অবিদ্যা (২।২৪) বা বিপর্য্যয় জ্ঞানবাসনা, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানের-সংস্কার। এই সংস্কার বা বাসনার উৎপত্তি হয় প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের পরে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি, এবং প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগও যেমন অনাদি, তাহার কারণ অবিবেকও তেমনই অনাদি। তাহা চিরকালই প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বীজ ও অঙ্কুরের মতো অবিবেক ও সংযোগের মধ্যে কে পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বলা যায় না। সংযোগের প্রথম উৎপত্তি কেহ দেখে নাই। তাহার উৎপত্তি দেখিয়া তাহার কারণ-নির্ণয় অসম্ভব। কিন্তু বিবেকের উৎপত্তি হইলে এই সংযোগের অবসান হয়। ইহা হইতে বিবেকের বিরোধী অবিদ্যা বা অবিবেকই সংযোগের কারণ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। কল্পান্তে প্রকৃতি যথন সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া যায়, তখন সৃষ্টি প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়, তাহার ধ্বংস হয় না। সকল বুদ্ধি তাহাদের সংস্কারাদি সহ প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত থাকে। প্রলয়াবসানে তাহারা জাগরিত হয় ; অবিবেক মস্তক উত্তোলন করে ; এবং প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ আবার সংঘটিত হয়। অর্থাৎ পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির উপর পতিত হয়, এবং যথন সংস্কার সহ বুদ্ধি উদ্‌ভূত হয়, তখন তাহার প্রতিবিম্ব পুরুষে পতিত হয়। জীবের ত্রিবিধ দুঃখের পুনরাবৃত্তি হয়। এই খেলাই অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

অবিবেক বা অবিদ্যা অনাদি হইলেও তাহার ধ্বংস হয়, কৈবল্য অবস্থায় তাহার নাশ হয়। সুতরাং তাহাকে সৎ পদার্থ বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে অবিদ্যার নাশ হইলেও অন্যত্র তাহার বিদ্যমানতা থাকে। সুতরাং তাহাকে সম্পূর্ণ অসৎও বলা যায় না। তাহার স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য। প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের যে অচেতন স্বাভাবিক প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তাহারই বশে প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে গিয়া তাহার আলোক প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি অহংকারাদিরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে, এবং বুদ্ধি-বিপর্য্যয় অথবা অবিবেকের উদ্‌ভাবন করিতেছে অনাদি কাল হইতে, আবার স্বয়ংই কোনও

কোনও ক্ষেত্রে বিবেকের উদ্‌ভাবন করিতেছে। ইহা বলিলে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের একটা ব্যাখ্যা হয়তো হইতে পারিত। কিন্তু সাংখ্যকার তাহা বলেন নাই। তিনি অবিবেককে সংযোগের কারণ বলিয়াছেন; ফলে সংযোগের পরে আবির্ভূত অবিবেক কিরূপে সংযোগের কারণ হইতে পারে, এই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। পাতঞ্জল সূত্রে ২।২৩ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে অদর্শন অথবা অবিদ্যার আট প্রকার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হইতেছে, গুণত্রয়ের কার্য্যারম্ভণ-সামর্থ্যই অবিদ্যা (গুণানাম্ অধিকারঃ)। পুরুষ যখন নিষ্ক্রিয়, তখন অবিদ্যাকে ত্রিগুণের একটি বিভাব (aspect) বলা যাইতে পারে। অবিবেকের অবস্থিতি যে চিত্তে, তাহা সাংখ্য সূত্রে উক্ত হইয়াছে। সমস্যা এই, প্রকৃতির মধ্যস্থিত অবিবেক কিরূপে পুরুষকে আকর্ষণ করিতে পারে, এবং কিরূপে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ ব্যতীত তাহার উদ্‌ভব হইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগকে অনাদি বলিয়া ইহার কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা হইতে পারে। কিন্তু এত আলোচনা ও ব্যাখ্যার পর সাংখ্যকার যখন বলেন, "কোন পুরুষের বন্ধও হয় না, মুক্তিও হয় না, জন্মান্তরও হয় না; প্রকৃতিরই বন্ধ, মুক্তি ও জন্মান্তর হয়" (সাং কা ৬২), এবং প্রকৃতি সপ্ত রূপে আপনিই আপনাকে বন্ধন করে, এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আপনাকে বিমুক্ত করে (সাং কা ৬৩), তখন এই সকল আলোচনা নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। মনে হয় পুরুষের আলোক-পাতের ফলে প্রকৃতির মধ্যে এক ভাক্ত পুরুষের উদ্‌ভব হয়, এবং বন্ধ, মোক্ষ, অবিবেক সকলই এই ভাক্ত পুরুষের বা জীবের। এই জীব অনাদি, ত্রিবিধ দুঃখে অবসন্ন। সে যখন তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ অবগত হয়, তখন তাহার বিনাশ হয়, এবং তাহার দুঃখেরও অবসান হয়। ইহাই সাংখ্যের মুক্তি।

বেদান্তের অবিদ্যা বা মায়া এবং সাংখ্যের অবিবেক এক নহে, উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বর্ত্তমান। মাক্ষমূলার বেদান্তের অবিদ্যা ও সাংখ্যের অবিবেকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "বেদান্তের মতে সৃষ্টি অবিদ্যার ফল, সাংখ্যের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অস্থায়ী সংযোগের ফল। এই সংযোগও বিবেকের অভাবের ফল, এবং প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে, কেন না বিবেকের উদ্‌ভবের সঙ্গেই ইহা তিরোহিত হয়।...ব্যবহারিক জগতের সৃষ্টি এবং তাহার মধ্যে আমাদের স্থান বেদান্তের মতে অবিদ্যা-সঞ্জাত, এবং সাংখ্যমতে অবিবেক-জাত। এই অবিবেককে যোগসূত্রে (২।২৪) "অবিদ্যা"ও বলা হইয়াছে। তবে বিশ্ব-সম্বন্ধে উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

প্রকাশের ভেদ আছে সত্য, কিন্তু বেদান্ত ও সাংখ্য উভয় মতেই যাহাকে আমরা সৎবস্তু বলি, তাহা একপ্রকার অচিরস্থায়ী ভ্রান্তির ফল, এই ভ্রান্তিকে অবিদ্যা, মায়া, অবিবেক অথবা অন্য যে কোনও নামই দাও না কেন। সুতরাং বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতো দার্শনিকেরা যদি সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে এই মৌলিক সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয় দর্শন মিশাইয়া ফেলিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথা বলা সঙ্গত নহে। এই দুই দর্শনের পরবর্ত্তী বিকাশে যদিও তাহাদিগকে বিভিন্নমুখী দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি উভয়ের একই উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তাহাদের গতিও কিছুদিন একই দিকে চলিয়াছিল। আত্ম-অনাত্ম-বিবেক ছিল বেদান্তীদিগের লক্ষ্য, আর প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক ছিল সাংখ্যদিগের লক্ষ্য। তবে আর পার্থক্য কোথায়?" মাক্স-মূলার অবিদ্যা ও অবিবেকের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন (সাংখ্য সূত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে অবিবেকের স্থলে অবিদ্যা শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে—১৩ সূত্র) তাহা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। বেদান্তের মতে সৃষ্টি অবিদ্যা-সঞ্জাত, এবং সাংখ্য মতে অবিবেক-জাত, সন্দেহ নাই, কিন্তু অবিদ্যা-সঞ্জাত সৃষ্টি মায়া, তাহা মিথ্যা, অবিবেক-জাত সৃষ্টি মিথ্যা নহে, সত্য। বেদান্ত মতে সৃষ্টি অস্তিত্ববান্ বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাহার সত্য অস্তিত্ব নাই। সাংখ্যের সৃষ্টি প্রকৃতি পুরুষের অস্থায়ী-সংযোগজাত হইলেও, তাহা মায়িক নহে, তাহা প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান ছিল, সংযোগের ফলে প্রকাশিত হইয়াছে, এই মাত্র। সাংখ্য দর্শন বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহার সহিত বেদান্তের সমন্বয় অসম্ভব। বেদান্তমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জগৎ মিথ্যা। সাংখ্য মতে পুরুষও যেমন সত্য, জগৎও তেমনি সত্য। বেদান্তমতে "অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্ব নিরূপণস্য অশক্যত্বাৎ" (ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।৩ সূত্রের ভাষ্য।) মায়ার স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য—ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। কিন্তু ইহা অঘটন ঘটন-পটীয়সী। "লোকেঽপি দেবাদিষু মায়ব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদি-সৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে। তথা একস্মিন্ অপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ ভবতি (শঙ্কর ভাষ্য ২।১।২৮)। ঐন্দ্রজালিক যেমন বিচিত্র হস্তী, অশ্বাদির সৃষ্টি করে, সেইরূপ এক ব্রহ্মে অনেকাকার সৃষ্টি হয়, তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না। অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব হয়। ইহা একটি সার্ব্বিক বা বৈশ্বিক (Cosmic) ব্যাপার। সাংখ্যের সৃষ্টি প্রকৃতির পরিণাম—কুহকজাল নহে। সাংখ্যমতে প্রকৃতির সহিত পুরুষের

প্রকৃত সংযোগ না হইলেও, সংযোগের মতো একটা কিছু ঘটে যাহার ফলে অচেতন প্রকৃতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, এবং তাহার মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ হয়। ইহা সত্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু এই তথাকথিত সংযোগের ফলেই হউক অথবা তাহার পূর্ব্বেই হউক (সংযোগের হেতু-স্বরূপে) অথবা প্রকৃতির একটি বিভাবরূপেই হউক প্রকৃতি-পুরুষের যে অভেদ-জ্ঞান দৃষ্ট হয়, তাহা মিথ্যা। এই মিথ্যা জ্ঞান অথবা তাহার সংস্কারই অবিবেক অবিবেকের অবস্থিতি প্রকৃতির মধ্যে। "ন অবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য— সাং সূ-৫।৩।" অসঙ্গ পুরুষের সহিত অবিদ্যা-শক্তির যোগ সম্ভবপর নহে। তথাপি প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ার ফলে এক একটী ভোক্ত পুরুষের (জীবের) উদ্ভব হয়, এবং অবিবেক তাহাকে আশ্রয় করার ফলস্বরূপে ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের আত্ম-অনাত্ম-বিবেক প্রকৃতি হইত পুরুষের ভেদ-জ্ঞান। যদিও এই জ্ঞান যখন হয় প্রকৃতির অঙ্গীভূত জীবের, তখন তাহার পক্ষে আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন মনে করা কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা বোঝা যায় না। বেদান্তের আত্ম-অনাত্ম বিবেক পারমার্থিক-অস্তিত্বহীন বস্তু হইতে আত্মার ভেদ-জ্ঞান এবং জীবও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান। একই সময়ে যদি যাবতীয় জীবের অবিদ্যার নাশ হয়, তাহা হইলে বেদান্ত-মতে জগতের অস্তিত্ব থাকিবে না, কিন্তু সাংখ্য-মতে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকিবে।

২২

বিবেক জ্ঞানের ফল

প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত যে অচেতন-উদ্দেশ্যকর্তৃক প্রকৃতির অভিব্যক্তি পরিচালিত হয়, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রকৃতি মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতিতে অভিব্যক্ত হয় এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্যরূপ সপ্ত রূপে আপনাকে বদ্ধ করে। পরে ভোগ সম্পূর্ণ হইলে পুরুষার্থ অর্থাৎ কৈবল্যসাধনের জন্য এই সপ্ত রূপ বর্জ্জন করিয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতিরূপ একটি রূপ ধারণ করিয়া আপনাকে মুক্ত করে। সাং কা—৬৩।

পুনঃ পুনঃ তত্ত্বের চিন্তনের ফলে বুদ্ধির বিপর্য্যয়ের বিলোপ হয় এবং বুদ্ধি-বিপর্য্যয় অপগত হইলে অজ্ঞান-ও-সংশয়-বর্জ্জিত "কেবল জ্ঞান" উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞাম অপরিশেষ, কেননা ইহাই চরম জ্ঞান, ইহার পরে জ্ঞাতব্য কিছু থাকে না এই জ্ঞানে না আছে "অস্মিতা" (আমি আছি, এই বোধ), না আছে "অহন্তা" (আমি দেহ, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাকার বোধ),

না আছে "মমতা" (আমার দেহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, ইত্যাকার বোধ)।* পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাহাতে কোনও ব্যাপার ঘটে না। ক্রিয়াবাচক কোনও পদই তাহাতে আরোপিত হইতে পারে না। আমি জানি, আমি হোম করি প্রভৃতি ক্রিয়াসূচক কোনও বোধই তাহার নাই। বিপর্য্যয় বা মিথ্যা-জ্ঞান-বাসনা অনাদি হইলেও সদ্য-উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান তাহার উচ্ছেদে সমর্থ। কেননা বুদ্ধির স্বভাবই হইতেছে সত্যের প্রতি—বস্তুযাথার্থ্যের প্রতি—অনুরাগ। (বাচস্পতি)।

তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পরে পুরুষ মনে করেন, "আমার প্রকৃতিকে দেখা শেষ হইয়াছে।" ইহা মনে করিয়া তিনি প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেন। প্রকৃতিও ভাবেন, "আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে ;" ভাবিয়া স্বকার্য্য হইতে বিরত হন। ইহার পরেও প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ যদি থাকে, তবু প্রয়োজনের অভাবে "সর্গ" আর হয় না। বিবেক হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হইতে পারে। সংযোগ তো "যোগ্যতা" ভিন্ন কিছু নহে। পুরুষের ভোক্তৃত্ব-যোগ্যতা এবং প্রকৃতির ভোগ্যত্ব-যোগ্যতাই সংযোগ। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভবের পরেও এই যোগ্যতার তিরোভাব হয় না। সুতরাং প্রয়োজনের অভাবেই সর্গনিবৃত্তি হয়। ভোগে উপেক্ষাবশতঃ সৃষ্টি আর হয় না। সাং কা—৬৬।

সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ধর্ম্মধর্ম্মাদির উৎপত্তির কারণ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় না। কুম্ভকার তাহার চক্র হইতে হাত সরাইয়া লইবার পরেও চক্র যেমন কিছুকাল ঘুরিতে থাকে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান-লাভের পরেও তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ সংস্কারবশতঃ কিছুকাল জীবিত থাকে। তারপরে স্থূল শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হইলে এবং প্রধানের কর্ম্ম-প্রয়োজন শেষ হওয়ার ফলে প্রধান তাহার কার্য্য হইতে বিরত হইলে, পুরুষ ঐকান্তিক অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী এবং আত্যন্তিক অর্থাৎ অবিনাশী কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। এই কৈবল্যই বিবেক-জ্ঞানের ফল। ইহার স্বরূপ কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যাত হয় নাই। ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে। বিপর্য্যয়হীন বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান কি, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। তখন দুঃখ থাকে না, ইহা বোঝা যায়। কিন্তু থাকে কি ? সুখ থাকে না, কেন না, সে অবস্থা সুখদুঃখের অতীত। জ্ঞান থাকে কি ? "তখন বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান হয়"—ইহা কারিকায় আছে সত্য। কিন্তু জ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা সে অবস্থায় হওয়া সম্ভবপর কি ? জ্ঞানের

* এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি, নমে, নাহম্ ইত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলং উৎপদ্যতে জ্ঞানম্। সাং কা—৬৪

মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ থাকে। কিন্তু "কেবল জ্ঞানের" মধ্যে সে ভেদ নাই। "অহং" বর্জ্জিত চৈতন্যের মধ্যে সে ভেদ থাকা সম্ভবপর নহে। সুখদুঃখের বোধহীন, বিষয়-বিষয়ীর ভেদহীন চৈতন্য আমাদের অজ্ঞাত। "কেবল জ্ঞান"কে "অপরিশেষ জ্ঞান" বা জ্ঞানের চরম অবস্থা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই জ্ঞানকে উন্নতি-মার্গে অগ্রসর ক্রমবর্দ্ধনশীল জ্ঞানের চরম উন্নত অবস্থা বলিবার উপায় নাই। কেননা শেষোক্ত মার্গে জ্ঞানের গতি সম্মুখের দিকে অগ্রসর, আর "কেবল জ্ঞান" পরাংমুখ, তাহা বর্জ্জনশীল, প্রগতিহীন, প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভূত যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানবর্জ্জিত। যাহা কিছু সংসারে জ্ঞান বলিয়া পরিচিত, তাহার কিছুই তাহার মধ্যে নাই। সেই অজ্ঞাত অপরিচিত অবস্থা দুঃখবর্জ্জিত হইলেও কাম্য কি না, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ আছে। তবে সেই জ্ঞান যদি বুদ্ধির অতীত অতিমানসিক কোনও প্রকার জ্ঞান (Supramental) হয়, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না।

এই কেবল জ্ঞান কাহার ? সাংখ্য বলিতেছেন—

তস্মান্ন বধ্যতে, অদ্ধা ন মুচ্যতে, নাপিসংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি, বধ্যতে, মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ। সাং কা—৬২

✓ বাস্তবপক্ষে কোনও পুরুষের বন্ধন হয় না, মুক্তিও হয় না। কোনও পুরুষের দেহান্তরপ্রাপ্তিও ঘটে না। বন্ধ, মুক্তি ও দেহান্তর প্রাপ্ত হয় নানা-অবস্থাপন্ন প্রকৃতি। সংসার, বন্ধ ও মুক্তি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই, পুরুষের নহে। তথাপি সংসার, বন্ধ ও মুক্তি আরোপিত হয় পুরুষে। কেন? বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন "যুদ্ধে জয়-পরাজয় প্রকৃতপক্ষে রাজভৃত্যগণের হইলেও, যেমন তাহা তাহাদের প্রভু রাজার জয়-পরাজয় বলিয়া কথিত হয়, কেননা রাজভৃত্যগণ রাজারই আশ্রিত, এবং জয়-পরাজয়ের ফল রাজা ভোগ করেন, তেমনি যদিও ভোগ ও অপবর্গ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই, তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাববশতঃ তাহা পুরুষেরই"। এ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। জয়-পরাজয়ের ফল রাজা নিজে ভোগ করেন, সুতরাং জয়-পরাজয় ভৃত্যবর্গের হইলেও, তাহা রাজার বলিতে বাধা নাই। কিন্তু যে প্রকৃতির সান্নিধ্যে অবস্থিতি ব্যতীত অন্য কোনও সম্বন্ধ তাহার সহিত পুরুষের নাই, তাহার ভোগ ও অপবর্গ কেন পুরুষের হইবে, তাহার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাব প্রকৃতির (বুদ্ধির) পুরুষের নহে। সেই ভেদজ্ঞানও উৎপন্ন হয় প্রকৃতির মধ্যেই, যদিও পুরুষের সান্নিধ্যেই হয়। যে পুরুষে ভেদজ্ঞান নাই, অভেদজ্ঞানও

নাই, সে এই অভেদজ্ঞানের ফল ভোগ করিবে কেন? পুরুষ চিরমুক্ত। সুতরাং "কেবল জ্ঞান" যে পুরুষের নহে, তাহা প্রকৃতির—প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভূত এবং পুরুষের চৈতন্যের আলোকপ্রাপ্ত জীবের—তাহা স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত কারিকাতেও তাহাই বলা হইয়াছে। "দুঃখত্রয়াভিঘাত" জীবের, পুরুষের নহে। দুঃখ হইতে মুক্তিও জীবের, পুরুষের নহে। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির মধ্যে (জীবে) যে দুঃখের অনুভূতি হয়, পুরুষের পক্ষে (তন্মধ্যে বুদ্ধির প্রতিবিম্বপাতবশতঃ) তাহার দ্রষ্টা হওয়া যদিও সম্ভবপর হয়, তথাপি পুরুষ যখন সুখ-দুঃখের অতীত, তখন সেই দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুঃখ-মুক্তি জীবের। ৬৩ কারিকায় বলা হইয়াছে, যে প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞান-রূপ ধারণ করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। জীবই এই মুক্তিলাভ করে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে নূতন এক অসংগতির উদ্‌ভব হয়। মুক্ত অবস্থায় "নাস্মি ন, মে, নাহং ইতি অপরিশেষ জ্ঞান" উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির অংশভূত জীবের মধ্যে আছে বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়। তাহার পক্ষে "নাস্মি, ন মে, নাহং" এই জ্ঞানলাভ করার অর্থ, বুদ্ধি-ও-অহংকার-বর্জ্জিত হওয়া অর্থাৎ তাহার জীবত্বের বিনাশ হওয়া। জীবের মুক্তির অর্থ হয় জীবের বিনাশ। বিনষ্ট জীবের পক্ষে "অপরিশেষ কেবলজ্ঞান"-লাভের কোনও অর্থই হয়না। এ অসংগতি দূর করিতে হইলে সাংখ্যকারিকার ৬২ ও ৬৩ কারিকার উপর গুরুত্ব-আরোপ না করিয়া বন্ধ বাস্তবিকই পুরুষের হয়, এবং "কেবল জ্ঞান" পুরুষের যখন হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

"প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধারণ করে" (সাং কা ৬৩) কিরূপে, তাহা দুর্ব্বোধ্য। "নাস্মি, নাহং, নমে" এই জ্ঞান অহংজ্ঞান-বর্জ্জিত পুরুষে সম্ভবপর নহে, কেন না "নাস্মি", "নমে", "নাহং"—এই জ্ঞানের মধ্যে অহংজ্ঞান বর্ত্তমান। ইহাই যদি "তত্ত্বজ্ঞান" হয়, তাহা হইলে ইহা জীবের পক্ষেও সত্য নহে। কেননা জীব বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি লইয়াই গঠিত। সত্য বটে প্রকৃতির উপর পুরুষের আলোকপাতেই জীবের বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি-সংবলিত অহংকারের উদ্‌ভব হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই অহংকার জীবের নহে, বলা যায় না। পুরুষের আলোক-বর্জ্জিত জীবে যখন অহংকার থাকে না, তখন জীবের অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং তাহার তত্ত্বজ্ঞান-লাভের কোনও অর্থই হয় না।

সুখদুঃখের অনুভূতির জন্য চৈতন্যের প্রয়োজন। এই চৈতন্য জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতনের ফলে। এই দুঃখ সত্য।

এই দুঃখ-নাশের জন্য সাংখ্য প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের আলোকপাতের নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অবিনাশী, উভয়ই দেশ-কালের অতীত। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ যোগ্যতামাত্র। উভয়ের সান্নিধ্য দেশ-ও-কালগত নহে। সুতরাং এই সংযোগের বিনাশ সম্ভবপর কি না, তাহাতে ঘোর সন্দেহ আছে। পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও প্রকৃতির ভোগ্যত্ব তাহাদের স্বরূপগত। ইহাদের সহিত আছে অনাদি বিপর্য্যয়-বাসনা। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বাসনার নাশ হয় বলা হইয়াছে। এই বাসনা পুরুষের। এই বাসনা যদি অনাদি হয়, তাহা হইলে অনাদিকাল হইতে পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযোগে বদ্ধ। কিন্তু বাসনা অনাদি হইলেও অনন্তকাল স্থায়ী নহে। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তাহার ধ্বংস হয়। প্রকৃতির মধ্যে উদ্ভূত জ্ঞানদ্বারা পুরুষের বাসনার ধ্বংস কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান পুরুষেরই বলিতে হইবে, এবং পুরুষ যে অনাদিকাল হইতে বদ্ধ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্য যে নির্গুণ পুরুষের কথা বলিয়াছেন, তিনি এই সকল বদ্ধ পুরুষের অতিরিক্ত, তিনি "ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ" (পাতঞ্জলদর্শন ১।২৪), তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সকল পুরুষই মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধ—সকলেই জীব। ইহা স্বীকার না করিলে সাংখ্যের অসংগতি দূর হয় না।

২৩

আখ্যায়িকা ও উপমা

ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় সাংখ্যদর্শন অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ৭২ কারিকায় ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আখ্যায়িকা ও পরবাদ বর্জ্জন করিয়া ষষ্টি-তন্ত্রের অবশিষ্ট সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয় তাঁহার সপ্ততিসংখ্যক কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকাগুলি কয়েকটি উপমাসহ সাংখ্য প্রবচনসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহাদিগের বর্ণনা করা গেল।

(১) আত্মানাত্ম-বিবেক হইতে নিঃশেষে দুঃখ-নিবৃত্তি হয়। এই আত্মানাত্ম-বিবেক তত্ত্বোপদেশ শুনিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। এক রাজপুত্র অশুভ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তিনি এক শবররাজ-কর্তৃক প্রতিপালিত হন, এবং বাল্যাবধি শবরদিগের সংসর্গে থাকায় আপনাকেও শবর অথবা ব্যাধ বলিয়া মনে করিতেন। রাজার মৃত্যুর পরে রাজামাত্যগণ রাজপুত্রের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করেন। তখন

নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া রাজপুত্র আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হন। (২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এক পিশাচ তাহা শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। অপর লোককে প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

(৩) বারংবার উপদেশ শ্রবণ করিবার পরে শ্বেতকেতু প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যা ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং তত্ত্বোপদেশ অসকৃৎ শ্রবণ করিবে। (৪) পিতার মৃত্যু হয়, পুত্র থাকে। আবার পুত্র পিতা হয়, পরে পরলোকগমন করে। ইহা হইতে জীবদেহের ভঙ্গুরত্ব এবং বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে হয়। (৫) এক শ্যেনপক্ষী একখণ্ড মাংস অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল দেখিয়া এক ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। তখন শ্যেন স্বেচ্ছায় মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া উদ্বেগ-রহিত হইয়াছিল। কিন্তু বলপূর্ব্বক যদি কেহ তাহার কবল হইতে মাংসখণ্ড কাড়িয়া লইত, তাহা হইলে সে দুঃখী হইত। (৬) গাত্র-চর্ম্ম জীর্ণ হইলে সর্প তাহা ত্যাগ করে। মুমুক্ষু ব্যক্তিও দেহ জীর্ণ হইলে তাহা হেয়-জ্ঞানে ত্যাগ করেন। (৭) ছিন্ন হস্ত যেমন পুনরায় কেহ গ্রহণ করে না, প্রকৃতিকেও তেমন একবার বর্জ্জন করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিবে না। (৮) অনাথ হরিণশিশুকে ধর্ম্মবোধে রক্ষা ও পালন করিতে গিয়া ভরত মোহে পতিত হন, এবং পরে হরিণ-জন্ম লাভ করেন। যাহা হইতে বিবেক-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহা আপাততঃ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইলেও মুমুক্ষু তাহা অবলম্বন করিবেন না। (৯) হস্তে একাধিক শাঁখার বালা থাকিলে পরস্পরের সংঘর্ষে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। বহুজন-সংসর্গ করিবে না। তাহাতে রাগাদির উৎপত্তি হইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। দুই জনের একত্র অবস্থানও সাধনার বিঘ্নকর। (১০) পিঙ্গলা নাম্নী নারী প্রিয়তমের আশায় বহুদিন অপেক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে তাহার আশা ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিল। সুতরাং কিছুরই আশা করিও না। তাহা হইলেই সুখী হইবে। (১১) মূষিকের গর্ত্তে সর্প বাস করে, নিজে গৃহ নির্ম্মাণ করে না। মুনিগণও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াসী হন না। (১২) ভ্রমর বহু পুষ্প হইতে তাহাদের সার মধুই আহরণ করে। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বহু গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে সারই গ্রহণ করিবে। (১৩) শরনির্ম্মাণে ব্যাপৃত ইষুকার নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া মহামান্য রাজা চলিয়া গেলেও তাহাকে দেখিতে পায় নাই। এইরূপ একচিত্ত হইলে সমাধিহানি হয় না। (১৪) চিকিৎসক রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। রোগী ব্যবস্থা অনুসারে চলিল না। ফলে রোগ সারিল

না। সেইরূপ যাহার পক্ষে যে নিয়ম শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করিলে অনর্থের উৎপত্তি হয়। (১৫) মৃগয়ায় বহির্গত এক রাজা অরণ্যে এক কামরূপা সুন্দরী নারী দেখিতে পাইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। নারী কহিল, রাজা যদি তাহাকে কখনও জল প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে সে তাহার ভার্য্যা হইয়া থাকিবে। কিন্তু জল-প্রদর্শনমাত্র তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। রাজা সম্মত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেম। কিছুদিন পরে রাজার সহিত ক্রীড়ায় ক্লান্ত হইয়া রমণী জলপান করিতে চাহিল। রাজা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া জল দিলেন। রমণী তৎক্ষণাৎ ভেকীরূপ ধারণ করিয়া জলে প্রবেশ করিল, এবং রাজা শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া বিহিত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। (১৬) দৈত্যরাজ বিরোচন এবং দেবরাজ ইন্দ্র উভয়েই উপদেশার্থী হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন করেন। প্রজাপতি প্রাথমিক উপদেশ উভয়কেই একসঙ্গে দান করেন। বিরোচন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করে। প্রজাপতির নিকট আর উপদেশের জন্য আসে নাই। ইন্দ্র কিন্তু সেই প্রাথমিক উপদেশে সন্তুষ্ট না হইয়া বার বার প্রজাপতির নিকট তত্ত্বোপদেশের জন্য গমন করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। তিনি গুরুবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ-শ্রবণেই কৃতকৃত্যতা হয় না। সম্যক মনন ও নিদিধ্যাসন চাই। (১৭) ইন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ প্রণতি, ব্রহ্মচর্য্য এবং গুরু-আরাধনা করিয়া পরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। (১৮) মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই গুরূপদেশ শ্রবণ করিয়া বামদেব তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন। কতদিন সাধন করিলে কাহার তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হইবে, তাহার কোনও নিয়ম অবধারিত নাই। কাহারও অল্পকালে হয়, কাহারও দীর্ঘকাল লাগে। (১৯) প্রতীকের উপাসনা করিয়া পরম্পরাক্রমে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয়। যজ্ঞদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষলাভ হয় না। কিন্তু যজ্ঞদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান-লাভে সহায়তা করে। তদ্রূপ প্রতীক-উপাসনাদ্বারাও মোক্ষলাভের সহায়তা হয়। কোনও সীমাবদ্ধ বস্তু অথবা মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত বলিয়া তাহার উপাসনা করিলে, তদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিবেকখ্যাতি ও মোক্ষ হয় না বটে, কিন্তু পরম্পরা-সম্বন্ধে তাহা মোক্ষলাভের হেতু হয়। (২০) ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে পঞ্চাগ্নিতে হোম করিলে পুনর্জন্ম হয়। নির্গুণ সাধনা ভিন্ন সগুণ ব্রহ্মাদির উপাসনাদ্বারা যে ব্রহ্মলোকাদি-লাভ হয়, তাহা হইতে পুনরায় সংসারে আবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া ব্রহ্মলোক-

প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহারই কেবল পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্তু যাহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। (২১) হংস নীর ত্যাগ করিয়া যেমন ক্ষীর গ্রহণ করে, তেমনি সংসার-বিরক্ত যিনি, তিনি হেয় প্রকৃতিকে বর্জ্জন করিয়া উপাদেয় আত্মাকে গ্রহণ করেন। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের সঙ্গলাভে হেয়-বর্জ্জন ও উপাদেয়ের গ্রহণ হইতে পারে। (২২) শুকপক্ষীর গুণে (সুন্দর কণ্ঠধ্বনি) আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে আবদ্ধ করে। তেমনি সাধকের অলৌকিক গুণ থাকা প্রকাশিত হইলে, তিনি পুনরায় সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হন। সুতরাং অণিমাদি সিদ্ধি কামনা করিবে না। তাহা লাভ করিলেও গোপন রাখিবে। (২৩) শুকপক্ষী সুন্দর। তাহার রূপলোভে লোকে তাহাকে বন্দী করিবে, এই ভয়ে শুক সাবহিত থাকে ও স্বেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন করে। বিষয়ানুরাগী লোকের সহবাসে বিষয়াসক্তি জন্মিতে পারে। সুতরাং বিষয়ানুরক্ত পুরুষের সঙ্গ ও স্বেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন করিবে। (২৪) সৌভরি ঋষি জলমধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেন। কিন্তু যোষিৎসঙ্গ-তৃষ্ণায় জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া পঞ্চাশৎ রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বহুকাল স্ত্রীসঙ্গ-ভোগেও তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি পুনরায় সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ভোগের দ্বারা রাগের শান্তি হয় না। প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য উভয়ের দোষ-দর্শন করিবার পরে সৌভরি মুনির রাগের শান্তি হইয়াছিল। (২৫) প্রিয়পত্নী ইন্দুমতীর বিরহে শোকতপ্ত অজরাজকে কুলগুরু বশিষ্ঠ অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হয় নাই। মলিন চিত্তে উপদেশ-বীজ অঙ্কুরিত হয় না। মলিন-দর্পণে যেমন প্রতিবিম্বের আভাসমাত্রও দৃষ্ট হয় না, তেমনি মলিন চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের আভাস স্ফুরিত হয় না। চিত্তের মালিন্য দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। (২৬) কোনও বস্তু হইতে যখন অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, তখন দ্বিতীয় বস্তু সকল সময়ে প্রথম বস্তুর সরূপ হয় না। পঙ্ক হইতে পঙ্কজের উৎপত্তি হইলেও উভয়ের মধ্যে সরূপতা নাই। সংসার মলিন বটে, কিন্তু সেই সংসারে উৎপন্ন সকলেই যে মলিন-চিত্ত হইবে, কেহই মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে না, তাহা নহে। মলিন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকে মোক্ষলাভ করিয়াছেন। (২৭) উপাস্য দেবতাগণ যেমন অণিমাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াও কৃতকৃত্য হন নাই, তেমনি তাহাদের উপাসনাদ্বারা যে সকল বিভূতিলাভ হয়, তাহাদ্বারাও জীব কৃতকৃত্য হয় না। (২৮) বৎসের পোষণের জন্য, গাভীর

স্তন হইতে যেমন অচেতন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, তেমনি পুরুষের মোক্ষসাধনের জন্য প্রধানের স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়। দুগ্ধ আপনা হইতে ক্ষরিত হয়। তাহার লক্ষ্য যদিও বৎসের পোষণ, তথাপি এই উদ্দেশ্য সচেতনভাবে গাভীর মনে উদিত হয় না। প্রকৃতির মধ্যেও পুরুষের মোক্ষসাধনের জন্য কোনও সচেতন উদ্দেশ্য থাকা সম্ভবপর নহে, কেননা প্রকৃতি অচেতন। তাহা হইলেও পুরুষের মোক্ষের জন্য আপনা হইতেই প্রকৃতির মধ্যে চেষ্টার উদ্ভব হয়। (২৯) মনে কোনও বস্তুপ্রাপ্তির জন্য ঔৎসুক্য হইলে, তাহা পাইবার জন্য লোকে যে-ভাবে চেষ্টা করে, সেইভাবেই প্রকৃতি পুরুষের বিমোক্ষের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতি অচেতন। সুতরাং পুরুষের মোক্ষসাধনের জন্য কোনও সচেতম ইচ্ছা তাহার নাই। (৩০) রঙ্গালয়ে দর্শকদিগকে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া নর্ত্তকী যেমন নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতি পুরুষকে আপনার রূপ প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হয়। (৩১) পুরুষ প্রকৃতির কোনও উপকার করে না। তবুও প্রকৃতি নানাবিধ উপায়ে পুরুষের উপকার করে। পুরুষ গুণহীম, কিন্তু প্রকৃতি গুণবতী। এই গুণহীন পুরুষের অর্থ প্রকৃতি নিঃস্বার্থভাবে সাধন করে। (৩২) প্রকৃতি অতিশয় লজ্জাশীলা। তাহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাশীলা কেহ নাই। কুলবধূ যেমন পরপুরুষকর্ত্তৃক একবার দৃষ্ট হইবামাত্রই লজ্জাবশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, আর বাহির হয় না, প্রকৃতিও তেমনি পুরুষকর্ত্তৃক একবার দৃষ্ট হইয়াই, "আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে" ভাবিয়া পুরুষের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যায়। আর তাহার সম্মুখে আসে না। (৩৩) তত্ত্বাভ্যাসের ফলে বিমল জ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রকৃতি তাহার প্রসবকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। ভোগ ও বিবেক-সাক্ষাৎকার এই দুইটিই প্রসবের বিষয়। প্রথমে ভোগ, পরে বিবেক-সাক্ষাৎকার যখন শেষ হয়, তখন প্রকৃতির প্রসোতব্য আর কিছুই থাকে না, সুতরাং প্রকৃতি প্রসব-কার্য্য হইতে তখন নিবৃত্ত হয়। বিবেক-জ্ঞান রূপ যে অর্থ, তাহার ফলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য - এই সপ্তরূপ-বিবর্জ্জিত অবস্থায় প্রকৃতিকে তখন পুরুষ দর্শন করেন, এবং তিনি স্বস্থ প্রেক্ষকবৎ অবস্থান করেন।

প্রেক্ষকের সহিত এই উপমাটি খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতি কোনও পুরুষ সম্বন্ধে তখনই নিষ্ক্রিয় হয়, যখন পুরুষের দেখিবার শক্তিই থাকে না। সুতরাং তখন তাহাকে প্রেক্ষক বলা যায় না। সেইজন্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, তখনও কিছু সাত্ত্বিক বুদ্ধি পুরুষে যুক্ত থাকে, রজঃ ও-তমঃ কর্ত্তৃক কলুষিত বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত না হইলেও কিঞ্চিৎ সাত্ত্বিক বুদ্ধি পুরুষে যুক্ত থাকে।

২৪

সাংখ্যদর্শনে বন্ধ ও মুক্তি

বন্ধ ও মুক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্রধান কথা। বন্ধের অর্থ দুঃখ-সংযোগ। এই দুঃখ হইতে মুক্তির উপায়-নির্দেশ করাই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় জানিতে হইলে দুঃখের উৎপত্তি কেন ও কিরূপে হয়, তাহা জানার প্রয়োজন। তাই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি এক, তাহা হইতে এই জীবোপেত জগতের উদ্ভব হয়, পুরুষ বহু, তাহা হইতে কিছুই উদ্ভূত হয় না। "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ ইতি" সাং সূ—১।১৫। পুরুষ বা আত্মা সর্ব্বপ্রকার সঙ্গবর্জ্জিত ও নির্গুণ। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই।

তস্মাৎ ন বধ্যতেঽদ্ধা, ন মুচ্যতে, নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি, বধ্যতে, মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ। সাং কা—৬২

পুরুষের বন্ধও নাই, মুক্তিও নাই, জন্মান্তরও নাই। জন্মান্তর, বন্ধ ও মুক্তি হয় নানা পুরুষাশ্রিত প্রকৃতির। (বন্ধ-মোক্ষ সংসারাঃ পুরুষে উপচর্য্যন্তে—তত্ত্বকৌমুদী ৬২)। কিন্তু এই কারিকার পূর্ব্বের এক কারিকায় আছে—

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যানিবৃত্তেঃ, তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন। সাং কা—৫৫

লিঙ্গদেহের অনিবৃত্তিবশতঃ দেহে অবস্থিত চেতন পুরুষ অবশ্যম্ভাবী জরা ও মৃত্যু নিবন্ধন দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। লিঙ্গদেহে আত্মবোধহেতু এই দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই আত্মবোধ বিনষ্ট হইলে দুঃখেরও বিনাশ হয়। এই দুঃখই বন্ধ। ইহারই কয়েক শ্লোক পরে উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রকৃত-পক্ষে বন্ধ প্রকৃতির, পুরুষের নহে। দুই সূত্রের মধ্যে বিরোধ সুস্পষ্ট। কিন্তু বন্ধ যদি পুরুষের না হয়, তাহা হইলে—

বৎসবিবৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য। সাং কা—৫৭

এই কারিকায় যে "পুরুষ-বিমোক্ষে"র কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? বৎস-বিবৃদ্ধির জন্য যেমন অচেতন গাভীদুগ্ধ আপনা হইতে ক্ষরিত হয়, সেইরূপ পুরুষের মোক্ষের জন্য প্রধানের (প্রকৃতির) চেষ্টা আপনা হইতেই উপজাত

হয়। প্রকৃতি প্রথমে পুরুষকে বদ্ধ করে, পরে তাহার মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। ৬২ কারিকায় বলা হইয়াছে, প্রকৃতির চেষ্টার ফলে প্রকৃতি নিজেই বদ্ধ হয়। মুক্তও হয় প্রকৃতি। পুরুষ চিরকালই মুক্ত। তাহার বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। তাহার পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধ নাই, মোক্ষও নাই। কিন্তু তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে সমগ্র সাংখ্যদর্শন "অপার্থ" (নিরর্থক) হইয়া পড়ে। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ না হইলে বন্ধ হয় না। এই সংযোগ স্বীকার করিতে সাংখ্যকার কুণ্ঠিত। কেননা তাঁহার মতে "চিতিশক্তি অপরিণামী"। এই তথাকথিত সংযোগকে "সান্নিধ্য" মাত্র বলা হইয়াছে। এই সান্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এবং পুরুষে বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পতিত হয়, বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবিম্ব-পাতের ফলেই হউক, অথবা বুদ্ধির সহিত পুরুষের প্রকৃত সংযোগের ফলেই হউক, বুদ্ধিতে উপজাত দুঃখ ও অন্যান্য ভোগ যদি পুরুষকে স্পর্শই না করে, তাহা হইলে পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষের কথা উঠিতে পারে না। আর অচেতন প্রকৃতির বন্ধই বা কি, তাহাও বোধগম্য হয় না। চৈতন্যরূপী পুরুষের আলো প্রকৃতির উপর পতিত না হইলে, বুদ্ধি, অহংকার ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভব হয় না। কিন্তু বুদ্ধি, অহংকার ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা পুরুষের উপর কোন ক্রিয়াই উৎপন্ন হয় না বলিলে, সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজনই অস্বীকৃত হয়। পুরুষের ভ্রান্তি হয়, পুরুষে অহংকারের উদ্ভব হয় এবং পুরুষ আপনাকে বুদ্ধির সহিত অভিন্ন মনে করিয়া বুদ্ধিতে অনুভূত সুখ-দুঃখ নিজে অনুভব করে, ইহা স্বীকার না করিলে বন্ধ ও মোক্ষের কোনও অর্থই হয় না। এইজন্যই পাতঞ্জল-সূত্রে ব্যুত্থানকালে বুদ্ধির সহিত পুরুষের বৃত্তি-সারূপ্য স্বীকৃত হইয়াছে। "বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র" (পাঃ সূঃ ১।৪)। পুরুষ যখন স্বরূপে অবস্থান করে না, তখন চিত্তের সহিত তাহার বৃত্তি-সারূপ্য হয়; অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি ও পুরুষের বৃত্তি একপ্রকার হয়, এবং চিত্তে যে দুঃখ উদিত হয়, পুরুষ তাহা নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করে। এই দুঃখ-ভোগই বন্ধ। পুরুষ যখন সমাধিকালে স্বরূপে অবস্থান করে, তখন অহংকার-মুক্ত হয় এবং চিত্তের সহিত তাহার সংশ্রব থাকে না। কিন্তু অন্য সময়ে "একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্।" (দর্শন = চৈতন্য, খ্যাতি = বুদ্ধিবৃত্তি। চৈতন্য ও বুদ্ধিবৃত্তি অভিন্ন।) পঞ্চশিখের এই সূত্রানুসারে পুরুষ আপনাকে বুদ্ধির সহিত অভিন্ন মনে করে এবং বুদ্ধির দুঃখকে নিজে অনুভব করে। এই অনুভূতি হইতে মুক্তিই মোক্ষ। এই দুঃখানুভূতি সত্য, এবং বিবেকজ্ঞানদ্বারা ইহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

সুতরাং সাখ্যকারিকার "ন বধ্যতে, ন মুচ্যতে, ন সংসরতি" (৬২) এই কারিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। লিঙ্গদেহ জরা-মরণ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। পুরুষ এই দুঃখকে তাহারই মনে করিতেছে, কেননা, তাহার বোধ বুদ্ধির বোধের সহিত অভিন্ন। লিঙ্গদেহের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত এই বোধ থাকে। পুরুষে দুঃখের অনুভূতি যদি না থাকিত, বুদ্ধির সহিত তাহার বৃত্তি-সারূপ্য যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করিত। বন্ধ ও মোক্ষের কথা উঠিত না। বন্ধ, মোক্ষ, জন্মান্তর যদি কেবল লিঙ্গশরীরেরই হয়, পুরুষ সর্ব্বদাই স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে যাহার মোক্ষ হয়, তাহার ঐকান্তিক বিনাশ বা "সর্ব্বোচ্ছিত্তি"ই মোক্ষ।

সাংখ্যসূত্রে বন্ধ-সম্বন্ধে যাহা আছে তাহা এই : "ন স্বরূপতঃ বদ্ধস্য মোক্ষ-সাধনোপদেশবিধি" (সাং সূ ১।৭)। পুরুষ স্বরূপতঃ বদ্ধ নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তাহার মোক্ষসাধনের উপদেশ বৃথা হইত। কেননা, যাহার যাহা স্বভাব, তাহা কখনও অপগত হয় না। তাহার স্বভাবের বিনাশের সঙ্গে তাহার নিজেরই বিনাশ হয়। আত্মা যদি স্বরূপতঃ বদ্ধ হইত, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে মোক্ষসাধনের উপায় বর্ণিত আছে, তাহার অনুষ্ঠান নিষ্ফল হইত। আবার যাহা অসাধ্য, তাহার সাধনের জন্য উপদেশ পালন করা অসম্ভব। তাহার জন্য উপদেশ দেওয়া না দেওয়ারই সমান। সত্য বটে শুক্লপটের উপর অন্য বর্ণের প্রয়োগ করিলে, তাহার শুক্লত্ব বিদূরিত হয়। আবার অগ্নিদগ্ধ বীজেরও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়। কিন্তু এই দৃষ্টান্তদ্বারা বস্তুর স্বভাবের বিনাশ প্রমাণিত হয় না। বস্তুর এক প্রকার শক্তির উদ্ভব এবং অন্যপ্রকার শক্তির অপ্রকাশ প্রমাণিত হয়। পটের শুক্লত্ব ধর্ম্ম তিরোহিত হয়, অন্য ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। বীজেরও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি তিরোহিত হয়। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে রজক ঐ রঞ্জিত বস্ত্রকে পুনরায় শুক্ল করিতে পারিত না, এবং যোগিগণ অগ্নিদগ্ধ বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারিতেন না। এই দুই স্থলে যাহা অসাধ্য, তাহা সাধিত হয় না। বন্ধ যদি পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহার উদ্ভব হয় কিরূপে? সাংখ্য বলেন কালের ও দেশের সহিত সংযোগবশতঃ পুরুষের বন্ধ হয় না। পুরুষ নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং সর্ব্বকালের সহিতই নিত্য সংযুক্ত। সে সংযোগের বিনাশ হইতে পারে না। বিশেষ অবস্থায় পতিত হইয়া যে আত্মার বন্ধ হয়, তাহাও নহে, কেননা অবস্থা দেহেরই ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মা অসঙ্গ ও অপরিণামী। কর্ম্মদ্বারাও আত্মার বন্ধ হয় না, কেননা, কর্ম্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম, আত্মার

ধর্ম্ম নহে। কর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিলে অতি-প্রসক্তি দোষ হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, দুঃখ তো চিত্তের ধর্ম্ম। তবে তাহাকে পুরুষের ধর্ম্ম বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে দুঃখকে যদি শুধু চিত্তধর্ম্ম বলা যায়, তাহা হইলে বিচিত্র সুখের অনুপপত্তি হয়। প্রত্যেক জীবের সুখদুঃখ অন্যান্য জীবের সুখদুঃখ হইতে ভিন্ন দেখা যায়। "ভোগ" অর্থে যদি কেবল সাক্ষাৎকার ধরা যায়, দুঃখযোগ অর্থে যদি কেবল দুঃখ-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক চিত্তের দুঃখের সহিত সকল পুরুষেরই সাক্ষাৎকার হইতে পারে, কোন্ পুরুষের কোন্ দুঃখ, তাহার নিয়ামক কিছুই থাকে না। সুতরাং দুঃখযোগরূপ বন্ধ যে পুরুষের, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে বুদ্ধিতে উদ্ভূত দুঃখ পুরুষের দুঃখে পরিণত হইতে পারে, বিজ্ঞান ভিক্ষু তাহার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক পুরুষের উপাধি চিত্তের দুঃখ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, ইহার কোনও সুবোধ্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার সেই প্রতিবিম্ব হইতে অসঙ্গ পুরুষে দুঃখবোধ উৎপন্ন হইতে পারে কিরূপে, তাহাও বোঝা সহজ নহে। এই জন্যই বোধ হয়, সাংখ্য-কারিকার ৬২ কারিকাতে বলা হইয়াছে যে, পুরুষের বন্ধ বাস্তবিক নাই। বিজ্ঞান ভিক্ষু বুঝিয়াছিলেন, পুরুষের দুঃখযোগ প্রকৃত, ইহা স্বীকার না করিলে সাংখ্যদর্শন ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু পুরুষের যে সংজ্ঞা সাংখ্যদর্শনে আছে, তাহাতে তাহার দুঃখের সহিত সংযোগ অসম্ভব। ইহার পরে সাংখ্য সূত্রে আছে—"প্রকৃতি নিবন্ধনাৎ চেৎ, ন, তস্যাপি পারতন্ত্র্যম।" (সাং সূ—১।১৮) প্রকৃতি-কর্তৃকও আত্মার বন্ধ হইতে পারে না, কেননা প্রকৃতি পরতন্ত্র। এখানে "পারতন্ত্র্য" শব্দের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে "সংযোগ-পারতন্ত্র্যম্", বন্ধকত্বে সংযোগ পারতন্ত্র্য, যাহার কথা পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত বিশেষ প্রকারের সংযোগ ব্যতীত পুরুষের বন্ধ হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে প্রলয়কালেও দুঃখবন্ধ হইতে পারিত। তখন সংযোগ থাকে না, কিন্তু প্রকৃতি থাকে। কিন্তু "পর" শব্দে এখানে "পর আত্মা" বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অধীন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং।" (৪।১০)। তাহাকেই আবার পরবর্ত্তী এক শ্লোকে (৬।৫) "সংযোগনিমিত্ত-হেতুঃ" বলা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৫ সূত্রে প্রকৃতিকে "পরবশ" বলা হইয়াছে (অকার্য্যত্বেঽপি তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ)। এখানে অনিরুদ্ধ "পরঃ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন

"আত্মা", যিনি সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা (৩।৫৬)।* সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও "পারতন্ত্র্যম্" শব্দের অন্তর্গত "পর" শব্দের অর্থ পরমাত্মা করা সঙ্গত। সাংখ্যসূত্রের সকল সূত্রই মহর্ষি কপিলের প্রণীত নহে, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সূত্রটি মৌলিক সাংখ্যসূত্রে ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। ইহাতে ঈশ্বরের স্বীকৃতি আছে।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতে বন্ধ হয় বলিয়া সূত্রকার আবার বলিতেছেন যে অবিদ্যা হইতে বন্ধ হইতে পারে না, কেননা অবিদ্যা অবস্তু, কোনও বস্তু নহে। যদি বল অবিদ্যা সৎবস্তু, তাহা হইলে তাহার বিনাশ হইতে পারে না, কেননা যাহা সৎ তাহার বিনাশ নাই। সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবিদ্যা যদি আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তু হয়, তাহা হইলে তাহা বিজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু হইল। তাহা বৈদান্তিক মতের যেমন বিরোধী, তেমনি ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদেরও বিরুদ্ধ। কেননা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে এই জগৎ বিজ্ঞান-সন্ততি বা বিজ্ঞান-প্রবাহ এবং এই প্রবাহের প্রত্যেক বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের সজাতীয়। কিন্তু অবিদ্যা যদি সৎ ও অসৎ উভয়রূপা হয়? না, তাহা হইতে পারে না, কেননা পরস্পর-বিরুদ্ধ-রূপবান্ কোনও পদার্থের প্রতীতি হয় না। সত্য বটে, বৈশেষিক দর্শনে মাত্র ছয়টি পদার্থ স্বীকৃত আছে। কিন্তু যাহারা বৈশেষিক দর্শনের অনুগামী নহে, তাহাদিগের পক্ষে ষট্ পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকারের বাধা নাই, ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সৎ ও অসৎ এইরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মান্বিত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। পদার্থের সংখ্যা অনিয়ত হইলেও ন্যায় ও যুক্তিতে যাহা অসিদ্ধ, তাহা স্বীকার করিতে কেবল বালক ও উন্মাদেই পারে। সুতরাং অবিদ্যা-সংযোগ হইতে আত্মার বন্ধ হয়, ইহা যাহারা বলেন, তাহাদের মত অগ্রাহ্য। নাস্তিক ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে প্রবাহরূপে বর্ত্তমান আত্মার অনাদি বিষয়বাসনা হইতেই বন্ধ হয়। এমতও গ্রাহ্য নহে। কেননা, আত্মা যেমন "আমি" "আমি", ইত্যাকার ক্ষণিক জ্ঞান-প্রবাহ, বাহ্য বিষয়ও তেমনি ক্ষণিক পরিবর্ত্তন-প্রবাহ। প্রবাহরূপে বর্ত্তমান বাহ্যবিষয়-কর্ত্তৃক উপরঞ্জিত হইয়া আত্মা বন্ধন-প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেননা, অভ্যন্তর প্রবাহ ও বাহ্যপ্রবাহ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বলিয়া উপরঞ্জ্য ও উপরঞ্জক ভাব তাহাদের মধ্যে থাকা সম্ভবপর নহে। শ্রুঘ্নদেশে অবস্থিত বস্তু ও পাটলিপুত্রে অবস্থিত বস্তুর মধ্যে দেশ-ব্যবধান-বশতঃ যেমন একটি কর্ত্তৃক অন্যটি উপরঞ্জিত হইতে পারে না, সেইরূপ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ যেমন তাহাদের বিষয়ের নিকট গমনের

* শ্রীমৎ সন্তদাসজীর সাংখ্যদর্শন ২৮৮—৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হয়, এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-কর্ত্তৃক উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ আত্মাও বিষয়ের নিকট গমনের ফলে বিষয়-কর্ত্তৃক উপরঞ্জিত হইতে পারিবে না কেন? ইহার উত্তর এই যে তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষের কোনও ব্যবস্থা থাকিত না, মুক্ত আত্মা ও বদ্ধ আত্মা উভয়েরই বিষয়-সংযোগ ও তাহার ফলে বন্ধ হইতে পারিত। কিন্তু এমনও তো হইতে পারে, যে মুক্ত আত্মা ও বদ্ধ আত্মা উভয়েরই বিষয়-সংযোগ হইলেও, অদৃষ্টবশতঃ কেবল বদ্ধ আত্মারই বিষয়ে অনুরাগ জন্মে, মুক্ত আত্মার অনুরাগ জন্মে না। হইতে পারে না, তাহার কারণ উপকার্য্য ও উপকারকের একই কালে অবস্থিতি না হইলে কোনও কার্য্যই সম্ভবপর হয় না। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে সর্ব্ব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, উঠিবামাত্র বিলয়প্রাপ্ত হয়। যাহার ধ্বংস হয়, ধ্বংসের পরক্ষণে উদিত বিষয়ের উপর তাহা কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না। গর্ভাধানাদি ক্রিয়াদ্বারা অজাত পুত্রের যেরূপ উপকার হয়, পূর্ব্বক্ষণ-স্থিত বিষয়দ্বারা সেইরূপ আত্মার উপরাগ সংঘটিত হয়, ইহাও বলা চলে না। কেননা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে "স্থির এক আত্মা" নামক কিছু নাই। এই মতে গর্ভাধানদ্বারা ভাবী পুত্রের কোনও রূপ সংস্কার অসম্ভব। গর্ভাধানের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কঠোপনিষদে আত্মার গতির কথা আছে। „আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"। কিন্তু গতিবিশেষদ্বারা—শরীর-প্রবেশরূপ গতিদ্বারা—আত্মার বন্ধ হয় না। কেননা প্রকৃতপক্ষে আত্মা নিষ্ক্রিয় ও বিভু (সর্ব্বব্যাপী)। তাহার পক্ষে দেহপ্রবেশাদি কার্য্য স্বীকার করা যায় না। আত্মা অচেতন ঘটাদির সমানধর্ম্মী হইতে পারে না। ঘটাদির ন্যায় মূর্ত্ত ও পরিচ্ছিন্ন বলিয়া আত্মাকে স্বীকার করিলে, তাহাকে অবয়বযুক্ত ও বিনাশী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহা অপসিদ্ধান্ত। আত্মার গতিসম্বন্ধে শ্রুতিতে যাহা আছে, তাহা উপাধিযুক্ত আত্মা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যেমন সর্ব্বব্যাপী ও অমূর্ত্ত আকাশ ঘট প্রভৃতি উপাধিযোগে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও গতিশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি দেহরূপ-উপাধিযোগে আত্মা দেহে প্রবিষ্ট (দেহ-প্রবেশরূপ গতি-বিশিষ্ট) বলিয়া প্রতীত হয়। ঘট একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলে তাহার মধ্যগত আকাশও যেমন স্থানান্তরিত হয় বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ দেহের গতিতে আত্মারও গতি আছে বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং দেহযোগে আত্মার বন্ধ হয় না। দেহযোগে আত্মার বন্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিলে শ্রুতিতে আত্মাকে যে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার বিরোধ হয়।

১।১৯ সূত্রে বলা হইয়াছে, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগের ফলেই পুরুষের বন্ধ হয়। এই সংযোগ স্বাভাবিক হইতে পারে, কালাদি-যোগেও হইতে পারে। তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেরও তো বন্ধ হইতে পারে। এই আশঙ্কার নিরসনের জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের কারণ অবিবেক। ইহা স্বাভাবিক নহে, কালাদি-যোগ-নিমিত্তও নহে। এই সংযোগের নিমিত্ত অবিবেক। আপত্তি উঠিতে পারে—এই শ্লোকে অবিবেক শব্দের অর্থ তো প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ-সাক্ষাৎকার নহে। কেননা প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে তাহার উদ্‌ভব সম্ভবপর নহে। এখানে অবিবেক শব্দের অর্থ বিবেকের প্রাগভাব বা অবিবেকাখ্য জ্ঞান-বাসনা। কিন্তু ইহারা উভয়ই তো বুদ্ধির ধর্ম্ম, পুরুষের ধর্ম্ম নহে। বিভিন্ন ধর্ম্মীর মধ্যে সংযোগ হইতে পারে কিরূপে? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, বিষয়তা-সম্বন্ধে অবিবেক পুরুষধর্ম্ম, এবং "প্রকৃতি বুদ্ধিরূপা সতী যস্মৈ স্বামিপুরুষায় তনুং বিবিচ্য ন দর্শিতবতী, স্ববৃত্তিদর্শনার্থং তদীয় বুদ্ধিরূপেণ তত্রৈব পুরুষে সংযুজ্যতে।" অর্থাৎ বুদ্ধিরূপা হইয়া প্রকৃতি যে স্বামি-পুরুষকে স্বীয় তনু প্রদর্শন করেন নাই, আপনার বৃত্তি-প্রদর্শনের জন্য তিনি সেই স্বামি-পুরুষেরই বুদ্ধিরূপে তাহাতে সংযুক্ত হন। কিন্তু ইহা কবিতামাত্র, দার্শনিক যুক্তি নহে।

সাংখ্য মতে অবিদ্যা বন্ধের কারণ নহে। কিন্তু পাতঞ্জল সূত্রে (২।২৪) অবিদ্যাকেই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ বলা হইয়াছে। অবিবেক যদি প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ হয়, তাহা হইলে অবিবেক ও অবিদ্যা সমার্থক বলিতে হইবে। ব্যাস-ভাষ্যে 'অবিদ্যার' অর্থ "বিপর্য্যয় জ্ঞান বাসনা" বলা হইয়াছে। ইহাই অবিবেক। সাংখ্য মতে এই অবিবেক হইতে সংযোগ হয়, এবং সংযোগ হইতে বন্ধ হয়। অবিবেক বা অবিদ্যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্ধের কারণ নহে বলিয়া অবিদ্যা হইতে বন্ধ হয় না, বলা হইয়াছে। কেবল নির্দ্দিষ্ট কারণ-দ্বারাই অবিবেক বা অবিদ্যার উচ্ছেদ হইতে পারে, যেমন অন্ধকারের উচ্ছেদ কেবল আলোকদ্বারা হয়। এই কারণ "বিবেক।" "বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ" (পাতঞ্জল সূত্র ২।২৬)। প্রকৃতি-ও-পুরুষ-সম্বন্ধে অবিবেকের নাশ হইলে অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন এই জ্ঞান হইলে, অন্য অবিবেকেরও নাশ হয়।

✓ বন্ধ-সম্বন্ধে এত কথা বলিয়া অবশেষে সূত্রকার বলিতেছেন—বাঙ্‌মাত্রং নতু তত্ত্বং, চিত্তস্থিতেঃ (সাং-কা ১।৫৮)। বন্ধ ও মোক্ষ বাক্যমাত্র, পুরুষের বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। বন্ধ ও মোক্ষ আছে চিত্তে—প্রকৃতিতে। জবাফুলের

সান্নিধ্যে স্ফটিক যেমন লোহিতবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বন্ধ ও মোক্ষ তেমনি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। প্রকৃতিস্থ চিত্ত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। অবিবেকযুক্ত চিত্তের প্রতিবিম্ব সুখ-দুঃখাদির প্রতিবিম্ব। বন্ধরূপবৃত্তি যদিও চিত্তেরই, তথাপি পুরুষে দুঃখের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই ভোগ এবং তাহার উচ্ছেদই পুরুষার্থ (বিজ্ঞান ভিক্ষু)। কিন্তু বন্ধ যদি বাঙ্‌মাত্রই হয়, তাহা হইলে শ্রবণ-মননদ্বারাই তো তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে, অন্য চেষ্টার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর—বাঙ্‌মাত্র হইলেও যতদিন আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন এই বোধ হয় না। দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তিকে সত্য দিকের নির্দেশ করিয়া দিলেও যেমন তাহার দিক্‌বৈপরীত্য অপগত হয় না, তেমন কেবল শ্রবণ ও মননদ্বারা বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়না, যুক্তিদ্বারাও অবিবেক বিদূরিত হয় না। এই অবিবেক, এই ভ্রান্তি, পুরুষের নহে, বুদ্ধির। বুদ্ধির সহিত পুরুষের অভেদ-জ্ঞান আছে বুদ্ধিতে, পুরুষে তাহা নাই। পুরুষে সেই অবিবেক, সেই ভ্রান্তি, প্রতিবিম্বিত হইলেও তাহা বুদ্ধিরই অবিবেক, বুদ্ধিরই ভ্রান্তি। সুতরাং বন্ধ পুরুষের নহে, প্রকৃতির।

দুঃখ-সংযোগই বন্ধ, দুঃখ হইতে মুক্তিই মোক্ষ। দুঃখমুক্তি ও সুখ এক নহে। সাংখ্য মোক্ষকে সুখের অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন না। সে অবস্থা—দুঃখ ও সুখ উভয়েরই অতীত অবস্থা—কিরূপ, তাহার ধারণা আমরা করিতে পারি না। যাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন সে অবস্থা কিরূপ। অথবা মোক্ষ যদি লিঙ্গশরীরধারী জীবেরই হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও তাহা জানেন না, কেননা সে অবস্থায় লিঙ্গশরীরের অস্তিত্বই থাকে না। পুরুষ চিরমুক্ত, তাহার বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। জীবই বুদ্ধ্যাদি-সমন্বিত লিঙ্গদেহে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার বিনাশ হয়।

সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই তিন অবস্থাতে ব্রহ্মরূপতা-প্রাপ্তি হয় (সাং-সূ ৫।১১৬)। কাহার? জীবের নহে। পুরুষের। কেন না মোক্ষে জীবের অস্তিত্বই লুপ্ত হয়। প্রকৃতির সংসর্গ-বিমুক্ত অবস্থাই ব্রহ্মরূপতা। কিন্তু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ যদি সত্য না হয়, (যাহা সাংখ্য বারংবার বলিয়াছেন) তাহা হইলে এই ব্রহ্মরূপতা পুরুষের কখনই অপগত হয় না। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান-ভিক্ষু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় না, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ বাস্তবিকই হয়, এবং তাহাতে পুরুষে মালিন্য-সৃষ্টি হয়। "ব্রহ্মত্বমেব পুরুষাণাং স্বভাবঃ, নৈমিত্তিকত্বাভাবাৎ। স্ফটিকস্য শৌক্ল্যমিব। বুদ্ধিবৃত্তি-সম্বন্ধকালে তু পরিচ্ছিন্ন-চিদ্-রূপত্বেনাভিব্যক্ত্যা পরিচ্ছেদা-

ভিমানঃ, তথা বুদ্ধি-প্রতিবিম্ববশাৎ দুঃখাদিমালিন্যমিব চ ভবতি, ইতি তৎ সর্ব্বমৌপাধিকমেব।" "ব্রহ্মত্ব পুরুষদিগের স্বভাব, স্ফটিকের শুক্লতার মতো। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সম্বন্ধকালে পরিচ্ছিন্ন চিদ্রূপে অভিব্যক্তি বশতঃ পুরুষের আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অভিমান হয়; বুদ্ধির প্রতিবিম্ব-পতনের ফলে (পুরুষে) দুঃখাদি মালিন্য যেন (ইব) হয়। সকলই ঔপাধিক।" কিন্তু যোগশাস্ত্রের "বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র" এই সূত্রানুসারে পুরুষেরও বুদ্ধির মতই বৃত্তি হয়। ফলতঃ এই বৃত্তি-সারূপ্য স্বীকার না করিলে "সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি হয়," এই বচনের কোনও যুক্তিসম্মত অর্থ থাকে না। বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁহার উপরিউদ্ধৃত ব্যাখ্যায় একবার পুরুষের পরিচ্ছিন্নতা স্বীকার করিতেছেন, পরিচ্ছেদাভিমান স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু শেষে "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন যে, দুঃখাদিমালিন্য "যেন" হয়। সমাধি ও সুষুপ্তির সহিত মোক্ষের ভেদ এই যে সমাধিও সুষুপ্তিতে বন্ধের বীজ থাকে, মোক্ষে সে বীজেরও ধ্বংস হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ সত্য। তাহার ফলে পুরুষে ভ্রান্তির উদ্ভব হয়, এবং পুরুষ আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। এই ভ্রান্তি যখন বিদূরিত হয়, তখন পুরুষ আপনার প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হয়, এবং ভ্রান্তি-সম্ভূত দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। ইহাই বন্ধ ও মুক্তির অর্থ। পুরুষ সত্যই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, ইহা স্বীকার না করিলে, সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজনই থাকে না। সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থার যেমন অস্তিত্ব আছে, তেমনি মোক্ষও আছে। সুষুপ্তি ও সমাধি উভয়েরই "দোষযোগ" আছে। কেননা, উভয় অবস্থাতেই আত্মার গুণসঙ্গ থাকে, এবং সুষুপ্তি ও সমাধি উভয় অবস্থার কোনটাই প্রধানের বাধা জন্মাইতে পারে না, কেননা উভয়ই প্রধানের অন্তর্গত। কিন্তু উক্ত অবস্থাদ্বয়ে কোনও বাসনার উদ্রেক হইয়া কোনও বিষয়ের জ্ঞান হয় না। মোক্ষ অর্থাৎ বন্ধন হইতে মুক্তি "অস্তিত্বের পাশ" হইতে মুক্তি নহে। আত্মা যখন অবিনাশী তখন মোক্ষে তাহার নাশ হইবে কেন? মোক্ষ হইলে নাশ হয় জীবের। আত্মনাশ কেহই চাহে না, সুতরাং পুরুষও তাহা চাহে না। কিন্তু "দুঃখত্রয়াভিঘাতে" অবসন্ন জীব তাহা চাহে কি? জীব মোক্ষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংস জীবের কাম্য কি?

পুরুষ নির্গুণ। সুতরাং "ন আনন্দাভিব্যক্তিঃ মুক্তিঃ (সাং সূ ৫।৭৪)।" মুক্তিতে আনন্দের অভিব্যক্তি হয় না। আবার পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাহার গতি নাই। সুতরাং "ন বিশেষগতিঃ নিষ্ক্রিয়স্য" (সাং সূ ৫।৭৬)। ব্রহ্মলোক অথবা অন্য কোনও লোকে গমন মোক্ষ নহে। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীদিগের মত এই

যে আত্মা ক্ষণিক জ্ঞানমাত্র। বিষয়কর্তৃক তাহার উপরাগের উচ্ছেদও মোক্ষ নহে। কেননা আত্মা ক্ষণিক জ্ঞানমাত্র নহে। "ন ভাগিযোগো ভাগস্য" (সাং সূ ৫।৮১) ঈশ্বরের অংশরূপ জীবের ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়াও মোক্ষ নহে। কেননা সংযোগ বিয়োগান্ত; ঈশ্বরের সহিত যোগ হইলে তাহার বিয়োগও হয়।" ধন-জন-যৌবন প্রভৃতি ইতর ঐশ্বর্য্যের ন্যায় অণিমাদি যোগজ ঐশ্বর্য্যের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী, তাহাও মোক্ষ নহে। ইন্দ্রত্বাদি পদও নশ্বর, সুতরাং তাহার প্রাপ্তিও মোক্ষ নহে। মোক্ষ অর্থে সেই দুঃখাতীত অবস্থা, যাহার বিনাশ নাই। এ সকলই মোক্ষের নেতিবাচক বর্ণনা। ইহার ভাববাচক বর্ণনা একটু পাওয়া যায় সাংখ্যকারিকার ৬৪ সূত্রে।

এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি, নমে, নাহম্ ইত্যপরিশেষম্
অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।

এইরূপ তত্ত্বাভ্যাসের ফলে বুদ্ধির বিপর্য্যয় দূর হয়, এবং আমি দেহাদি নহি আমার কেহ নাই, এবং কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া "আমি" কেহ নাই, এই প্রকার বিশুদ্ধ নির্ম্মল আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান কাহার? পুরুষের যদি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে তাহাতে এই জ্ঞান ছিল না বলিতে হয়. অর্থাৎ পুরুষের বন্ধ হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। অহংকারমুক্ত জীবের এই জ্ঞান হয়, ইহা বলা অর্থহীন, কেননা প্রথমতঃ অহংকারের ধ্বংসের সঙ্গে বন্ধন মুক্ত জীবেরও বিনাশ হয়। দ্বিতীয়তঃ আমি দেহ নহি, আমার কিছুই নাই—এ সকল কথা-পুরুষের পক্ষে সত্য হইলেও হইতে পাবে, জীবের পক্ষে নহে। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব যখন অবিদ্যা-মুক্ত হয়, তখন তো তাহার অস্তিত্বই নাই। গীতায় যোগের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে চিত্তের নিরোধ হয়, আত্মা আপনাকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ-লাভ হয়, আত্মা স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় না; অন্য কোনও লাভকেই লাভ বলিয়া মনে হয় না, মহৎ দুঃখেও আত্মা বিচলিত হয় না; ইহাই দুঃখ-সংযোগ-বিযুক্ত অবস্থা, ইহাই সমাধি। এই অবস্থা পরম আনন্দের অবস্থা। ইহাই ব্রহ্মরূপতা, কিন্তু ইহা সাংখ্যের মোক্ষ নহে। সাংখ্যের মোক্ষ আনন্দের অবস্থা নহে। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।" (তৈত্তিরীয় উপ)। ব্রহ্ম সুখস্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মরূপতা আনন্দপূর্ণ অবস্থা। সাংখ্যের পুরুষ ব্রহ্ম নহে, কেন না ব্রহ্ম এক, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। কিন্তু পুরুষ বহু, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতি তাহার পার্শ্বে অবস্থিত। সাংখ্যের ৫।১১৬ সূত্রে "ব্রহ্মরূপতা" শব্দের ব্যবহার হইতে মনে

হয়, এই সূত্র প্রাচীন কাপিল সূত্রাবলীর অন্তর্গত ছিল, এবং কপিল প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবাদীই ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে সাংখ্যদর্শন হইতে ব্রহ্ম বর্জ্জিত হইয়াছেন। চরক সংহিতার প্রথমেই যে দর্শন বিবৃত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন সাংখ্যদর্শন। তাহাতে অব্যক্তকে পুরুষ বলা হইয়াছে। এই অব্যক্ত পুরুষই ব্রহ্ম। তাহা হইতেই জগৎ উদ্ভূত হয়। তিনি "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং, একো বহূনাং বিদধাতি কামান্, তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং, জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বাপাপৈঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উপ, ৬।১৩) এই সাংখ্য-যোগাধিগম্য দেব পরবর্ত্তী সাংখ্যদর্শন হইতে বর্জ্জিত হইয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে।

চিতিশক্তি অপরিণামী এই যুক্তিতে সাংখ্যের ভাষ্যকারগণ পুরুষের সহিত প্রকৃতির প্রকৃত যোগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। বন্ধ যে পুরুষের হয়, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। বন্ধ ও মোক্ষকে বাঙ্‌মাত্র বলিয়াছেন। কিন্তু চিত্তস্থিত দুঃখকে পুরুষ নিজের দুঃখরূপে অনুভব করে, অহংকার-সমন্বিত হইয়া লিঙ্গশরীরের জরা-মরণ-সংসৃতির দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া ভোগ করে, ইহা স্বীকার করিলে বন্ধ ও মোক্ষকে বাঙমাত্র বলিবার কারণ থাকে না। ইহা স্বীকার না করিলে "জীব" পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বস্তু—চৈতন্যের আভাসপ্রাপ্ত লিঙ্গদেহ, এবং মোক্ষ অর্থে তাহার ঐকান্তিক বিনাশ। ঈদৃশ মোক্ষ কাহারও কাম্য হইতে পারে না।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "প্রকৃতির খেলা যখন শেষ হয়, তখন তাহার অভিব্যক্ত অবস্থা অনভিব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায়। তখন পুরুষ হয় দ্রষ্টা, কিন্তু দর্শন করিবার কিছুই থাকে না; পুরুষ দর্পণে পরিণত হয়, কিন্তু তাহাতে প্রতিফলিত হইবার কিছুই থাকে না। প্রকৃতির বন্ধন হইতে পুরুষ চিরকালের জন্য মুক্ত হয়, প্রকৃতির সংস্পর্শে আর কলুষিত হয় না। কালাতীত শূন্যের মধ্যে শুদ্ধ চিদ্রূপে অবস্থান করে।* মুক্ত পুরুষের দৃশ্য যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে ৬৪ কারিকায় যে অপরিশেষ বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সে জ্ঞান কিসের? প্রকৃতপক্ষে মোক্ষে পুরুষ কি বাস্তব চৈতন্য হইতে চৈতন্যের শক্যতামাত্রে পরিণত হয়? প্রকৃতির স্পর্শে তাহার যে জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার ও তাহার সংস্কারের বিলোপের ফলে সে কি জ্ঞানহীন অবস্থায় পরিণত হয়? সাংখ্যের ভাষ্য অনুসারে এই মীমাংসা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে বটে। কিন্তু

* Ind. Philosophy vol II, P. 313

পুরুষ অনাদিকাল হইতে প্রকৃতির পাশে বদ্ধ; বুদ্ধিদ্বারা তাহার জ্ঞানশক্তি সংরুদ্ধ। বুদ্ধির বাধা বিদূরিত হইলে পুরুষ অতিমানসিক (Supra-mental) জ্ঞান লাভ করে। সেই অতিমানসিক জ্ঞানই অপরিশেষ বিশুদ্ধ ও কেবল জ্ঞান। সে জ্ঞান কিরূপ, তাহার কোনও ধারণাই আমাদের নাই। সম্ভবতঃ তাহা যোগদর্শনে ঈশ্বরের যে সর্ব্বজ্ঞতার কথা আছে তাহারই অনুরূপ, রজস্তমো-রহিত-বিশুদ্ধ-চিত্ত-সত্ত্বাশ্রয়ী-জ্ঞান। সে জ্ঞান বৌদ্ধ জ্ঞান অপেক্ষা উন্নততর। ইহা স্বীকার করিলে সাংখ্যের অসংগতি বহু পরিমাণে বিদূরিত হয়।

২৫

সাংখ্য ও বেদান্ত

সাংখ্যদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে পরস্পরের খণ্ডনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় দর্শনের মধ্যে একটি সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। কিন্তু গীতায় ব্যাখ্যাত দর্শনের সঙ্গে সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য প্রবচন সূত্রে বিবৃত দর্শনের সমন্বয়-সাধন অসম্ভব। ঈশ্বর বেদান্তের আদি, অন্ত ও মধ্য। যে দর্শনে ঈশ্বরকে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বেদান্তের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টাকে অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। এই প্রচেষ্টাকে সফল করিতে হইলে প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে "ঢালিয়া সাজিতে" হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বেদান্তে ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জীব-সমন্বিত জগৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্মকর্ত্তৃক বিধৃত এবং পরিণামে ব্রহ্মেই বিলীন হয়, ইহাই বেদান্তের মত। সাংখ্যমতে অচেতন প্রকৃতি হইতেই জগতের উদ্ভব। বেদান্তে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই একমাত্র পুরুষ; সাংখ্য মতে পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। সাংখ্যমতে জগৎ সত্য, বেদান্ত (শাঙ্কর) মতে জগৎ মিথ্যা। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েই অবিদ্যার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষের অভেদ-জ্ঞানই অবিদ্যা; বেদান্ত মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ-জ্ঞান অবিদ্যা। এইরূপ বিরুদ্ধবাদী দর্শনের সমন্বয় হইবে কিরূপে?

বেদান্ত দর্শন মুখ্যতঃ শব্দ-প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্য শব্দকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার যথোচিত ব্যবহার করেন নাই। করিলে ঈশ্বর প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিতে পারিতেন না। সমগ্র উপনিষৎ তো ঈশ্বরের কথায় পূর্ণ। তবুও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই? সাংখ্য

সূত্রে "ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (৩।৫৭) সূত্রে যে ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, তিনি ঈশ্বর নহেন, সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবমাত্র। প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে যে ভাবে জগতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনও স্থানই নাই। প্রাচীন সাংখ্য উপনিষদ হইতে উদ্ভূত হইলেও, প্রচলিত সাংখ্য উপনিষদ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বেদান্তের ব্রহ্মকে বর্জ্জন করিয়া সাংখ্য তাহার স্থানে পুরুষকে বসাইয়াছেন। কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং—ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু। সাংখ্য জানেন যে কেবলমাত্র অচেতন প্রকৃতিদ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, কেননা অচেতন প্রকৃতি হইতে কেবলমাত্র অচেতন বস্তুই উদ্ভূত হইতে পারে, চৈতন্য ও তাহার প্রকাশ—জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার উদ্ভব অসম্ভব। জগতে বর্ত্তমান চৈতন্যের ব্যাখ্যার জন্য সাংখ্যের চেতন পুরুষের প্রয়োজন হইয়াছিল। চৈতন্যের অধিষ্ঠান বহু জীবের অস্তিত্ব হইতে সাংখ্য পুরুষ-বহুত্ব অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পুরুষের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা হইতে পুরুষের বহুত্ব কল্পনা করা যায় না। সাংখ্য মতে পুরুষদিগের মধ্যে কোনও ভেদই নাই; তাহারা একরস, সকলেই চিৎ-স্বরূপ, সকলেই অন্য-নিরপেক্ষ, অসঙ্গ, সকলেই বিভু। কিন্তু বহুসংখ্যক বিভু (সর্ব্বব্যাপী) ও অনন্যাপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। যেখানেই বহু, সেখানেই তাহারা পরস্পরকর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ। সাংখ্য মতে জীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বদ্বারা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের কোনও পরিণাম উৎপন্ন হয় না। সুতরাং প্রত্যেক জীবের সহিত কোনও নির্দ্দিষ্ট পুরুষের যদি কোনও সংসর্গ থাকে, তাহা হইলে সাংখ্যমতে তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। যে কোনও পুরুষের অথবা একমাত্র পুরুষের দ্বারাই যাবতীয় জীব-চৈতন্যের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির মধ্যগত বুদ্ধিতে পতিত হওয়ার ফলেই জীবের উদ্ভব হয়। সুতরাং একাধিক পুরুষ-কল্পনার কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে না। একমাত্র পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির বিভিন্ন অংশে পতিত হইয়া বহু জীবের সৃষ্টি করিতে পারে। চরক সংহিতায় পুরুষকেই অব্যক্ত বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদেও (৬।৮) এক "ব্যাপক অলিঙ্গ পরপুরুষের" কথা আছে। সাংখ্যে পুরুষের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই পর-পুরুষেই প্রযোজ্য। সাংখ্য পুরুষ-বহুত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদ্বারা জীববহুত্বই প্রমাণিত হয়, পুরুষ বহুত্ব নহে।

শঙ্কর জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। জগৎ মিথ্যা। রামানুজ ও অন্যান্য পরিণাম-বাদীদিগের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, এবং অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে। সাংখ্য জগৎকে সত্য বলিয়াছেন; এ বিষয়ে পরিণামবাদীদিগের সঙ্গে তাঁহার কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও, তাঁহার মতে অচেতন প্রকৃতি হইতেই জগৎ উদ্‌ভূত হইয়াছে। বেদান্তমতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই। সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন বস্তু জগতের উপাদান; তাহারা অচেতন এবং পুরুষ হইতে ভিন্ন। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি কেন হয়, স্পষ্ট করিয়া সাংখ্য তাহা বলেন নাই। সাম্যাবস্থার বিচ্যুতির জন্য কি পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগের অথবা পুরুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজন? প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের ভোগ-ও-অপবর্গ-সাধনের জন্য এক প্রবৃত্তি আছে, সাংখ্য বলিয়াছেন। বৎস-বিবৃদ্ধির জন্য যেমন গাভীর দুগ্ধ আপনা হইতে ক্ষরিত হয়, পুরুষের বিমোক্ষের জন্য সেইরূপ প্রধানের (প্রকৃতির) প্রবৃত্তি হয় (সাং কা ৫৭), ইহাও বলিয়াছেন। মোক্ষের জন্য প্রথমে বন্ধের প্রয়োজন। বন্ধ হয় প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইতে। এই সংযোগ কি পুরুষের ভোগ-সাধনের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তির ফল, অথবা ইহা সম্পূর্ণ আপতিক? অসংখ্য পুরুষ প্রকৃতির সহিত অস্তিত্বের রঙ্গক্ষেত্রে একত্র অবস্থিত বলিয়া তাহাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও আকস্মিক ভাবে কি তাহাদের সংযোগ সাধিত হয়? সাংখ্যকার এই দুই বিকল্পের কোনওটিই সংযোগের কারণ বলেন নাই। তাহার মতে অবিবেকই সংযোগের কারণ। সাংখ্যের অবিবেকের সহিত বেদান্তের অবিদ্যার কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদও আছে। বেদান্তের অবিদ্যা জীব ও ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান; সাংখ্যের অবিবেক প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ জ্ঞানরূপ ভ্রান্তজ্ঞান-বাসনা। কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের পূর্ব্বে কোনও জ্ঞান-বাসনার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া অবিবেককে অনাদি বলা হইয়াছে। এই অনাদি অবিবেক প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত, ইহা পুরুষের নহে। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের অর্থ প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের প্রতিবিম্বপাত। পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয় বুদ্ধিতে। এই প্রতিবিম্ববাদদ্বারা প্রকৃতিতে চৈতন্যের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিতে পারিত, পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির উপর পতিত হয় কি বুদ্ধি অহংকার, মন, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অথবা পরে? প্রকৃতি কি আপনার প্রবৃত্তির উত্তেজনায় এই সকলের উদ্ভাবন করিয়া তাহাদিগকে পুরুষের ব্যবহারের জন্য পুরুষের হস্তে অর্পণ করে? পাশ্চাত্য দার্শনিক দে-কার্ত্ত

জীবদেহকে একটি স্বতশ্চালিত যন্ত্র এবং প্রত্যেক যন্ত্র এক একটি আত্মাকর্তৃক ব্যবহৃত হয় বলিয়াছেন। সাংখ্যের মতও কি তাহাই? অথবা পুরুষের আলোক প্রকৃতির উপর পতিত হইবার পরে প্রকৃতির অভিব্যক্তির আরম্ভ হয়? অবিবেককে অনাদি বলিয়া সাংখ্য অতি কৌশলে প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছেন। অবিবেকের উৎপত্তির যখন কোনও কাল নাই, তখন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগেরও কোনও কাল নাই; সে সংযোগও অনাদি। অবিবেক ও সংযোগ এক সঙ্গেই বর্ত্তমান। অবিবেককে যে সংযোগের কারণ বলা হয়, তাহার কারণ অবিবেকের ধ্বংস ও বিবেকের উৎপত্তি হইলে সংযোগ থাকে না।

পুরুষের ভোগ-ও-অপবর্গ-সাধনের জন্য প্রকৃতির যে প্রবৃত্তির কথা সাংখ্য বলিয়াছেন, তমোভূত অন্ধ প্রকৃতির পক্ষে অন্ধভাবে সৃষ্টি করিয়া সে প্রবৃত্তির চরিতার্থতাসাধন সম্ভবপর নহে। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদিগকে পুরুষের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য প্রথমেই চিতের আলোকে তাহাদিগের উদ্ভাসিত হওয়ার প্রয়োজন। এই দিক হইতে বলা যায় পুরুষের সহিত সংযোগের পূর্ব্বে প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয় না। কিন্তু সে সংযোগ যখন অনাদি, তখন পূর্ব্বাপরের প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

বেদান্তের আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষে জ্ঞান নাই, যদিও তাহা চিৎ-স্বরূপ। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই বর্ত্তমান। জ্ঞাতায় অহংভাব বর্ত্তমান। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার মধ্যে "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞান থাকে। বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ ভিন্ন জ্ঞান হয় না। সাংখ্যের পুরুষে এই অহং জ্ঞান নাই, বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদও নাই। সুতরাং সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিকে না জানিলেও আপনাকেই যে জানেন, তাহাও বলা যায় না। সাংখ্য মতে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ হয় অহংকারসহ মহতের আবির্ভাবের পরে। প্রকৃতির সংশ্রব-বিযুক্ত পুরুষের যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সে জ্ঞানের স্বরূপ অজ্ঞাত।

সাংখ্যকারিকায় (৬৪) আছে—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি, নমে, নাহমিত্যপরিশেষম্

অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।

তত্ত্বাভ্যাসের ফলে "আমি সুখী", আমি দুঃখী" ইত্যাদি ভাব, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, ইত্যাকার মমতা বিদূরিত হইয়া বিশুদ্ধ, অপরিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই জ্ঞান তো বুদ্ধির। অহন্তা ও মমতাভাবের আধার বুদ্ধি। বুদ্ধিতে

অবিবেকের অস্তিত্ব-বশতঃ তাহার বিপরীত ভাবও উদ্ভূত হয় বুদ্ধিতে। অবিবেকের আশ্রয় যেমন বুদ্ধি, বিবেকের আশ্রয়ও তেমনি বুদ্ধিই। সুতরাং উপরোক্ত কারিকায় যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধির, পুরুষের নহে। পুরুষের জ্ঞানের স্বরূপ অজ্ঞাত।

বেদান্তমতে জগতের সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা, অর্থাৎ এক জ্ঞানবান্ পুরুষ বুদ্ধিপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

"আত্মৈব ইদম্ অগ্রে আসীৎ পুরুষবিধঃ সঃ অনুবীক্ষ্য ন অন্যৎ আত্মনো অপশ্যৎ....স বৈ নৈব রেমে...." পূর্ব্বে এই জগৎ পুরুষরূপী আত্মারূপে বর্ত্তমান ছিল। সেই আত্মা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাকে ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না।...তিনি আনন্দলাভ করিলেন না। ইহার পরে তিনি জগতের সৃষ্টি করেন (বৃহদারণ্যক উপঃ ১।৪)। সাংখ্য মতে জগৎ-সৃষ্টির প্রারম্ভেই বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। সেই বুদ্ধি হইতে জাগতিক অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি হইলেও, সেই বুদ্ধির সৃষ্টি কেহ বুদ্ধিপূর্ব্বক করে নাই। প্রকৃতি হইতে তাহা আপনিই উদ্ভূত হইয়াছিল। হয়তো বুদ্ধির আবির্ভাবের পূর্ব্বে পুরুষের দৃষ্টি প্রকৃতির উপর পতিত হইয়াছিল; কিন্তু পুরুষে বুদ্ধি ছিল না; সুতরাং সে দৃষ্টিপাত বুদ্ধিপূর্ব্বক ছিল না। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে বুদ্ধির আবির্ভাবের পরবর্ত্তী সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা। তিনি লিখিয়াছেন "বহু স্যাং প্রজায়েয় ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ তাবৎ ভূতাদিসৃষ্টেঃ অভিমান-পূর্ব্বকত্বাৎ বুদ্ধি-বৃত্তি-পূর্ব্বক-সৃষ্টৌ কারণতয়া অভিমানঃ সিদ্ধঃ।" অর্থাৎ "আমি বহু হইব," "আমি প্রজাসৃষ্টি করিব" শ্রুতি ও স্মৃতিতে ইহা আছে। সুতরাং সৃষ্টি যে অহংকারপূর্ব্বিকা, তাহা সিদ্ধ। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে "মহৎ" সমষ্টি বুদ্ধি, ব্যষ্টি বুদ্ধি নহে। সাংখ্য সূত্রের ২।৬৩ সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন, "সমষ্টিবুদ্ধ্যাদি-উপাদানিকা এব সৃষ্টি, নতু তদংশব্যষ্টি-বুদ্ধ্যাদি-উপাদানিকা, যথা মহাপৃথিব্যা এব স্থাবরজঙ্গমাদিউপাদানত্বং, নতু পৃথিব্যাংশ-লোষ্ট্রাদেঃ ইতি" অর্থাৎ সৃষ্টির উপাদান সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি বুদ্ধির অংশ ব্যষ্টি বুদ্ধি নহে; স্থাবর জঙ্গমাদির উপাদান যেমন মহাপৃথিবী, তাহার অংশ লোষ্ট্রাদি নহে।

অচেতন প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির আবির্ভাব একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার মনে হইতে পারে। কিন্তু সাংখ্য মতে বুদ্ধি ও তাহা হইতে উদ্‌ভূত জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সকলই অচেতন। পুরুষের সহিত সংযোগের ফলেই অচেতন লিঙ্গ চেতনবৎ হয়। "সোঽয়ং বুদ্ধি-তত্ত্ববর্ত্তিনা জ্ঞানসুখাদিনা তৎপ্রতিবিম্বিতঃ

তৎছায়াপত্ত্যা জ্ঞানসুখাদিমান্ ইব ভবতি।" (বাচস্পতি—৫) পুরুষের সহিত বুদ্ধির বাস্তব সংযোগ নাই ; তাহার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হয়। বুদ্ধির ছায়া আবার সেই প্রতিবিম্বে পতিত হয়, এবং বুদ্ধির সুখ-দুঃখ-জ্ঞানের সহিত সেই প্রতিবিম্বের সংযোগবশতঃ পুরুষ জ্ঞান-সুখ-দুঃখমানের মতো হয় ; এবং বুদ্ধিও চেতনের মতো হয়। এই বর্ণনার অর্থগ্রহণ নিতান্তই কষ্টকর। অচেতন বুদ্ধি, অচেতন অহংকার, অচেতন মন, অচেতন ইন্দ্রিয়, অচেতন সুখ, দুঃখ, জ্ঞান যে কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহারা কি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ মাত্র—চৈতন্য-সংসর্গহীন সন্নিবেশ মাত্র—এবং চৈতন্যের সহযোগে বুদ্ধি, অহংকার, সুখ-দুঃখাদি রূপ প্রাপ্ত হয় ? ইহাই যদি উক্ত বর্ণণার অর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রশ্ন উঠে—প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির এবং বুদ্ধি হইতে অহংকার প্রভৃতির উদ্ভব কি পুরুষ-সংযোগ ব্যতিরেকেই নিষ্পন্ন হয়, এবং অভিব্যক্তির পরে কি প্রকৃতি ইহাদিগকে পুরুষের নিকট উপস্থাপিত করে ? প্রকৃতি কি তথাকথিত জড় জগৎ সহ স্নায়ুযন্ত্র-সমন্বিত জীবদেহের সৃষ্টি করিয়া সেই স্বতশ্চালিত যন্ত্র পুরুষের ব্যবহারের জন্য তাহাকে সমর্পণ করে ? জড়বাদী দার্শনিকগণ জীবদেহ প্রকৃতির নিয়মানুসারে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করেন এবং চৈতন্যকে স্নায়ু-যন্ত্রের ক্রিয়া বলেন। চৈতন্য ও জ্ঞান তাহাদের মতে উপজাত (By-product) বা অতিরিক্ত সমুৎপাদ (Epi-phenomenon) মাত্র। সাংখ্য চৈতন্যরূপী পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বুদ্ধি-অহংকার-মন-ও-ইন্দ্রিয়সমন্বিত জীবদেহের সৃষ্টি কি তাহার মতে পুরুষ-নিরপেক্ষ ? অধ্যাপক মাক্ষমূলার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কপিল কি মনে করিতেন যে প্রতীতি (perception) ও চিন্তা (thought) পুরুষের ব্যবহারের জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো যন্ত্রমাত্র, এবং যে পর্য্যন্ত তাহা পুরুষকর্ত্তৃক ব্যবহৃত না হয়, ততক্ষণ তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো নিশ্চেষ্ট থাকে ? অথবা প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় যখন তাহার উপর পুরুষের দৃষ্টি প্রথম পতিত হয়, তখনই প্রকৃতি সক্রিয় হইয়া উঠে, এবং পুরুষদৃষ্টি-উদ্ভূত প্রকৃতির এই চেষ্টাই ত্রিগুণে আরোপিত হয় ?" মাক্ষমূলার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার প্রশ্নের অর্থ এই যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর সাম্যাবস্থার যে বিচ্যুতি হইতে প্রকৃতির অভিব্যক্তি আরব্ধ হয়, সেই বিচ্যুতি কি পুরুষের দৃষ্টির ফলে সংঘটিত হয়, অথবা তাহার অন্য কোনও কারণ আছে ? অন্য কোনও কারণের কথা সাংখ্য-কারিকা ও সাংখ্য সূত্রে নাই। আবার তাহা যে পুরুষের দৃষ্টির ফল, তাহাও

কোথাও স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু সাংখ্য সূত্রের ১।:৮ সূত্রে আছে যে, প্রকৃতি-নিমিত্ত পুরুষের বন্ধ হয় না, কেননা প্রকৃতি পরতন্ত্র। (প্রকৃতিনিবন্ধনাৎ চেৎ, ন, তস্যাপি পারতন্ত্র্যম্।) পুরুষের সহিত সংযোগের উপরই প্রকৃতির পুরুষকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে। পুরুষকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা প্রকৃতি লাভ করে তাহা হইতে মহৎ, অহংকার প্রভৃতির উদ্‌ভবের ফলে। সুতরাং প্রকৃতির বন্ধন-ক্ষমতা পুরুষের সহিত তাহার সংযোগের ফল বলিয়া সূত্রকার মহৎ, অহংকার প্রভৃতির উদ্‌ভবকে সংযোগের পরবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিতেন, ইহা মনে করা অসঙ্গত হয় না।

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় বস্তু—প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ চেতন, উভয়ের সংযোগ কিরূপে সম্ভবপর হয়? সাংখ্যকারিকার ২০ কারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি "সংযোগ" শব্দের অর্থ "সন্নিধান" বলিয়াছেন। কিন্তু পুরুষ দেশ ও কালাতীত। দেশকালাতীত বস্তুর সন্নিধানের অর্থ কি? ৬৬ কারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি সংযোগ শব্দের অর্থ "যোগ্যতা" বলিয়াছেন। পুরুষের সম্বন্ধে ভোক্তৃত্ব যোগ্যতা, প্রকৃতি-সম্বন্ধে ভোগ্যতাই যোগ্যতা। এই যোগ্যতা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষের ভোগ ও বন্ধন নাই। এক এক পুরুষকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতিই এক একটি জীবের উৎপাদন করে; সেই জীবেরই ভোগ, বন্ধন ও মুক্তি হয়। (সাং কা—৬২, ৬৩)। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম সকলেই জীব। এক অনির্ব্বচনীয় উপায়ে প্রকৃতির উপর পুরুষের আলোকপাতে আমরা প্রকৃতির মধ্যে উদ্‌ভূত হইয়াছি, এবং সুখদুঃখাদি ভোগ করিতেছি। মুক্তি অর্থে পুরুষের আলোক হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া যে চৈতন্যের আভাস আমাদের মধ্যে আছে, তাহার বিনাশ-সাধন করিয়া আত্মনাশ করা। যে যে পুরুষের আলোকে আমাদের চিত্ত আলোকিত, আমরা সেই সেই পুরুষ নহি। ইহাই সাংখ্য মত, কিন্তু ইহার সহিত গীতা অথবা বেদান্তের সামঞ্জস্য কোথায়?

অন্ধ তমোভূত প্রকৃতির পক্ষে নিজে কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। পুরুষের সেবার জন্য প্রকৃতির যে প্রবৃত্তি আছে, পুরুষের সহায়তা ব্যতীত সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে না। পুরুষের আলোকে তমোময়ী প্রকৃতি উজ্জ্বলিত হয়। এই উজ্জ্বলতা বা আলোকদ্বারা প্রকৃতি যে কেবল গ্রহণযোগ্য বা জ্ঞেয় হয় (অজ্ঞেয় অবস্থা হইতে জ্ঞেয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়) তাহা নহে; প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞাতৃত্বেরও উদ্‌ভব হয়। এই আলোকই মহৎ বা বুদ্ধি; প্রকৃতির প্রথম জাত সন্তান। এই মহতের মধ্যে অহংকার

মন, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াদি সকলই বর্ত্তমান। বুধ ধাতুর অর্থ জাগরিত হওয়া। সুপ্ত প্রকৃতি পুরুষের আলোক পাইয়া প্রবুদ্ধ হয়; তখন তাহাতে বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। এই মহৎ বা বুদ্ধি সমষ্টি-বুদ্ধি, ইনিই বেদের হিরণ্যগর্ভ—অব্যক্ত হইতে উদ্‌ভূত ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমং সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা, ভুবনস্য গোপ্তা।

(মুণ্ডক উপ ১।১।১)

এই অব্যক্ত পুরুষাবস্থ—অচেতন নহে। তিনি জ্যোতিঃ-স্বরূপ—জ্ঞান-জ্যোতিঃ। তিনি যখন প্রকাশিত হন, তখন তিনি মহৎ, সবিতারও পূজনীয়, বরেণ্য। তাহা হইতেই যাবতীয় ব্যষ্টি বুদ্ধির উদ্‌ভব এবং তাহাদ্বারা ব্যষ্টি বুদ্ধি বিধৃত। তিনিই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন। (ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ)। যে অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, সর্ব্বভূতময়, অচিন্ত্য, সনাতন তমোনুদ, স্বয়ম্ভু, অব্যক্ত ভগবান মহাভূতাদিসহ ব্যক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, ইনি সেই স্বয়ম্ভু ভগবান্, প্রাচীন সাংখ্যের মহৎ, কঠোপনিষদের মহান্ আত্মা। মহাভারতে অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে এই মহৎ তত্ত্বকে "গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী পুরাতন পরম পুরুষ" বলা হইয়াছে। বেদান্তের জ্ঞানময় অব্যক্তের এই প্রথম প্রকাশ অর্ব্বাচীন সাংখ্যে অচেতন বুদ্ধিমাত্রে পরিণত হইয়াছেন।

———

☞ সংশোধন—পূর্ব্ববর্ত্তী ৩১৭ পৃষ্ঠায় ২৬ পংক্তিতে "মাযব্যাদিষু" স্থলে পড়িতে হইবে "মায়াব্যাদিষু"। মায়াব্যাদি=মায়াবি+আদি।

যোগদর্শন

উপক্রমণিকা

যোগদর্শন পাতঞ্জল দর্শন নামেও পরিচিত। চারি পাদে বিভক্ত ১৯৪টি সূত্রে এই দর্শন বিবৃত আছে। ভাষ্যকার ব্যাসের ভাষ্যে এই সূত্রাবলী "পাতঞ্জল সাংখ্য প্রবচন সূত্র" নামে অভিহিত। "কাপিল সাংখ্যসূত্র" নামে পরিচিত সূত্রাবলীর নামও "সাংখ্য প্রবচন সূত্র"। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, সাংখ্যদর্শনের একাধিক রূপ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান কালে প্রচলিত সাংখ্যসূত্র ও যোগসূত্র তাহাদের দুইটি। তত্ত্ব-সম্বন্ধে উভয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। বিবেক-খ্যাতি উভয় দর্শনেরই লক্ষ্য। সাংখ্য-দর্শনে বিবেক-খ্যাতি-লাভের উপায় বর্ণিত হয় নাই। যোগদর্শনে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ ইহাই উভয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্য। প্রচলিত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর। যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত। "ঈশ্বর প্রণিধান" যোগদর্শনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই জন্য যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্যও বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর-স্বীকৃতিদ্বারা উভয় দর্শনের মধ্যে কোনও মৌলিক ভেদ সূচিত হয় না। সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন উভয়েই দ্বৈতবাদী। উভয় দর্শনের মতেই সত্তা দ্বিবিধ—পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন। প্রকৃতি এক, পুরুষ বহু। এই অর্থে উভয় দর্শনকে বহুত্ববাদীও বলা যায়। সাংখ্য মতে তত্ত্ব-সংখ্যা ২৫টি। তন্মধ্যে একটি তত্ত্ব পুরুষ, যাহা সংখ্যায় বহু। অন্য ২৪টি তত্ত্ব প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভূত মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ স্থূলভূত। যোগমতে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের অতিরিক্ত আর একটি তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্ব ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরও পুরুষ—বন্ধহীন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। এই জন্য বৈশেষিক দর্শন ও ন্যায় দর্শনের মতো সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শনও সদৃশ দর্শন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

যোগদর্শনের প্রাচীনত্ব

যোগসূত্রাবলী মহর্ষি পতঞ্জলি-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রখ্যাত। এই পতঞ্জলি কে, সে সম্বন্ধে এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। পাণিনি ব্যাকরণের "মহাভাষ্য"-রচয়িতা পতঞ্জলি ও যোগসূত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি এক ব্যক্তি, ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

সংস্কৃত সাহিত্যে একাধিক পতঞ্জলির কথা পাওয়া যায়। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'অথ শব্দানুশাসনম্" এই সূত্রদ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। পাতঞ্জল সূত্রাবলীরও প্রথম সূত্র 'অথ যোগানুশাসনম্"। কিন্তু কেবল এই সাদৃশ্যদ্বারা উভয় গ্রন্থের রচয়িতা অভিন্ন, ইহা প্রমাণিত হয় না। বৈয়াকরণিক পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। যোগ-সূত্রকার যে তাঁহার পরবর্ত্তী, তাহা বলিবারও কারণ পাওয়া যায় না। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী যোগসূত্রের রচনাকাল ইহা বলা যাইতে পারে।

পতঞ্জলি যোগসূত্রাবলীর রচয়িতা হইলেও তিনিই যে যোগদর্শনের উদ্‌ভাবয়িতা ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় হিরণ্যগর্ভকেই যোগের বক্তা বলা হইয়াছে। "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা, নান্যঃ পুরাতনঃ"। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে বিবস্বান্‌কে যোগের উপদেশ করিয়াছিলেন: বিবস্বান্ মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে যোগের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনকে যোগ-সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। শ্রীকৃষ্ণ পতঞ্জলির নামের উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে যোগসূত্র যে গীতার পরবর্ত্তী, তাহা অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মসূত্র যে বর্ত্তমানে প্রচলিত বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ব্রহ্মসূত্রে যোগদর্শনের উল্লেখ আছে। "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (২।১।৩) (ইহাদ্বারা যোগমত খণ্ডিত হইল)। কিন্তু পতঞ্জলি-রচিত যোগসূত্র যে বাদরায়ণের সময় প্রচলিত ছিল, তাহা ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় না। যোগসূত্রগুলি যখনই রচিত হইয়া থাকুক না কেন, যোগদর্শন যে অতি প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগসূত্রের ভাষ্যকার ব্যাসকে অবশ্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস মনে করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ নাই। ব্যাস-উপাধিধারী বহু লোক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালেও অনেক ব্যাস আছেন। ব্রহ্মসূত্র-ও-মহাভারত-রচয়িতা, বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রহ্মসূত্রে যোগমতের খণ্ডন করিয়া যোগসূত্রের ভাষ্যরচনা করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। সম্ভবতঃ ব্যাস-উপাধিধারী অন্য কোনও যোগী এই ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভাষ্য ব্যাসভাষ্য নামে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস-ভাষ্যের রচয়িতা না হইলেও মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বে অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে আছে "যে সকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে জগতের সমুদায় পদার্থের মর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত হইয়া নির্লিপ্তভাবে বিষয় ভোগ

করেন, তাহাদিগকে কখনই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। তাঁহারা অলৌকিক শক্তি প্রভাবে অনায়াসেই বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন।" (২৫ অধ্যায়—৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)। এই অলৌকিক শক্তি যে যোগের বিভূতি তাহা সুস্পষ্ট। শান্তি পর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে (৩০১ অধ্যায়) সাংখ্যমত ও যোগমত উভয় মতকেই যথার্থ ও সাধু-সম্মত বলা হইয়াছে। তথায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, যোগদর্শনের মতে ঈশ্বর ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায় নাই। যদিও পাতঞ্জলসূত্রানুসারে ঈশ্বর-প্রণিধান সমাধি-লাভের একাধিক উপায়ের একটি মাত্র, তথাপি ইহা হইতে মহাভারতরচনার সময় যে সেশ্বর সাংখ্যদর্শন বা যোগদর্শনের একাধিক রূপের এক রূপ প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

গৌতম বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করিয়া প্রথমে এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃচ্ছ্র তপস্যা অবলম্বন করেন। ইহা হইতে বুদ্ধের সময় যৌগিক সাধনা প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমিত হয়। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী।

শ্বেতাশ্বতর ও কঠ উপনিষদের সময় যে এক প্রকার যৌগিক সাধনা প্রচলিত ছিল, উক্ত উপনিষদ্ দুইটি পড়িয়া তাহাতে সন্দেহ থাকে না। কঠোপনিষদে আছে—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে, তামাহুঃ পরমাং গতিং॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি, যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ। ৬।১০-১১

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, বুদ্ধির কোনও চেষ্টা থাকে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানিগণ পরম গতি বলেন। সেই স্থির ইন্দ্রিয়-ধারণকে যোগ বলে। তখন যোগী অপ্রমত্ত হন। কেননা যোগের উদ্ভব ও তিরোভাব উভয়ই আছে।

"শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ। ১।১৪

নিজ দেহকে অরণির মতো করিয়া, প্রণব (ওঁকার) কে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ ঘর্ষণাভ্যাসদ্বারা সাধক নিগূঢ় অগ্নিবৎ ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। ইহা এক প্রকার যোগ। উক্ত উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—

"তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। ৬।১৪

সাংখ্য (বস্তুতত্ত্ব-বিচারণ) ও যোগদ্বারা অধিগম্য সেই কারণরূপী দেবকে জানিয়া সাধক সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন। এখানে 'যোগের' স্পষ্টই উল্লেখ আছে। যোগ অর্থ চিত্ত-সমাধান। সুতরাং যোগ যে অতি প্রাচীন দর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিত্তসমাধান যে পরম সত্যের সাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

"যোগ" শব্দের অর্থ

"যুজ্" ধাতু হইতে "যোগ" শব্দের উৎপত্তি। "যুজ্" ধাতুর অর্থ "সংযোগ"-বিধান করা, ও "চিত্ত-সমাধান" করা। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ তাঁহার "পাতঞ্জল দর্শনের" অবতরণিকায় যোগ শব্দের ২৭ প্রকার অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের চারিটি এই :—

(১) আত্মায় আত্মায় সংযোগ ; (২) বস্তু-বিষয়ক চিন্তাপ্রবাহের উত্থাপন ; (৩) সমস্ত মনোবৃত্তির নিরোধ ; (৪) চিত্তের একাগ্রতা-বিধান। ইহাদের মধ্যে তৃতীয় অর্থেই পাতঞ্জল দর্শনে যোগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, (যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ ১।২), সংযোগ-বিধান অর্থে নহে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন, "অধ্যাপক ওয়েবর তাঁহার History of Indian Literature গ্রন্থে (২৩৮-৩৯ পৃঃ) যোগ শব্দের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত। তিনি বলেন, যোগমতের একটা বিশেষত্ব হইতেছে বাহ্য উপায়দ্বারা—কৃচ্ছ্র-সাধনদ্বারা—ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হওয়া। কিন্তু ঈশ্বরে লয়-প্রাপ্তির কথা যোগদর্শনে নাই। পতঞ্জলি ও কপিল উভয়েই আত্মাকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই সন্তুষ্ট। এই বিচ্ছেদের পরে আত্মা কোথায় কিরূপে থাকে, তাহা তাঁহারা বলেন নাই।" পতঞ্জলির যোগসূত্রে এবং সাংখ্যদর্শনে "ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সংযোগ" অর্থেও যোগশব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। সাংখ্য তো ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। পতঞ্জলিও ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার মিলনের কথা বলেন নাই। মাক্ষমূলারের মতে উদ্যোগ (সংযোগ নহে) অর্থাৎ প্রচেষ্টা বা চিত্তের একাগ্রতা-বিধান অর্থে যোগদর্শনে "যোগ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।* ইহাও ঠিক নহে। সূত্রকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই চিত্ত-বৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই নিরোধের জন্য অবশ্য চিত্তের একাগ্রতা-বিধানের প্রয়োজন। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের সহিত সংযোগ অর্থে "যোগ" শব্দ ব্যবহৃত না হইলেও, অনেক যোগী

---

* Six systems of Indian Philosophy P. 466.

যে ঈশ্বরের সহিত আত্মার সংযোগ-বিধানের জন্য চেষ্টা করিতেন ও করেন, তাহাও সত্য।

গীতায় যোগ শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "বুদ্ধি-যুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। এখানে "বুদ্ধি যুক্ত" শব্দে যুজ্ ধাতু সংযোগার্থে, কিন্তু "যুজ্যস্ব" শব্দে প্রচেষ্টা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"—এখানে যোগশব্দ "কর্ম্মে কৌশল" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "সাযুজ্য" মুক্তির অর্থ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের সহিত সংযোগরূপ মুক্তির কথা নাই; অন্য কিছুর সহিত যুক্ত হইবার কথাও নাই। বরং "বিয়োগের" কথা আছে। ভোজদেবের যোগসূত্রের ভাষ্যে এই কথা আছে:—"পুম্প্রকৃত্যো র্বিয়োগোঽপি যোগঃ ইত্যুদিতো যয়া" (পতঞ্জলির মতে পুরুষ ও প্রকৃতির বিয়োগই যোগ)। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে চিত্তের উপরতিকেই যোগ বলা হইয়াছে। সেই যোগে আত্যন্তিক সুখ ও দুঃখ-বিমুক্তির কথা আছে।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥
তং বিদ্যাৎ দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং।

যে অবস্থায় নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত হয় ও আত্মা আত্মাকে দর্শন করিয়া আপনাতে পরিতুষ্ট হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ-লাভ হয়, যাহাতে অবস্থিত আত্মা স্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না, যাহাকে লাভ করিয়া অন্য কোনও লাভই তাহা অপেক্ষা অধিক মনে হয় না, এবং যাহাতে অবস্থিত থাকিয়া গুরু দুঃখেও আত্মা বিচলিত হয় না, সেই দুঃখ-সংযোগ-বিহীন অবস্থার নামই যোগ। ইহা ঠিক পাতঞ্জল দর্শনের যোগ নহে। এই যোগ আনন্দের অবস্থা।

গীতায় যোগ শব্দ "নিষ্কাম কর্ম্ম" অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্—এখানে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করাই কর্ম্মে কৌশল। "সাংখ্য-যোগৌ পৃথক বালা প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ," "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং,

তৎ যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।" এই দুই স্থলেও যোগ শব্দ নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ফলতঃ যোগের বহুপ্রকার ভেদ অতি প্রাচীনকালে ছিল, এখনও আছে। পাতঞ্জল দর্শনে তাহাদের একটি বর্ণিত হইয়াছে। শাণ্ডিল্য উপনিষৎ, যোগ উপনিষৎ, ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ, হংস উপনিষৎ, অমৃতনাদ উপনিষৎ, নাদবিন্দু উপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষদে যে যোগ বর্ণিত আছে, তাহার সহিত সাংখ্যদর্শনের বিশেষ মিল নাই। শৈব ও শাক্ত দর্শনের অনুযায়ী যোগেরও পৃথক পৃথক রূপ আছে। যোগতত্ত্ব উপনিষদে চারি প্রকার যোগের আছে—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ ও রাজযোগ। এই সকল যোগের সহিত তান্ত্রিক যোগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বৈদান্তিক মতের সহিত সামঞ্জস্য-যুক্ত যোগও আছে। এই সকল মতের বর্ণনা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

যোগদর্শনের গ্রন্থাবলী

যোগ-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে। তাহাতে বিভিন্ন যোগপ্রণালী বর্ণিত আছে। যোগদর্শন-সম্বন্ধে পাতঞ্জল সূত্রাবলীই প্রধান গ্রন্থ। ইহার ব্যাস ভাষ্য অনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে রচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। ভাষ্যের বৃত্তি ভোজবৃত্তি নামে খ্যাত। ভোজবৃত্তি দশম শতব্দীতে রচিত। সাংখ্য কারিকার ভাষ্যকার বাচস্পতি মিশ্র-রচিত ব্যাসভাষ্যের টীকার নাম তত্ত্ব-বৈশারদী। সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু রচিত ব্যাসভাষ্যের টীকার নাম "যোগ বার্ত্তিক"। সপ্তদশ শতব্দীতে নাগেশ রচিত একখানা টীকাও বর্ত্তমান আছে, তাহার নাম "সূত্রভাষ্য বৃত্তি ব্যাখ্যা।" এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য-বিরচিত কাপিলাশ্রমীয় "পাতঞ্জল দর্শন" গ্রন্থে ব্যাস ভাষ্যের ভাস্বতীনামক টীকা এবং বাংলা ভাষায় প্রত্যেক সূত্রের ও ব্যাস ভাষ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। উক্ত গ্রন্থে যোগদর্শন-সম্বন্ধে ২৩ খানা গ্রন্থের নাম আছে।

১

যোগদর্শনের তত্ত্বাবলী

পাতঞ্জল দর্শনকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়—তত্ত্বাংশ ও ক্রিয়াংশ। সংখ্যদর্শনের ২৫ তত্ত্ব যোগদর্শনে গৃহীত হইয়া তাহাতে ঈশ্বর নামে একটি নূতন তত্ত্ব সংযোজিত হইয়াছে। ২৫ তত্ত্বের প্রথম প্রকৃতি স্বতন্ত্র কোনও বস্তু নহে। প্রত্যক্ষ (বাহ্য ও আন্তর) জগৎ তিনটি মূল উপাদানে গঠিত—সত্ত্ব, রজঃ ও

তমঃ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই গুণ বৈশেষিক গুণ (Quality) নহে, দ্রব্য। ইহারা বিভিন্ন গুণান্বিত এবং পরস্পরের বিরোধী। ইহাদের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি। এই সাম্যাবস্থা "অব্যক্ত" নামেও অভিহিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অপ্রকাশিত থাকে। সাংখ্যদর্শনে এই ত্রিগুণ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি কেন হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই। বিচ্যুতি হইলেই প্রকৃতি হইতে জড় ও মানসিক জগতের উদ্ভব হয়। প্রথমে উদ্ভূত হয় মহৎ অথবা বুদ্ধি। বুদ্ধি হইতে অহংকার ও পঞ্চ-তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। সাংখ্যমতে কিন্তু পঞ্চতন্মাত্র উদ্ভূত হয় অহংকার হইতে বুদ্ধি হইতে নহে। এইখানে সাংখ্য ও যোগমতে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। অহংকার বা অস্মিতা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উদ্ভূত হয়। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত আর দুইটি তত্ত্ব পুরুষ ও ঈশ্বর। সাংখ্যে ঈশ্বরের কথা নাই। তাহাতে মাত্র পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত। যোগদর্শনের তত্ত্ব-সাংখ্যা ২৬। কিন্তু ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব ঈশ্বরও পুরুষ।

প্রকৃতি ও পুরুষ

যোগ-দর্শনে প্রকৃতি হইতে অন্য ২৩টি তত্ত্বের উদ্ভব-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ—ইহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিবিধ পর্ব্ব বা অবস্থা। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ বিকারই বিশেষ। অবিশেষ হইতেছে, পঞ্চ তন্মাত্র ও অহংকার। (ষড়্ অবিশেষাঃ, তদ্ যথা শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং, রূপতন্মাত্রং, রসতন্মাত্রং, গন্ধ-তন্মাত্রং, ষষ্ঠশ্চ অবিশেষঃ অস্মিতামাত্র ইতি, এতে সত্তামাত্রস্য আত্মনো মহতঃ ষড়্ অবিশেষ পরিণামাঃ (২।১৯ ব্যাসভাষ্য)। লিঙ্গমাত্র হইতেছে মহৎতত্ত্ব। "লিঙ্গ" শব্দের অর্থ গমক বা চিহ্ন। প্রকৃতি যখন "মহৎ"-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব "মহৎ" রূপ লিঙ্গ হইতে অনুমিত হয়। এইজন্য ইহা লিঙ্গ। মহতের উদ্ভবের পূর্ব্বে প্রকৃতির অস্তিত্ব-অনুমানের কিছু ছিল না, তাই তাহা তাহার অলিঙ্গ রূপ। *

উপরোক্ত সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এই অব্যক্ত অলিঙ্গ নিঃসত্তাসত্ত্ব, নিঃসদসৎ এবং নিরসৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিঃসত্তাসত্ত্ব—অর্থাৎ ইহার সত্তাও নাই, অসত্তাও নাই। ইহার সত্তা নাই, অর্থাৎ ইহার অস্তিত্ব প্রকাশিত নহে। ইহার কোনও কার্য্যই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা

* বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণ-মাত্রাণি (২।১৯)।

"অভাবপদার্থ"ও নহে। তাহা অব্যক্ত হইলেও শক্তিরূপে বর্ত্তমান। তাহা নিঃসদসৎ—অর্থাৎ সৎও নহে, অসৎও নহে। সৎ নহে, কেননা মহৎতত্ত্বাদির মতো তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। আবার মহদাদির কারণ বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় ও অস্তিত্বহীনও নহে। এই কথাই "নিরসৎ" শব্দে পুনরুক্ত হইয়াছে। ইহা অসৎ নহে, সাক্ষাৎ জ্ঞেয় না হইলেও অনুমানগম্য।

মহৎ-তত্ত্বকে উপরোক্ত ভাষ্যে "সত্তামাত্র" বলা হইয়াছে। প্রকৃতি সৎও নহে, অসৎও নহে। কিন্তু তাহার প্রথম পরিণাম "মহৎ" সত্তামাত্র। প্রকৃতির মধ্যে তাহার বহু পরিণাম সুপ্ত থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। প্রথম পরিণামে সত্তাই কেবল ব্যক্ত হয়। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি নিত্য সংযুক্ত বলিয়া এই সত্তা চিৎএর আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া অস্মিতারূপ প্রাপ্ত হয়। "অস্মি" শব্দের অর্থ এখানে "আমি"—অব্যয় পদ। অস্মিতা অর্থ "আমি আছি" এইবোধ—সত্তামাত্রবোধ। এই বোধের বিকারই অভিমান বা অহংকার—আমি জ্ঞাতা, আমি শ্রোতা, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাকার জ্ঞান। অহংকারের বিকার একাদশ ইন্দ্রিয়। সত্তামাত্র মহৎ হইতে যেমন অহংকার, তেমনি পঞ্চ তন্মাত্রেরও উদ্‌ভব হয়।

যোগদর্শনে পুরুষকে দ্রষ্টা ও প্রকৃতিকে দৃশ্য বলা হইয়াছে। দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ চিন্মাত্র, তাহাতে জ্ঞানাদি-ধর্ম্ম নাই। এইজন্য শুদ্ধ (অপরিণামী)। তাহা হইলেও বুদ্ধির প্রত্যয়দিগকে তিনি দর্শন করেন। তিনি দৃক্-শক্তি, বিশেষণ অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট। তবুও তিনি অচেতন প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভূত অচেতন বুদ্ধিতে আবির্ভূত প্রত্যয়সকল দর্শন করেন, ইহার সম্ভব হয় কিরূপে? ইহার উত্তর ব্যাসভাষ্যে আছে—পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ দর্পণে পুরুষের প্রতিবিম্ব-সংক্রান্তির ফলে সংবিদের উদ্‌ভব হয়, ইহাই প্রতিসংবেদিত্ব। এই প্রতিবিম্ববাদ পূর্ব্বে সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, পুরুষ বুদ্ধির সরূপও নহেন, অত্যন্ত বিরূপও নহেন। বুদ্ধি পরিণামিনী অর্থাৎ অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গো, ঘট প্রভৃতি যখন তাহার সমীপে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা জ্ঞাত হয়, আবার যখন তাহারা সরিয়া যায়, তখন অজ্ঞাত হয়। সুতরাং বুদ্ধির বিষয়—জ্ঞাত ও অজ্ঞাত। কিন্তু পুরুষের বিষয় সদাজ্ঞাত। পুরুষের বিষয় বুদ্ধি। তাহা কখনও পুরুষ-কর্ত্তৃক গৃহীত, কখনও অগৃহীত—এরূপ হয় না। পুরুষের বিষয় সদাজ্ঞাত বলিয়া পুরুষের অপরিণামিত্ব সিদ্ধ হয়। বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগ চিত্তবৃত্তির নিরোধাবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থায় সর্ব্বদাই থাকে, ইহা সত্য, কিন্তু

সেই অবস্থায় বুদ্ধি অনবরত পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধির যে জ্ঞান পুরুষের হয়, তাহাও পরিবর্ত্তনশীল। এ অবস্থায় পুরুষকে কিরূপে অপরিণামী বলা হয়, তাহা বোঝা কষ্টকর।

বুদ্ধি পুরুষের অর্থ-সাধন করে, এবং ত্রিগুণা। ত্রিগুণা বলিয়াই অচেতন। আবার পুরুষ ত্রিগুণের দ্রষ্টা। এই জন্য পুরুষ বুদ্ধির সরূপ নহে। আবার অত্যন্ত বিরূপও নহে। কেননা, পুরুষ শুদ্ধ হইলেও বুদ্ধির প্রত্যয়দিগের আবির্ভাবের পরে তাহাদিগকে দর্শন করেন। ইহা তথ্য হিসাবে সত্য। কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মী চেতন ও অচেতনের সংযোগ কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা ইহাদ্বারা বোধগম্য হয় না। সাংখ্যদর্শনে এই জন্য পুরুষের সহিত বুদ্ধির প্রকৃত সংযোগ হয় না বলা হইয়াছে। (তস্মাৎ ন বধ্যতে অদ্ধা ন মুচ্যতে, নাপিসংসরতি কশ্চিৎ। সাং কা-৬২)। পুরুষ দ্রষ্টা। তাহার দৃশ্য প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি-শীল ভূতেন্দ্রিয়াত্মক। সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল, রজঃ ক্রিয়াশীল এবং তমঃ স্থিতিশীল। পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়ে পরিণত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দৃশ্য। "প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়ক্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যং" (২।১৮)। পুরুষের ভোগ-ও-অপবর্গ-সাধনই এই দৃশ্যের অর্থ বা লক্ষ্য।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের—পুরুষ ও প্রকৃতির—সংযোগ

প্রকৃতির লক্ষ্য পুরুষের ভোগ-ও-অপবর্গ-সাধন। অস্তিত্বের রঙ্গক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই বর্ত্তমান—বিভিন্নধর্ম্মী। পুরুষ মুক্ত, নিষ্ক্রিয় ও চেতন। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল ও অচেতন। প্রকৃতি চায় প্রথমে পুরুষকে বন্ধন করিতে, বন্ধন করিয়া পরে তাহাকে মুক্তি দিতে। এ একটি খেলা। এই খেলা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনাদি কাল হইতে পুরুষ প্রকৃতির জালে আবদ্ধ। অনেকে হয়তো মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু অবশিষ্ট যাবতীয় পুরুষ বদ্ধ। পুরুষের ভোগের জন্য প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগের প্রয়োজন। পুরুষকর্ত্তৃক প্রকৃতির স্বরূপের উপলব্ধিই ভোগ। ভোগের পরে দ্রষ্টার স্বরূপের উপলব্ধি অপবর্গ বা মুক্তি। "স্ব-স্বামি-শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধি-হেতুঃ সংযোগঃ (২।২৩)।" পুরুষ স্বামী; তাহার দৃশ্য তাহার স্ব। উভয়ের স্বরূপের পুরুষকর্ত্তৃক উপলব্ধির জন্যই উভয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগ হয় অবিদ্যাকর্ত্তৃক। "তস্য হেতুঃ অবিদ্যা।" সেই অবিদ্যা যখন বিনষ্ট হয়, তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগেরও নাশ হয়। এই সংযোগের নাশকে বলে "হান"। এই হানই অর্থাৎ প্রকৃতি-বিমুক্ত অবস্থাই পুরুষের কৈবল্য। প্রকৃতি ও

পুরুষের সংযোগ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে সাংখ্যদর্শনে করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

যোগের প্রয়োজন

জগতে যাবতীয় বস্তুই দুঃখপ্রদ। পরিণাম-দুঃখ, তাপ-দুঃখ, সংস্কার-দুঃখ, এবং তিন গুণ পরস্পরকে অভিভূত করে দেখিয়া বিবেকী ব্যক্তি এ জগতে সমস্ত বস্তুই দুঃখময় বলিয়া জানেন। এই বিপুল দুঃখরাশি হইতে মুক্ত হইবার উপায়ের উপদেশ করাই যোগদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখের উৎপত্তি হয় চিত্তে। বিষয়ের সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত বিষয়াকারে আকারিত হয়। চিত্তের এই পরিণাম বা পরিবর্ত্তন অনবরত সংঘটিত হইতেছে। এই পরিণামই চিত্তের বৃত্তি। ইহাকে "জ্ঞান"ও বলা যায়। চিত্তের এক প্রকার বৃত্তিই দুঃখ। দুঃখনিবৃত্তির জন্যই যোগের প্রয়োজন।

২

চিত্তবৃত্তি

চিত্তের বৃত্তি পাঁচপ্রকার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। চিত্তের যাবতীয় অবস্থাকে এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। আবার এই সকল বৃত্তিকে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই দুই ভাগেও ভাগ করা যায়। যে সকল বৃত্তিকে প্রমাণ বলা যায়, তাহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান, অথবা আগম। আমাদের জ্ঞানের এই তিন উৎস। এই তিন প্রকার জ্ঞান-কালে মনের যে অবস্থা হয়, তাহাই প্রমাণ। বিপর্য্যয় বৃত্তি মিথ্যাজ্ঞান। বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্ অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠম্ (১।৮)। যাহা তাহার রূপ নহে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহাই বিপর্য্যয়। ইহার পাঁচ প্রকার ভেদ। বিকল্প হইতেছে শব্দ-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন বস্তু-শূন্য চিত্তবৃত্তি। "শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তু-শূন্যো বিকল্পঃ।" "নরশৃঙ্গ" একটি শব্দ। ইহার অনুরূপ কোনও বস্তু নাই। এই শব্দ-জ্ঞান বস্তুশূন্য। এই শব্দ শুনিয়া যে জ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই বিকল্প। বিকল্প একপ্রকার চিন্তা, কিন্তু অযথা চিন্তা। বিকল্প শব্দের অর্থ "প্রপঞ্চ" এবং "কল্পনায় আরোপও" হয়। "নির্বিকল্প সমাধিতে" বিকল্প শব্দের অর্থ প্রপঞ্চ। "বৈকল্পিক রূপ" শব্দে শেষোক্ত অর্থ। কিন্তু উপরি উক্ত সূত্রে উক্ত শব্দে চিত্তের উপরি বর্ণিত বৃত্তিই বুঝায়। নিদ্রা-বৃত্তির অবলম্বন "অভাব"। অভাব-প্রত্যয়াবলম্বনা বৃত্তিঃ নিদ্রা (১।১০)। তমঃ বা অজ্ঞানই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন। নিদ্রাকালে একেবারেই

যে জ্ঞান থাকে না, তাহা নহে। জাগরিত হইলে স্মরণ হয়, যে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। তখন সত্ত্বগুণ আচ্ছাদিত থাকে এবং তমোগুণের উদ্রেক হয়। সেই সময়ের চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ (১।১১)। অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ তাহাই স্মৃতি। "অসম্প্রমোষ" শব্দের অর্থ অস্তেয় বা নিজস্ব মাত্রগ্রহণ, পরস্বের অগ্রহণ। পূর্ব্বে যাহার অনুভূতি হইয়াছে, তাহার সংস্কার হইতে যে মনোবৃত্তিতে অনুভূত বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুই গৃহীত হয় না, তাহাই স্মৃতি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে চিত্তবৃত্তিদিগকে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই দুই ভাগেও বিভক্ত করা যায়। ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ইহাদের মধ্যে অবিদ্যা হইতে অন্য চারি প্রকার ক্লেশের উদ্‌ভব হয়। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ আবার প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার-ভেদে চারি প্রকার। তাহারা কখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় শক্তিরূপে থাকে। তখন তাহারা প্রসুপ্ত বা প্রলীন। যখন বাসনা বা সংস্কার-রূপে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, তখন বিচ্ছিন্ন ; যখন প্রকাশিত অবস্থায় থাকে তখন উদার। "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখাত্ম-খ্যাতিরবিদ্যা' (২।৫)। যাহা অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মপদার্থ. তাহাকে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মপদার্থ (আমি বা আমার) বলিয়া মনে করার নাম অবিদ্যা। আবার যাহা কোনও একটি বিশেষ বস্তু নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া মনে করার নাম ও (অতস্মিন তদ্‌বুদ্ধিঃ) অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই যাবতীয় অনর্থের বীজ। দৃকশক্তি (পুরুষ) এবং দর্শনশক্তি (বুদ্ধি) এই উভয়কে অভিন্ন মনে করাই অস্মিতা। দৃকশক্তি দর্শন-শক্তির সহিত একীভূতের মতো প্রকাশিত হয় ; সেই একীভাবপ্রাপ্তির নাম অস্মিতা। বুদ্ধি ও পুরুষ ভিন্ন। কিন্তু বুদ্ধি পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহাই অস্মিতা। যে সুখ ভোগ করা হইয়াছে, তাহা পুনরায় ভোগ করিবার জন্য যে তৃষ্ণা, তাহাই "রাগ"। যে দুঃখ ভোগ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি জিঘাংসা, ক্রোধ বা বিতৃষ্ণাই দ্বেষ। বারংবার জন্মমরণ-দুঃখের সংস্কার হইতে উদ্‌ভূত যে মরণ-ভয়, তাহাকে অভিনিবেশ বলে। পণ্ডিতদিগেরও এই ভয় আছে। চিত্তের প্রত্যেক বৃত্তিরই এক একটা ছাপ চিত্তে অঙ্কিত হয়। এই ছাপের নাম সংস্কার। কৃত কর্ম্মের অনুভব হইতে যে সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, এবং নূতন রাগ-দ্বেষাদি-রূপ কর্ম্মবীজ জন্মে, তাহাকে কর্ম্মাশয় বলে। ইহাকে অদৃষ্ট, পাপ-পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মও বলে। সেই সকল সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের প্রেরণাতেই জীব পুনরায়

সেইরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়। কর্ম্মাশয় একপ্রকার শক্তি বা গুণ এবং ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া জীবের পুনঃ পুনঃ অবস্থান্তর-প্রাপ্তি ঘটায় এবং নূতন রাগ-দ্বেষাদির বীজ উৎপাদন করে। ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয়ের ফল কথনও ইহ জন্মে উদ্‌ভূত হয় কথনও জন্মান্তরে। কর্ম্মাশয় থাকিলেই, তাহার বিপাক অর্থাৎ ফল—জাতি অর্থাৎ জন্ম, আয়ু অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবিত কাল এবং ভোগ—হইতেই হইবে। "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" (২।১৩)। ইহার ফল আহ্লাদ ও পরিতাপ। পাপ ও পুণ্য হইতেই হ্লাদ ও পরিতাপ উদ্‌ভূত হয়। যেরূপ জন্ম, যেরূপ আয়ু ও যেরূপ ভোগ-লাভ হউক না কেন, কর্ম্মফল আহ্লাদ ও পরিতাপ হইতে মুক্তি নাই। তাই বিবেকী জগৎকে দুঃখময় বলিয়া জ্ঞান করেন। এই দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় নির্দেশই যোগদর্শনের লক্ষ্য।

দুঃখ-মুক্তির উপায়

জীবনের সহভাবী দুঃখ হইতে মুক্তি-লাভের উপায় যোগ। যোগ শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ (১।১)।

করণ দুইপ্রকার—বাহ্য করণ ও অন্তঃকরণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাহ্য করণ। বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিনটি অন্তঃকরণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়সকল অন্তঃকরণদিগের নিকট উপস্থাপিত করে। এই বিষয়সকলের উপর অন্তঃকরণদিগের ক্রিয়া হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধি ও অহংকার-সমন্বিত মনই চিত্ত। চিত্তের সম্মুখে যাহা উপস্থিত হয়, চিত্ত তদাকারে পরিণত হয়। এই পরিণাম-প্রাপ্তি চিত্তের অনবরত হইতেছে। ইহাই চিত্তের বৃত্তি। চিত্তের বৃত্তি-নিরোধ, বা তাহার ক্রিয়ানিরোধ করিয়া তাহাকে নির্জীব করিয়া রাখা এবং বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার সংস্পর্শ বন্ধ করার নামই যোগ। পাঁচটি অবস্থায় চিত্ত থাকিতে পারে। প্রথমতঃ ক্ষিপ্ত। মনের অস্থির অথবা চঞ্চল অবস্থাই ক্ষিপ্ত অবস্থা। এই অবস্থায় মন এক বিষয়ে স্থির থাকে না। দ্বিতীয়তঃ মূঢ় অবস্থা। যে অবস্থায় কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া মন কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হয়, অথবা নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্যের অধীন থাকে, তাহা মূঢ় অবস্থা। তৃতীয়তঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থা। বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত ক্ষিপ্ত অবস্থার পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত অবস্থায় মন মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়। যথন চিত্ত সুখাস্বাদে মগ্ন থাকে, তথন স্থির হয়। কিন্তু এই স্থৈর্য্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। চতুর্থ অবস্থা একাগ্র অবস্থা। এই অবস্থায়

কোন বিষয়ে মন নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অচঞ্চল অবস্থায় বদ্ধ থাকে। তখন রজঃ ও তমঃ সত্ত্বকর্ত্তৃক অভিভূত থাকে। পঞ্চম অবস্থা নিরুদ্ধ অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্তের কোনও অবলম্বনই থাকে না, তখন তাহার কোনও বিসদৃশ পরিণাম হয় না। এই অবস্থার নামই যোগ। একাগ্র অবস্থাও এক প্রকার যোগ। তাহার নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। নিরুদ্ধ অবস্থার যোগের নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সময় দ্রষ্টা বা পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন। দ্রষ্টার স্বরূপ চিতিশক্তিমাত্র। অন্য সময়ে পুরুষের স্বরূপ চিতিশক্তি যে বিলুপ্ত হয়, তাহা নহে। তবে তখন বুদ্ধির বৃত্তির সহিত তাঁহার বৃত্তির একরূপতা হয়, অর্থাৎ স্বরূপতঃ বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন হইলেও, তাহার সহিত তিনি অভিন্ন হন। বুদ্ধি যে জানিতে পারে, চৈতন্য ব্যতিরেকে সেই জানা সম্ভবপর হয় না। পুরুষের স্বরূপ চিতিশক্তি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত বিষয়ের সংস্পর্শে আসে, এবং এই সংস্পর্শ হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। নিরোধ অবস্থায় বুদ্ধির ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়। তখন পুরুষের কেবল স্বরূপে অবস্থান ঘটে। কৈবল্য অবস্থায় পুরুষের এই অবস্থা হয়।

পুরুষ যখন বুদ্ধিসংস্পর্শ-বিচ্যুত হ'ন, তখন বুদ্ধিতে যে যে বিষয় উদিত হইবার ফলে দুঃখের অনুভূতি হয়, তাহাদের সহিত পুরুষের সংস্পর্শ হয় না। সুতরাং দুঃখের উৎপত্তিও হয় না। দুঃখের কারণ বুদ্ধিতে উদিত হইলেও তাহাদের বোধ, এবং তাহা হইতে দুঃখের অনুভূতি পুরুষেরই, কেননা বুদ্ধির বোধ-শক্তিও নাই, অনুভূতি-শক্তিও নাই। পুরুষকে বুদ্ধির সংস্পর্শ হইতে মুক্ত করিয়া দুঃখের উদ্ভব অসম্ভব করাই যোগের লক্ষ্য। তাহাই দুঃখ-মুক্তির উপায়। তাহার জন্য যাহার প্রয়োজন, তাহা পরে বর্ণিত হইবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। চিত্তনদী দুইদিকে প্রবাহিত—কল্যাণের দিকে ও অকল্যাণ বা পাপের দিকে। তাহার যে গতি বিবেকবিষয়-চালিত হইয়া কৈবল্য পর্য্যন্ত প্রবাহিত, তাহা কল্যাণবহা। যে গতি অবিবেকবিষয়-চালিত এবং সংসার পর্য্যন্ত প্রবাহিত, তাহা পাপবহা। বৈরাগ্যদ্বারা বিষয়-স্রোত মন্দীভূত হয়, এবং বিবেকাভ্যাসদ্বারা বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়। অভ্যাস কাহাকে বলে? বৃত্তিরহিত চিত্তের যে প্রশান্তবাহিতা স্থিতি, তাহার জন্য যে প্রযত্ন বা উৎসাহ, অর্থাৎ সেই স্থিতিলাভের জন্য যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, তাহার নামই অভ্যাস। সেই অভ্যাস দৃঢ় করিতে হইলে দীর্ঘকাল যাবৎ অনবরত অতি আদরের সহিত তাহার সেবা করিতে হয়।

বৈরাগ্য কাহাকে বলে? দৃষ্টবিষয় অর্থাৎ স্ত্রী, অন্নপান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে, এবং আনুশ্রবিক (বৈদিক) অর্থাৎ বেদোক্ত স্বর্গ, বিদেহলয়, প্রকৃতি-লয়-প্রাপ্তি, প্রভৃতি ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে বিতৃষ্ণাই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের নাম বশীকার। আর পুরুষ-খ্যাতি অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিবার পরে গুণ-বিতৃষ্ণারূপ যে বৈরাগ্য, অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ স্বরূপ প্রকৃতির প্রতি যে বৈরাগ্য, তাহাই "পর বৈরাগ্য"।

৩

সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ

ভাবনার বা চিত্ত-সমাধানের বিষয় সংশয়-বিপর্য্যয়-রহিত ভাবে যে সমাধিতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। উক্ত যোগ চারি প্রকার—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। ভাবনার বিষয় যদি স্থূল হয়, তাহা হইলে তাহার সাক্ষাৎকারী প্রজ্ঞার নাম বিতর্ক। স্থূল দুই প্রকারের হইতে পারে—বাহ্য স্থূল অর্থাৎ পঞ্চভূত, এবং আধ্যাত্মিক স্থূল বা ইন্দ্রিয়গণ। বাহ্য স্থূলের সাক্ষাৎকার যে সমাধিতে হয়, অর্থাৎ বাহ্য বস্তুতে মন সমাধান করিয়া তাহার সাক্ষাৎকার-লাভ হয়, তাহাই সবিতর্ক সমাধি। আবার সূক্ষ্মও দুই প্রকার—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। পঞ্চ তন্মাত্রগণ বাহ্য সূক্ষ্ম এবং অহংকার ও বুদ্ধিতত্ত্ব, আত্মা ও ঈশ্বর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম। বাহ্য কোনও সূক্ষ্ম বস্তুতে মন সমাধান করিয়া তাহার সাক্ষাৎকার যে সমাধিতে হয়, তাহা সবিচার সমাধি। আধ্যাত্মিক স্থূলে মন-সমাধানের ফলে তাহার সাক্ষাৎকার হইলে, সেই সমাধির নাম সানন্দ সমাধি। আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মে, অর্থাৎ বুদ্ধি-সংবলিত পুরুষে মন সমাধান করিয়া তাহার সাক্ষাৎকার-লাভ হইলে সেই সমাধিকে সাস্মিত সমাধি বলে।

সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত—ইহারা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতেছে চিত্তের সম্পূর্ণ নিরোধ। তখন চিত্ত সংস্কারমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যোগীদিগের সকলেই যে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ অবলম্বন করেন, তাহা নহে। কেহ কেহ পঞ্চ মহাভূতের কোনটিতে অথবা ইন্দ্রিয়ে তাহাদের চিত্ত-সমাধান করেন। দেহপাতের পরেই তাঁহারা সেই মহাভূতে অথবা ইন্দ্রিয়ে লীন হইয়া থাকেন। ইহাদিগকে বিদেহলয়ী বলে। আবার কেহ প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার অথবা পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে কোনও একটিতে চিত্ত সমাহিত করেন।

তাঁহারা দেহান্তে অষ্টপ্রকৃতির যেটিতে চিত্ত-সমাধান করেন, তাহাতে লীন হয়। ইহাদিগকে প্রকৃতি-লয়ী বলে। উক্ত বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী কৈবল্যলাভ করেন না। তাহাদের সমাধি অজ্ঞানমূলক। কিন্তু যাহারা মুক্তিকামী, তাঁহারা শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত যোগদ্বারা মুক্তি-লাভ করেন। তাহাদের যোগকে "উপায় প্রত্যয়" বলে। "উপায় প্রত্যয়" অর্থ শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়দ্বারা উৎপন্ন। সমাধি একদিনে হয় না। যাহাদের ক্রিয়াদ্বারা সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, তাহাদের সেই দৃঢ়ীভূত সংস্কার (সংবেগ) তীব্র হইলে সমাধি আসন্ন ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই তীব্র সংবেগেরও ভেদ আছে—মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র। তীব্রতার তারতম্য অনুসরে সমাধি-প্রাপ্তির কালেরও তারতম্য হয়।

সমাধি-লাভের আর একটি উপায় আছে। গ্রহীতা (বুদ্ধি), গ্রাহ্য (বিষয়) ও গ্রহণ (ইন্দ্রিয়) এই তিনের ধ্যানে চিত্তকে একাগ্র করিয়া একাগ্রভূমিক সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-লাভ করা যায়। ইহা ব্যতীত চিত্তকে একাগ্র করিয়া, সেই অবস্থায় স্থিতি-লাভ করিবার অন্য এক উপায় হইতেছে "ঈশ্বর প্রণিধান" "প্রণিধান" শব্দের অর্থ ভক্তিবিশেষ। অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া তাঁহাতে আত্মনিবেদন এবং সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণ এই ভক্তির স্বরূপ। যাবতীয় কর্ম্ম যেন ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া করিতেছি, এইরূপ অহরহঃ অনুভব করাই ঈশ্বরে কর্ম্ম-সমর্পণ। সাধকের এতাদৃশ ভক্তি ঈশ্বরকে সাধকের অভিমুখী করে, এবং ঈশ্বর সাধকের ইচ্ছা পূর্ণ হউক এইরূপ "অভিধ্যান" করেন, তাহাতে সাধকের সমাধিপ্রাপ্তি হয়। ফলতঃ যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু ধ্যান করিলেই চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। চিত্ত হইতে যখন অন্য সকল প্রত্যয় বিদূরিত হইয়া একমাত্র প্রত্যয় অবশিষ্ট থাকে, তখন গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যে অর্থাৎ পুরুষ, ইন্দ্রিয় বা বিষয়ে যে "তৎস্থ-তদঞ্জনতা," তাহাকে সমাপত্তি বলে। অর্থাৎ চিত্তে বর্ত্তমান সেই একমাত্র প্রত্যয় অবলম্বন করিয়া তাহাতে স্থির থাকা, এবং তাহার আকার প্রাপ্ত হওয়াই চিত্তের সমাপত্তি। ইহা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। কোনও এক বিষয়ে স্থিতি-প্রাপ্ত চিত্তের অবস্থার নামই সমাপত্তি। বিষয়-ভেদে ইহা ত্রিবিধ—গ্রহীতা-বিষয় (অর্থাৎ পুরুষ-বিষয়), গ্রহণ বিষয়, (ইন্দ্রিয়-বিষয়) এবং গ্রাহ্য বিষয় ; অর্থাৎ সমাপত্তিতে চিত্তের স্থিতি পুরুষে অথবা ইন্দ্রিয়ে, অথবা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবিষয়ে হইতে পারে। সমাপত্তির স্বকীয় প্রকৃতি-ভেদে ইহা চতুর্বিধ—সবিতর্ক সমাপত্তি, নির্বিতর্কা সমাপত্তি, সবিচারা

সমাপত্তি, নির্বিচারা সমাপত্তি। সমাপত্তি যখন "শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণা", তখন তাহাকে সবিতর্কা বলে। বিতর্ক শব্দের অর্থ বিশেষ চিন্তা। যে সমাপত্তিতে বিতর্ক থাকে, তাহা সবিতর্কা। প্রত্যেক বস্তুর একটি নাম আছে। নাম একটি শব্দ। বস্তুটি সেই শব্দের অর্থ, তাহার নামটি সংকেত। নাম উচ্চারিত হইলে বস্তুর জ্ঞান হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান পরস্পর মিশ্রিত থাকে। যখন কোনও বস্তুতে চিত্ত সমাপন্ন হয়, তখন যদি সেই বস্তুর নাম (শব্দ), সেই বস্তুটি (অর্থ) ও তাহার জ্ঞান চিত্তে মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে সেই সমাপত্তি সবিতর্কা। যদি একটি "গো"তে চিত্ত সমাপন্ন হয়, তখন চিত্তে যদি গো-শব্দ, গো-বস্তু ও গো-জ্ঞান তিনটি মিশ্রিত থাকে, তবে সে সমাপত্তি সবিতর্কা। এই সমাপত্তি চিন্তাহীন নহে।

শব্দ ও তাহার অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্মৃতিতে বর্ত্তমান, তাহার ফল স্মৃতিসাংকর্য্য। এই সাংকর্য্যযুক্ত স্মৃতি অপরিশুদ্ধ। যদি শব্দ ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থের চিন্তা করিতে অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে এই স্মৃতিসাংকর্য্য নষ্ট হয়, এবং স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়। তখন শব্দ বর্জ্জন করিয়াও অর্থের চিন্তা করা যায়। এইরূপ স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে "অর্থমাত্র-নির্ভাসা" যে সমাপত্তি স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় হয়, তাহা নির্বিতর্কা। অর্থাৎ যখন চিত্তে কেবল অর্থটিই বর্ত্তমান থাকে, নামটি থাকে না, এবং জ্ঞাতৃভাব চিত্তে উদিত হয় না, অর্থাৎ "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞান হয় না, তখন সেই সমাপত্তি নির্বিতর্কা। এই সমাপত্তির যাহা বিষয়, তাহাই স্থূলের চরম জ্ঞান।

সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা উভয় প্রকার সমাপত্তিতেই স্থূলের সাক্ষাৎকার হয়। সবিচারা সমাপত্তি সূক্ষ্মবিষয়া। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র বাহ্য সূক্ষ্ম, এবং অহংকার, বুদ্ধি ও পুরুষ ইহারা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম। শব্দার্থজ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণা সূক্ষ্মে সমাপত্তি সবিচারা, এবং স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থমাত্র-নির্ভাসা সূক্ষ্মে সমাপত্তি নির্বিচারা। সবিচারা সমাপত্তির বিষয় দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন—অর্থাৎ তাহা দেশবিশেষে ও বর্ত্তমান কালে নিমিত্ত-বিশেষ-দ্বারা অবচ্ছিন্ন রূপে অনুভূত হইবে। নির্বিচারের অনুভব দেশ-কাল-নিমিত্তাবচ্ছিন্ন নহে। সবিচার ও নির্বিচার সমাপত্তির বিষয় যে সূক্ষ্ম, তাহার সূক্ষ্মতা অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রসারিত। পার্থিব স্থূল ভূতের সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র, তন্মাত্রের সূক্ষ্ম অহংকার, অহংকারের সূক্ষ্ম লিঙ্গমাত্র বা বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে সূক্ষ্মতর অলিঙ্গ বা প্রকৃতি।

এই চারিপ্রকার সমাপত্তি সবীজ সমাধি। দৃশ্য পদার্থ অবলম্বন করিয়া ইহারা উৎপন্ন বলিয়া ভাষ্যকার ইহাদিগকে বহির্বস্তুবীজ বলিয়াছেন।

রজঃ ও তমঃ গুণের আবরণমুক্ত বুদ্ধির স্বচ্ছ স্থিতি-প্রবাহকে বৈশারদ্য বলে। নির্বিচার সমাধিতে যখন বুদ্ধির এইরূপ বৈশারদ্য জন্মে, তখন যোগীর অধ্যাত্ম-প্রসাদ হয়। বুদ্ধির প্রকাশগুণের উৎকর্ষই অধ্যাত্ম প্রসাদ। তখন জ্ঞেয় বিষয়ের যাবতীয় ধর্ম্ম বুদ্ধিতে যুগপৎ প্রকাশিত হয়, ক্রমে ক্রমে হয় না। তখন ক্রমহীন সর্ব্বভাসক স্ফুট প্রজ্ঞালোক (সাক্ষাৎকার-জনিত বিজ্ঞানালোক) হয়। সেই অবস্থায় যে প্রজ্ঞা হয়, তাহার নাম ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। ঋতম্ভরা শব্দের অর্থ সত্যপূর্ণ, তাহাতে ভ্রমের গন্ধমাত্রও থাকে না। শ্রুতি ও অনুমান হইতে যে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহা হইতে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিষয় ভিন্ন। শ্রুতি হইতে যে জ্ঞান, তাহা সামান্য বিষয়ক, বিশেষের জ্ঞান নহে, কেননা শব্দদ্বারা বিশেষের সংকেত হয় না। অনুমানও সামান্য বিষয়ক। ধূম দেখিয়া যে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, তাহা সাধারণ অগ্নি, কোনও বিশেষ অগ্নি নহে। কিন্তু ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায় বিশেষের জ্ঞান হয়।

নির্বিচার-সমাধি-প্রজ্ঞা হইতে যে সংস্কারের উৎপত্তি হয়, তাহা অন্য সংস্কারের অর্থাৎ ব্যুত্থানকালের সংস্কারের প্রতিবন্ধক। সমাধিজ প্রজ্ঞার সংস্কার বিদ্যামূলক। তাহা অবিদ্যামূলক সংস্কারকে নাশ করে। সম্প্রজ্ঞাত যোগের চরম অবস্থা যে বিবেকখ্যাতি, তাহা উৎপন্ন হইলে চিত্ত-চেষ্টার বিরাম হয়। তখন চিত্ত প্রলীন হয়, দ্রষ্টা কৈবল্যলাভ করে। সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারের নিরোধ হয় নিরোধ-সংস্কার হইতে। চিত্তের সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হইলে সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারেরও নিরোধ হয় এবং তখন নির্বীজ সমাধি উৎপন্ন হয়।

৪

যোগের সাধন

জীবন দুঃখময়। এই দুঃখ হইতে সকলে মুক্তি পাইতে চায়। মুক্তি পাইতে হইলে, যে উপায়ে তাহা লাভ করা যায়, তাহা অবলম্বন করিতে হয়। সেই উপায় ক্রিয়াযোগ। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, ইহারাই ক্রিয়াযোগ। ব্রহ্মচর্য্য, শৌচ, মৌন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, মিতাহার, দ্বন্দ্বসহন প্রভৃতিই তপস্যা। স্বাধ্যায় অর্থে প্রণব মন্ত্রাদি জপ ও বেদ প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন। ঈশ্বর-প্রণিধানের অর্থ ঈশ্বরের উপাসনা। ক্রিয়াযোগদ্বারা সমাধি উৎপাদিত এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চক্লেশ ক্ষীণ হয়, চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়,

অন্তঃকরণের রজোগুণ হইতে উদ্ভূত চাঞ্চল্য ও তমোগুণ হইতে উদ্ভূত জড়ত্ব ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, চিত্ত সমাধির অভিমুখী হয়, এবং চিত্তমল দূরীভূত হওয়ার ফলে পঞ্চবিধ ক্লেশও ক্ষীণতা-প্রাপ্ত হয়।

উক্ত পঞ্চক্লেশ ক্রিয়াযোগদ্বারা ক্ষীণ অথবা সূক্ষ্ম হইলে, প্রতিলোম-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া চিত্তের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তপস্যাদিদ্বারা ক্লেশের মূল উৎপাটিত হয় না, কিন্তু ক্লেশ ক্ষীণ হয়। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, ইহারাই পঞ্চক্লেশ। অবিদ্যা হইতে অন্য চারিটি ক্লেশের উদ্ভব হয়। তাহারা কখনও প্রসুপ্ত, কখনও ক্ষীণ, কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও বলবৎ থাকে। ক্রিয়াযোগদ্বারা যখন তাহাদের ক্ষীণতা সম্পাদিত হয়, তখন তাহারা দগ্ধ বীজের ন্যায় শক্তিহীন হইয়া পড়ে; পরে সমাধির ফলে চিত্ত সহ বিলীন হয়। ইহাই প্রতিপ্রসব—চিত্ত হইতে উৎপন্ন, পরে চিত্তে লীন হওয়া এবং শেষে চিত্তের সহ বিনষ্ট হওয়া। ক্লেশদিগের স্থূলাবস্থা ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষীণ হইলে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা দগ্ধবীজ না হয়, ততদিন প্রসংখ্যান অর্থাৎ ধ্যানদ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে হয়।

ক্লেশসকলের মূল যে কর্ম্মাশয় তাহার ফল ইহজন্মে অথবা পরজন্মে ভোগ করিতে হয়। যতদিন এই মূলের বিনাশ না হয়, ততদিন তাহার ফল জন্ম, আয়ু ও ভোগ ভোগ করিতে হয়। জন্ম, আয়ু ও ভোগের ফল হ্লাদ ও পরিতাপ।

অনাগত যে দুঃখ, তাহাই হেয়। অতীত দুঃখের কথা উঠে না। বর্ত্তমান দুঃখও বর্জ্জন করিবার উপায় নাই। সুতরাং ভবিষ্যতে যাহাতে দুঃখ না ভোগ করিতে হয়, তাহার জন্যই চেষ্টা করিতে হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। সেই সংযোগের নাশই দুঃখনাশের উপায়। ক্রিয়াযোগের ফল সমাধিদ্বারা তাহাই সংসাধিত হয়। অবিদ্যাই এই সংযোগের কারণ। অবিদ্যা যদি যোগাভ্যাস, জ্ঞান বা চিত্তনিরোধের দ্বারা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগও বিনষ্ট হয়। কিন্তু একজনে অবিদ্যার নাশ হইলেও তাহা সর্ব্বসাধারণ বলিয়া অন্যের নিকট তাহা বর্ত্তমান থাকে। অবিদ্যা নষ্ট হইলে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগও বিনষ্ট হয়। তাহাই পুরুষের কৈবল্য। অবিদ্যানাশের প্রধান উপায় অবিপ্লবা অর্থাৎ বিচ্ছেদ-বিহীন বিবেক-খ্যাতি, অর্থাৎ পুরুষ যে বুদ্ধি নহে, এই জ্ঞান। দুঃখ বুদ্ধির। বুদ্ধি পুরুষ নহে। সুতরাং দুঃখ পুরুষের নহে, এই জ্ঞানই বিবেক-খ্যাতি। এই জ্ঞানের যখন বিচ্ছেদ না হয়, তখনই অবিদ্যার নাশ হয়।

যাহার বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বিবেকখ্যাতির অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকাররূপ প্রজ্ঞার সাত প্রকার অবস্থা। চারিটি কার্য্য-বিমুক্তি অবস্থা, তিনটী চিত্ত-বিমুক্তি অবস্থা। কার্য্যবিমুক্তি অবস্থা চারিটি এই—(১) হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য যাহা, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে, অন্য পরিজ্ঞেয় কিছু নাই। (২) হেয় যে সকল ক্লেশ, তাহাদের কারণ ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাদের ক্ষীণ করিবার প্রয়োজন আর নাই। (৩) নিরোধ-সমাধিদ্বারা "হান" অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বিচ্ছেদ, সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে। (৪) বিবেকখ্যাতিরূপ প্রকৃতি-পুরুষের বিচ্ছেদসাধনের উপায় উৎপাদিত হইয়াছে। চিত্তবিমুক্তি অবস্থা তিনটি এই: (১) বুদ্ধি চরিতাধিকারা হইয়াছে, অর্থাৎ বুদ্ধির মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়াছে, তাহার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। (২) গুণসকল গিরিশিখরচ্যুত উপলখণ্ডের ন্যায় অবস্থান-বিহীন হইয়া স্ব-কারণে প্রলীন হইবার জন্য ছুটিয়াছে, এবং সেই কারণের সহিত বিলীন হইতেছে। প্রয়োজনাভাবে তাহাদের আর উৎপত্তি হইবে না। (৩) পুরুষ গুণ-সম্বন্ধের অতীত, স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ, অমল ও কেবলী, এই জ্ঞানের অবস্থা। এই সপ্তবিধ প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা যখন পুরুষ সাক্ষাৎ করে, তখন তাহাকে "কুশল" বলে। চিত্ত লীন হইলেও "মুক্ত কুশল" বলা যায়। যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর হইলে জ্ঞানের দীপ্তি হয়। সেই জ্ঞান-দীপ্তি বিবেকখ্যাতির উৎপত্তি পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

যোগের অঙ্গ আটটি—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম। মন, বাক্য ও কায়দ্বারা সর্ব্বভূতের অপীড়নের নাম অহিংসা। যাহা যথার্থ, মনে ও বাক্যে তাহা মনে করা ও বলাই সত্য। পরদ্রব্য অপহরণ না করা অস্তেয়। বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য।* প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ না করা অপরিগ্রহ। এই পঞ্চবিধ যম যদি জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে সেই সার্ব্বভৌম যম মহাব্রত বলিয়া গণ্য হয়। সর্ব্বজাতীয় লোকের সহিত আচরণে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বনিয়ম-নিরপেক্ষভাবে (সময়—কর্ত্তব্যের নিয়ম। যেমন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য যুদ্ধ) যদি যম অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা মহাব্রত আখ্যা পাইতে পারে।

---

* "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং। সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরেব চ॥ এতন্মৈথুনং অষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যং অনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি তামস মনোবৃত্তিদিগের নাম বিতর্ক। ইহারা তিন প্রকার—স্বেচ্ছাকৃত, অন্যের অনুরোধ বা আদেশকৃত, অথবা নিজে না করিয়া অন্যকে আদেশ করিয়া তাহাদ্বারা কারিত, এবং অন্যকর্তৃক কৃত, কিন্তু নিজের অনুমোদিত। এই ত্রিবিধ বিতর্কের মূলে থাকে লোভ, মোহ ও ক্রোধ, এবং ইহাদের মাত্রা বা পরিমাণ অল্প, অধিক অথবা মাঝারি থাকে। কিন্তু যে কোনও প্রকারেরই হউক, ইহাদের ফল হয় অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞান। বিতর্ক-দিগের বাধা দিবার জন্য ইহারা যে অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞানের হেতু, ইহা ভাবিতে হইবে। এই ভাবনাই বিতর্কদিগের প্রতিপক্ষভাবন।

অহিংসাতে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, তাহা হইলে অহিংসকের সম্মুখে সকল প্রাণীই বৈর ত্যাগ করিবে। সত্যে যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার বাক্য অমোঘ হয়—তিনি যদি কাহাকেও বলেন "ধার্ম্মিক হও", তবে সে ধার্ম্মিক হইবে। যদি বলেন "তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হউক", সে স্বর্গে যাইবে। যদি পরস্বাপহরণের স্বপ্ন পর্য্যন্ত না দেখ, অস্তেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ কর, তাহা হইলে সমস্ত রত্ন আপনা হইতেই তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ লোকে বহুমূল্য দ্রব্য তোমাকে উপঢৌকন দিবে। ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হয়, অর্থাৎ অব্যাহত জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তি (অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি) এবং শিষ্য-হৃদয়ে জ্ঞানাধান করিবার সামর্থ্যলাভ হয়। অপরিগ্রহে স্থিতিলাভ করিলে "জন্ম কথন্তা-সংবোধ"—অর্থাৎ জন্মের ভাব কি প্রকার (কথন্তা), তাহার বোধ জন্মিবে, আমি কে, আমি ভবিষ্যতে কি হইব, কিরূপেই বা হইব, এই সকল জানিতে পারা যাইবে। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান ইহারা নিয়ম। শৌচ হইতে স্বীয় অঙ্গের প্রতি তুচ্ছ জ্ঞান ও অন্যের সঙ্গ করিতে ইচ্ছা দূর হয়। স্বীয় অঙ্গ ও অন্যের অঙ্গ অশুচি বলিয়া মনে হয়। ইহা বাহ্য শৌচ। আভ্যন্তর শৌচের ফলে সত্ত্ব-শুদ্ধি—মন হইতে মলিনতার অপগম। সৌমনস্য (চিত্তের আনন্দভাব) হইতে একাগ্র্য-ইন্দ্রিয়-জয় এবং ইন্দ্রিয়াতীত আত্মার দর্শন-যোগ্যতা লাভ হয়। সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয়। তপস্যা হইতে চিত্তের অশুদ্ধির ক্ষয় হয়, এবং কায়-সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সিদ্ধি হয়। কায়সিদ্ধির অর্থ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি। দূরশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-সিদ্ধি। স্বাধ্যায় সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, ইষ্টদেবতার দর্শন হয়। ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে সমাধিলাভ হয়। সমাধিসিদ্ধি হইলে সকলই জানা যায়। দেহান্তরে, দেশান্তরে, কালান্তরে যাহা হয়, সকলই জানা যায়।

শরীর না দোলে, কোনওরূপ বেদনা না হয়, চিত্তের চাঞ্চল্য না ঘটে,

এইরূপভাবে উপবেশন করার নাম আসন। আসন-শিক্ষা কষ্টজনক হইলেও, অভ্যস্ত হইলে তাহা স্থির ও সুখজনক হয়। বসিবার জন্য প্রযত্ন ত্যাগ করিতে হয়। শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে বসিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিবে এবং চিত্তকে অনন্ত আকাশে সমাপন্ন করিবে অর্থাৎ অনন্ত আকাশের চিন্তা করিয়া তাহার সহিত এক হইয়া গিয়াছে, এই চিন্তা করিবে। আসন-জয় হইলে শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব থাকে না। আসন-জয়ের পরে প্রাণায়াম। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি-ভঙ্গ করিয়া নিয়মের অধীন করাই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম ত্রিবিধ— বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তর-বৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। নাসারন্ধ্রপথে শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু বাহিরে স্থাপন ও পরে শ্বাসগ্রহণ না করা বাহ্যবৃত্তি। ইহা রেচক ও কুম্ভক উভয়ই। বহিঃস্থ বায়ু নাসিকাপথে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া তদ্বারা সমস্ত শিরা ও উপশিরা পূর্ণ করার নাম আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়াম। ভিতরে বায়ু গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ তাহা ত্যাগ না করা ইহার অন্তর্গত। সুতরাং বাহ্যবৃত্তি ও আভ্যন্তর বৃত্তির সহিত স্তম্ভবৃত্তি সংলগ্ন, স্বতন্ত্র নহে। এই তিন প্রকার প্রাণায়াম আবার দ্বিবিধ—দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা স্থান, কাল ও সংখ্যা-বিশেষের দ্বারা জানা যায়। পরিত্যক্ত বায়ু যদি বেশীদূর যায়, তবে তাহা দীর্ঘ, অন্যথা সূক্ষ্ম। যদি আভ্যন্তর বৃত্তিকালে শরীরাভ্যন্তরের সর্ব্বস্থান বায়ু-পূর্ণ হয় বলিয়া অনুভূত হয়, তবে তাহা দীর্ঘ, নতুবা সূক্ষ্ম। আভ্যন্তর বৃত্তির দীর্ঘতা ও বাহ্যবৃত্তির সূক্ষ্মতা ভাল। সংখ্যানির্ণয়দ্বারাও দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যায়। উক্ত তিন প্রকার প্রাণায়ামের অতিরিক্ত এক প্রাণায়াম আছে— চতুর্থ প্রাণায়াম। বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তি যখন অতি সূক্ষ্ম হয়, তখন দৃঢ় অভ্যাসের ফলে দেশকালাদির আলোচনা ত্যাগ করিয়া যে স্তম্ভবৃত্তি হয়, তাহাই চতুর্থ সুসূক্ষ্ম স্তম্ভ-বৃত্তি। প্রাণায়ামের ফলে চিত্ত-সত্ত্বের রজস্তমোরূপ আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং "ধারণা" প্রভৃতির সামর্থ্য জন্মে। অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থাপন করাই ধারণা। যেখানে চিত্তকে ধারণ করা হয়, তথায় ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যয়ের একতানতা বা সদৃশ প্রবাহই ধ্যান। যে বস্তুর ধ্যান, সেই বস্তুর প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কোনও প্রত্যয় মনে উদিত হইবে না, সেই বস্তুর অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ ছুটিবে, ইহাই ধ্যান। সেই ধ্যানে যখন ধ্যেয় বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুই আবির্ভূত হয় না, "আমি ধ্যান করিতেছি" এ জ্ঞানও থাকে না, থাকে কেবল ধ্যেয় বস্তু, তখন হয় সমাধি।

ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়দিগের সংযোগের অভাব ঘটিলে ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক চিত্তের স্বরূপের অনুকরণের মত যে ভাব হয়, তাহাই প্রত্যাহার।

ইচ্ছাপূর্ব্বক চিত্তকে যে দিকে রাখা যায়, ইন্দ্রিয়গণও সেইদিকে যায়। ইহার ফলে ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণ বশীভূত হয়। এইভাবে একাগ্রতা উৎপন্ন হইলে, চিত্ত কি পরমাণু, কি মহৎ সর্ব্বত্রই স্থির হয়। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম পদার্থ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই তাহার গ্রাহ্য, প্রকাশ্য ও বশ্য হয়।

৫

চিত্তের একাগ্রতা-লাভের উপায়

প্রথমতঃ প্রণব-মন্ত্র জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা একাগ্রতা-লাভের সুগম উপায়। ইহা হইতে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, এবং আত্মসাক্ষাৎকারের যে সকল অন্তরায় আছে, তাহা দূরীভূত হয়।

চিত্ত-বিক্ষেপকারী অন্তরায় নয়টি। (১) ব্যাধি, (২) স্ত্যান (চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা বা জড়তা), (৩) সংশয় (যোগ আমার সাধ্য কিনা এতাদৃশ সন্দেহ), (৪) প্রমাদ (সমাধির যাহা সাধ্য, তাহাতে ঔদাসীন্য), (৫) আলস্য (দেহ ও চিত্তের গুরুত্ব বা ভারিত্ব বোধ), (৬) অবিরতি (চিত্তের বিষয়-তৃষ্ণা) (৭) ভ্রান্তিদর্শন (বিপরীত বুদ্ধি, যাহা যোগের সাধন তাহাকে অসাধন মনে করা, এবং যাহা অসাধন, তাহাকে সাধন মনে করা), (৮) অলব্ধ-ভূমিকত্ব (যোগের ক্রমিক ভূমিকার অপ্রাপ্তি; যোগী এক ভূমি অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী ভূমিতে আরোহণ করেন, এই সকল ভূমিকার অলাভ, (৯) অনবস্থিতত্ব (চিত্তের অস্থিরতা)। এই সকল চিত্তবিক্ষেপের সঙ্গে থাকে—(১) দুঃখ, (২) দৌর্ম্মনস্য, (অভীষ্ট অপ্রাপ্তিতে মনঃ-ক্ষোভ), (৩) অঙ্গমেজয়ত্ব (অঙ্গের চঞ্চলতা), (৪) শ্বাস-প্রশ্বাস (শ্বাস-প্রশ্বাস জয় না করিলে যোগ হয় না)। এই সকল অন্তরায় দূর করিবার জন্য কোনও অভিমত তত্ত্ব, অর্থাৎ যে কোনও মনোরম আকৃতি বা প্রীতিজনক বস্তুর ধ্যান করিতে হয়।

একাগ্রতা-শিক্ষার পূর্ব্বে চিত্তের মলিনতা দূর করা প্রয়োজন। মলিন চিত্ত সূক্ষ্ম-বস্তু-গ্রহণে অসমর্থ। এইজন্য চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সমাহিত হয় না। চিত্তের মালিন্য দূর করিতে হইলে পরের সুখ, পরের দুঃখ, পরের পুণ্য, পরের পাপ দেখিলে চিত্তে **মৈত্রী, করুণা, মুদিতা** ও **উপেক্ষার** উদ্রেক করিতে হয়। পরের সুখে সুখী হইও, ঈর্ষ্যা করিও না। ইহাই মৈত্রী। পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া করুণা করিবে। অন্যে পুণ্য কর্ম্ম করিতেছে দেখিয়া 'মুদিত' অর্থাৎ আনন্দিত হইও। পরে পাপ করিতেছে দেখিলে উপেক্ষা করিও। বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা করিও না। এইরূপ করিলে চিত্ত প্রসন্ন হইবে। আর একটী উপায় প্রাণ

অর্থাৎ বায়ুর প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ অর্থাৎ প্রাণায়াম। প্রচ্ছর্দ্দনের অর্থ বায়ু গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ। বিধারণের অর্থ ধারণ। প্রাণায়াম ঠিকভাবে করিতে পারিলে মনের বিক্ষেপ দূরীভূত হয়।

মনঃ-সংযোগ ঠিকমত অনুষ্ঠিত হইলে, "বিষয়বতী প্রবৃত্তি" (প্রকৃষ্টা চিত্তবৃত্তি বা সাক্ষাৎকার রূপ প্রজ্ঞা) উৎপন্ন হয়। তাহাতে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইহারাই বিষয়। ইহাদের সাক্ষাৎকারকে "বিষয়বতী প্রবৃত্তি" বলে। নাসাগ্রে চিত্ত ধারণ করিতে করিতে দিব্যগন্ধ পাওয়া যায়। জিহ্বাগ্রে চিত্তসংযম করিয়া দিব্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়। তালুর অগ্রভাগে চিত্তসংযমের ফল হয় দিব্যরূপদর্শন। জিহ্বামধ্যে চিত্তসংযমের ফল দিব্যস্পর্শের অনুভূতি। জিহ্বামূলে চিত্ত-সংযমদ্বারা দিব্যশব্দ শ্রুত হয়। ইহার ফলে যোগফলে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়, এবং চিত্ত অনাকুল হইয়া স্থির হয়।

উদর-কন্দরের উর্দ্ধে হৃৎ-পিঞ্জরের মধ্যে এক খণ্ড মাংস আছে। তাহা প্রায় পদ্মাকার বলিয়া হৃৎ-পদ্ম নামে আখ্যাত। রেচক-প্রাণায়ামদ্বারা হৃৎ-পদ্মকে উর্দ্ধমুখ করিয়া তাহার অন্তরালে চিত্তধারণ করিলে এক প্রকার জ্যোতিঃ অনুভূত হয়। সে জ্যোতির তুলনা নাই। তাহা নিস্তরঙ্গ নিষ্কল্লোল মহাসমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও অনন্ত। তাহাতে সূর্য্যপ্রভা, চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতি শত শত বিচিত্র প্রভা স্ফুরিত হইতে দেখা যায়। এই জ্যোতিঃ নয়নগোচর হইলে আর কোনও শোক থাকে না। এইজন্য ইহাকে বিশোকা বলে। ইহাও বিষয়বতী প্রবৃত্তি। এখানে "অস্মিতা"ই বিষয়। চিত্ত "অস্মিতা"য় সমাপন্ন হইলে এই জ্যোতিঃ-দর্শন হয় (অস্মিতা = বুদ্ধিসত্ত্ব)। হৃদয়পদ্মে চিত্ত ধারণ করিলে বুদ্ধি-সংবিদ হয়। বুদ্ধি-সত্ত্বই অস্মিতা। বুদ্ধিসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় আকাশকল্প। তাহাতে সমাপন্ন চিত্ত নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের ন্যায় শান্ত, অনন্ত অস্মিতামাত্র হয়, এবং তাহার উপলব্ধি হয়। উপলব্ধি হইলে চিত্ত স্থিতিলাভ করে।

যাহার বিষয়রাগ নিবৃত্ত হইয়াছে, এরূপ কোনও পুরুষের চিত্তের ধ্যানের ফলে তাহাদ্বারা উপরক্ত যোগিচিত্ত স্থিতি লাভ করে। ইহা করিতে হইলে বীতরাগ ভাব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন।

সুষুপ্তির সুখ ও স্বপ্নদৃষ্ট মনোরম মূর্ত্তির ধ্যান করিলেও চিত্তস্থৈর্য্য হয়। যে কোনও মনোজ্ঞ বস্তুর ধ্যান করিলেই মন স্থির হইতে পারে।

৬

যোগদর্শনে ঈশ্বর

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পুরুষের সান্নিধ্যে গুণদিগের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে, ত্রিগুণের শক্তিতেই জগতের উৎপত্তি হয়। তাহার জন্য ঈশ্বর-স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় নাই। পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কোনও যুক্তি বা প্রমাণদ্বারা তাহা সিদ্ধ করেন নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁহার দর্শনের পক্ষে অপরিহার্য্যও নহে; এবং তাহা স্বীকার না করিলেও তাঁহার দর্শনের বিশেষ ক্ষতি হইত বলিয়াও মনে হয় না। জগতের ব্যাখ্যার জন্য তিনি সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাহার জন্য ঈশ্বর-স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল না। ইহা অসম্ভব নয়, যে সমাধিতে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা তিনি বলেন নাই। সুতরাং দর্শনের দিক হইতে এই স্বীকৃতির মূল্য অত্যধিক নহে।

শ্রুতিকে ত্রিবিধ প্রমাণের অন্যতম বলিয়া গণ্য করিলেও তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে, একথা সাংখ্য স্বীকার করেন নাই। হয়তো পতঞ্জলি শ্রুতিপ্রমাণেই ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন, এবং সমাধিতে তাহার সমর্থন পাইয়া সাংখ্যের পঞ্চবিংশ তত্ত্বের অতিরিক্ত ষড়বিংশ তত্ত্বরূপে ঈশ্বরকে স্বীয় দর্শনে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। ঈশ্বর কিরূপে যোগদর্শনে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাহা এখন দেখা যাউক। চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ, ইহা বলিয়াও পতঞ্জলি দ্বিবিধ যোগের কথা বলিয়াছেন—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। এই যোগে চিত্ত উপরত হয়, তাহার কোনও ক্রিয়া থাকে না, পুরুষ চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিত হন। সম্প্রজ্ঞাত যোগে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। চিত্ত তখন একটিমাত্র বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, এবং তখন সেই বস্তু ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর জ্ঞান হয় না; সেই বস্তুও তখন তাহার নাম ও প্রত্যয়ের সহিত সম্বন্ধহীন অবস্থায় চিত্তের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে; "আমি দেখিতেছি" —এ জ্ঞান তখন থাকে না। কেবলমাত্র সেই বস্তুর জ্ঞানই অবিরল ভাবে হইতে থাকে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-লাভের কয়েকটি উপায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি (একাগ্রতা) আবশ্যক। তাহার পরে "তীব্র সংবেগ" (=বৈরাগ্য [মিশ্র], অথবা উপায়ের ত্বরিত অনুষ্ঠান [ভিক্ষু])।

তাহার পরে আছে "ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ বা"—ঈশ্বরের প্রণিধানেও হয়। চিত্তের একাগ্রতা-লাভের জন্য, এবং যে যে কারণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, যোগের সেই নয়টি অন্তরায়ের প্রতিষেধের জন্য "এক তত্ত্বাভ্যাস" তাহার পরে উপদিষ্ট হইয়াছে। যোগের জন্য অপরিহার্য্য চিত্ত-প্রসন্নতা-লাভের উপায়-স্বরূপে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার ভাবনা করিতে বলা হইয়াছে। প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণের (প্রাণায়ামের) উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ঈশ্বর-প্রণিধান চিত্তের একাগ্রতা-লাভের বহু উপায়ের মধ্যে একটি। সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের অতিরিক্ত এই ঈশ্বর কে? তিনি কি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্ত্তা ঈশ্বর, মন্দিরে মন্দিরে, গির্জ্জায় ও মসজিদে যাঁহার উপাসনা হয়, সেই ঈশ্বর অথবা সাংখ্যসূত্রের "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" এবং "ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা" সূত্রদ্বয়ে (বিজ্ঞান ভিক্ষুর ব্যাখ্যা অনুসারে) পূর্ব্বসর্গে কারণ-লীন এবং সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা যে "জন্য" ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইনি সেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ? পতঞ্জলি বলেন "ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ"। এই ঈশ্বর অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মৃত্যু, ভয়) রূপ পঞ্চ ক্লেশ, পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম, কর্ম্মের ফল (জাতি, আয়ু ও ভোগ) এবং কর্ম্মফলের অনুগুণ বাসনাসকলকর্ত্তৃক অপরামৃষ্ট একজন পুরুষ। ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মবিপাক ও কর্ম্মাশয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এ অবস্থা কৈবল্যের অবস্থা। কিন্তু ঈশ্বর কৈবল্য-প্রাপ্ত কোনও পুরুষ নহেন। কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ বহু পুরুষ আছেন। কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে কৈবল্যের ভূত ও ভাবী কোনও সম্বন্ধ নাই। তিনি যে অতীতে কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইবেন, তাহা নহে। তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। বাচস্পতি মিশ্রের মতে জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি-রূপ সম্পদই ঐশ্বর্য্য বা ঈশ্বরের স্বরূপ। (স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ—উপনিষৎ)। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সাম্য ও অতিশয়-হীন, অর্থাৎ অন্য কাহারও ঐশ্বর্য্য তাহার সমান নহে, তাহা অপেক্ষা অধিকও নহে। যাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্য্য কাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর পুরুষ; কিন্তু অন্যান্য পুরুষের মতো নহেন। তাঁহার মধ্যে নিরতিশয় "সর্ব্বজ্ঞ-বীজ" বর্ত্তমান। যাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না, তাহাই নিরতিশয়। এইরূপ নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক যে জ্ঞানশক্তি, তাহা ঈশ্বরে বর্ত্তমান। ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকা-শয়মুক্ত কৈবল্য-অবস্থাতেও জ্ঞান অনন্তত্ব-প্রাপ্ত হয় (৪।৩১)। কিন্তু কৈবল্য-প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাহা সান্ত। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি সেরূপ নহে।

তাহা অর্জ্জিত নহে, স্বাভাবিক। তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বকালেই কাষ্ঠাপ্রাপ্ত। ঈশ্বর পুরুষ। কিন্তু পুরুষ চিতি-শক্তি মাত্র। তাহার কোনও পরিণাম হইতে পারে না। এই মত সাংখ্যদর্শনে বারংবার ব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞান এক প্রকার পরিণাম। কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা শাশ্বতিক অর্থাৎ নিত্য, তাহাতে পরিবর্ত্তন নাই। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতাদ্বারা কোনও পরিণাম সূচিত হয় না। কিন্তু জ্ঞান তো প্রকৃতির মধ্যগত বুদ্ধিতে চিতের প্রতিবিম্ব-পাতের ফল। রজস্তমঃমুক্ত সত্ত্ব ভিন্ন এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। ঈশ্বরে এই প্রকৃতি-জাত বুদ্ধির স্থান কোথায়, যদি তিনি সদা মুক্ত হন? ইহার উত্তর—ঈশ্বর "প্রকৃষ্ট সত্ত্বোপাদান" প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন অনাদি কাল হইতে। তাহার ফলেই তাঁহার শাশ্বতিক উৎকর্ষ। এই সত্ত্বোপাদান-গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, ত্রিতাপজনিত জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য। প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব-গ্রহণের ফলেই ঈশ্বরের জ্ঞান ও ক্রিয়া সম্ভবপর হইয়াছে। "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশদ্বারা সংসারী পুরুষদিগকে আমি উদ্ধার করিব" এই ইচ্ছা করিয়াই ঈশ্বর প্রকৃষ্ট চিত্তসত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীব-মঙ্গল-চিকীর্ষু মহর্ষি কপিল যেমন জীবদিগের প্রতি করুণাবশতঃ নির্ম্মাণ-চিত্ত আশ্রয় করিয়া আসুরিকে সাংখ্য-দর্শনের উপদেশ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের এই শুদ্ধ-সত্ত্ব-চিত্তগ্রহণ তদনুরূপ। কিন্তু ঈশ্বরের চিত্ত অনাদি। কোনও বিশেষ কালে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। অন্যান্য পুরুষেরও চিত্ত-সংযোগ আছে। কিন্তু তাহাদের চিত্ত সত্ত্ব সহ রজস্তমঃ-সংযুক্ত। ঈশ্বরের চিত্ত অপহত-রজস্তমঃ। এই প্রভেদ।

ঈশ্বর পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদিগেরও গুরু। জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তিনি মহর্ষি কপিলকে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য ঋষিগণও তাঁহার নিকটই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান। বর্ত্তমান সর্গের আদিতেই যে কেবল তিনি ঈশ্বর ছিলেন, তাহা নহে। অতিক্রান্ত সর্গসকলের আদিতেও তিনি ঈশ্বর ছিলেন। তিনি স্বকীয় চেষ্টাদ্বারা ঈশ্বরত্বলাভ করেন নাই। তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বল, ও তাঁহার ক্রিয়া স্বাভাবিক। তিনি "জন্য" ঈশ্বর নহেন। প্রণব মন্ত্র—ওঁকার—ঈশ্বরের বাচক। ওঁকার ও ঈশ্বরের মধ্যে এই বাচক-বাচ্য সম্বন্ধ অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান আছে। ইহাই পাতঞ্জল দর্শনের ঈশ্বর-বর্ণনা। এই বর্ণনায় ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয় নাই। তাঁহাকে পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তাও বলা হয় নাই। তিনি যে জীবদিগকে স্ব-স্ব-কর্ম্মানুরূপ ফল—

পাপের জন্য শাস্তি ও পুণ্যের জন্য পুরস্কার—দান করেন, সেকথাও এই বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

উপনিষদে আছে "সদেব সৌম্য, ইদমগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। তৎ ঐক্ষত বহুস্যাম্, প্রজায়েয়।" আদিতে এক অদ্বিতীয় "সৎ" বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ভাবিলেন "আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব।" অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ম হইতে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মের এই বহু হইবার ইচ্ছা, কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে হইয়াছে, ইহা মনে করা যায় না। শাশ্বত ব্রহ্মে বহু হইবার ইচ্ছা শাশ্বত কালেই বর্ত্তমান। তাই বহু জীবের অস্তিত্ব। যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে অসংখ্য পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত। এই সকল পুরুষ ঈশ্বরের মতোই চিৎস্বরূপ। অনাদি কাল হইতে তাহারা ঈশ্বরের সহিত বর্ত্তমান, ঈশ্বরও তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং ঈশ্বরের বহুত্বলাভের অনাদি ইচ্ছার সঙ্গে অনাদি বহু পুরুষের অস্তিত্ব তাঁহার স্রষ্টৃত্বের সহিত সংগতিহীন নহে। যোগদর্শনে বাহ্য সৃষ্টি কিরূপে হয়, তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয় নাই। বিশেষ ও অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র (মহৎ) ও অলিঙ্গ (অব্যক্ত), ইহারা অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত (বিশেষ), পঞ্চ-তন্মাত্ররূপ অবিশেষ, মহৎ তত্ত্ব (লিঙ্গমাত্র) ও অলিঙ্গ (অব্যক্ত), ইহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিবিধ অবস্থা, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে অব্যক্ত অবস্থা হইতে ইহারা অভিব্যক্ত হয়, তাহার বর্ণনা নাই। এ সম্বন্ধে সাংখ্য মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের একাধিক রূপ ছিল। এক রূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আত্মার গুণ বলিয়া গণ্য হইত, এবং আত্মা হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে বলা হইত। "আত্মনস্তু জগৎ সর্ব্বং, জগতশ্চাত্মসম্ভবঃ" এবং "সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব গুণাস্তস্তৈব কীর্ত্তিতাঃ" (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)।

মহাভারতে আছে "পঞ্চজ্ঞঃ পঞ্চকৃৎ পঞ্চগুণঃ পঞ্চশিখঃ স্মৃতঃ। পুরুষা-বস্থমব্যক্তং পরমার্থংন্নবেদয়ৎ" (১২।১২০।১২)। পঞ্চশিখ অব্যক্তকে "পুরুষাবস্থ" বলিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্বে (৩০৩ অধ্যায়) বশিষ্ঠের উক্তি বলিয়া এই কথাগুলি আছে—"পণ্ডিতেরা নারায়ণকেই হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সাংখ্যশাস্ত্রে তিনি বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা, এক ও অক্ষর প্রভৃতি নামে অভিহিত। এই ত্রৈলোক্য উঁহা হইতে সমুৎপন্ন। বিকারযুক্ত হইয়া উনি আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে, সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি হয়।" ইহা হইতে সাংখ্যের এক শাখা যে এক বিশ্বাত্মা স্বীকার করিত, এবং বিশ্ব সেই বিশ্বাত্মা হইতে উদ্‌ভূত বলিয়া

বিশ্বাস করিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পতঞ্জলি যে এই মতাবলম্বী ছিলেন, তাহা বলিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। পাতঞ্জল দর্শনে সেকথা নাই।

প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে পুরুষের সান্নিধ্যই প্রকৃতির অভিব্যক্তির কারণ। সুতরাং পুরুষকে জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ বলা যায়। কিন্তু পুরুষ হইতে কোনও শক্তি প্রকৃতির মধ্যে গমনের ফলে প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়, একথা সাংখ্য স্বীকার করেন না। কেননা পুরুষ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত বশিষ্ঠের উক্তি হইতে প্রতীতি হয়, যে ষড়বিংশ তত্ত্ব নারায়ণের ইচ্ছাতেই প্রকৃতি হইতে মহৎ তত্ত্বের উদ্ভব হয়। বর্ত্তমান যোগ দর্শনে এ সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। সুতরাং যোগদর্শনে স্বীকৃত ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলা যায় না। পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত প্রকৃতির অভিব্যক্তি যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পুরুষকেই তাহার জ্ঞাত জগতের নিমিত্ত কারণ বলা যায়। পূর্ব্বে উল্লিখিত মৌলিক্য সাংখ্যে প্রত্যেক পুরুষের জন্ত স্বতন্ত্র প্রধানের অস্তিত্বের কথা আছে। তদনুসারে প্রত্যেক পুরুষের জগৎ অন্যান্য পুরুষের জগৎ হইতে ভিন্ন, (যদিও এই সকল জগতের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ত্তমান) এবং প্রত্যেক পুরুষ তাহার জগতের নিমিত্ত কারণ। পাতঞ্জল দর্শন একমাত্র ঈশ্বরকেই জগতের নিমিত্ত কারণ বলেন নাই, এবং তিনি যে জগতের উপাদান কারণ সেকথাও তাহাতে নাই। সুতরাং পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, এ কথা বলা যায় না। আত্মাই যে অব্যক্ত, এবং জগতের মূলীভূত সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ যে আত্মারই গুণ, এ কথাও পাতঞ্জল দর্শনে নাই। কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে সমাধি-লাভ হয়, এবং তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদিগেরও গুরু, ইহা হইতে তিনি যে করুণাময়, ইহা উপলব্ধ হয়। প্রণিধান শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট ভক্তি কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু ব্যাসভাষ্যে উক্ত অর্থে শব্দটি গৃহীত হওয়ায়, পাতঞ্জল যোগী সম্প্রদায়ে ঈশ্বর করুণাময় বলিয়া গৃহীত, ইহা প্রতীত হয়। কিন্তু এই করুণা সাংসারিক ব্যাপারে পাওয়া যায় কি না, বিপদে তাঁহার শরণ লইলে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় কি না, তাহা বলা যায় না।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ কি না, তাহাও পাতঞ্জল সূত্রে নাই। প্রকৃষ্ট সত্ত্ব-গ্রহণ করায়, তাঁহাতে জ্ঞান, বল, ইচ্ছা ও ক্রিয়া আছে, এবং তিনি যখন অনন্ত, তখন তাঁহার ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিও অনন্ত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই পাতঞ্জল দর্শনে নাই। পাতঞ্জল দর্শনে "ঈশ্বর-

প্রণিধান" যদি ঈশ্বরে ভক্তি অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তথাপি ঈশ্বরপ্রাপ্তিকে যোগের লক্ষ্য বলা হয় নাই। ঈশ্বরে ভক্তির প্রয়োজন ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য নহে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি-লাভের জন্য। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সমাধিলাভ দ্রুততর হয়, ইহা ভাষ্যে আছে। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই পাতঞ্জল যোগের লক্ষ্য, ঈশ্বরপ্রাপ্তি নহে। মহাভারতে আছে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "যোগিগণ বলেন, ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলেন, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার প্রয়োজন নাই।" (শান্তিপর্ব্ব —মোক্ষ পর্ব্বাধ্যায়)। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর-প্রণিধাম মুক্তির অন্যতম উপায় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।

সাংখ্যমতে কর্ম্মের ফল কর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তি হইতে উদ্ভূত হয়, এবং বিবেক-জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মবন্ধন ছেদন করা যায় না। পাতঞ্জল দর্শনের মতও তাহাই। কর্ম্মবিপাক ও কর্ম্মাশয় পাতঞ্জল মতে নিরোধ-সংস্কারদ্বারা বিনষ্ট হয়। এই নিরোধ-সংস্কারলাভ ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোনও ভাবে ঈশ্বর কর্ম্মফল হইতে কাহাকেও মুক্তি দিতে পারেন, এ কথা পাতঞ্জল দর্শনে নাই। এই কর্ম্মফল হইতে ঈশ্বর কাহাকেও মুক্তি দেন অথবা দিতে পারেন, এ কথা অবশ্য গীতাতেও নাই। "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।" (৫।১৪)।

কৈবল্য-প্রাপ্তির পরে পুরুষ কি অবস্থায় থাকেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা পাতঞ্জল দর্শনে নাই। কৈবল্যে পুরুষের স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হয়। তখন পুরুষ চৈতন্য-মাত্রে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহার ক্লেশকর্ম্ম-নিবৃত্তি হয়, এবং তিনি সর্ব্বমলাবরণ-মুক্ত অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হন। ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্পর্ক তখন কি হয়, সে সম্বন্ধে কিছু যোগদর্শনে নাই। বস্তুতঃ তিনি নির্গুণ ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হন। সুতরাঃ দেখা যাইতেছে পাতঞ্জল মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও বিভু, কিন্তু জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। তিনি করুণাময় ও জীবের সুহৃদ এবং মুক্তিলাভে জীবকে সাহায্য করেন, কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি না করিয়াও মুক্তি-লাভ সম্ভবপর। তিনি সর্ব্বরূপ বাসুদেব নহেন (বাসুদেবঃ সর্ব্বম্)। তাঁহাতে ভক্তির ফলে জীব যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাতে বাস করে (নিবসিষ্যসি ময়ি), তাহাও নহে; তিনি সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত নহেন এবং ভক্ত যে ভগবান্‌কে কামনা করেন, তিনি তাহা নহেন। কৈবল্যলাভের ফলে অনন্ত জ্ঞান লাভ করিলেও সিদ্ধযোগী যে আত্যন্তিক সুখের

অধিকারী হন, যোগদর্শনে সে কথা নাই। কৈবল্য সুখ ও দুঃখ উভয়ের অতীত অবস্থা। কিন্তু ভগবদ্‌গীতায় যোগী ভক্তের ঈশ্বরপ্রাপ্তি এবং আত্যন্তিক সুখ-লাভের কথা আছে। যোগমার্গাবলম্বী সাধক কৈবল্যকেই চরম প্রাপ্তি বলিয়া গণ্য করেন। "পরা শান্তি ও শাশ্বত স্থান-প্রাপ্তির" জন্য সর্ব্বভাবে ঈশ্বরের শরণ লইবার প্রয়োজন তাহার নাই।

৭

যোগের বস্তু-তন্ত্রতা

সাংখ্যের ন্যায় যোগদর্শনও বস্তুতন্ত্র। প্রকৃতি ও তাহা হইতে উদ্‌ভূত যাবতীয় পদার্থই সত্য, তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তাহারা বিজ্ঞানমাত্র নহে। ইহাই উভয় দর্শনের মত। যোগদর্শনে ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন "নাস্তি অর্থো বিজ্ঞান-বিসহচরঃ, অস্তি তু জ্ঞানং অর্থ-বিসহচরং স্বপ্নাদৌ কল্পিতং" অর্থাৎ যাহার বিজ্ঞান নাই (যাহা বুদ্ধির বিষয় নহে), এরূপ কোনও বস্তু নাই, কিন্তু যাহার বিষয়ীভূত বস্তু নাই, এরূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে (যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়), তাহাদের মতে একমাত্র জ্ঞানই আছে, তদতিরিক্ত, তাহা হইতে ভিন্ন, কোনও বস্তু নাই। এই মত ভ্রান্ত। চিত্তে বস্তুর জ্ঞান হয়। চিত্ত ও বস্তু ভিন্ন। একই বাহ্য বস্তু হইতে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান বা প্রতীতি (Perception) হয়। সুতরাং চিত্ত ও বস্তু ভিন্ন। একই বস্তু হইতে কোনও চিত্তে সুখ, কোনও চিত্তে দুঃখ হয়। বস্তু একটিমাত্র চিত্তের বিষয় নহে। তাহা বহুচিত্তকর্ত্তৃক জ্ঞাত হয়। যদি এক চিত্তের বিষয়মাত্র হইত, তাহা হইলে যখন তাহা সেই চিত্তের বিষয় না হয়, তখন তাহার অস্তিত্বের লোপ হইত। কিন্তু তখনও তাহা অন্য চিত্তের বিষয় থাকে। বস্তু একচিত্তকল্পিত নহে, বহুচিত্তকল্পিতও নহে। তাহারা স্বপ্রতিষ্ঠ, এবং স্ব-তন্ত্রভাবে তাহাদের পরিণাম ঘটিতেছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণই মূল পদার্থ। প্রত্যেক বস্তুতেই এই তিন গুণ বর্ত্তমান, এবং ইহারা এক সঙ্গেই পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অঙ্গাঙ্গী ভাবে। তাহাদের পরিণাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয় না। তাহাদের পরিণামের এই একত্বের জন্য তাহাদের সমবায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন বস্তুর পরিণামও এক হয়। সুতরাং বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহারা অস্তিত্বহীন নহে।

অতীত ও অনাগত বস্তুরও অস্তিত্ব আছে। ধর্ম্মী বস্তুর ধর্ম্মদিগের বিভিন্ন পন্থাকে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে (৪।১২। ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত

হইবে, তাহাই অনাগত। যাহার অনুভূতি হইয়া গিয়াছে, তাহা অতীত। যাহার ব্যাপার হইতেছে তাহা বর্ত্তমান। এই ত্রিবিধ বস্তুই জ্ঞানের জ্ঞেয়। জ্ঞান থাকিলেই তাহার বিষয় থাকিবে। অতীত ও অনাগতের জ্ঞান যখন আছে, তখন তাহাদের অস্তিত্বও আছে—তাহারা স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে যথাযথ আছে। প্রত্যেক বস্তুর নানা ধর্ম্ম আছে। তাহার ধর্ম্মসকলের ত্রিবিধ পন্থা—অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। এই ত্রিবিধ পন্থা কালভেদ। যাহা সৎ অর্থাৎ আছে (সূক্ষ্মরূপে), নিমিত্তকর্ত্তৃক তাহাই বর্ত্তমানে পরিণত হয়। বর্ত্তমান আবার অতীত পন্থায় গিয়া অদৃশ্য হয়। বস্তুর এই তিন পন্থা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশমাত্র। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহারা এই তিন গুণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ব্যক্ত, অতীত ও ভবিষ্যৎ সূক্ষ্ম। গুণদিগের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপ, কিন্তু তাহাদের পরম রূপ অব্যক্ত।

গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি,
যৎতু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং, তন্মায়েব সুতুচ্ছকং। (বার্ষগণ্যের ষষ্টিতন্ত্র)

যাহা দৃষ্টিপথে পড়ে, তাহা ক্ষণস্থায়ী মায়ার মতই তুচ্ছ। মায়া নহে, অস্তিত্বহীন নহে। মায়ার মতো ক্ষণস্থায়ী।

৮

মনোবিজ্ঞান

বস্তুদিগের দ্বারা চিত্ত উপরক্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের প্রতিবিম্ব চিত্তে পতিত হয়। তাহা না হইলে বস্তুর জ্ঞান হইত না। তাহা হয় বলিয়া তাহারা কোনও সময়ে জ্ঞাত, কখনও বা (যখন চিত্ত উপরক্ত না হয় তখন) অজ্ঞাত থাকে। চিত্তের বৃত্তিসকল সর্ব্বদাই তাহার প্রভু পুরুষের জ্ঞাত। পুরুষের কোনও পরিণাম নাই।* যদি চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা পুরুষের জ্ঞাত না হইত, কখনও জ্ঞাত কখনও অজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে পুরুষের পরিণাম হয়, বলিতে হইত। চিত্ত স্বপ্রকাশ নহে—কেননা চিত্ত দৃশ্য। চিত্ত তাহার বৃত্তিকে নিজে জানে না, জানে পুরুষ। পুরুষই মনে করে "আমার রাগ" "আমার ভয়"। রাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তপ্রত্যয় পুরুষেই জানে। পুরুষ স্বপ্রকাশ বলিয়া ইহা সম্ভবপর হয়। চিত্ত স্বপ্রকাশ নহে। ক্ষণিকবাদীদিগের মতে যাহা ভবন (উৎপত্তি), তাহাই ক্রিয়া, আবার তাহাই কারক। সুতরাং তাহাদের মতে জ্ঞাতা (কারক) এবং জ্ঞেয় (উৎপন্ন ভাব) উভয়ের জ্ঞানের

* সদা জ্ঞাতাশ্চিত্ত-বৃত্তয় প্রভোঃ পুরুষস্য অপরিণামিত্বাৎ (৪।১৮)।

মধ্যে কোনও ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অবধারণ এক সঙ্গেই পৃথক্ রূপে হয়। তখন উভয়ে ভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়। যখন "আমার চিত্ত", "আমি-সুখী" ইত্যাদি অনুভব হয়, তখন আমি ও আমার চিত্ত, আমি ও আমার সুখ, ভিন্ন বলিয়াই অনুভব হয় এবং এক সঙ্গেই "আমার" ও চিত্তের অবধারণ হয়। যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ না থাকিত, তাহা হইলে ইহা হইতে পারিত না। সুতরাং আত্মা ও চিত্ত পৃথক। আত্মা স্বপ্রকাশ, চিত্ত স্বপ্রকাশ নহে।

যদি বল চিত্তকে জানিবার জন্য আত্মার কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? চিত্ত উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে আবার অন্য চিত্তের উদ্ভব হয়। এই পরে উৎপন্ন চিত্তদ্বারা পূর্ব্ব চিত্ত প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে অনন্ত চিত্ত-শ্রেণী স্বীকার করিতে হয়, এবং স্মৃতি-সাংকর্য্য উপস্থিত হয়। এক চিত্ত যদি অন্যচিত্তকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তবে শেষোক্ত চিত্তের প্রকাশক অন্য এক চিত্তের আবশ্যক এবং তাহার প্রকাশের জন্য আবার অন্য এক চিত্তের আবশ্যক। এইরূপ অনবস্থা চলিবে বা অতিপ্রসঙ্গ দোষ উপস্থিত হইবে। আবার যতগুলি চিত্ত হইবে, ততগুলি স্মৃতি হইবে, এবং তাহাদের সাংকর্য্য-বশতঃ কোনও একটি স্মৃতির নিশ্চিতরূপে অবধারণ সম্ভবপর হইবে না। পরন্তু পরক্ষণে উৎপন্ন চিত্তের দ্বারা বর্ত্তমান ক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত চিত্তের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে, তাহা দুর্ব্বোধ্য। সুতরাং আত্মাই যে বুদ্ধির দ্রষ্টা, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধি ও তৎপ্রকাশিত বাহ্য বস্তু আত্মা হইতে ভিন্ন। কিন্তু চিৎশক্তিরূপী পুরুষ অপ্রতি-সংক্রম, অর্থাৎ তাহার অন্যত্র গতি নাই। তবে পুরুষ কিরূপে বুদ্ধিকে জানিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন বুদ্ধি পুরুষের আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার ফলেই পুরুষ-কর্ত্তৃক "স্ব-বুদ্ধি সংবেদন" বা বুদ্ধির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু চিৎ পদার্থের তো কোনও জড়ীয় আকার থাকিতে পারে না, তাহা ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা গোলাকার হইতে পারে না। চিতির ধর্ম্মই তাহার আকার। সুতরাং চিতির আকার-প্রাপ্তির অর্থ চিতির ধর্ম্ম-(চৈতন্য) প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। পুরুষ বিভু। তাহা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। বুদ্ধির সহিত তাহা সংযুক্ত, বুদ্ধির মধ্যেও বর্ত্তমান। সুতরাং এই আকারপ্রাপ্তির সহিত পুরুষের প্রতিসংক্রমণের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পুরুষ বুদ্ধির সান্নিধ্যে বা মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলেই, বুদ্ধির অথবা তাহাতে প্রতিবিম্বিত বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, যদি পুরুষের কোনও প্রতিক্রিয়া না থাকে। হিমালয় ভারতের ইতিহাসের সাক্ষী, কিন্তু হিমালয়ে সেই

ইতিহাসের জ্ঞান নাই। সুতরাং পুরুষ কেবল বুদ্ধির সাক্ষী হইলেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, যদি পুরুষের কোনও প্রতিক্রিয়া না থাকে। এই প্রতিক্রিয়া হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় (৪।১৮)। সূত্রে আছে চিত্ত সদাই পুরুষের জ্ঞাত বলিয়া সেই জ্ঞানের দ্বারা পুরুষের অপরিণামিত্ব লঙ্ঘিত হয় না। এই যুক্তির বলবত্তা-সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ আছে, কেননা বুদ্ধি সদাজ্ঞাত হইলেও, যখন তাহার আকার সদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন পুরুষের জ্ঞানেরও সদা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, বলিতে হইবে। কিন্তু সূত্রকারের মতে তাহাদ্বারা পুরুষের অপরিণামিত্বের অপহ্নব হয় না।

দ্রষ্টাপুরুষকর্ত্তৃক উপরক্ত এবং বাহ্যদৃশ্যকর্ত্তৃক উপরক্ত চিত্ত সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারে, অর্থাৎ কেবল বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্বপাতের ফলেই জ্ঞান হয় না, পুরুষের ধর্ম্মপ্রাপ্তি চাই। পুরুষের ধর্ম্মপ্রাপ্তির অর্থ বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্বের উপর চিৎশক্তির ক্রিয়া। চিত্তে অসংখ্য বাসনা বর্তমান, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য পুরুষের প্রয়োজন-(ভোগ ও অপবর্গ) সাধন। চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংঘাতে উৎপন্ন, সুতরাং সংহত্যকারী। চিত্ত যে পরার্থে উৎপন্ন, ইহা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

চিত্তের ত্রিবিধ পরিণাম

চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থার (ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত) নাম ব্যুত্থান। বিশুদ্ধ-সত্ত্বরূপে পরিণামের নাম নিরোধ। উভয় অবস্থার সংস্কারই চিত্তে সঞ্চিত হয়। যখন ব্যুত্থান-সংস্কার অভিভূত হয় এবং নিরোধ-সংস্কার প্রাদুর্ভূত হয়, তখন যতক্ষণ নিরোধ থাকে, ততক্ষণ তাহার সংস্কার বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ব্যুত্থান সংস্কার ক্ষীণ হইতে থাকে, উভয় ধর্ম্মই চিত্তরূপ ধর্ম্মীতে একত্র (অন্বিত) থাকে। উভয় সংস্কার-অন্বিত চিত্তের এই নিরুদ্ধ অবস্থাই নিরোধ পরিণাম। নিরোধ-সংস্কার অভ্যাস করিয়া, তাহাতে পটুতা লাভ করিতে পারিলে, তাহার ফলে চিত্ত প্রশান্ত ভাবে বাহিত হয়। তখন চিত্তে কোনও প্রত্যয়ের উদয় হয় না, চিত্তের পরিণামও হয় না। চিত্তের সর্ব্বার্থতা (অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপ-রূপ নানাবিধ বিষয়ের গ্রহণ) এবং একাগ্রতা (অর্থাৎ একই আলম্বনে অবস্থান)—এই উভয় অবস্থার মধ্যে একের (সর্ব্বার্থতার) ক্ষয়, ও অন্যের (একাগ্রতার) উদয় চিত্তের সমাধি পরিণাম। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে একই প্রত্যয়ের প্রবাহ চিত্তে প্রবাহিত করার নাম ধ্যান। এই ধ্যানই একাগ্রতা পরিণাম। ইহাতে একটি প্রত্যয় উদিত হইয়া বিলীন হইতেছে, আবার উদিত হইতেছে, আবার বিলীন হইতেছে। এই একটি প্রত্যয়ের শান্ত ও পুনঃ উদিত হওয়ার নামই একাগ্রতা পরিণাম।

৯

ভূত ও ইন্দ্রিয় পরিণাম

চিত্তের উপরিউক্ত তিন পরিণাম যেমন আছে, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়দিগেরও সেইরূপ তিন পরিণাম আছে। এই তিন পরিণামের নাম (১) ধর্ম্ম পরিণাম, (২) লক্ষণ পরিণাম ও (৩) অবস্থা পরিণাম। প্রত্যেক বস্তুরই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণাম আছে। মৃত্তিকা ধর্ম্মী, তাহার পিণ্ডত্ব, পরে ঘটত্ব ও তৎপরে ঘট চূর্ণ হইয়া গেলে চূর্ণত্ব ধর্ম্ম আবির্ভূত হয়। ইহাই ধর্ম্ম পরিণাম। লক্ষণ শব্দ এখানে কাল-অর্থে ব্যবহৃত। নূতন বস্ত্র কিছুদিন পরে পুরাতন হয়, এই কালিক পরিণামই লক্ষণ পরিণাম। এক ধর্ম্ম শান্ত হইয়া ধর্ম্মান্তরের উদ্ভব হয়। যে ধর্ম্ম ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল, তাহা আবির্ভূত হয়, পরে অতীতের গর্ভে প্রবেশ করে, তাহার ধ্বংস হয় না। ভবিষ্যৎ হইতে বর্ত্তমানে প্রবেশ ও পরে অতীতে প্রবেশই ধর্ম্মের কালিক পরিণাম। ইহার ফলে ধর্ম্মীর অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়। বস্ত্রের নূতনত্ব ধর্ম্ম যখন অতীতে প্রবেশ করে, তখন তাহার অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তনই অবস্থা পরিণাম।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে বস্তু (ধর্ম্মী) ও তাহার ধর্ম্ম অভিন্ন বা ভিন্ন। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় না। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মীকে কূটস্থ (Noumenon) ও ধর্ম্মকে তাহার সমুৎপাদ Phenomenon বলিতে হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী মূলতঃ এক, কিন্তু ব্যবহারতঃ ভিন্ন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সকল দ্রব্যের মূলে এই তিন গুণ। সেখানে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ নাই। সমস্ত ধর্ম্মই সেখানে ধর্ম্মীর অন্তর্গত, কিন্তু ত্রিগুণের মতো তাহারাও অব্যক্ত। অব্যক্ত হইলেও ত্রিগুণের মতোই তাহারা "ভাব" পদার্থ, "অভাব" নহে। অভাব হইলে সৎকার্য্য মতে তাহাদের উদ্ভব হইতে পারিত না। কিন্তু যখন তাহারা আবির্ভূত হয়, তখন তাহারা ধর্ম্মী হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। যাহা এক সময় ধর্ম্মী, তাহাই আবার ধর্ম্ম হয়। যেমন পঞ্চ তন্মাত্ররূপ ধর্ম্মী হইতে পঞ্চভূতরূপ ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। আবার অহংকারের সম্পর্কে তন্মাত্র ধর্ম্ম, অহংকার ধর্ম্মী। অহংকার আবার বুদ্ধির ধর্ম্ম। ইত্যাদি।

কোনও বস্তুর "যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তি" তাহার ধর্ম্ম। অর্থাৎ উপযুক্ত নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যে শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। প্রত্যেক

ধর্ম্মীর তিন প্রকার ধর্ম্ম—শান্ত (অতীত), উদিত (বর্ত্তমান) ও ব্যপদেশ্য- (অনাগত)।

প্রত্যেক বস্তুর উপাদান-পরমাণুদিগের সংস্থান প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহা আমরা দেখিতে পাই না। যে পরিণাম আমরা দেখিতে পাই, পরমাণুর প্রতিক্ষণিক পরিণামই তাহার হেতু। এই পরিণামের ক্রমই অর্থাৎ যে ভাবে তাহারা একটির-পরে একটি ব্যবস্থিত, তাহাই আমাদের অনুভূত বিভিন্ন পরিণামের হেতু। বিভিন্ন পারমাণবিক পরিণামের ক্রমের মধ্যে বিভিন্নতাই দৃশ্যমান পরিণামদিগের ভিন্নতার কারণ।

১০

সিদ্ধি বা যোগবিভূতি

ধ্যান, ধারণা ও সমাধি পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোনও এক বিষয়ে এই তিনের একত্র প্রয়োগ করার নাম সংযম। সংযম আয়ত্ত করিতে পারিলে প্রজ্ঞানামক সর্ব্বভাসক আলোক উৎপন্ন হয়। ঐ সংযম স্থূল হইতে সূক্ষ্মতরে প্রয়োগ করিয়া সোপানক্রমে আরোহণ করিতে হয়। এক ভূমিতে প্রয়োগ করিয়া সে ভূমি জিত হইলে পরবর্ত্তী ভূমিতে প্রয়োগ করিতে হয়। পূর্ব্বে যে যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা তিন অঙ্গ-যুক্ত সংযম সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাক্ষাৎ সাধন। এই অন্তরঙ্গ সাধনত্রয় (সংযম) নির্ব্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ।

কোনও বস্তুর ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা, এই তিন পরিণামের প্রতি পূর্ব্বোক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম প্রয়োগ করিলে অতীত ও অনাগত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ হয়। শব্দ, তাহার অর্থ (বিষয় বস্তু) ও তাহার জ্ঞান আমাদের মনে মিশ্রিত (সংকর) থাকে। ইহাদিগকে পৃথক করিয়া প্রত্যেকের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে সকল প্রাণীর উচ্চারিত শব্দের অভিপ্রায় জানিতে পারা যায়। চিত্তে সঞ্চিত সংস্কারদিগের সাক্ষাৎ বা স্মৃতি হইতে পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। পরের চিত্তে সংযম করিতে পারিলে, তাহার জ্ঞান হয়। কিন্তু সেই পরচিত্তের তৎকালিক আলম্বন অর্থাৎ ভাবনার বিষয় যোগীর সেই পরচিত্তের তৎকালিক আলম্বন অর্থাৎ ভাবনার বিষয় যোগীর সংযমের বিষয় নহে বলিয়া তাহার জ্ঞান হয় না।

শরীরের রূপের মধ্যে সত্ত্বগুণ (প্রকাশক) আছে বলিয়া তাহা চক্ষুর্গ্রাহ্য হয়। কিন্তু তাহাতে সংযমের প্রয়োগ করিলে তাহার প্রকাশিত হইবার শক্তি

স্তম্ভিত হয়। তাহার ফলে অন্যের চক্ষুর প্রকাশ-শক্তির সহিত তাহার সংযোগ হইতে পারে না। ফলে অন্তর্দ্ধান-সিদ্ধি হয়। শরীরের শব্দাদিও এইরূপে অন্তর্হিত হয়।

যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে, তাহা সোপক্রম, যাহার ফলের আরম্ভ হয় নাই তাহা নিরুপক্রম। এই দ্বিবিধ কর্ম্মের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে "অপরান্ত জ্ঞান" এবং অরিষ্টের জ্ঞান হয়। অপরান্ত জ্ঞান= মৃত্যুবিষয়ক জ্ঞান। অরিষ্ট জ্ঞান=মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ, কোথায় কবে কি ভাবে মৃত্যু হইবে তাহার জ্ঞান।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষায় সংযম করিলে বল-লাভ হয়, অর্থাৎ ঐ চতুর্বিধ বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ হয়। বলশালী দ্রব্য বা জীবে সংযম করিলেও বললাভ হয়। হস্তীর বলে সংযমে হস্তিবল, বায়ুবল-সংযমে বায়ুবল-লাভ হয়।

পূর্ব্বে "জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির" কথা বলা হইয়াছে। তাহার আলোক যোগী সূক্ষ্ম, দূরস্থ এবং দৃষ্টিরোধক আবরণদ্বারা ব্যবহিত দ্রব্যে প্রয়োগ করিয়া সূক্ষ্ম, দূরস্থ ও ব্যবহিত বস্তুর জ্ঞান লাভ করেন।

সূর্য্যে সংযম দ্বারা যতদূর সূর্য্যালোক যায়, যোগী তত দূরের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। চন্দ্রে সংযম করিয়া যোগী তারাদিগের সংস্থান জানিতে পারেন। ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম করিয়া তারাদিগের গতি জানা যায়। নাভিচক্রে সংযম করিয়া কায়ব্যূহ (শারীরিক সংস্থান) জানা যায়। কণ্ঠমূলে (গলগহ্বরে) সংযমের ফলে যোগীর ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

কণ্ঠকূপের নিম্নে কূর্ম্ম নামক নাড়ী আছে। তাহাতে সংযম করিলে দেহের ও মনের স্থিরতা জন্মে। মস্তক-কপালের (মথার খুলির) মধ্যস্থলে ব্রহ্মরন্ধ্র নামে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা বুদ্ধির সাত্ত্বিক জ্যোতিঃ সেই ছিদ্রে ঘনীভূত হয়। সেই মূর্দ্ধা-জ্যোতিতে সংযম করিয়া দ্যাবা-পৃথিবীর (স্বর্গ মর্ত্ত্যের) অন্তরালচারী সিদ্ধ পুরুষদিগের দর্শন লাভ হয়।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার প্রভা যেমন দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি বিবেক-জ্ঞানের উদ্ভবের পূর্ব্বে এক প্রকার জ্ঞান জন্মে, যাহাকে প্রাতিভ অথবা তারক জ্ঞান বলে। ভোজরাজের মতে "মনোমাত্রজন্যং অবিসংবাদকং ঝটিতি উৎপাদ্যমানং জ্ঞানং"—অর্থাৎ অন্যহেতু-বিরহিত স্বতঃ মনে উদ্ভূত জ্ঞানকে "প্রাতিভ জ্ঞান" বলে। ইংরাজীতে যাহাকে Intuition বলে, বোধ হয় ইহা তাহাই। এই প্রাতিভ জ্ঞান হইলে বিনা সংযমেই সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়।

হৃৎপদ্মে সংযম প্রয়োগের ফলে স্ব-চিত্তের বাসনাদি এবং পর-চিত্তের সংবাদ (রাগাদি) জানা যায়।

পুরুষ বা আত্মা এবং সত্ত্ব (বুদ্ধি-সত্ত্ব) অত্যন্ত অসংকীর্ণ বা ভিন্ন। বুদ্ধির প্রত্যয় এবং পুরুষের প্রত্যয় (জ্ঞান) কিন্তু অবিশেষ। (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বৃত্তি-সারূপ্যম্ ইতরত্র)। স্ব-মধ্যস্থ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া বুদ্ধিসত্ত্ব বিবেক-খ্যাতি বা বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতা-প্রত্যয়ে পরিণত হয়। পুরুষ সেই পরিণামপ্রাপ্ত বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, চিতিমাত্র। বুদ্ধির ও পুরুষের অভিন্নতার যে বোধ, তাহাই ভোগ। সেই ভোগ বুদ্ধিসত্ত্বের। তাহা দ্রষ্টার দৃশ্য। সুতরাং তাহা পরার্থ। পুরুষ নিজে স্বার্থ। সেই পুরুষে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান লাভ করা যায়। পুরুষসম্বন্ধীয় যে প্রত্যয় বুদ্ধিসত্ত্বাত্মক, তাহাদ্বারা পুরুষের স্বরূপ জানা যায় না। পুরুষ নিজে যে প্রত্যয়ের অবলম্বন (স্বাত্মাত্মক প্রত্যয়), তাহাকেই পুরুষ জানেন। তাহাই সংযমের বিষয়। এই সংযমের ফলে প্রাতিভ জ্ঞান, দিব্যশব্দ শ্রবণ (শ্রাবণ), বেদনা, (দিব্য-স্পর্শের অনুভব), আদর্শ (দিব্যরূপদর্শন), স্বাদ (দিব্যরসাস্বাদ) এবং বার্ত্তা (দিব্যগন্ধ) অনুভূত হয়।

চিত্ত সর্ব্বগামী। তাহা যে এক শরীরে আবদ্ধ থাকে, তাহার কারণ কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। চিত্তের বন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি সংযমের দ্বারা শিথিল করিয়া দেওয়া যায়, চিত্তের সঞ্চরণ বা গতিবিধির পথ উত্তমরূপে জানা থাকে, তাহা হইলে চিত্তের স্বাধীন গতির বাধা হয় না; চিত্ত তখন পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারে।

উদানজয় হইলে জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে মজ্জন হয় না। উৎক্রান্তি (মরণ) ও স্বাধীন হয়। ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যেমন রূপ-রস-গন্ধাদির জ্ঞান হয়, তেমনি তাহারা মিলিত ভাবে দেহ রক্ষাও করিতেছে। ইন্দ্রিয়দিগের যে ক্রিয়াদ্বারা হৃদয় হইতে মুখ ও নাসিকা পর্য্যন্ত উদরস্থ বায়ুর গমনাগমন সাধিত হয়, তাহার নাম প্রাণ। যে ক্রিয়াদ্বারা বায়ু নাভি হইতে নিম্ন দিকে রস, রক্তাদি বহন করে, তাহার নাম অপান, আর যে ক্রিয়াদ্বারা ভুক্ত দ্রব্য রক্তমাংসে পরিণত হয়, তাহার নাম সমান। যে ক্রিয়া সর্ব্বশরীরে শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করে, তাহার নাম ব্যান, এবং যে ক্রিয়া গ্রীবা হইতে মস্তকচূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক উপাদান ঊর্দ্ধগামী করিয়া থাকে, তাহার নাম উদান। উদানে সংযম প্রয়োগ করিতে পারিলে, ঊর্দ্ধগতি উদান প্রবল হয় এবং যোগী জল, পঙ্ক, কণ্টক কিছুতেই সংলগ্ন হন না, তখন উৎক্রান্তি

বা মৃত্যুও তাহার ইচ্ছাধীন হয়। সমান বায়ুকে সংযমদ্বারা জয় করিতে পারিলে প্রজ্বলন অর্থাৎ শরীরের তেজ বর্দ্ধিত হয়। আকাশ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাতে সংযমের ফলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্ত্তী শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। দেহ ও আকাশ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাতে অথবা লঘুদ্রব্য তূলা আদিতে সংযম করিয়া যোগী লঘু হইয়া আকাশ-গমনে সমর্থ হন। শরীরে অবস্থিত মনের শরীরের বাহিরে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থানের নাম "কল্পিত বিদেহ"। "আমার মন শরীরের বাহিরে থাকুক" এই কল্পনাদ্বারা তাহার উদ্ভব হয়। কিন্তু দেহে আত্মভাব অপগত হইলে স্বতঃই মন যখন বাহিরে অবস্থান করে, তখন সেই বৃত্তির নাম "অকল্পিত বৃত্তি"—মহা বিদেহ। মহা বিদেহে সংযমের ফলে চিত্তের যে প্রকাশশক্তি আছে, তাহার আবরণ উন্মুক্ত হয়, এবং চিত্ত সকলই জানিতে সমর্থ হয়।

প্রত্যেক ভূতের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব, এই পাঁচটি অবস্থা আছে। যেরূপে ভূতগণ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাই স্থূল রূপ। পৃথিবী কঠিন, জল স্নিগ্ধ, তেজ উষ্ণ, বায়ু গতিশীল, ব্যোম সর্ব্বব্যাপী, ইহাই ভূতদিগের স্বরূপ। পরমাণু ও তন্মাত্রগণ ভূতের সূক্ষ্ম রূপ। প্রত্যেক ভূতই সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন গুণান্বিত। ইহাই অন্বয়িত্ব। ভূতদিগের ভোগপ্রদানের সামর্থ্যের নাম অর্থবত্ত্ব। ভূতদিগের এই পাঁচ রূপের উপর সংযমপ্রয়োগের দ্বারা ভূতদিগকে আজ্ঞাধীন করা যায়। যোগিগণ তখন সকলই করিতে সক্ষম হন। ভূতজয় হইলে অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যথাকামাবসায়িত্ব নামক অষ্টসিদ্ধি, (ইহাদিগকেই ঐশ্বর্য্য বলে) "কায়সম্পৎ" এবং শরীরধর্ম্মের অনভিঘাত লাভ করা যায়। অণিমা=অণুতুল্য ক্ষুদ্র হইবার শক্তি। লঘিমা=তূলার মত লঘুভার হইবার শক্তি। প্রাপ্তি= ইচ্ছামাত্র দূরস্থ বস্তুকে হস্তলভ্য করিবার সামর্থ্য। মহিমা=ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহৎ হইবার শক্তি (গরিমা)। প্রাকাম্য=ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত। ঈশিত্ব= ভৌতিক পদার্থের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি। বশিত্ব=ভৌতিক পদার্থ বশীভূত বা আজ্ঞাধীন করিবার শক্তি। যত্রকামাবসায়িত্ব=সত্যসংকল্পতা, অর্থাৎ ভৌতিক যে বস্তুকে যেরূপ করিবার ইচ্ছা হয়, সেইরূপ করিবার সামর্থ্য, বিষকে অমৃতে পরিণত করিবার শক্তি। কায়সম্পৎ=রূপ, লাবণ্য, বল, বজ্রতুল্য দৃঢ় শরীর ও বেগশীলতা। শরীর-ধর্ম্মের অনভিঘাত=শরীরের রূপ ও অন্যান্য ধর্ম্মের অবিনাশীর মতো হওয়া। অগ্নি রূপকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। বায়ু শরীর শোষণ করিতে পারিবে না ইত্যাদি। ভূতদিগের ন্যায়

ইন্দ্রিয়দিগের পাঁচ রূপ আছে। তাহারা হইতেছে (১) গ্রহণ (বিষয় গ্রহণ) (২) স্বরূপ (প্রকাশ ধর্ম্ম), (৩) অস্মিতা (প্রকাশের সহিত যুক্ত সাত্ত্বিক অহংকার), (৪) অন্বয় (গুণত্রয়ের সহিত যুক্ততা), (৫) অর্থবত্ত্ব (ভোগদান সামর্থ্য)। সংযমদ্বারা সেই সকল রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকে। ইন্দ্রিয়গণ জিত হইলে মনের মত গতি লাভ করা যায়, অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র যথাস্থানে যাওয়া যায়। বিকরণ ভাব (দেহ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়দিগের দূরস্থ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান-লাভ-সামর্থ্য) এবং প্রধান-জয় (যাবতীয় প্রকৃতি ও বিকৃতির উপর প্রভুত্ব) লাভ করা যায়। এই ত্রিবিধ সিদ্ধিকে "মধু প্রতীক" বলে। সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের অন্যতা-খ্যাতি অর্থাৎ তাহারা যে এক নহে ভিন্ন, এই জ্ঞান হইতে সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব (সর্ব্ব বস্তুর উপর আধিপত্য) এবং সর্ব্বজ্ঞতা-লাভ হয়।

এই সকল সিদ্ধি ব্যুত্থান-কালে সিদ্ধি বলিয়া গণ্য হইলেও সমাধির উপসর্গ (বিঘ্ন)। ইহাদের প্রতি বৈরাগ্য হইলে দোষবীজক্ষয় (অবিদ্যাদির নাশ) হয়, এবং কৈবল্য প্রাপ্তি হয়।

যোগীরা চারি প্রকার—(১) প্রথমকল্পিক, (২) মধুভূমিক, (৩) প্রজ্ঞা-জ্যোতি, (৪) অতিক্রান্ত ভাবনীয়। যাহারা যোগ আরম্ভ করিয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমকল্পিক। এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মধুভূমিক। ভূতেন্দ্রিয় জয় করিয়া যাঁহারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজ্ঞা-জ্যোতি। চিত্তবিলয় করিতে যাঁহারা কৃতসংকল্প, তাঁহারা অতিক্রান্ত ভাবনীয়। সপ্ত প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা তাঁহাদেরই। ইহাদিগের মধ্যে মধুভূমিক যোগীদিগের সত্ত্বশুদ্ধি দর্শন করিয়া দেবগণ (স্থানিগণ) তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করেন। যোগিগণ তাহাতে সঙ্গ (কামনা) করিবেন না, অথবা যোগের ফল দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না, অন্যথা অনিষ্ট সম্ভাবনা।

ক্ষণ এবং তাহার পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে সংযম করিলে বিবেক-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য অবগত হওয়া যায় জাতি, লক্ষণ ও অবস্থান-দ্বারা। কিন্তু যেখানে সমানাকার বস্তুদিগের মধ্যে ভেদ ইহাদের দ্বারা অবধারণ করা যায় না, সেখানেও ক্ষণ ও তাহাদের ক্রমের প্রতি সংযমের প্রয়োগদ্বারা এই ভেদ জানিতে পারা যায়। এতাদৃশ সংযমের দ্বারা যে বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা অগাধ সংসার-সমুদ্রহইতে লোককে উদ্ধার করে

বলিয়া "তারক"। ইহার অবিষয় কিছুই নাই। সর্ব্ববস্তু এবং বস্তুর অতীত অনাগত সর্ব্বপ্রকার অবস্থাই ইহার জ্ঞাত। ইহার জ্ঞানে ক্রম নাই। সর্ব্ব-বস্তুই যুগপৎ জ্ঞাত।

বুদ্ধির ও পুরুষের শুদ্ধিদ্বারা সাম্য হইলে কৈবল্য হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব যখন রজস্তমোলেশশূন্য হয় এবং তাহাতে পুরুষ যে তাহা হইতে পৃথক, এই জ্ঞান মাত্র থাকে, এবং তাহাতে অবস্থিত ক্লেশবীজ দগ্ধ হইয়া যায়, তখন এই শুদ্ধিবশতঃ তাহা পুরুষের সদৃশ হয়। পুরুষের যে ভোগের ভাব হয়, তাহার অভাবই পুরুষের শুদ্ধি। এই অবস্থা হইলে কৈবল্য হয়। কৈবল্য অবস্থায় পুরুষ "স্বরূপমাত্রজ্যোতি", অমল ও কেবলী হন।

১১

নির্ম্মাণ-চিত্ত ও কায়ব্যূহ

যোগবলে নূতন চিত্ত-নির্ম্মাণের শক্তি-লাভ হয়। কেবলমাত্র অস্মিতা হইতেই যোগী বহু চিত্ত সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহাদের জন্মকালে লব্ধ চিত্ত এই সকল সৃষ্ট চিত্তের অর্থাৎ তাহাদের ইচ্ছাদি উৎপাদনের কর্ত্তা।

প্রসংখ্যানের দ্বারা যাহার চিত্তের সংস্কারের লোপ সাধিত হইয়াছে, তাদৃশ যোগী ভূতানুগ্রহ-নিমিত্ত জ্ঞান-ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া থাকেন। যেমন কপিল আসুরিকে করিয়াছিলেন। চিত্ত ব্যতীত এতাদৃশ উপদেশ সম্ভবপর হয় না। যোগী তখন "অস্মিতা"মাত্ররূপ উপাদানদ্বারা নূতন চিত্ত নির্ম্মাণ করেন ও তাহাদ্বারা কার্য্য সম্পাদন করেন। ইচ্ছামাত্রই এতাদৃশ চিত্ত রুদ্ধ হয় বলিয়া তাহাতে অবিদ্যা-সংস্কার জন্মিতে পারে না এবং তাহা বন্ধের কারণ হয় না। আবার যোগী যখন ভোগদ্বারা, শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় করিতে ইচ্ছুক হন, তখন এককালে বহু শরীর ও তৎসহ বহুচিত্তের সৃষ্টি করিতে পারেন। এই সকল শরীরকে "কায়ব্যূহ" বলে। এই সকল চিত্ত ও শরীর যোগীর সহজাত চিত্তের অধীন থাকে।

এই সকল নির্ম্মাণ-চিত্তের মধ্যে যাহারা ধ্যান বা সমাধিজাত, তাহারা অনাশয় অর্থাৎ তাহাদের আশয় বা রাগাদি প্রবৃত্তি নাই, এবং পুণ্য-পাপের সহিত সম্বন্ধ নাই। জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, ও তপস্যাদ্বারা যে সকল নির্ম্মাণ-চিত্ত নির্ম্মিত হয়, তাহারা সেরূপ নহে। নির্ম্মাণ-চিত্তকে সিদ্ধ-চিত্তও বলে।

১২

কর্ম্মফল ও কর্ম্মবাসনা

সাধারণ লোকের কর্ম্ম ত্রিবিধ—শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্ল-কৃষ্ণ। যে কর্ম্মের ফল সুখ, তাহা শুক্ল। যাহার ফল দুঃখ, তাহা কৃষ্ণ। যজ্ঞরত ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র। কিন্তু যোগীদিগের কর্ম্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ। যোগী যেভাবে কর্ম্ম করেন তাহাতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়, এবং চিত্তস্থ পুণ্য-পাপও নিবৃত্ত হয়। তাহাদের কর্ম্ম নিষ্কাম। সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম কিছুই তাঁহারা করেন না। জীবনধারণের জন্য যে কর্ম্ম করেন, তাহার কোনও সংস্কার উৎপন্ন হয় না, এই জন্য তাহাদের কর্ম্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ।

জাতি, আয়ু ও ভোগ কর্ম্মের ত্রিবিধ বিপাক বা ফল। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মের বিপাকের অনুরূপ বাসনারই অভিব্যক্তি হয়। যে কর্ম্মের ফল হইবে, তাহার সংস্কারের নাম কর্ম্মাশয়। আর জাতি, আয়ু ও ভোগের স্মৃতি যাহা হইতে অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম বাসনা। কর্ম্মাশয় ও বাসনা উভয়ই সংস্কার। কতক কর্ম্ম জন্ম, আয়ু ও ভোগ প্রসব করে, কতক সেই জন্মের ভোগের স্মৃতি উপস্থাপিত করে। জন্ম-জন্মান্তরের অসংখ্য কর্ম্মবাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত এবং পুনর্জন্মের আরম্ভক হয়, কতক সেই জন্মের উপযুক্ত রুচি উৎপাদন করে। মনুষ্য-জন্মের কর্ম্মবাসনা-মনুষ্য-জন্মে অভিব্যক্ত হয়। অন্য জন্মে তাহা প্রসুপ্ত থাকে। বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত অতীত মনুষ্য-জন্মের কর্ম্মবাসনাই বর্ত্তমান জন্মের রুচি বা প্রবৃত্তি। ভবিষ্যতে যদি দেবযোনি অথবা তির্যকযোনি-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে বিগত দেবজন্ম অথবা তির্য্যক-জন্মের বাসনা তখন উদ্বোধিত হইবে।

স্মৃতি ও বাসনা অভিন্ন। সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। জাতি, দেশ ও কালের ব্যবধান থাকিলেও বাসনাসকল অব্যবহিতের ন্যায় উদিত হয়। সংস্কার সঞ্চিত হইবার পরে বহুদিন গত হইলেও, বহুজন্ম ও বহুদেশের ব্যবধান থাকিলেও, স্মৃতি উঠিতে বিলম্ব হয় না।

মরণ-ভয় (আশিষ) অনাদি। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয়, যে মরণের সংস্কারও অনাদি।

চিত্তে বাসনাসকল সঞ্চিত হয়, তাহাদের হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনদ্বারা। অবিদ্যামূলক প্রত্যয়সকল বাসনার হেতু। ধর্ম্ম হইতে সুখ, অধর্ম্ম হইতে দুঃখ। ধর্ম্মোদ্ভূত সুখ হইতে সুখের প্রতি রাগ, এবং অধর্ম্মজাত দুঃখ হইতে দুঃখের

প্রতি দ্বেষ। রাগ ও দ্বেষ হইতে সুখের প্রাপ্তির জন্য, এবং দুঃখের পরিহারের জন্য প্রযত্ন, এবং এই প্রযত্নবশতঃ জীব কায়, মন ও বাক্যদ্বারা কাহারও উপকার, কাহারও অপকার করে, এবং তাহার ফলে পুনরায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ-দুঃখ ও রাগদ্বেষের উদ্‌ভব হয়। এইরূপে সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অবিদ্যাই এই সংসারচক্রের নেত্রী। অবিদ্যাই যাবতীয় ক্লেশের মূল এবং অবিদ্যাই সকলের হেতু। বাসনার ফল দেহ, স্মৃতি প্রভৃতি। বাসনার আশ্রয় হইতেছে মন, এবং যাহা বাসনাকে অভিব্যক্ত করে—শব্দাদিবিষয়—তাহাই বাসনার আলম্বন। এই সকল কারণের—হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের—অভাব হইলেই বাসনার বিলোপ হয়।

১৩

কৈবল্য

যোগদর্শনের বিভূতিপাদে যে সকল অলৌকিক শক্তিলাভের উপায় বর্ণিত আছে, তাহারা জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধিকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। জন্মকালে বিশেষ এক প্রকার দেহ-প্রাপ্তির ফলে কাহারও কাহারও সিদ্ধিলাভ হয়। ক্লেয়ারভয়ান্‌স্‌ প্রভৃতি এই জাতীয় সিদ্ধি। ঔষধি-সেবনেও কখনো কখনো অলৌকিক শক্তি-লাভ হয়। মন্ত্র, তপস্যা ও যোগদ্বারাও হয়।

মনুষ্য দেহের দেবশরীরে অথবা তির্য্যক্‌যোনিতে পরিণাম হইতে পারে। এই জাত্যন্তর পরিণাম হয়, "প্রকৃতির আপূরণ" হইতে, অর্থাৎ সেই শরীরে যে প্রকৃতি, তাহার মধ্যে দেবশরীরের ও দেবপ্রকৃতির অথবা পশু-শরীরের ও পশু-প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতে। যে নিমিত্তবশতঃ (ধর্ম্মাধর্ম্ম) এতাদৃশ পরিণাম হয়, তাহা এই পরিণামের প্রয়োজক কারণ নহে। প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার পরিণামের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। নিমিত্তদ্বারা এই আবরণ তিরোহিত হয় মাত্র। কৃষক যেমন ক্ষেত্রে জলপ্রবাহের অবরোধক আলি কাটিয়া দিলে, সেই পথে জল প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ অবরুদ্ধ পরিণাম আবরণ-উন্মোচনের ফলে প্রকাশিত হয়। দিব্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মানুষ-ধর্ম্মের নিরোধ হইলে (মানুষ-ধর্ম্ম দিব্যধর্ম্মের আবরণ, তাহা অপাবৃত হইলে) দিব্যধর্ম্মের আবির্ভাব হয়।

কৈবল্য অর্থে অলৌকিক শক্তি-লাভ বা মহত্তর যোনিলাভ নহে। বিশেষরূপে যাহারা পুরুষকে দর্শন করেন, তাঁহাদের আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা বা আত্মতত্ত্বের ভাবনা বিনিবৃত্ত হয়; কেননা আত্মতত্ত্ব তাহাদের অধিগত।

তাহাদের চিত্ত "বিবেক নিম্ন" (অর্থাৎ দ্রষ্টৃ ও দৃশ্যের ভেদজ্ঞানরূপ যে বিবেক, তাহা তাহাদের চিত্তের নিম্নে অবস্থিত থাকে), এবং "কৈবল্য-প্রাগ্‌ভার" (অর্থাৎ কৈবল্যের "প্রাগ্‌ভার" বা অবধি পর্য্যন্ত প্রসারিত)। সেরূপ চিত্ত কৈবল্য ফল প্রাপ্ত হয়, এবং "ধর্ম্মমেঘ" নামক ধ্যানে নিবিষ্ট হয়।[১]

সমাধির ছিদ্রদিগের মধ্যে (অর্থাৎ বিভিন্ন কালে জাত সমাধিসকলের অবকাশে), পূর্ব্ব সংস্কার-প্রভাবে এক একবার "অহং", "মম" প্রভৃতি বিভিন্ন প্রত্যয় উপস্থিত হইয়া থাকে।[২]

ক্লেশসকল (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) যেরূপে বিনষ্ট হয় বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের সংস্কারসকলও সেইরূপ বিনষ্ট হয়।[৩]

প্রসংখ্যান উপস্থিত হইলেও, যিনি তাহার ফলস্বরূপ কিছুই প্রার্থনা করেন না (অকুসীদ), তাঁহারই "বিবেক-খ্যাতি" হয় ; বিবেক-খ্যাতি হইতে "ধর্ম্মমেঘ" নামক সমাধি উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মমেঘ সমাধির ফলে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি ঘটে। তাহা হইতে ক্লেশ-কর্ম্মরূপ মলের আবরণমুক্ত জ্ঞানের অনন্তত্ব-প্রাপ্তি হয়, এবং জ্ঞেয় অল্প হইয়া পড়ে। ধর্ম্মমেঘ-সমাধির উদয় হইলে গুণসকল কৃতার্থ হয়। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ-সাধন গুণদিগের উদ্দেশ্য। অপবর্গ-সাধন সমাপ্ত হইলে, গুণদিগেরও পরিণামক্রম সমাপ্ত হয়। তাহাদের নানাবিধ বস্তু-উৎপাদনের প্রয়োজনের শেষ হয়।

এই পরিণামক্রম কি ? কালের সূক্ষ্মতম অংশের নাম ক্ষণ। ক্ষণ আপনা হইতে অনুভূত হয় না। যাহা ক্ষণের প্রতিযোগী (Co-relative), তাহাদ্বারাই ক্ষণের জ্ঞান হয়। যাহা ক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই ক্ষণের প্রতিযোগী। বস্তুর পরিণামই ক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে, এবং তাহাই ক্ষণের প্রতিযোগী। পরিণামশ্রেণীর অবসানই পরিণামের অপরান্ত (অপর+অন্ত)। পরিণামের অবসানদ্বারাই পরিণামের ক্রমের জ্ঞান হয়। পরিণামের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্তই পরিণামের ক্রম। এই ক্রমের সমাপ্তি হয়, যখন গুণসকলকর্তৃক পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ-সাধন পরিসমাপ্ত হয়। তখন সেই পুরুষের সম্বন্ধে গুণদিগের আর কোনও পরিণাম হয় না। পুরুষ ও গুণত্রয় উভয়ই নিত্য। পুরুষ কূটস্থ নিত্য। গুণত্রয় পরিণামী হইলেও তাহাদের স্বরূপের বিনাশ হয় না, এই জন্য তাহারাও নিত্য-পরিণামী নিত্য। গুণের ধর্ম্ম বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি।

১। তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্য-প্রাগ-ভারং চিত্তম্। ৪।২৬

২। তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ। ৪।২৭

৩। হানম্ এষাং ক্লেশবৎ উক্তং। ৪।২৮

তাহাতেই "পরিণামাবসান-নিগ্র্াহ্য" ক্রম পরিসমাপ্ত হয়। গুণসকল নিত্য, তাহাতে ক্রম-সমাপ্তি হয় না। সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রবাহরূপে সংসার গুণ-ত্রয়ে বর্ত্তমান। কৈবল্যপ্রাপ্ত যোগীর সম্বন্ধে সংসারের অবসান হয়, কিন্তু অন্যের পক্ষে হয় না।[১]

গুণত্রয়কর্তৃক যখন পুরুষের ভোগ-ও-অপবর্গ-সাধন সমাপ্ত হয়, তখন তাহারা স্বকারণ প্রধানে লয় প্রাপ্ত হয়। তাহাদের ব্যুত্থান-সংস্কার, সমাধি-সংস্কার ও নিরোধ-সংস্কার মনে লীন হয়, মন অস্মিতায় লীন হয়, অস্মিতা লিঙ্গে (বুদ্ধিতে) লীন হয়, এবং লিঙ্গ অলিঙ্গ প্রধানে লয়-প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রতিপ্রসব। এই প্রতিপ্রসব বা প্রতিসর্গই কৈবল্য। চিতিশক্তি যখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার সেই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ অবস্থাই কৈবল্য। প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য হইয়া নিত্যকাল স্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে জ্ঞান অনন্ত হয় এবং জ্ঞেয় বিষয় অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ভাষ্যকার অনন্ত আকাশে খদ্যোতের দৃষ্টান্ত দ্বারা, অনন্ত জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের তুলনা করিয়াছেন। সাধারণ লোকের জ্ঞান সামান্য। কিন্তু জ্ঞেয় অনন্ত, রজস্তম-কর্তৃক অভিভূত বুদ্ধিসত্ত্ব বা জ্ঞানশক্তি আবৃত বা সীমাবদ্ধ থাকে। এই আবরণ যখন উন্মুক্ত হয়, তখন বুদ্ধিসত্ত্বের জ্ঞান অনন্ত হইয়া পড়ে। সেই জ্ঞান অতিমানস (Supra-mental) জ্ঞান—পরস্পর-সংবদ্ধ চিত-ও-অচিত-সংবলিত অনন্ত বিশ্বের জ্ঞান। তাহার তুলনায় প্রত্যেক জ্ঞেয় বস্তু অতি ক্ষুদ্র। সাধারণ জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ থাকে। ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে এই ভেদ থাকে না, কেননা অহংকার প্রকৃতি-সম্ভূত। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভেদহীন জ্ঞান কিরূপ, তাহা আমরা জানি না।



১। ক্ষণ প্রতিযোগী পরিণামাপরান্ত নিগ্র্াহ্যঃক্রমঃ। (৪।৩৩)

উত্তর মীমাংসা
বা
বেদান্ত দর্শন

বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ। বেদের তিন কাণ্ড—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। শেষ কাণ্ড উপনিষদ্, তাহাই বেদান্ত। উপনিষদেই বেদের শেষ-সিদ্ধান্ত বা সারভাগ নিহিত আছে। এই অর্থেও উপনিষদ্ বেদান্ত।

উপনিষদের সংখ্যা বহু। সকল উপনিষদেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সু-সম্বদ্ধ দর্শনের আকারে বিবৃত হয় নাই। বিভিন্ন উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্ম-তত্ত্বে মধ্যে সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যও প্রতীত হয় না। মহর্ষি বাদরায়ণ উপনিষদ্দিগের মর্ম্ম সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া বিভিন্ন বর্ণনার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। বাদরায়ণের সূত্রের নাম ব্রহ্ম-সূত্র। "ব্রহ্ম-সূত্র্যতে (সূচ্যতে) এভিঃ ইতি ব্রহ্ম সূত্রাণি (শ্রীধর)। ইহাদের দ্বারা ব্রহ্ম সূচিত হন বলিয়া ইহাদিগকে ব্রহ্মসূত্র বলে। ব্রহ্মসূত্রসমূহের সংখ্যা কোন মতে ৫৫৫, কোন কোনও মতে ৫৫৮। সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও সাধন ফল এই চারি অধ্যায়ে ব্রহ্মসূত্র বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া "পাদ" আছে। প্রত্যেক পাদে একাধিক অধিকরণ আছে।

ব্রহ্ম-সূত্রের বহু ভাষ্য ও টীকা আছে। বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে বহু শাখার উদ্ভব হইয়াছে। বহু-ভাষ্য-সমন্বিত বেদান্ত সূত্রই বহুশাখা-সমন্বিত বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি।

বেদান্ত সূত্রের এক নাম শারীরক-সূত্র। শরীরে অধিষ্ঠিত জীব বা শরীরে অনুভূত সুখ ও দুঃখের নাম শারীরক। তৎসম্বন্ধীয় সূত্রসমূহ শারীরক সূত্র। যে সকল সূত্রে জীবের অধিষ্ঠান শরীরের অথবা শরীরে উৎপন্ন সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-বিষয়ক আলোচনা আছে, তাহাদের নাম শারীরক মীমাংসা সূত্র।

জৈমিনির কর্ম্ম মীমাংসায় বেদোক্ত ধর্ম্মের ও তাহার অনুষ্ঠান হইতে যে ফলের উৎপত্তি হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বেদের প্রথম কাণ্ড ইহার বিষয় বলিয়া জৈমিনির দর্শনের নাম পূর্ব্ব-মীমাংসা। বেদের শেষ বা উত্তর কাণ্ড বাদরায়ণের দর্শনের বিষয় বলিয়া তাহার নাম উত্তর-মীমাংসা। চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রমে অবলম্বনীয় বলিয়াও উত্তর মীমাংসার নাম অন্বর্থ।

বেদান্ত-সূত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ দর্শনের আকারে রচিত হয় নাই। উপনিষদের তত্ত্ব ব্যাখ্যাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাতে ঈশ্বর ও জগৎ এবং জীবাত্মার সংসার-ভ্রমণও মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদিগকে সু-সংবদ্ধ করা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া উপনিষদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। অধিকাংশ সূত্রেই দুইটি বা তিনটির অধিক শব্দ নাই। তাহাদের একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর। ইহার ফলে বিভিন্ন ভাষ্যে বিভিন্ন অর্থ গৃহীত হইয়াছে এবং বিভিন্ন দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার উপর সগুণ ঈশ্বর-বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কেহ বা নির্গুণ নির্বিশেষ অসঙ্গ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

রচনাকাল

ব্রহ্মসূত্র মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে (১৩।৫)। ব্রহ্মসূত্রেও "স্মর্য্যতে" (স্মৃতিতে উক্ত আছে) বলিয়া গীতার উল্লেখ আছে। উভয় গ্রন্থ একজনের লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে জৈনও বৌদ্ধ মতেরও উল্লেখ আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ ইহাকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী বলেন। ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির নাম এগারো বার উল্লিখিত হইয়াছে। জৈমিনিও পূর্ব্ব মীমাংসায় বহুস্থলে—কোনস্থলে পূর্ব্বপক্ষরূপে কোনও স্থলে স্বীয় মতের সমর্থকরূপে—বাদরায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। প্রাচীন ভারতে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে তাহাদের মধ্যে এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। ইহা হইতে ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ এবং জৈমিনির গুরু বেদব্যাস এক ব্যক্তি কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ব্রহ্মসূত্রেই সূত্রকারের মত-সমর্থনে বাদরায়ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহা হইতেও বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা কিনা তাহাতেই সন্দেহ হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে এ প্রথা বিরল ছিল না, ইহাও কেহ বলিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রে সাংখ্য ও বৈশেষিক মতের উল্লেখ আছে। গরুড় পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং মনুসংহিতায় বেদান্ত সূত্রের উল্লেখ আছে হরিবংশেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতেরা খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ২০০ অব্দ ব্রহ্মসূত্রের রচনাকাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু মাক্ষ-মূলারের মতে বেদান্তসূত্র গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী। পরাশরের পুত্র বলিয়া বেদব্যাসের নাম পারাশর্য্য। পাণিনি "ভিক্ষু-সূত্রের" রচয়িতা বলিয়া এক পারাশর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই ভিক্ষুসূত্র ও বেদান্ত-সূত্র অভিন্ন। মাক্ষমূলার বলেন, ইহার উপর নির্ভর করা গেলে বেদান্তসূত্রকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হয়।

অন্যান্য দর্শনের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সম্বন্ধ

ব্রহ্মসূত্রে ন্যায় দর্শনের উল্লেখ নাই। কিন্তু বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব্ব মীমাংসা, কয়েকটি বৌদ্ধ দর্শন, লোকায়ত দর্শন এবং ভাগবত মতের সমালোচনা আছে। রামানুজ বলেন পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা এক সময়ে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শঙ্কর ইহা স্বীকার না করিলেও উভয় দর্শনই বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং বেদের ব্যাখ্যা উভয়েরই উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে, যে উহারা এক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধ মত, লোকায়ত মত এবং ভাগবত মত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগমতের বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকিলেও, তাহাদের কতকগুলি মত বেদান্তসূত্রে গৃহীত হইয়াছে। ভাগবত মতের সমালোচনা থাকিলেও গীতা ও ভাগবত মতের বিশিষ্ট প্রভাব ব্রহ্মসূত্রের উপর দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য ও টীকা

ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বে যে বেদান্ত দর্শন প্রচারিত হইয়াছিল এবং বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে বাদরি, জৈমিনি, আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔডুলোমী, কার্ষ্ণ্য কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীনতম ভাষ্যকার ছিলেন বোধায়ন। আচার্য্য রামানুজ বোধায়নের ভাষ্যই অনুসরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বোধায়নের ভাষ্যই বেদান্তের শঙ্করপূর্ব্ব যুগের ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু বোধায়নের ভাষ্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বোধায়নের পূর্ব্বে উপবর্ষ নামে এক বৃত্তিকারের নাম পাওয়া যায়। শঙ্কর-ভাষ্যে তাঁহার উল্লেখ আছে। পাণিনির গুরু উপবর্ষ এবং বৃত্তিকার উপবর্ষ এক ব্যক্তি কিনা, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই।

শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব প্রভৃতি-কৃত ব্রহ্ম-সূত্রের বহু ভাষ্য এপর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে (৭৮০) গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য মাণ্ডুক্যকারিকায় উক্ত উপনিষদের অদ্বৈত মতে ব্যাখ্যা করেন। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ, গোবিন্দের শিষ্য শঙ্কর (৭৮৮-৮২০)। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের নাম শারীরক ভাষ্য। শঙ্কর-ভাষ্যরূপ মূল হইতে বহু-সংখ্যক টীকা গ্রন্থ উদ্‌ভূত হইয়াছে। শঙ্করের শিষ্য আনন্দগিরি "ন্যায় নির্ণয়" এবং গোবিন্দানন্দ "রত্নপ্রভা" এবং বাচস্পতি মিশ্র (৮৪১ খৃঃ অঃ) "ভামতী" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। অমলানন্দ ভামতীর "কল্পতরু" নামে টীকা, এবং অপ্পয় দীক্ষিত (১৫৫০) "কল্পতরু-পরিমল" নামে কল্পতরুর টীকা রচনা করেন। পদ্মপাদ (সনন্দন) রচিত পঞ্চপাদিকায় ব্রহ্মসূত্রের কেবল প্রথম চারি সূত্রের টীকা আছে। প্রসিদ্ধ মীমাংসক মণ্ডন মিশ্র শঙ্করকর্ত্তৃক তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইবার পরে তাঁহার শিষ্যত্ব এবং সুরেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া শঙ্করের অনুমতি অনুসারে শঙ্কর-ভাষ্যের এক বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন। কিন্তু শঙ্করের অন্যান্য শিষ্যগণ বলেন যে তিনি যখন মীমাংসক ছিলেন, তখন তিনি শঙ্করভাষ্যের টীকারচনার অধিকারী নহেন। ইহার পরে সুরেশ্বর "নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পদ্মপাদ এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন, কিন্তু এই টীকা গৃহদাহে ভস্মসাৎ হয়। এই গ্রন্থ শঙ্কর পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি স্মৃতি হইতে তাহার উদ্ধার করেন, এবং পদ্মপাদ তাহা আবার লেখেন। প্রকাশাত্মন্ (১২১০) পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার "পঞ্চপাদিকা বিবরণ" নামে টীকা রচনা করেন। অখণ্ডানন্দ এবং নরসিংহাশ্রম মুনি এই শেষোক্ত গ্রন্থের "তত্ত্বদীপন" এবং "বিবরণ ভাব প্রকাশিকা" নামক দুইখানি টীকা প্রণয়ন করেন। অমলানন্দ এবং বিদ্যাসাগরও পঞ্চপাদিকার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম "পঞ্চপাদিকা-দর্পণ" ও "পঞ্চপাদিকা-টীকা"। বিদ্যারণ্যের (১৩৫০) "বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ" গ্রন্থে "পঞ্চপাদিকা বিবরণের" ব্যাখ্যা আছে। বেদান্তের মুক্তি সম্বন্ধে বিদ্যারণ্যের "জীবন্মুক্তি বিবেক" গ্রন্থ বিখ্যাত।

বিদ্যারণ্যের "পঞ্চদশী" বেদান্ত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। সুরেশ্বরের "নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি" ও বিখ্যাত গ্রন্থ। সর্ব্বজ্ঞাত্মা-মুনির (৯০০ খৃঃ) "সংক্ষেপ-শারীরক",

এবং শ্রীহর্ষের (১১৯০) "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" এবং চিৎসুখের "তত্ত্বদীপিকা"ও সুপরিচিত গ্রন্থ। ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রণীত (১৫৫০) "বেদান্ত পরিভাষা" বেদান্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাহার পুত্র রামকৃষ্ণ এবং অমরদাস নামে এক পণ্ডিত "শিক্ষামণি" ও "মণিপ্রভা" নামে বেদান্ত পরিভাষার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতীর "অদ্বৈত সিদ্ধি" বেদান্ত সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। "গৌড় ব্রহ্মানন্দী" "বিটঠলেশোপাধ্যায়ী" এবং "সিদ্ধিব্যাখ্যা" নামে ইহার তিনখানি টীকা আছে। "অদ্বৈত সিদ্ধি সিদ্ধান্ত সার" নামে ইহার এক সংক্ষিপ্ত সার লিখিয়াছিলেন সদানন্দ ব্যাস। সদানন্দের "দেবান্ত-সারের" "সুবোধিনী" এবং "বিদ্বন্ মনোরঞ্জিনী" নামে দুইখানা টীকা আছে। সদানন্দ যতির "অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি"ও একখানা মূল্যবান্ গ্রন্থ। আনন্দ বোধ ভট্টারকের "ন্যায় মকরন্দে" মায়াবাদ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকাশানন্দের "বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী"তে চিতের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ প্রভৃতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপ্পয় দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তলেশ" এবং নরসিংহাশ্রমের "ভেদাধিকার" উল্লেখযোগ্য। "বেদান্ত তত্ত্ব দীপিকা" এবং "সিদ্ধান্ত তত্ত্ব" নামে অন্য দুইখানি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান ভিক্ষুর "বিজ্ঞনোমৃত"ও একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আরও বহু গ্রন্থ বেদান্ত সম্বন্ধে আছে।

ব্রহ্মসূত্রের সংক্ষিপ্ত সার

ব্রহ্ম-সূত্র চারি অধ্যায় ও ষোড়শ পাদে বিভক্ত। গ্রন্থারম্ভেই আছে (১।১।১) "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।" অথ অর্থাৎ ইহার পরে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। কিসের পরে? শঙ্কর বলেন নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহ ও অমুত্র ফলভোগবিরাগ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান (মনের স্থৈর্য্য) ও শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে বিশ্বাস), এই সকল লাভ ও মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা, এই সকল হইলে তাহার পরে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। রামানুজ বলেন, বেদপাঠ ও পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের আলোচনা শেষ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের অধিকারী হওয়া যায়। ইহাই প্রথমপাদের প্রথম সূত্র। দ্বিতীয় সূত্রে আছে—যাহা হইতে জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তৃতীয় সূত্রে আছে—ব্রহ্ম-তত্ত্ব শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। তাহার অন্য উপায় নাই। শাস্ত্রেই আছে ব্রহ্ম ভূতদিগের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ। চতুর্থ সূত্রে আছে "তৎতুসমন্বয়াৎ"—ব্রহ্মই সকল বেদান্তে প্রতিপাদিত। বেদান্ত বাক্যসকলের

তাৎপর্য্য নির্ণয় দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায় যে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ।

এই চারিসূত্রের ভূরি ভূরি ব্যাখ্যা ভাষ্য ও টীকাকারগণ দিয়াছেন। এই চারিসূত্রকে চতুঃসূত্রী বলে। পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকায় কেবল চতুঃসূত্রীরই টীকা আছে। পঞ্চম সূত্র হইতে পাদ শেষ পর্য্যন্ত (১।১।৩২) ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ, এই মতের বিরুদ্ধ যুক্তি সকল খণ্ডিত হইয়াছে। প্রথমতঃ উপনিষদের "সৎ" সাংখ্যের প্রধান নহেন; প্রধান অচেতন, কিন্তু বেদের "সৎ" "ঐক্ষত" (অর্থাৎ আলোচনা করিলেন), সুতরাং চেতন। শ্রুতিতে বহু স্থলে ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। (আনন্দময়=প্রচুর আনন্দের আধার)। উপনিষদে ব্রহ্মকে বুঝাইতে আকাশ, প্রাণ ও জ্যোতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদে কতকগুলি শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

তৃতীয়পাদের প্রথমে উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকে যে সাংখ্যের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হয় নাই, ব্রহ্মই তাহাদের লক্ষ্য, ইহা বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে যে "দহরে"র কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মবাচক, ইহা বলা হইয়াছে। তাহার পরে দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কিনা তাহার বিচার করিয়া দেবতাদিগের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। পরে শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নাই বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যাতেও অধিকার নাই বলা হইয়াছে।

চতুর্থ পাদের প্রথমে বলা হইয়াছে যে কঠোপনিষদে সাংখ্যের প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হয় নাই। উক্ত উপনিষদের ১।৩।১১ শ্লোকে যে অব্যক্তের কথা আছে (মহতঃ পরং অব্যক্তং), তাহার অর্থ শরীর, শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থা। উক্ত উপনিষদের "মহৎ" শব্দের অর্থ বুদ্ধি নহে। "অজাম্ একাং" ইত্যাদি শ্লোকে (শ্বেতাশ্বতর উপ) প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ অগ্নি, জল ও পৃথিবীর রূপ। পরমেশ্বরের যে শক্তি হইতে এই তিন সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাই অজা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাহাতে "পঞ্চ পঞ্চজন" প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে আত্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু "এই পঞ্চ-পঞ্চজন" সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নানাবিধ, তাহাদিগকে পাঁচটি করিয়া একত্রিত করিবার কারণ নাই। আবার উপনিষদে তত্ত্ব সংখ্যা ২৭টি, কেননা আকাশ ও আত্মা উপরিউক্ত পঞ্চ পঞ্চজনের অতিরিক্ত। "সমাকর্ষাৎ" (১।৪।১৫) সূত্রে তৈত্তিরীয় উপনিষদের

"অসৎ বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ" এই শ্লোক লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই বাক্যে অসৎকেই আদি কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও আছে "তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইব" এবং "তৎ সত্যং ইতি আচক্ষতে" তাহাকে সত্য বলা হয়। উক্ত শ্লোকে ব্রহ্মকে অসৎ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ তখন তিনি নাম-রূপ ধারণ করেন নাই। ইহার পরে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অবিরোধ) বিরুদ্ধ পক্ষের আপত্তির খণ্ডন এবং বিরুদ্ধ মত সকলের সমালোচনা ব্যতীত ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে সম্বন্ধ এবং ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি এবং তাহাতে লয়ের বর্ণনা আছে। আত্মার স্বরূপ ও তাহার ধর্ম্ম, এবং দেহের সহিত, স্বকৃত কর্ম্মের সহিত এবং ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের বর্ণনাও আছে।

প্রথম পাদের প্রথমে সাংখ্য ও যোগদর্শন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগ স্মৃতি হইলেও মনু ও ব্যাস-প্রণীত স্মৃতির সহিত তাহাদের বিরোধ আছে। সাংখ্যে প্রধান ব্যতীত অন্য যে সকল তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহাদের অনেকগুলির উল্লেখ বেদে নাই। সুতরাং সাংখ্য-মত গ্রহণীয় নহে।

ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন, উভয়ের স্বভাব ভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। এ আপত্তির মূল্য নাই, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশলোমাদির উদ্ভব দেখা যায়। জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন যদি হয়, তবে প্রলয়ে ব্রহ্মে বিলীন হইবে এবং এই বিলয়ে জগতের দোষ ব্রহ্মে সঞ্চারিত হইবে, এই আপত্তি মূল্যহীন। ঘটের যখন ধ্বংস হয়, তখন ঘটের গুণ (বা দোষ) উপাদান মাটিতে সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না (২।১।৯)।

তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। তাহার প্রয়োজন থাকিলেও, তাহার দোষ নিরস্ত হয় না। প্রকৃত সত্য কেবল বেদ হইতেই জানা যায় (২।১।১১)।

উপনিষদে আছে যাহাকে মৃত্তিকার বিকার বলা যায়, তাহা 'বাচারম্ভণ' মাত্র—নামমাত্র, মৃত্তিকা হইতে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তেমনি জগৎও নামমাত্র, ব্রহ্ম হইতে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। শ্রুতিতে যে আছে, জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল, তাহার অর্থ জগৎ তখন নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হয় নাই, এইমাত্র। যাহা কার্য্য, তাহা কারণের মধ্যে পূর্ব্বেই থাকে। সুতরাং কার্য্য-জগৎ কারণ-ব্রহ্মের মধ্যে অব্যক্ত ছিল।

শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা

অধিক বলিয়াছেন। জগৎ-সৃষ্টিতে কোনও উপকরণ পূর্ব্ব হইতে ছিল না। দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয়, ব্রহ্মও তেমনি জগতে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্ম যদি জগৎরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, তবে সমগ্র ব্রহ্ম অথবা তাহার অংশ এইরূপ হইয়াছেন? সমগ্র ব্রহ্ম যদি জগতে পরিণত হইয়া থাকেন, (কৃৎস্ন প্রসক্তি) তাহা হইলে এখন আর ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই। যদি অংশমাত্র জগতে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ম যে নিরবয়ব, বেদের এই কথার সহিত বিরোধ (নিরবয়বত্ব শব্দ কোপঃ) হয়। ইহার উত্তর এই যে শ্রুতিতে আছে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও, নির্বিকারই আছেন। সুতরাং উপরিউক্ত আপত্তি মূল্যহীন। স্বপ্নকালে নিজের মধ্যে বিচিত্র রথ আদির সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহাতে আত্মার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না। জগৎ-সৃষ্টিও সেইরূপ।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিযুক্ত এই কথা শ্রুতিতে আছে। তাঁহার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও সকল ইন্দ্রিয়শক্তি তাঁহার আছে। জগৎ-সৃষ্টিতে তাঁহার কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় না। তিনি আপ্তকাম। সৃষ্টি তাঁহার লীলা। "লোকবৎ লীলা কৈবল্যম্।" (২।১।৩২) তাঁহাতে বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা নাই। জীব নিজ কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি। প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কিছু ছিল না। সুতরাং কর্ম্মও কর্ম্মফল-ভোগ অনাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে যুক্তি দ্বারা সাংখ্য, বৈশেষিক বৌদ্ধ, জৈন, ও ভাগবত মত খণ্ডিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে প্রথম হইতে ১৫ সূত্রে সৃষ্টি-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পঞ্চভূত হইতে বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদে অগ্নির পূর্ব্বে আকাশ-সৃষ্টির কথা না থাকিলেও এবং বৃহৎ-আরণ্যকে আকাশকে অমৃত (সুতরাং অজ) বলা হইলেও তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছিল, ইহা আছে। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তু যদি না থাকে, তবেই ছান্দোগ্য, বৃহৎ-আরণ্যক ও মুণ্ডকের "ব্রহ্মকে জানিলে সকলই জানা হয়", এই উক্তি সার্থক হয়। আকাশ যখন ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ হইতে ভিন্ন প্রতীত হয়, তখন তাহাকে অন্য বস্তুর বিকার বলিতে হয়, ইহা বলা যায় না। কেননা আত্মাও তো আকাশ হইতে পৃথক। তথাপি আত্মা কোনও বস্তুর বিকার নহে। আত্মাকে বিকার বলিলে তাহাকে বৌদ্ধদিগের মত শূন্যের বিকার বলিতে হয়। কিন্তু 'সৎ' আত্মার উৎপত্তি অসম্ভব। ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ক্রমের বিপরীত ক্রমে প্রলয় হয়।

১৬ সূত্রে জীবের বাস্তবিক জন্ম ও মৃত্যু নাই বলা হইয়াছে। আত্মা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আত্মা নিত্য। জীবাত্মা জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ (২।৩।১৭-১৮)। ১৯ হইতে ২৯ শ্লোক আত্মা অণু-পরিমাণ ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে। বেদে জীবাত্মার উৎক্রান্তি (শরীর হইতে গমন) এবং আগতির (আগমন) কথা আছে। অনন্তের উৎক্রান্তি ও আগতি অসম্ভব। জীবের পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন এবং দেহের সমান, ইহাও কল্পনা করা যায় না। সুতরাং জীব অণুপরিমাণ। শ্রুতিতে যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বলা হইয়াছে, সেখানে পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। মুণ্ডকে (৩।১।৯) আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে জীবকে "বালাগ্র-শত ভাগের শত ভাগ" (৫।৯) বলা হইয়াছে। এক বিন্দু চন্দন দেহের এক ভাগে লিপ্ত হইলে যেমন সকল দেহে তৃপ্তির অনুভব হয়, তেমনি অণু-পরিমাণ আত্মার অস্তিত্ব সকল দেহে অনুভূত হয়। আত্মার অবস্থিতি হৃদয়ে। আত্মার অংশ নাই বটে, কিন্তু তাহার গুণ চৈতন্য সকল দেহে ব্যাপ্ত হয়, যেমন আলোক প্রসারিত হইয়া সকল গৃহ আলোকিত করে। আত্মা সকল দেহে ব্যাপ্ত না হইলেও তাহার গুণ চৈতন্যের সকল দেহে থাকিবার বাধা নাই। যেমন পুষ্পের গন্ধ যেখানে পুষ্প নাই' সেখানেও থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে হৃদয়ে আশ্রিত অণু-পরিমাণ আত্মা লোম এবং নখ পর্য্যন্ত সকল দেহ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। আত্মা এবং চৈতন্য যে পৃথক, তাহা কৌষীতকি উপনিষদের "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" (৩।৬) এই উক্তি হইতে (জীবাত্মা প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরে আরোহণ করে) বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (শঙ্করের মতে) জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মের মতই অনন্ত। আত্মা সংসারী হইলে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণ তাহার সার বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহারা বুদ্ধির গুণ। বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে আছে বালাগ্র শতভাগের শত ভাগ জীব মোক্ষে অনন্ত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অণু-পরিমাণ হইলে জীব মোক্ষে অনন্তত্ব পাইতে পারিত না। বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত আত্মাই অণু-পরিমাণ: প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকেও "ব্রীহের্বা, যবাৎ বা অণীয়ান্ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।৩) বলা হইয়াছে। ইহা উপাসনার জন্য।

৩০ হইতে ৪২ সূত্রে জীবের কর্তৃত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বুদ্ধি-রূপ উপাধি-যোগে ব্রহ্ম জীবে পরিণত হন। যতদিন জীবত্ব থাকে, ততদিন এই সংযোগ থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীব আর থাকে না, তখন ব্রহ্ম হইয়া যায়।

সুষুপ্তির সময়ও বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু বালকের পুংস্বভাবের ন্যায় তাহা অনভিব্যক্ত থাকে। বুদ্ধির অস্তিত্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-যোগে হয় সর্ব্বদাই বিষয়ের উপলব্ধি হইত, অথবা কখনও হইত না। বুদ্ধি আছে, এবং কখনও তাহা বিষয়ে সংযুক্ত হয়, কখনও বা হয় না। তাই কখনও উপলব্ধি কখনো অনুপলব্ধি হয়। অন্তঃকরণই বুদ্ধি বা মন। যখন সংশয়াত্মক বৃত্তি হয়, তখন ইহার নাম মন। যখন নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হয়, তখন ইহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণ। জীবই কর্ত্তা। শরীরের মধ্যে আত্মা যথেচ্ছ বিচরণ করে (বৃ, আর, ২।২।১৪)। জীব ইন্দ্রিয়দিগকে উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে (বৃঃ আ ২।১।১৮)। তৈত্তিরীয়ে (২।৫।১) আছে "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে)" বিজ্ঞান (জীব) যজ্ঞ করে, "বিজ্ঞানেন যজ্ঞং তনুতে" বিজ্ঞানদ্বারা যজ্ঞ করে, ইহা নাই। জীব কর্ত্তা হইলেও সকল সময়ে নিজের হিতকর কর্ম্ম করে না। ইহার কারণ এমন কোনও নিয়ম নাই যে জীবকে হিতকর কর্ম্ম করিতেই হইবে। প্রতিকূল অবস্থায় জীব অহিতকর কর্ম্ম করে। জীব উপলব্ধি বা জ্ঞানের কর্ত্তা হইলেও যেমন তাহার দুঃখের জ্ঞানও হয়, সেইরূপ। জীব কর্ত্তা না হইয়া বুদ্ধি যদি কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে শক্তি-বিপর্য্যয় হইত অর্থাৎ বুদ্ধির করণ-শক্তি থাকিত না। বুদ্ধি তাহা হইলে ভোক্তা হইত। জীব যদি কর্ত্তা না হইত, তাহা হইলে সমাধি হইতে পারিত না। "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন", এই প্রত্যয়ই সমাধির অবলম্বন। বুদ্ধি প্রকৃতির অবলম্বন। তাহার এই প্রত্যয় হইতে পারে না। তক্ষা বা সূত্রধরের মত জীব কখনও কাজ করে, কখনও করে না। জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, উপাধি-জাত। স্বাভাবিক হইলে এই কর্ত্তৃত্ব কখনও অপগত হইত না। জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত। কৌষীতকিতে (৩।৮) আছে —ইনি যাহাকে উপরে তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা সাধু কর্ম্ম, এবং যাহাকে নীচে নামাইতে চাহেন তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান। ঈশ্বর জীবের "কৃৎস্ন প্রযত্নের" (সমুদয় চেষ্টা) অপেক্ষা করেন, অর্থাৎ তাহার অর্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুরূপ কর্ম্ম তাহাদ্বারা করান। শাস্ত্রে কতকগুলি কর্ম্ম বিহিত এবং কতকগুলি প্রতিষিদ্ধ আছে। এই বিধান যাহাতে অর্থহীন না হয়, সেজন্য এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

৪৩ সূত্র হইতে ৪৭ সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উপনিষদে কোথাও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। কোথাও বলা হইয়াছে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। বেদের মন্ত্রভাগ হইতেও জানা যায় যে

জীব ব্রহ্মের অংশ (পুরুষসূক্ত)। গীতাতেও জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জীব যদি ঈশ্বরের অংশ হয়, তাহা হইলে জীবের দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। সূর্য্যের আলোকে অঙ্গুলি বাঁকাইলে সূর্য্যালোক বক্র বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ সেই বক্রতা যেমন আলোককে স্পর্শ করে না, তেমনি জীবের দুঃখ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না।

৪৯ সূত্র হইতে ৫৩ সূত্রে (পাদশেষ) জীবাত্মার কর্ম্মফল-ভোগের কথা আছে। এক জীবাত্মার একাধিক দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া এক জনের কর্ম্মফল অপরকে ভোগ করিতে হয় না। এক জলাশয়ে সূর্যের প্রতিবিম্ব কাঁপিলে, অপর জলাশয়ের প্রতিবিম্ব কাঁপে না। সেই রূপ এক জীবাত্মা নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিলে অপর জীবাত্মা তাহা ভোগ করে না। কিন্তু সাংখ্য-মতে যখন জীবাত্মা বহু এবং তাহাদের প্রত্যেকই সর্ব্বব্যাপী, তখন প্রত্যেক দেহের সহিত সকল আত্মাই সমভাবে সংবদ্ধ। সুতরাং এক দেহের অর্জিত পাপপুণ্য সকল আত্মাই ভোগ করিবে না কেন, তাহার কারণ পওয়া যায় না। বিভিন্ন আত্মার সংকল্প বিভিন্ন বলা যায় না। কারণ সকল আত্মাই যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন সকল সংকল্পই প্রত্যেক আত্মার। আত্মা যখন সর্ব্বব্যাপী তখন প্রত্যেক দেহকর্ত্তৃক আত্মার যে প্রদেশ অবচ্ছিন্ন, তদনুসারে বিভিন্ন জীবের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ সকল প্রদেশই সকল আত্মার অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়দিগের কার্য্যের ব্যাখ্যা আছে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগকে উপনিষদে প্রাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। কোথাও ইহাদিগের উৎপত্তির কথা আছে, আবার কোথাও বা সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল, ইহা বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি লোকের ন্যায় প্রাণদিগেরও উৎপত্তি হইয়াছিল (ব্র-সূ তথাপ্রাণাঃ ২।৪।১)। অগ্নি, জল ও পৃথিবী-সৃষ্টির পরে বাচ্‌এর (বাক্যের) সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাণ সাতটি। যেখানে প্রাণের সংখ্যা সাতের বেশী বলা হইয়াছে, সেখানে এক একটি ইন্দ্রিয়ের একাধিক বৃত্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও প্রাণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে ধরিয়া প্রাণের সংখ্যা এগারো। প্রাণগুলি অনু-পরিমাণ, মৃত্যুর সময় যখন প্রাণ বাহির হয়, কেহ দেখিতে পায় না। প্রাণ (মুখ্য প্রাণ) প্রথমে সঞ্চারিত হয় বলিয়া প্রাণ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পরে জন্মে। প্রাণ বায়ু নহে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও নহে। (প্রাণের) বায়ু ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে

পৃথক ভাবে উপদেশ আছে। চক্ষুআদি যেমন জীবের অধীন এবং ভোগ-সম্পাদক, প্রাণও তেমনি। চক্ষুআদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ আলোচনা উপনিষদে আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন প্রাণ শরীর ও ইন্দ্রিয়দিগকে ধারণ করে। জীবের স্থিতি ও উৎপত্তি প্রাণের কাজ। চক্ষু-কর্ণাদির ন্যায় প্রাণ কোনও বিষয় গ্রহণ করে না ; কিন্তু তাই বলিয়া নিষ্ক্রিয় নহে। মনের ন্যায় (দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ ও আস্বাদন মনের বৃত্তি) প্রাণেরও পাঁচ-বৃত্তি—নিশ্বাস-গ্রহণ (প্রাণ), নিশ্বাস ত্যাগ (অপান), প্রশ্বাস বন্ধ রাখিয়া শ্রমসাধ্য কার্য্য করা (ব্যান), ঊর্দ্ধগমন (উদান), ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক (সমান)। প্রাণ পরিচ্ছিন্ন (বিভু নহে) ও সূক্ষ্ম। শ্রুতি বলেন জ্যোতিঃ (অগ্নি) আদি দেবতাগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণ নিজ কার্য্য করে। যদিও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তথাপি জীবের সহিতই প্রাণের সম্বন্ধ ; দেবতাদের সহিত নহে। কেননা পাপপুণ্যের সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য, জীবকেই পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয়—দেবতাদিগকে নহে। মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণগুলি (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) ইন্দ্রিয় ; মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে। শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়দিগের ভেদ উক্ত হইয়াছে। মুখ্য প্রাণের সহিত অন্যান্য প্রাণের বৈলক্ষণ্যও দেখা যায়। বিভিন্ন বস্তুর নামকরণ ও রূপকরণ, যিনি ত্রিবৃৎ করিয়াছেন, তাঁহারই কৃত। উপনিষদে আছে, যে পরমাত্মা অগ্নি, বায়ু ও জল এই তিনটি পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে মিশাইয়া নানা বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই ত্রিবিৎ-করণ। বেদে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে সেইরূপ মাংসাদি ভূমি হইতে, রক্ত জল হইতে এবং অস্থি অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে যেমন জল ও অগ্নি আছে, তেমনি জল ও অগ্নির মধ্যেও পৃথিবী, জল ও অগ্নি তিনটিই আছে। পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীর অংশ বেশী, জলের মধ্যে জলের অংশ বেশী এবং অগ্নির মধ্যে অগ্নির অংশ বেশী।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে মৃত্যুর পরে জীবাত্মার গতি বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।৩) প্রবাহণ-শ্বেতকেতু সংবাদে এই বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবাহণ বলিয়াছিলেন অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মে শ্রদ্ধার সহিত যে জল ব্যবহৃত হয়, তাহা স্বর্গরূপ অগ্নিতে পতিত হইয়া দিব্যদেহে পরিণত হয়, মানুষ মৃত্যুর পরে সেই দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গবাস শেষ হইলে সেই দেহ মেঘরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া বৃষ্টিতে পরিণত হয়। বৃষ্টি পৃথিবীরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া অন্নে পরিণত হয়। অন্ন পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া শুক্রে পরিণত হয়। শুক্র রমণীরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া গর্ভে পরিণত হয়। এইরূপে

পঞ্চম আহুতি পুরুষরূপে পরিণত হয়। ইহাই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা। জলের মধ্যে ক্ষিতি, অপ ও তেজ আছে। এই সূক্ষ্মভূতগণ প্রাণের আশ্রয়। প্রাণের সহিত তাহারা পরলোকে গমন করে। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার সহিত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সহ ভবিষ্যৎ দেহের উপাদান সূক্ষ্মভূতও পরলোকে গমন করে। শ্রুতিতে আছে যাহারা গ্রামে থাকিয়া যজ্ঞ, পুষ্করিণী-আদি প্রতিষ্ঠা ও দান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমের সহিত গমন করে, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গে উপভোগের দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় হইলে অনুশয়ের (কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট কর্ম্মের) সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করে। যে কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগ, অবতরণের সময় তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অন্যবিধ শুভ বা অশুভ কর্ম্ম অবতরণের সময় জীবে সংশ্লিষ্ট থাকে। শুভ কর্ম্মের ফলে উৎকৃষ্ট যোনি এবং অশুভ কর্ম্মের ফলে নিকৃষ্ট যোনিপ্রাপ্তি ঘটে। "রমণীয়-চরণাঃ রমণীয়াং যোনিং, কপুয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিং আপদ্যন্তে"। এখানে "চরণ" শব্দের অর্থ শীল বা আচরণ নহে, কর্ম্ম (বৈদিক কর্ম্ম)। শীলের মূল্য এই যে যাহাদের শীল উৎকৃষ্ট, তাহারাই কর্ম্মে অধিকারী, এবং যাহাদের শীল যত উৎকৃষ্ট, তাহাদের কর্ম্মের ফলও তত উৎকৃষ্ট হয়। যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না, তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে না। বেদে সংযমনের (যমলোকে যাতনার) উল্লেখ আছে। স্মৃতিতেও পাপীর নরকগমনের উল্লেখ আছে। যাহাদের চন্দ্রলোকে গমনের অধিকার হইয়াছে, তাহারাই তথায় গমন করে। যাহারা দেবযানে ব্রহ্মলোকে এবং পিতৃযানে পিতৃলোকে যায় না, তাহারা বার বার জন্মে ও মরে। এই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না। শস্যাবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাগুলির পরিবর্ত্তন শীঘ্র হয়। কিন্তু শস্যভাব হইতে জীবের শুক্রে পরিণত হওয়া সহজ নহে। অন্য জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে শস্য হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতরণকারী জীব কিছু কালের জন্য সেই শস্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে মাত্র। তখন কোনও ভোগ হয় না।

পাদশেষে উক্ত হইয়াছে যে বৈদিক কর্ম্ম অশুদ্ধ বলিয়া শস্যত্ব-প্রাপ্তি তাহার ফল, ইহা নহে। বৈদিক কর্ম্ম অশুদ্ধ হইতে পারে না। কোন্ কর্ম্ম ধর্ম্ম, কোন্ কর্ম্ম অধর্ম্ম, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। বেদে কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না বলিয়াও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে পশুবধের বিধি দিয়াছেন। ইহা বিশেষ নিয়ম। শাস্ত্রে যেখানে পশু-বধের বিধান আছে, সেখানে পশুবধ দোষের নহে। যে পশুকে বধ করা যায় সে স্বর্গে গমন করে। ইহা চিকিৎসক-কর্ত্তৃক রোগীর অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় উৎকৃষ্ট কর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্ম সবিশেষ অথবা নির্বিশেষ অথবা সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয়ই, এই বিষয়ে আলোচনা আছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ইহাই মীমাংসা। রামানুজের মতে ব্রহ্ম নির্দ্দোষ অর্থাৎ বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, বীজিঘৎস, অবিপাস, আবার তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, সকল কল্যাণ গুণের আধার, ইহাই বেদান্তের মীমাংসা।

সেখানে রথ নাই, রথযোগ নাই, রথের পথ নাই, অথচ রথ, রথযোগ ও পথের সৃষ্টি স্বপ্নে হয় দেখিয়া মনে হইতে পারে ঈশ্বর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল নির্ম্মাণ করেন, এবং তাহারা জাগ্রৎ কালে দৃষ্ট বস্তুর মতই সত্য। কিন্তু তাহারা মায়ামাত্র—সত্য নহে। সত্যবস্তুতে দেশ, কাল, নিমিত্ত এবং বাধার অভাব, এই সকল ধর্ম্ম থাকে। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে এই সকল থাকে না। স্বপ্নে রথ চলিতে দেখা যায়; কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার কক্ষে রথের স্থান ও পথ নাই। স্বপ্ন দ্রষ্টা নানা বস্তু দেখে আর তাহার চক্ষু মুদিত থাকে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, নিদ্রাভঙ্গে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং স্বপ্ন মায়ামাত্র। কিন্তু বেদে আছে এবং স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ভবিষ্যতের শুভাশুভের সূচক। জীব ঈশ্বরের অংশ, সুতরাং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান তাহার থাকা উচিত, এবং জীব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করিতে সমর্থ, ইহা বলা যায় না, কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহার ঐশ্বর্য্যও জ্ঞান তিরোহিত, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাহার বন্ধ ও মোক্ষ হয়। দেহের সহিত জীবের যোগবশতঃ এবং দেহের সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করে বলিয়া তাহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হয়। সুষুপ্তি-কালে জীব নাড়ীতে অথবা পুরীততে (হৃদয়বেষ্টন চর্ম্মের মধ্যে) অথবা হৃদয়াকাশে অথবা ব্রহ্মে থাকে, ইহা উপনিষদে আছে। জীব হৃদ্-পদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, সেই জন্য তখন স্বপ্ন দর্শন হয় না। যখন সুষুপ্তি হইতে জাগ্রৎ হয়, তখন জীব ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয়। একথা বেদে আছে। তাহার অনুস্মৃতি ও কর্ম্ম দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। সুষুপ্তির পূর্ব্বে অসমাপ্ত কর্ম্ম জীব সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া করে। ইহা দ্বারা অসমাপ্ত কর্ম্ম সেই যে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা প্রতীত হয়। সুষুপ্তির পূর্ব্বে দৃষ্ট বস্তু সুষুপ্তির পরে স্মরণপথে আসে। এই অনুস্মৃতিও এক প্রমাণ। শাস্ত্রে আছে জীব স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে। সুষুপ্তির পরে যদি সুষুপ্তি-পূর্ব্ব জীবের আবির্ভাব না হইত, তবে এই শাস্ত্রবচন ব্যর্থ হইত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু অবস্থা হইতে মূর্চ্ছা ভিন্ন। ইন্দ্রিয় সকল মূর্চ্ছাবাস্থায় আংশিক ভাবে বিলীন হয়।

উপনিষদে ব্রহ্মকে সবিশেষ এবং অবিশেষ উভয়রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু উপাধিযোগেও ব্রহ্মের স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। শঙ্করের মতে নির্বিশেষতাই ব্রহ্মের রূপ। উপাধিযোগে তাঁহাকে সবিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়। যে সকল বাক্যে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণনা। যে সকল বাক্যে তাঁহাকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা-প্রণালী প্রদর্শন করা। সূর্য্যালোক সমগ্র আকাশব্যাপী হইলেও যখন অঙ্গুলি বক্র হয়, তখন সেই আলোক বক্র বলিয়া প্রতীত হয়। সেই রূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও পৃথিবী প্রভৃতি উপাধিযোগে সেই সেইরূপ আকারযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন। শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম তন্মাত্র—চৈতন্যমাত্র। স্মৃতিও তাহাই বলেন। বিভিন্ন জলাশয়ে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইলেও বিভিন্ন উপাধিযোগে ভিন্ন প্রতীত হন। অবশ্য জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত বুদ্ধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের তুলনা সর্ব্বাংশে সংগত হয় না, কেননা জল মুর্ত্ত, আর জীবাত্মা অমূর্ত্ত। কিন্তু জলের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে জলগত প্রতিবিম্বের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, জল কম্পিত হইলে বিম্ব কম্পিত হয়, বাস্তবিক সূর্য্যের বৃদ্ধি, হ্রাস বা কম্পন হয় না ; জলের ধর্ম্ম সূর্য্যে আরোপিত হয় ; সেইরূপ উপাধির ধর্ম্ম ব্রহ্মে আরোপিত হওয়ায় ভ্রম হয়। দৃষ্টান্তের সহিত এই সাদৃশ্য আছে। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম দেহাদি উপাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। অতএব জলমধ্যগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বের সহিত তুলনা হইতে পারে। শ্রুতিতে ইহাও আছে যে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় লিঙ্গযুক্ত হইতে পারেন না।

উপনিষদে ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, স্থির ও গতিমান্, স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ রূপের কথা বলিলেও "নেতি নেতি" বলিয়া তাহার প্রতিষেধও করিয়াছেন। শঙ্করের মতে "নেতি" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মের দুই রূপ সত্য নহে। ব্রহ্মকে শ্রুতি অব্যক্ত বলিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই বলিয়াছেন সংরাধনে (ধ্যানের সময়) ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আলোকের কোনও রূপ না থাকিলেও যেমন আলোকস্থিত বস্তুর রূপযুক্ত বলিয়া আলোক প্রতীত হয়, সেইরূপ উপাসনার সময় ব্রহ্ম রূপযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই বলিয়া মোক্ষে জীব অনন্ত ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, ইহা উপনিষদে আছে। এইজন্য একই সর্প যেমন কখনও কুণ্ডলাকারে দৃষ্ট হয়, কখনও ঋজু আকারে দৃষ্ট হয়—সেইরূপ ব্রহ্মও কখন জগৎরূপ, কখনও জগৎ হইতে ভিন্ন, ইহা বলা যায়। অথবা সূর্য্যের প্রকাশ এবং সূর্য্য উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ।

অথবা রূপহীন আলোক যে বস্তুর উপর পড়ে, আলোকও সেই বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম বুদ্ধিরূপ উপাধিযোগে সবিশেষ রূপে প্রতীত হন। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও জীব নাই—এইরূপ প্রতিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব অভেদ। কিন্তু ব্রহ্মকে সেতু (সেতুঃ বিধৃতিঃ), বলা হইয়াছে। তাহার উন্মানের (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ) সম্বন্ধ ও ভেদের কথা আছে। ইহা হইতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে, ইহা যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তর এই যে এসকল দৃষ্টান্ত সাদৃশ্যবাচক। ব্রহ্ম জগৎ ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া তিনি সেতুঃ বিধৃতিঃ। সেতুর অপর পার আছে বলিয়া ব্রহ্মের পরেও অন্য কিছু আছে, ইহা নহে। ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ ষোড়শকলাযুক্ত বলা হইয়াছে উপাসনার সুবিধার জন্য, বাস্তবিক তাহার পাদ বা কলা নাই। যে উপাধিতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পরিমিত বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে, সুষুপ্তি কালে জীব "স্বম্ অপীত ভবতি" অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে ব্রহ্ম ও জীব যে অভিন্ন তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রুতিতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। সুতরাং ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা এবং তিনি সর্ব্বগত প্রভৃতি ব্যাপিত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। ব্রহ্ম হইতেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা শ্রুতিতে আছে। "তিনি অন্নাদঃ বসুদানঃ" (বৃ, আ, ৬।৪।২০)। জৈমিন বলেন বটে, যে ধর্ম্মই (কর্ম্ম বিশেষ) কর্ম্মফলের দাতা, কিন্তু বাদরায়ণের মতে কর্ম্ম নিজ হইতে ফল দান করে না, ঈশ্বরই ফলদান করেন। "যাহাকে তিনি উর্দ্ধলোকে উন্নীত করিতে চাহেন, তাহা দ্বারা তিনি সাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে নামাইতে চাহেন তাহা দ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান"। এই সৎ ও অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি-দান জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল। ঈশ্বরই তাহা দান করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উপাসনা, ব্রহ্মের স্বরূপ, মৃত্যুর পরে মোক্ষ লাভের পথে পাপ-পুণ্য-ত্যাগ, দেহ হইতে জীবের স্বাতন্ত্র্য, ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাবে উপাসনা প্রভৃতির আলোচনা আছে।

বেদের এক শাখায় বিভিন্ন স্থানে এক উপাসনার উল্লেখ থাকিলে এক স্থানে উপাস্যের যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, অপর স্থানেও সে সকল গ্রহণ করিতে হইবে। বাজসনেয় শাখায় শাণ্ডিল্য বিদ্যায় "মনোময় প্রাণশরীর ভাঃ-রূপ" অর্থাৎ ইচ্ছাময়, সর্ব্বশক্তিমান ও জ্যোতির্ম্ময়রূপে আত্মার উপাসনা

বিহিত হইয়াছে। ঐ শাখার বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মাকে ইচ্ছাময়, জ্যোতির্ম্ময়, সত্য এবং হৃদয়ের মধ্যে ব্রীহি বা যবের ন্যায় সূক্ষ্ম, সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি বলা হইয়াছে। শেষোক্ত স্থলে যেসকল অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ আছে, প্রথমোক্ত স্থলেও সেগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বৃহদারণ্যকে একস্থলে ব্রহ্মকে সত্য এবং তিনি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে বিরাজমান পুরুষ বলা হইয়াছে। এখানে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ ব্রহ্মের অধিদেব রূপ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে তাহার অধ্যাত্মরূপ। কিন্তু এখানে এই দুই রূপেই উপাসনা ভিন্নভাবে করিতে হইবে। কেননা শ্রুতি বলিয়াছেন আদিত্য-মণ্ডলস্থ পুরুষ ও অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের নাম ও রূপই কেবল এক। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে তাহাদের অন্যান্য গুণ ভিন্ন। ছান্দোগ্যে এবং তৈত্তিরীয়ে পুরুষ বিদ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু ছান্দোগ্যে পুরুষকে যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়ে সেরূপ করা হয় নাই। ছান্দোগ্যে পুরুষবিদ্যার ফল দীর্ঘায়ুলাভ, তৈত্তিরীয়ে তাহার ফল ব্রহ্মের মহিমালাভ। সুতরাং এখানে এক উপনিষদে বর্ণিত গুণ অন্য উপনিষদে গ্রহণ করা হইবে না।

কৌষীতকি উপনিষদে আছে, যিনি মোক্ষলাভ করেন তিনি পাপপুণ্য ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুর সময়েই পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন, মৃত্যুর পরে বিরজা নদী পার হইবার সময়ে নহে। সকলেই যে দেবযান পথে গমন করিয়া মোক্ষলাভ করেন, তাহা নহে। সাধনার তারতম্য অনুসারে কেহ মৃত্যুমাত্রই মোক্ষলাভ করেন, কেহ বা দেবযান পথে গমন করিয়া মোক্ষলাভ করেন। যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে দেবযান পথে গমন করিবে, যে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে তাহার দেবযান পথে গমনের প্রয়োজন নাই। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক সকলেই দেবযান পথে গমন করেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও কোনও কোনও ঋষি যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মের ফলভোগ আরব্ধ হইবার পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের জন্য তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তাঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য বেদ-প্রচার প্রভৃতি কার্য্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য যতদিন প্রয়োজন, ততদিন পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হয়।

মুণ্ডক উপনিষদের (৩।১।১) "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" প্রভৃতি শ্লোকে এবং শ্বেতাশ্বতরের (৪।৬) "ঋতং পিবন্তৌ" প্রভৃতি শ্লোকে উভয়ত্রই জীব ও

ঈশ্বরের কথা আছে। ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ করেন না। কিন্তু কর্ম্মফলভোগী জীবের সহচর বলিয়া জীব ও ঈশ্বর উভয়কেই "ঋতং পিবন্তৌ" বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে (৩।৪।১) যে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম এবং সর্ব্বান্তর আত্মার কথা আছে, উভয়ই এক। উক্ত উপনিষদের (৫।৮।২১) শ্লোকে সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী পুরুষ এবং চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পুরুষ একজন। এক ব্রহ্মকেই উভয়প্রকারে উপাসনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্যে (৮।১।১২) হৃদয়াকাশকে জন্মমরণহীন আত্মা বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২১) বলা হইয়াছে যে এই হৃদয়াকাশে আত্মা শয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু উপদেশ দুইটি ভিন্ন নহে। হৃদয়াকাশই ব্রহ্ম।

চৈতন্য শরীরের ধর্ম্ম নহে। দেহে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় সত্য, কিন্তু দেহ না থাকিলেও চৈতন্য থাকিতে পারে। চৈতন্য যদি ভৌতিক বস্তুর ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে চৈতন্য ভৌতিক বস্তু অনুভব করিতে পারিত না। কোনও বস্তুর ধর্ম্ম তাহার নিজের উপরে ক্রিয়া করিতে পারে না। রাত্রিতে কোনও বস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে দীপের প্রয়োজন। তাই বলিয়া উপলব্ধি দেহের ধর্ম্ম নহে। দেহ থাকিলে উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না, বলিয়া উপলব্ধিকে দেহের ধর্ম্ম বলা যায় না।

ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাবে উপাসনার বিধি আছে। যে কোনও উপায়ে তাঁহার উপাসনাতেই মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু একটিমাত্র উপাসনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক সঙ্গে বিভিন্ন উপাসনা গ্রহণ করিলে চিত্তবিক্ষেপ হইতে পারে। অনেক যজ্ঞ করিলে বিবিধ স্বর্গে দীর্ঘকাল বাস করা যায়। কিন্তু কোনও এক উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিলে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান কেবল যজমানের সংস্কারের জন্যে প্রয়োজনীয় নহে, তাহার মোক্ষপ্রাপকতা শক্তিও আছে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জৈমিনির মতে বেদের উদ্দেশ্য কেবল যজ্ঞ করিবার বিধি ও উপায় বলিয়া দেওয়া। যজ্ঞে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলের সংস্কারের যেমন বিধি আছে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যাজ্ঞিকের সংস্কারের বিধি আছে। এই সংস্কারের জন্যই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন। তাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসামুলক বাক্য বেদে আছে। যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়, তাহা হইলে জনক, কেকয়রাজ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন কেন? বিদ্যা কর্ম্মের সহায়ক মাত্র। যে কর্ম্ম বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও রহস্য-

জ্ঞানের সহিত করা যায়, তাহার শক্তি বেশী হয় (ছান্দোগ্য—১।২।২০)। "বিদ্যা ও কর্ম্ম পরলোকগত আত্মার সঙ্গে গমন করে" (বৃ-আর—৪।৪।২)। বৃহদারণ্যকের এই উক্তিদ্বারাও বুঝিতে পারা যায়, যে কেবল বিদ্যাদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। ছান্দোগ্যে আছে (৮।১৫।২) ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় সমিধ-আহরণাদি গুরুর কর্ম্ম করিবে, অবশিষ্ট সময়ে বেদ অধ্যয়ন করিবে। তাহার পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বেদ অধ্যয়ন ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে। তাহাতে মোক্ষলাভ হইবে। সুতরাং জ্ঞানের পরেও কর্ম্মের প্রয়োজন আছে। ঈশোপনিষদে আছে—বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিবে। এইভাবে পাপ হইতে মুক্তি হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং জ্ঞান হইলেও কর্ম্ম না করিলে মুক্তি হয় না। কিন্তু বাদরায়ণ ঈশ্বরকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তৈত্তিরীয়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়াছেন। ঈদৃশ ঈশ্বরকে জানিলে স্বর্গসুখ তুচ্ছ বোধ হয়, এবং স্বর্গসুখ-প্রাপক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। ঈশ্বরকে জানিলে তাঁহাকে লাভ করা যায়, ইহা শাস্ত্রে আছে। ইহাতে কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ করিতেছে, ইহা যেমন দেখা যায়, তেমনি সর্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, ইহাও দেখা যায়। কৌষীতকি উপনিষদে আছে ঋষিগণ বলিতেছেন "কি জন্য আমরা যজ্ঞ করিব ? কি জন্য বেদপাঠ করিব ? পূর্ব্বের ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন" (৯।৫)। "ইহাই অমৃতত্ব" বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, ইহা বৃহদারণ্যকে আছে, (৪।৫।১৫)। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ করিতে পারেন। "বিদ্যা ও কর্ম্ম মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে" ইহার অর্থ কাহারও অনুসরণ করে বিদ্যা, কাহারও অনুসরণ করে কর্ম্ম। বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ে এক ব্যক্তির অনুসরণ করে না। যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহার বেদ অধ্যয়ন মাত্র হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। তাহার পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজন আছে। শতবৎসর বাঁচিয়া কর্ম্ম করিবে, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই। সুতরাং জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা বলা যায় না। বিদ্বান্ যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম তাহাতে লিপ্ত হয় না, ইহা বিদ্যারই স্তুতি। ইহাতে কর্ম্ম করিবার অনুমতি মাত্র দেওয়া হইয়াছে। বিদ্বান বিদ্যার ফল অনুভব করিয়া সকল কামনা ত্যাগ করেন (বৃঃ আর ৪।৪।২২)। আবার ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগতের সকল বস্তুই আত্মারূপে প্রতীত হয়। তখন কিসের

দ্বারা কাহাকে দেখিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে (বৃঃ আঃ ২।৪।১৬)? ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে করণ, কর্ম্ম এই সকল ভেদ বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী করণ অভাবে ক্রিয়া করিতে পারেন না। উর্দ্ধরেতা অর্থাৎ সন্ন্যাসীর আশ্রমে বিদ্যা (কর্ম্ম নহে) বিহিত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না।

জৈমিনি বলেন বেদে সন্ন্যাসাশ্রমের "পরামর্শ" (উল্লেখ) মাত্র আছে, সন্ন্যাসের বিধান নাই। "যে ব্যক্তি অগ্নি নির্বাপিত করে, সে দেবযানের বীর্য্যহানি করে," (যজুর্ব্বেদ—১।৫।২)। বাদরায়ণ বলেন শ্রুতিতে গার্হস্থ্য-আশ্রমের যে প্রকার উল্লেখ আছে, সন্ন্যাস-আশ্রমেরও সেই প্রকার উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (২।২৩।১) ধর্ম্মের তিন শাখার মধ্যে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসেরও উল্লেখ আছে। ইহাতে সন্ন্যাসের বিধি দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র উল্লেখ নহে। যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। "যজ্ঞ, তপস্যা এবং অনাসক্তির দ্বারা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন" (বৃঃ আর ৬।৪।২২)। রথ টানিবার জন্য অশ্বের প্রয়োজন। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতির প্রয়োজন। বিদ্যালাভ হইলে মোক্ষের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। (যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ কার্য্যমেব তৎ, যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্। যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং, স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ—গীতা। কিন্তু শমদমাদির প্রয়োজন আছে। ভক্ষ্য, অভক্ষ্য বিষয়ে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধও অনুসরণ করা উচিত। তবে প্রাণ-রক্ষার জন্য সেই সকল বিধিনিষেধ অতিক্রম করা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য আহার-শুদ্ধির প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান চাহে না, আশ্রম-কর্ম্ম তাহার জন্যও প্রয়োজনীয়। বর্ণাশ্রমে যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যেও করিবে, তাহা লাভের ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ত্তব্য। যাহারা আশ্রমধর্ম্ম পালন করেন, তাহারা কামক্রোধের বশীভূত হন না।

যাহাদের ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম নাই, যাহারা আশ্রমসকলের অন্তরালে থাকেন, তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। রৈক্যের ও বাচক্নবীর আশ্রমধর্ম্মে অধিকার ছিল না, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

মনুসংহিতায় আছে যে ব্রাহ্মণ অন্য আশ্রমধর্ম্ম পালন করেন না, তিনি কেবল জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। জপ, উপবাস, দান প্রভৃতি দ্বারা বিদ্যার অনুগ্রহ লাভ করা যায়। সকল বর্ণের লোকের এই

ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার আছে। কিন্তু বিদ্যালাভের জন্য আশ্রমধর্ম্মপালন অধিক উপযোগী।

জৈমিনিও বলিয়াছেন সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহী হইতে পারেন না। স্ত্রীসংসর্গে যে সন্ন্যাসীর পতন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদিও কাহারও কাহারও মতে প্রায়শ্চিত্ত আছে, তথাপি যাহাতে এরূপ পতন না হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এরূপ পতিত সন্ন্যাসী প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাকে বহিস্কৃত করা উচিত। বিহিতসাধন অবলম্বন করিলে ইহজন্মেই বিদ্যালাভ হয়। যদি বাধা উপস্থিত হয়, তবে পরজন্মেও হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মোপাসনার সাধন ও ফল বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে—একবার নহে বারংবার ব্রহ্মকে আত্মারূপে উপাসনা করিতে হইবে। ইহা প্রতীক উপাসনা নহে। প্রতীমাকে বিষ্ণুজ্ঞানে উপাসনা প্রতীকোপাসনা। কিন্তু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আত্মা ব্রহ্মের প্রতীক নহে। উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবে; দাঁড়াইয়া অথবা শয়ন করিয়া নহে। স্থিরভাবে উপবেশন না করিলে ধ্যান হয় না। পৃথিবীর মতো অচল হইয়া ধ্যান করিবে। ব্রহ্মকে আত্মারূপে দর্শন করিবার পরে উপাসনার প্রয়োজন থাকিবে না। স্বর্গলাভ অথবা অন্য কোনও কামনায় যে উপাসনা, তাহা মরণ পর্যন্ত করিতে হয়। ব্রহ্মলাভ হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাপের বিনাশ হয়, পরবর্ত্তী পাপ ব্রহ্মজ্ঞকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরবর্ত্তী পুণ্যও ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না। শরীরপাত হইলে তাহার মোক্ষ হয়। যে সকল সঞ্চিত কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সেই সকল কর্ম্মের বিনাশ হয়। শরীরপাত পর্য্যন্ত মোক্ষ হয় না। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল সে পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক নিত্য কর্ম্মের ফল জ্ঞান, জ্ঞানের ফল মোক্ষ। জ্ঞানলাভের জন্য এই সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। অন্যবিধ কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। বিনা অর্থবোধে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিলে তাহাতেও ফল হয়। কিন্তু সে ফল তত বীর্য্যবৎ হয় না। আরব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান।

দ্বিতীয় পাদে জীব কিভাবে দেহ ত্যাগ করে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে বাক্, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মনে বিলীন হয়। তখন চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু কথা বলিবার, দেখিবার ও শুনিবার ক্ষমতা থাকে না। ইন্দ্রিয়গণ মনে সংযুক্ত হইবার পরে মন প্রাণে যুক্ত হয়। প্রাণ

তখন জীবে অবস্থান করে। প্রাণ জীবের সহিত দেহ ত্যাগ করে। তখন প্রাণ জীবের মধ্যে অবস্থান করে এবং জীব অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূতে (সূক্ষ্ম) অবস্থান করে। মৃত্যুর পর কোনো জীব স্বর্গলোকে, কোনো জীব ব্রহ্মলোকে গমন করে। প্রথমটির পথ পিতৃযান, দ্বিতীয়টির পথ দেবযান। এই দুই পথ কতকটা দূর পর্য্যন্ত অভিন্ন, পরে বিভক্ত হয়। দেবযান পথে গমন করিয়া জীব যে অমরত্ব লাভ করে, তাহা আপেক্ষিক অমরত্ব। ব্রহ্মলোকে গমনকারী দীর্ঘকাল সুখে বাস করেন। শীঘ্র শীঘ্র জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কর্ম্মজনিত সংস্কার তখনো থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সে সংস্কার দগ্ধ হয়। মৃত্যুর সময় জীব সূক্ষ্মভূতে অবস্থান করে। সেই সূক্ষ্মভূত ব্রহ্মের সহিত মিলিয়া যায়। কিন্তু মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মভূত জীবের সহিত অবস্থান করে এবং জীব সংসারে জন্মগ্রহণ করে। স্থূল শরীর যখন অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হয়, তখন সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হয় না। জীবিতকালে স্থূল শরীরে যে তাপ অনুভূত হয়, তাহা সূক্ষ্ম শরীরের তাপ। তাই মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম শরীর যে পথে স্থূল শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহা উষ্ণ বোধ হয়। ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তির প্রাণ দেহ ত্যাগ করে না। দেহের মধ্যেই তাহা লয়প্রাপ্ত হয়। জীবও তখন ব্রহ্মে লীন হয়। তাহার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণও ব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হয়। তখন জীবের নামরূপাদি কিছুই থাকে না।

যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মৃত্যুকালে হৃদয়ের অগ্রভাগ উজ্জ্বল হয়, সেই আলোকে হৃদয় হইতে বাহির হইবার দ্বার প্রকাশিত হয়। জীব তখন ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহার অনুরূপ ভাবনা অনুভব করে। যদি ব্যাঘ্রজন্মফল উদ্বোধিত হয়, তবে ভাবে "আমি ব্যাঘ্র", মনুষ্যজন্মফল কর্ম্ম উদ্বোধিত হইলে ভাবে "আমি মানুষ"। ইহার পরে উৎক্রমণ হয়। কেহ বা মূর্দ্ধা দিয়া কেহ বা চক্ষু অথবা অন্য পথে বাহির হয়। জ্ঞানী মূর্দ্ধণ্যনাড়ী পথে বাহির হন। অজ্ঞানী অন্য পথে বাহির হয়। মূর্দ্ধণ্যনাড়ীরূপ ব্রহ্মলোকমার্গ জ্ঞানীর সম্মুখে দেদীপ্যমান হয়। তাঁহারা নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধগামী এবং অমৃত হন। মূর্দ্ধণ্যনাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে। জ্ঞানী মূর্দ্ধণ্যনাড়ী পথে বাহির হইয়া তৎসম্বদ্ধ সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন। দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে হউক তাহাতে কোনও ভেদ নাই। রাত্রিকালেও সূর্য্যরশ্মির অভাব হয় না। দক্ষিণায়ণে মৃত্যু হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানীর মোক্ষলাভ হয়।

তৃতীয়পাদে দেবযান পথের বর্ণনা ও গম্য স্থানের আলোচনা আছে; বেদে দেবযান পথের বিভিন্ন বর্ণনা থাকিলেও এই পথ এক। পথের বিভিন্ন

অংশের বর্ণনা বিভিন্ন স্থানে আছে বলিয়া ভেদ দৃষ্ট হয়। এই পথে অগ্নি, দিবস, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি যে সকলের উল্লেখ আছে তাহারা আতিবাহিক দেবতা। জীবকে তাঁহারা বহন করিয়া লইয়া যান। জীব তখন থাকে অজ্ঞান। বিদ্যুৎ-রূপ অমানব এক পুরুষ চন্দ্র হইতে জীবকে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত লইয়া যান। অগ্নি, দিবস প্রভৃতি মানব পুরুষ। বিদ্যুৎ-পুরুষ জীবকে যে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত লইয়া যান, তিনি পরব্রহ্ম নহেন, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা (যদিও পুংলিঙ্গ ব্যবহার হয় না)। ব্রহ্মলোকে জীবগণ বহু বৎসর বাস করেন। তখন মোক্ষ হয় না, কিন্তু প্রলয়ে যখন ব্রহ্মার তিরোধান হয়, তখন তাঁহার সহিত জীব মোক্ষধাম (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন। জৈমিনির মতে দেবযান পথে পরব্রহ্মের নিকটই জীব উপস্থিত হয়। বাদরির মতে উক্তপথে ব্রহ্মার নিকট যাইতে হয়। সূত্রকারের মতে বাদরির মতই সত্য।

যাহারা নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, মৃত্যুর সময়েই তাহাদের মোক্ষ হয়, তাহাদের কোথাও গতি হয় না। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রতীক অবলম্বন করেন না, তাহাদিগকেই বিদ্যুৎপুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। প্রতীকাবলম্বীদিগের গতি হয় অন্য লোকে! যে যেরূপ ধ্যান করে, তাহার সেইরূপ গতি হয়। যাহারা প্রতীকোপাসনা করেন, তাহাদের দেবযান পথে গতি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে আছে জীব যখন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তখন স্বীয় রূপে আবির্ভূত হন, কোন নূতন দেহ তাহার হয় না। তাহা দেহসম্বন্ধমুক্ত অবস্থা। তখন প্রিয়াপ্রিয় থাকে না। পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব তাহার সহিত "অবিভাগে" বাস করে। উভয়ের মধ্যে বিভাগ থাকে না। জৈমিনির মতে ব্রহ্মলাভের পরে জীব "ব্রহ্মরূপ" প্রাপ্ত হয়। তাহাতে কোনও পাপ থাকে না; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ থাকে। ঔড়ুলোমির মতে মুক্ত জীবের স্বরূপ "চিতি-তন্মাত্র"—সর্ব্ববিশেষ-রহিত কেবলমাত্র চৈতন্য। বাদরায়ণ বলেন, চিতি-তন্মাত্র হইলেও নিষ্পাপত্ব, সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণের বাধা হয় না। ছান্দোগ্যে আছে আত্মজ্ঞ পুরুষ যদি পূর্ব্বপুরুষদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উত্থিত হন। আত্মজ্ঞব্যক্তি "অনন্যাধিপতিঃ", তাহার অন্য অধিপতি নাই। মোক্ষ-প্রাপ্তিতে মনের অস্তিত্ব যে থাকে, তাহা ইহা হইতে প্রতীত হয়, কেননা মন না থাকিলে পিতৃপুরুষদিগকে দেখিবার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকে না। কোনও শ্রুতিবাক্যে মুক্ত জীবকে অশরীর বলা হইয়াছে, আবার কোথাও শরীরযুক্ত বলা হইয়াছে; বাদরায়ণ বলেন

মুক্ত জীব শরীরযুক্ত ও অশরীরী উভয়ই হইতে পারেন। যখন মুক্ত পুরুষের দেহ থাকে না, তখনও বিবিধ বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে। যখন মুক্ত পুরুষের শরীর থাকে, তখন জগতে যে সকল বস্তু আছে, সকলেরই উপলব্ধি হয়। মুক্ত পুরুষ এক সময়ে অনেক শরীর গ্রহণ করিতে পারেন। তখন সকল শরীরেই তাঁহার "আবেশ" থাকে। এক প্রদীপ হইতে যেমন অনেক প্রদীপ জ্বালা যায়, সেইরূপ।

সুষুপ্তিতে জীব যখন "স্বং অপীত" হয়, তখন এবং মুক্তিতে সকলই একাকার হইয়া যায়। কোনও ভেদই থাকে না। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। ঈশ্বরের অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তিলাভ করেন, কিন্তু "জগদ্ব্যাপার বর্জ্জং" জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় শক্তি প্রাপ্ত হন না। ঈশ্বর যেমন জগতের মধ্যে তেমনি তাহার বাহিরেও অবস্থিত। যাহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা না করিয়া তাঁহার কোনও বিকার মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাহাদের ভোগই ঈশ্বরের সমান হয়, শক্তি সমান হয় না। যাঁহারা দেবযান পথে গমন করেন, তাঁহাদের পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

অদ্বৈত বেদান্ত

১

গৌড়পাদ

অদ্বৈত বেদান্তের সুশৃঙ্খল দর্শনাকারে প্রথম ব্যাখ্যাতা গৌড়পাদ। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন। গৌড়পাদের কাল-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাংখ্যকারিকার গৌড়পাদ-রচিত এক ভাষ্য আছে। এই গৌড়পাদ ও অদ্বৈতবাদী গৌড়পাদ এক ব্যক্তি কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় আছে।

☞ সংশোধন—৩৯০ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারার তৃতীয় পংক্তিতে "জীবের অধিষ্ঠান শরীরের" স্থলে "শরীরে অধিষ্ঠিত জীবের স্বরূপ-বিষয়ক" পড়িতে হইবে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী শঙ্করের আবির্ভাব-কাল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মত ঠিক হইলে শঙ্করের পরম গুরুর আবির্ভাব-কাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ অথবা সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। কিন্তু ওয়ালেসার (Wallesur) বলেন যে ভব-বিবেক-রচিত "তর্কজ্বালা" গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদে গৌড়পাদের কারিকার উল্লেখ আছে। ভব-বিবেক য়ুয়ান্ চোয়াংএর পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং গৌড়পাদের কাল ৫৫৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভবপর নহে। জ্যেকোবির মতে গৌড়পাদের কারিকা ব্রহ্ম-সূত্রের পরবর্ত্তী। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ নাই, কিন্তু গৌড়পাদের উল্লেখ আছে, সত্য। কিন্তু তাহাদ্বারা ব্রহ্মসূত্র যে বৌদ্ধ শাস্ত্রের পরবর্ত্তী তাহা প্রমাণিত হয় না। কেননা বৌদ্ধ দর্শনের সমর্থনের জন্য বাদরায়ণের বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু গৌড়পাদের দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের এত সাদৃশ্য আছে, যে তাহা উপেক্ষা করা বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের পক্ষে অসম্ভব ছিল। জৈন দার্শনিকগণও বাদরায়ণের উল্লেখ করেন নাই। সে যাহা হউক গৌড়পাদ যে অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর পরবর্ত্তী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়পাদের কারিকার নাম "মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণরূপ কারিকা।" ইহাকে মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য বলা যায়। এই গ্রন্থ চারি প্রকরণে বিভক্ত— আগম, বৈতথ্য, অদ্বৈত ও অলাতশান্তি। এই কারিকার শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য আছে। কারিকার প্রথম প্রকরণে মাণ্ডুক্যোপনিষদে বর্ণিত আত্মার চতুর্বিধ বিভাবের বর্ণনা আছে—বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো অন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ, ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞঃ এক এব ত্রিধা স্মৃতঃ। বহিঃপ্রজ্ঞ বৈশ্বানর, অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস এবং ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ পুরুষ—এক আত্মাই এই ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন। বৈশ্বানর জাগরণস্থানীয়, তৈজস পুরুষ স্বপ্নস্থানীয় এবং প্রাজ্ঞ পুরুষ সুষুপ্তি স্থানীয়। কিন্তু—

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানাম্ ঈশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ
অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবঃ তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥

ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ স্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তির প্রভু, তিনি অদ্বৈত। তিনিই তুরীয় (তুর্য্য) বা চতুর্থ পাদ। ইহারা সকলেই ব্রহ্মেরই দেহে অধিষ্ঠিত। বৈশ্বানর আত্মা স্থূলভূক, তৈজস প্রবিবিক্তভূক, প্রাজ্ঞ আনন্দভূক—অর্থাৎ বৈশ্বানরের তৃপ্তি বিষয়ভোগে, তৈজসের তৃপ্তি বাসনা-ভোগে এবং প্রাজ্ঞের তৃপ্তি আনন্দভোগে। "কার্য্যকারণ-বদ্ধৌ তৌ ইষ্যেতে

বিশ্বতৈজসৌ, প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু, দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ”। বৈশ্বানর ও তৈজস কার্য্য-কারণ ভাবে আবদ্ধ; প্রাজ্ঞও কারণরূপে বদ্ধ। কিন্তু তুরীয় পরমাত্মা কার্য্যকারণ ভাববিহীন। (ক্রিয়তে ইতি কার্য্যং=ফলভাবঃ। করোতি ইতি কারণং=বীজভাবঃ)। যিনি বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞঃ আত্মাকে এক বলিয়া জানেন, তিনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। ইহার পরে সৃষ্টি-সম্বন্ধে কয়েকটি মতের উল্লেখ আছে। কাহারও মতে প্রাণ হইতেই জগতের উদ্‌ভব হইয়াছে। কাহারও মতে এই জগৎ স্রষ্টার বিভূতিমাত্র, কাহারও মতে সৃষ্টি স্বপ্ন বা মায়ামাত্র। কাহারও মতে প্রভুর ইচ্ছা হইতেই জগতের উদ্‌ভব হইয়াছে। কাহারও মতে কাল হইতেই ভূতগণ প্রসূত হইয়াছে। কাহারও মতে স্রষ্টার ভোগের জন্য, কাহারও মতে তাঁহার ক্রীড়ার জন্য জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টিই ঈশ্বরের স্বভাব। কিন্তু তিনি আপ্তকাম সুতরাং তাঁহার কোনও কামনা পুরণার্থে সৃষ্টি হয় নাই। গৌড়পাদ এই সকল মতের কোনটি তাঁহার মনঃপূত, তাহা বলেন নাই। বলিবার প্রয়োজনও ছিল না, কেননা তাঁহার মতে সৃষ্টির—জগৎপ্রপঞ্চের—অস্তিত্বই নাই। ইহা মায়ামাত্র। “স্বপ্ন-নিদ্রা-যুতৌ আদ্যৌ, প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্নঃ নিদ্রয়া, ন নিদ্রাং নৈবচ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ”। স্বপ্ন=অন্যথা-গ্রহণ, যেমন রজ্জুতে সর্পবোধ। নিদ্রা=তত্ত্বা প্রতিবোধ-লক্ষণং তমঃ, তত্ত্ববোধের অভাবস্বরূপ তম। বৈশ্বানর ও তৈজস আত্মার লক্ষণ স্বপ্ন ও নিদ্রা। সুতরাং তাহারা কার্য্য-কারণবদ্ধ। প্রাজ্ঞ স্বপ্নবর্জিত, কেবল নিদ্রাযুক্ত (তমঃ যুক্ত), সুতরাং কেবল কারণবদ্ধ। যাহারা নিশ্চিত (ব্রহ্মবিৎ), তাঁহারা তুরীয়ে স্বপ্ন ও নিদ্রার কোনটিই দেখিতে পান না। সুতরাং তুরীয় কার্যবদ্ধও নহে, কারণবদ্ধও নহে। স্বপ্ন ও নিদ্রা ক্ষীণ হইলে তুরীয়পদ প্রাপ্তি হয়। “অনাদি-মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে, অজং অনিদ্রং অস্বপ্নং অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা।” অনাদি মায়ার দ্বারা প্রসুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখনই অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন তুরীয়কে জানিতে পারে। “প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ, মায়ামাত্রং ইদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ”। (জগৎ প্রপঞ্চের অস্তিত্বই নাই, তাহা কল্পিত। অস্তিত্ব থাকিলেও রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায় তাহার নিবৃত্তি হইত। সকল দ্বৈতই মায়া-মাত্র, পরমার্থ হইতেছে অদ্বৈত)।

দ্বিতীয় প্রকরণের নাম বৈতথ্য। “বৈতথ্য” শব্দের অর্থ অসত্যত্ব। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সকল ভাবই বিতথ অর্থাৎ অসত্য। সকল ভাবই (পর্ব্বত, হস্তী প্রভৃতি) শরীরের মধ্যস্থ। কিন্তু শরীরের মধ্যে পর্ব্বত হস্তী আদি থাকা

অসম্ভব। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল মিথ্যা, কেননা রথাদি যাহা স্বপ্নে দেখা যায়, তাহাদের অস্তিত্ব নাই। স্বপ্নে সামান্য সময়ের মধ্যে বহু দূরে যাওয়া বোধ হয়। অথচ স্বপ্নভঙ্গে দেখা যায় যেখানে সুপ্ত ব্যক্তি শায়িত ছিল, সেইখানেই আছে। জাগরিত অবস্থাতেও যাহা দেখা যায়, তাহাও মিথ্যা। যাহা আদিতে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, বর্তমানকালেও তাহা নাই। স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় অবস্থাতেই দৃষ্ট বস্তুসকল আত্মার কল্পনামাত্র, মায়ামাত্র। আত্মা মায়াদ্বারা জগৎ নির্মাণ করেন, তিনিই জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয়, অন্য কেহ নহে। আত্মা সর্ব্বপ্রকার লৌকিক পদার্থ কল্পনা করে। যে সকল বস্তু মনঃকল্পিত ও যে সকল বস্তু বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, উভয়ই মিথ্যা। আত্মা স্বীয় মায়াবলে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা করিবার ইচ্ছায় জীবের সৃষ্টি করেন, পরে সেই জীবদ্বারা পৃথগ্বিধ নানা ভাব (পদার্থ) সৃষ্টি করেন (কল্পনা)। রজ্জুর স্বরূপ অন্ধকারে পরিজ্ঞাত না হওয়ায় যেমন তাহা সর্প, জলধারা অথবা দণ্ডরূপে কল্পিত হয়, তেমনি অবিদ্যা দ্বারা আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকায়, তাহা বিবিধরূপে কল্পিত হয়। এই মায়া আত্মারই। নিজের মায়াদ্বারাই তিনি মোহিত হন। এই আত্মাকে প্রাণ, ভূত, গুণ, তত্ত্ব প্রভৃতি বহুরূপে ধারণা করা হইয়াছে। অজ্ঞানী ব্যক্তিই আত্মাকে এই সকল ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। প্রাণাদি যে যে রূপে আত্মার কল্পনা করা হয়, তখন তাহারা সকলেই আত্মার অপৃথক্‌ভূত ভাব। কোনটি আত্মার অতিরিক্ত নহে। বেদান্তে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই জগৎকে স্বপ্নের মতো, মায়ার মতো, গন্ধর্ব-নগরের মতো গণ্য করিয়া থাকেন। উৎপত্তি, নিরোধ (বিনাশ), বন্ধ, মুক্তিকামী সাধক, মুমুক্ষু, মুক্ত কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ইহাই পরম সত্য। এসকল আত্মারই কল্পনা।

তৃতীয় প্রকরণের নাম অদ্বৈত। ইহাতে তর্কদ্বারা কিরূপে অদ্বৈত জ্ঞান হয়, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। প্রকরণের প্রথম কারিকাতেই আছে যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াও, তাঁহাকে উপাস্য এবং আপনাকে উপাসক মনে করেন তিনি কৃপণ (দীন)। আত্মা আকাশতুল্য, জীব ঘটাকাশ তুল্য। ঘটের ধ্বংস হইলে ঘটাকাশ যেমন আকাশে বিলীন হয়, জীবও তেমনি প্রলয়ে আত্মাতে লীন হয়। এক ঘটের আকাশ যেমন ধূলি ইত্যাদি দ্বারা মলিন হইলে অন্যান্য ঘটাকাশ মলিন হয় না, তেমনি এক জীবের সুখাদি দ্বারা অন্য জীব মলিন হয় না। ঘটাকাশ আকাশের বিকারও নহে, অবয়বও নহে। জীবও পরমাত্মার বিকার বা অবয়ব নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়,

প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় রূপ যে পঞ্চ কোষের কথা আছে, তাহাদের প্রত্যেকটি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোষের অন্তর্বর্ত্তী ; সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা। তিনি আকাশের দ্বারা প্রকাশিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধু ব্রাহ্মণে (পঞ্চম ব্রাহ্মণ) পরব্রহ্মই প্রকাশিত। জীব ও আত্মার অভেদ ব্যাস পরাশরাদি কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহাদের ভেদ নিন্দিত হইয়াছে। উপনিষদে জীব ও আত্মার পৃথক্‌ত্বের যে সকল কথা আছে, সেখানে গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। মৃৎ, লৌহ, স্ফুলিঙ্গাদির যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে অদ্বৈত-অবতারণাই তাহাদের উদ্দেশ্য। জগতে কেহ উৎকৃষ্ট, কেহ মধ্যম, কেহ হীন অধিকারী। মধ্যম ও হীন অধিকারীর প্রতি অনুকম্পাবশতঃই তাহাদের জন্য উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তম অধিকারীর উপাসনার প্রয়োজন নাই। মায়া কর্ত্তৃক অদ্বৈতে ভেদের উদ্ভব হয়। অজাত আত্মা কখনও মর্ত্ত্যভাব পাইতে পারেন না। শ্রুতিতে নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে," ইহাদ্বারা এই জগৎ যে মায়িক তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যাহার জন্ম নাই (অজায়মান) তিনি বহুরূপে জাত হন মায়াদ্বারা। সংকল্পবর্জিত অজ (নিত্য), জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্ন। ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তিনি অজ। অজ কর্ত্তৃকই অজ জ্ঞাত হন। জগতের দ্বৈতরূপ মনেরই গ্রাহ্য। মন যখন "অমনীভাব" প্রাপ্ত হয়, (যখন তাহার মননকার্য্য লুপ্ত হয়) তখন দ্বৈত থাকে না। বিবেকবান ব্যক্তির নিরুদ্ধ নির্বিকল্প মনের প্রচরণ সুষুপ্ত মনের প্রচরণ হইতে ভিন্ন। সুষুপ্ত মন লয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু নিরুদ্ধ মন লয়প্রাপ্ত হয় না, তখন গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ-মল-বর্জিত হইয়া নির্ভয় জ্ঞানালোকে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তিনি অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, নামহীন, রূপহীন, সদা প্রকাশমান, সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহাকে কোনও বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না, তিনি অন্তঃকরণ-বর্জিত সুপ্রশান্ত নিত্য জ্যোতির্ময় অচল, অভয় ও সমাধিগম্য। তিনি "অস্পর্শযোগ" বলিয়া উপনিষদে উল্লিখিত। চিত্ত-নিগ্রহের জন্য জগতে সকলই দুঃখময় ইহা স্মরণ করিবে, কামভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবে, এবং সর্বদা ব্রহ্মকে স্মরণ করিবে। তাহা হইলে দ্বৈত দর্শন হইবে না। যখন চিত্ত সুষুপ্তিতে লীন হয় না, বিষয়েতেও বিক্ষিপ্ত হয় না, তখন অচল নিবাত প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল থাকে, অন্য কোনও কল্পিত বিষয়ে অনুরক্ত হয় না। সেই স্বস্থ (আপনাতে স্থিত), শান্ত (সকল অনর্থের উপসম রূপ), সনির্ব্বাণ (কৈবল্য সহ বর্তমান) অবর্ণনীয় উত্তম নিত্য, অজ কর্ত্তৃক জ্ঞেয় অজ সুখকে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মবাদিগণ জানেন। "ন কশ্চিৎ জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।

এতৎতদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিৎ ন জায়তে"। জীবের উৎপত্তি নাই। জীব স্বভাবতঃ অজ, তাহার কারণ নাই। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কিছুই তাহা হইতে জন্মে না।

চতুর্থ প্রকরণের নাম অলাতশান্তি। গৌড়পাদ বলিয়াছেন সকল পদার্থই (ধর্ম্ম) জন্ম-ও-মরণহীন। যাহারা কারণকে কার্য্য (শক্য অবস্থায়) মনে করেন, তাহারা কারণকে অজ বলিতে পারেন না। কেননা ইহার পরিণাম হয়। যাহার পরিণাম হয়, তাহা নিত্য হইতে পারে না। যাহার উৎপত্তি নাই, তাহা হইতে কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এরূপ কোনও দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় না। যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতেও কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহা স্বীকার করিলে অনবস্থার উদ্ভব হয়। আপনা হইতে কিছুরই উৎপত্তি হয় না, আবার অন্য কিছু হইতেও কিছুর উৎপত্তি হয় না। কোনও বস্তুরই উৎপত্তি নাই, তা সে সৎ হউক, অথবা অসৎ হউক অথবা সদসৎ হউক। সুতরাং অনাদি কোনও বস্তু হইতে কিছুর উৎপত্তি অসম্ভব। সকল প্রজ্ঞপ্তিই (অভিজ্ঞতা Experience) সনিমিত্ত অর্থাৎ তাহার কারণ আছে। বিষয়হীন প্রজ্ঞপ্তি হইতে পারে না। যুক্তিতে প্রজ্ঞপ্তি বাহ্য নিমিত্ত হইতে উদ্ভূত প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু পরমার্থ-দৃষ্টিতে (ভূত-দর্শনাৎ) তাহাদের নিমিত্তই নাই। চিত্তের সহিত অর্থের সংস্পর্শ হয় না। অর্থের আভাসও চিত্তে উৎপন্ন হয় না। কেন না অর্থের অস্তিত্বই নাই। সুতরাং তাহার আভাসও নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে (ত্রিষু অধ্বসু) চিত্ত কখনও নিমিত্তের সংস্পর্শে আসে না। সুতরাং নিমিত্তহীন চিত্তের বিপর্য্যাস হইতে পারে না। চিত্ত অথবা চিত্ত দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয়, উভয়েরই উৎপত্তি নাই। জন্মরাহিত্যই যাহার প্রকৃতি, সে সে প্রকৃতি বর্জন করিতে পারে না। সংসারের আদি নাই, সুতরাং তাহার অন্তও থাকিতে পারে না। সুতরাং আদিমৎ মোক্ষের (যে মোক্ষের আদি আছে, তাহার) অনন্ততা সিদ্ধ নহে। আদিতে যাহার অস্তিত্ব নাই, অন্তে যাহার অস্তিত্ব নাই, বর্ত্তমানেও তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মিথ্যার সদৃশ হইয়াও তাহা সত্যের মতো প্রতীত হয়। স্বপ্নে শরীর নিশ্চেষ্ট ভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকে। যে শরীর দ্বারা স্বপ্নে অন্য স্থানে গমন হয়, তাহা মিথ্যা। স্বপ্নের শরীর যেমন অবস্তু, তেমনি জাগ্রৎকালে চিত্তকর্তৃক দৃশ্যমান জড় সংসারও অবস্তু। জাগরিত অবস্থায় বস্তু-সকল যেমন গৃহীত হয়, স্বপ্নেও সেইরূপ। স্বপ্ন জাগরণের কার্য্য। কিন্তু সেই জন্য জাগরিত কালের বস্তু সৎ নহে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সাধারণের গ্রাহ্য নহে।

জাগরিতকালে দৃষ্ট বস্তুও কেবল যাহার নিকট অবস্থিত, তাহার নিকটই সত্য, অন্যের নিকট নহে। সুতরাং তাহারাও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। কোনও বস্তুরই উৎপত্তি হয় না। কখনও অ-ভূত হইতে ভূতের উৎপত্তি হয় না। জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট বস্তু অবিদ্যাকল্পিত। স্বপ্নেও অবিদ্যাগ্রস্ত জীব বস্তু-সকল দর্শন করে। কিন্তু জাগরিত হইয়া আর তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। স্বপ্নের হেতু হইলেও জাগরিত অবস্থার বস্তু সৎ নহে। অসৎ হইতে অসৎ বস্তুরও উৎপত্তি হয় না, সৎ হইতেও অসতের উৎপত্তি হয় না। সৎ হইতে সতেরও উৎপত্তি হয় না। অসৎ কিরূপে সৎ হইতে উৎপন্ন হইবে?

উপলম্ভ (Experience-অনুভব) ও সমাচার কে (বর্ণাশ্রমোক্ত প্রত্যক্ষ বস্তু) বস্তুর অস্তিত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে মায়াহস্তীর অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়। জাত্যাভাস (জন্মের প্রতীতি), চলাভাস (গতির প্রতীতি), বস্ত্বাভাস (বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীতি) সকলই আভাস মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞান অজ, অচল, অবস্তু, শান্ত ও অদ্বয়। অলাতের (জ্বলন্ত যষ্টি) স্পন্দন কখনও ঋজু, কখনও বক্র প্রতীত হয়, তেমনি বিজ্ঞানের স্পন্দন গ্রাহক এবং গ্রহণরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের বাস্তবিক স্পন্দন নাই, তাহা অবিচল। অবিদ্যার অপগমে বিজ্ঞান যখন অস্পন্দিত হয়, তখন আর তাহার জন্মাদির বোধ হয় না। অলাত যেমন অস্পন্দমান ও আভাসহীন, বিজ্ঞান তেমনি অস্পন্দমান ও অনাভাস, নিত্য। অলাত যখন স্পন্দিত হয়, তখন সে স্পন্দন অন্য বস্তু হইতে আসে না, অলাতের আপনার স্পন্দন স্তব্ধ হইলে, সে স্পন্দন অন্যত্র গমন করে না। অলাতের ন্যায় বিজ্ঞানও নিশ্চল। বিজ্ঞানও তাহার আভাসের মধ্যে কার্য্যকারণতা ভাব কল্পনা করা যায় না। বিজ্ঞানের আভাস অচিন্ত্য। ধর্ম সকল চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, চিত্তও তাহাদের হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না।

যতদিন হেতু ফলাবেশ (কার্য্য-কারণতায় বিশ্বাস) থাকে (পাপের ফল ও পুণ্যের ফলে বিশ্বাস থাকে), ততদিন কারণও কর্য্যেরও উদ্ভব হয়, কিন্তু হেতু ফলাবেশ যখন ক্ষীণ হয়, তখন সংসারেরও সমাপ্তি হয়। সংবৃত্তি (মায়া) হইতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, বাস্তবিক শাশ্বত কিছু নাই। পরমার্থ-দৃষ্টিতে সকলই অজ আত্মা, অন্য কিছুই নাই। মায়া হইতেই সকলের উৎপত্তি, প্রকৃতপক্ষে কিছুই উৎপন্ন হয় না। কেননা যে মায়া হইতে তাহাদের উৎপত্তি, সেই মায়ারও অস্তিত্ব নাই। ঐন্দ্রজালিকের মায়াময় বীজ হইতে যেমন মায়াময়

অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, (সে অঙ্কুর নিত্যও নহে), তেমনি জাগতিক পদার্থের জন্ম ও মৃত্যু।

মাণ্ডুক্য-কারিকার উপরিউক্ত বর্ণনার সহিত বৌদ্ধদিগের কোনও কোনও মতের সাদৃশ্য স্পষ্ট। অধ্যাপক দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন যে সম্ভবতঃ গৌড়পাদ নিজেই বৌদ্ধ ছিলেন। মাণ্ডুক্য-কারিকার চতুর্থ প্রকরণের প্রথমেই যে আচার্য-স্তুতি আছে, ডাঃ দাসগুপ্তের মতে তাহা বুদ্ধের স্তুতি। কারিকাটি এই—

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান যো গগনোপমান্
জ্ঞেয়াভিন্নেন সংবুদ্ধঃ তং বন্দে দ্বিপদাং বরং।

যিনি আকাশকল্প জ্ঞেয়া-ভিন্ন জ্ঞান দ্বারা গগনোপম ধর্ম্ম (বস্তু) দিগকে জ্ঞাত হইতেছেন, সেই মানবশ্রেষ্ঠকে বন্দনা করি। কারিকার—"দ্বিপদাং বর" শব্দ নিশ্চয়ই কোনও মানুষকে বুঝাইতেছে। সংবুদ্ধ শব্দও গৌতমবুদ্ধের বাচক হইতে পারে। কিন্তু "দ্বিপদাং বর" শব্দ ও নরোত্তম শব্দ একই অর্থ বহন করে, এবং শাস্ত্রপাঠের প্রারম্ভে নারায়ণ ও নরোত্তমকে নমস্কার করিবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। "বুদ্ধ" শব্দ মাণ্ডুক্য কারিকায় তাহার ধাতুগত অর্থে বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তাহা হইতেও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শঙ্করের মতে 'দ্বিপদাং বর' পুরুষোত্তম নারায়ণকে লক্ষ্য করিতেছে।

পরবর্ত্তী কারিকা—

অস্পর্শ-যোগো বৈ নাম সর্ব্বসত্ত্বসুখো হিতঃ
অবিবাদোঽবিরোধশ্চ দেশিত স্তং নমাম্যহং"

সর্ব্ব প্রাণীর সুখকর ও হিতকর অবিবাদ অবিরোধ অস্পর্শযোগকে আমি নমস্কার করি। ডাঃ দাসগুপ্তের মতে এই কারিকায় গৌড়পাদ অস্পর্শযোগের উপদেষ্টাকে নমস্কার করিয়াছেন। তাহার মতে অস্পর্শযোগের অর্থ নির্ব্বাণ। কিন্তু শংকরের মতে এই কারিকা "অদ্বৈতদর্শন যোগের" স্তুতি। তাঁহার মতে ব্রহ্মবিদ্যাই অস্পর্শযোগ নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ নির্ব্বাণকে সুখময় অবস্থা বলা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আত্মার অস্তিত্ব বৌদ্ধদর্শনে অস্বীকৃত। নির্ব্বাণে সংস্কারসহ চৈতন্যেরও বিলোপ হয়। সুখ হইবে কাহার?

উক্ত প্রকরণের ১৯ কারিকা—

অশক্তি অপরিজ্ঞানং ক্রম-কোপোঽথবা পুনঃ।
এবং হি সর্ব্বথা বুদ্ধৈঃ অজাতিঃ পরিদীপিতা॥

হেতু ও ফল ইহাদের মধ্যে কে অগ্রে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না।

এইজন্য অজাতি (সকল বস্তুর অনুৎপত্তি) "বুদ্ধগণ" কর্তৃক প্রকাশিত। ডাঃ দাসগুপ্ত বলেন এখানে "বুদ্ধৈঃ" শব্দের অর্থ বুদ্ধদিগের কর্তৃক। শংকরের মতে এখানে 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ পণ্ডিত। আরও কয়েকটি কারিকায় দাসগুপ্তের মতে গৌড়পাদ বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে বর্ণিত আত্মার চতুষ্পাদ হইতে গৌড়পাদের দর্শনের আরম্ভ। তাঁহার মতে জাগ্রৎদৃশ্য বস্তু ও স্বপ্নবস্তু উভয়ই কল্পিত ও অসত্য। যাহাই মনের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাই অসত্য। কেবল মাত্র সাক্ষী আত্মাই সত্য। যাহা সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিক, সহজ, অকৃত, যাহা নিজের ভাব কখনও ত্যাগ করে না, তাহাই বস্তুর প্রকৃতি। কিন্তু বাহ্য বা আভ্যন্তর কোনও বস্তুরই (আত্মা ভিন্ন) এই প্রকৃতি নাই। সুতরাং আত্মা ভিন্ন সকলই মিথ্যা। কোনও বস্তুই আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না, অথবা অন্য কিছুর উৎপত্তি করে না। বস্তুতঃ উৎপত্তিই নাই। কোনও বস্তুই অন্য কিছুর কারণ নহে। কার্য্য-কারণবাদ স্বীকার করিলে বাহ্য ও আন্তরিক ভাব-সকলের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের অস্তিত্ব নাই।

গৌড়পাদের মতে বিজ্ঞান-স্পন্দনের ফলেই গ্রহণ (প্রতীতি) এবং গ্রাহ্য ভাবের প্রকাশ হয়, এবং আমরা নানাত্বের কল্পনা করি। কিন্তু বাহ্য জগতের অস্তিত্ব মনের বাহিরে নাই। মনে তাহাদের আবির্ভাবেরও কোনও কারণ নাই। চিত্তের মধ্যে বাহ্য কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। শঙ্কর বলেন যে বাহ্যার্থবাদীদিগের মত খণ্ডন করিতে গৌড়পাদ বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়পাদ চিত্তের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এক আত্মা ভিন্ন বাহ্য ও অন্তর কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোনও ভেদই তাহার মতে নাই। সুষুপ্তির অনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার অনুভব চরম সত্য নহে। যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহা সত্য। যতক্ষণ জাগ্রৎ অবস্থা থাকে, ততক্ষণ তাহার অনুভব সত্য। সুষুপ্তির অনুভব স্থায়ী নহে। সুতরাং তাহাও সত্য নহে। গৌড়পাদের মতে যাহার আদিতে অস্তিত্ব নাই, অন্তেও অস্তিত্ব নাই, মধ্যেও তাহার অস্তিত্ব নাই। আদ্যন্তবৎ সকল বস্তুই অসৎ। যাহা শাশ্বত ও যাহার অন্যের অপেক্ষা নাই, তাহাই একমাত্র সত্য। তাঁহার মতে সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। যাহা সৎ, তাহার পরিণাম নাই; কোনও বস্তুই তাহা হইতে ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইতে পারে না।

সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। জ্ঞানময় আত্মার জ্ঞান আত্মাতেই সীমাবদ্ধ; অন্য কিছুর জ্ঞান তাহাতে নাই (কেননা অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই)। কিন্তু স্থানে স্থানে জগতের অস্তিত্বের কথা আছে। কেহ কেহ জগৎকে ঈশ্বরের বিভূতি বলেন, কেহ বলেন স্বপ্ন মায়া, কেহ বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা। কেহ বলেন ঈশ্বরের ভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি, কেহ বলেন তাঁহার ক্রীড়ার জন্য। কিন্তু সৃষ্টি করা ঈশ্বরের স্বভাব। যিনি আপ্তকাম, তাঁহার আবার স্পৃহা কিসের। ঈশ্বরের এই স্বভাব তাঁহার মায়া। "কল্পয়তি আত্মনাত্মানং আত্মদেহঃ স্ব মায়য়া।" আপনার মায়া বলে, আত্মা আপনাকে আপনি কল্পনা করেন। তিনিই সকল ভেদ (বিভিন্ন বস্তু) জানেন, ইহাই বেদান্তের মত (২।১২)। অন্যত্র গৌড়পাদ বলিয়াছেন "আত্মা এই মায়া দ্বারা নিজে সম্মোহিত।" (মায়ৈব তস্যদেবস্য যয়া সম্মোহিতঃ স্বয়ং)। এই মায়া অনাদি। মায়াদ্বারা সুপ্তজীব যখন জাগরিত হয়, তখন অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অদ্বৈতকে জানিতে পারে—ইহাই গৌড়পাদের স্থির মত। আত্মা ভিন্ন অন্য যাহা কিছুর প্রতীতি হয়, তাহা মায়া, তাহার অস্তিত্ব নাই।

গৌড়পাদের মতে জীব ও আত্মার মধ্যে ভেদ নাই (২।১৩)। জীব ও আত্মার পৃথক্‌ত্ব, যাহা বেদের কর্ম্ম কাণ্ডে কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা গৌণ, মুখ্য নহে (২।১৪)। আত্মা আকাশতুল্য, জীব ঘটাকাশতুল্য। ঘটের বিনাশ হইলে ঘটাকাশ যেমন আকাশে বিলীন হয়, জীব ও তেমনি পরমাত্মাতে লীন হয়। ঘটাকাশ যেমন আকাশের বিকারও নহে, অবয়বও নহে, তেমনি জীবও আত্মার বিকার অথবা অবয়ব নহে। উভয়ে এক।

জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করাই মুক্তি। মুক্ত আত্মার জন্ম নাই। তিনি সকল লৌকিক ব্যবহারের অতীত। স্তুতি, নমস্কার বা দেব ও পিতৃকার্য্য কিছুই তাঁহার থাকে না।

অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবল সত্য জ্ঞান নহে, সৎ আচার এবং ঈশ্বরে ভক্তিরও প্রয়োজন। আত্মাকে যে যে ভাবেই গ্রহণ করে, সেই ভাবে উপাসনা করিলে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়পাদ তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপে যোগের বিধি দিয়াছেন। মনের নিরোধের ফলে আত্মতত্ত্বের বোধ হয় এবং গ্রাহ্যাভাবে মন শূন্যে পরিণত হয়। এই অবস্থাও সুষুপ্তির অবস্থা এক নহে। কেননা এ অবস্থায় ব্রহ্মের জ্ঞান হয়।

গৌড়পাদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম

গৌড়পাদ যে বৌদ্ধ ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ না হইলেও তাঁহার দর্শন যে বৌদ্ধ দর্শন কর্ত্তৃক প্রভাবিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদিগণ বাহ্য জগতের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করিতে যে যে যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন, গৌড়পাদও সেই সেই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বাহ্যজগৎকে মানসিক প্রত্যয়ে পরিণত করিয়া, তিনি শেষে মানসিক জগতের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন, এবং মনেরই (চিত্তের) অস্তিত্ব নাই বলিয়াছেন। শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে বৌদ্ধ-বাহ্যার্থ-বাদিপক্ষ-প্রতিষেধপর বচন আচার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন যেমন কার্য্যকারণতা স্বীকার করেন নাই, গৌড়পাদও তেমনি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ন নিরোধো নচোৎপত্তিঃ ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুঃ ন বৈ মুক্তঃ ইত্যেষা পরমার্থতা। বিনাশ উৎপত্তি, বন্ধ, সাধক, মুমুক্ষু, মুক্ত কিছুই নাই। ইহাই পরম সত্য।" নাগার্জ্জুন যাহাকে সংবৃত্তি বলিয়াছেন, সেই মায়াই জগতের অনুভূতির কারণ। "মায়াময়বীজ হইতে মায়ার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তাহা নিত্যও নহে নশ্বরও নহে। ধর্ম্ম সকল (বস্তু) সেইরূপ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত অবস্থা—বর্ণনাতীত। ইহাই "প্রপঞ্চোপশম।" নাগার্জ্জুনও ইহাকে "সর্ব্বোপলম্ভোপশমঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ" বলিয়াছেন। গৌড়পাদ ধর্ম্ম (বস্তু অর্থে), সংবৃতি (মায়া বা আপেক্ষিক জ্ঞান অর্থে) এবং সংঘাত (বাহ্যবস্তু অর্থে) বৌদ্ধ দর্শনে গৃহীত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অলাতের উপমাও বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সকল হইতে মনে মনে হয় গৌড়পাদ উপনিষদের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২

ভর্ত্তৃহরি ও ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ

কবি ও বৈয়াকরণিক ভর্ত্তৃহরি শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার ভট্টিকাব্য ও বৈরাগ্যশতক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মাক্ষমূলারের মতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৈরাগ্যশতক ভর্ত্তৃহরির রচিত অথবা তৎকর্ত্তৃক-সংগৃহীত সুভাষিতাবলী, সে সম্বন্ধে মাক্ষমূলার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরির দার্শনিক গ্রন্থের নাম বাক্যপদী। ইৎসিং বলেন ভর্ত্তৃহরি একাধিক বার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একাধিক বার তাহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যপদী বৌদ্ধমতের অনুকূল। জগৎ তাঁহার মতে প্রতিভাস মাত্র। "সর্ব্বং বস্তু

ভয়াম্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেব অভয়ম্।" পৃথিবীতে সকল বস্তুই ভয়ের আকর, বৈরাগ্যই কেবল অভয়। কিন্তু তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত—ব্রহ্ম 'শব্দাত্মক'।

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দাত্মকং যদক্ষরম্
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন, প্রক্রিয়া জগতো যথা॥

শব্দরূপ ব্রহ্ম হইতেই জগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিরবয়ব স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দই ব্রহ্ম।

ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্কর তাঁহার মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মতে ব্রহ্মে ভেদ যেমন আছে, তেমনি তিনি ভেদরহিত। শঙ্কর বলেন যে দুইটি বিভিন্ন গুণ এক বস্তুতে থাকিতে পারে না। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ বলেন—কারণ ব্রহ্ম কার্য্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কিন্তু প্রলয়ে কার্য্য ব্রহ্ম কারণে বিলীন হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়।

৩

শঙ্করাচার্য্য (৭৮৮-৮২০)

ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। থিব লিখিয়াছেন "শঙ্করের মত হইতে ভিন্ন যে সকল বৈদান্তিক মত অথবা অবৈদান্তিক অন্যান্য যে সকল মত প্রচলিত আছে, গভীরতায় অথবা সূক্ষতায় শঙ্করের দর্শনের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। "শঙ্করের দর্শন পড়িবার সময় পাঠকের মনে হয় তিনি এক অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মনের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁহার দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইলেও উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাকালে তাঁহার বুদ্ধি কোন ধর্ম্মবিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রতিহত হয় নাই। যুক্তির সাহায্যে তিনি তাহদের উপর যে অপূর্ব্ব দার্শনিক সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহ যুগ যুগ ধরিয়া সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে।"

শঙ্করের শিষ্যগণ-রচিত তাঁহার কয়েকখানি জীবনচরিত আছে। তাহাদের মধ্যে মাধবরচিত শঙ্করদিগ্‌বিজয় এবং আনন্দগিরিরচিত শঙ্করবিজয় প্রধান। মাক্ষমূলার ও ম্যাকডনেলের মতে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম এবং ৮২০ খৃষ্টাব্দে ৩২ বৎসরে তাহার মৃত্যু হয়। দাক্ষিণাত্যে মালাবারে কালদিগ্রামে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ বংশে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম ছিল

শিবগুরু এবং মাতার নাম সতী। তিনি পিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। কথিত আছে শিবপূজা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতা পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিয়াছিলেন। তিনি যে বেদ বিদ্যালয়ে বেদ শিক্ষা করেন, তাহার অধ্যাপকের নাম ছিল গোবিন্দ। গোবিন্দ ছিলেন গৌড়পাদের শিষ্য। শঙ্করের সকল গ্রন্থেই তিনি আপনাকে গোবিন্দ-শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিকটই তিনি অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং অষ্টম বর্ষেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যশ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই সময়ে কুমারিল ভট্টের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মণ্ডনমিশ্র তাঁহার সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিচারের সময় মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয় ভারতী মধ্যস্থ ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে সুরেশ্বরাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্র একই ব্যক্তি। দক্ষিণ ভারতে একটি প্রবাদ আছে যে শঙ্কর কুমারিলের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। শঙ্কর ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাদের মধ্যে মহীশূর প্রদেশে শৃঙ্গেরী মঠ প্রধান। অপর তিনটি পুরী, দ্বারকা এবং বদরিকাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত। মাতার মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রচলিত মত উপেক্ষা করিয়া শঙ্কর মাতার শ্রাদ্ধ করেন। তাহার ফলে অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ বিষম রুষ্ট হন। ৩২ বৎসর বয়সে হিমালয়ের উপরিস্থ কেদারনাথে শঙ্কর মানবলীলা সংবরণ করেন।

শঙ্কর যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। দাক্ষিণাত্যে তখন জৈন ধর্ম্মের অসাধারণ প্রভাব ছিল। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছিল। শৈব আদিয়ার ও বৈষ্ণব আলোয়ারগণ ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল। মীমাংসকগণ বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কুমারিল ও মণ্ডন মিশ্র জ্ঞানকাণ্ড ও সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মকাণ্ড ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। শঙ্কর আবির্ভূত হইয়া উপনিষদের জ্ঞান-মার্গের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি প্রাচীন এগারখানা উপনিষদের ও ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গীতার ভাষ্য রচনা করিয়া জ্ঞানবাদের সহিত ভক্তি ও কর্ম্মবাদের সামঞ্জস্য বিধান

করিলেন। তিনি এক সার্বিক দর্শনের সাহায্যে সমগ্র ভারতকে এক ধর্ম্মসূত্রে বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যে বহুল পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে বেশী জন্ম গ্রহণ করে নাই।

শঙ্কর-রচিত গ্রন্থাবলী

শঙ্কর-রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকখানা প্রাচীন উপনিষদের ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও গীতা-ভাষ্যই প্রধান। যে সকল উপনিষদের ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের নাম: (১) ঈশ, (২) কেন, (৩) কঠ, (৪) প্রশ্ন, (৫) মুণ্ডক, (৬) মাণ্ডুক্য, (৭) তৈত্তিরীয়, (৮) ছান্দোগ্য, (৯) বৃহৎ আরণ্যক, (১০) শ্বেতাশ্বতর ও (১১) ঐতরেয়। কথিত আছে তিনি অথর্বশির ও নৃসিংহ তাপনী উপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম (১) আপ্তবজ্রশুচি, (২) আত্মবোধ, (৩) মোহমুদ্গর, (৪) দশশ্লোকী, (৫) অপরোক্ষানুভূতি, (৬) বিষ্ণু-সহস্র-নামের টীকা ও (৭) সনৎ সুজাতীয়ের ভাষ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত কয়েকটি স্তোত্রও আছে। দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্র, হরিমীড়ে স্তোত্র, আনন্দলহরী, সৌন্দর্য্যলহরী ও গঙ্গা-স্তোত্র ইহাদের অন্তর্গত। এই সকল স্তোত্রে তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির ও সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শঙ্করের দর্শন

চতুঃসূত্রী

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটি সূত্রকে "চতুঃসূত্রী" বলে। এই চারি সূত্রের শঙ্কর-রচিত ভাষ্যকে তাঁহার সমগ্র ভাষ্যের উপক্রমণিকা বলা যায়। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই "অধ্যাসের" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চতুঃসূত্রীর মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যুস্মৎ" শব্দের যাহা বাচ্য এবং "অস্মৎ" শব্দের যাহা বাচ্য, উভয়ে নিতান্ত ভিন্ন। "যুস্মৎ" শব্দের বাচ্য বিষয় (জ্ঞানের বিষয়), এবং "অস্মৎ" শব্দের বাচ্য বিষয়ী, (বিষয়ের জ্ঞাতা)—চিৎ পদার্থ। ইহারা অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব। তাহাদের স্বরূপ ও ধর্ম্মের বিনিময় হইতে পারে না, অর্থাৎ একের স্বরূপ ও ধর্ম্ম অন্যে বর্ত্তিতে পারে না। বিষয়ী চিৎস্বরূপ জ্ঞাতা, বিষয় অচেতন জড়। বিষয়ীর ধর্ম্ম যেমন বিষয়ে বর্ত্তিতে পারে না, তেমনি বিষয়ের ধর্ম্মও বিষয়ীতে বর্ত্তিতে পারে না। সুতরাং চিদাত্মক বিষয়ীতে অচিৎ

বিষয়ের ধর্ম্মের আরোপ এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্ম্মের আরোপকে মিথ্যা বলিতে হইবে। তথাপি অনাদিকাল হইতে বিষয়ীতে বিষয়ের ধর্ম্মের আরোপ এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্ম্মের আরোপ লোক-ব্যবহারে চলিয়া আসিতেছে। "আমি ইহা", "ইহা আমার" প্রভৃতি সর্ব্বদাই লোকে বলিয়া থাকে। ইহা অধ্যাস।

অধ্যাস কি? "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"—পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুর স্মৃতিতে রক্ষিত রূপের অন্য বস্তুতে অবভাসই অধ্যাস। পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতিরূপের রজ্জুতে প্রকাশ অধ্যাস। কেহ কেহ (অন্যথা খ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক ও আত্মখ্যাতিবাদী বিজ্ঞানবাদিগণ) বলেন "অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ" অর্থাৎ এক বস্তুর ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে প্রতীতি অধ্যাস। আবার কেহ কেহ বলেন (প্রভাকর) "যত্র যদধ্যাসঃ তদ্‌বিবেকাগ্রহ-নিবন্ধনঃ ভ্রমঃ।" যেখানে যাহার অধ্যাস হয় সেখানে উভয়ের পার্থক্য জ্ঞানের অভাববশতঃ যে ভ্রম (যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম), তাহাই অধ্যাস। সকল মতেই একের ধর্ম্মের অবভাস অন্য বস্তুতে হয়। ভাষ্যকার অন্যত্র "অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধি"ই অধ্যাস, ইহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যাহা কোনও এক বিশেষ বস্তু নহে (অ-তৎ), তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া জ্ঞান (তদ্‌বুদ্ধিঃ) অধ্যাস।

কিন্তু যে প্রত্যক্-আত্মা কখনও বিষয় হন না, তাঁহাতে বিষয় ও তাহার ধর্ম্মের অধ্যাস কিরূপে সম্ভবপর হয়? যাহা সম্মুখে অবস্থিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহাতেই অন্য বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারে। কিন্তু বিষয়ী প্রত্যক্ আত্মা তো কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না। উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, কেবল সম্মুখস্থ বিষয়েই যে অধ্যাস হইবে এমন নিয়ম নাই। অপ্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিঅগ্রাহ্য) আকাশে অজ্ঞলোক তল ও মালিন্যের (নীলবর্ণ) অধ্যাস করে। প্রত্যক্ আত্মা "একান্ত অবিষয়"ও নহেন। তিনি "অস্মৎ" প্রত্যয়ের বিষয় এবং স্বয়ং-প্রকাশ (অপরোক্ষ)। এই প্রকার অধ্যাসকে পণ্ডিতেরা বলেন অবিদ্যা। আর অধ্যাসবর্জন করিয়া বস্তুর স্বরূপের অবধারণকে বিদ্যা বলেন। অধ্যস্ত পদার্থের গুণ ও দোষ দ্বারা তাহার অধিষ্ঠান অণুমাত্রও সম্বদ্ধ হয় না। এই অধ্যস্ত পদার্থসকল অবলম্বন করিয়াই লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার হয়। বিধি-নিষেধ ও মোক্ষপর শাস্ত্র সকলই এই অধ্যস্ত বস্তুসকলকে স্বীকার করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও শাস্ত্র সকলই অবিদ্যাদুষ্ট। অসঙ্গ আত্মা প্রমাতা বা জ্ঞাতা হন না। কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়াদিতে "অহং", "মম" ভাব না থাকিলে প্রমাতৃত্বও হয় না, প্রমাণের ব্যবহারও হয় না। পশুদিগের সহিত এ বিষয়ে মানুষের প্রভেদ নাই। আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরের মধ্যে অধ্যাস

হইলেই ব্যবহার সম্ভব হয়। নিষ্ক্রিয় অসঙ্গ আত্মার দ্বারা কোনও ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। এই অনাদি অনন্ত নৈসর্গিক মিথ্যা প্রত্যয়রূপ অধ্যাসই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের প্রবর্ত্তক। এই অনর্থহেতু অবিদ্যার নাশের জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন।

উপরে যে "প্রত্যক্ আত্মা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ জীবাত্মা। যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রতিকূলভাবে নিজেকে নির্বচনীয় করেন, তিনিই প্রত্যক্ এবং তিনিই আত্মা। "অসৎ জড় ও দুঃখাত্মক অহংকার প্রভৃতি হইতে ভিন্ন ভাবে সৎ ও চিৎ সুখাত্মকরূপে যিনি প্রকাশিত হন, তিনিই প্রত্যক্ ও আত্মা" (রত্নপ্রভা)। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অভ্যন্তরবর্ত্তী, কিন্তু তাহাদিগের হইতে ভিন্ন তাহাদের অধিষ্ঠান যে কূটস্থ আত্মা, তাহাই প্রত্যক্ আত্মা। অন্তঃকরণরূপ উপাধিযোগে তিনি সোপাধিক। ইনিই জাগ্রৎ অবস্থাতে "আমি"রূপে অনুভূত হন। সুষুপ্তিকালে যখন অন্তঃকরণের ক্রিয়া থাকে না, তখন অজ্ঞান উপাধিযোগে তিনি যে প্রকার অনুভূত হন, তাহারই স্মৃতি নিদ্রাভঙ্গে "সুখে ঘুমাইয়াছি, কোনও কিছুরই জ্ঞান তখন ছিল না" এই অনুভবরূপে দেখা দেয়। এই জন্যই (উপাধি-যোগবশতঃ) শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মা অনুভব-গোচর হন। তখন তিনি নিতান্ত অবিষয় থাকেন না। একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে উপাধির যোগে যদি চিৎস্বরূপ আত্মা বিষয় হন, আবার তিনি বিষয় না হইলে যদি তাহাতে উপাধির যোগ হইতে না পারে, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে। কিন্তু বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় এই অধ্যাস অনাদি। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যাসে বিষয়রূপে ভাসমান আত্মা, পরবর্ত্তী অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন। ইহাতে কোনও বিরোধ নাই।

এই উপক্রমণিকার পরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মের কথা শুনিলেই তাঁহাকে জানা হয় না। ব্রহ্ম শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার মনন ও ধ্যান ব্যতীত হয় না। কর্ম্মের ফল অনিত্য। এইজন্য নিত্যানিত্য-বিবেক, (অনিত্য অনাদি বস্তু হইতে নিত্য ব্রহ্মের ভেদ জ্ঞান), ইহামুত্র ফলভোগ-বিরাগ (ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বিরাগ) এবং ছয় সাধন-সম্পত্তি যথা—শম (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), উপরতি (শ্রবণ ও মননাদি ব্যতিরিক্ত কর্ম্ম হইতে বিরতি), তিতিক্ষা (অখেদে দুঃখসহন), সমাধান (ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা); শ্রদ্ধা (গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস) অর্জ্জন করিবার পরে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। সাধন-সম্পত্তি অর্জ্জন না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা ফলবতী হয় না।

কিন্তু ব্রহ্ম কি? সে সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে। ব্রহ্ম যে আত্মা, ইহা লোকে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আত্মা কে? কেহ বলেন (শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোক ও চার্ব্বাকপন্থিগণ) যে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। অন্য একদল চার্ব্বাকপন্থী বলেন চেতন ইন্দ্রিয়গণই আত্মা। অপর একদল চার্ব্বাকপন্থী বলেন মনই আত্মা। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা। মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলেন শূন্যই আত্মা। ন্যায় বৈশেষিক মতাবলম্বী বলেন দেহ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন সংসারী কর্ত্তা ও ভোক্তাই আত্মা। সাংখ্যগণ বলেন, আত্মা ভোক্তামাত্র, কর্ত্তা নহেন। পাতঞ্জল মতাবলম্বী বলেন, ভোক্তা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ ও শক্তিমান ঈশ্বর আছেন। কোন কোন বেদান্তী বলেন ব্রহ্ম ভোক্তা জীবের আত্মস্বরূপ। কিন্তু শ্রুতি বলেন, যাহা হইতে জীবের জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু হয় এবং যাঁহাতে অন্তিমে জীব প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, তিনিই ব্রহ্ম, ইহা অনুমান নহে, ইহার প্রমাণ শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কাররূপ অনুভব। বেদান্তবাক্য-কুসুমসকল গ্রথিত করাই ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য। শ্রুতি-বাক্যের বিচার হইতে যে তাৎপর্য্য-নিশ্চয় হয়, তাহা দ্বারাই ব্রহ্ম-জ্ঞান নিষ্পাদিত হয়, অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা নহে। বেদান্ত-বাক্যের অর্থগ্রহণের দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য উপনিষৎ-বাক্যের অবিরোধী যে অনুমান, তাহাও প্রমাণ বটে, কিন্তু তাহা শ্রুতি-বাক্যের সহায়ক মাত্র।

ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, কেন না তাঁহা হইতেই বেদের উৎপত্তি, তিনি শাস্ত্রযোনি। অনেক প্রকার বিদ্যার আকর শাস্ত্র দ্বারা উপবৃংহিত (পুষ্ট), প্রদীপের ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়-প্রকাশক বেদের উৎপত্তি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ হইতেই সম্ভবপর—অন্য কিছু হইতে সম্ভবপর নহে। বৃহদারণ্যকে (২।৪।১০) আছে "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম এতদ্ যৎ ঋক্‌বেদঃ"। কিন্তু বেদ নিত্য, তাহার আবার উৎপত্তি কি? ইহার উত্তর এই যে প্রতি কল্পে একই থাকে বলিয়া বেদ নিত্য। শ্রুতিতে স্পষ্ট আছে "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ (সকল যজ্ঞে যাহাকে আহুতি প্রদান করা হয়, সেই যজ্ঞ-শব্দ-বাচ্য ব্রহ্ম হইতে) ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে" ঋক ও সামগণ জন্মলাভ করিয়াছেন)। ব্রহ্ম হইতে যেমন বেদের উৎপত্তি, তেমনি বেদই ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ—তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রমাণ।

এই ব্রহ্মই (তৎ) বেদান্তের প্রতিপাদ্য। সকল বেদান্ত বাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখা যায় যে তাহারা ব্রহ্মেই সংগত হয়। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কারণ ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

জ্ঞান তত্ত্ব

বহু-সংখ্যক উপনিষদের প্রত্যেকেই ব্রহ্ম-তত্ত্ব আলোচিত হইলেও তাহাদিগের মধ্যে মত-ভেদ আছে। এই মত-ভেদের কারণ প্রত্যেক উপনিষদকার যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহার বিভাবও অনন্ত। যে ঋষির নিকট তাঁহার যে বিভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্ম-সূত্রে এই সকল মতের সামঞ্জস্য-বিধান করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্ম-সূত্রগুলি এত সংক্ষিপ্ত, যে তাহাদের অর্থ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শঙ্কর তাঁহার দর্শনের প্রারম্ভেই প্রমাতা জীবকে "অবিদ্যাবৎ" (অবিদ্যাযুক্ত) এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং শাস্ত্রদিগকে "অবিদ্যাবৎ-বিষয়াণি" বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিজাত জ্ঞান নির্ভর যোগ্য নহে।

শংকরের মতে অদ্বৈত আত্মাই চরম সত্য। তিনিই সর্ব্বত্র বিরাজিত। তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু নাই। বিভিন্ন উপাধিযোগে তিনি বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। ভিতরের অন্তঃকরণ, বা দূরস্থ ঘটাদি বস্তু, সকলই সেই অদ্বৈত আত্মায় অধ্যস্ত; তিনিই সকলের অধিষ্ঠান। জ্ঞানে এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের তিন রূপে প্রকাশ: (১) প্রমাতৃ-চৈতন্য, (২) প্রমাণ চৈতন্য এবং (৩) বিষয়চৈতন্য। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, অর্থাৎ অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত ও তদ্দ্বারা সীমাবদ্ধ চৈতন্যকে প্রমাতৃ-চৈতন্য বলে। অন্তঃকরণের বৃত্তি, অর্থাৎ জ্ঞানকালে অন্তঃকরণ যে রূপ ধারণ করে, সেই বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য প্রমাণ-চৈতন্য। জ্ঞানের যাহা বিষয় (ঘটাদি), তাহা দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বিষয়-চৈতন্য বলে। ঘটাদি-উপাধি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ঘটাদি-উপহিত চৈতন্যও বলে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—সর্ব্বত্রই চৈতন্যেরই প্রকাশ। যাহা বস্তুবিশেষের সহিত অন্বিত না হইলেও, তাহার জন্য সেই বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, তাহাই উপাধি। বহিরিন্দ্রিয়কর্ত্তৃক যাহা আনীত হয়, অন্তঃকরণ তাহাদিগকে জ্ঞানোপযোগী করিয়া সজ্জিত করে। অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত করা হয় না, কেননা ইহা যদি ইন্দ্রিয় হইত, তাহা হইলে ইহা ইহার নিজের অথবা বৃত্তির জ্ঞানলাভ করিতে পারিত না। ইহার অংশ আছে।

ইহা আকারে আণবিকও নহে, অসীমও নহে। দর্পণে যেমন বস্তু প্রতিফলিত হয়, অন্তঃকরণেও তেমনি তাহারা প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনের অর্থ তাহাদিগের জ্ঞানলাভ করা। এই জ্ঞানশক্তি অন্তঃকরণ লাভ করে আত্মা হইতে। আত্মাই অন্তঃকরণের মধ্যে দীপ্তিমান এবং বস্তুতঃ আত্মাতেই সকল বস্তু প্রতিফলিত হয়। আত্মার শক্তিতেই অন্তঃকরণ বস্তু-জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

অন্তঃকরণের বৃত্তি চারিপ্রকার—সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব (অহংকার) ও স্মরণ। সংশয়াপন্ন অন্তঃকরণকে বলে মন। নিশ্চয়বৃত্তি-যুক্ত অন্তঃকরণকে বলে বুদ্ধি। আত্ম-সংবিদবৃত্তি-যুক্ত অন্তঃকরণকে বলে অহংকার। মনঃসংযোগ ও স্মৃতিবৃত্তি-যুক্ত অন্তঃকরণকে বলে চিত্ত। মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত মূলতঃ এক, বৃত্তিভেদে তাহা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। জ্ঞানের কারণ কেবল অন্তঃকরণের সহিত যুক্ত (তাহার তলদেশে অবস্থিত) চৈতন্য নহে। অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যই জ্ঞানের কর্তা। প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণ ভিন্ন বলিয়া তাহার জ্ঞানও অন্যের জ্ঞান হইতে ভিন্ন। সীমাবদ্ধ বলিয়া অন্তঃকরণে সমগ্র জগতের জ্ঞান হয় না।

প্রমাণ

প্রমাণ ত্রিবিধ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। অন্তঃকরণ যখন ইন্দ্রিয়দিগের মাধ্যমে বাহ্যবস্তুদিগের সংস্পর্শে আসে, তখন তাহার পরিণাম হয়। এই পরিণামকেই বলে বৃত্তি। যখন কোনও ঘটের জ্ঞান হয়, তখন অন্তঃকরণ চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া ঘটে যায় এবং ঘটের আকার প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার ঘটাকার-বৃত্তি। সকল বস্তুই অজ্ঞানে আবৃত। যখন অন্তঃকরণের ঘটাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তখন ঘট হইতে অজ্ঞানাবরণ তিরোহিত হয় এবং তাহার উপর চিতের আলোক পতিত হয় এবং তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞেয় বস্তুর রূপপ্রাপ্ত অন্তঃকরণের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশই সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যখন ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, তখন অন্তঃকরণের ঘটাকার বৃত্তি ঘটের সহিত মিলিত হয়। তখন ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বৃত্তি-বিশিষ্ট চৈতন্য মিলিত হইয়া ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। যখন "আমি সুখী" এই জ্ঞান হয়, তখন সুখ ও অন্তঃকরণের বৃত্তি একই দেশস্থিত। উভয়ের ভেদ না থাকাতে ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষ। বিষয় ও অন্তঃকরণবৃত্তি যখন একই দেশে ও কালে অবস্থিত, তখনই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। বিভিন্ন কালে অবস্থিত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। যেমন স্মৃতি জ্ঞান। *

---

* প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বর্ণনা শরৎচন্দ্র ঘোসাল-সম্পাদিত "বেদান্ত পরিভাষা" হইতে গৃহীত।

অন্তঃকরণের বৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বার পথে বহির্গত হইয়া বিষয়কে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহার গতি সীমাবদ্ধ, সুতরাং অধিক দূরে অবস্থিত বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্তঃকরণ যে ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার উপরেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান নির্ভর করে। যদি তাহা শব্দাকারে পরিণত হয়, তাহা হইলে শব্দ-জ্ঞান হয়। যদি কোনও বস্তুর ভারের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে ভারের জ্ঞান হয়।

যখন ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান হয়, তখন অন্তঃকরণ অগ্নির রূপ ধারণ করে না, কেননা অগ্নির সহিত তখন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ নাই।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে প্রমাতৃ-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য এবং বিষয়-চৈতন্য ও তাহাদের উপাধিদিগের (অন্তঃকরণ, বৃত্তি এবং ঘটাদি) একই কালে একত্র সমাবেশের ফলে তাহারা অভিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলেই বিষয়-চৈতন্য হইতে অভিন্ন প্রমাতৃ চৈতন্য অধ্যস্ত ঘটাদি জানিতে পারে। ঘটাকারা বৃত্তি ও ঘট উভয়েই একই স্থানে একত্র থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ থাকে না। অনুমানে বৃত্তি ও বিষয় একত্বপ্রাপ্ত হয় না। অনুমানের সহিত প্রত্যক্ষের এইখানে পার্থক্য। দর্শন ও শ্রবণ কালেই অন্তঃকরণবৃত্তি দেহের বাহিরে গিয়া বিষয়ের সহিত মিলিত হয়। ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শকালে বৃত্তি বাহিরে গমন করে না। বিষয়ই তখন দেহের মধ্যে উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষে বিষয় ও অন্তঃকরণ-বৃত্তি একই কালে অবস্থিত, কিন্তু স্মৃতিতে অতীত ঘটনাই জ্ঞানে আবির্ভূত হয়। অনুমানে অন্তঃকরণ বিষয়ের চিন্তা করে, কিন্তু বাহিরে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হয় না।

প্রত্যক্ষের নানা ভেদ আছে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়াজন্য প্রত্যক্ষ। যে সকল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, তাহারা ইন্দ্রিয়-জন্য, আর যে সকল প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নাই তাহারা ইন্দ্রিয়াজন্য। কামনা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়াজন্য। বিষয়-চৈতন্য ও প্রমাণ-চৈতন্যের মিলন ও একত্বই প্রত্যক্ষের লক্ষণ—ইন্দ্রিয়ক্রিয়া নহে। সুখের প্রত্যক্ষের সময় সুখ ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তি এক হইয়া যায়। কেন না তাহারা এক স্থানেই অবস্থিত। কিন্তু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইলেও তাহারা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অন্তঃকরণের সকল ধর্ম্মই প্রত্যক্ষের "যোগ্য" নহে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বভাব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা প্রত্যক্ষের "যোগ্য" নহে।

শব্দ-জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে, যখন শব্দজনিত অন্তঃকরণ-বৃত্তি ও শব্দ-জ্ঞানের বিষয় সংমিলিত হয়। যখন দশজন লোকের মধ্যে একজনকে বলা হইল 'তুমি দশম', তখন সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ (বা অপরোক্ষ), পরোক্ষ

নহে। যখন চন্দন দেখিয়া বলি "সুরভি চন্দন", তখন চন্দনের ঘ্রাণ লই না। দূর হইতে দেখিয়াই বলি ঐ সুরভি চন্দন। এখানে চন্দন-জ্ঞান প্রত্যক্ষ, সৌরভ-জ্ঞান পরোক্ষ। সুতরাং প্রত্যক্ষের প্রকৃত সংজ্ঞা হইবে "স্বাকার-বৃত্ত্যুপহিত-প্রমাতৃ-চৈতন্য-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্ব-শূন্যত্বে সতি যোগ্যত্বং বিষয়স্য প্রত্যক্ষং"—অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় আপনার সদৃশ বৃত্তির দ্বারা যে প্রমাতৃ-চৈতন্য উপস্থিত করিবে, তাহার অস্তিত্বের সহিত বিষয়টির অস্তিত্বের পার্থক্য না থাকিলে এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষের যোগ্য হইলে সেখানে প্রত্যক্ষ হয় (বেদান্ত-পরিভাষা)।

সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদেও প্রত্যক্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। "বৈশিষ্ট্য-অবগাহী" জ্ঞান সবিকল্প প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ সে জ্ঞান বিশেষিত। যাহার মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ থাকে তাহাই সবিকল্প। যেমন "ঘটমহং জানামি", আমি ঘট জানি। এখানে ঘটের গুণের জ্ঞানসহ ঘটের জ্ঞান হইতেছে। "সংসর্গ-অনবগাহী জ্ঞান" নির্বিকল্প। যে জ্ঞানে সংসর্গ (বৈশিষ্ট্য) জ্ঞান নাই, তাহা নির্বিকল্প। যেমন "এই সেই দেবদত্ত", "তুমি সেই।" এই জ্ঞান শাব্দ জ্ঞান বলিয়া যে প্রত্যক্ষ নহে, তাহা নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শাব্দ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়-দ্বারা উৎপন্ন না হইলেও জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অন্তঃকরণ বাহিরে আসিয়া দেবদত্তরূপ বৃত্তি ধারণ করে এবং প্রমাতৃচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য এক হইয়া যায়। এই জন্য ইহা প্রত্যক্ষ। "তুমি সেই" এখানেও প্রমাতৃ-ও-বিষয়-চৈতন্য এক হইয়া যায়।

জীব-সাক্ষী এবং ঈশ্বর-সাক্ষী ভেদেও প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ। অন্তঃকরণকর্তৃক অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। অন্তঃকরণ-উপাধিযুক্ত চৈতন্য জীব-সাক্ষী। জীব ও জীব-সাক্ষী এই উভয়ের মধ্যে ভেদ এই যে একটিতে অন্তঃকরণ জীবের বিশেষণ, জীব অন্তঃকরণ-কর্তৃক বিশেষিত, কিন্তু অন্যটিতে ইহা জীবসাক্ষীর উপাধিমাত্র। বিশেষণ কার্য্যান্বয়ী অর্থাৎ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ও ব্যাবর্ত্তক (অন্য হইতে ভেদ সাধক), উপাধির সঙ্গে এখানে কার্য্যের সম্বন্ধ নাই। তাহা ব্যাবর্ত্তক ও বর্ত্তমান। "রূপবিশিষ্ট ঘট" এখানে রূপ বিশেষণ। কিন্তু "কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভঃ শ্রোত্রং" এখানে কর্ণের বহির্দৃশ্যমান অংশ (কর্ণশষ্কুলী) কর্তৃক অবচ্ছিন্ন আকাশ শ্রোত্র—এখানে কর্ণশষ্কুলী উপাধি। নৈয়ায়িকগণ এই উপাধিকে "পরিচায়ক" বলেন।

অন্তঃকরণ জীবের একটা অংশ, কিন্তু জীব-সাক্ষীর বাহিরে তাহার

আবরণমাত্র। মায়া-উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর-সাক্ষী। তাহা এক, বহু নহে। তাহার উপাধি মায়া এক। সুতরাং ঈশ্বর-সাক্ষী চৈতন্যও এক। মায়া-উপহিত ঈশ্বর-সাক্ষী চৈতন্য অনাদি, কেননা তাহার উপাধি মায়া অনাদি। মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য পরমেশ্বর। মায়াকে বিশেষণ ধরিলে ঈশ্বরত্ব পাওয়া যায়, তাহাকে উপাধি ধরিলে সাক্ষিত্ব পাওয়া যায়। ঈশ্বরত্ব ও সাক্ষিত্বের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। কিন্তু ঈশ্বর ও ঈশ্বর সাক্ষী একই, কোনও ভেদ নাই। জীবের প্রত্যক্ষ জীবসাক্ষী-প্রত্যক্ষ। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরসাক্ষী-প্রত্যক্ষ। জীব বহু বলিয়া জীবসাক্ষী প্রত্যক্ষ প্রতি জীবে ভিন্ন। ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ এক। ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বর সাক্ষিত্বে ভেদ থাকিলেও, একই চৈতন্য উভয়ত্র প্রকাশিত, কিন্তু ঈশ্বর ও ঈশ্বর-সাক্ষীর মধ্যে ভেদ নাই।

সাক্ষী দ্বিবিধ বলিয়া প্রত্যক্ষও দ্বিবিধ—জ্ঞেয়গত ও জ্ঞপ্তি (জ্ঞান) গত। জ্ঞেয় (বিষয়) গত প্রত্যক্ষের সহিত যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহার সম্বন্ধ। কিন্তু জ্ঞপ্তিগত প্রত্যক্ষ হয় জ্ঞানের—যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের, জ্ঞানের বিষয়ের নহে। "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান" এখানে বহ্নি প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু বহ্নির আকার যে বৃত্তি, তাহা দ্বারা উপহিত চৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয়।

উপরে প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা যথার্থ ও ভ্রান্ত উভয় প্রত্যক্ষেই থাকে। যথার্থ প্রত্যক্ষের বেলায় বিষয়টি অবাধিত হওয়া চাই।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল সময়ে সত্য হয় না। কখনো কালো রজ্জু সর্পরূপে এবং শুক্তি রজতরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এই ভ্রান্তির কারণ অবিদ্যা। সত্য রজতজ্ঞানে যে সকল পদার্থ চক্ষুর সংসর্গে আসিয়া রজতজ্ঞান উৎপাদন করে, ভ্রান্ত রজত জ্ঞানে সে সকল পদার্থ জ্ঞানোৎপাদনে সহায়তা করে না। নেত্ররোগ-বিশিষ্ট লোকের দূষিত চক্ষুর সহিত সন্নিহিত শুক্তির সন্নিকর্ষ হইলে অন্তঃকরণে শুক্তির মতো চাকচিক্যময় বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বৃত্তিতে বিষয়-চৈতন্য (শুক্তিতে যে চৈতন্যের অধিষ্ঠান) প্রতিবিম্বিত হয়। তাহার পরে অন্তঃকরণে উদ্‌ভূত বৃত্তি বাহির হইলে বিষয়-চৈতন্য, বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্য এক হইয়া যায়। তাহার পর শুক্তিস্বরূপ অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যা প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন বিষয়-চৈতন্যে সংশ্লিষ্ট। চাকচিক্য প্রভৃতি সাদৃশ্য দেখিয়া (শুক্তিতে) রজতজ্ঞান উৎপন্ন হয়। নেত্ররোগ ইহার সহায়তা করে। এইরূপে এই অবিদ্যা রজতরূপ দ্রব্য ও রজতজ্ঞানের আভাস-রূপে পরিণত হয় (বেদান্ত পরিভাষা)। শুক্তিত্ব প্রকারিকা অবিদ্যা (বিষয়ে অবস্থিত) চাকচিক্যাদি সাদৃশ্য সন্দর্শন দ্বারা সমুদ্বোধিত রজত-সংস্কার দ্বারা

রজত জ্ঞানের আভাসাকারে পরিণত হয়। ভ্রান্ত জ্ঞানে অন্তঃকরণের দ্বিবিধ পরিণাম হয়—ইদম্‌রূপ (শুক্তি), এবং রজতরূপ। রজতরূপ স্মৃতির রূপ। তখন এই দুই রূপের (সত্য ও মিথ্যারূপের) মিলন হইতে ভ্রান্তির উদ্‌ভব হয়। ভ্রান্তরূপের যে অস্তিত্ব নাই, তাহা বলা যায় না। তাহার অস্তিত্ব না থাকিলে ভ্রান্তিই হইত না। যাহাকে সত্য রজত বলা হয় শঙ্করের দর্শনে তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু সত্য রজত ও মিথ্যা রজতের মধ্যে ভেদ এই যে মিথ্যা রজত সম্পূর্ণ বিষয়িগত (Subjective), অনুভবকর্ত্তার মনেই কেবল তাহার অস্তিত্ব, তাহা অন্যের অনুভবের বিষয় নহে।

উপাদানের সমান অস্তিত্ববিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তির নাম পরিণাম। দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধির অস্তিত্ব দুগ্ধের অস্তিত্বের সমান। কার্য্য এখানে স্বীয় উপাদানের পরিণাম। কিন্তু যেখানে কার্য্যের অস্তিত্ব উপাদানের অস্তিত্বের সমান নহে, সেখানে কার্য্যের উৎপত্তির নাম বিবর্ত্ত। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানে সর্পজ্ঞান বিবর্ত্ত। অবিদ্যার দিক হইতে দেখিলে শুক্তিতে রজত-জ্ঞান পরিণাম (অবিদ্যার), কিন্তু চৈতন্যের দিক হইতে দেখিলে বিবর্ত্ত।

বেদান্তমতে প্রত্যভিজ্ঞাও প্রত্যক্ষ-জ্ঞান—প্রত্যক্ষের সহিত স্মৃতি-সংস্কার-জড়িত। প্রত্যভিজ্ঞায় প্রত্যভিজ্ঞাত বস্তুর অভিন্নতা ও জ্ঞাতার অভিন্নতা উভয়ই থাকে।

বাহ্যজগতের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং স্বপ্নজ্ঞানও শুক্তিতে রজত-জ্ঞানের মতো ভ্রান্ত জ্ঞান—সকলই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অভিজ্ঞতালব্ধ বাহ্য জগতের জ্ঞানের সহিত স্বাপ্নিক জ্ঞানের ভেদ এই যে স্বাপ্নিক জ্ঞান অনভিব্যক্ত-স্বরূপ বলিয়া মায়ামাত্র। স্বপ্নে সৃষ্টির (স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর) মধ্যে পরমার্থের গন্ধও নাই। তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত নহে। পরমার্থবস্তুধর্ম্ম (সত্য বস্তুর ধর্ম্ম) স্বপ্নে প্রকাশপ্রাপ্ত হয় না। দেশ-কাল-নিমিত্ত-সম্পত্তি-ও-বাধা-রাহিত্যই পরমার্থ বস্তু ধর্ম্ম। এ সকল স্বপ্নে নাই। স্বপ্ন-স্থানে রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ নাই, দেহের মধ্যে তাহারা থাকিবে কোথায়? দেহ হইতে বাহির হইয়া জীব যে এই সকল দেখে তাহাও সম্ভবপর নহে। সুপ্ত জীব কি ক্ষণকাল মধ্যে শত যোজন দূরে গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে? আবার এমন স্বপ্নও আছে যাহাতে ফিরিয়া আসা দৃষ্ট হয় না। স্বপ্নে কালের বিরোধিতাও দেখা যায়। রজনীতে স্বপ্ন-দর্শনের সময় দিবস-দর্শন হয়। আবার মুহূর্তমাত্র স্থায়ী স্বপ্নে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইতেছে দেখা যায়। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত, তখন রথাদি দর্শনের জন্য

প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়ের অভাব, অথচ দর্শনশ্রবণাদি হয়। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় জাগ্রৎকালে এমন কি স্বপ্নকালেই বাধিত হয়। যাহা রথ ছিল দেখিতে দেখিতে তাহা মানুষে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু মায়িক হইলেও স্বপ্নে যে সত্যের লেশমাত্রও নাই, তাহা নহে। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভ ও অশুভের সূচক। স্বপ্নের কারণ জীবের সুকৃত-দুষ্কৃত (পাপ ও পুণ্য)।

বেদান্তমতে জগৎ মায়িক ও মিথ্যা। তাহা হইলে স্বপ্ন-জ্ঞান ও জাগরিত অবস্থায় জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি? প্রাজ্ঞ আত্মাই স্বপ্নের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা, ইহা কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে। আবার অন্যত্র স্বপ্নকে জীবের ব্যাপারও বলা হইয়াছে। ইহা শ্রুতিতে আছে যে জীব জাগ্রৎ দেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় আশ্রিত বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বরূপ-চৈতন্যের দ্বারা স্বপ্নানুভব করেন। আবার এই জীবকেই শুদ্ধ ও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন, স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, ইহা আমরা বলি না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাদি-সৃষ্টি আকাশাদি-সৃষ্টির ন্যায়ই; তাহা পারমার্থিক নহে। আকাশাদি-সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। যাবৎ না ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে, কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত। এইমাত্র প্রভেদ।

কিন্তু বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীবও তেমনি পরমেশ্বরের অংশ। যেমন দাহ ও প্রকাশ-শক্তি অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গ উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিও জীব ও ঈশ্বরের সমান। সুতরাং ঐশ্বর্য্যবলে জীবের সৃষ্টি-সংকল্প হয় এবং সেই সংকল্পবান জীব স্বপ্নে রথাদির সৃষ্টি করে, ইহা বলাতে আপত্তি কি? উত্তরে শঙ্কর বলেন, অংশাদি ভাব থাকিলেও জীবও ঈশ্বরের ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ। জীব অসত্য-সংকল্প, ঈশ্বর সত্য-সংকল্প। জীবের ঈশ্বরত্ব অবিদ্যা-কর্তৃক তিরোহিত, আচ্ছাদিত, প্রতিবদ্ধ বা অনভিব্যক্ত, আবরণ বিধ্বস্ত হইলে তাহা প্রকাশিত হয়, তাহার পূর্ব্বে হয় না। দেহের সহিত সম্বন্ধই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোধানের কারণ। এইজন্য জীব স্বপ্নে রথাদি সৃষ্টি করিতে পারে না। স্বাপ্নিক সৃষ্টি যদি সংকল্প-পূর্ব্বিকা হইত, তাহা হইলে কেহই অনিষ্ট স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না।

অনুমান

"অনুমিতি-প্রমা-করণম্ অনুমানম্" (বেদান্তপরিভাষা)। অনুমিতির যথার্থ জ্ঞান যাহাদ্বারা হয়, তাহাই অনুমান। "অনুমিতিশ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞান-

জন্য"। ব্যাপ্তি-জ্ঞান রূপে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, তাহা হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুব্যবসায়, স্মৃতি ও শাব্দজ্ঞান অনুমিতি নহে। ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির হেতু, বিষয়রূপে (যেমন অনুব্যবসায়ে) অথবা পদার্থজ্ঞানত্ব-রূপে (যেমন শাব্দজ্ঞান) অথবা সমান বিষয়ানুভবত্বরূপে (যেমন স্মৃতিতে) নহে।

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ। ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অনুমিতির মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কার। ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে অনুমিতি হয়। ব্যাপ্তির যে সংস্কার মনে থাকে, তাহাই অনুমিতির হেতু।

প্রাচীন ন্যায়ে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট এই ত্রিবিধ অনুমান স্বীকৃত। নব্য ন্যায়ে ইহাদিগকে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী, বলা হইয়াছে। কারণ হইতে কার্য্যের অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। কার্য্য হইতে কারণের অনুমান শেষবৎ। মেঘ দেখিয়া ভাবী বৃষ্টির অনুমান পূর্ব্ববৎ, ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান শেষবৎ। কার্য্য ও কারণ ভিন্ন হেতু হইতে অনুমান সামান্যতো দৃষ্ট। উৎপত্তি দেখিয়া ভাবী বিনাশের অনুমান এই শ্রেণীর। পূর্ব্ববৎ অনুমানে কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তি থাকে বলিয়া তাহা কেবলান্বয়ী। শেষবৎ অনুমানে থাকে কেবল ব্যতিরেক। যেখানে মেঘ সেখানেই বৃষ্টির সম্ভাবনার অনুমান কেবলান্বয়ী। যেখানে ধূম নাই সেখানে অগ্নিও নাই, এই অনুমান কেবল-ব্যতিরেকী। অন্বয় ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি উভয় হইতে যে অনুমান, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকী। যেখানে ধূম, সেখানে অগ্নি এবং যেখানে ধূম নাই, সেখানে অগ্নিও নাই। সুতরাং ধূম হইতে অগ্নির অনুমান অন্বয়-ব্যতিরেকীও হইতে পারে।

বেদান্ত মতে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি হইতে অনুমান হইতে পারে না। বেদান্তী অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকের ন্যায় বেদান্তও স্বার্থ ও পরার্থভেদে দ্বিবিধ অনুমান স্বীকার করেন। নিজের অনুমিতির জন্য যাহার প্রয়োগ হয়, তাহা স্বার্থ অনুমান। বহুবার রন্ধনশালায় ধূমের সঙ্গে অগ্নি দেখিয়া লোকের ধারণা হয়, যেখানে ধূম, সেখানেই অগ্নি। তাই পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া সেখানে অগ্নি আছে এই অনুমান হয়। ইহাতে ন্যায়ের পঞ্চ অবয়বের ব্যবহার হয় না। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলেই ন্যায়ের অবয়বগুলির ব্যবহার করিতে হয়। এই অবয়ব-সমন্বিত অনুমানকে পরার্থ অনুমান বলে। বেদান্তী পাঁচটি অবয়বের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে তিন অবয়বই যথেষ্ট। বেদান্তের তিন

অবয়ব—(১) প্রতিজ্ঞা (পর্ব্বতো বহ্নিমান), (২) হেতু (কেননা ইহা ধূমযুক্ত), এবং (৩) উদাহরণ (যাহা যাহা ধূমযুক্ত তাহাই বহ্নিযুক্ত), যেমন মহানস। বেদান্তমতে অনুমানের অবয়ব নিম্নলিখিত রূপও হইতে পারে।

যাহা যাহা ধূম-যুক্ত তাহাই বহ্নিযুক্ত (উদাহরণ), পর্ব্বত ধূমযুক্ত (উপনয়), সুতরাং পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত (নিগমন)। পাশ্চাত্য ন্যায়ের অবয়বগুলিও এইরূপ।

শব্দ ও অর্থ

শঙ্কর স্ফোটবাদ স্বীকার করেন নাই। যে যে বর্ণদ্বারা কোনও শব্দ গঠিত হয়, তাহাদের অতিরিক্ত সেই শব্দের একটি অখণ্ড রূপ আছে, ইহা তিনি স্বীকার করেন না।

বেদান্ত পরিভাষায় শব্দ ও তাহার অর্থবোধ-সম্বন্ধে যে মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে নিম্নে তাহার মর্ম্ম দেওয়া হইল।

"যস্য বাক্যস্য তাৎপর্যবিষয়ীভূত সংসর্গো মানান্তরেণ ন বাধ্যতে, তৎবা ক্যং প্রমাণং"—যে বাক্যের অর্থদ্বারা প্রকাশিত সম্বন্ধ অন্য কোনও প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয়না, সেই বাক্য প্রমাণ। কোনও বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার কারণ চারিটি—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি এবং তাৎপর্য্য-জ্ঞান। বাক্যের মধ্যে যে সকল পদ থাকে, তাহাদের যাহা অর্থ, তাহাদিগের পরস্পরের জিজ্ঞাস্য হইবার যোগ্যতাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। বাক্যের মধ্যস্থ ক্রিয়াপদে কর্ত্তার, কর্ত্তৃপদে ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। "কৃষক জমি চষিতেছে" এই বাক্যে "চষিতেছে" এই ক্রিয়া পদে কর্ত্তার (কৃষক) আকাঙ্ক্ষা, কৃষক এই কর্ত্তায় ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা, এবং জমি এই কর্ম্মে ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে।

বাক্যের যাহা তাৎপর্য্য তাহার সম্বন্ধের বাধার অভাবের নাম "যোগ্যতা"। "জল দ্বারা সেচন করিতেছে", এখানে জলের সঙ্গে সেচন ক্রিয়ার সম্বন্ধের বাধা নাই। সুতরাং অর্থ-গ্রহণে বাধা হয় না। কিন্তু যদি থাকিত "অগ্নি দ্বারা সেচন করিতেছে", তাহা হইলে বাধা হইত। অর্থ-গ্রহণও হইতে পারিত না।

অব্যবধানে পদোৎপন্ন পদার্থের উপস্থিতি আসত্তি। "অশ্ব দেখিতেছি" বাক্যে "অশ্ব" শব্দ উচ্চারণ করিয়া দুই ঘণ্টা ব্যবধানে "দেখিতেছি" শব্দ উচ্চারণ করিলে অর্থবোধ হয় না। "দেখিতেছি" শব্দ "অশ্ব" শব্দের অব্যবহিত পরেই উচ্চারিত হওয়া চাই, যাহাতে উহার অর্থ উচ্চারিত অশ্ব শব্দের অর্থের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে। স্থান বিশেষে কোনও পদ অনুক্ত থাকিতে পারে, তখন অনুক্তপদ অধ্যাহার করা যাইতে পারে। যেমন যজুর্বেদের প্রথম

মন্ত্রে "ইষেত্বা উর্জেত্বা" ইত্যাদি। এখানে "ছিনদ্মি" পদ অধ্যাহার করিয়া আসত্তি রক্ষা করা হয়।

পদার্থ (পদের অর্থ) দ্বিবিধ—শক্য ও লক্ষ্য। অর্থ-বিষয়ে পদের মুখ্য বৃত্তিকে শক্তি বলে। যেমন 'ঘট' বলিলে স্থূল উদর-বিশিষ্ট দ্রব্য বুঝায়। নৈয়ায়িকদিগের মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এক এক শব্দের এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ হয়। এই ঈশ্বরের ইচ্ছার সংকেতের নাম শক্তি। ইহা কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। বেদান্তীর মতে শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ, কেন না কারণের মধ্যে কার্য্যের অনুকূল শক্তিমাত্রকেই বেদান্তী পৃথক পদার্থ বলিয়া বাখ্যা করেন। "ঘট" শব্দের উচ্চারণ হইতে ঘটের জ্ঞান হয়। ঘটের জ্ঞান কার্য্য, ঘট শব্দ কারণ। সেই জন্য কারণে অবস্থিত কার্য্যানুকূল শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ। শক্তি-বিষয়ত্বই শক্যত্ব।

এই শক্যত্ব জাতিতে থাকে, ব্যক্তিতে নহে। "গো" শব্দে জাতিও বুঝায়, ব্যক্তিও বুঝায়। শক্যত্ব গো জাতিতে থাকে। ব্যক্তির সংখ্যা অনন্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিতে শক্তি থাকে বলিলে "গৌরব" হয় (বেশী বলা হয়)। কিন্তু "গো" শব্দে ব্যক্তিও বুঝায়। ব্যক্তিতে শক্যতা যদি না থাকে, তাহা হইলে "গো" শব্দে কেবল জাতিই বুঝাইত। উত্তরে বেদান্তী বলেন ব্যক্তি ও জাতির জ্ঞান এক সঙ্গেই হয়। ব্যক্তিগত শক্তি (স্বরূপবর্তী হেতু) 'গো' প্রভৃতি শব্দে স্বরূপে থাকে, তাহা জ্ঞাত হয় না। জাতিগত শক্তি আমাদের দ্বারা জ্ঞাত হইয়া জাতি-জ্ঞান উৎপন্ন করে। জাতি-শক্তির জ্ঞান হইতেই ব্যক্তি-জ্ঞান হয়। সুতরাং ব্যক্তিতে শক্তির অস্তিত্ব মানিবার প্রয়োজন নাই।

যে শক্তি জ্ঞাত হয় তাহার বিষয় বাচ্য। সুতরাং জাতিই শব্দের বাচ্য। "গো" শব্দের বাচ্য গো-জাতি (universal), গো-ব্যক্তি নহে। ইহাও বলা যায় যে "লক্ষণা" দ্বারা জাতিবাচক গো-শব্দ হইতে গো-ব্যক্তির জ্ঞান হয়। 'নীল ঘট'—এখানে নীল শব্দের অর্থ নীল বর্ণ হইলেও, "নীলবর্ণ বিশিষ্ট" এই অর্থ লক্ষণা দ্বারা বোধগম্য হয়।

'লক্ষণার' বিষয়ই লক্ষ্য। লক্ষণা দ্বিবিধ—কেবল ও লক্ষিত। শক্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের নাম "কেবল লক্ষণা"। "গঙ্গা" শব্দের শক্যার্থ গঙ্গা-নামক জল প্রবাহ। "গঙ্গায় ঘোষ" শব্দের অর্থ গঙ্গা-তীরে গোপালক। এখানে গঙ্গা-তীরের সঙ্গে গঙ্গার জল-প্রবাহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলিয়া এই লক্ষণা "কেবল লক্ষণা।" কিন্তু যেখানে শক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ নহে, সেখানে যে লক্ষণা, তাহার নাম "লক্ষিত লক্ষণা"। যেমন "দ্বিরেফ" শব্দে যখন ভ্রমর

বুঝায়, তখন লক্ষিত লক্ষণা। "ভ্রমর" শব্দে দুইটি 'র' আছে বলিয়া ভ্রমরকে দ্বিরেফ বলে। এখানে ভ্রমরের সঙ্গে দ্বিরেফের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে।

পদের অর্থের উপস্থিতি (স্মরণ—অব্যবহিত ভাবে) আসত্তি। আসত্তিই শব্দবোধের কারণ। অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়। পরস্পর অন্বয়-যোগ্য পদার্থের উপস্থিতি হইলে শব্দবোধ হয়, উপস্থিতি না হইলে হয় না। আবার অবান্তর (অন্তর্ভুক্ত) বাক্যগুলির অর্থবোধ হইতে মহাবাক্যের অর্থবোধ হয়।

অর্থবোধ উৎপাদন করিবার যোগ্যতার নাম তাৎপর্য্য—যদি সেই শব্দ বা বাক্য উদ্দিষ্ট বস্তু ভিন্ন অন্য প্রতীতির উৎপাদনের ইচ্ছায় উচ্চারিত না হয়। যে বাক্য যে প্রতীতি উৎপাদনের যোগ্য, তাহা যদি তদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রতীতি উৎপাদনের ইচ্ছায় উচ্চারিত না হয়, তাহা হইলে সেই বাক্য উদ্দিষ্ট বস্তুর সংসর্গপর। "সৈন্ধব" শব্দের অর্থ লবণ ও অশ্ব উভয়ই হয়। ভোজন কালে যখন বলা হয় "সৈন্ধবমানয়", তখন উদ্দিষ্ট বস্তু হইতেছে লবণ। এই উদ্দেশ্যে যদি উক্ত বাক্য উচ্চারিত হয় (অশ্ব অর্থে নহে), তাহা হইলে উক্ত বাক্য লবণ-সংসর্গপর। প্রতীতি উৎপাদনকারী তাৎপর্য্যই শাব্দ জ্ঞানের হেতু।

ন্যায় মতে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়াই বেদ নিত্য। মীমাংসা মতে বেদ নিত্য বলিয়া মানবসুলভ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, ইন্দ্রিয়াপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) প্রভৃতি দোষশূন্য; সেই জন্য ইহার প্রামাণ্য। কিন্তু বেদান্তমতে বেদ নিত্য নহে। কেননা ইহার উৎপত্তি আছে। শ্রুতিতেই আছে, ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ মহান্ পরমাত্মার নিঃশ্বাস। সুতরাং শ্রুতি দ্বারাই বেদের উৎপত্তি প্রমাণিত হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতে বেদ তিন ক্ষণমাত্রস্থায়ী। বেদান্ত তাহা স্বীকার করেন না। বেদ যদি তিনক্ষণমাত্র স্থায়ী হইত, তাহা হইলে যে বেদ দেবদত্ত পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন, তাহা তো লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমি এখন তাহা পাঠ করি কিরূপে? গ প্রভৃতি বর্ণও ক্ষণস্থায়ী নহে—কেননা বহু পূর্ব্বে পঠিত গ-কারকে পরে আমরা গ-কার বলিয়া চিনিতে পারি। বর্ণ, পদ ও বাক্য সকলের সমষ্টিস্বরূপ বেদ সৃষ্টিকালে উৎপন্ন ও প্রলয়ে বিনষ্ট হয়—আকাশ প্রভৃতির ন্যায়। সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে বর্ণসকল অনবরত উৎপন্ন হইয়া তৎক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে বলিলে "গৌরব" হয়, অর্থাৎ বাড়াবাড়ি হয়। বর্ণসকল যখন উচ্চারিত হয় না তখনও তাহারা বিদ্যমান থাকে, কেবল উচ্চারিত হয় না বলিয়া জ্ঞানগোচর হয় না। ধ্বনিদ্বারাই বর্ণ অভিব্যক্ত হয়। ধ্বনিরই উৎপত্তি হয়। বর্ণের নহে।

বেদ নিত্য না হইলেও পৌরুষেয় নহে। স্বজাতীর কোনও উচ্চারণের অপেক্ষা না করিয়া যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা পৌরুষেয়। সৃষ্টিকালে ঈশ্বর পূর্ব্ব সৃষ্টিতে সিদ্ধ বেদেরই ঠিক সদৃশ বেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পৃথক কিছু করেন নাই। এইজন্য বেদ পৌরুষেয় নহে। মহাভারত প্রভৃতি পৌরুষেয়। কেননা তাহাদের উচ্চারণ তজ্জাতীয় কোনও উচ্চারণের অপেক্ষা করিয়া কৃত নহে।

শব্দ প্রমাণ

অদ্বৈতবাদে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্র শাব্দ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য প্রমাণের কথা তাহাতে বিশেষ ভাবে নাই। "ঋগ্বেদাদি এই মহৎ ভূতের নিঃশ্বসিত।" বেদ শব্দসমষ্টি। ব্রহ্ম হইতে স্বতঃ নির্গত বলিয়া বেদ প্রমাণ। বাদরায়ণ যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাহা নহে। তিনি শ্রুতিকেই প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতিকে অনুমান নাম দিয়াছেন (১।৩।২৮)। বেদ স্বপ্রকাশ। স্মৃতি যতক্ষণ বেদের অবিরোধী, ততক্ষণ প্রমাণ। শঙ্কর বলিয়াছেন (২।১।১১) "যে সকল বিষয়ের জ্ঞান শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে যুক্তি ও তর্কের উপর নির্ভর করা যায় না। মানুষের চিন্তা কোনও বন্ধন মানে না। যে যুক্তি শ্রুতিকে গ্রাহ্য করে না, ব্যক্তিগত মতের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার দৃঢ় ভিত্তি নাই। বহু কষ্টে এক পণ্ডিতকর্ত্তৃক যে সকল যুক্তি উদ্‌ভাবিত হয়, তাহা অপেক্ষা বিজ্ঞতর ব্যক্তিকর্ত্তৃক তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তির যুক্তিও অন্য লোককর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। বিভিন্ন মতের অস্তিত্ববশতঃ কেবল যুক্তিকে নিশ্চিত ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আবার কপিল, কণাদ বা অন্য কোনও সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিতের মতকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কেননা তাহাদের মত পরস্পরের বিরোধী।" এইভাবে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করার জন্য শঙ্করের বিরুদ্ধবাদিগণ বলিয়াছেন, "কোনও যুক্তিরই দৃঢ়ভিত্তি নাই, একথা তুমি বলিতে পার না। কেননা যুক্তির কোন ভিত্তি নাই, ইহাও তো তুমি যুক্তিদ্বারাই প্রমাণ করিতে চাও। বিশেষতঃ কোনও যুক্তিরই যদি কোনও ভিত্তি না থাকে, তাহা হইবে জীবনযাপন যে অসম্ভব হয়"। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন "কোন কোনও বিষয়ে যুক্তির ভিত্তি আছে, ইহা সত্য। কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে যুক্তির যে দৃঢ় ভিত্তি নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যুক্তি নির্ভর করে বিশ্বের যাহা

কারণ, তাহার জ্ঞানের উপর। কিন্তু তাহা এতই দুর্গম, যে শ্রুতির সাহায্য ব্যতীত, তাহার চিন্তা করাও অসম্ভব। কেননা তাহার রূপ এবং প্রত্যক্ষযোগ্য কোনও গুণ নাই বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, এবং তাহার বিশেষ লিঙ্গ অথবা গুণ নাই বলিয়া তাহার সম্বন্ধে অনুমান অথবা অন্য কোনও প্রমাণের ব্যবহারও সম্ভবপর নহে।" শঙ্করের মতে সূর্য্যালোক যেমন নিজেই আলোকের প্রমাণ, স্বপ্রকাশ বেদও তেমনি নিজেই তাহার সত্যতার প্রমাণ, তাহার প্রামাণ্য নিরপেক্ষ অর্থাৎ তাহার অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই। কিন্তু এই উপমাদ্বারা যাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, তাহাদিগকে নিরস্ত করা অসম্ভব।

বেদ শব্দসমষ্টি। বেদান্তীর মতে বেদের অর্থই নিত্য। কিন্তু যেসকল বাক্যে ও শব্দে বেদের অর্থ প্রকাশিত, তাহারা নিত্য নহে। কেননা তাহারা প্রতিকল্পে ঋষিদিগের রচিত। যে সকল বাক্য, শব্দ ও অক্ষর যোগে বেদ রচিত, তাহারা প্রতিকল্পে সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হয় এবং প্রলয়ে বিনষ্ট হয়। "সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি এবং প্রতিকল্পের শেষে সৃষ্টির ধ্বংস হইলেও পর পর সৃষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ আছে, তাহাদের মধ্যে নিয়তত্ব আছে" (ডয়সেন)। "বেদের মধ্যে বিশ্বের আদর্শ রূপ রক্ষিত আছে। এই রূপ অবিনাশী বলিয়া বেদকে নিত্য বলা হয়। পর পর সৃষ্ট জগতের আকৃতি নিয়ত বলিয়া কোনও কল্পে বেদের প্রামাণ্যের হ্রাস হয় না। অবশ্য যেসকল আকৃতির আদর্শে জগৎ এবং জাগতিক বস্তু গঠিত হয় (archetypal form) তাহারা মায়া-জাত, সুতরাং তাহারা পরম সত্তার ন্যায় নিত্য নহে" (রাধাকৃষ্ণণ্)। শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি কিন্তু শব্দ জগতের উপাদান-কারণ নহে। ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। শঙ্করের মতে শব্দের অর্থ নিত্য। এই নিত্য অর্থ বহন করিবার শক্তিই শব্দের স্বরূপ। এই অর্থ যে সকল বস্তুতে প্রকাশিত হয়, তাহাদের সৃষ্টিকেই এই সকল শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হয় (শ, ভা ১।৩।২৮)। ঈশ্বরের বুদ্ধি ও ইচ্ছা স্বাধীন। প্রতিকল্পে ঈশ্বর এই সকল শব্দ স্মরণ করিয়া তদনুসারে নূতন সৃষ্টি করেন। যুগে যুগে এই সকল শব্দের অর্থকে বাস্তবরূপ দানই সৃষ্টি। বেদে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং স্বরূপ প্রকাশিত। এই অর্থেই বেদ নিত্য। তাঁহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু শ্রুতি কেবল ব্রহ্মবিষয়েই প্রমাণ। ভৌতিক বস্তু এবং তাহাদিগের গুণাদি সম্বন্ধে (যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বিজ্ঞানের (Science) প্রামাণ্য শঙ্কর অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও শ্রুতিবাক্যের দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে (১।১।২)।

বেদ শব্দের মৌলিক অর্থ জ্ঞান (বিদ্ জ্ঞানে)। অধ্যাপক মাক্সমুলার বলেন সম্ভবতঃ আদিতে 'জ্ঞান' অর্থেই (Sophia) বেদ শব্দ ব্যবহৃত হইত। জ্ঞানের (অর্থের) সহিত শব্দের সম্বন্ধ নিত্য, অর্থপ্রকাশক শব্দ ব্যতীত কোনও জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। বেদ বুঝাইতে ব্রহ্ম-শব্দ বহু স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অর্থেই ব্রহ্ম ও বেদ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে যে আদিতে "বেদ" শব্দের অর্থ ছিল "জ্ঞান",—ব্রাহ্মণ ও সংহিতা অর্থে পরে ঐ শব্দের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল। শব্দেই ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক শব্দ এক একটি প্রত্যয়ের (Idea) বাঙ্ময় রূপ। সৃষ্টিকালে ঈশ্বর এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহার এক একটি প্রত্যয়কে রূপ দিয়া তাহাকে বাহিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই শব্দসকলই প্রাকৃতিক বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং প্রত্যেক শব্দই জ্ঞানময় ঈশ্বরের সৃষ্টি। জীব-জগতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিতে (Species) যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ, তেমনি প্রত্যেক শব্দে তাহার জ্ঞানের প্রকাশ। শঙ্কর বেদকে "দেব-তির্য্যক্-মনুষ্য-বর্ণাশ্রমাদি-প্রবিভাগ-হেতু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১।১।৩)। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন "কোনও কিছু করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন কেহ কার্য্যারম্ভ করে, তখন ঈপ্সিত বস্তু প্রকাশক শব্দটি প্রথমে স্মরণ করে (১।৩।২৮)।" কিন্তু যখন কোন শব্দেরই সৃষ্টি হয় নাই, তখন সে কি করিবে? সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক শব্দগণ প্রথমে স্রষ্টার মনে উদিত হইয়াছিল এবং এই শব্দগণের আবির্ভাবের পরে স্রষ্টা তদনুরূপ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করিতে হয়। এই অনুমানের সমর্থক প্রমাণ শ্রুতিতে আছে। শ্রুতিতে আছে "ভূঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "ভুবঃ ও-"স্বঃ" উচ্চারণ করিয়া ভুবঃ ও স্বঃ-লোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় প্রজাপতির চিন্তা বুঝাইতেই "বেদ" শব্দ" ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই অর্থে বেদ নিত্য, কেননা বেদ শব্দসমষ্টি এবং এই সকল শব্দ ঈশ্বরের চিন্তার বাঙ্ময় রূপ। বেদ (ব্রহ্ম, বাক্, শব্দ) নিত্য ও নিরপেক্ষ। যে সত্য প্রকাশের জন্য বেদান্তের এত প্রচেষ্টা, তাহা "ব্রহ্ম" (=বাক্=শব্দ) ও আত্মা—এই দুই শব্দ বহন করিতেছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। শব্দসমষ্টি বেদই তাহার প্রমাণ।

সৎকার্য্যবাদ

প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানের ভিত্তি। কারণের দ্বারা কার্য্যের ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের কাজ। গ্রীক দার্শনিকগণ চতুর্বিধ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন—উপাদান কারণ (material cause), রূপ কারণ (Formal cause), উৎপাদক কারণ Efficient cause) এবং শেষ কারণ (Final cause)। ভারতীয় দর্শনে উপাদান ও নিমিত্ত ভেদে কারণ দ্বিবিধ। গ্রীক দর্শনের চারিটি কারণ এই দুই কারণের অন্তর্ভূক্ত। কোনও বস্তুর যাহা উপাদান তাহাই তাহার উপাদান-কারণ। উপাদানের সহযোগী অন্যান্য সকল হেতু নিমিত্তকারণের অন্তর্ভূক্ত। ন্যায়-বৈশেষিক মতে কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন—নূতন বস্তু। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিলনা। এই মতকে আরম্ভবাদ বা অসৎ-কার্যবাদ বলে। কিন্তু সাংখ্যমতে কার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহা কারণের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে থাকে ; যখন ব্যক্ত হয়, তখন তাহা কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। তিলের মধ্যে তৈল অব্যক্ত ভাবে থাকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষ সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান। এই মতকে সৎকার্য্যবাদ বলে। কার্য্য অসৎ নহে, তাহা সৎ। যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা অসৎ, তাহার ভাব (উৎপত্তি) হইতে পারে না। কার্য্য যদি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহার উদ্‌ভব অসম্ভব হইত। বেদান্তও সৎকার্য্যবাদী। শঙ্কর নানা যুক্তিদ্বারা অসৎকার্য্যবাদের খণ্ডন এবং সৎকার্য্য-বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

শঙ্কর বলিয়াছেন শাস্ত্র ও যুক্তি অনুযায়ে কার্য্য ও কারণেব মধ্যে ভেদ নাই। আকাশাদি পদার্থ-সমন্বিত জগৎ কার্য্য, ব্রহ্ম তাহার কারণ। জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, তাহা উপনিষদুক্ত "আরম্ভণ" বাক্য প্রভৃতি হইতে জানা যায়। শ্রুতি বলেন যেমন মৃত্তিকা জানিলে যাবতীয় মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়, মৃত্তিকাই সত্য এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যাবতীয় বস্তু বাচারম্ভণমাত্র—নাম মাত্র, তেমনি ব্রহ্মরূপ কারণটি সত্য, জগৎরূপ কার্য্য বিকার মাত্র, নামমাত্র। বিকারসকল কেবল নাম, নাম সকল বাক্যমাত্র, সত্য নহে।

কার্য্য যে কারণ হইতে ভিন্ন নহে, তাহার অন্য হেতু এই যে, কারণ থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না। (ভাবে চ উপলব্ধি: ব্র সূ—২।১ ১৫)। মৃত্তিকা না থাকিলে ঘটের এবং তন্তু না থাকিলে পটের উপলব্ধি হয় না। যেখানে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নাই, সেখানে ইহা হয় না।

অশ্ব থাকিলে গোর দর্শন হয় না। মৃত্তিকা ও ঘট গো ও অশ্বের ন্যায় অত্যন্ত বিভিন্ন হইলে মৃত্তিকার কারণত্ব থাকিত না।

শ্রুতিতে আছে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎরূপ কার্য্য তাহার কারণাকারে ছিল। "সৎএব সৌম্য ইদং অগ্রে আসীৎ, আত্মা বা ইদং এক এবাগ্রে আসীৎ।" এই সকল স্থলে কারণের সহিত ইদং শব্দবাচ্য জগতের সামানাধিকরণ্য (অভেদ) বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীতি হয় কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। যাহা যাহাতে থাকেনা, তাহা হইতে তাহা জন্মে না। বালুকা হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যেমন কারণের সহিত অভিন্ন, উৎপত্তির পরেও তেমনি। কোনও কালেই কারণ ব্রহ্মের সত্তার ব্যভিচার নাই। তেমনি কার্য্যভূত জগতেরও ত্রৈকালিক সত্তার ব্যভিচার নাই। (সত্ত্বাৎ চ অবরস্য—ব্র, সূ ২।১।১৬।

শ্রুতি কোনও কোনও স্থলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্তা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সত্য। "অসৎ এব ইদং অগ্রে আসীৎ। অসৎ বা ইদং অগ্রে আসীৎ"। ইহা হইতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, ইহা বলা যায় না। কেননা উদ্ধৃত স্থানে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অত্যন্তাভাব উক্ত হয় নাই। জগৎ তখনও নামরূপে ব্যক্ত হয় নাই, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্ব্বেও থাকে এবং কারণ হইতে ভিন্ন নহে, তাহা যুক্তিদ্বারাও জানা যায়। (যুক্তেঃ শব্দান্তরাৎ চ—১।২।১৮)। দধি, ঘটাদি, প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধ, মৃত্তিকাদি নির্দিষ্ট উপাদান (কারণ) গ্রহণ করিতে হয়, যে-সে দ্রব্য গ্রহণ করিলে হয় না। এইরূপ নিয়মিত প্রবৃত্তি অসৎ কার্য্যাবাদে উপপন্ন হয় ন,। কার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কোথায়ও না থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়, অন্য বস্তু হইতে হয় না কেন? যদি বল দধি সম্বন্ধীয় "অতিশয়" (এক প্রকার ধর্ম্ম ও শক্তি) দুগ্ধেই থাকে, অন্যত্র থাকে না, তাই দুগ্ধ ভিন্ন অন্য বস্তু হইতে দধি উৎপন্ন হয় না, তাহা হইলে তো অসৎকার্য্যবাদ ভঙ্গ হইয়া সৎকার্য্যবাদই সিদ্ধ হয়। কেন না কার্য্যের পূর্ব্ব অবস্থায় "অতিশয়ের" অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে। অতিশয় শব্দের অর্থ শক্তি, তাহা কারণে থাকিয়াই কার্য্যের নিয়মন করে। যাহাতে ইহা (কার্য্যশক্তি) থাকে না, তাহা কারণ নহে। সুতরাং তাহা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না। শক্তি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং অসৎ (অভাবরূপী) হইলে তাহা কার্য্যের নিয়ামক হইত না। অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট কারণ হইতে

নির্দিষ্ট কার্য্য হইবে, অন্য কার্য্য হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিত না। অতএব শক্তি কারণেরই স্বরূপ, ইহা অনস্বীকার্য্য।

কেহ কেহ কার্য্য ও কারণের মধ্যে অভেদ প্রতীতিকারক সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য অন্য এক সম্বন্ধের এবং শেষোক্ত সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য অন্য এক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে অনবস্থা দোষ হয়। বস্তুতঃ দ্রব্য-গুণাদিতে ও উপাদান উপাদেয়ে তাদাত্মপ্রতীতি ব্যতীত সমবায় নামক পদার্থের প্রতীতি হয় না। এই তাদাত্ম-প্রতীতি দ্বারাই অভেদ বুদ্ধি হইলে "সমবায়"-কল্পনার কি প্রয়োজন ?"

উৎপত্তি(Causation) এক প্রকার ক্রিয়া। প্রত্যেক ক্রিয়ারই কর্ত্তা থাকে। যদি বস কারণ-দ্রব্রের সহিত কার্য্যের সত্তা সম্বন্ধ হইলেই কার্য্যের উৎপত্তি ও আত্মলাভ (স্বরূপ নিষ্পত্তি) হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যাহার কোন ও স্বরূপ নাই, তাহার সহিত সম্বন্ধ ঘটনা হইবে কিরূপে ? বিদ্যমান কারণের সহিত অবিদ্যমান কার্য্যের সম্বন্ধ-ঘটনার সম্ভব হয় কি প্রকারে ? অভাব পদার্থ "তুচ্ছ" বা মিথ্যা। স্বতরাং তাহা "উৎপত্তির পূর্ব্বে" এরূপ মর্য্যাদা স্থান (সীমা স্থান) পাইতে পারে না। রাজা পূর্ণ-ধর্ম্মের অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা ছিল, একথাও যেমন অর্থহীন, পূর্ব্বোক্ত বাক্যও তেমনি অর্থহীন। কারক-ব্যাপারের (কর্ত্তার ক্রিয়ার) পূর্ব্বে যদি বন্ধ্যাপুত্র থাকিতে পারে, তবেই কারক-ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্যাভাব থাকিতে পারে। সুতরাং কারকব্যাপারের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র ও যেমন অসৎ, কার্য্যাভাব ও তেমনি অসৎ।

কার্য্য যদি পূর্ব্ব হইতেই থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তার প্রয়োজন কি ? কার্য্যের যদি অস্তিত্বই থাকে, তাহা হইলে তাহা ঘটাইবার কথা উঠিতে পারে না এবং কার্য্যের জন্য কারকের (কর্ত্তার) ও প্রয়োজন হয় না। ইহার উত্তর এই যে, তথাকথিত কার্য্য "উৎপত্তি"র পূর্ব্বে থাকিলেও তাহা কার্য্যাকারে থাকে না। তাহাতে কার্য্যাকারতা-সম্পাদনের জন্য কারক-ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। সেই কার্য্যাকারতা কারণের স্বরূপ-সন্নিবিষ্ট। যাহা যাহার স্বরূপ-সন্নিবিষ্ট নহে, তাহা তাহার আরভ্য (জন্য—জনয়িতব্য) নহে। আকারের বিশেষ থাকিলেই ভিন্ন বস্তু হয় না। কোন ও লোক এক সময় সংকোচিত-হস্ত-পাদ অন্য সময় প্রসারিত-হস্ত-পাদ থাকে ; কিন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন লোক হয় না। মানবদেহ প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তাহাতে জন্ম ও উচ্ছেদ হয় না। দুগ্ধই দধির আকারে এবং মৃত্তিকা ঘটের আকারে

প্রত্যক্ষ হয়। বটবৃক্ষ বটরূপে সূক্ষ্ম ও অদৃষ্ট থাকে, পরে সজাতীয় অবয়বের (পরমাণুর) প্রবেশবশত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং অঙ্কুরাদি রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্রূপে দৃষ্টিগোচর হওয়ার নাম জন্ম এবং অবয়বের ক্ষয়বশতঃ দৃষ্টিপথের অতীত হওয়ার নাম উচ্ছেদ বা বিনাশ।

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না—কোনও আকারে থাকে না—বলিলে কারক ব্যাপারের (কর্ত্তার ক্রিয়ার) নিষ্ফলতা সূচিত হয়। কেন না অভাব (যাহা নাই, তাহা) কাহারও বিষয় হয় না। অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কৃতকার্য্য হয় না।

শ্রুতিতেও কার্য্যকে সৎ বলা হইয়াছে। শ্রুতি বলেন "কেহ কেহ বলেন এ সকল আগে অসৎ ছিল, কিন্তু অসৎ হইতে কিরূপে সতের উৎপত্তি হইতে পারে?" এই বলিয়া "সৎই ছিল" শ্রুতি এইরূপ আবরণ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ইদং" শব্দ বাচ্য জগৎরূপ কার্য্যে সহিত "সৎ"-শব্দ-বাচ্য ব্রহ্মরূপ কারণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ উক্ত হওয়ায় কার্য্যের সৎ-ত্ব ও কারণাভিন্নত্ব প্রতীত হয়। কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন। সংবেষ্টিত বস্ত্র (গুটানো বস্ত্র) স্পষ্টরূপে জ্ঞানগোচর হয় না। প্রসারিত হইলে তাহাকে বস্ত্র বলিয়া বোঝা যায়। সূত্রাবস্থ (কারণাবস্থ) বস্ত্রাদি স্পষ্টরূপে বোঝা যায় না, তন্তুবায়ের ব্যাপার দ্বারা তাহা বিস্পষ্ট হয়। তখন তাহা বস্ত্ররূপে দৃষ্ট হয়। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে।

শঙ্করের মতে কার্য্যও কারণ অভিন্ন। যাহাকে "উৎপত্তি" বলা হয়, তাহা ভাণ মাত্র। যাহা সৎ তাহা অপরিণামী। সৎ নিশ্চল ও নির্ব্বিকল্প, নিষ্ক্রিয়। তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ব্রহ্মই সৎ। জগৎ পরিবর্ত্তন-প্রবাহমাত্র। তাহা ভাণ। যাহা পূর্ণ সত্য, তাহা নিশ্চল।

সৎ ও অসৎ

দেশ, কাল ও কারণ

শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার ব্যবহারিক সত্তা আছে, তাহাও বলিয়াছেন। ব্যবহারিক সত্তা—আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট যে সত্তা প্রকাশিত হয় সেই সত্তা সামুৎপাদিক। তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে, তাহা আমাদের জীবনযাত্রার জন্য কাজে লাগে, কিন্তু তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই। তাহা নিত্য নহে। পারমার্থিক সত্তা কেবল ব্রহ্মের আছে। ব্রহ্মে কোনও পরিবর্ত্তন নাই। তাহা নিত্য, স্থির, অচঞ্চল।

পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে এই ভেদ দর্শনের আদিম যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। উপনিষদে অসৎ শব্দ কোন কোনও স্থলে অপ্রকাশিত অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। "সৎ" এই অসতের প্রকাশিত অবস্থা। কিন্তু পরে 'সৎ' শব্দ যাহা নিত্য, যাহার পরিবর্ত্তন নাই, তাহা বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই নিত্য বস্তুর সন্ধান গ্রীক দর্শনেও বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। মিলেসিয়ান দার্শনিকদিগের 'উপাদান' (matter), এম্‌পিডক্লিসের মৌলিক দ্রব্য, আনক্ষগোরাসের "Homoiomeriae", পাইথাগোরাসের সংখ্যা, ডেমক্রিটাসের পরমাণু (atoms) এবং প্লেটোর Ideas সকলই সতের সন্ধান হইতে উদ্‌ভূত। ইয়োরোপের মধ্যযুগের দর্শনে "সার" (Essence) বা স্বরূপ এবং অস্তিত্বের ভেদের অনুসন্ধান চলিয়াছিল। ক্যাণ্ট "সৎ"কে স্বগত বস্তু (Thing in itself) বা noumenon নাম এবং অজ্ঞাত noumenonএর উপরি ভাগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নশ্বর ঘটনাদিগকে phenmenon (সমুৎপাদ) নাম দিয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানে তড়িৎই একমাত্র সৎ বস্তু বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান কালে দর্শনে Being (সত্তা) ও Existenceএর মধ্যেও ভেদ নির্দ্দেশ করা হয়। যাহা দেশ-কালে প্রকাশিত হয়, তাহাই Existence ; যাহা দেশ-কালে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যাহার অপ্রকাশিত সত্তা আছে, তাহা Being। Being নির্গুণ অর্থাৎ অন্য কিছু হইতে তাহাকে বিশিষ্ট করিবার কোনও গুণ তাহাতে নাই। Existence গুণবিশিষ্ট সত্তা। Being সত্তামাত্র, কেবল সত্তা। শঙ্কর দেশ ও কালে অপ্রকাশিত, কার্য্য-কারণের নিয়মের অতীত ব্রহ্মকেই 'সৎ' বলিয়াছেন। তদতিরিক্ত যাহা, যাহা দেশ, কাল, কারণ ও কার্য্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ ও আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত, তাহা অসৎ। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ও নিষ্কল। তিনি জগৎ-রূপে প্রকাশিত হন, এ কথা শঙ্কর বলেন নাই। বহুধা বিভক্ত জগৎ তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়, অর্থাৎ জগতের ভ্রান্তি হয়, এই কথা বলিয়াছেন। পারমেনিদিস্‌ সর্ব্বব্যাপী সত্তাকে একমাত্র সত্য বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সত্তার নানা বিশিষ্ট রূপের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বন্দ্ব। সৎএর বিশেষ বিশেষ রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, 'সৎ' বুদ্ধি গ্রাহ্য। বুদ্ধির জ্ঞান সত্য, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান মিথ্যা। শঙ্কর বুদ্ধির জ্ঞানকেও সত্য বলেন নাই। তাঁহার মতে দেশ, কাল ও কারণ দ্বারা বদ্ধ কিছুই সত্য হইতে পারে না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সর্ব্ব বস্তু দেশ-কাল ও কারণে বদ্ধ রূপে প্রকাশিত হয়।

যাহা অসৎ তাহার প্রতীতি হয়, কিন্তু এই প্রতীতি মিথ্যা। অসতের অস্তিত্বই নাই। এই মিথ্যা প্রতীতির উৎপাদনের হেতু অবিদ্যা। মানুষের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় এমন ভাবে গঠিত যে তাহা দ্বারা সকল বস্তুই দেশ-কালও কারণে বদ্ধরূপে প্রতীত হয়, এক অখণ্ড বস্তু খণ্ড খণ্ড রূপে আবির্ভূত হয়। এই খণ্ড খণ্ডরূপে এক বস্তুর আবির্ভাব ভাণ মাত্র, তাহার বাস্তবতা নাই। তাহা ভাণ (appearance), সৎ (Reality) নহে। শঙ্কর বলেন, ঘট প্রভৃতি ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্ন (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণযুক্ত) সকল বস্তুই অন্তবৎ, তাহাদের বিনাশ আছে, তাহারা অসৎ। যাহাই দেশে অবস্থিত, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাজ্য। তাহা উৎপন্ন কার্য্য, সৎ নহে। সতের উৎপত্তি নাই। তাহা অবিভাজ্য, তাহা দেশে বিস্তৃত নহে। দেশের বিভুত্ব আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ নহে। যাহা দেশে সীমাবদ্ধ, কালেও তাহা সীমাবদ্ধ। ব্যবহারিক জগতে কাল সত্য হইলেও তাহার বাহিরে কালের অস্তিত্ব নাই। কালে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তাহা সৎ নহে।

শঙ্কর কার্য্যকারণ তত্ত্বের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্কর কারণ হইতে কার্য্যের ভেদই স্বীকার করেন না। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে যদি ভেদ না থাকে, কার্য্য ও কারণ যদি একই হয়, তাহা হইলে কার্য্যরূপে পরিবর্ত্তনের অস্তিত্বই নাই, তাহা ভাণ মাত্র। আছে শুধু সৎ, এক, অদ্বিতীয়, অপরিণামী, নিষ্ক্রিয়, পূর্ণ সত্তারূপ অনন্ত ব্রহ্ম। সসীমত্ব অভাববাচক। তাই সকল সসীম বস্তুই যেন সসীমত্ব অতিক্রম করিতে চায়। এই আপনাকে অতিক্রমণ করিবার চেষ্টার ফলই পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তনের ফলেই প্রত্যেক সসীম বস্তু নশ্বর। এই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গঠন প্রকৃতির ফলে। বাস্তবিক পরিবর্ত্তন নাই।

সামুৎপাদিক জগৎ—ভাণের জগৎ—নামরূপবিশিষ্ট বস্তুদিগের জগৎ, যে জগৎ দেশ, কাল ও কার্য্য কারণের জগৎ, তাহার নিম্নে যে অপরিবর্ত্তনীয় দেশ-কাল কারণাতীত বস্তু নিশ্চল স্বরূপে বর্ত্তমান, তাহাই সৎ, তাহা ব্রহ্ম।

বিরুদ্ধ মত খণ্ডন

বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন

শঙ্করের মতে বাহ্য জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; তাহার অস্তিত্ব ব্যবহারিক। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানবাদী নহেন। যাহা বাহ্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, মনের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই. তাহা বিজ্ঞানমাত্র, ইহা তাঁহার মত নহে। এই মতে বাহ্য জগৎ বস্তুত্বহীন স্বপ্ন মাত্র। তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের এই মত শঙ্কর গ্রহণ করেন নাই। আমাদের উপলব্ধির বাহিরে অবস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই। কোনও স্তম্ভ অথবা প্রাচীরকে কেহই জ্ঞানের এক রূপ বলিয়া অনুভব করে না—পরন্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়রূপেই অনুভব করে। যাহারা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারাও বলেন যে যাহা মনের মধ্যে অনুভূত হয়, তাহারা যেন বাহিরে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং বাহ্যবস্তু যে মনোবাহ্য বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা তাহারাও স্বীকার করেন। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিষয়ের ভিন্নতাবশতঃই জ্ঞানের ভিন্নতা হয়। আমরা বিষয়দিগকে প্রত্যক্ষ করি, কেবল যে তাহাদের চিন্তা করি, তাহা নহে। প্রতীতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ মানসিক ক্রিয়া হইতে সেই প্রতীতির বিষয়ের উদ্ভব হয় না। পরন্তু জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহার প্রকৃতিই ঐ মানসিক ক্রিয়ার কারণ। কোনও ব্যক্তি সংবিদের সমীপে উপস্থিত হইলে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় না। যখন কোন কষ্টের অনুভব হয়, তখন সেই কষ্ট কেবল মনের একটা বিকার মাত্র নহে। অন্য বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের ন্যায় সেই কষ্টের অস্তিত্ব আছে। বস্তু স্বরূপে যাহা, সেই রূপেই তাহা অনুভূত হয়। যেরূপে তাহার অনুভূতি হয়, তাহাই তাহার স্বরূপ। শঙ্করের মতে সংবিদের মধ্যে কোনও আধেয় নাই, ইহা কেবল জ্ঞান মাত্র (awareness)। ইহার ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম নাই। ইহা বিশুদ্ধ রূপহীন স্বচ্ছতামাত্র। জ্ঞানে যে বর্ণ, সৌন্দর্য্য, গতি ও উদ্বেগ দৃষ্ট হয়, তাহা সকলই বিষয়ের, সংবিদের নহে। সংবিদের বিষয়সকল বিভিন্ন বলিয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি, কল্পনা, পরিচিন্তন, বিচার, তর্ক, বিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে আমরা ভেদ দেখিতে পাই। কিন্তু বিশুদ্ধ সংবিদ্ কিছু দানও করে না, কিছু গ্রহণও করে না। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও বিষয় থাকে। সেই জন্য ব্রাড্‌লের মতো শঙ্করও নিরপেক্ষ সত্য অথবা ভ্রান্তি স্বীকার করেন না। সত্য প্রত্যয়গণ

আমাদের প্রয়োজন-সাধনে সাহায্য করে এবং আমাদের সত্যের ধারণার সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য থাকে, কিন্তু ভ্রান্ত প্রত্যয় দ্বারা আমাদের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না, আমাদের সত্যের ধারণার সহিত তাহাদের সামঞ্জস্যও থাকে না। যে দেখে, শোনে, স্পর্শ করে ও আঘ্রাণ করে, সেও যেমন সত্য, তেমনি যাহাকে দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, আঘ্রাণ করে, তাহাও তেমনি সত্য। প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন "বিষয় আছে, অথচ তাহা জানিবার উপায় নাই, বলা, আর দৃশ্যবস্তু দৃষ্ট হইতেছে, অথচ চক্ষু নাই বলা, সমান।" যেখানে কোনও জ্ঞান নাই, সেখানে জ্ঞানের বিষয়ও নাই। এক দিকে মন ও তাহার প্রকারগণ (Categories), অন্যদিকে প্রকারদিগের দ্বারা গঠিত জগৎ এক সঙ্গে বর্ত্তমান। বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর-সাপেক্ষ। একটি ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। শঙ্কর বিজ্ঞানবাদ ও বস্তুবাদ (mentalism and realism) উভয়ই অস্বীকার করিয়াছেন। উভয় মতই অভিজ্ঞতার বিরোধী। তিনি স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার পার্থক্য নির্দ্দেশও করিয়াছেন। স্বপ্নাবস্থায় উপলব্ধ বস্তু জাগরিত অবস্থায় বাধিত হয়, কিন্তু জাগরিত অবস্থার উপলব্ধ স্তম্ভাদি কোনও অবস্থাতেই বাধিত হয় না (১।২।২৯)।

শঙ্কর বিজ্ঞানবাদী নহেন, কিন্তু তিনি আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বাহ্য জগৎ অচেতন জড়রূপে প্রতীত হয়। কিন্তু তাহা চৈতন্যেরই প্রকাশ। যাহাই জ্ঞানের বিষয়, তাহাতে বিষয়-চৈতন্যই প্রকাশিত। জ্ঞানের বিষয় জড় নহে, গতি নহে, শক্তিও নহে, তাহা মনের সজাতীয় পদার্থও নহে। গতি, শক্তি এবং মন সকলই প্রত্যয় মাত্র (concept)। সংবিদ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। কোনও ব্যক্তির সংবিদে যে বিষয় নাই, ঐশ্বরিক সংবিদে তাহা বর্ত্তমান। ঈশ্বরের সংবিদে যাবতীয় বিশ্ব বর্ত্তমান। বিশ্বের জ্ঞান-সমন্বিত জীবগণও ঈশ্বরের সংবিদে বর্ত্তমান। জগৎ যে স্থায়ী, তাহার কারণ ঈশ্বরের সংবিদে তাহা সর্ব্বদা অনুভূত হইতেছে। সমগ্র জগৎ সেই অসীম আত্মা দ্বারা পূর্ণ। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই স্বরূপে আত্মিক—আত্মার ধর্ম্ম। আত্মা বিষয়-ও-বিষয়ী-সম্বন্ধের অতীত, আত্মাই সৎ বস্তু। আত্মার বাহিরে কিছুই নাই। ঈশ্বরের জ্ঞানে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব। ঈশ্বরের জ্ঞানে যাহা নাই, তাহার অস্তিত্বই নাই।

পূর্ব্ব-মীমাংসা

পূর্ব্ব-মীমাংসা মতে বেদের সর্ব্বত্র কর্ম্মের কথাই আছে। সুতরাং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য, ইহা বলা যায় না। কিন্তু উপনিষৎ-বাক্যগুলি বিচার করিলে দেখা যায়, ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ইহা বলা যায় না যে যজ্ঞকর্ত্তার স্বরূপ কি, তাহাই সকল উপনিষৎ-বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সকল বাক্য যজ্ঞেরই অঙ্গ। যদি বলি যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু ব্রহ্মকে জানিয়া লাভ কি ? ইহার উত্তর ব্রহ্মকে জানিলে দুঃখ হইতে ঐকান্তিক মুক্তি এবং অনন্তকাল অসীম আনন্দ-লাভ হয়। যজ্ঞ-বিধি অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের প্রয়োজন অধিক।

মীমাংসা বলেন বেদে ব্রহ্মের উপাসনার কথা আছে সত্য, কিন্তু উপাসনারূপ কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইয়াছে। যথোক্তরূপে ব্রহ্মের উপাসনারূপ কর্ম্ম করিলে মোক্ষ-লাভ হইবে, ইহা বলাই বেদের উদ্দেশ্য। কিন্তু শঙ্কর বলেন, কর্ম্মের ফল অনিত্য। উপাসনাকর্ম্ম দ্বারা যদি মোক্ষলাভ হইত, তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য হইত। মোক্ষ কর্ম্মের ফল নহে, জ্ঞানের ফল। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি"। আত্মা নিত্য শুদ্ধ। কর্ম্ম দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় না।

যদি বলেন, জ্ঞান মনের ক্রিয়া বিশেষ। তাহা যদি হয় তাহা হইলে মোক্ষ জ্ঞানরূপ কর্ম্ম দ্বারা লভ্য। শঙ্করের মতে জ্ঞান বস্তু-তন্ত্র। তিনি বলেন, যাহা ইচ্ছা হইলে করা যায়, ইচ্ছা না হইলে না করা যায়, তাহাই ক্রিয়া। কিন্তু জ্ঞান যখন বস্তুতন্ত্র, তখন তাহা কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। তাহা ক্রিয়া নহে।

সাংখ্য

"সদেব সৌম্য, ইদম্ অগ্রে আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং। তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।" ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬।২।১-৩) এই বাক্যে যে সতের কথা আছে, তিনি সাংখ্যের "প্রধান" নহেন। কেননা সাংখ্যের প্রধান অচেতন। এখানে যে সতের কথা আছে, তিনি "ঐক্ষত" অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। অচেতন বস্তু আলোচনা করিতে পারে না (১।১৫)। গৌণ অর্থেও এখানে "ঐক্ষত" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। কেননা পরে আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে। "অহং ইমাঃ তিস্রঃ দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছা- ৬।৩।২)। আমি এই তেজ, অপ ও অন্ন এই তিন দেবতার

মধ্যে জীবাত্মা-রূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। আবার "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" (১।১৭)। সেই সতে নিষ্ঠ যিনি, তাহার মোক্ষ হইবে একথাও আছে। অচেতন প্রকৃতিনিষ্ঠ যিনি, তাহার মোক্ষ হইতে পারে না। স্থূল জগৎ ত্যাগ করিয়া প্রথম সূক্ষ্ম প্রধানের ধারণা করিয়া পরে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মের ধারণা করিতে হয়। এইজন্য এখানে 'সৎ' পদ দ্বারা প্রধানের কথা বলা হইয়াছে, ইহাও কেহ কেহ বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। "হেয়ত্বাবচনাৎ" (১।১।৮) কেননা এই 'সৎ' যে হেয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা নাই।

সুষুপ্তি কালে জীব 'স্ব'কে প্রাপ্ত হয়, একথা উপনিষদে আছে (স্বাপ্যয়াৎ ১।১।৯ অপ্যয়=প্রাপ্তি)। এই স্বশব্দ বাচ্য সৎ অচেতন প্রকৃতি হইতে পারে না।

সকল বেদান্ত বাক্যের "গতি" (তাৎপর্য্য) এক (গতি সামান্যাৎ ১।১।১০)। তাহা ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং এখানে বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য প্রধান বা প্রকৃতি হইতে পারে না। ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, তাহা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে আছে। "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" (শ্বেত)।

উপনিষদে ব্রহ্মকে বহুস্থলে আনন্দময় বলা হইয়াছে (১।১।১২) (আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ)। তাহাকে আনন্দের হেতুও (তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ চ-১।১।১৪) বলা হইয়াছে। আনন্দময় শব্দের অর্থ—যাহাতে প্রচুর আনন্দ আছে। ইতর জীব আনন্দময় হইতে পারে না (১।১।১৬)। আনন্দময় আত্মা যে জীব হইতে ভিন্ন, তাহাও বলা হইয়াছে (ভেদব্যপদেশাৎ চ ১।১।১৭)। এই আনন্দময় আত্মা "অকাময়ত বহু স্যাম প্রজায়েয়" অর্থাৎ আমি বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব, এই কামনা করিলেন (১।১।১৭)। অচেতন প্রকৃতি কামনা করিতে পারে না।

সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে অব্যক্তের কথা আছে, তাহা নহে (মহতঃ পরমব্যক্তং)। এখানে অব্যক্ত শব্দের অর্থ শরীর। যে সকল সূক্ষ্ম ভূত হইতে শরীরের উৎপত্তি তাহারাই 'অব্যক্ত' শব্দের বাচ্য। এই অব্যক্ত ব্রহ্মের অধীন। এই অব্যক্তকে জানিতে হইবে একথাও উপনিষদে নাই।

. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং' যাহাকে বলা হইয়াছে, তাহা যে সাংখ্যের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা বলা যায় না। তাহা বেদান্তের প্রকৃতি। ঈশ্বরের শক্তিই এই অজা প্রকৃতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে যাহার মধ্যে "পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" তাহাকে আত্মা, ব্রহ্ম ও অমৃত মনে করি"। এই পঞ্চ পঞ্চজনা "সাংখ্যের পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব নহে। কেননা সাংখ্যের পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব নানাবিধ বস্তু। তাহাদিগকে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া একত্র উল্লিখিত করিবার কারণ নাই। বিশেষতঃ আকাশ ও আত্মা ধরিয়া উপনিষদের তত্ত্বসংখ্যা ২৭টি, ২৫টি নহে।

সাংখ্যশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র, তাহাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এ কথা বলা চলে না। কেননা মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতির সহিত সাংখ্যদর্শনের মিল নাই। ঐ সকল স্মৃতিতে ঈশ্বরকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে। যে স্মৃতি বেদের অনুযায়ী, তাহাই গ্রাহ্য, বেদ-বিরোধী স্মৃতি গ্রাহ্য নহে।

সাংখ্যদর্শনে যে সকল তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহাদের কতকগুলির উল্লেখ বেদে নাই। তাহাদের অনুভবও হয় না। (ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ ২।১।২)।

অচেতন প্রকৃতি কর্ত্তৃক জগৎ রচনা সম্ভবপর নহে। সাংখ্যমতে পুরুষের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে অচেতন প্রকৃতি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কোনও বস্তু রচনা করিতে হইলে প্রথমে সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি হওয়া চাই। অচেতন বস্তুর প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং অনুমান (সাংখ্য প্রকৃতি) জগতের কারণ হইতে পারে না।

গো-বৎসের তৃপ্তির জন্য ধেনুর স্তন হইতে আপনা হইতেই দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। জীবের মঙ্গলের জন্য বৃষ্টি হয়। এ সকল স্থলে অচেতন বস্তু চেতন বস্তুর প্রয়োজনসাধনার্থ আপনা হইতেই প্রবৃত্ত হয়—ইহা বলা যায় না। বৎসের প্রতি ধেনুর স্নেহই তাহার দুগ্ধক্ষরণের কারণ। বৃষ্টির জল ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য পতিত হয়। এখানে অচেতনের প্রবৃত্তির কথা নাই।

চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত যদি প্রকৃতি জগৎ রচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জগৎ-রচনা সর্ব্বদাই চলিবে, কখনও প্রলয় হইবে না।

গাভীর উদরস্থ তৃণ অন্যবস্তুর অপেক্ষা না করিয়া যেমন নিজ হইতেই দুগ্ধে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া জগতে পরিণত হয়, ইহা বলা যায় না। কেননা তৃণ দুগ্ধে পরিণত হইবার জন্যে যদি অন্য কিছুর অপেক্ষা না রাখিত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই দুগ্ধে পরিণত হইত।

প্রকৃতি অন্য বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া জগতে পরিণত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিলেও, পুরুষের প্রয়োজনের অভাবে এই যুক্তি সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যমতে পুরুষ নির্বিকার। তাহার কিসের প্রয়োজন? সে কিরূপে ভোগ

করিবে ? যদি বল তাহার প্রয়োজন মোক্ষ, তাহা হইলে বক্তব্য যে মোক্ষ তো তাহার নিত্যসিদ্ধ, মোক্ষতো হইয়াই আছে।

পঙ্গু ও অন্ধ এবং চুম্বক প্রস্তরের দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। পঙ্গু দেখিতে পায়, চলিতে পারে না। অন্ধ চলিতে পারে, দেখিতে পায় না। অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পঙ্গু তাহাকে চালিত করিতে পারে না। সাংখ্যের পুরুষের জ্ঞান আছে, কিন্তু ক্রিয়া-ক্ষমতা নাই। প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্ঞান নাই। পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারে কিন্তু পঙ্গু চলিতে না পারিলেও পথ নির্দেশ করিতে পারে। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ কিছুই পারে না। সে প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবে কিরূপে ? চুম্বক-প্রস্তর যেমন নিকটস্থ লৌহকে চালিত করে, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতিকে চালিত করে, ইহাও বলা যায় না। কেননা তাহা হইলে প্রকৃতি সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল থাকিত, প্রলয় কখনও হইত না।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিরূপ অঙ্গীর অঙ্গ নহে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সুতরাং ঐ তিন গুণের সাম্যবস্থার বিচ্যুতি হইয়া কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। যদি উক্ত তিনগুণ প্রকৃতির অঙ্গ হইত, তাহা হইলে অঙ্গীর প্রভাবে গুণ বিশেষের কাহারও প্রাবল্য কাহারও দৌর্বল্য হইতে পারিত। কিন্তু তাহারা কোনও অঙ্গীর অঙ্গ নহে।

যদি বল, প্রলয় অবস্থায় গুণত্রয়ের সাম্য থাকিলেও তাহাদের বৈষম্যের উপযোগীতা আছে এবং সেইজন্য তাহারা কম-বেশী হইয়া জগৎ রচনা করিতে পারে, তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে বৈষম্যের উপযোগীতা থাকিলেও বৈষম্যের উদ্‌ভবের কারণ চাই। প্রকৃতির যখন চৈতন্য-শক্তি নাই, তখন কি কারণে এক গুণের প্রাবল্য, অন্য গুণের দুর্ব্বলতা ঘটিবে ?

সাংখ্যমত সামঞ্জস্য-বিহীন। ইহার মধ্যে বিরোধ আছে। কেহ কেহ বলেনইন্দ্রিয় সাতটি, কেহ বলেন ১১টি। কেহ বলেন মহৎ হইতে পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। কেহ বলেন অহংকার হইতে। কোথাও উক্ত হইয়াছে অন্তঃকরণ তিনটি, কোথাও উক্ত হইয়াছে একটি। পুরুষকে নির্বিকার আবার ভোক্তাও বলা হইয়াছে। আবার পুরুষকে নির্গুণ বলিয়া প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হয় এবং পুরুষ আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করে, ইহাও বলা হইয়াছে।

যোগ খণ্ডন

যোগ স্মৃতিশাস্ত্র হইলেও মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি অন্যশাস্ত্রের সহিত জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহার মিল নাই। বেদের সহিতও এই বিষয়ে ইহার বিরোধ আছে। সুতরাং সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগ দর্শনও এই বিষয়ে গ্রহণীয় নহে। যোগমতে ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন। ঈশ্বরের সহিত তাহাদের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। (সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৮)। যোগমতে প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর সকলেই অনন্ত। ঈশ্বর যদি অনন্ত হন তাহা হইলে তিনি আপনাকে, প্রকৃতিকে ও পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে জানেন কি? যদি জানেন, তাহা হইলে প্রকৃতিও পুরুষ অনন্ত হইতে পারে না, কেননা তাহারা ঈশ্বরের জ্ঞানদ্বারা পরিচ্ছন্ন হয়। যদি ঈশ্বর ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে না জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। কিন্তু যোগমতে তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

বৈশেষিক মত

বৈশেষিক মতে দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্ব্যণুক হয়। তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া একটি ত্র্যণুক হয়। চারিটি ত্র্যণুকে চতুরণু হয়। পরমাণুর পরিমাণকে পরিমণ্ডল বলে, দ্ব্যণুকের পরিমাণের নাম 'হ্রস্ব'। পরমাণু ও দ্ব্যণুক এবং ত্র্যণুক হইতে চতুরণুর উৎপত্তি হইলেও পরমাণুর গুণ পরিমণ্ডল এবং দ্ব্যণুকের গুণ 'হ্রস্ব' চতুরণুতে থ কে না। 'মহৎ' ও 'দীর্ঘ' নামে অপর গুণ চতুরণুতে উৎপন্ন হয়। এইভাবে যদি চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈশেষিক তাহাতে দোষ দিতে পারেন না।

বৈশেষিক মতে সৃষ্টিকালে পরমাণুগণ সক্রিয় হয়। কেন হয়? জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্টবশতঃ? তাহা হইলে জীবের কর্ম্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? যদি জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা হইলে পরমাণুর গতি উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে? যদি পরমাণুর আশ্রয়ে থাকে, তাহা হইলে সেই অদৃষ্ট হইতে উদ্‌ভূত গতির তো কখনই বিরাম হইবে না। দুই বিকল্পের কোনটি অনুসারেই সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ের ব্যাখ্যা হয় না। (উভয়থা অপি ন কর্ম্ম, অতঃ তদভাবঃ। ২।২।১২)

দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত দ্ব্যণুকের সহিত পরমাণুদ্বয়ের সম্বন্ধ বৈশেষিক মতে সমবায় সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ কিরূপে দ্ব্যণুকে অবস্থান করে? ইহার জন্য অন্য একটি সমবায়-সম্বন্ধের কল্পনার প্রয়োজন। আবার এই দ্বিতীয় সমবায়ের জন্য অন্য একটি সমবায়-সম্বন্ধের কল্পনার প্রয়োজন।

এইরূপে অনবস্থার উদ্ভব হয়। পরমাণুর স্বভাব কিরূপ? উহার স্বভাব কি প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি, অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই, অথবা দুইটির কোনওটিই নহে। প্রবৃত্তি পরমাণুদিগের স্বভাব হইলে, তাহারা সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল থাকিবে, প্রলয় কখনও হইবে না। নিবৃত্তি স্বভাব হইলে পরমাণুগণ সর্ব্বকালে নিষ্ক্রিয় থাকিবে, কখনই সৃষ্টি হইবে না। দুইটি পরস্পর বিরোধী গুণ এক বস্তুতে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই পরমাণুদিগের স্বভাব হইতে পারে না। প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি কোনটিই পরমাণুর স্বভাব যদি না হয়, অদৃষ্টহেতু কখনও প্রবৃত্তি কখনও নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাণুবাদ অসিদ্ধ। বৈশেষিক মতে পরমাণুগণ নিত্য, কিন্তু তাহাদের রূপ-রসাদি গুণ আছে। কিন্তু দেখা যায়, যে সকল বস্তুর রূপ-রসাদি গুণ আছে, তাহারা অনিত্য। সুতরাং পরমাণুগণ নিত্য হইতে পারে না।

বৈশেষিক মতে চারিপ্রকার পরমাণু—ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। ইহাদের গুণসম্বন্ধে যদি বলা যায় ক্ষিতির চারি গুণ—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, অপের তিনগুণ—রূপ, রস, ও স্পর্শ, তেজের দুইগুণ—স্পর্শ ও রূপ এবং মরুতের এক গুণ—স্পর্শ, তাহা হইলে পরমাণুদিগের সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের ইতর বিশেষ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বৈশেষিক মতে সকল পরমাণুই সূক্ষ্মতম। যদি বলা যায় মৃত্তিকার কেবল গন্ধগুণ, অপের কেবল রস, তেজের কেবল রূপ এবং বায়ুর কেবল স্পর্শগুণ আছে, তাহা হইলে তাহা প্রত্যক্ষের বিরোধী হয়। কেননা ক্ষিতির স্পর্শ, রূপ ও রস গুণও প্রত্যক্ষ। বৈশেষিক দর্শনের কোনও মতই বেদজ্ঞ ঋষিগণ গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য এই মত একেবারেই গ্রাহ্য নহে।

বৌদ্ধ মত

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার মত-সম্বন্ধে মতভেদের উদ্ভব হয়। এই মতভেদের ফলে ত্রিশটির অধিক দর্শন উদ্ভূত হয়। বুদ্ধ তাত্ত্বিক গবেষণা (metaphysical speculation) নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বৌদ্ধদর্শনে গভীর দার্শনিকতত্ত্বসকল আলোচিত হইয়াছিল। বুদ্ধ যে কর্ম্মনীতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সমর্থনের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে জগতের স্বরূপের আলোচনাও করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই আলোচনাকে এক দার্শনিক প্রস্থান বলিয়া গণ্য

করা যাইতে পারে। আমাদের চিন্তা এই জগতের এবং আমাদের জীবনের উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। এইজন্ত বুদ্ধের দর্শনকে প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) বলা যাইতে পারে। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা যে সকল সমুৎপাদের (Phenomena) সংস্পর্শে আসি, তাহাদের সম্বন্ধেই কেবল আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। সুতরাং তাহার দর্শনকে সমুৎপাদবাদও (Phenomenalism) বলা যায়। অভিজ্ঞতাই (Experience) এই দর্শনের গবেষণার ভিত্তি বলিয়া ইহাকে অভিজ্ঞতাবাদও বলা যায়। বুদ্ধ যে অভিজ্ঞতার অতীত, দশটি তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কেহ কেহ তাঁহাকে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী (Empiricist) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অভিজ্ঞতার অতীত বিষয়ের জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব ইহাই বুদ্ধের মত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন।

মহাযানিগণ বুদ্ধের এই মনোবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার, অথবা তাহার জ্ঞানলাভের অসম্ভবতাসূচক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের ও তাহার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা যে সম্ভব, তাহাদের মতে বুদ্ধ তাহা অস্বীকার করেন নাই। ইহার সমর্থনে ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য বিষয়ের জ্ঞান নির্বাণে লাভ করা যায়, বুদ্ধের এই উক্তির তাহারা উল্লেখ করিতেন। বুদ্ধ অনেকবার বলিয়াছিলেন যে তিনি বহুদূরে স্থিত অনেক বিষয়ের অনুভব লাভ করিয়াছিলেন, যাহা যুক্তিদ্বারা লভ্য নহে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরাই কেবল যাহা বুঝিতে পারেন। ইহার ফলে এক প্রকার গুহ্যবাদেরও (mysticism) উদ্ভব হইয়াছিল।

বৌদ্ধ দার্শনিক প্রস্থানগুলির মধ্যে চারিটি প্রধান : (১) মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ (২) বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার (৩) বাহ্যানুমানবাদ বা সৌত্রান্তিকবাদ (৪) বাহ্য প্রত্যক্ষবাদ বা বৈভাষিকবাদ। মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ অনুসারে মানসিক অথবা অমানসিক, কোনও বস্তুরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, সকলই শূন্য। যোগাচারে (বিজ্ঞানবাদ মতে) মনোবাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই, মানসিক বস্তুরই কেবল অস্তিত্ব আছে। সৌত্রান্তিকবাদে মানসিক এবং মনোবাহ্য উভয়বিধ বস্তুরই অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বাহ্য-বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না, তাহা অনুমানগম্য। এই মতকে সর্ব্বাস্তিবাদও বলে। বৈভাষিক মতে মানসিক ও মনোবাহ্য উভয়বিধ বস্তুই প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য। প্রত্যেক বস্তুই সদাপরিবর্ত্তনশীল, তাহার অস্তিত্ব ক্ষণিক, ইহাও একটি বৌদ্ধমত।

ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর এই সকল মতের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা এই : (১) সর্ব্বস্তিবাদে বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ পদার্থ ই স্বীকৃত। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণুগণ সম্মিলিতহইয়া জগৎ রচনা করে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের মিলন হইতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে রূপ-স্কন্ধ বলে। ইহাই বাহ্য জগৎ। অন্তর্জগৎ চারি স্কন্ধে বিভক্ত—বিজ্ঞান-স্কন্ধ (অহং অহং রূপ বিজ্ঞান প্রবাহ), বেদনা-স্কন্ধ (সুখ দুঃখাদির অনুভূতি), সংজ্ঞাস্কন্ধ (গো, অশ্ব প্রভৃতি নামের প্রত্যয়) এবং সংস্কার-স্কন্ধ (রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ভাব)। অণুদিগের সমুদায় (মিলন) এবং স্কন্ধদিগের সমুদায় হেতু জগতের ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু এই দুই প্রকার সমুদায় হইতে পারে না। কেননা পরমাণুগণ যেমন অচেতন, স্কন্ধগুলিও তেমনি। কোনও চেতন বস্তু দ্বারা চালিত না হইলে সুসংবদ্ধ মিলন কিরূপে সংঘটিত হইবে? আর উৎপন্ন হইবার পরক্ষণেই যদি স্কন্ধগণের ধ্বংস হয়, তাহা হইলে মিলিত হইবার অবসর থাকে না। এই মতে স্কন্ধগুণ ক্ষণিক।

বৌদ্ধমতে অবিদ্যা, সংস্কার, নাম, রূপ, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, জরা, মরণ, শোক প্রভৃতির একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি হয় এবং এইভাবে লোকযাত্রা নির্বাহিত হয়। কিন্তু একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, ইহাদের পরস্পরের মিলনের কোনও হেতু নাই, সুতরাং লোকযাত্রা নির্বাহিত হইতে পারে না।

বৌদ্ধমতে পরবর্ত্তী ক্ষণ উৎপন্ন হইবামাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ বিনষ্ট হয়। অথচ পূর্ব্বক্ষণকে পরক্ষণের হেতু বলা হয়। পূর্ব্বক্ষণ উৎপন্ন হইবামাত্র যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে পরক্ষণকে উৎপন্ন করিবার অবসর কোথায়?

পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বক্ষণ যদি "অসৎ" হয়, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব যদি তখন না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বক্ষণকে পরক্ষণের হেতু বলা যায় না (প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয়)। আবার তখন যদি পূর্ব্বক্ষণের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে যৌগপদ্য (Simultaneity) হয়। তাহাতেও প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয়, কেননা তাহা হইলে পূর্ব্বক্ষণ পরক্ষণের পূর্ব্বক্ষণ হয় না। (অথবা পূর্ব্বক্ষণের ক্ষণিকত্ব থাকে না।) (অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যম্ অন্যথা ২।২।২১)।

বৌদ্ধমতে যাবতীয় বস্তুই ক্ষণিক, কেবল প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ ও আকাশ এই তিন বস্তু এরূপ নহে। সহেতুক বিনাশের নাম প্রতি-সংখ্যা নিরোধ। সহেতুক অনুপলব্ধ বিনাশের নাম অপ্রতি-সংখ্যা

নিরোধ। বৌদ্ধমতে এই তিনবস্তু উৎপত্তি ও বিনাশহীন। ইহাদিগকে অবস্তু বা অভাব মাত্রও বলা হয়। কিন্তু যাহার অস্তিত্ব আছে, এরূপ কোনও বস্তুরই ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং বৌদ্ধ কল্পনা ভ্রান্তিপূর্ণ।

বৌদ্ধমতে অবিদ্যার নিরোধ হইতে নির্বাণ হয়। কিন্তু এই নিরোধ কি আপনা হইতে হয়, না ইহার হেতু আছে? আপনা হইতে যদি হয়, তবে নানাবিধ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কেন? আবার জ্ঞান হইতে অবিদ্যার নিরোধ হয় বলিতে পার না, তোমাদের মতে অজ্ঞানের নিরোধ অহেতুক।

আকাশ অবস্তু বা অভাব মাত্র নয়। অন্য বস্তুর সহিত আকাশের কিছু ভেদ নাই। "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"—ইহা বেদে আছে। আকাশের গুণ শব্দ ও তাহা প্রত্যক্ষ হয়। তোমরা বল—আবরণের 'অভাবই' আকাশ। কিন্তু কোনও পক্ষী যখন পাখা মেলিয়া নিম্নে নামিয়া আসে, তখন তাহার পাখাই তো আবরণ। তখন আবরণের অভাব নাই। তবে কি বলিব তখন আকাশও নাই? তাহা হইলে তো অন্য পাখী উড়িয়া যাইতে পারিবে না। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী (ক্ষণিকবাদ)। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে যিনি উপলব্ধি করেন (উপলব্ধা) তিনিও ক্ষণিক। কিন্তু উপলব্ধা ক্ষণস্থায়ী হইলে 'অনুস্মৃতি'র (আমি পূর্ব্বে ইহা দেখিয়াছিলাম) সম্ভব হইতে পারিত না।

বৌদ্ধমতে কারণের ধ্বংস হইবার পরে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। বীজের ধ্বংস না হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। দুগ্ধ নষ্ট হইলে পরে দধি হয়। কিন্তু অসৎ হইতে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। বীজ ধ্বংস হইবার পরে এবং দধি ধ্বংস হইবার পরে যাহা থাকে (শূন্য) উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং বীজ ধ্বংস হইবার পরে দধি উৎপন্ন হইবার বাধা নাই। যখন বীজ ধ্বংসের পরে অঙ্কুর ভিন্ন অন্য কিছু উৎপন্ন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে বীজের ধ্বংস হয় না। অসৎ অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং কোন বস্তু দেখিয়া যখন তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে, এই মত সত্য হইতে পারে না। (নাসতো দৃষ্টত্বাৎ ২।২।২৬)।

যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারিত, তাহা হইলে উদাসীন

থাকিয়াও লোকের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিত। বিনা সূত্রে তন্তুবায় বস্ত্র উৎপন্ন করিতে পারিত, কৃষককে কষ্ট করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে হইত না।

বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের জন্য ব্রহ্মসূত্রে আছে:—

যাহা উপলব্ধ হয়, তাহার অভাব হইতে পারে না। বাহ্য বস্তু উপলব্ধ হয়। সুতরাং তাহার অস্তিত্ব নাই, কেবল বিজ্ঞানমাত্র আছে, তাহাই বাহ্যবস্তুরূপে উপলব্ধ হয়, ইহা হইতে পারে না।

স্বপ্ন-জ্ঞান ও জাগ্রৎ জ্ঞানের ধর্ম্ম বিভিন্ন। স্বপ্নে যে সকল বস্তু দর্শন করা যায়, তাহাদের অস্তিত্ব নাই দেখিয়া জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা উপলব্ধি করা যায়, তাহারও অস্তিত্ব নাই, ইহা মনে করা সংগত নহে। স্বপ্নকালে যাহা দেখা যায়, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া মনে করা যায় যে, তাহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায়, তাহা যে বাস্তবিক নাই, এ বোধ কখনই হয় না। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে বাসনার উৎপত্তি হইতে পারে না। তোমাদের মতে তো বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি হয় না। তবে বাসনার উৎপত্তি হইবে কিরূপে? সুতরাং তোমরা যে বল বিচিত্র বাসনা হইতে বিচিত্র জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহা সত্য নহে। তোমাদের মতে "আলয়-বিজ্ঞান" বাসনার আশ্রয়। কিন্তু আলয়-বিজ্ঞানও তোমাদের মতে ক্ষণস্থায়ী, যাহা উৎপত্তির পরক্ষণে বিলীন হয়। যাহা ক্ষণকালও অবস্থান করে না, তাহা বাসনার আশ্রয় হইবে কিরূপে?

শূন্যবাদ সর্ব্বপ্রকারেই অনুপপন্ন। বাহ্যবস্তুও নাই, বিজ্ঞানও নাই, ইহা একবারেই যুক্তিহীন ও অগ্রাহ্য। বুদ্ধদেব যুক্তিহীন মত প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত করিয়াছিলেন (সর্বথা অনুপপত্তেশ্চ। ২।২।৩২)।

জৈনমত

জৈনমতে প্রত্যেক বস্তুর অসংখ্য ধর্ম্ম (অনন্তধর্ম্মকং বস্তু)। তাহার সম্বন্ধে কিছুই অনপেক্ষভাবে বলা যায় না। যাহাই বলা যায় তাহা আপেক্ষিকভাবে সত্য, ঐকান্তিক সত্য নহে। সেইজন্য প্রত্যেক বর্ণণার পূর্ব্বে "স্যাৎ" শব্দ ব্যবহার করা উচিত। জৈন দর্শনে সাতপ্রকার নয়ের (Judgement) বর্ণনা আছে। (১) স্যাৎ অস্তি, (২) স্যাৎ নাস্তি, (৩) স্যাৎ অস্তিচ নাস্তিচ, (৪) স্যাৎ অবক্তব্যং, (৫) স্যাৎ অস্তিচ অবক্তব্যংচ, (৬) স্যাৎ নাস্তিচ অবক্তব্যংচ, (৭) স্যাৎ অস্তিচ নাস্তিচ, অবক্তব্যংচ। এই সাত নয়ের কোনও একটি ব্যবহার করিয়া দ্রব্যের বর্ণনা করিতে হয়। এই মতের সমালোচনায় ব্রহ্মসূত্রে আছে

'ন একস্মিন অসম্ভবাৎ। ২।২।৩৩) এক পদার্থে এক সময়ে পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

জৈন মতে আত্মার পরিমাণ দেহের সমান। কিন্তু কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে দেহের পরিমাণ বিভিন্ন। সুতরাং আত্মার পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন হয়। এইমত অশ্রদ্ধেয় (এবং চ আত্মা অকাৎ‌র্স্ন্যম্। ২।২।৩৪) আত্মা পর্য্যায় ক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয় বলিলেও বিরোধের পরিহার হয় না। তাহা স্বীকার করিলে আত্মাকেও বিকারশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হয় অন্ত্য অবস্থায় অর্থাৎ মোক্ষলাভের পরে আত্মা যে ভাবে অবস্থান করে, সে সময় আত্মা ও তাহার পরিমাণ এই উভয়ের নিত্যত্ব হেতু মোক্ষের পূর্ব্বেও আত্মার পরিমাণের কোনও পার্থক্য হইতে পারে না। দেহ অনুসারে আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না।

ভাগবত মত খণ্ডন

ভাগবত মতে ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের চারিরূপ—বাসুদেব, সংকর্ষণঃ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বাসুদেব পরমাত্মা। সংকর্ষণ জীব। প্রদ্যুম্ন মন এবং অনিরুদ্ধ অহংকার। সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু জীব নিত্য তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। এই মতে সংকর্ষণ (জীব) হইতে প্রদ্যুম্নের (মনের) উৎপত্তি হয়। কিন্তু জীব কর্তা, মন তাহার করণ। কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি হইতে পারে না। ভাগবত মতাবলম্বী বলিতে পারেন সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইহারা সকলেই জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজ দ্বারা ঈশ্বর-ধর্ম্মান্বিত। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ঈশ্বরই। কিন্তু তাহা হইলে বাসুদেব হইতে ইহাদের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় কিরূপে? আর ইহারা যদি ঈশ্বরই হন, তাহা হইলে চারিটি ঈশ্বরের কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা বাসুদেব বা পরমাত্মা তো ইহাদের মতেও এক। এই মতে গুণ ও গুণীকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি নিজেই গুণ ও গুণী উভয়ই। বল, বীর্য্য ও তেজ এ সকল গুণ। ইহাদিগকে বাসুদেবের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাতে বেদের নিন্দা আছে। "চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়ঃ অলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রম্ অধিগতবান্" শাণ্ডিল্য চারিবেদে পরম শ্রেয়ঃ না পাইয়া এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

রামানুজের মতে উপরোক্ত সূত্রগুলিতে ভাগবত মতের নিন্দা নাই, সমর্থন আছে। ২।২।৪২ ও ২।২।৪৩ সূত্র পূর্ব্বপক্ষ, ভাগবত-মতের প্রতিপক্ষের

উক্তি। মীমাংসা আছে ২।২।৪৪ সূত্রে। এই সূত্রের "বিজ্ঞানাদি" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। বিজ্ঞান (জ্ঞানময়) ও আদি (জগতের কারণ)। সংকর্ষণ; প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ শব্দ দ্বারা বাস্তবিক জীব, মন ও অহংকারকে লক্ষ্য করা হয় নাই। জীব, মন ও অহংকারের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকেই সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে "অজারমানো বহুধা বিজায়তে", জন্মহীন হইলেও তিনি বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। জীবের যে উৎপত্তি নাই, তাহাও পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বাসুদেব হইতে সংকর্ষণের উৎপত্তির অর্থ ইহা নয় যে জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন। বেদের নিন্দাও ইহাতে নাই। বেদের অর্থ দুরূহ। এইজন্য ভগবান্ পঞ্চরাত্র শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম ও জগৎ

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহাই শঙ্করের বিশিষ্ট মত। ব্রহ্মই চরম সত্য। ব্রহ্মই আত্মা। আত্মা একটি মাত্র, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জীবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। সকল দেহে একই আত্মা সাক্ষীরূপে অবস্থিত। জীবের—ব্যক্তিগত আত্মার—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বাহ্য জগতেরও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। জাগতিক ও মানসিক যাবতীয় ঘটনা, যাহা প্রতিক্ষণে সংঘটিত হইতেছে, তাহারা ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাসমাত্র, আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু। মানসিক ও জড়ীয় সকল প্রতিভাসের তলদেশে যে স্থায়ী অবিনশ্বর আত্মা বর্তমান, বেদান্ত তাহারই জ্ঞানলাভের জন্য সচেষ্ট। "তৎ ত্বম্ অসি, শ্বেতকেতু", ইহাই বেদান্তের মহাবাক্য। সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র ইহারই ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত। বিশুদ্ধ চিত্তে ভিন্ন এই জ্ঞান প্রতিভাত হয় না।

"তৎ ত্বম্ অসি" এই মহাবাক্যের তৎ শব্দ ব্রহ্ম-বাচক, ত্বম্ ব্যক্তিগত আত্মা বা জীববাচক। জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এই ব্রহ্ম (বা তৎ) সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এই জ্ঞান যখন অধিগত হয়, তখন জগতের বহুত্ব জ্ঞাতার মনে বিলুপ্ত হয়, জ্ঞাতা তখন ব্রহ্মই হইয়া যান। তাহার নিজের ব্যক্তিগত সত্তা ও তাহাতে প্রতিফলিত জগৎ প্রপঞ্চ বিলুপ্ত হয় এবং স্বয়ং-জ্যোতি ব্রহ্মই কেবল প্রকাশিত থাকেন। ইহাই মুক্তি। শঙ্করের এই মুক্তি অন্যান্য দর্শনের মুক্তি হইতে ভিন্ন। সাংখ্যমতে বাহ্য জগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ জীবাত্মা আপনাকে দেহ, এবং যে বুদ্ধি দেহের অংশ এবং প্রকৃতি হইতে উৎভূত,

তাহার সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করে। ফলে নানা দুঃখকষ্টের উৎপত্তি হয়। জীবাত্মা যখন আপনাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মনে করিতে সমর্থ হয়, এবং বুদ্ধি হইতে আপনাকে ভিন্ন বুঝিয়া স্বকীয় স্বরূপ চিৎ-মাত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়।

ন্যায় ও বৈদেশিক মতেও আত্মা যখন দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, দেহের সহিত সংসর্গ হইতে উদ্‌ভূত স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও ধন-সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ ও তাহাদের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়। আত্মার এই অবস্থায় তাহার চৈতন্য থাকে না। বেদান্তের মুক্তি ভিন্ন। বেদান্তের মতে জগৎই মিথ্যা, তাহার সত্য অস্তিত্ব নাই। জীবের সীমিত চৈতন্যে এই জগতের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয়, তখন জীবের জ্ঞানের সাক্ষী যে চৈতন্য, তাহা ব্রহ্ম চৈতন্যে মিশিয়া যায়, (নূনের পুতুল যেমন সমুদ্র-জলে মিশিয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়), এবং তাহাতে প্রকাশিত জ্ঞান ও তাহার বিষয় যে জগৎ তাহারও (প্রপঞ্চের) বিলয় হয়। জীবের সসীম চৈতন্যের বিলয়-বশতঃ তাহাতে প্রতিফলিত জগতেরও বিলয় হয়। তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই বেদান্তের মুক্তি। প্রপঞ্চের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব না থাকিলেও অনাদি কাল হইতেই তাহার অস্তিত্বের বোধ হইতেছে। এই বোধ মায়িক। শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হয়। তাহার পরে সত্যজ্ঞান হইলে বুঝিতে পারা যায় যে সেখানে রজতের প্রতীতি হইলেও, রজতের অস্তিত্ব কখনও ছিল না। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান হইলে-জগতের অস্তিত্ব জ্ঞানই থাকে না, পরন্তু কখনও যে ছিল তাহা মনে হয় না। যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিনই প্রপঞ্চের জ্ঞান হয়। ততদিন আমরা বুঝিতে পারি না, যে যদিও প্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীত হয় তথাপি তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; আমাদের যে প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্ত, মায়িক। ততদিন আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিতে পারি না; জগতের স্বরূপ কি, তাহাও বুঝিতে পারি না। জগৎ আমাদের নিকট নিয়মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতীত হয়। আমাদের মানসিক ক্রিয়া প্রজ্ঞার যে সকল নিয়ম অনুসরণ করে, বাহ্য জগতেও সেই সকল নিয়ম বর্ত্তমান. ইহা আমরা আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানে দেখিতে পাই। কিন্তু এই জ্ঞান পারমার্থিক ভাবে সত্য নহে। যতদিন জগতের মায়িক জ্ঞান হয়, ততদিনই ইহা সত্য। যখনই পারমার্থিক জ্ঞান হয়, তখনই ব্যবহারিক জগৎ সহ তাহার জ্ঞানেরও

বিলোপ হয়। তখন এক মাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। অন্যান্য দর্শনে মুক্তির পরে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না (বৌদ্ধ শূন্যবাদ ব্যতীত), এবং জগৎকে মায়ামাত্র বলা হয় না। তখন জগতের সহিত আত্মার কোনও সম্বন্ধ থাকে না, এই মাত্র বলা হয়। কিন্তু শাঙ্কর বেদান্ত-মতে মুক্তিতে জগৎ ও তাহার জ্ঞান উভয়ই বিলুপ্ত হয়। উপনিষদে বহুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। "(নেহ নানাস্তি কিঞ্চন)"। শঙ্করের মতে এই নানাত্বের বোধ—বিভিন্ন বস্তুসমম্বিত জগতের জ্ঞান—মায়া। ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে এই মিথ্যা জ্ঞানের বিলোপ হয়। ব্রহ্মের সহিত এই মায়ার সংসর্গের কারণ কি, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কেননা এই সংসর্গের কখনও আরম্ভ হয় নাই, ইহা অনাদি। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সহিত মায়ার কোন সংযোগ নাই, পরম সত্যের উপর তাহার কোনও প্রভাবই নাই। ব্রহ্মের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। মিথ্যা জ্ঞানই মায়া। মায়া কোনও সৎ বস্তু নহে; তাহা অবিদ্যা। তাহা হইতে প্রতিভাসের উদ্ভব হয়। যখন সত্যের জ্ঞান হয়, তখনই তাহা তিরোহিত হয়। যতক্ষণ মায়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব। তাই মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে। তাহা "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্বচনীয়া।" স্বপ্ন ও অন্যান্য ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানে এবং স্বপ্নে যে যে বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহাদের এইটুকু অস্তিত্ব আছে যে তাহাদের অনুভূতি হয়। কিন্তু এই অনুভূতি ব্যতীত তাহাদের অন্য কোনও সত্তা নাই বলিয়া তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। মায়া হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহা মায়ার ন্যায়ই মিথ্যা। মিথ্যা জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টির অস্তিত্ব। মিথ্যা জ্ঞানের নাশের সঙ্গে সৃষ্টিরও নাশ হয়।

বিশুদ্ধ চৈতন্য

বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বয়ং-প্রকাশ। ইহা কখনও জ্ঞান-ক্রিয়ার বিষয় হয় না। জ্ঞানের বিষয় না হইলেও ইহা আমাদের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়ায় বর্ত্তমান। জ্ঞানের বিষয় না হইয়া সমস্ত জ্ঞান-ক্রিয়ায় বর্ত্তমান থাকিবার যোগ্যতাই স্বয়ং-প্রকাশ্যতা। যখন কোনও বস্তুকে জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন সেই বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব তাহার এক গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জ্ঞেয়ত্ব সময় বিশেষে বস্তুর মধ্যে অবস্থিত, অন্য সময়ে অবস্থিত না হইতেও পারে। এই জ্ঞেয়ত্ব নির্ভর করে জ্ঞেয়ত্ব-উৎপাদনক্ষম অন্য বস্তুর উপরে। কিন্তু বিশুদ্ধ চৈতন্য তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না।

পরন্তু তাহা অন্য সকল বস্তুকে প্রকাশ করে। এক সংবিদকে প্রকাশিত করিবার জন্য যদি অন্য সংবিদের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় সংবিদের প্রকাশের জন্য অন্য সংবিদের প্রয়োজন হইত। তাহাতে অনবস্থার উদ্‌ভব হইত। কোনও বিষয়কে জানাইবার সময় যদি সংবিদ আপনাকে প্রকাশিত না করিত, তাহা হইলে কোনও বস্তুকে দেখিবার অথবা জানিবার পরেও জ্ঞাতা তাহা দেখিয়াছে অথবা জানিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ হইতে পারিত। এই স্বয়ং-প্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য বা সংবিদই আত্মা। আত্মা কোনও জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও সর্ব্ব অনুভূতির মধ্যে প্রকাশিত। সকল জ্ঞানে আত্মা প্রকাশিত বলিয়া কেহই আত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান হয় না। আত্মা সকল বস্তুর প্রকাশক, কিন্তু নিজে কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় না। যাহা আত্মানুভূতি রূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অহংকার—আত্মা নহে।

জীব ও ঈশ্বর বিশুদ্ধ চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে পতিত প্রতিবিম্ব। বিশুদ্ধ চৈতন্য বিম্ব। জীব ও ঈশ্বর প্রতিবিম্ব। বিশুদ্ধ চৈতন্য কোনও উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। তাহার মধ্যে চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছু নাই। তাহার মধ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ নাই।

ব্রহ্মের স্বরূপ

উপনিষদে ব্রহ্মের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ নেতিমূলক (negative)। বৃহদারণ্যক (২।৩।৬) বলেন "অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হি এতস্মাৎ ইতি, ন ইতি অন্যৎ পরম্ অস্তি। অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যং ইতি। প্রাণা বৈ সত্যম্। তেষাম্ এষ সত্যম্।" ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ "ইহা নয়, ইহা নয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। "সত্যের সত্য"—এই ইহার নাম। প্রাণ সত্য, ইনি সেই সমুদায় প্রাণের সত্য। "স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ—নহি গৃহ্যতে, অশীর্য্যঃ—নহি শীর্য্যতে, অসঙ্গঃ—নহি সজ্যতে, অসিতঃ, ন ব্যথতে, ন রিষ্যতি।" এই আত্মা নেতি নেতি, ইনি অগৃহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অশীর্য্য, ইনি শীর্ণ হন না। ইনি অসঙ্গ, কোন বস্তুতে আসক্ত হন না। ইনি অসিত—অবদ্ধ। ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হন না। ইনি হিংসিত হন না (বৃঃ আ ৩।৯।২৬)। "হে গার্গি, ব্রাহ্মণেরা সেই অক্ষরকে এই ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি অস্থুল, অনণু (অণু নহেন), হ্রস্ব নহেন, লোহিত নহেন, স্নেহ-বস্তু নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন। তিনি অসঙ্গ, অরস, অচক্ষু,

অশ্রোত্র, বাগিন্দ্রিয়বিহীন, মনোবিহীন, তেজো-রহিত, প্রাণ-রহিত, মুখ-রহিত, অপরিমেয়, অন্তর-রহিত, বাহ্-রহিত। (বৃ আ ৩।৮।৮)।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যম অগন্ধবৎ চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তম্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। (কঠ ১।৩।১৫)

শ্বেতাশ্বতর বলেন তিনি নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। কঠ উপনিষদে আরও আছে—তিনি ধর্ম্ম হইতে পৃথক, অধর্ম্ম হইতে পৃথক, কার্য্য ও কারণ উভয় হইতে স্বতন্ত্র, অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন। (১।২।১৪)

কিন্তু ভাব-বাচক (positive) বর্ণনাও আছে। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় ২।১), বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম (বৃহ ৩।৯।২৮) এরূপ বর্ণনাও আছে।

নেতিবাচক বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্ম দেশ ও কালের অতীত। আমাদের জ্ঞান দেশ ও কালে আবদ্ধ। যে সকল গুণ দেশ ও কালের সহিত সংসৃষ্ট, ব্রহ্মে তাহাদের আরোপ হইতে পারে না। আমাদের মন দেশ ও কালের অতীত কোনও বস্তুর ধারণা করিতে অক্ষম। আমাদের ভাষাও দেশ-কালাতীত বস্তুর বর্ণনা করিতে অসমর্থ। তাই বাক্য ও মন তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু ঋষিগণ ধ্যানবলে জানিয়াছেন, তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। ঋষিদিগের অপরোক্ষ অনুভূতির উপর ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত।

বৃহদারণ্যকে (২।৩।১) আছে :

দ্বেবাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈব অমূর্ত্তং চ, মর্ত্ত্যং চ অমৃতং চ, স্থিতং চ যৎ চ, সৎ চ ত্যৎচ। ব্রহ্মের দুই রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য ও অমৃত, স্থিতিশীল ও গতিশীল, সৎ (সত্তাবান) ও ত্যৎ (অব্যক্ত)। শঙ্কর বলেন এখানে ব্রহ্মের যে মূর্ত্ত রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাঁহার পারমার্থিক রূপ নহে। তাহা উপাধিমাত্র। কেননা ইহার পরেই উপনিষদ্ বলিয়াছেন "অথাতো আদেশঃ নেতি নেতি।" প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সংরাধনকালে যোগিগণ অব্যক্ত নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের দর্শনলাভ করেন (শঙ্কর ভাষ্য ৩।২।২৪)। (সংরাধন=ভক্তি, ধ্যান প্রণিধানাদি অনুষ্ঠান)। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে (প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্) জানা যায়। কঠোপনিষদ্ বলেন—স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়দিগকে পরাক্-দর্শী (অনাত্মদর্শী) করিয়া বিনষ্ট করিয়াছেন। সেই জন্য তাহারা অনাত্ম বস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন

কোনও অমৃতত্বকামী ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-নিরোধ-পূর্ব্বক প্রত্যগাত্মকে দেখিতে পাইয়াছেন।

শঙ্কর বলেন (শঙ্করভাষ্য ৩।২।১১), শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বোধক বাক্য আছে। "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্মবোধক। আবার "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন" ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক। কিন্তু ইহা হইতে ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়-লিঙ্গ বলা যায় না, কেন না কোনও বস্তু রূপাদিযুক্ত ও রূপাদিহীন, এই উভয়ই হইতে পারে না। তাহা বিরুদ্ধ। স্বতঃ দ্বিরূপ না হইলেও স্থানাদি উপাধিদ্বারা কোনও বস্তু দ্বিরূপ হয়, ইহাও বলা যায় না। উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হয় না। স্বচ্ছ স্ফটিক অলক্তাদি-যোগে অস্বচ্ছ হয় না। বস্তুতঃ রক্ত স্ফটিক রূপে যে প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম। অতএব বর্ণিত দ্বিবিধ রূপের একরূপ স্বীকার করিতে হইবে। 'তিনি অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ ইত্যাদি বাক্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্ম নির্বিশেষ!

ব্রহ্ম নির্বিশেষ, একাকার কেবল চৈতন্য। যেমন লবণপিণ্ড অনন্তর অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন সেইরূপ এই আত্মা অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন" (শাঃ ভাঃ ৩।২।১৬)। আত্মার চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সর্ব্বকালিক রূপ। যেমন লবণপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে কেবল লবণরস, রসান্তর নাই, তদ্রূপ আত্মার অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যাতিরিক্ত রূপ নাই। শ্রুতি সবিশেষ রূপ প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের নির্বিশেষ রূপই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে বা পৃথক। "বাক্য ও মন যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়"। শ্রুতিতে আরও বলা হইয়াছে যে বাস্কলিকর্তৃক ব্রহ্মবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নিরুত্তর থাকিয়া বাস্কলির প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। বাস্কলি বুঝিতে না পারিয়া তৃতীয়বার প্রশ্ন করিলে বাহ্ব বলিয়াছিলেন 'আমি তো উত্তর দিতেছি, কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। এই আত্মা উপশান্ত (অখণ্ড একরস অদ্বৈত)।" স্মৃতিতেও (গীতায়) আছে "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে"—পরব্রহ্ম আদিহীন। তিনি সৎ নহেন, অসৎও নহেন। (সৎ=ব্যক্ত, প্রত্যক্ষ। অসৎ=পরোক্ষ)। অন্য স্মৃতিতে আছে 'নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন "তুমি সর্ব্বভূতগুণযুক্ত আমার যে রূপ দেখিতেছ, তাহা মায়া, আমার সৃষ্ট। এরূপ না হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইতে না।" অনাত্মরূপ নিষেধ

করিয়া শ্রুতি আত্মাকে, চৈতন্যস্বরূপ, নির্বিশেষ, বাঙ্মনসতীত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। এইজন্য মোক্ষ-শাস্ত্র তাহার উপাধিকৃত বিশিষ্ট ভাব যে অপারমার্থিক, তাহা প্রদর্শনের জন্য জল-সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, বলিয়াছেন যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুর ন্যায় হন, সেইরূপ এই ব্রহ্ম, জন্মাদি-রহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধিদ্বারা বহু ক্ষেত্রে (দেহে) অনুগত হইয়া বহুর ন্যায় হইয়াছেন।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যে শঙ্কর কথঞ্চিৎ ভিন্নভাবে ব্রহ্মের স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। "অনেকে হি বিলক্ষণাঃ চেতনাচেতনরূপাঃ সামান্যবিশেষাঃ। তেষাং পারম্পর্য্যগত্যা যথা একস্মিন মহা-সামান্যে অন্তর্ভাবঃ তথা প্রজ্ঞানঘনে।" "সামান্যের বহু ভেদ আছে। এই সকল সামান্যের বহু বিশেষ আছে। এই সকল সামান্য পরম্পরাগতিতে (hierarchical series) এক মহাসামান্যের অন্তর্ভুক্ত। এই মহাসামান্যই প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম।" এই মহাসামান্য সত্তামাত্র (Existence)। জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর আবরণ উন্মোচিত হইলে এই সত্তাই অবশিষ্ট থাকে। এই সর্ব্ববস্তু-সাধারণ সত্তা চৈতন্য-স্বরূপ। তাহাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম নির্বিকল্প এক-লিঙ্গ (একরূপ), উভয়-লিঙ্গ নহেন। তিনি সর্ব্ববিশেষ-বর্জিত হইলেও উপনিষদ তাঁহাকে বিশেষত্ব-যুক্ত বলেন কেন? তাহার উত্তরে ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে (৮।১।১) শঙ্কর বলিয়াছেন "দিক্-দেশ-গুণ-গতি-কাল-ভেদশূন্যং হি পরমার্থসদদ্বয়ম্ ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিনাম্ অসৎ ইব প্রতিভাতি।" অর্থাৎ দেশ, গুণ, গতি, কাল এবং ভেদবর্জিত পরমার্থ সৎ—যাহা দ্বৈতহীন—তাহা মন্দবুদ্ধি লোকের নিকট অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়। "সন্মার্গস্থাঃ তাবৎ ভবন্তু, ততঃ শনৈঃ পরমার্থসৎ অপি গ্রাহয়িষ্যামি ইতি মন্যতে শ্রুতিঃ"—শ্রুতির অবিপ্রায় প্রথমে ইহারা "সৎ"-মার্গস্থ হউক অর্থাৎ সৎ কি তাহা বুঝুক, তাহার পরে পরমার্থ সৎ কি তাহা বুঝাইব। শিক্ষার সৌকর্য্যের জন্য প্রথমে ব্রহ্মে কতকগুলি গুণের আরোপ করিয়া শ্রুতি পরে সেই সকল গুণের প্রত্যাহার করিয়াছেন। ইহাকে অধ্যারোপ-বাদ বলে। ব্রহ্মে যে দেশবাচক বিশেষণের আরোপ করা হইয়াছে, তাহা অন্যের উপলব্ধির জন্য এবং উপাসনার জন্য। যাহা আমাদের নিকট মহত্তম বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা ঈশ্বরের ধারণা প্রথমে করিয়া পরে যাহা অনপেক্ষ-

ভাবে মহত্তম (ব্রহ্ম), তাঁহার ধারণায় পৌছিতে হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-কর্তৃত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। সৎ-চিৎ আনন্দত্ব স্বরূপ লক্ষণ। "যে বাড়ীতে একটি গাই আছে, তাহা দেবদত্তের বাড়ী" বলিয়া যখন দেবদত্তের বাড়ীর বর্ণনা করা যায়, তখন তাহা তটস্থ বা গৌণ লক্ষণ। তেমনি ব্রহ্ম জগতের কারণ ও স্রষ্টা বলিলে তাঁহার তটস্থ লক্ষণের বর্ণনা করা হয়। ব্রহ্মের যখন অনুভব হয়, তখনই তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এক প্রাচীন আচার্য্য বলিয়াছিলেন—"যাহারা নির্বিশেষ পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ, সবিশেষ ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া সেই সকল অল্পবুদ্ধিদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা যায়।"

উপনিষদে ব্রহ্মকে বুঝাইতে "আত্মন্" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মকে সৎ-চিৎ আনন্দ-স্বরূপ, সত্যং জ্ঞানং অনন্তংও বলা হইয়াছে। কিন্তু যিনি বাক্য ও মনের অতীত তাঁহাতে এই সকল শব্দ কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে ছান্দোগ্যের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন আত্মন্ শব্দ আত্মাকে প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তাহাদ্বারা আত্মা যে এই শব্দের বাচ্য তাহা বলা যাইতে পারে না। "আত্মন্" শব্দ-বাচ্য দেহাদি-বিশিষ্ট প্রত্যক আত্মা, নিরুপাধিক বিশুদ্ধ আত্মা নহে, নির্বিশেষ আত্মা নহে। নির্বিশেষ আত্মা আত্মন্ শব্দের বাচ্য নহে। প্রথমে আত্মন্ শব্দদ্বারা দেহবিশিষ্ট আত্মার প্রতীতি হইলে পরে দেহাদি উপাধি প্রত্যাখ্যাত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আত্মন্‌শব্দের বাচ্য না হইলেও আত্মন্ শব্দ দ্বারা তাহার প্রতীতি হয়। * (ছা ৭।১।৩)

---

* "সর্ব্বো হি শব্দোঽভিধানমাত্রং।...ন আত্মবিৎ আত্মানং বেদ্মি। নমু আত্মাপি মন্ত্রৈঃ প্রকাশতে এব, ইতি কথং ন আত্মবিৎ? ন, অভিধান-অভিধেয়-ভেদস্য বিকারত্বাৎ। ন চ বিকার আত্মা ইষ্যতে। নমু আত্মাপি আত্মশব্দেনাভিধীয়তে। ন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে", "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কথং তর্হি "আত্মৈবাধস্তাৎ, স আত্মা" ইত্যাদি শব্দা আত্মানং প্রত্যায়য়ন্তি? নৈষ দোষঃ, দেহবতি প্রত্যগাত্মনি ভেদবিষয়ে প্রযুজ্যমানঃ শব্দো দেহাদীনাম্ আত্মত্বে প্রত্যাখ্যায়মানে যৎ পরিশিষ্টং সৎ অবাচমপি প্রত্যায়য়তি। (ছান্দোগ্য—৭।১।৩)

সকল শব্দই অভিধান মাত্র।...আমি আত্মাকে জানি না তাই আত্মবিৎ নহি। কিন্তু মন্ত্রদ্বারা আত্মাও তো প্রকাশিত হয়। তবে কেন আত্মবিৎ নহে? তাহার কারণ অভিধান অভিধেয় ভেদ বিকার মাত্র। আত্মাতো বিকার নহে। কিন্তু আত্মাও তো "আত্ম শব্দদ্বারা অভিহিত হয়। না তাহা হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে "যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হয়" "যেখানে অন্য কিছু দেখে না", (সুতরাং বাক্যদ্বারা তাহাকে প্রকাশ করা যায় না।) তাহা যদি হয়, তবে "আত্মাই নিম্নে", "তিনি আত্মা" এইরূপ প্রয়োগ শ্রুতিতে কেন আছে? তাহা দোষের নহে। কেননা "আত্মন্ শব্দ ভেদবুদ্ধির বিষয়ীভূত জীবাত্মাতে প্রযুক্ত। দেহাদির আত্মত্ব নিষিদ্ধ হইলে পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা বাক্যের অতীত হইলেও তাহার প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে।

ব্রহ্ম সৎ, ইহার অর্থ ব্রহ্ম অনৃত নহেন। সর্ব্ববস্তুর মধ্যে যে সার্বিক সত্তা বর্ত্তমান, তিনি অবাহ্য। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, ইহার অর্থ তিনি জ্ঞান পদার্থ, তিনি স্বপ্রকাশ, অচেতন নহেন। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, ইহার অর্থ তাঁহাতে দুঃখ নাই, তিনি সুখ-স্বরূপ। ব্রহ্ম অনন্ত, অর্থাৎ সীমা বা পরিচ্ছেদহীন—দেশকাল বস্তুকৃত পরিচ্ছেদহীন। তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার দেশকৃত পরিচ্ছেদ নাই, নিত্য বলিয়া কালকৃত পরিচ্ছেদ নাই, সকলের আত্মা বলিয়া বস্তুকৃত পরিচ্ছেদও নাই। দেশ-কাল ও বস্তু বেদান্ত মতে সত্য নহে, এজন্যও তিনি সর্ব্ব পরিচ্ছেদহীন। প্রপঞ্চ মিথ্যা না হইলে ব্রহ্মের অনন্তত্ব প্রতিপন্ন হয় না। আকাশে দৃষ্ট গন্ধর্ব-নগর মিথ্যা বলিয়া তাহা দ্বারা আকাশের যেমন পরিচ্ছেদ হয় না, প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া তাহাদ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ হয় না। ব্রহ্মই জীবভাবাপন্ন হন। প্রত্যেক জীবেরই তাহার অন্তরস্থ আত্মাতে যে প্রীতি, তাহাই অন্য সকল বস্তুতে প্রীতির মুল। আত্মা স্বভাবতঃ (পরের জন্য নহে) প্রিয়, স্ত্রী ও বিত্তাদি আত্মার জন্যই প্রীতিকর হয়, এই জন্য আত্মাকে সুখ-স্বরূপ বলা যায়। সুষুপ্তিকালের যে সুখ তাহা বিষয়ানুভব হইতে উদ্ভূত নহে। তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। জাগতিক যাবতীয় সুখ ব্রহ্মসুখেরই অংশ মাত্র।

ব্রহ্মের কোনও ধর্ম্ম নাই। সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ও অনন্তত্ব ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্মের লক্ষণ ইহারা কিরূপে হইতে পারে, ইহার উত্তরে বেদান্ত পরিভাষা (৭ম পরিচ্ছেদ) বলেন—সত্যত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্মের লক্ষণ নহে। কেননা ইহারা ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ইহাদিগকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া আমরা কল্পনা করি—ইহাদিগকে স্বরূপলক্ষণ বলি। চৈতন্য বা ব্রহ্মের আনন্দ, বিষয়ানুভব ও নিত্যত্ব এই সকল ধর্ম্ম আছে বলিয়া কথিত হয়। ইহারা চৈতন্য বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক না হইলেও পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ইহারা অভিন্ন। সত্যে জ্ঞান বা জ্ঞানে সত্যতা, আনন্দে জ্ঞানতা, জ্ঞানে আনন্দতা ও সত্যতা, সত্যেও আনন্দতা আছে। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ একই পদার্থ। ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ ব্রহ্ম। ইহাকে জগৎ-কারণ বলা যায় না। মায়া-শবলিত (মায়া উপাধিযুক্ত) ব্রহ্ম জগৎ-কারণ। ব্রহ্ম উপনিষদে অনেক স্থলে ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনিই জগৎ-কারণ, শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন।

জগতের মিথ্যাত্ব

শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা—মায়া-সৃষ্ট। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ—সকলেরই খণ্ডন করিয়াছেন। তবে জগৎ মিথ্যা—ইহার অর্থ কি ?

জগৎ মিথ্যা, কেননা ইহা চিরকাল থাকে না, সত্য জ্ঞান যতদিন না হয়, ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। সত্য জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিলোপ হয়। কিন্তু আকাশ-পুষ্প এবং শশ-শৃঙ্গ যে অর্থে মিথ্যা, সে অর্থে জগৎ মিথ্যা নহে। আকাশ-পুষ্প ও শশ-বিষাণ আত্যন্তিক অসৎ, তাহারা "তুচ্ছ"। কিন্তু জগৎ-প্রপঞ্চের প্রতীতি হয়, অনুভব হয় (শশবিষাণ ও আকাশপুষ্পের অনুভব কখনই হয় না)। এই অর্থে জগতের অস্তিত্ব আছে। কিছুকাল জগতের অস্তিত্ব থাকে বলিয়া জগৎ 'সৎ', চিরকাল থাকে না বলিয়া "অসৎ"। এইজন্য জগৎ সৎও নহে অসৎও নহে—অনপেক্ষভাবে সৎ নহে, অনপেক্ষভাবে অসৎও নহে। আবার জগৎকে এইজন্যও মিথ্যা বলা যায় যে যদিও জগৎ সৎ অথবা সতের বিভূতি বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি যখন সতের সত্যজ্ঞান হয়, তখন ইহা স্পষ্টীকৃত হয়, যে জগতের বর্ত্তমান অস্তিত্ব যেমন নাই, তেমনি ইহার অস্তিত্ব পূর্ব্বেও ছিলনা কখনও থাকিবেও না। যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম বিদূরিত হয়, তখন পূর্ব্বে যে সর্প প্রতীত হইয়াছিল তাহার অস্তিত্ব থাকে না। ইহাও স্পষ্ট হয়, যে সর্প সেখানে কখনও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না। রজ্জুতে সর্পভ্রমের সময় যেমন ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত "ইদম্" (ইহা) সর্পরূপে প্রতীত হইয়াছিল, জগৎ-ভ্রান্তিকালে তেমনি সৎ বা ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতীত হন। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ অন্তর্হিত হয় ও তখন বুঝিতে পারা যায় যে জগৎ পূর্ব্বেও ছিলনা, পরেও থাকিবে না। ব্রহ্মজ্ঞান ও জগতের তিরোধান একই সময়ে হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানের তিরোধান একই ব্যাপার। তখন জগৎ ও তাহার জ্ঞান উভয়েই তিরোহিত হয়। ব্রহ্মই কেবল অবশিষ্ট থাকেন। ব্রহ্মের মধ্যে জগতের অস্তিত্ব না থাকিলেও, জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়। যাহার কখনও বাধা হয় না, তাহাকেই সত্য বলে। সত্যজ্ঞান হইলে যখন জগতের বাধা হয় অর্থাৎ জগৎ থাকে না, তখন জগৎকে মিথ্যা বলিতে হয়।

কিন্তু জগতের এই মিথ্যাত্ব ও রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের মিথ্যাত্ব এক প্রকার নহে। রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্বকে প্রাতিভাসিক বলে। রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাসিত হয়, তাই সর্পের অস্তিত্ব প্রাতিভাসিক, পরবর্ত্তী অনুভব দ্বারা

সর্পজ্ঞানের বাধা হয়। কিন্তু এই সংসারে জগৎ-জ্ঞানের কোনও বাধা হয় না। যত দিন ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, তত দিন জগৎ নিয়মানুসারে চলিতে থাকে, কোনও বাধা হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎকে সত্য বলিতে হইবে। কিন্তু এমন একটি অবস্থা আছে, যাহাতে জগতের কোনও প্রকাশই হয় না। এই জন্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎকে অসৎ বলা হয়। জগতের অনুভব হয়। ব্যবহারে তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় বলিয়া এই অস্তিত্বকে ব্যবহারিক অস্তিত্ব বলে (Phenomenal existence)। কিন্তু ইহা পারমার্থিক বা নিত্য অস্তিত্ব নহে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ অসৎ। যুক্তিতেও জগতের প্রতীয়মান অস্তিত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

একত্বই পারমার্থিক সত্য, নানাত্ব মিথ্যাজ্ঞান। শঙ্করের মতে বহুত্বের জ্ঞান অবিদ্যা-সঞ্জাত। ঈশ্বরও অবিদ্যাজাত। কিন্তু আমাদের বহুত্বের জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মের একত্বের হানি হয় না। চক্ষুর দোষবশতঃ দুইটি চন্দ্র দৃষ্ট হয় বলিয়া চন্দ্রের একত্ব নষ্ট হয় না। আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানে ব্রহ্ম বহু রূপে প্রতীত হন বলিয়া তাঁহার একত্বের অপহ্নব হয় না। নাম-রূপ-বিশিষ্ট সমগ্র ব্যবহারিক জগৎ—যাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না —তাহা অবিদ্যার ভূমিতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু চরম সত্য যাহা (সত্তা), তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন নাই। যে পরিবর্ত্তন কেবল বাচারম্ভণ (বাক্য) মাত্র, তাহা দ্বারা সতের অবিভাজ্যতার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। জগতের বিভাগ মিথ্যাজ্ঞান হইতে উদ্‌ভূত এবং পূর্ণজ্ঞানের সঙ্গে তাহা বিলুপ্ত হয়। "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা যখন অভেদজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়, তখন জীবের সংসারভ্রম এবং ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বের বিরতি ঘটে।

শঙ্কর বলেন সংসারে জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আমাদের উপজীব্য, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আমরা নির্ভরশীল। কিন্তু তাহা দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। সত্য-নিরূপণের উপায় পরীক্ষা। আমাদের সমকালবর্ত্তী সকলের সাক্ষ্যদ্বারা প্রতীয়মান জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই জগতেই আমাদের চেষ্টা অভীষ্ট ফল উৎপাদন করে। এ সকলই সত্য। কিন্তু এই প্রকার পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে এই জগৎ-প্রপঞ্চের বাধা কখনও হইবে না। পরীক্ষাদ্বারা এই মাত্র প্রমাণিত হয়, যে জগৎ-প্রপঞ্চ বর্ত্তমানকালে যেরূপ প্রতীত হয়, সেইরূপে বর্ত্তমান। ইহা বেদান্ত স্বীকার করেন। কিন্তু ইহা যে চিরকাল থাকিবে, তাহা স্বীকার করেন না। বেদান্ত-মতে এক সময় আসিবে যখন ইহার অস্তিত্ব থাকিবে না।

দৃক্ (চিৎ) ও তাহার বিষয়ের (দৃশ্যের) মধ্যে, বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে, যে সম্বন্ধ, তাহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। দৃক ও দৃশ্যের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে কোনও বিষয়ই যে কোনও সময়েই জ্ঞানে আবির্ভূত হইতে পারিত। কিন্তু এই সম্বন্ধ কি? ইহা সংযোগ নহে, সমবায়ও নহে। অন্য কোন-রূপ সম্বন্ধের কথাও আমাদের জানা নাই। মীমাংসকদিগের মতে বিষয়ে "জ্ঞাততা" উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই জ্ঞাততা বোধগম্য হয় না। প্রভাকরের মতে বিষয় দ্বারা আমাদের যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই প্রয়োজনই তাহার বিষয়ত্ব। কিন্তু ইহাও সত্য নহে, কেননা এমন অনেক বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয়, যাহা দ্বারা আমাদের কোনও প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। আবার জ্ঞান-কারণত্বকেও বিষয়ত্ব বলা যায় না (অর্থাৎ জ্ঞানকালে মননের বিষয়কে বিষয় বলা যায় না), কেননা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষকারীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু অতীত কালে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু-সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে না। কেননা যাহা বর্ত্তমান কালে উপস্থিত নাই, তাহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞানের বিষয় হওয়ার অর্থ ইহাও নহে—যে বস্তুকর্ত্তৃক তাহার রূপ জ্ঞানে অর্পিত হয়, কেননা প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে ইহা সত্য হইলেও অনুমান সম্বন্ধে সত্য নহে। অনুমানকালে বিষয় বহুদূরে বর্ত্তমান থাকে এবং সংবিদ্ বিষয়ের রূপ ধারণ করে না। সুতরাং মন হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানকালে বস্তুসকল কিরূপে সংবিদের বিষয় হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সংবিদ ও তাহার বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধের স্বরূপও দুর্বোধ্য। ইহা হইতেও জগৎ-প্রপঞ্চ যে মায়ামাত্র, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু এই অবিদ্যা বা মায়া, যাহার জন্য জগৎ-প্রপঞ্চের অনুভব হয়, তাহা সর্ব্ব-সাধারণ। তাহা ব্যক্তিগত ভ্রান্তি নহে। রজ্জুতে সর্পদর্শন ব্যক্তিগত ভ্রান্তি। কিন্তু জগৎ-ভ্রান্তি সর্ব্বমানব-সাধারণ, সম্ভবতঃ সর্ব্বজীব-সাধারণ। সুতরাং রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি ও জগৎ-ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু শঙ্কর যে সকল উপমার ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে শঙ্করের মতে মরীচিকার মতো জগতের কোনও অস্তিত্বই নাই। রজ্জুতে সর্পের অনুভব হইলেও সর্পের অস্তিত্ব যেমন সেখানে কখনও ছিল না, মরীচিকায় জলের অনুভব হইলেও সেখানে যেমন জলের অস্তিত্ব একেবারেই নাই, জগতেরও তেমনি কোনও প্রকার অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নাই। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। অবিদ্যা অচেতন, সাংখ্যের প্রধানের মতো অচেতন। সুতরাং তাহা দ্বারা জগতের সৃষ্টি অসম্ভব। অচেতন প্রধান দ্বারা জগতের সৃষ্টি অসম্ভব,

ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন। সুতরাং অচেতন অবিদ্যা দ্বারা জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা বলা তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদে বর্ণিত দ্বাদশ নিদানের প্রথম নিদান অবিদ্যা। শঙ্কর ইহা গ্রহণ করেন নাই, ইহার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়া তিনি জগতের মনোবাহ্য অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের মনের বৃত্তির উপর কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। পরবর্ত্তী অদ্বৈতবাদিগণের মত যাহাই হউক না কেন, শঙ্কর আমাদের জাগরণ-কালের অনুভবকে স্বপ্নের অনুভবের মত অলীক বলেন নাই। তিনি ব্যক্তিগত অবিদ্যাকেই জগতের কারণ বলেন নাই। তাঁহার মতে অবিদ্যার মনোবাহ্য অস্তিত্ব আছে, তাহা বিষয়ী-তন্ত্র (Subjective) নহে। অবিদ্যা সর্ব্বসাধারণ ও পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চের কারণ। অবিদ্যা অনাদি শক্তি—ভাব-বস্তু। "অনাদি-ভাব-রূপম্ যৎ প্রজ্ঞানেন বিলীয়তে তৎ অজ্ঞানম্, ইতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে (চিৎসুখ)।" এই সমস্ত কারণে শঙ্কর যে জগৎকে স্বপ্ন বা মরীচিকার মতো একেবারেই মিথ্যা মনে করিতেন, ইহা সম্ভবপর নহে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ্ বলেন "শঙ্করের মতে ব্রহ্মই জগতের ভিত্তি। ব্রহ্ম যদি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতেন, উভয়ের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য যদি না থাকিত, জাগরিত, সুষুপ্ত ও স্বপ্নাবস্থার সহিত আত্মার কোনও সাদৃশ্য না থাকিত, তাহা হইলে জগৎকে ও জাগরিত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থাকে মিথ্যা বলিলেও তাহা দ্বারা সত্যে পৌছিবার কোনও পথের সন্ধান পাওয়া যাইত না। "যদি হি ত্রি-অবস্থাত্ম-বিলক্ষণম্ তুরীয়ম্ অন্যৎ, তৎপ্রতিপত্তি-দ্বারাভাবাৎ শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যম্ শূন্যতাপত্তিশ্চ" (মাণ্ডু-ক্যোপনিষদের শঙ্কর ভাষ্য)। তুরীয় যদি তিন অবস্থা হইতে ভিন্ন হইত, তাহা হইলে তাহার উপলব্ধির উপায়ের অভাবশতঃ শাস্ত্রোপদেশ অনর্থক হইত এবং শূন্যবাদ স্বীকার করিতে হইত। মায়িক সর্প শূন্যতা হইতে উদ্‌ভূত হয়না। ভ্রান্তির অপনোদনের সঙ্গে তাহা শূন্যে পরিণত হয়না। নানাভূত জগৎ ভ্রান্ত বিচারের ফল। এই ভ্রান্তির অপনোদনের অর্থ মতের পরিবর্তন। (যাহাকে সর্প বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহা সর্প নহে, এই মত অবলম্বন)। রজ্জুর সর্পরূপে জ্ঞান হয়, পরে ভ্রান্তি দুরীভূত হয় এবং সর্প রজ্জুতে পরিণত হয়। এই ভ্রান্তির মূল কারণ বস্তুর স্বরূপগত (Metaphysical) নহে, তাহা হেতুগত (logical) ও মানসিক (psychological)। সর্প যেমন ভ্রান্তি-অপগমে রজ্জুরূপে প্রতীত হয়, তেমনি জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্ম-জ্ঞানের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। জগৎ তখন যে

অস্বীকৃত (negated) হয় তাহা নহে, নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত—অনুভূত হয়। জীবন্মুক্তি ও ক্রমমুক্তির ধারণা, সত্য ও মিথ্যা এবং পাপ ও পুণ্যের ভেদ, এই জগতের মাধ্যমে মোক্ষলাভের শক্যতা—এই সকল হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায়, যে ভাণের (appearance) মধ্যেই সৎ বর্ত্তমান এবং ব্রহ্ম জগৎরূপে না হইলেও জগতের মধ্যে বর্ত্তমান। জগৎ-প্রপঞ্চ যদি একেবারে মিথ্যা হইত, ব্রহ্মের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে প্রেম, বিজ্ঞতা ও বৈরাগ্য দ্বারা আমরা উন্নততর জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতাম না। ধর্মাচরণ দ্বারা আমরা অসঙ্গ আত্মাকে পাইতে পারি, ইহা শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ সৎ নহে ইহা সত্য, কিন্তু মরীচিকার মতো মিথ্যা নহে। জীবও অবস্তু নহে। আত্মার বিপরীত যে অহংকার (false self) তাহার লয় দ্বারা মোক্ষ হয়। বিদ্যারণ্য বলেন "সমগ্র জীবাত্মার যদি বিলাপ হইত, তাহা হইলে মোক্ষ মানুষের মঙ্গলকর হইত না।"

যদি ব্রহ্মের অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক কোনও প্রকার অস্তিত্বেরই সম্ভাবনা থাকিত না। "প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতাং ইতি বিনিশ্চয়ঃ" (গৌড়পাদকারিকা—১।৬), এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন "বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বতঃ মায়য়া বাপি জায়তে"—তত্ত্বতঃ অথবা মায়া দ্বারা বন্ধ্যাপুত্রের জন্ম হইতে পারে না। যদি অসতের জন্ম সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সতের সম্ভাবনাও অস্বীকার করিতে হয়, ব্রহ্মের অস্তিত্বও থাকে না। সৎই জগতের আস্পদ; মৃগতৃষ্ণিকাও আস্পদ বিহীন নহে।

"আত্মজ্ঞান-মহানিদ্রা-বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্‌জগন্ময়ে
দীর্ঘস্বপ্নে স্ফুরন্ত্যেতে স্বর্গ-মোক্ষাদি বিভ্রমাঃ। (অদ্বৈতমকরন্দ)

আত্মার অজ্ঞানরূপ মহানিদ্রায় জগৎরূপ দীর্ঘ-স্বপ্নে স্বর্গ-মোক্ষ প্রভৃতি ভ্রমের স্ফুরণ হয়। কিন্তু ঈশ্বর-সৃষ্ট স্বপ্ন, ঈশ্বর যাহার আধার, তাহা কখনও স্বপ্ন (মিথ্যা) হইতে পারে না। আমরা যে সামুৎপাদিক জগতের আবরণ ভেদ করিয়া সতে পৌছিতে সমর্থ, তাহার কারণ এই যে নশ্বর জগতের মধ্যে শাশ্বত ব্রহ্মের চিহ্ন বর্ত্তমান। জগৎ নিত্য না হইলেও নিত্য অসঙ্গই ইহার আস্পদ। যাহা নিত্য নহে, তাহা নিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সেই নিত্যেরই প্রকাশ। জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ না হইলেও ইহা ব্যবহারে সত্য। সৎ ব্রহ্ম জগৎরূপেই আমাদের সসীম মনের সম্মুখে উপস্থিত হন।

শঙ্কর যে জগৎকে একান্তভাবে মিথ্যা বলেন নাই, তাহা তাঁহার জীবন্-মুক্তের ব্যাখ্যাদ্বারাও প্রমাণিত হয়। দেহ-ত্যাগের সঙ্গে যে মুক্তি, তাহা

বিদেহ মুক্তি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে শরীর বর্ত্তমান থাকিতে যে মুক্তি, তাহা জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্তের নিকট জগতের অস্তিত্ব বিলীন হয় না। জীবন্মুক্ত জগৎকে তাহার সত্যরূপে দেখিতে পান। তাঁহার অবিদ্যার নাশ হয়। অর্থাৎ তিনি সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পান, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র না দেখিয়া ব্রহ্মেরই ভাগরূপে দেখিতে পান। শঙ্কর কার্য্যের সত্যতা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু কারণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্যের অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহাই তাঁহার মত।

অবিদ্যার আবরণ ভেদ করিয়া, অর্থাৎ জগতের নানাত্ব-সমন্বিত স্থূল রূপ অতিক্রম করিয়া তাহার কারণস্বরূপ ব্রহ্মে পৌছিতে হয়। শঙ্কর পরিণামবাদী নহেন, এবং জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম-রূপে ব্রহ্মের ন্যায় সত্য মনে করেন না। তাঁহার অনেক বচন হইতে মনে হয় যে সসীম মানব মনে অনন্ত ব্রহ্ম যে রূপে প্রতিভাত হন, শঙ্কর সেই রূপকেই জগৎ বলিয়াছেন। মানব-মনের বাহিরে তাঁহার সে রূপ নাই। এই অর্থে জগৎ মিথ্যা। আবার অনেক বচন হইতে মনে হয় যে তিনি জগতের মনোবাহ্য অস্তিত্ব—জগৎ যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার মনঃনিরপেক্ষ অস্তিত্ব—স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে মায়া কেবল ব্যক্তির অবিদ্যা নহে, তাহা সর্ব্ব-ব্যক্তি সাধারণ বৈশ্বিক পদার্থ, যাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। মায়ার অস্তিত্ববশতঃ ব্যক্তির দৃষ্টিতে সৎ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না, তাহার অখণ্ড রূপ খণ্ডিত, সুতরাং মিথ্যা রূপে প্রতিভাত হয়, ব্যক্তির বুদ্ধির বেষ্টনী রচিত হয়। কিন্তু মানব-বুদ্ধির এই বেষ্টনী—সত্য-উপলব্ধির এই অক্ষমতা কেন? কেন দেশ-কাল-কারণত্বের অতীত ব্রহ্ম দেশকালকারণত্ব-নিয়ন্ত্রিত জগৎরূপে প্রতিভাত হন? আবার যে আত্মার স্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান, তিনিই বা কেন অজ্ঞানের মধ্যে পতিত হন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

বাইবেলে আছে পূর্ব্বে একমাত্র ঈশ্বরই ছিলেন, অন্য কোনও পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং গ্রহনক্ষত্র-সমন্বিত দ্যুলোক ও পৃথিবীর আবির্ভাব হইল। এই জগতের উপাদান ছিল না। ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই সৃষ্টির কারণ। কিন্তু এই ইচ্ছার ফলে কিরূপে শূন্য হইতে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-সমন্বিত জগতের এবং চেতন জীবের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ঈশ্বর বলিলেন "আলো হউক" আর আলোর উদ্ভব হইল। তিনি মানুষ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি

মানুষের উদ্ভব হইল, ইহা বোঝা যায় না। যাহা কোথাও ছিল না, তাহার উদ্ভব কল্পনা করা যায় না। এতাদৃশ সৃষ্টি ও মায়িক সৃষ্টি একই প্রকার। ঐন্দ্রজালিক যাদুবলে হস্তী-অশ্বাদির সৃষ্টি করে, তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকে না। জগৎ তাহা অপেক্ষা অধিককাল থাকিলেও জাগতিক সকল বস্তুই বিনাশশীল। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এতাদৃশ সৃষ্টি মায়া। মায়া অনাদি, কোনও কালে ইহার উদ্ভব হয় নাই। সৃষ্টিপ্রবাহ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, সৃষ্ট বস্তুর ধ্বংস হইতেছে, নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে—অনাদিকাল ধরিয়া। শূন্য হইতে সৃষ্টিবাদের (Creation out of nothing) সহিত মায়াবাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। "লোকবৎ তু লীলাবৈকল্যম্ (ব্র-স্থ—২।১।৩২)। এই সূত্রে জগৎকে ব্রহ্মের লীলা বলিয়া ইহা যে ব্রহ্মের সৃষ্টি এবং ইহার সত্যতা আছে, তাহা বাদরায়ণ স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এই সূত্রের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

সত্য ও মিথ্যা

মীমাংসকদিগের মতে বেদের সকল অংশই (উপনিষদ-ও) কর্ম্মাঙ্গভূত, কর্ম্মের উপদেশ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র (১।১।৪) বলেন ব্রহ্মই সমগ্র বেদের প্রতি-পাদ্য। বেদান্ত-বাক্যসকলের তাৎপর্য্য-নির্ণয়-দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়। মীমাংসক বলেন ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু, তাঁহাকে ত্যাগ করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে উপদেশ অনর্থক। বেদান্ত বলেন ব্রহ্ম ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য না হইলেও তাঁহাকে আত্মারূপে অবগত হইলে সর্ব্বদুঃখের অত্যান্তিক নাশ হয়, এবং পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অজ্ঞান দূরীভূত হইলে মোক্ষরূপ ব্রহ্ম অধিগত হয়। কোন ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার ফল মোক্ষ অধিগত হয় না। আত্মজ্ঞানের ফল মোক্ষের প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় যে বস্তুজ্ঞান, তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানও বস্তুতন্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত কোনও কার্য্যের সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। শাস্ত্র ব্রহ্মকে ইদম্ বলিয়া প্রতিপাদন করেন না। ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা; তিনি জ্ঞানের বিষয় নহেন, ইহা প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্র অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞেয়, জ্ঞাতা জ্ঞান প্রভৃতি ভেদ অপসরণ করেন। শ্রুতি বলেন —"যস্য অমতং, তস্য মতং, মতং যস্য, ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্"—ব্রহ্ম যাহার নিকট অবিদিত তাহার নিকট বিদিত, আর যাহার নিকট বিদিত বলিয়া বিবেচিত, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না।

কারণ সমস্ত জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত (ফলাব্যাপ্য রূপে তাহাদের জ্ঞানের বিষয় হন না।) আর অজ্ঞানীর নিকট জ্ঞানের বিষয়রূপে ব্রহ্ম হন বিজ্ঞাত। শ্রুতিতে ইহাও আছে—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে এবং বিজ্ঞাতার (বুদ্ধিবৃত্তির) বিজ্ঞাতাকে (সাক্ষীকে) জানিতে পারিবে না। ব্রহ্মকে বিধিমুখে প্রতিপাদন করা যায় না বলিয়া তিনি শব্দ-জ্ঞানের অবিষয়। আবার নিষেধ মুখে তিনি নেতি, নেতি রূপে বিজাত হন বলিয়া তিনি শাস্ত্র-প্রমাণগম্য। তিনি "তৎ-ত্বম্ অসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি, এই প্রকার বৃত্তির বিষয় হন—সুতরাং তিনি শব্দ-জ্ঞানের অবিষয় নহেন।

যখন আমাদের ঘটজ্ঞান হয়, তখন আমাদের অন্তঃকরণ ঘটের আকার ধারণ করে। এই ঘটাকার বৃত্তিতে চিতের আভাস থাকে। অন্তঃকরণের এই বৃত্তি ঘটের অধিষ্ঠান। যে চৈতন্য তাহাতে বর্ত্তমান তাহা অজ্ঞানরূপ আবরণকে নাশ করে। ঘটাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত যে চিদাভাস, তাহাকে প্রমাণ-চৈতন্য বা "ফল" বলে। এই প্রমাণ-চৈতন্যই ঘটকে প্রকাশিত করে (অজ্ঞানাবরণ নাশের পরে)। প্রমাতৃ চৈতন্য ও ঘটাধিষ্ঠানভূত বিষয় চৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ প্রমাণ চৈতন্য ঘটকে প্রকাশিত করে। ইহাই ঘটের ফলব্যাপ্যতা। প্রমাতৃ চৈতন্যও বিষয় চৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তি-বশতঃ বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত ঘট প্রমাতৃ চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়। ইহার ফলে প্রমাতা ঘটকে জানিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানের সময় "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া মনের ব্রহ্মাকারা অখণ্ড বৃত্তি হয়। ব্রহ্ম এই বৃত্তির ব্যাপ্য। এই বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। কিন্তু অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু স্বয়ং অভিভূত হইয়া পড়ে ও ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইহার কারণ এই অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকার বৃত্তি কর্ত্তৃক ব্রহ্মনিষ্ঠ অবিদ্যার নাশ হইলে, সেই অবিদ্যার কার্য্যভূত সমস্ত প্রপঞ্চ ও তাহার অন্তর্গত উপরি-উক্ত ব্রহ্মাকারা বৃত্তি বিনষ্ট হয়। দর্পণ অপসারিত হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত মুখ যেমন সত্য মুখে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ উক্ত ফলরূপ চিদাভাসও ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, লবণের পুতুল লবণ সমুদ্রে মিলাইয়া যায়। অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস রূপ "ফল চৈতন্য" ঘটাদির ন্যায় ব্রহ্ম বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইহাই ব্রহ্মের ফলাব্যাপ্যতা। এইভাবে ফলব্যাপ্য নহেন বলিয়া ব্রহ্মকে শব্দ জ্ঞানের অবিষয় বলা হইয়াছে।*

---

* বেদান্তদর্শনম্। (উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত) (১৬৮-৯ পৃষ্ঠা)

ব্রহ্ম জ্ঞানই একমাত্র সত্যজ্ঞান। তাহা প্রকাশিত হইলে অন্য সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় অন্য জ্ঞান মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যা জ্ঞানেরও এক প্রকার সত্যতা আছে। ইহা ব্যবহারিক জ্ঞান। লোক ব্যবহারে ইহা সত্য। লোক ব্যবহারে যতটুকু সত্যতা, এই জ্ঞানের সত্যতা তাহার অধিক নহে। ব্রহ্মজ্ঞান পারমার্থিক। তাহার সত্যতা অনপেক্ষ, কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান যতক্ষণ অবিদ্যা থাকে, ততক্ষণই সত্য। অবিদ্যার নাশ হইলে এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রপঞ্চের সহিত এই জ্ঞানও বিনষ্ট হয়। রজ্জুতে সর্প জ্ঞান দূরীভূত হইলে যেমন বুঝিতে পারা যায় রজ্জুই সত্য, সর্প মিথ্যা, সর্প সেখানে কখনও ছিলনা, তাহার যে জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে যখন অবিদ্যা ও প্রপঞ্চের নাশ হয়, তখন চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণের অস্তিত্ব থাকিলে বুঝিতে পারা যাইত, যে প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান কখনই ছিল না। কিন্তু তখন অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়।

ব্যবহারিক জ্ঞানের আপেক্ষিক সত্যতার প্রমাণ বস্তুর সহিত তাহার সাদৃশ্য, ব্যবহারে তাহার কার্য্যকারিতা এবং অন্যান্য ব্যবহারিক জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য। কোনও বস্তু সত্য কিনা তাহা নির্ভর করে সেই বস্তুর উপর, আমাদের ধারণার উপর নহে। কোনও স্তম্ভকে স্তম্ভ অথবা মানুষ অথবা অন্য কিছু এইভাবে বর্ণনা করিলে তাহা সত্য হয় না। তাহা স্তম্ভ ইহাই সত্য। কেননা এই বর্ণনাই সেই বস্তুর স্বরূপের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত। সত্য ও মিথ্যা উভয়ই সংশ্লিষ্ট বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য বস্তু ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এবং ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে সমর্থ কোনও শব্দই নাই। সুতরাং আমাদের কোনও বর্ণনাই সম্পূর্ণ সত্য নহে।

যে জ্ঞান অন্য জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, অন্য জ্ঞানের সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে, তাহা সত্য (ব্যবহারিক)। কিন্তু বিশ্বের অতিসামান্য অংশই আমাদের পরিজ্ঞাত বলিয়া কোনও জ্ঞানকেই অবাধ বলিতে পারা যায় না। অন্য জ্ঞান-লাভের ফলে যে জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সে জ্ঞান সত্য নহে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, জাগরিত হইলে তাহার বাধা হয়, সুতরাং স্বপ্ন সত্য নহে। আবার ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা জাগ্রৎ কালের ব্যবহারিক জ্ঞান বাধিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক কোনও জ্ঞান নাই। এই পরম জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ থাকে না। ব্যবহারিক জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একত্ব অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। মনের গঠনের মধ্যে অবিদ্যার বীজ নিহিত।

জ্ঞান স্ব-প্রকাশ। অবিদ্যাকর্তৃক তাহার পূর্ণ প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানকালে চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ জ্ঞেয় বস্তুর রূপধারণ করে। ইহাই অন্তঃকরণের বৃত্তি। ইহার ফলে জ্ঞেয় বস্তু যখন প্রমাতৃ চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়, তখন সেই বস্তুর জ্ঞান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানেরও জ্ঞান হয়। বস্তুর জ্ঞান বস্তুর সহিত আপনাকে (জ্ঞানকে) প্রকাশিত করে। ইহা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোনওরূপ জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। তখন জ্ঞান জ্ঞানরূপে পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞানে অন্তঃকরণে-প্রতিবিম্বিত চিদাভাস ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। ব্রহ্মনিষ্ঠ অবিদ্যার নাশের ফলে তখন ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তির সহিত অবিদ্যাকৃত যাবতীয় প্রপঞ্চ বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান অন্তঃকরণে হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া অনুমান করা যায়।

জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিতে আছে 'কোনও বস্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহা প্রকাশ করে বলিয়াই তাহার জ্ঞান প্রামাণিক হয় না, অথবা তাহার বিপরীত রূপে প্রকাশ করিলে অপ্রামাণিক হয় না। কিন্তু যে জ্ঞান পরবর্তী কালে অসত্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না, তাহা প্রামাণিক, এবং যাহা পরিত্যক্ত হয়, তাহা অপ্রামাণিক। এই প্রামাণ্য কেবল শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানেরই থাকিতে পারে। অন্য কোন জ্ঞানের এই প্রামাণ্য নাই।"

ব্যবহারিক জ্ঞান

শঙ্কর বলেন, আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস এবং অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস অবিদ্যা। এই আত্মা ও অনাত্মার ইতরেতর অধ্যাসকে হেতু করিয়া যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার প্রবৃত্ত হইয়াছে। "আমি ও আমার" এইরূপ অভিমান যাহার নাই, সে জ্ঞাতা হইতে পারে না। সুতরাং তাহার পক্ষে প্রমাণসকলের প্রয়োজ্যতা নাই। দেহের সহিত প্রত্যক্ আত্মার ইতরেতর অধ্যাস ও ধর্ম্মের অধ্যাস না হইলে অসঙ্গ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হয় না। অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রমাণ ও শাস্ত্র সকল প্রবৃত্ত হয়। ব্যবহার-কালে পশু প্রভৃতির সহিত বিদ্বান ব্যক্তির কোনও প্রভেদ নাই। উদ্যতদণ্ড-হস্ত পুরুষকে নিজের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া পশুগণ পলায়ন করে এবং হরিত-তৃণ-হস্ত পুরুষকে দেখিয়া তাহার দিকে গমন করে। মানুষও উদ্যতখড়্গ পুরুষ দেখিয়া দূরে যায়, বিপরীতাবস্থ মানুষের নিকট গমন করে। বিবেকীই হউক অবিবেকীই হউক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার পশুগণের সমানই হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমাদের মানসিক ক্রিয়া আমাদের স্বার্থ

(interests) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং অন্তঃকরণ-কর্তৃক আমাদের চেতনা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে। আমাদের প্রয়োজনের সহিত দ্রব্যের যেসকল গুণের সম্বন্ধ তাহারাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে পড়িয়া থাকে। ফলে সংবিদের ক্ষেত্র নিতান্তই সংকীর্ণ। দ্রব্যের অসংখ্য সম্বন্ধের অল্পই আমাদের সংবিদে প্রতিফলিত হয়। সকল সম্বন্ধযুক্ত হইয়া কোনও বস্তুই সংবিদে প্রতিফলিত হয় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও সসীম বুদ্ধিদ্বারা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বের অধিকাংশই আমাদের জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বের যেরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহা যে বিশ্বের প্রকৃত রূপ তাহা বলিতে পারা যায় না। বিশ্বের যতটুকু আমরা জানিতে পারি, ততটুকুর সহিতই আমাদের জীবনের কারবার। সুতরাং পার্থিব জীবনের পক্ষে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে এবং তাহার মূল্যও আছে। এই জ্ঞানই ব্যবহারিক জ্ঞান। অধ্যাস বা অবিদ্যা জ্ঞানের ভিত্তি হইলেও এবং তাহা ত্রুটীপূর্ণ হইলেও, তাহা নিরর্থক ও মূল্যহীন নহে।

আমাদের সংবিদ (বিষয়ী) ও তাহার বিষয়ের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধই জ্ঞান। কিন্তু এই সম্বন্ধ অনন্যসাধারণ। অন্য কোনও সম্বন্ধের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। সংবিদ ও তাহার বিষয় একত্র বর্ত্তমান, এই পর্য্যন্ত বলা যায়, কিন্তু উভয়ের সম্বন্ধের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না।

চিন্তা বা মননদ্বারা বস্তুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। চৈতন্যই পরম সত্তা, তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্যই যাবতীয় জ্ঞানের চেষ্টা। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সতেরই প্রকাশ। কিন্তু সৎ কালাতীত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কালিক বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়না। জ্ঞানের কোনও সাধনই সৎকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না। সৎকে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা তাহাতে বিশেষণের আরোপ করি। যাহার আরোপ করি তাহা সৎ নহে। যাহা সৎ নহে, তাহা সতে আরোপ করি বলিয়াই তাহা অধ্যাস। আত্মা সৎ, তাহাতে আমরা ক্রিয়া, কর্তৃত্ব ও ভোর্ত্তৃত্বের আরোপ করি। 'অতস্মিন্ তদ্‌ব্রুদ্ধিঃ' —যাহা তাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া জানাই অধ্যাস। আমাদের যাবতীয় ব্যবহারিক জ্ঞান অধ্যস্তের জ্ঞান। রজ্জুতে সর্পের মত, শুক্তিতে রজতের মত, জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মে অধ্যস্ত। ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে ইহার বিলোপ হয়। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহার জ্ঞান মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানে

বিষয়-বিষয়ী ভেদ নাই। কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান বিষয়-বিষয়ীর ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানব-মনের গঠনই এইরূপ যে তাহা এক অখণ্ড বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে, এবং অসঙ্গ আত্মাকে বিষয়ী-বিষয়-সম্বন্ধ-যুক্তরূপে প্রকাশিত করে। মানব-মন ও তাহাতে প্রকাশিত যাবতীয় বিষয় সেই অখণ্ড অসঙ্গ আত্মাতে অধ্যস্ত। তাহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তাহারা প্রপঞ্চের অন্তর্গত; ব্রহ্মজ্ঞানে প্রপঞ্চ-বিলয়ের সময় তাহারা বিলুপ্ত হয়।

ব্যবহারিক জ্ঞানে যে জগৎ প্রকাশিত, তাহা প্রজ্ঞার নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ; তাহা কার্য্যকারণ-নিয়মের অধীন, দেশ ও কালে ব্যবস্থিত। কিন্তু এই জগতের তলদেশে যে অখণ্ড আত্মা বর্ত্তমান, তাহা অবিকারী, তাহাতে কার্য্য-কারণ ভেদ নাই, তাহা দেশ ও কালের অতীত। ব্যবহারিক প্রমাণ তাহাতে প্রযোজ্য নহে, ব্যবহারিক প্রমাণ দ্বারা তাহাকে জানা যায় না। কিন্তু আমরা তাঁহার চিন্তা করি, চিন্তার অভ্যস্ত উপায়ে। সেই পরম সত্তাকে—যাহাতে আমাদের জ্ঞানের যাবতীয় বিষয় অধ্যস্ত, তাঁহাকে পুরুষরূপে এবং সমগ্র বিশ্ব সেই পুরুষের জ্ঞানের বিষয়রূপে চিন্তা করি। এই পুরুষই ঈশ্বর। ঈশ্বর জ্ঞাতা ও জগৎ জ্ঞেয়। তাঁহার ও জগতের মধ্যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানও মানবীয় জ্ঞানের মতো আপেক্ষিক, জ্ঞাতা-ও-জ্ঞেয়-সম্বন্ধের অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিক। পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক।

ভ্রান্তি-জ্ঞান

ভ্রান্তিও একপ্রকার জ্ঞান, যাহা নয় তাহার বোধ। শঙ্কর জগতের জ্ঞানকে ভ্রান্তি বলিয়াছেন। মীমাংসকদিগের মতে সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানই সত্য। এই মত সত্য হইলে শঙ্করের মায়াবাদের কোনও ভিত্তিই থাকে না। মীমাংসকদিগের মতে শুক্তিতে যখন রজত-জ্ঞান হয়, তখন স্মৃতির সহিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান মিশ্রিত হয়, তাহা কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। স্মৃতিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভেদের বোধের অভাববশতঃই শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হয়। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, শুক্তিতে রজত-জ্ঞান— "ইহা রজত", এই জ্ঞান—একটি মাত্র জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত বস্তু (ইদম্) দ্বারা অতীতে প্রত্যক্ষীকৃত রজতের স্মৃতি যে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা সত্য। কিন্তু এই স্মৃতিজ্ঞান প্রত্যক্ষ শুক্তিজ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া একমাত্র জ্ঞানের উৎপাদন করে। তাহা যদি না হইত, যদি স্মৃতিজ্ঞান ও

প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাশাপাশি পৃথকভাবে থাকিত, তাহা হইলে দুইটি জ্ঞানের উৎপত্তি হইত—(১) আমি ইহা (শুক্তি) দেখিতেছি এবং (২) আমার রজতের স্মৃতি হইতেছে অথবা, (১) এই শুক্তি আছে, (২) ঐ রজত ছিল। কিন্তু "ইহা রজত" এই বাক্যে "ইহা"তে রজতত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং এখানে "ইদম্" এর সহিত রজতের অভিন্নত্বই উক্ত হয়। জ্ঞানে এই অভিন্নতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে রজ্জুতে যখন সর্পের জ্ঞান হয়, তখন দ্রষ্টা ভীত হইয়া পলায়ন করিত না। সুতরাং প্রত্যক্ষে যে ভ্রান্তি হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

নৈয়ায়িকদিগের মতে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের সময় পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতি এত বলবতী হয়, যে তাহা প্রত্যক্ষের মত স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের আকৃতি তখন তাহার প্রত্যয়দ্বারা মনের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। যাহা পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহাই মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সম্পূর্ণ অসৎ কোনও বস্তু মনের নিকট উপস্থিত হয় না। যাহা সম্পূর্ণ অসৎ তাহার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বর্ত্তমানে যে জগৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা সম্পুর্ণ ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, অন্ততঃ অতীতে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। জগতের অস্তিত্ব কখনই ছিল না, ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, যে বস্তু অন্য স্থানে অন্য সময়ে বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমান স্থলে ও বর্ত্তমান কালে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। স্মৃতিতে রক্ষিত রূপ যতই স্পষ্ট হউক না কেন, তাহা অতীতে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর রূপ, বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের যাহা বিষয় তাহার রূপ নহে। সুতরাং অতীতে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু যে বর্ত্তমানে মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ইহা অসম্ভব। স্মৃতিতে রক্ষিত "প্রত্যয়" একটি সত্য বস্তুকে তাহার স্থান ও কাল হইতে বিচ্যুত করিয়া ভিন্ন কাল ও স্থানে স্থাপন করিতে পারে, ইহা মনে করা অসম্ভব। নৈয়ায়িকদিগের মতে ইহা স্বীকৃত যে যাহা বর্ত্তমান কালে ও স্থানে বর্ত্তমান নাই, তাহা বর্ত্তমান কালে ও স্থানে প্রতিভাত হইতে পারে। বর্ত্তমান কালে ও স্থানে অবস্থিত বস্তুর (রজ্জুর) জ্ঞানের অভাব ইহার এক কারণ। এই দুই তথ্যের সমাবেশ করিয়া অদ্বৈতবাদী বলেন ভ্রান্তি জ্ঞানে অবিদ্যাকর্ত্তৃক বস্তুর (রজ্জুর) রূপ আবৃত হয় এবং তাহাতে অন্য বস্তুর ভাণ হয়। বস্তুর যে প্রতীতি হয় না, তাহার কারণ চক্ষুর দোষ, আলোকের অভাব প্রভৃতি হইতে পারে। পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত সাদৃশ্য এবং তাহার ফলে

স্মৃতির উদ্বোধন অন্য বস্তুর (সর্পের) ভাণ উৎপাদনে অবিদ্যার সহায়ক হয়। ভ্রান্তিতে যে ভাণ হয় তাহা ভাণ বা প্রতিভাস-রূপে বর্ত্তমান কালে ও স্থানে বর্ত্তমান থাকে। ইহা অবিদ্যার অস্থায়ী সৃষ্টি। এই সৃষ্টিকে অসৎ বলা যায় না, কেননা ইহা ক্ষণকালের জন্য হইলেও প্রতিভাত হয়। ইহার জ্ঞান হয়। যাহা একেবারেই অসৎ তাহার ভাণও হইতে পারে না। বন্ধ্যার পুত্রের মতো ইহা অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি। অদ্বৈতবাদীর এই মতকে বলে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদ। অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে অবস্থিত, তাহা আবৃত হয় অর্থাৎ তাহার প্রতীতি হয় না। দ্বিতীয়তঃ যাহা ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে অনুপস্থিত, তাহার প্রতীতি হয়। প্রথম ব্যাপারকে বলে আবরণ ও দ্বিতীয় ব্যাপারকে বলে বিক্ষেপ। এই আবরণ ও বিক্ষেপ অজ্ঞানের সৃষ্টি। এই অজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত। ইহার সৃষ্টি যেমন সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা নিজেও তেমনি সৎ নহে, অসৎও নহে। অবিদ্যা ও তাহার সৃষ্টি একটি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা, গূঢ় রহস্য। নৈয়ায়িকগণও ভ্রান্তি-জ্ঞানের মধ্যে এই রহস্য স্বীকার করেন। তাঁহারা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকে "অলৌকিক প্রত্যক্ষ" বলেন।

মায়া

জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহার ভাণ হয়। এই ভাণের কারণ অবিদ্যা। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। অথচ বহুবস্তুসমন্বিত জগতের ভাণ হয়। ইহার কারণ অবিদ্যার আবরণ-ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক সৎ-চিৎ-রূপ ব্রহ্ম আবৃত হন এবং বিক্ষেপ-ধর্ম্মবশতঃ অলীক জগতের প্রতীতি হয়। সাধারণ ভ্রান্তি-জ্ঞানে সত্য বস্তুর আবরণের সঙ্গে পূর্ব্ব-দৃষ্ট-কোনও বস্তুর ভাণ হয়। কিন্তু যখন জগৎ-ভ্রান্তি হয়, তখন পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু কোথায়? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি; বর্ত্তমান জগতের পূর্ব্বেও বহু জগতের উৎপত্তি ও বিলয় হইয়াছে এবং বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বেও অনাদি কাল হইতে আমরা জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিয়া আসিতেছি। সুতরাং বর্ত্তমান যে জগতের প্রতীতি হয়, তাহার মূলে পূর্ব্বজন্মে অনুভূত জগতের স্মৃতি বর্ত্তমান। "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"ই অধ্যাস। এই অধ্যাসই ভ্রান্তি-জ্ঞান। কিন্তু পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি যদি নাও থাকে, তথাপি এক বস্তুর স্থানে অন্য বস্তুর প্রতীতি প্রত্যেক ভ্রান্তি-জ্ঞানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা

প্রমাণিত হয়, যে যাহার বর্ত্তমান কালে সত্য অস্তিত্ব নাই, তাহার ভাণ হইতে পারে। সৎরূপে অসতের ভাণ প্রত্যেক ভ্রান্তি-জ্ঞানেই হয়।

কিন্তু অসতের এই ভাণ অবলম্বনশূন্য নহে বা বিজ্ঞান-মাত্র নহে। বৈনাশিক বৌদ্ধমতে জগতের ভাণের মূলে কোনও সৎবস্তু নাই। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু শঙ্কর এই প্রতীয়মান জগতের নিম্নে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

অদ্বৈতবাদী দ্বিবিধ অবিদ্যার কথা বলেন—মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদ্যা। যে অবিদ্যার দ্বারা জগৎ-ভ্রম উৎপন্ন হয় তাহা মূলাবিদ্যা, যাহা দ্বারা ক্ষণিক ভ্রান্তিজ্ঞান হয় (রজ্জুতে সর্প) তাহা তুলাবিদ্যা।

ভ্রান্তির কারণ যে অবিদ্যা, তাহাই মায়া। বিষয়ীর দিক হইতে তাহা অবিদ্যা, বিষয়ের দিক হইতে মায়া। মায়া শব্দ বেদে বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। "ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে", এখানে "অপ্রাকৃতশক্তি" অর্থে মায়াশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অসুরগণ মায়াবী অর্থাৎ ধূর্ত্ত ও প্রতারক। অন্যরূপ ধারণ করিবার শক্তি মায়া। প্রশ্নোপনিষদে (১।১৬) "তেষাম্ অসৌ বিরজঃ ব্রহ্মলোকঃ, ন যেষু জিহ্মং অনৃতং মায়া চ ইতি"—যাহাদের (কুটিলতা) মিথ্যা ও মায়া নাই, তাহাদেরই সেই ব্রহ্মলোক। এখানে মায়া শব্দ প্রবঞ্চনা অর্থে ব্যবহৃত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১০) প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে।

শঙ্কর ২।১।২৮ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—মায়াবী যেমন বিচিত্র হস্তী অশ্বাদির সৃষ্ট করে সেইরূপ এক ব্রহ্মে অনেকাকার সৃষ্টি হয়। মায়াবীর সৃষ্টি মিথ্যা, প্রবঞ্চনা। এই অনেকাকার সৃষ্টিও শঙ্করের এই উপমা অনুসারে ভেল্‌কী মাত্র, মিথ্যা, তাহার সত্য অস্তিত্ব নাই।

মারীচ যে মৃগরূপে রামসীতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মায়ামৃগ, সত্য মৃগ নহে, মৃগরূপে ভাণ। এই জগৎ মায়া, কেননা যুক্তিতে ইহার সত্যতা থাকে না। জগতের প্রতীতি হয়, সুতরাং বন্ধ্যাপুত্রের মতো ইহা একেবারে মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহা ভাণমাত্র, অনুভবমাত্র, তাহার অতিরিক্ত সত্যতা ইহার নাই। তাই জগৎ মায়া।

জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক কি, তাহা বুঝাইতেই মায়াবাদের উৎপত্তি। কিন্তু সম্বন্ধ দুইটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেই সম্ভব। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। জগতের মূল ব্রহ্মে নিহিত (ঊর্দ্ধমূলং অধঃশাখং অশ্বত্থং)। কিন্তু ব্রহ্ম জগতের সহিত

যেমন অভিন্ন, তেমনি অভিন্ন নহেন। জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, এইজন্য তাহা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। জগৎ, দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ। ব্রহ্ম তাহা নহেন বলিয়া তিনি জগতের সহিত অভিন্ন নহেন। জাগতিক যাবতীয় বস্তুর সমষ্টিও ব্রহ্ম নহে। জগৎ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করা যায় না। ব্রহ্ম সৎ, জগৎ তাহার ভাণ। একটি হইতে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সসীমের মধ্যেই অসীম বর্ত্তমান, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েন না, দৃষ্টির বাধাবশতঃ। আমাদের সসীম মন তাহার অভিজ্ঞতার জগৎকে অনপেক্ষ সৎ বলিয়া গণ্য করে, স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করে। তাই ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধের কথা ওঠে। অসঙ্গ পরমাত্মাকে যখন আমরা জানিতে পারি, তখন যাবতীয় সসীম রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই জগৎ মায়া। কিন্তু মায়া ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে।

সতের সহিত অসতের কোনও সম্বন্ধ হইতে পারে না। ন্যায় দর্শনে যে সকল পদার্থ স্বীকৃত, তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করা যায় না। জগতের যখন অনুভব হয়, তখন তাহার এক প্রকার অস্তিত্ব আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চরম সত্তার সহিত তাহার সম্বন্ধের বর্ণনা করা অসম্ভব। তাহা অনির্বচনীয়। শঙ্কর দেখাইয়াছেন এই সম্বন্ধের যত ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই সুসংগত হয় না। যদি ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা ও কারণ বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে কালে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কালাতীত। সামুৎপাদিক জগতের বাহিরে কারণত্বের আরোপ করা যায় না, কেন না সসীম বস্তুদিগের মধ্যেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের অস্তিত্ব সম্ভবপর। সেখানেই পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতার অবকাশ আছে। ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিলে, তাঁহার অসীমত্বের অপহ্নব হয়। সসীম ও কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ জগৎ কিরূপে অসীম ও অসঙ্গ ব্রহ্মের কার্য্য হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অসীম কিরূপে আপনার অসীমত্ব বর্জন করিয়া সসীমে অবস্থিত হইতে পারে, তাহা দুর্বোধ্য। বাস্তবিক জগতের উৎপত্তি অথবা অভিব্যক্তি নাই, কিন্তু আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে তাহা উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। জগৎ ব্রহ্ম হইতে "অনন্য" ও "অ-ব্যতিরিক্ত", ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম হইতে জগৎ কালে অভিব্যক্ত নহে। ব্রহ্ম জগতের আত্মা। জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র প্রতীত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে জগৎ যাহা বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা নহে। অসীমে কোনও ক্রিয়ার আরোপ করা যায় না, কেননা সকল ক্রিয়ারই উদ্দেশ্য

থাকে ; কিছু পাইবার জন্যই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। অসীমের অপ্রাপ্ত কিছুই নাই। সসীমের মাধ্যমে অসীম আপনাকে প্রকাশিত করেন, ইহাও বলা চলে না। কেননা অসীম তো সর্ব্বদাই সূর্য্যের মতো আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। কখনো যদি আমরা সূর্য্যকে দেখিতে না পাই, তাহা সূর্য্যের দোষ নহে। অসঙ্গ আত্মা ও তাহার প্রকাশের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। যদি বলা হয় ঈশ্বরের প্রকাশ সৃষ্টি ভিন্ন হয় না, তাহা হইলে সৃষ্টির বাহিরে তিনি নাই, ইহা বলিতে হয়। তিনি সমগ্র স্বরূপে বিশ্বে অনুস্যূত বলিতে হয়। ঈশ্বরের পরিণাম নাই। জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম হয়, তাহা হইলে সমগ্র ব্রহ্ম অথবা তাহার এক অংশ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে, এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যদি সমগ্র ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জগতের বাহিরে ব্রহ্ম নাই, বলিতে হয়। যদি ব্রহ্মের অংশ জগতে পরিণত হইয়াছে, বলা হয়, তাহা হইলে নিষ্কল নিরবয়ব ব্রহ্মের কলা (অংশ) স্বীকার করিতে হয়। যাহার অবয়ব আছে তাহা নিত্য হইতে পারে না। অসঙ্গ যদি জগদ্রূপে পরিণত হইয়া জগতের ক্রমবিকাশের দ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত হন, যদি জগতের অংশীভূত আমাদের কার্য্যদ্বারা অসঙ্গের বিকাশ-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার অসঙ্গত্ব থাকে না। বীজের সহিত বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ তাহা নহে। সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ অথবা মৃত্তিকার সহিত ঘটাদির যে সম্বন্ধ তাহাও নহে। কেননা এই সম্বন্ধের মধ্যে অবয়ব-অবয়বী এবং দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ সংযোগ নহে, সমবায়ও নহে। উভয়ই অংশহীন। জীব কি ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত অথবা ব্রহ্মই জীবে অবস্থিত ? যে ভাবেই ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধের কল্পনা করা হউক না কেন, শেষ মীমাংসা পাওয়া যায় না। অসীমের বক্ষে সসীম জগতের উদ্ভব কিরূপে হইল, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। মায়া শব্দ দ্বারা আমাদের জ্ঞানের এই অক্ষমতাই সূচিত হয়।

ব্রহ্মের উপর যদিও জগৎ নির্ভরশীল, তথাপি জগতের উদ্ভবদ্বারা ব্রহ্মে কোনও বিকার উৎপন্ন হয় না। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। অসঙ্গ ব্রহ্ম স্বরূপে অপ্রচ্যুত থাকিয়া দেশ কালাধীন জগৎ রূপ প্রতিভাত হন।

ব্রাড়লে তাঁহার Appearance and Reality গ্রন্থে লিখিয়াছেন "ভাণের (appearance) অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, আমরা জানিনা"। বিশ্ব কিরূপে এবং কেন আছে, এবং কেনই বা সসীম বস্তু তাহার মধ্যে আছে, তাহা

ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমগ্রের অংশ মানববুদ্ধির পক্ষে সমগ্রের জ্ঞান অসম্ভব।" ব্রাড্‌লের মতে এই বিশ্ব অসঙ্গের মধ্যে বর্ত্তমান—সমগ্র অভিজ্ঞতার সমষ্টিই অসঙ্গ। এই সমগ্র অভিজ্ঞতার মধ্যে কেন ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে অভিজ্ঞতার (Experience) উদ্ভব হয় এবং তাহা সসীম "ইদম্" রূপ ধারণ করে, তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না। গ্রীণ্ (Green) এক শাশ্বত সংবিদের (Consciousness) অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই সংবিদ কালাতীত এবং পূর্ণ। এই কালাতীত সংবিদের সহিত অপূর্ণ সসীম ও কালে অবস্থিত বহু সংবিদ বর্ত্তমান। কিন্তু এই উভয়বিধ সংবিদের মধ্যে সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এক অসীম পূর্ণ সংবিদ কেন আপনার অসংখ্য অপূর্ণ প্রতিরূপ সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা এবং সৎ কেন সতের স্বভাবাপন্ন, তাহা জিজ্ঞাসা করা একই কথা। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না।

মায়ার একাধিক ব্যাখ্যা আছে। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। সুতরাং মায়া ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কিছু হইতে পারে না। কিন্তু যে বিশ্বরূপে মায়া প্রকাশিত, তাহা চঞ্চল নিত্য ও পরিণামী। ব্রহ্ম স্থির অচঞ্চল, পরিণামবিহীন। সুতরাং ব্রহ্ম ও মায়াকে অভিন্নও বলা যায় না। ব্রহ্মের সত্তার মতো পূর্ণ সত্ত্বা জগতের নাই। তাহাতে সত্তার অভাব আছে, তাহা সত্তার সহিত অসত্তার সংযোগ—যাহা সৎ, তাহারই অসৎরূপে প্রকাশ। যে শক্তি অখণ্ড ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকাশিত করে, যে তত্ত্ব অনন্ত ব্রহ্মকে সান্ত রূপে প্রকাশিত করে, অপরিমেয়কে পরিমেয় (মা = মাপা), করে, রূপহীনে রূপ সৃষ্টি করে, তাহাই মায়া। এক নির্বিশেষ অবিভক্ত নিষ্কল ব্রহ্ম যে শক্তিদ্বারা বিবিধ খণ্ডিত বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট নামে প্রকাশিত হন তাহাই মায়া। মায়াকে ব্রহ্মের লক্ষণ (feature) বলা যায়। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ও নহে, তাহা হইতে ভিন্নও নহে। জগতে যে বিভেদ বা নানাত্ব দৃষ্ট হয় তাহার কারণ মায়া। যখন ব্রহ্মে মায়া যুক্ত হ'য়, তখন মায়া-যুক্ত ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন। তখন মায়াকে ঈশ্বরের "শক্তি" বলা হয়। মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অসীম ব্রহ্মের পার্শ্বে সসীম জগতের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার স্বীকার করিলেও তাহাদ্বারা ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করা হয়। এইজন্যই মায়াকে সৎ ও অসৎ উভয়ই বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ মায়াযুক্ত ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়াছেন। মায়া নিজে জগতের উপাদান নহে, ইহা দ্রব্য নহে, ব্যাপার মাত্র—উপাদান ব্রহ্মের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। মায়ার দুই ধর্ম্ম—আবরণ ও বিক্ষেপ, সত্যকে আবৃত

করা এবং তাহাকে মিথ্যারূপে প্রকাশ করা। আবরণ অভাবাত্মক, বিক্ষেপ ভাবাত্মক (মিথ্যা জ্ঞানের উৎপাদক)। অসঙ্গকে আমরা কেবল যে দেখিতে পাই না, তাহা নহে, তাহার স্থলে অন্য বস্তু প্রত্যক্ষ করি। মায়া হইতে বিবিধ নাম ও রূপের উদ্ভব হয়। সেই নাম রূপই জগৎ। ব্রাউনিং লিখিয়াছেন :

Some think creation is meant to show him forth,
I say it is meant to hide him all it car. *

কেহ কেহ বলেন তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) প্রকাশিত করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আমি বলি, যথাসাধ্য তাঁহাকে লুকাইয়া রাখাই তাহার উদ্দেশ্য।

মায়ার স্বরূপ অচিন্তনীয়। মায়া কাম ও সংকল্প-রূপে পরিণত হয়। মায়া ঈশ্বরের মতই সনাতন। উত্তাপ যেমন অগ্নিতে বর্ত্তমান, মায়াও তেমনি ঈশ্বরে বর্ত্তমান, তাহার অন্য স্থান নাই। "নিস্তত্ত্বা কার্য্য-গম্যা অস্য শক্তিঃ মায়া অগ্নিশক্তিবৎ (পঞ্চদশী)"! ইহার কার্য্য হইতে ইহার অনুমান হয়। মায়াই নামরূপ। অব্যক্ত অবস্থায় নামরূপ ঈশ্বরে বর্ত্তমান থাকে, ব্যক্ত অবস্থায় জগতের সৃষ্টি করে। মায়াই প্রকৃতি। (ঈশ্বরস্য মায়াশক্তি প্রকৃতিঃ—শঙ্কর ভাষ্য ২।১।২১) বীজের মধ্যে বৃক্ষের শক্যতার মতো মায়ার মধ্যে জগতের শক্যতা নিহিত। ইহার মধ্যে প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে ভিন্নও বলা যায় না, অভিন্নও বলা যায় না। প্রলয়েও ইহার অস্তিত্বের লোপ হয় না, যদিও তাহা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। এই প্রকৃতিই পুরাণে ঈশ্বরের স্ত্রীরূপে কল্পিত।

অদ্বৈত দর্শনে মায়াশব্দ যে সকল বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা এই :

(১) জগতের ব্যাখ্যার জন্য যে জগতের বাহিরে যাইতে হয় (world is not self-explanatory) ইহা হইতে ধারণা করা হয় জগৎ সমুৎপাদ বা প্রতিভাস (phenomenal)। মায়া শব্দ ইহা বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

(২) যাহা চরম সত্য তাহার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। মায়া শব্দদ্বারা এই দুর্ব্বোধ্যতা সূচিত হয়।

(৩) ব্রহ্মকে যখন জগতের কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তখন তাহার অর্থ এই যে জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত জগতের সংস্পর্শ নাই। এই অর্থে জগৎকে মায়া বলা হয়।

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের গ্রন্থে উদ্ধৃত।

(৪) ব্রহ্মের জগৎরূপে প্রতিভাত হওয়ার মূলে যে তত্ত্ব তাহা বুঝাইতে মায়া শব্দের ব্যবহার হয়।

(৫) ঈশ্বরের শক্তি অর্থে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(৬) ঈশ্বরের এই শক্তি উপাধিতে বা অবচ্ছেদে (অধ্যাকৃত প্রকৃতিতে) পরিণত হয়। তাহা হইতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি হয়। (ঈশ্বরস্য আত্মভূতে ইব অবিদ্যাকল্পিত নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম অনির্বচনীয়ে সংসার-প্রপঞ্চ-বীজভূতে...ঈশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিঃ ইতি চ শ্রুতি স্মৃত্যোঃ অভিলপ্যেতে (শঙ্কর ভাষ্য ২।১।১৪) *

অবিদ্যা

চক্ষুর দোষবশতঃ রজ্জু সর্পরূপে প্রতীত হয়। তেমনি বুদ্ধির দোষবশতঃ ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতীত হন। দৃষ্টিকালে যাহা চক্ষুতে পতিত হইয়া স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যে মস্তিকে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইতেছে স্নায়ুর স্পন্দন, অথচ তাহা দৃষ্ট হয় বিশিষ্ট বস্তু রূপে। শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে পতিত হইয়া যাহা মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয় তাহাও স্নায়ুর স্পন্দন, অথচ তাহা অনুভূত হয় শব্দরূপে। বস্তুর যাহা স্বরূপ তাহা হইতে ভিন্ন ভাবে প্রতীতিই অবিদ্যা। ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দোষের ফল। আমাদের বুদ্ধি এমন ভাবে গঠিত যে তাহা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ ভাবে সকল বস্তু দেখে। অনন্ত ব্রহ্ম সমগ্র ভাবে প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থিত হইলেও বুদ্ধি প্রত্যেক বস্তু দেশ ও কালে সীমিত দেখে, জগতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও সেই বস্তুকে নানাভাগে খণ্ডিত নানা বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করে। আমাদের বুদ্ধি যুক্তির (ন্যায়ের) নিয়মে চালিত। যতদিন বুদ্ধির বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া আমরা বোধিতে (Intuition) পৌঁছিতে না পারি, ততদিন সত্য দৃষ্টি লাভ হয় না। এই বুদ্ধির বেষ্টনীই অবিদ্যা। ডয়মন বলেন, আমাদের জ্ঞানের স্বাভাবিক আবরণই অবিদ্যা—দেশ ও কালের চস্‌মা ব্যতীত বস্তুদর্শনের অক্ষমতা। বোধি-লাভের ফলে যখন আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ দেখিতে পাই, তখন অবিদ্যার আবরণ বিদূরিত হয়। তখন অবিদ্যার আবরণে আচ্ছাদিত বস্তুসকলের রূপের পরিবর্ত্তন হয় ও জগৎ ব্রহ্ম-রূপে দৃষ্ট হয়। শুক্তিতে রজত-দৃষ্টির পরে শুক্তি যখন শুক্তিরূপে প্রতীত হয়, তখন দৃষ্ট রজতের সহিত শুক্তির সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। তাই রজতকে

---

* Indian Philosophy—Vol II. P. 574

মিথ্যা বলি। অবিদ্যা কেবল অভাবরূপ নহে। তাহার ভাবরূপও আছে। তাহা কেবল জ্ঞানের অভাব নহে। ভ্রান্ত জ্ঞান।

উপনিষদে বহু স্থলে অবিদ্যা শব্দ পাওয়া যায়। তাহার অর্থ জ্ঞানের অভাব। পরে উক্ত শব্দে নূতন অর্থ সংযোজিত হইয়াছে। মানব মনের সসীমত্ব হইতে উদ্ভূত যে চিন্তাপ্রণালী, যাহা ন্যায়ের বন্ধনে বদ্ধ (logical way of thinking) তাহাই শঙ্করের অবিদ্যা।* অবিদ্যা বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ নহে। অসৎ হইলে ইহা হইতে কিছুই উদ্ভূত হইতে পারিত না। ইহা যদি সৎ হইত, তাহা হইলে ইহা হইতে যাহা উদ্ভূত হয়, তাহাও সৎ হইত।

কিন্তু এই অবিদ্যার কারণ, ইহার উৎস কি? পার্থ-সারথি মিশ্র বলেন "এই অবিদ্যা কি ভ্রান্ত জ্ঞান অথবা অন্য কিছু, যাহাদ্বারা ভ্রান্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়? যদি অবিদ্যা ভ্রান্ত জ্ঞানমাত্র হয়, তাহা হইলে কাহার এই ভ্রান্ত জ্ঞান? ভ্রান্তজ্ঞান ব্রহ্মের হইতে পারে না। কেননা বিশুদ্ধ জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ। সূর্য্যের মধ্যে অন্ধকারের স্থান নাই। অবিদ্যা জীবাত্মার হইতে পারে না, কেননা জীবাত্মাগণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এই হেতু অবিদ্যার অস্তিত্ব যখন অসম্ভব, তখন তাহার কারণস্বরূপ দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বও অসম্ভব। অজ্ঞান অথবা তাহার কারণকে যদি ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু গণ্য করা যায়, তাহা হইলে অদ্বৈত থাকে না। ব্রহ্মের অবিদ্যা আসিল কোথা হইতে? ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্বই যে নাই। অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বভাব বলা যায় না। কেননা জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ"। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তাই অবিদ্যা অনির্বচনীয়।

ব্রহ্মের পার্শ্বে অবিদ্যা কিরূপে থাকিতে পারে, তাহা দুর্বোধ্য। ডয়সন বলিয়াছেন "এক ব্রহ্ম ব্যতীত প্রকৃত পক্ষে অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। যদি জগতে আমরা তাহার বিকার দেখিতে পাই এবং তাহাকে বিভিন্ন বস্তুতে বিভক্ত দেখি বলিয়া আমরা কল্পনা করি, তাহা হইলে তাহার কারণ অবিদ্যা। কিন্তু ইহা ঘটে কিরূপে? যেখানে ব্রহ্ম অবিকৃত ও অবিভক্ত, সেখানে আমরা যে বিকার ও বহুত্ব দেখি বলিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করি, ইহার সম্ভব হয় কিরূপে? এ সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্যা গ্রন্থকারগণ দেন নাই।" অবিদ্যার উদ্ভবের কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব।

বুদ্ধ ভবচক্রের বর্ণনায় যে দ্বাদশ নিদানের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের

* Indian Philosophy vol II—B 576

মধ্যে মূল নিদান অবিদ্যা, এই অবিদ্যাও ভ্রান্ত জ্ঞান। ইহা অনাদি হইলেও "আসব"দিগের উৎপত্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা আছে। আসব পঞ্চবিধ—কামাসব (ইন্দ্রিয়সুখের কামনা), ভাবাসব (অস্তিত্বের প্রতি আসক্তি), দৃষ্ট্যাসব (ভ্রান্তমত) ও অবিদ্যাসব (দুঃখের কারণ ও নাশ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব)। বেদান্তের অবিদ্যাও বুদ্ধের অবিদ্যা এক নহে।

মায়াবাদের যৌক্তিকতা

শঙ্কর কেবল শ্রুতিবচনদ্বারা স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। স্বাধীন যুক্তিদ্বারাও তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বিবর্ত্তবাদ নামে প্রসিদ্ধ। "অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইতি উদাহৃতঃ" (বেদান্তসার)। তত্ত্বের অন্যথা ভাব (পরিণাম) না হইয়া, অন্যরূপে বস্তুর যে ভাণ, তাহাই বিবর্ত্ত। পরিণামবাদেও (রামানুজ) জগৎরূপে ব্রহ্মের পরিণামদ্বারা তাঁহার অবিকারিত্বের অপহ্নব হয় নাই। কিন্তু পরিণামবাদে ব্রহ্মের পরিণাম যে জগৎ, তাহা মায়া নহে, সত্য। শঙ্করের মতে এই জগৎ প্রতীতিমাত্র, তাহার ভাণ হয় কিন্তু প্রকৃত অস্তিত্ব তাহার নাই। ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন, তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, অথচ ব্রহ্মাকে জগৎ বলিয়া ভাণ হয়। জগৎ তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়। "অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ"ই অধ্যাস। ঈশ্বর জগৎ নহেন, অথচ ঈশ্বরকে জগৎ বলিয়া প্রতীতি হয়। তত্ত্বপ্রদীপিকা, অদ্বৈত-সিদ্ধি, খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য প্রভৃতি গ্রন্থে এই তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বেদান্ত-মতে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। সুবর্ণের অলঙ্কারের মধ্যে সুবর্ণ ভিন্ন কিছুই পাওয়া যায় না। সুবর্ণই অলঙ্কারে পরিণত হয়। উপাদান কারণ হইতে কোনও কার্য্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না। সুতরাং কার্য্যকে উৎপন্ন নূতন বস্তু বলিয়া ধারণা করা যায় না। উপাদান কারণের মধ্যে কার্য্য তাহার তথাকথিত উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল। উপাদানের রূপের পরিবর্তন হয়। কিন্তু উপাদান হইতে স্বতন্ত্রভাবে রূপ থাকিতে পারে না। এই সৎকার্য্যবাদ সাংখ্যদর্শনেও স্বীকৃত। কিন্তু সাংখ্যমতে উপাদান কার্য্যে পরিণত হয়, এই পরিণাম সত্য। বেদান্তে কার্য্য যখন উপাদানের নূতন রূপ গ্রহণমাত্র, তখন এই রূপ আসে কোথা হইতে এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যখন অসতের ভাব হইতে পারে না, তখন উপাদান যে রূপ ধারণ করিয়া কার্য্যরূপে

গণ্য হয়, সেই রূপেরও পূর্ব্ব অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। রূপ উপাদানেরই একটি অবস্থা। যখন রূপের পরিবর্ত্তন হয়, তখন দ্রব্যের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। বিভিন্ন রূপের মধ্যে দ্রব্য অপরিবর্ত্তিত থাকে। দেবদত্ত বসিয়াই থাকুক, শুইয়া থাকুক অথবা দাঁড়াইয়া থাকুক, সে একই ব্যক্তি (শঙ্কর—২।১।১৮)। বস্তু ও তাহার রূপ (অথবা গুণ) যদি ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের উদ্‌ভব কিরূপে হয়, তাহা কল্পনা করা অসম্ভব হইত। বস্তু ও গুণের মধ্যে সংযোগ-বিধানের জন্য তৃতীয় এক বস্তুর কল্পনা করিতে হইত। কিন্তু এই তৃতীয় বস্তুর সহিতই বা বস্তুর সংযোগ কিরূপে হয়? তাহার জন্য চতুর্থ এক বস্তু কল্পনা করিতে হয়। এইরূপে অনবস্থায় উদ্‌ভব হয়। সুতরাং বস্তু ও তাহার রূপ যে ভিন্ন নয়, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তিতে কারণের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, কেননা উপাদান ও তাহার রূপ ভিন্ন নহে। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই কারণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু কারণে যখন কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, তখন প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ত্তনের (বা পরিণামের) কোনও অস্তিত্বই নাই বলিতে হয়। পরিবর্ত্তনের অনুভব হয় সত্য, কিন্তু তাহাকে সত্য বলা যায় না। অনুভূতির বাহিরে রামধনু, নীলাকাশ এবং সূর্য্যের গতির অস্তিত্ব যে নাই, তাহা আমরা যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারি। যাহার অনুভূতি হয়, অথচ সত্য অস্তিত্ব নাই, তাহাকে প্রতিভাস বলে। যাবতীয় পরিণামই প্রতিভাসমাত্র—তাহা অসৎ। তাহা বিবর্ত্ত, তাহা দ্বারা বস্তুর স্বরূপের অন্যথা হয় না, কিন্তু বস্তু অন্যরূপে প্রতীত হয়। জগৎ এই অর্থে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। আমরা জগতে যে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহা আমাদের মনের ভাব মাত্র, সেই ভাব আমরা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে আরোপ করি। এই মিথ্যার আরোপই অধ্যাস। ইহা আমাদের অজ্ঞানের ফল। এই অজ্ঞানবশতঃ যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহার অনুভব হয়। এই অজ্ঞানই অবিদ্যা বা মায়া।

জগতে সকল বস্তুই বিকারী। অঙ্গুরী স্বর্ণের বিকার, স্বর্ণ অন্য বস্তুর বিকার। বিকারের যাহা অধিষ্ঠান, তাহা দ্রব্য। মৃত্তিকা, স্বর্ণ প্রভৃতি যাহা পরিণামের অধিষ্ঠানরূপে প্রতীত হয়, তাহাও অন্য বস্তুর পরিণাম এবং প্রতিভাসমাত্র। এই সকল বিকার বা প্রতিভাসের মূলে এমন কি কিছু আছে, যাহা এই সকল বিকার বা প্রতিভাসের অধিষ্ঠান? শঙ্কর বলেন—"সত্তা"ই সেই বস্তু। তাহা সকল বস্তুতেই বর্ত্তমান। এই সত্তাই যাবতীয় বিকারের তলদেশে অপরিবর্ত্তিত

থাকে। সকল বস্তুই এই সত্তারই প্রতিভাস। বিশুদ্ধ সত্তাই বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রতীত হয়। সকল বস্তুর জ্ঞানে এই সত্তাই প্রকাশিত হয়। সত্তাই যাবতীয় বস্তুর উপাদান কারণ। এই সত্তা হইতেই যাবতীয় "ভূত" উৎপন্ন হয়, সত্তা-দ্বারা জীবিত থাকে, এবং সত্তাতে লীন হয়। "সত্তা" যেমন বহির্জগতে সর্ব্ববস্তু-সাধারণ, তেমনি মনোজগতের সকল ভাবেই বর্ত্তমান। প্রত্যেক প্রত্যয়ের অস্তিত্ব আছে। যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, এরূপ বস্তুর প্রত্যয়েরও অস্তিত্ব আছে। বাহ্য ও আন্তর জগতের সকল অবস্থারই অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সত্তাই যাবতীয় বস্তুর উপাদান কারণ। বহু রূপে প্রতিভাত হইলেও এই সত্তার কোনও রূপ নাই। বহু অংশে বিভাজ্যরূপে প্রতীত হইয়াও সত্তা নিষ্কল। এই নির্বিশেষ সত্তাই জগতের সার বা উপাদান।

এই অসঙ্গ সত্তা, যাহার রূপ নাই, যাহা নিরংশক, অথচ যাহা সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা কি জড় বা চেতন? বাহ্য বস্তু আমাদের নিকট অচেতন এবং মানসিক অবস্থা চেতনরূপে প্রতীত হয়। মানসিক অবস্থাকে চেতন বলি, তাহার কারণ তাহা আপনা হইতে প্রকাশিত হয়; কিন্তু যখন বাহ্য বস্তুর অনুভব হয়, তখন তাহাও তো প্রকাশিত হয়। বাহ্য বস্তুর মধ্যে যদি চৈতন্য না থাকে তাহা হইলে তাহা প্রকাশিত হয় কিরূপে? ভাণ যেমন মানসিক অবস্থার আছে তেমনি বাহ্য বস্তুরও আছে। সুতরাং সত্তা, যাহা বাহ্য ও আন্তর উভয় জগৎ-সাধারণ, তাহাও যে চৈতন্যবান, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যাহার সত্তা নাই, যাহা অসৎ (যেমন বন্ধ্যাপুত্র) তাহার প্রতিভাত হইবার ক্ষমতাও নাই।

কিন্তু স্বয়ং-প্রকশ্যতা যদি চৈতন্যের লক্ষণ হয়, এবং সত্তা যদি চেতন পদার্থ হয়, তাহা হইলে যাবতীয় সত্তাবান্ বস্তুই প্রকাশিত, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু এমন বস্তুর অস্তিত্বও তো আছে, যাহা প্রকাশিত নহে। ইহার কারণ প্রকাশের বাধা। মেঘ দ্বারা আবৃত সূর্য্য যেমন প্রকাশিত হয় না, তেমনি প্রকাশের বাধা থাকায় অনেক বস্তু প্রকাশিত হইতে পারে না। স্মৃতিতে বাধা উৎপন্ন হয় বলিয়া স্মৃতির বিষয় সকল সময় স্মৃতিতে উদিত হয় না। বাধা বিদূরিত হইলে, এই সকল বিষয় স্মৃতিতে উদিত হয়। আবার ভাণ হইতেছে, অথচ প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, এমন বিষয়ও আছে। সুতরাং প্রকাশের সামর্থ্য ও সত্তা সমব্যাপী বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, যে ভাণের বস্তু নাই, তাহারও তলদেশে সত্তা আছে। যাবতীয় সত্তার সহিত তাহার বোধ সংশ্লিষ্ট। মৃত্তিকা কাহারো সম্মুখে উপস্থিত

হইলে মৃৎবুদ্ধি হয়। মৃত্তিকা ঘটে পরিণত হইলে ঘটবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। কাল্পনিক বস্তু কল্পনামাত্র। বাহিরে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও প্রত্যয়রূপে তাহার সত্তা আছে। বস্তুত্বহীন ভাণেরও প্রত্যয়রূপে অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সত্তার সহিত জ্ঞান নিত্য সংশ্লিষ্ট।

আমাদের সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্তার প্রকাশ হইলেও প্রকাশের রূপ বিভিন্ন। অনেক সময় অভিজ্ঞতার এক রূপ অন্যরূপ দ্বারা বাধিত হয়। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা জাগরিত অভিজ্ঞতা দ্বারা, ভ্রান্ত প্রতীতি (Illusion) সত্য প্রতীতি দ্বারা বাধিত হয়। কিন্তু সকল অভিজ্ঞতার বিষয়ের মধ্যেই সত্তা বর্ত্তমান। অভিজ্ঞতার একরূপ রূপান্তর দ্বারা বাধিত হইলেও সত্তা কখনও বাধিত হয় না। সত্য, মিথ্যা সকল অনুভবের মধ্যেই সত্তা বর্ত্তমান। যখন রজ্জুতে সর্পের মিথ্যা জ্ঞান হয়, তখন সেখানে "সত্তা" মিথ্যা হয় না, শুধু তাহার সর্পরূপটিই মিথ্যা। স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা মিথ্যা হইলেও সেই স্বপ্নের অনুভূতি যে হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা হয় না। সেই অনুভূতির "সত্তা" অবাধিত থাকে। সুতরাং সত্তা ও চিন্তা (Thought) সমব্যাপী। এই সার্বিক সত্তা বা চৈতন্যের কখনও বাধা হইতে পারে না, কেননা ইহা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ইহার বাধার কল্পনা করাও অসম্ভব। ইহাই, এই সার্বিক সত্তা-চৈতন্যই (সৎ-চিৎ) পারমার্থিক সত্তা। এইরূপে উপনিষদের সৎ ও চিৎরূপী ব্রহ্মকে শঙ্কর যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সার্বিক পারমার্থিক সত্তা কোন কালেই বাধিত হয় না। যদ্বিষয় বুদ্ধির ব্যভিচার নাই, তাহা সৎ, যদ্বিষয় বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা অসৎ। ঘট বিনষ্ট হয়, সুতরাং ঘট অসৎ। জাগতিক যাবতীয় বস্তু দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহারা অসৎ। কিন্তু ইহাদের মধ্যগত সত্তা বিনাশ হীন। সত্তার বিভিন্ন রূপই জগৎ ও তাহার মধ্যস্থ সকল বস্তু। এইসকল রূপই অসৎ। কিন্তু যে সত্তার তাহারা বিভিন্নরূপ তাহার উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই। তাহাই পরম সত্য। তাহার কখনও বাধা হয়না।

ভগবদ্গীতায় ২।১৬ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন "অসতের ভাব অর্থাৎ ভবন বা অস্তিতা নাই। শীত, উষ্ণ প্রভৃতি সকারণ বস্তুর অস্তিতা নাই, কেননা তাহারা বিকার। বিকারের ব্যভিচার হয়। ঘটআদি চক্ষুগ্রাহ্য বস্তু, তাহার কারণ মৃত্তিকার রূপেই উপলব্ধ হয়। মৃত্তিবাবর্জিত তাহার উপলব্ধি হয় না। সেইরূপ কোন বিকারই কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না, এইজন্য সকল বিকারই অসৎ। ঘটাদি কার্য্যের কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না। এই

জন্য তাহারা অসৎ। কিন্তু সেইজন্য সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গ হয় না। অর্থাৎ কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, ইহা বলা যায় না। কেননা সর্ব্বত্রই দুইটি বুদ্ধির (বোধ=জ্ঞান) উপলব্ধি হয়—সৎ বুদ্ধি (অস্তিতার জ্ঞান) ও অসৎ বুদ্ধি (অস্তিত্ব হীনতার জ্ঞান)। যাহার বোধের ব্যভিচার নাই, তাহা সৎ, যাহার বোধের ব্যভিচার হয়, তাহা অসৎ। জ্ঞানে সৎ ও অসৎ—এই দুই বিভাগ আছে বলিয়া, সকলেরই এই দুই জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, সমানাধিকরণ জন্য (দুই বোধের অধিকরণ এক বলিয়া)। ঘট, পট, হস্তী প্রভৃতিতে ঘট, পট, হস্তী ইত্যাদি বোধের ব্যভিচার হয়, কিন্তু সৎ বুদ্ধি অর্থাৎ সত্তার বোধের ব্যভিচার হয় না। সুতরাং ঘটাদি জ্ঞানের বিষয় অসৎ, কিন্তু সত্তা জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহা সৎ। ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সত্তার বোধেরও ব্যভিচার হয় ইহা বলা যায় না, কেননা ঘটের অবর্ত্তমানে পটাদিতে তাহার উপলব্ধি হয়। "সদ্‌বুদ্ধি বিশেষণ-বিষয়া" এই জন্যও তাহার নাশ হয় না। এক ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ঘটবুদ্ধি দেখা যায়, সুতরাং ঘটবুদ্ধিকে অসৎ বলিবে কেন? ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্যত্র সত্তা বোধ হয় বলিয়াই তো সত্তাকে সৎ বলা হয়। ঘটবুদ্ধি যখন এক ঘটের বিনাশের পরে অন্য ঘটে হয়, তখন তাহাকে সৎ বলিবে না কেন? উহার উত্তর—ঘটবুদ্ধি পটাদিতে হয় না। সত্তার অনুভব প্রত্যেক বস্তুতে হয়—উহা নানা নহে, একই সত্তা সকল বস্তুতে অনুভূত হয়। এই জন্যই উহা নিত্য বা সত্য।

ঈশ্বর

ব্রহ্মসূত্রের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২), এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর লিখিয়াছেন "অস্য জগতঃ নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য, অনেক-কর্তৃ-ভোক্তৃ-সংযুক্তস্য, প্রতিনিয়ত-দেশ-কাল-নিমিত্ত-ক্রিয়া-ফলাশ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত-রচনা-রূপস্য জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি, তৎ ব্রহ্ম"। অর্থাৎ নামরূপে ব্যাকৃত, অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তার সহিত সংযুক্ত, ব্যবস্থিত দেশ, কাল, নিমিত্ত, ক্রিয়া ও ফলের আশ্রয়, অচিন্ত্য রচনা-কৌশল এই যে জগৎ, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ হইতে হয়, তাহাই ব্রহ্ম। কিন্তু এখানে ব্রহ্মের যে লক্ষণের বর্ণনা শঙ্কর করিয়াছেন (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তৃত্ব) তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ নহে, তটস্থ লক্ষণ। কিন্তু জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত ও মায়িক। যাহার পারমার্থিক সত্তা নাই, তাহার স্রষ্টৃত্ব, পালনকর্ত্তৃত্ব ও সংহর্ত্তৃত্বও মায়িক—এই মীমাংসা

অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। জগতের অস্তিত্ব যেমন ব্যবহারিক, ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতিও তেমনি ব্যবহারিক। ব্রহ্ম নির্গুণ ও একমাত্র পারমার্থিক সত্য।

ব্রহ্মের দুইরূপ—নির্গুণ ও স-গুণ, নিরুপাধি ও সোপাধিক, নির্বিশেষ ও সবিশেষ। ব্রহ্মকে সত্যং জ্ঞানং, অনন্তং এবং সৎ, চিৎ, আনন্দ বলিয়া শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টিকার্য্য তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য "মায়া" ও "অবিদ্যার" কল্পনা। এই জগৎ নির্গুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি নহে, (মায়া-উপহিত, মায়া-উপাধিযুক্ত) ব্রহ্মের সৃষ্টি। মায়া-উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই মায়া বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতি। ত্রিগুণা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব যখন প্রধান হয়, তখন তাহা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা। আর অবিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যা—ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। ব্রহ্ম যখন অবিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হন, তখন তিনি জীব। মায়া যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মের উপাধি হয়, তাহা হইলে দ্বৈত স্বীকৃত হইয়া পড়ে। তাই মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয় নাই। তাহাকে অনির্ব্বচনীয় বলা হইয়াছে। সৎ অথবা অসৎ ইহাকে কিছুই বলা যায় না। এবংবিধ মায়াগত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই ঈশ্বর। আর অবিদ্যা-গত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীব। মায়ার আবরণশক্তির ফলে ব্রহ্ম-চৈতন্য আবৃত হন, তাঁহাকে দেখা যায় না; বিক্ষেপ-শক্তির ফলে জীব ও জড় জগতের আবির্ভাব হয়। মায়ার আবরণ-শক্তির আধিক্য হইলে তাহাকেই অবিদ্যা বলে, তাহাতেই পতিত ব্রহ্ম-চৈতন্য জীব। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান জীবের উপাধি, ঈশ্বরের নহে। জীব আপনাকে অজ্ঞ বলিয়া জানে। ঈশ্বরের সঙ্গে অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, মায়াধীশ। ব্রহ্ম অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহার উপাসনার জন্য যে ঈশ্বর কল্পিত, তাহা নহে। মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে, কেননা মায়াকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না—তাহা অনির্বচনীয়। সেই জন্য কিরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন, তাহা অচিন্ত্য হইলেও ঈশ্বরকে অসৎ বলা যায় না। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে চিৎপ্রতিবিম্ব। যাঁহার প্রতিবিম্ব তিনি বিম্ব। মায়া ও অবিদ্যায় (বা অন্তঃকরণে) যাঁহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই বিম্ব ব্রহ্ম। তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য, উপাধিদ্বারা তিনি অবচ্ছিন্ন হন না।

চৈতন্য চতুর্বিধ বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন—জীব, কূটস্থ, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে একই, তাহাতে ভেদ নাই। এই সকল ভেদ ঔপাধিক বা ব্যবহারিক। একই আকাশ যেমন উপাধি ভেদে ঘটাকাশ, জলাকাশ, মেঘাকাশ ও মহাকাশ নামে পরিগণিত হয়, তেমনিই একই চৈতন্য উপাধি-ভেদে চতুর্বিধ প্রতীত হয়। সমস্ত জগৎই ব্রহ্মে কল্পিত। জীবের স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরও চৈতন্যেই কল্পিত। চৈতন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠান। এইজন্য চৈতন্য উক্ত শরীরদ্বয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন। এই শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাম কূটস্থ। ইহা নির্বিকার, এই জন্য কূটস্থ। সূক্ষ্ম শরীর কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত বলিয়া তাহার অন্তর্গত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণও কূটস্থে কল্পিত। এই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব—চিদাভাস। চিদাভাস সংসারী, কিন্তু কূটস্থ চৈতন্য নির্বিকার। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মে মায়া আশ্রিত। ব্রহ্মাশ্রিত মায়ায় জগৎ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। জগতের অন্তর্গত যাবতীয় প্রাণীর বুদ্ধিও সূক্ষ্মরূপে মায়ায় অবস্থিত। এই মায়ায় অবস্থিত সূক্ষ্মবুদ্ধিকে বুদ্ধিবাসনা বা ধী-বাসনা বলে। সকল প্রাণীর বুদ্ধি-বাসনাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। বুদ্ধির বিষয় হইতেছে যাবতীয় বস্তু। সকল প্রাণীর সমস্ত বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি-বাসনা (যাহা মায়ায় অবস্থিত) ঈশ্বরের উপাধি। এইজন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্ব্বকর্ত্তা। *

ঘটের মধ্যে জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ দ্বারা ঘটাকাশ যেরূপ তিরোহিত হয়, কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত জীবদ্বারা কূটস্থ সেইরূপ তিরোহিত হয়—প্রতিভাত হয় না। জীব ও তাহার অধিষ্ঠান কূটস্থের অবিবেককে মূল অবিদ্যা বলে।

বেদান্ত-মতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং জগতে অচেতন কিছু নাই। চৈতন্য সর্ব্ববস্তুতে থাকিলেও যাহাতে বুদ্ধিগত চিদাভাস আছে তাহাকে চেতন ও যাহাতে তাহা নাই, তাহাকে অচেতন বলা হয়। প্রাণীদিগের চিদাভাস আছে বলিয়া তাহারা চেতন, জড়-পদার্থে নাই বলিয়া তাহা অচেতন। অন্তঃকরণাদি মায়ার কার্য্য। মায়া ও তাহার কার্য্যাদি পরমাত্মা বা ব্রহ্মের উপাধি। কিন্তু তাহাদ্বারা ব্রহ্ম অবচ্ছিন্ন নহেন। সর্ব্ব-উপাধি-বর্জিত পরমাত্মা বা ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য। মায়া-উপাধিযুক্ত পরমাত্মা ঈশ্বর। যাবতীয় সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত এবং যাবতীয় স্থূল শরীরসমষ্টিরূপ উপাধিযুক্ত পরমাত্মা বিরাট বা বিরাট পুরুষ।

* ফেলোসিপের লেকচার; ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, চতুর্থ পর্ব্ব—৬৭ পৃষ্ঠা।

লিঙ্গদেহ অধ্যস্ত হয় কুটস্থ চৈতন্যে। লিঙ্গদেহে বর্তমান অন্তঃকরণে চিদাভাস বা চিৎ-প্রতিবিম্ব পতিত হয়। কূটস্থ চৈতন্য, লিঙ্গদেহ ও চিদাভাস মিলিত হইয়া জীব।

"বিবরণ"-গ্রন্থ অনুসারে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই প্রতিবিম্ব নহেন। জীব প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর বিম্ব। অজ্ঞানগত চিৎ-প্রতিবিম্ব জীব। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই প্রতিবিম্ব হইলে ভিন্ন ভিন্ন উপাধির প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাহারও মতে অজ্ঞানগত চিৎ-প্রতিবিম্ব ঈশ্বর। অন্তঃকরণগত চিৎ-প্রতিবিম্ব জীব। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মায়াতে (বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিতে) প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি বা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম জীব। কোনও কোনও প্রাচীন আচার্য্যের মতে প্রতিবিম্ব ও বিম্বের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। বিম্ব যেরূপ সত্য, প্রতিবিম্বও তেমনি। প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে। প্রতিবিম্ব সত্য বলিয়া মুক্তিতেও জীবের অস্তিত্বের নাশ হয় না। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অভিন্নত্ব-প্রমাণের জন্য বলা যাইতে পারে, বিম্ব কখনও চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে না, তাহাতে পতিত আলোক প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুতে পতিত হইলে বিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিবিম্বের বেলাতেও সেই বিম্ব হইতে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মিই স্বচ্ছ পদার্থকর্তৃক প্রতিহত হইয়া যখন চক্ষুতে পতিত হয়, তখন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। একই আলোক-রশ্মি বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ের দৃষ্টিজ্ঞানের কারণ। যাহারা প্রতিবিম্বকে সত্য বলেন, তাহারা বলেন, প্রতিবিম্ব মিথ্যা হইলে জীব মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, মুক্তি মিথ্যা হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন ইহাই তো বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। গৌড়পাদ বলেন—

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্নবদ্ধো নচ সাধকঃ
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।

নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বদ্ধ নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই, মুক্তিও নাই। ইহাই পরমার্থতা। কিন্তু প্রতিবিম্বের সত্যতাবাদিগণ বলেন—প্রতিবিম্ব যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন হয় না; যদি ব্রহ্ম হয় সত্য ও জীব হয় মিথ্যা, তাহা হইলে উভয়ে অভিন্ন হইবে কিরূপে। সত্য ও মিথ্য কখন ও অভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, চিতের প্রতিবিম্বই হইতে পারে না। প্রতিবিম্ব হয় দ্রব্যের। যাহার ক্রিয়া ও গুণ আছে এবং যাহা সমবায়ী কারণ, তাহা দ্রব্য, ইহাই কণাদের মত। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও নিগুণ, তিনি সমবায়ী কারণ হইতে

পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব। ইহার উত্তরে বলা হয়, দ্রব্য না হইলেও প্রতিবিম্ব হইতে পারে, যেমন প্রতিধ্বনি। শব্দ দ্রব্য নহে, কিন্তু তাহার প্রতিধ্বনিই তাহার প্রতিবিম্ব। সে যাহা হউক বৈশেষিক দর্শনে আত্মা দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত এবং ব্রহ্ম পরমাত্মা।

শঙ্কর বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—অবিকৃত ব্রহ্ম স্বীয় অবিদ্যাদ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় বিদ্যাদ্বারা মুক্ত হন। ঈশ্বরের সহিত সমস্ত প্রপঞ্চ জীবদ্বারাই কল্পিত হয়।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত উপরে বর্ণিত হইল। জগৎ-স্রষ্টৃত্ব ব্রহ্মের তটস্থ অর্থাৎ আগন্তুক লক্ষণ। জগৎ-সম্বন্ধ-বর্জিত ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে নিত্য বর্তমান। কিন্তু সৃষ্টি-প্রবাহ যখন অনাদি, তখন জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধও অনাদি। সুতরাং অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম জগৎ-স্রষ্টা। কিন্তু সৃষ্টি-প্রবাহ ও ব্রহ্মের জগৎ-স্রষ্টৃত্ব মায়াকল্পিত। মায়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টারূপে প্রতিভাত হন। জগতের মধ্যে জীব ও জগৎ উভয়ই বর্তমান। ভাণ কেবল জীবের নিকটই হইতে পারে। জীবের নিজের অস্তিত্বের ভাণও হয় জীবেরই নিকট। জীব ও জড়ের ভাণ ব্রহ্মের নিকট হয় না। শঙ্কর বলেন ঈশ্বর ও জড় জগৎ জীবেরই কল্পিত অর্থাৎ উভয়ই জীবকর্তৃক ব্রহ্মে অধ্যস্ত।

নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের অতীত। মায়াতে তাঁহার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই ঈশ্বর। কিন্তু দ্রষ্টা না থাকিলে প্রতিবিম্ব হয় না। এই প্রতিবিম্ব দর্শন করে জীব, ব্রহ্ম করেন না। মায়ার মধ্যে জীব ব্রহ্মের যে রূপ দর্শন করে, তাহাই ঈশ্বর। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব। এই প্রতিবিম্ব অচেতন নহে, চেতন। প্রকৃতপক্ষে এই তথাকথিত প্রতিবিম্ব ব্রহ্মই। অবিদ্যারূপ এক অচিন্ত্য পদার্থকর্তৃক অনন্ত জ্ঞানময় ব্রহ্ম নিজে অবিকৃত থাকিয়াও বহুসংখ্যক সসীম জীবে পরিণত হন। ব্রহ্ম অবিকারী, সুতরাং তিনি জীবে পরিণত হন বলা যায় না। জীবের উদ্ভব হয় বলিতে পারা যায়। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ কেবল জ্ঞানের পরিমাণের ভেদ। জীব সসীম বলিয়া তাহার সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই অসম্পূর্ণ, ব্রহ্মের জ্ঞান পূর্ণ। যখন অবিদ্যা অপগত হয়, তখন জীবের জ্ঞান প্রসারিত হয়, তখন তাহার জ্ঞান ও ব্রহ্মের জ্ঞানের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না, জীব তখন ব্রহ্ম হয়।

ব্রহ্মকে সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ

প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা ব্রহ্ম নির্গুণ কিন্তু 'সৎ' ও 'চিৎ' ও 'আনন্দ' শব্দত্রয় গুণবাচক। জাগতিক সমস্ত বস্তুই সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণাত্মক। ব্রহ্ম তাহা নহেন, এই অর্থেই ব্রহ্ম নির্গুণ। আমাদের পরিচিত কোনও গুণই তাঁহাতে নাই। তিনি ত্রিগুণাতীত—ত্রিগুণ জগতের অতীত (transcendent)।

উপরি বর্ণিত প্রতিবিম্ববাদকে সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রতিবিম্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-বর্জিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কি তাহা বোধগম্য হয় না। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন মায়া-উপহিত বলিয়া গৃহীত হন, তখন তিনি সগুন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ঈশ্বরের সদৃশ (made after his image) রূপে কল্পিত পুরুষ জীব ; কিন্তু এই কল্পনা কাহার ? *

উপনিষদে ব্রহ্মে ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বীকৃত। ব্রহ্মসূত্রে জগৎ-সৃষ্টিকে ব্রহ্মের লীলা বলা হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিলে জীবকে ঈশ্বর-সৃষ্ট বলা যায়।

এক ব্রহ্ম কিরূপে অসংখ্য জীবরূপে প্রতীত হন, তাহা দুর্বোধ্য। ব্রহ্ম ব্যতীত তো দ্বিতীয় বস্তু নাই। সুতরাং এই প্রতীতি ব্রহ্মেরই বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম বিশুদ্ধ চিৎ, তাঁহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদ নাই, তাহার পরিণামও নাই। সুতরাং তিনি যে আপনাকে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে অনুভব করেন, ইহা বলা যায় না। মায়াবশতঃই ব্রহ্ম জীবরূপে অনুভূত হন। মায়াবশতঃ যে সকল জীব উদ্‌ভূত হয় এই অনুভূতি তাহাদেরই। এই অনুভূতি ও জীবের উদ্‌ভব একই। কেননা জীব না থাকিলে যেমন এই অনুভূতি হইত না, তেমনি এই অনুভূতিতেই জীবের উৎপত্তি। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই, যে এক অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম মায়াতে অসংখ্য কেন্দ্রে অসংখ্য জীবরূপে প্রতীত হন, যেমন একই চন্দ্র জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্ররূপে দৃষ্ট হয়। এই প্রতীতি সেই সকল জীবেরই। মায়াতে যে সকল জীব উদ্‌ভূত হয়, তাহারা চিতের ধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহারা আপনাদিগকে (সান্ত বলিয়া) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভব করে। জড়ের সহিত চিতের পার্থক্য এইখানে। নির্গুণ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম কেবল বহু রূপে আবির্ভূত হন না, জ্ঞাতারূপেও আবির্ভূত হন ; কিরূপে হন তাহা বুঝিতে পারা যায়

---

* শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে প্রতিবিম্ববাদের উৎপত্তি কি না বলা যায় না।

রেমে রমেশঃ ব্রজসুন্দরিভিঃ যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ

শিশু যেমন (দর্পণস্থ) নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে ক্রীড়া করে, রমেশ ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

না। ব্রহ্ম কেবল ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপেই আবির্ভূত হন না, তিনি সমগ্র মায়া উপাধির মধ্যে ঈশ্বররূপেও আবির্ভূত হন। জীবের বুদ্ধিতে ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে প্রতীত হন। জড়জগৎ জীবকর্তৃক ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়। ইহার কারণ অবিদ্যা, এই অবিদ্যাবশতঃ জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতীত হয় এবং ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হন।

কর্ম্মবাদ

শঙ্কর কর্ম্মবাদ স্বীকার করেন। প্রত্যেক জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকে পরলোকে তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, "অনুশয়" (অভুক্ত কর্ম্মশেষ) সহ এই লোকে ফিরিয়া আসে। শ্রুতি বলেন "অবতরণকারী জীবের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে রমণীয়াচারী ছিলেন (পুণ্যকর্ম্মা), তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য-যোনি প্রাপ্ত হন। যাহারা পাপাচারী ছিল, তাহারা কুকুর যোনি, শূকর যোনি অথবা চণ্ডাল-যোনি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্নরূপ ভোগের কারণস্বরূপ অনুশয়ের অস্তিত্ব সূচিত হয়। আকস্মিক কিছু হওয়া অসম্ভব (শা ভা ৩।১।৮)।

কিন্তু কর্ম্মের বন্ধন কর্ম্মের দ্বারা ছেদন করা যায়। তাহা না হইলে সৎকর্ম্মের জন্য শাস্ত্রোপদেশ ব্যর্থ বলিতে হয়।

এক জীববাদ ও অনেক জীববাদ

শঙ্করের পরে তাহার অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ বিষয়ে মত-ভেদ হয়। ইহার ফলে "এক জীববাদ" নামে এক মতের উদ্ভব হয়। এই মতেরও প্রকার-ভেদ আছে। এক মতে হিরণ্যগর্ভই একমাত্র জীব, অন্য যাবতীয় জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র। মতান্তরে একমাত্র জীব সকল দেহে বর্ত্তমান। এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে এক জীব সকল দেহে অধিষ্ঠিত হইলে প্রত্যেক দেহে অন্য দেহের সুখ-দুঃখ প্রভৃতির অনুভব হইত। অবিদ্যা যখন এক, তখন জীবও একমাত্র, এই যুক্তির উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত। শঙ্কর এই মতের অনুমোদন করেন নাই। এই মত সত্য হইলে এক জীবের যখন মুক্তি হইয়াছিল, তখনই সকল জীব মুক্ত হইয়া যাইত —সংসারের বিলুপ্তি ঘটিত।

"অনেক জীববাদ"ও অনেক প্রকার। এক মতে অন্তঃকরণরূপে দেহের মধ্যে অবিদ্যার অবস্থানহেতু ভিন্ন ভিন্ন জীবের উদ্ভব হয়। এই অন্তঃকরণ বহু; সুতরাং জীবের সংখ্যাও বহু। অন্য এক মতে অবিদ্যার বহু অংশ

আছে। এক এক অংশ এক এক জীবে বর্ত্তমান। অবিদ্যার যে অংশ যখন বিনষ্ট হয়, সেই অংশের অধিষ্ঠানভূত জীবের তখন মুক্তি হয়। এই মতের আরও বহু ভেদ আছে। অবিদ্যা-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা হইতে এই সকল মতের উদ্ভব। এক মতে অবিদ্যার বিভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন জগতের উৎপত্তি হয়, এবং প্রত্যেক জীবের জগৎ তাহাতে অবস্থিত অবিদ্যা-দ্বারা উৎপন্ন। এই সকল জগৎ যে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা ভ্রান্তি। দুইজন লোকে যখন এক শুক্তি দেখে, এবং উভয়ের রজত-ভ্রান্তি হয়, তখন একজন বলে তুমি যে রজত দেখেছ, আমিও তাহা দেখেছি"। অন্য এক মতে ঈশ্বরে অবস্থিত মায়া প্রত্যেক জীবে অবস্থিত অবিদ্যা হইতে ভিন্ন। জগৎ সৃষ্ট হয় ঈশ্বরে অবস্থিত মায়া দ্বারা। জীবে অবস্থিত অবিদ্যার আবরণশক্তি-বশতঃ ঈশ্বর আবৃত; বিক্ষেপশক্তি হইতে শুক্তিতে রজত ভ্রমের ন্যায় জাগতিক বস্তুর ভাণ উৎপন্ন হয়।

দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহার বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীতে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতে আমরা যাহা দেখি, তাহা আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি; বাস্তবিক স্থায়ী কোনও বস্তু আমরা দেখি না। মধুসূদন সরস্বতী এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন জীব যাহা দেখে তাহা অজ্ঞানবশতঃ জীব নিজেই সাময়িক ভাবে সৃষ্টি করে। কিন্তু চিৎসুখ প্রমুখ কেবলাদ্বৈতবাদিগণ এই মতের সমর্থন করেন নাই।

শঙ্কর-দর্শনে চরিত্রনীতি

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই জীবনের লক্ষ্য। ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। যখন জীব বিশ্বের আত্মার সঙ্গে আপনাকে অভিন্ন মনে করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার যাবতীয় দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয়। আত্ম-সাক্ষাৎকারের সহায় যে সকল কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম, যে সকল কর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক, তাহা অধর্ম্ম বা অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জ্ঞানের জন্য সত্য কি, মিথ্যা কি—তাহার জ্ঞান আবশ্যক। জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ। এই জ্ঞান হইলে সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতির উদ্ভব হয়। তাহার ফলে শান্তি অধিগত হয়। জগতের প্রতি, সর্ব্ব জীবের প্রতি প্রীতি হইতে সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের জন্য আত্ম-ত্যাগের ইচ্ছা উদ্ভূত হয়। আপনার সুখের জন্য চেষ্টার বিরতি হয়। স্বার্থপরতাই সর্ব্ব অমঙ্গলের মূল। সর্ব্বজীবে মৈত্রী ও করুণা—ক্ষুদ্র পারিবারিক

স্বার্থ অতিক্রম করিয়া সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ—মঙ্গলের নিদান।

গীতা শাস্ত্র-বিধানকেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে প্রমাণ বলিয়াছেন এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যে শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করিয়া কামনার বশে কর্ম্ম করে, গীতার মতে সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না এবং ইহলোকে সুখও সে লাভ করে না, পরমা গতির তো কথাই নাই। শঙ্করের মতও তাহাই। তাঁহার মতে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম পাপ। স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সহায়ক। কিন্তু বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ফলে অভ্যুদয়-লাভ হইলেও মোক্ষলাভ হয়না। তাহাদ্বারা লোকে স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিবার ক্ষমতা লাভ করে মাত্র। ভক্তি জ্ঞানের জন্য এবং ধ্যানের জন্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে মুক্তির সাধন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম জ্ঞানের সহায়ক। যাহার মন বিশুদ্ধ, যিনি কামনাবিহীন এবং যিনি ইহজন্মে ও পূর্ব্বজন্মে কৃত কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মনেই ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভের ইচ্ছা উদিত হয়।

শঙ্কর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমে অবস্থান শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি ও স্মৃতির বচন দ্বারা তিনি ইহার সমর্থন করিয়াছেন (শ-ভা ৩।৪।৩৯)। কিন্তু অনাশ্রমী ও দরিদ্রগণ যজ্ঞ, উপবাস, দেবসেবা প্রভৃতি দ্বারাও যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাও বলিয়াছেন (৩।৪।৩৮)। অনাশ্রমী যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাহারা তাহাদের জন্মান্তর-সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারের বলেই বিদ্যালাভ করে। শূদ্রগণও যে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে সমর্থ, তাহা শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন।

চতুরাশ্রমের মধ্যে পারিব্রজ্য বা সন্ন্যাস আশ্রমকেই শঙ্কর শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, কারণ সন্ন্যাস পরমাত্মবিজ্ঞানের বা পরমার্থপ্রাপ্তির হেতু। অন্য তিন আশ্রমী পুণ্যলোকভাগী। কিন্তু "ব্রহ্মসংস্থ" পরিব্রাজক মোক্ষভাগী। অনন্যব্যাপার বা অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর হওয়াই ব্রহ্মসংস্থ হওয়া। সেরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা অন্য তিন আশ্রমে অসম্ভব। অন্যান্য আশ্রমী আশ্রম-বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপভাগী হন। কিন্তু পরিব্রাজকের কর্ম্ম-ত্যাগে প্রত্যবায় হয় না। শমদমাদি দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠতা পোষণ করা প্রব্রজ্যাশ্রমের কার্য্য, যজ্ঞাদি করা অন্যান্য আশ্রমীর কার্য্য। যজ্ঞাদি ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসীর অধর্ম্ম হয় না। তাহাতে বরং আশ্রম-বিহিত কর্ত্তব্যই করা হয়। প্রব্রজ্যাশ্রম-গ্রহণ-

মাত্র মোক্ষ-ভাগী হইলে জ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। এ আপত্তি হইতে পারে না, কেননা পারিব্রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞান-পরিপাকের অসাধারণ উপায় (শ-ভা ৩।৪ ২০)। অন্য আশ্রমীকে মুক্তি-লাভের পূর্ব্বে সন্ন্যাসী হইতে হইবে।

ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে শঙ্কর বৃহৎ আরণ্যকের এই শ্লোকের উদ্ধার করিয়াছেন ; "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ। অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ।"—সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন। বাল্য ও পাণ্ডিত্য লব্ধ হইলে মুনি হইবেন। মৌন ও অমৌন নিশ্চিতরূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। মুনি শব্দের অর্থ নিরন্তর মননশীল। বাল্য শব্দের অর্থ বালভাব বা সারল্য (শুভবুদ্ধি)। অধ্যয়নজাত ব্রহ্মবুদ্ধির নাম পণ্ডা। পণ্ডা-বিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত। ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে শঙ্কর নিম্নের স্মৃতি-বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যং ন সন্তং ন চা সন্তং নশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ॥
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ।
অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মূকবৎচ মহীং চরেৎ॥ (৩।৪।৫০)

যিনি আপনার কুলীনত্ব, অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য, অপাণ্ডিত্য, সদাচারিত্ব, অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি গূঢ় ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া (লোকের) অজ্ঞাত আচরণ করেন, এবং অন্ধ, জড় ও মূকের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

গৃহী সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন, গৃহীর কৃৎস্নভাব আছে ; অর্থাৎ তিনি কেবল স্বীয় আশ্রমবিহিত কর্ম্ম করেন না, অন্য আশ্রমবিহিত অহিংসা সংযমাদির অনুষ্ঠানও করেন (৩।৪।৪৮)।

শঙ্কর সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে জাতি-বৈষম্যের স্থান দান করেন নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিধান দেন নাই।

ব্রহ্ম-জ্ঞানীর করণীয় কোনও কর্ম্ম নাই। গীতার ৪।২০ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন "নিজের প্রয়োজনের অভাবহেতু লোকসংগ্রহের জন্য অথবা জীবনরক্ষার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কোনও কর্ম্ম করেন না। তাহার কর্ম্ম কোনও কামনাপুরণের উদ্দেশ্যে কৃত হয় না। সাংসারিক কর্ম্ম সংসারী জীবের জন্যই বিহিত। যিনি সর্ব্ব কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই"। গীতার ৪।২১ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর "কিল্বিষ" শব্দের

ব্যাখ্যায় ধর্ম্ম-কর্ম্মকেও কিল্বিষ (পাপ) বলিয়াছেন। কেননা ("ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপত্বাৎ কিল্বিষমেব বন্ধাপাদকত্বাৎ") বন্ধের জনক বলিয়া ও মোক্ষকামীর অনিষ্টরূপ বলিয়া ধর্ম্মও কিল্বিষ। কর্ম্ম কামনার ফল বলিয়া বন্ধের জনক। কিন্তু তাহা যখন নিষ্কামভাবে কৃত হয়, তখন তাহা হইতে বন্ধ হয় না। "কেবল শারীর কর্ম্ম" অর্থাৎ শরীররক্ষা মাত্র যাহার প্রয়োজন, তাহা দ্বারাও বন্ধ হয়না। কোনও পাপ বা পুণ্য নিষ্কাম কর্ম্মীকে স্পর্শ করে না। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কোনওরূপ কর্ম্মের বিধি শঙ্কর দেন নাই। কিন্তু তাঁহার নিজের জীবনের অধিকাংশ জীবের মঙ্গলের জন্যই ব্যয়িত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে তিনি ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অজ্ঞানান্ধ-লোকের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনের চেষ্টায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আপনার মুক্তিতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নাই। অজ্ঞানকেই তিনি জীবের প্রধান শত্রু মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন সেই অজ্ঞান-দূরীকরণে ব্যয় করিয়াছিলেন।

কোনও কোনও সমালোচক বলিয়াছেন শঙ্করের মতে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। জাগতিক সকল বস্তুই যদি মায়িক হয়, কোনও ভেদই যদি জগতে না থাকে, তাহা হইলে পাপ ও পুণ্যের ভেদও মিথ্যা। এই সমালোচনার কোনও গুরুত্ব নাই। শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তি পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের নিকট এই জগৎ ব্যবহারিকভাবে সত্য এবং মুক্তি-লাভের প্রধান উপায় যদিও ব্রহ্মজ্ঞান, তথাপি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া অনেক কর্ম্ম করণীয় ও অনেক কর্ম্ম বর্জ্জনীয় ইহা শঙ্কর অস্বীকার করেন নাই। সত্য, অহিংসা, শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম; মিথ্যা, স্বার্থপরতা, হিংসা প্রভৃতি অসৎ কর্ম্ম। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি পাপ ও পুণ্যের ভেদকে অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যা বলিবেন না এবং নিজেও কখনও পাপ কর্ম্ম করিবেন না। কেন না দেহে আত্ম-বুদ্ধি হইতেই পাপে প্রবৃত্তি হয়। যাহার দেহে আত্ম-বুদ্ধি নাই, পাপ কর্ম্মে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না।

শ্রুতিতে অনুজ্ঞা ও পরিহার আছে, অর্থাৎ কোনও কোনও কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কোনও কোনও কর্ম্ম পরিহর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, জীব ও ব্রহ্মে যদি ভেদ না থাকে, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই সকল অনুজ্ঞা ও পরিহার অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তর শঙ্কর নিজেই যাহা দিয়াছেন তাহা এই (শ-ভা ২।৩।৪৮):

আত্মা এক হইলেও জীবের দেহ-সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুজ্ঞা ও পরিহার সার্থক হয়। যতদিন সম্যক দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিন ঐ ভ্রম নিবারিত হয়না, ততদিন অবিদ্যাজনিত নানা ভেদ বর্ত্তমান থাকে। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাহার ত্যাজ্য ও অত্যাজ্যবুদ্ধি নাই, সুতরাং তাহার নিযোজ্যতা (অর্থাৎ এই কর্ম্ম কর, ইহা করিও না) অসম্ভব। আত্মার অতিরিক্ত হেয় ও উপাদেয় যে দেখে না, বিধি-নিষেধ তাহাকে কিসে নিয়োগ করিবে? একাত্মদর্শী নিয়োজ্য নহেন। জ্ঞানীর নিয়োগ না থাকিলেও তাঁহার যথেচ্ছাচার সম্ভবপর নহে। কেন না তাহার অভিমান (যাহা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক) নাই। যেমন অগ্নি এক হইলেও অশুচি জ্ঞানে শ্মশানের অগ্নি ত্যাজ্য, শুচিজ্ঞানে অন্য অগ্নি গ্রাহ্য, সূর্য্যালোক এক হইলেও অশুচি দেশস্থ সূর্য্যালোক পরিহার্য্য, শুচি দেশের সূর্য্যালোক গ্রহণযোগ্য, সমস্তই মৃত্তিকার বিকার হইলেও হীরকাদি আদরণীয়, মৃতদেহাদি বর্জ্জনীয়, তেমনি আত্মা এক হইলেও দেহাদি উপাধি সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুজ্ঞা ও পরিহার সার্থক হয়।

জগৎ মায়িক হইলেও, শঙ্কর তাহাকে আকাশে গন্ধর্বনগরের ন্যায় একেবারে অস্তিত্বহীন বলেন নাই। অনিত্য হইলেও, যতদিন অবিদ্যা দূরীভূত না হয়, ততদিন জীবের নিকট জগতের অস্তিত্ব আছে। অবিদ্যার নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্‌ভবের জন্য কতকগুলি কর্ম্ম করণীয়, কতকগুলি ত্যাজ্য। সুতরাং শঙ্করের মতের সহিত নৈতিক বিধি ও নিষেধ সংযত হয়না, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইহার অর্থ ব্রহ্মের সহিত কর্ম্মী জীবের "মুখ্য সামানাধিকরণ্য" নহে, অর্থাৎ অহংকার-সমন্বিত জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ইহা নহে। ইহা "বাধসামানাধিকরণ্য"-বোধক, অর্থাৎ অবিদ্যার অপগমে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব-বোধক।

শঙ্কর চিত্ত-শুদ্ধিকে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধির অর্থ রজঃ ও তমোগুণের অভিভব ও সত্ত্বগুণের প্রভাব। নিঃস্বার্থ কর্ম্ম ও সাধন ব্যতীত সত্ত্ব-গুণের প্রাচুর্য্য অসম্ভব। যাহার নিকট "অহং" ও 'মম' অর্থহীন তিনিই আত্মাকে জানিয়াছেন। কাম বিনষ্ট না হইলে অবিদ্যার ধ্বংস এবং আত্ম-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। অবিদ্যাকে কেবল অস্বীকার করিলেই অবিদ্যার ধ্বংস হয় না। শুধু শ্রবণ (উপদেশ শ্রবণ) দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান অনুভবের বিষয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। ইহা ব্রহ্মের সহিত একত্বের অনুভব। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত এই অনুভব হইতে পারে না। সুনীতি

বর্জন করিয়া দৈহিক সুখের পশ্চাতে ধাবমান ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না।

শঙ্করের মতে ব্রহ্মজ্ঞানী পাপ-পুণ্যের অতীত। পাপ-পুণ্যের ভেদ মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের পক্ষে সত্য, কিন্তু তাহা পারমার্থিক সত্য নহে। যতদিন জীব আপনাকে তাহার বহিঃস্থ জগৎ হইতে পৃথক মনে করে, আপনাকে অন্যান্য "আমি" হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, ততদিনই ন্যায়ান্যায় ও পাপ পুণ্যের ভেদ সত্য। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে যখন সকল ভেদ বিদূরিত হয়, তখন কাহার প্রতি কে অন্যায়াচরণ করিবে, কাহার অনিষ্ট করিয়া কে পাপভাগী হইবে? জীব ক্রমে ক্রমে "আমিত্বে"র—স্বার্থের—বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এই মুক্তি যখন সম্পূর্ণ হয়, যখন আত্মপরভেদ বিলুপ্ত হয়, তখন সুনীতি দুর্নীতির ভেদও লুপ্ত হয়। "আমিত্বের" সংকীর্ণ গণ্ডী ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করিয়া জীবকে বিশ্বের সার্বিক আত্মার সহিত একীভূত করাই সুনীতির লক্ষ্য। জীব যখন এই আমিত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার সসীমত্ব বিলুপ্ত হয়। ন্যায়ান্যায় ও পাপ-পুণ্যের ভেদ সসীম জীবের পক্ষেই সত্য, কিন্তু জীব যখন সসীমত্ব অতিক্রম করিয়া অসীমের সহিত এক হইয়া যায়, তখন সে ভেদও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সুনীতির ভেদ সেই জন্যই শঙ্করের মতে আপেক্ষিক, অনপেক্ষ নহে। সুনীতির লক্ষ্য জীবকে অসীমত্বে উত্তীর্ণ করা। সেই লক্ষ্য অধিগত হইলে তাহার প্রয়োজন লুপ্ত হয়। অনেকে সমাজের মঙ্গলকেই সুনীতির লক্ষ্য বলেন। কিন্তু সমাজই তো এক-মাত্র সত্য বস্তু নহে। সমাজের উপরে ঈশ্বরের সহিতও মানবের সম্বন্ধ আছে। সমাজ-সেবা দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ যখন পরিপূর্ণভাবে অনুভূত হয়, তখন সমস্ত ভেদ বিলুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ান্যায়ের ভেদেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

শঙ্করের কঠোর বৈরাগ্যবাদ অনেকের অপ্রীতিকর। ঈশ্বর মানুষের ভোগের জন্য যে সকল ভোগ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাদের সম্পূর্ণ বর্জনের কোনও হেতু অনেকে দেখিতে পান না। শঙ্করের বৈরাগ্যবাদ তাঁহার তাত্ত্বিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের সকলই অস্থায়ী—কিছুরই চিরস্থায়ী মূল্য নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভোগের প্রতি আসক্তি, যাহা পরম পুরুষার্থ-লাভের প্রতিবন্ধক, তাহার বর্জনের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তিই টিকিতে পারে না। ভোগের সহিত সন্ধি করিয়া ভোগাসক্তি অতিক্রম

করা সম্ভবপর হয় না। তাই শঙ্করের মতে পরমপুরুষার্থ সর্ব্বস্ব-ত্যাগ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জাগতিক অবস্থার উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা নিরর্থক। সামাজিক জীবনের মূল্যও শঙ্করের মতে নাই—ইহা কেহ কেহ বলেন। শঙ্কর মায়িক জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি চাহেন, জাগতিক অবস্থার উন্নতি তাঁহার লক্ষ্য নহে। কিন্তু তিনি জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। রাজতন্ত্র ভালো কি প্রজাতন্ত্র ভালো, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর, এ সকল রাজনৈতিক ও আর্থিক মতের আলোচনা না করিলেও, শঙ্কর সকল মানবের মঙ্গলই চাহিয়াছেন, কোন্ পথে সকলে পরমার্থ লাভ করিতে পারে, তাহার নির্দেশ করিয়াছেন, প্রত্যেকের আমিত্বের প্রসারের উপদেশ দিয়া স্বার্থপরতার সংকোচ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনা শান্ত না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তিনি নিত্য নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি ও তাহার পুরণের ব্যবস্থা না করিয়া ভোগ-বাসনাকে সংযত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং মানবের দুঃখ মুক্তির উপায় সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও তাহার সাংসারিক কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে বলেন নাই, কাহাকেও ঈশ্বরে ভক্তি না করিতে শিক্ষা দেন নাই, কাহাকেও শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিতে উপদেশ দেন নাই। বরং বিধি-নিষেধ পালনকেই মুক্তির দ্বার বলিয়াছেন। বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়, তখনই শঙ্করের মতে তাহা অর্থহীন হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। জগৎ যে উর্দ্ধমূল, ঈশ্বরে তাহার মূল নিহিত, একথা শঙ্কর বারংবার বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সামুৎপাদিক জগৎকে অতিক্রম করিয়াই যেমন সতে পৌছিতে হয়, তাহা বর্জন করিয়া নহে, তেমনি নৈতিক বিধি-নিষেধ পালন করিয়াই মুক্তি অধিগত হয়, বর্জন করিয়া নহে।

উপাসনা

ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে উপাসনার কথা আছে। এই উপাসনা "রূপং দেহি, জয়ং দেহি" এইরূপ প্রার্থনা নহে। ইহা নিদিধ্যাসন। এতাদৃশ উপাসনা শুধু একবার নহে, বারংবার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।২।১)। শ্রবণ করিবে, মনন

করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে—এই উপদেশ দ্বারা পুনঃ পুনঃ আত্মাকার চিত্তবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতে বলা হইয়াছে। যতদিন আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন এইরূপ করিতে হইবে।

কিন্তু এতাদৃশ অসকৃৎ উপাসনা কিরূপে করিতে হয়? উপাসনা-কালে কি পরমাত্মাকে আত্মা হইতে অভেদে ধ্যান করিতে হয় অথবা তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন ও প্রভু রূপে ধ্যান করিতে হয়? ইহার উত্তর, "আত্মা ইতি তু উপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (৪।১।৩)। আত্মারূপে উপাসনা করিতে হইবে। জাবাল উপনিষদে আছে "ত্বং বা অহং অস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বং অসি দেবতে,—হে ভগবতি দেবতে, তুমিই আমি আমিই তুমি"। "অহং ব্রহ্মাস্মি", "এষ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।" "এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ" প্রভৃতি বাক্যেও পরমেশ্বরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং পরমেশ্বরকে আত্মা (আমি) বলিয়া ধ্যান করিবে। জীব সংসারী, ঈশ্বর অসংসারী, এই জন্য উভয়ের ঐক্য সম্ভবপর নহে। এই যুক্তি সংগত নহে, কেননা জীবের ঈশ্বরের বিরুদ্ধ যে গুণ, তাহা মিথ্যা। জীব সত্যই সংসারী নহে।

মন ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, আদিত্য ব্রহ্ম, নাম ব্রহ্ম, এই রূপ মনে করিয়া যে উপাসনা, তাহা প্রতীকোপাসনা। সম্পৎ, অধ্যাস ও সম্বর্গভেদে প্রতীকোপাসনা ত্রিবিধ। কোন অপকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়া ধ্যান করা এবং ধ্যান কালে অপকৃষ্ট বস্তুকে তিরোহিত করিয়া প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট বস্তুর চিন্তা করাকে সম্পৎ উপাসনা বলে। "অনন্তং বৈ মনঃ", এখানে মনকে বিশ্বদেব নামক দেবতাগণের সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করা হয়। বিশ্বদেবগণ অনন্ত, মনের বৃত্তিও অনন্ত। এই সাদৃশ্য বশতঃ বিশ্বদেবদিগকে মনে আরোপ করিয়া মনবিষয়ক চিন্তাটিকে প্রায় বিলুপ্ত করিয়া বিশ্বদেবদিগের চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে হয়। ইহাই সম্পৎ উপাসনা। কিন্তু 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ ধ্যান সম্পৎ উপাসনা নহে।

অধ্যাস উপাসনাতে এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে আলম্বন বস্তুটির প্রাধান্য থাকে। যখন মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়, তখন মনের প্রাধান্য থাকে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" অধ্যাস উপাসনা নহে।

সম্বর্গ উপাসনাতে সম্পৎ বা অধ্যাস উপাসনার ন্যায় অধিষ্ঠান বা আরোপ্যের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য থাকে না; কিন্তু দুইটি বস্তুর ক্রিয়া-বিশেষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের অভেদ চিন্তা করা হয়। প্রলয়কালে বায়ু অগ্নি প্রভৃতিকে সংহার বা নিজের মধ্যে গ্রহণ করে এবং সুষুপ্তি-কালে প্রাণ ও বাক্য

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগকে মনের মধ্যে গ্রহণ করে, এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া বায়ু ও প্রাণের অভেদ চিন্তনরূপ উপাসনা সংবর্গ উপাসনা।

প্রতীক উপাসনায় প্রতীকে অহংজ্ঞান করিতে হইবে না। (৪।১।৪)। মন, আদিত্য, নাম প্রভৃতিই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাস্য। ব্রহ্ম মন ও আদিত্য প্রভৃতি বুদ্ধিতে উপাস্য নহেন (৪।১।৫)। আত্মা ঈশ্বর হইতে পৃথক নহেন, এই ভাবে ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

উপবিষ্ট হইয়া পৃথিবীর ন্যায় অচল থাকিয়া ধ্যান করিতে হয়। যতদিন ব্রহ্মদর্শন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উপাসনার প্রয়োজন। ব্রহ্মদর্শন হইলে তাহার প্রয়োজন থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অন্য সকল কর্ম্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। মৃত্যুর পরে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

শঙ্কর বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম নিষেধ করেন নাই। ইহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায়ক বলিয়াছেন।

মায়ায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম তাঁহার নিকট পূর্ণ পুরুষরূপে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, অশেষ কল্যাণ গুণের আকর, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন। এই ঈশ্বর কল্পনা মাত্র নহেন। জীবও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। জীব যতটা সত্য, ঈশ্বরের সত্যতা তাহা অপেক্ষা কম নহে।

ব্রহ্মদর্শন যখন হয়, যখন ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভূত হয়, উপাসনার প্রয়োজন তখন তিরোহিত হয়। কিন্তু যত দিন ব্রহ্মদর্শন না হয়, ততদিন ঈশ্বরই জীবের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহার সমস্ত ভক্তির দাবী করেন, মানুষের জ্ঞান ও ভক্তি মিলিত হইয়া তাহার ধর্ম্মচেতনা পরিতৃপ্ত করে। অদ্বৈতবাদেও যে ভক্তির স্থান আছে, শঙ্কর নিজেই তাহার প্রমাণ। যেখানেই তিনি ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার লেখনী হইতে শব্দরাশি ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

শঙ্করের নিকট ধর্ম্ম মতের বিষয়ও নহে, অনুষ্ঠানের বিষয়ও নহে, অনুভবের বিষয়। আপনার সসীমত্বের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তের বোধ হইতে ধর্ম্মের আরম্ভ এবং অসীমের সহিত একত্ববোধের অর্থ একত্বের অনুভূতি, শিক্ষালব্ধ জ্ঞান মাত্র নহে।

উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ-ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ভেদ বিলুপ্ত হইলে ভক্তির পাত্রের অভাব হয়। রামানুজ এই অবস্থা স্বীকার করেন না। শঙ্করের মতে ইহাই সর্ব্বোত্তম অবস্থা, ইহাই মুক্তি। এ অবস্থায় ধর্ম্ম অতিক্রান্ত

হয়, ধর্ম্মের লক্ষ্য অধিগত হয়, সসীম অসীমত্বে উন্নীত হয়, জীবের সীমিত চৈতন্য অসীমত্ব প্রাপ্ত হয়।

মানবোচিত গুণের আরোপে শঙ্কর অনিচ্ছুক। কিন্তু ঈশ্বরে ইচ্ছা ও অশেষ কল্যাণগুণ বর্ত্তমান। মায়া অনাদি, তাহাতে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বরও অনাদি। এই ঈশ্বর সকল মানুষকে তাঁহার অভিমুখে আকর্ষণ করেন। মানুষের সকল কামনা তাঁহাতেই পরিসমাপ্ত হয়। শঙ্কর মানুষকে তাহারও উপ্পরে তুলিতে ইচ্ছুক। কিন্তু মানবীয় চিন্তা তাহার উপরে উঠিতে ভয় পায়। অত উর্দ্ধে তাহার গতি স্তম্ভিত হয়।

মোক্ষ

মুক্তি বা মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। জীবাত্মার স্বরূপ আনন্দ। অবিদ্যাজাত দেহাত্মবোধের ফল দুঃখ। তাহাই বন্ধ। মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও স্বীয় স্বরূপ আনন্দের অভিব্যক্তিই বন্ধ হইতে মুক্তি বা মোক্ষ। আনন্দ জীবের স্বরূপগত হইলেও অজ্ঞান-আবরণে আবৃত থাকার ফলে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যখন অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তখন আনন্দ প্রকাশিত হয় এবং দুঃখের বিনাশ হয়।

বৈশেষিক মতে মুক্তিতে আত্মার বিশেষ গুণের আত্যন্তিক বিনাশ হয় এবং অন্য কোনও বিশেষ গুণও তাহাতে আবির্ভূত হয় না। ন্যায়দর্শন মতে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই মুক্তি। মুক্তির অবস্থায় বৈশেষিক ও ন্যায় মতে আত্মায় চৈতন্য থাকে না। তাহা শিলার মতো জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ন্যায়-মতে আত্মা স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, মনের সহিত সংযোগের ফলে আত্মায় চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। মুক্তিতে মনের সহিত সংযোগের নাশ হয়, চৈতন্যও তিরোহিত হয়। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতেও মুক্তিতে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থা শুদ্ধ চিতের অবস্থা, আনন্দময় অবস্থা নহে। বেদান্ত মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। তাহা পরম আনন্দের অবস্থা। ব্রহ্মভাব কিরূপ অবস্থা তাহা আমাদের ধারণার অতীত। জগতে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হয়, এবং অবিদ্যার আবরণবশতঃ যদি তাহা হইতে ভ্রান্ত জ্ঞান-বিশিষ্ট সসীম জীবের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে অবিদ্যার অপসরণে জীবের সসীম ভ্রান্তিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, এবং পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম—যিনি জীবের অবিদ্যার বিনাশের পূর্ব্বেও তাহার ভ্রান্ত জ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ জীবে বর্ত্তমান ছিলেন—তিনিই অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং যাহাকে আমরা

জীবাত্মা বলি, মুক্তিতে তাহার বিনাশ হয় এই মীমাংসা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম জীবের মুক্তির পূর্ব্বেও আনন্দস্বরূপ, পরেও আনন্দস্বরূপ। মুক্তিতে অবিদ্যা-নাশের ফলে নূতন আনন্দানুভূতি কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে।

শঙ্কর বলেন আত্মা অশরীর। তাহার জ্ঞানশক্তিমান্ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন নাই। আত্মা শুভ্র (শুদ্ধ) অসঙ্গ। সুতরাং মোক্ষনামক অশরীরত্ব নিত্য, ইহা ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফল নহে। শরীরাভিমানরহিত মোক্ষ পরিণামী নিত্য নহে। (যেমন সাংখ্যের তিন গুণ)। মোক্ষ পারমার্থিক কূটস্থ-নিত্য, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব (শ-ভা ১।১।৫)। তাহাতে কালভেদ নাই। মোক্ষ নামক অশরীরত্বই ব্রহ্ম। মোক্ষের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান। অজ্ঞানের নিবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞানের ফল। তত্ত্ব-জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-বিজ্ঞান সম্পদরূপও নহে, অধ্যাসস্বরূপও নহে। সম্পদ উপাসনাকে প্রতীকোপাসনাও বলে। অধ্যাস উপাসনা ও প্রতীকোপাসনা। এতাদৃশ উপাসনা পুরুষ-ব্যাপার তন্ত্র অর্থাৎ পুরুষের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মোক্ষ-সাধক ব্রহ্ম-জ্ঞান তাহা নহে। ইহা বস্তুতন্ত্র যে বস্তুর জ্ঞান, তাহার অধীন অর্থাৎ সেইরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার কোনও সম্বন্ধ নাই। মোক্ষও ক্রিয়াসাধ্য নহে। মোক্ষ উৎপাদ্য বা প্রাপ্য নহে। আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্ম সকলের নিত্যপ্রাপ্ত। মোক্ষ নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ। মোক্ষ আত্মার ধর্ম্ম হইলেও অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; উপাসনা দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হইলে অভিব্যক্ত হয়, ইহা বলা যায় না। কেননা আত্মা ক্রিয়ার আশ্রয় হইতে পারে না। ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারা লভ্য। এই জ্ঞান পুরুষের মানসিক ব্যাপারের অধীন নহে। জ্ঞানকে "করিতে", "না করিতে", অথবা "অন্য প্রকার করিতে" পারা যায় না, কেননা তাহা বস্তুতন্ত্র, বিধির অধীন অথবা পুরুষের অধীন নহে।

উপাধিমুক্ত আত্মা মোক্ষে শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তাহাতে নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় না। যাহা কেবল আত্মভাব, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানী তাহাতে আবির্ভূত হন (শ-ভা ৪।৪।১)। পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন, বিগলিত-বন্ধন হইয়া শরীর ও শরীর-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হন মাত্র, নূতন কিছু হন না। স্বরূপ-নিষ্পন্ন হইয়া (মুক্ত হইয়া) আত্মা কি পরমাত্মা হইতে পৃথক অবস্থান করেন, অথবা তাহার সহিত একীভূত হন? শঙ্কর বলেন মুক্ত পুরুষ পৃথক অবস্থান করেন না। (অবিভক্ত এব পরেণ আত্মনা

মুক্তঃ অবতিষ্ঠতে—শ-ভা ৪।৪।৩)। "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধং আসিক্তং, তাদৃক্ এব ভবতি"। যেমন নির্মল জলে নির্মল জল মিশাইলে এক হইয়া যায়, জ্ঞানীর আত্মাও তেমনি শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিভক্ত হইয়া যায়। কোন কোনও শ্রুতিতে ভেদের কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা ঔপচারিক। "ভেদ নির্দেশস্তু অভেদেহপি উপচর্য্যতে" (শ-ভা ৪।৪।৪)। মোক্ষে আত্মা মাত্র আত্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। জৈমিনির মতে মুক্তের স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা নিষ্পাপ, সত্যসংকল্প প্রভৃতি বিশেষণান্বিত। তাহা সর্বেশ্বর ও সর্বজ্ঞ। "তিনি সেইকালে মুক্ত অবস্থায় পরিক্রমণ করেন, ক্রীড়া করেন, ভোগ করেন", ইত্যাদিও তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। এ সকল মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য। শঙ্কর বলেন—ঔড়ুলোমির মতে যদিও ব্রহ্মে এই সকল বিশেষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহারা "শব্দ বিকল্পজ" অর্থাৎ শব্দব্যবহারমূলক মিথ্যা প্রত্যয় (যেমন রাহুর শির)। ব্রহ্মে পাপাদি নাই, এই মাত্র উপরিউক্ত বিশেষণ সকলের অর্থ। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, মোক্ষকালে জীব চৈতন্যমাত্রে অভিনিষ্পন্ন হয়। কেননা এই আত্মা অন্তর্বাহ্য-রহিত, একরস, পূর্ণ চৈতন্যঘন। সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ সন্নিবিষ্টের ন্যায় উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে সকল উপাধি-সম্পর্কের অধীন, স্বরূপের অন্তর্গত নহে। চৈতন্যমাত্রই স্বরূপ, আর সকল উপাধি-সংসর্গে অধ্যস্ত। "তিনি ক্রীড়া করেন, রমমান থাকেন" প্রভৃতি দুঃখাভাব বুঝাইতে ও স্তুতি অর্থে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃত ক্রীড়া অন্য পদার্থ-সাপেক্ষ, আত্মার তাহা নাই। মোক্ষ "নিরস্তাশেষপ্রপঞ্চ, প্রসন্ন (অত্যন্ত নির্মল, উপাধি-কালুষ্যহীন) ও অব্যপদেশ্য।" (অবর্ণনীয়)। ইহাই ঔড়ুলোমীর মত। কিন্তু বাদরায়ণ বলেন আত্মা পারমার্থিক রূপে নির্দ্ধর্ম্মক ও অখণ্ডচিৎমাত্র হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে তাহার ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয় না।

উপনিষদে আছে মুক্ত পুরুষের সংকল্প মাত্র তাহার পিতৃগণ তাহার সমীপে উপস্থিত হন। শঙ্কর বলেন, ইহার জন্য মুক্ত পুরুষের সংকল্পই যথেষ্ট, অন্য নিমিত্তের প্রয়োজন হয় না। মুক্ত পুরুষ কাহারও অধীন নহেন (অনন্যাধিপতি)। সংকল্প শব্দের প্রয়োগে জানা যায় মুক্ত পুরুষের মন থাকে, কেন না মনই সংকল্পের সাধন। বাদরি মুনির মতে মন থাকিলেও শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না (শ-ভা ৪।৪।১০)। জৈমিনির মতে মনের সহিত শরীরও ইন্দ্রিয় থাকে। বাদরায়ণের মতে মুক্ত পুরুষের কখনও শরীর থাকে, কখনও বা থাকে না। মুক্ত পুরুষ ঐশ্বর্য্যবলে অনেক শরীর সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে আবিষ্ট হইতে পারেন। (এক প্রদীপ হইতে যেমন অনেক প্রদীপ

হয়, সেইরূপ।) কিন্তু মুক্তি হইলে মুক্ত যখন চিৎমাত্র ও দ্বৈতরহিত হন, তখন ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? শঙ্কর বলেন, উপনিষদে মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্যের কথা আছে বটে। কিন্তু তাহা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নহে। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। জগৎ-সৃষ্টির ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য ঐশ্বর্য্য ঈশ্বর-সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগের হইয়া থাকে, কিন্তু পরমেশ্বরের যে নির্গুণ নির্বিকার রূপ আছে, সগুণ উপাসক তাহা প্রাপ্ত হন না। যাহারা দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মার লোক) গমন করেন, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না (পুনর্জ্জন্ম হয় না), নির্গুণ ব্রহ্মবাদীদিগের তো কথাই নাই। এই আলোচনা হইতে প্রতীত হয়, যে ঈশ্বরোপাসকগণ অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হন না। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলেও, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্‌ক্য সংবাদে যাজ্ঞবল্‌ক্য বলিতেছেন "ইদং মহাভূতং অনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি। ন প্রেত্য-সংজ্ঞা অস্তি"। এই মহাভূত (মহান্ আত্মা) অনন্ত অপার (অসীম) এবং বিজ্ঞানঘন। এই সকল হইতে (দেহ হইতে) উত্থিত হইয়া, (দেহ ও দেহ-সম্বন্ধ বর্জন করিয়া) (এই মহাভূত) তাহাদের পরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহ হইতে যাইবার পরে সংজ্ঞা থাকে না। দেহ-ত্যাগের পরে সংজ্ঞা থাকে না শুনিয়া মৈত্রেয়ী কহিলেন, ভগবান আমাকে মোহের মধ্যে ফেলিলেন। যাজ্ঞবল্‌ক্য কহিলেন "আমি মোহজনক কিছু বলি নাই, আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদহীন।" আত্মাকে বিজ্ঞানঘন, অবিনাশী ও অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা বলিয়াও যাজ্ঞবল্‌ক্য তাহার বিনাশ হয় বলিয়াছেন এবং দেহ-ত্যাগের পরে তাহার সংজ্ঞা থাকে না বলিয়াছেন। ইহার অর্থ মুক্তিতে আত্মার বিশেষ জ্ঞান থাকে না। (শ-ভা ১।৪।২২) তাহার আমিত্বের লোপ হয় এবং তাহা ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়। ইহাই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক-দিগের মুক্তি। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ ঈশ্বরে মিশিয়া যান না তাহাদের ভেদ থাকে। বিশেষ জ্ঞানহীন আত্মার ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাওয়াকে যাজ্ঞবল্‌ক্য বিনাশই বলিয়াছেন, (বিনশ্যতি)। যদিও ব্রহ্মের মধ্যে তাহা অভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে। তরল মেঘাবৃত আকাশের নিম্নে সূর্য্য অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হন, কিন্তু মেঘের উপরে স্বীয় পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করেন, মেঘাপস-রণের ফলে তাহার কোনও পরিবর্ত্তনই হয় না। সেইরূপ অবিদ্যাবরণে আচ্ছাদিত ব্রহ্ম অবিদ্যার উপরি সদাই পূর্ণ গৌরবে বর্ত্তমান থাকেন।

অবিদ্যাবরণ বিদূরিত হইবার পূর্বেও তিনি যাহা ছিলেন পরেও তাহাই থাকেন, কেবল নিম্নভাগে অবিদ্যাজনিত বিশেষ জ্ঞান বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মে নূতন কিছুই ঘটে না, কিছুই তাহাতে প্রবেশ করে না। অবিদ্যাবরণমুক্ত ব্রহ্মই মোক্ষ—তাহাকে প্রাপ্তব্য বলা যায় না, তিনি নিত্যপ্রাপ্ত। বিশেষ জ্ঞানের উপরে তাহার সাক্ষীরূপে তিনি নিত্য বর্ত্তমান, সুতরাং তিনি সদাই "প্রাপ্ত"। কিন্তু জীবের বিশেষ জ্ঞানে সেই প্রাপ্তি-জ্ঞান নাই। বিশেষ জ্ঞানের যখন অভাব হয়, তখন তাহা জানিববার কেহই থাকে না।

ভ্রান্তি-অপগমে রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় মুক্তিতে সংসারের জ্ঞান তিরোহিত হয়, শঙ্কর বহু স্থানে একথা বলিয়াছেন। এই সকল উক্তি দ্বারা তিনি সংসারকে ঐকান্তিক মিথ্যা বলেন নাই। মাণ্ডুক্য উপনিষদে ঋষি জাগরিত অবস্থাকে "বহিঃপ্রজ্ঞ" অবস্থা, স্বপ্নাবস্থাকে "অন্তঃপ্রজ্ঞ" অবস্থা বলিয়া সুষুপ্তিকে "একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়" অবস্থা বলিয়াছেন। "একীভূত" অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার পৃথক পৃথক রূপে অনুভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময় অবস্থায় একীভূত। প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন জ্ঞান ঘনীভূত হইয়া এই অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় আত্মা সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী ও ভূতদিগের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। চতুর্থ অবস্থা, "প্রপঞ্চোশম" অবস্থা—যে অবস্থায় সকল প্রপঞ্চ উপশান্ত হয়। প্রপঞ্চোপশমে প্রপঞ্চের নাশ হয় না. প্রপঞ্চ ব্রহ্মে বিলীন হয়। তখন এক "আত্মামাত্র প্রত্যয়সার" রূপে আত্মা থাকেন। তুরীয় অচেতন অবস্থা নহে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন, সত্যের বিভিন্ন রূপ দেখিবার জন্য আমাদের বিভিন্ন শক্তি (faculties) আছে। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের ফলে বিশ্বের রূপেরও ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন হয়। তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহ্মই জগতের পারমার্থিক সত্য, তখন মায়ার আবরণ উন্মোচিত হয় এবং ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। মুক্ত পুরুষের উপরে মায়ার আবরণ-শক্তির প্রভাব থাকে না। যখন ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অনুভব হয়, তখন নামরূপের সহিত আমাদের বন্ধন ছিন্ন হয় এবং তাহাদের কোনও আকর্ষণ থাকে না। যতদিন ইন্দ্রিয়গণ থাকে ও বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতে থাকে, ততদিন তাহারা থাকে। মরীচিকার স্বরূপজ্ঞানের পরেও মরীচিকার প্রতীতি হয়, কিন্তু তাহাদ্বারা প্রতারিত হইবার ভয় থাকে না। সেইরূপ জগতের মায়িকরূপ যখন মায়িক বলিয়া প্রতীত হয়, তখন তাহাদ্বারা প্রতারিত হইবার

সম্ভাবনা থাকে না। জগতের প্রপঞ্চ রূপ ব্রহ্মে বিলীন হউক অথবা ব্রহ্মের ভাগ বলিয়া প্রতীত হউক, জগৎ আত্যন্তিক মিথ্যা নহে। *

শঙ্কর বলিয়াছেন "যৎ অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিতং অ-পারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব-রাগ-দ্বেষাদি-দোষ-কলুষিতম্ অনেকানর্থযোগি, তৎবিলয়নেন তদ্বিপরীতম্ অপহতপাপ্মাত্মাদিগুণকং পারমেশ্বরং স্বরূপং বিদ্যয়া প্রতিপদ্যতে। সর্পাদিবিলয়নেন এব রজ্জ্বাদীন্।" তত্ত্ববিদ্যা অবিদ্যাজাত রূপের বিলয় করিয়া শুদ্ধরূপের প্রাপ্তি করায়, যেমন রজ্জুতত্ত্বজ্ঞান কল্পিত সর্পের বিলয় করিয়া অকল্পিত রজ্জুরূপ প্রতীতি করায় (শ-ভা ১।৩।১৯)। আরও বলিয়াছেন "এক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থো নিত্যঃ বিজ্ঞানধাতুঃ অবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবৎ অনেকধা বিভাব্যন্তে। নান্যো বিজ্ঞানধাতুঃ অস্তি ইতি"-এক পরমেশ্বর কূটস্থ নিত্য বিজ্ঞানধাতু (চিৎ-এক রস), তিনি মায়াবীর মত অবিদ্যা মায়া দ্বারা নানা আকারে প্রকাশিত হইতেছেন। তিনি ভিন্ন বিজ্ঞান ধাতু অন্য কিছু নাই।" "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবে কূটস্থনিত্যে একস্মিন্ অসঙ্গে অরূপে পরমাত্মনি তৎ বিপরীতং জৈবং রূপং ব্যোম্নি ইব তলমলাদি পরিকল্পিতং তদাত্মৈকত্ব-প্রতিপাদন-পর-বাক্যৈঃ ন্যায়োপেতৈঃ দ্বৈতবাদ-প্রতিষেধৈশ্চ অপনেষ্যামি ইতি পরমাত্মনো জীবাৎ অন্যত্বং দ্রঢ়য়তি, জীবস্য তু ন পরস্মাৎ অন্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতি।" ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে পরমাত্মা এক। অনন্ত আকাশে যেমন মালিন্যাদি কল্পিত হয়, তেমনি পরমাত্মার আশ্রিত অজ্ঞান প্রভাবে তাহাতে জীবত্ব ও প্রপঞ্চ কল্পিত হইতেছে। দ্বৈতনিষেধক 'অদ্বৈত'-প্রতিপাদক যুক্তি সহ শ্রুতি বাক্যের দ্বারা তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি পরমাত্মা হইতে জীবের প্রতীয়মান অন্যত্ব দৃঢ় করিয়া পরে পরমাত্মা হইতে জীবের যে প্রকৃত অন্যত্ব নাই, তাহা প্রতিপাদন করিবেন (শ-ভা ১।৩।১৯)।

শঙ্করের উপরিউক্ত উক্তি এবং ঐ প্রকার অন্যান্য উক্তি হইতে মনে হয় যে চিদ্রূপ বিজ্ঞান-ধাতু একমাত্র। কিন্তু অবিদ্যাকর্তৃক বিভিন্ন কেন্দ্রে পরস্পর সংবদ্ধ এক প্রকার বিজ্ঞান-প্রবাহের উদ্ভব হয়। কাহার বিজ্ঞান, জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ নাই, কেননা পরমাত্মারূপ অনন্ত সমুদ্রের বক্ষে এই সকল বিজ্ঞান-বুদ্‌বুদ উঠিলেও এবং পরমাত্মা তাহাদের সাক্ষী হইলেও, তাহারা নির্লিপ্ত পরমাত্মার বিজ্ঞান নহে। প্রত্যেক কেন্দ্রের বিজ্ঞান-প্রবাহের সঙ্গে "আমি"-

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, Indian Philosophy vol II P. 639.

জ্ঞান যুক্ত থাকে, কিন্তু এই "আমিত্বের" যেমন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, বিজ্ঞান-বুদবুদদিগেরও তেমনি পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে এই সকল বুদবুদের সঙ্গে "আমি"-জ্ঞানেরও বিনাশ হয়। ইহাই মোক্ষ। "আমি"-জ্ঞানযুক্ত বিজ্ঞান-বুদবুদপুঞ্জের সাক্ষী পরমাত্মা পূর্ব্বে যাহা ছিলেন 'আমি'র বিনাশের পরে তাহাই থাকেন। তাঁহাতে কোনও পরিণাম হয় না। আমিত্ব-যুক্ত বিজ্ঞান-প্রবাহ নানাজন্মে নানারূপে আবির্ভূত হয়, তিরোহিত হয়, দুঃখকষ্ট ভোগ করে। যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি হয়, আমিত্বযুক্ত বিজ্ঞান-প্রবাহেরও নিবৃত্তি হয়। এই নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কেহ প্রাপ্ত হয়না। তাহা ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান, তাহাই ব্রহ্ম। যখন মোক্ষ হয়, তখন তাহা ভোগ করিবার জন্য আমিত্বযুক্ত জীব থাকে না। কিন্তু এই জীব—এই আমিত্বযুক্ত বিজ্ঞান-শ্রেণী—ঐকান্তিক মিথ্যা নহে। জড়জগতের অস্তিত্বের মতো তাহার ব্যবহারিক (সুতরাং নশ্বর) অস্তিত্ব আছে। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ", ইহার অর্থ জীবের মধ্যে যিনি সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান, তিনিই ব্রহ্ম—জীব-সাক্ষী। তিনি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। জীবের নশ্বর অংশ ব্রহ্ম নহে।

শঙ্কর, ক্যাণ্ট্‌ ও ফিষ্‌টে (Fichte)

শঙ্কর ও ক্যাণ্ট্‌ উভয়ের মতেই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগৎ সামুৎপাদিক (phenomenal), উভয়ের মতেই জ্ঞানের উৎপত্তি যে প্রকারে হয়, তাহাতে যাহা পারমার্থিক সৎ, তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। শঙ্করের মতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগৎ দেশ, কাল ও কারণত্বের নিয়মকর্তৃক শাসিত, কিন্তু যাহা পরমার্থ সৎ তাহা দেশ, কাল ও কারণত্বের অতীত। ক্যাণ্টের মতে বাহ্য বস্তুকর্তৃক ইন্দ্রিয়ে যে সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহাই আন্তরিন্দ্রিয়-প্রদত্ত দেশ ও কালের ছাপ পরিয়া বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে বুদ্ধির প্রকারগুলি (categories) প্রযুক্ত হয়। ইহার ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার সহিত সংবেদনের যাহা কারণ, তাহার সাদৃশ্য অনুমান করা যায় না। শঙ্করের মতে দৃশ্যমান্‌ জগতের তলদেশে ব্রহ্ম (বিষয়-চৈতন্য) বর্ত্তমান। আমাদের আভ্যন্তরীণ সুখ, দুঃখ প্রভৃতির তলদেশেও যে অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা বর্ত্তমান, তাহাও ব্রহ্ম। ক্যাণ্ট্‌ সুখদুঃখাদি মানসিক অবস্থাকে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চঞ্চল জগৎকে বলিয়াছেন phenomena এবং তাহার তলস্থ নিশ্চল বস্তুকে বলিয়াছেন noumenon। শঙ্করের মতে

একই অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমুৎপাদদিগের অন্তরালে বর্ত্তমান। ক্যাণ্ট্ তাঁহার Critique of Pure Reasonএর প্রথম সংস্করণে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ noumenaএর একত্ব-সম্বন্ধে একটা আভাস দিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে উভয়ের ভিন্নতা স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেন। শঙ্কর জগতের নানাত্ব অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু ক্যাণ্ট্ বহু স্ব-গত বস্তুর (things in themselves) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ক্যাণ্ট্ Berkeleyর বিষয়িনিষ্ঠ-বিজ্ঞানবাদ অস্বীকার করিয়া বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়াও বাহ্য জগতের সত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বাহ্য ও আন্তর উভয় জগৎই ব্রহ্মে অধ্যস্ত অর্থাৎ তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই বলিয়াছেন।

ক্যাণ্টের মতে জ্ঞানে যাহা প্রাপ্ত (given) তাহা জ্ঞান নহে। প্রাপ্ত উপাদানকে অন্তরিন্দ্রিয় ও বুদ্ধি জ্ঞানে পরিণত করে। শঙ্করের মতে জ্ঞানের এই দ্বিবিধ উপাদানের মধ্যে বিরোধ নাই, তাহারা পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য-যুক্ত। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শঙ্কর অনুল্লঙ্ঘনীয় বিভেদ দর্শন করেন নাই। যদিও বুদ্ধিদ্বারা সত্যে উপনীত হওয়া যায় না, তথাপি শঙ্করের মতে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ে প্রাপ্ত বিষয় বুঝিতে সাহায্য করে।

বিষয়িনিষ্ঠ বিজ্ঞানবাদী ফিষ্টে (Subjective Idealist) ইন্দ্রিয়ে লব্ধ সংবেদন যে বাহ্য বস্তুদ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ক্রিয়াপর অহমের (Ego) ক্রিয়ার ফলে তাহার বিপরীত এক তত্ত্বের উদ্‌বব হয়, যাহার ধর্ম্ম বিপ্রকর্ষণ। ফিষ্টে এই বাধার নাম দিয়াছেন anstoss। Anstossএর সংস্পর্শে আসিবামাত্র অহমের বহির্মুখী ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হয় এবং অহমের দিকে ফিরিয়া আসে। ইহার ফল হয় অহমের ব্যবচ্ছেদ। অহম্ হইতে অনহম্ (Non-ego) বিচ্ছিন্ন হয় এবং Anstoss-এর ক্রিয়ার ফলে সংবেদনের সৃষ্টি হয়। ক্যাণ্ট্ দেশ ও কালের প্রত্যয়ের উৎপত্তির জন্য মনের বাহিরে যান নাই। তাঁহার মতে মনই দেশ ও কালের উৎপত্তি স্থল। ফিষ্টের মতে Anstossএর ক্রিয়ার ফলে বাহ্য জগতের প্রতীতি হয়। বাহ্য জগতের মনোবাহ্য অস্তিত্ব নাই। শঙ্কর বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিলেও তাঁহার মতে যে অবিদ্যা দ্বারা বাহ্য বিষয়ের সৃষ্টি হয়, তাহা বিষয়িনিষ্ঠ (Subjective)। Anstoss ও অবিদ্যার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

শাঙ্কর দর্শন ও ব্রহ্মসূত্র

শঙ্করের দর্শন নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। ইহাই উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের মত বলিয়া শঙ্করের দাবী। শঙ্কর উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র হইতে তাঁহার দার্শনিক মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথবা স্বোদ্ভাবিত দর্শনের আলোকে তিনি উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু তাঁহার দর্শন যে দার্শনিক জগতে এক অতুল্য কীর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহু উপনিষদের মধ্যে নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ উভয় বাদের সমর্থনই পাওয়া যায়। শঙ্কর পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা—জ্ঞানের এই দুই বিভাগের কল্পনা দ্বারা উপনিষৎদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ তাঁহার মতে পরাবিদ্যা। কিন্তু বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে অনেক স্থলে বিশিষ্টাদ্বৈত মতে উপনিষদ বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাদরায়ণের সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত ; একাধিক ভাবে তাহাদের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলে বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। "অধিকং তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ" (ব্র সূ ২।১।২২) "শ্রুতি", জীব ও ব্রহ্মের ভেদ-নির্দেশ করিয়াছেন সুতরাং ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক ; "অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" (২।৩।১২) শ্রুতি "নানার" উপদেশ করিয়াছেন সুতরাং জীব ব্রহ্মের অংশ (বিবর্ত্ত নহে), "বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিম্ আহ" (৪।৪।১৯) "শ্রুতি ব্রহ্মের বিকারের কথা বলিয়াছেন সুতরাং তাহার বিকারী ও নির্বিকার উভয়বিধ রূপই আছে"—প্রভৃতি সূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষ রূপ সুস্পষ্ট। রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি অনেকে সেই ভাবেই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু Thibaut বলেন The task of reducing the whole of the Upanishads to a system consistent and free from contradictions is an intrinsically impossible one. But the task once given, we are quite ready to admit that Sankara's System is most probably the best that can be devised *—সকল উপনিষৎ-দিগকে সুসম্বদ্ধ ও স্ববিরোধহীন প্রস্থানে পরিণত করা অসম্ভব। যদি তাহা করিতেই হয়, তাহা হইলে বলিব যে শঙ্করের দার্শনিক প্রস্থানই সম্ভাব্য প্রস্থানদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। Gough বলেন "The teaching

* Introduction to Sankara Bhashya.

of Sankara is the natural and legitimate interpretation of the doctrines of the Upanishads. *—শঙ্করের ব্যাখ্যাই উপনিষৎদিগের স্বাভাবিক ও ন্যায্য ব্যাখ্যা। Jacobi বলেন "It may be admitted that if the impossible task of reconciling the contradictions of the Upanishads and reducing them to a harmonious and consistent whole is to be attempted at all, Sankara's system is about the only one that could do it. †—উপনিষদদিগের পরস্পরের মধ্যে যে সকল বিরোধ আছে তাহাদের সমন্বয় করিয়া যদি একটি সংগতিপূর্ণ প্রস্থানে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে শঙ্করের প্রস্থানই একমাত্র তাহা করিতে সক্ষম। সুতরাং মোটের উপর শঙ্করের দর্শনের সহিত উপনিষদের সামঞ্জস্য সর্ব্বাধিক, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠায় শঙ্করের প্রধান অবলম্বন মায়া। কিন্তু মায় "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম অনির্বচনীয়া"—সৎ ও নহে, অসৎও নহে, অনির্বচনীয়। অবশ্য অনেক টীকাকার মায়ার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু মায়া যদি সৎ বা অসৎ কিছুই না হয়; তাহার স্বরূপ যদি অনির্বচনীয় হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারা ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করা, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য "বেদান্ত বাক্যকুসুম"গুলি একত্র গ্রথিত করা, এবং তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা। শঙ্করের উদ্দেশ্যও তাহাই। কিন্তু এই কার্য্য সাধন করিতে শঙ্করকে স্থানে স্থানে বাদরায়ণের অননুমোদিত পন্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছে ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাঁহার দার্শনিক সৌধ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল।

আধুনিক বিজ্ঞান ও মায়াবাদ

বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পোয়ঁকারে (Poincare) লিখিয়াছেন, "Does the harmony, which human intelligence thinks it discovers in Nature, exist apart from such intelligence? Assuredly no. A reality completely independent of the spirit

* Gough—Philosophy of the Upanishads P. viii.

† Introduction to Vedanta-Sara.

that conceives it, sees it or feels it, is an impossibility. A world so external as that even if it existed, would be for ever inaccessible to us. What we call "objective reality" is strictly speaking that which is common to several thinking beings, and might be common to all. This common part can only be the harmony expressed by mechanical laws". (প্রকৃতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা মানবীয় বুদ্ধি দেখিতে পায় বলিয়া মনে করে, সেই শৃঙ্খলার কি বুদ্ধিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে ? নিশ্চয়ই নাই। যে চিৎপদার্থ কোনও বস্তুর ধারণা করে, অথবা তাহা দেখে বা অনুভব করে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সে বস্তুর অসম্ভব। এতাদৃশ জগতের অস্তিত্ব যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহা কখনও আমাদের জ্ঞানগম্য হইত না। আমরা যাহাকে মনোবাহ্য বস্তু বলি, প্রকৃত পক্ষে তাহা কতিপয় মননশীল জীবের পক্ষে সাধারণ বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু নহে। হয়তো তাহারা সকল জীব-সাধারণ হইতে পারে। যান্ত্রিক নিয়মসমূহ দ্বারা যে শৃঙ্খলা ব্যক্ত হয়, তাহাই এই সাধারণ অংশ)। ইহা হইতে আধুনিক বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে তাহা বুঝিতে পারা যায়। *

এডিংটন বলেন "it is the inexorable law of our acquaintance with the external world that that which is presented for knowing becomes transformed in the process of knowing." ? † (বাহ্য জগতের সহিত আমাদের যে পরিচয়, তাহার অলঙ্ঘ্য নিয়ম এই যে যাহা জ্ঞাত হইবার জন্য উপস্থাপিত হয়, জ্ঞানের উৎপত্তিপদ্ধতিদ্বারা তাহা রূপান্তরিত হয়।) অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া এমন, যে তাহা দ্বারা বাহ্যবস্তুর বাস্তব রূপের পরিবর্ত্তন হয় এবং নূতন রূপে তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহার সত্য রূপের সহিত আমাদের পরিচয় হয় না।

বিজ্ঞান মতে জড় জগৎ পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা নির্মিত। পূর্ব্বে পরমাণু জড়ের অবিভাজ্য অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণুর অবিভাজ্যতা নাই। পরমাণুদিগের উপাদান প্রোটন এবং ইলেকট্রনই জড় বস্তুর অবিভাজ্য অংশরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমবায়ে গঠিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

* New Pathways in science by Eddington. p. 1

† Do Do Do „ Do p. 7

প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রনদিগের অবস্থান সৌর জগতের মধ্যে সূর্য্য ও গ্রহদিগের অবস্থানের অনুরূপ। সৌর জগতের মধ্যস্থলে সূর্য্য, সূর্য্যের চতুর্দিকে গ্রহগণ স্ব-স্ব কক্ষে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থ এক কেন্দ্রীণের চতুষ্পার্শে কতকগুলি ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগে বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই কেন্দ্রীণও (nucleus) কতকগুলি প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমবায়ে গঠিত। সূর্য্য ও তাহার গ্রহগণের মধ্যে যে পরিমাণ ব্যবধান, কেন্দ্রীণ ও তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনদিগের মধ্যেও তাহাদের পরিমাণের অনুপাতে ব্যবধান তাহার অনুরূপ। সৌর জগতের মধ্য স্থানের সামান্য অংশই সূর্য্য ও গ্রহগণ কর্তৃক অধিকৃত। অধিকাংশ স্থানই শূন্য। প্রত্যেক পরমাণুর অধিকৃত স্থানেরও অতি সামান্য অংশই কেন্দ্রীণ ও তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনগণ কর্তৃক অধ্যুষিত। অবশিষ্ট অংশ শূন্য। সৌর জগতের শূন্য অংশ ও সূর্য্যের অধিকৃত অংশের মধ্যে যে অনুপাত, পরমাণুর শূন্য অংশ ও কেন্দ্রীণের অধিকৃত অংশের অনুপাত তাহার সমান। ইহার ফলে যে বস্তু রন্ধ্রহীন বলিয়া অনুভূত হয় তাহা রন্ধ্রহীন নহে, তাহা অসংখ্য রন্ধ্রে পূর্ণ, তাহার অতি নগণ্য অংশই প্রোটন ও ইলেকট্রনের অধিকৃত। প্রত্যেক বস্তুই ঝাঁঝরার মতো। এই বিশ্ব অনন্ত শূন্যের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন প্রোটন ও ইলেকট্রনদিগের দ্বারা গঠিত দ্রব্যদিগের সমবায় মাত্র। যাহা নীরেট বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা নীরেট নহে। কঠিন প্রস্তর ও লৌহ রন্ধ্রহীন রূপে দৃষ্ট হইলেও, অসংখ্য ছিদ্রদ্বারা পূর্ণ। সুন্দর মানব দেহের, অধিকাংশই শূন্য, সেই শূন্যের মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রনগণ প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। সুতরাং জগতের যে রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা তাহার প্রকৃত রূপ নহে। জ্ঞানোৎপত্তিকালে জগতের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

বাহ্য জগতে বর্ণ বলিয়া কিছু নাই। অথচ শ্বেত, নীল প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণ আমরা দেখিতে পাই। যে বর্ণগুলি আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকটি আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের (Wave length) নির্দ্দেশক সংখ্যার অতিরিক্ত কিছু নহে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের কোনওটিই জড় বস্তুর নাই। আছে কেবল তরঙ্গ বা স্পন্দন। এই স্পন্দন কাহার?

প্রোটন ও ইলেকট্রন নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ—শক্তির ব্যক্ত অবস্থা। প্রতি সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্পন্দনে এই শক্তির প্রকাশ। জলের স্পন্দন আমরা দেখিতে পাই, বাতাসের স্পন্দন অনুভব করি। কিন্তু শক্তির স্পন্দন

হয় কোন আধারে? কেহ কেহ বলেন সর্ব্বব্যাপী ইথারে। কিন্তু ইথারের অস্তিত্বে সকল বৈজ্ঞানিকের আস্থা নাই। না থাকিলেও আলো, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি রূপে শক্তি যে স্পন্দনেই প্রকাশিত হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করেন না। ইথার যদি না থাকে, তবে এই স্পন্দনের আধার শূন্য দেশ (Empty space)—দুঃসাধ্য কল্পনা! কিন্তু ইহাই বৈজ্ঞানিক কল্পনা। জড়ের স্থূলত্ব শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সংখ্যানুযায়ী স্পন্দনমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই স্পন্দন-সর্ব্বস্ব জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু?

যে প্রোটন ও ইলেক্ট্রন জড় বিশ্বের উপাদান, তাহারা জ্যামিতির বিন্দু সদৃশ। তাহাদের দৈশিক পরিমাণ (magnitude) নাই, ব্যাপ্তি নাই, কোনও আকার নাই, অথচ তাহারাই স্থানব্যাপী বিরাট্ জগৎরূপে প্রকাশিত। এই প্রতীয়মান রূপ জগতের স্বরূপগত নহে, অথচ মানুষের ইন্দ্রিয়ে ও বুদ্ধিতে জগৎ এই রূপেই প্রতিভাত হয়। এই রূপ মিথ্যা—নামরূপমাত্র। ইহাকে মায়া ভিন্ন আর কি বলা যায়?

বিজ্ঞান জগতের যে রূপ আবিষ্কার করিয়াছে তাহা বুদ্ধির সৃষ্টি। বুদ্ধির নিয়ামক যে সকল নিয়ম, তাহারা আমাদের প্রাত্যহিক জগতেও (যে জগৎ আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে প্রতিভাত, তাহাতে) দৃষ্ট হয়। যে জগৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যাহা নাই তাহা সত্য বলিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, তাহার উপর নির্ভরশীল বুদ্ধি জগতের যে নূতন রূপের আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাকেও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া নিঃসংকোচে গ্রহণ করা যায় কি?

পরিসমাপ্তি

শঙ্কর অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ৩২ বৎসরে তিনি যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অন্য কেহ সেরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই। উপনিষদের অদ্বৈত দর্শন তাঁহার ভাষ্যে পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার প্রাচীন ব্রহ্মবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছিল। তিনি যে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৈদিক যাগযজ্ঞ অপেক্ষা তাহাদ্বারা লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা অধিকতর পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। মুক্তির জন্য তিনি কোনও বিশেষ দেবতার উপাসনার বিধি দান করেন নাই—বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, শক্তি সকলেরই স্তব তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালপ্রচলিত অনেক দূষিত প্রথার তিনি

সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি এবং সাধক ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের রক্ষণ ও প্রচারের জন্য তিনি ভারতবর্ষের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন—দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ এবং দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরী মঠ। এই সকল মঠ এখনও বর্ত্তমান আছে।

শঙ্করের দর্শন সম্বন্ধে অধ্যাপক থিব বলেন যে "দর্শনের দিক হইতে শঙ্করের সমর্থিত মতই ভারতীয় সকল দার্শনিক মতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সাহসে, গভীরতায় এবং যুক্তির সূক্ষ্মতায় ভারতীয় অন্য কোনও দর্শনই শঙ্করের দর্শনের সহিত তুলনীয় নহে।" জগতের দর্শনেও শঙ্করের স্থান অতি উচ্চে।

শঙ্কর তাঁহার দর্শনে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন। তবু তাঁহার দর্শনকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মত বলিয়াছেন। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদের মায়াবাদ সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, তাঁহার মায়াবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদ হইতে একান্ত ভিন্ন। শঙ্কর জগৎকে 'মায়া' বলিলেও তাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা—ইহা সত্য। কিন্তু এখানে 'মিথ্য' অর্থ অস্তিত্ব-হীন নহে, শশশৃঙ্গ অথবা বন্ধ্যাপুত্রের মতো অলীক নহে; জগৎ-ভ্রম—শুক্তিতে রজত-ভ্রম এবং রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতোও নহে। শুক্তিতে রজত-জ্ঞান এবং রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান ক্ষণ কাল পরেই বাধিত হয়, কিন্তু জাগতিক বস্তুর জ্ঞান আমুক্তি বাধিত হয় না। জগতের অনুভূতি আমাদের হয়, সে অনুভূতির এক ভিত্তিও আছে। সুতরাং জগৎ ঐকান্তিক মিথ্যা নহে। কিন্তু জগৎ নশ্বর, নিত্য-পরিণামী ও চঞ্চল, জগৎ সৎ নহে। জাগতিক বস্তু যাহাতে অধ্যস্ত হয়, সেই ব্রহ্মই সৎ, অধ্যস্ত জগৎ অসৎ। ব্রহ্ম noumenon, জাগতিক বস্তু তাহার phenomena। Noumenon এর উপরে phenomena দিগের আবির্ভাব হয় কেন, এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা জানি না। এই অজ্ঞাত শক্তিই 'মায়া'। এই শক্তিবশতঃই সমুদ্রে তরঙ্গের মত ব্রহ্ম-noumenon-সমুদ্রে অনবরত জাগতিক বস্তুরূপ phenomena-তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। ইহাই মায়া। এই মায়াবশে যে জগতের উদ্ভব ও বিলয় অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে, তাহার অন্তর্গত জীব মায়ার বশ হইয়াও মায়ার স্বরূপের আলোচনা করিতেছে। মায়া নিতান্ত মিথ্যা নহে, মায়ার সৃষ্টিও সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন নহে।

ব্রহ্ম নির্গুণ। নির্গুণ কোনও বস্তুর অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। এরূপ কোনও বস্তুর ধারণা ও বর্ণনা করাও অসম্ভব। তাই ব্রহ্মকে মনের অতীত বলা হইয়াছে। কিন্তু "গুণ" শব্দদ্বারা এখানে আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য 'গুণ'ই সূচিত হইয়াছে। এই জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের বিকার। আমাদের পরিচিত যাবতীয় গুণই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার। ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত। জাগতিক কোনও গুণ ব্রহ্মে নাই। ব্রহ্মকে আমাদের পরিজ্ঞাত যাবতীয় গুণের অতীত বলিলেও শঙ্কর তাঁহাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম একেবারে যে বাক্য ও মনের অতীত, তাহা নহে। সৎ এবং চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। সৎ-ত্ব (অস্তিত্ব) কোনও গুণের বোধক না হইলেও চিৎ ও আনন্দকে গুণ না বলিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু এই চিৎ ও আনন্দ আমাদের পরিজ্ঞাত চিৎ ও আনন্দ নহে। ব্রহ্ম চিৎত্ব ও আনন্দত্ব-গুণান্বিত নহেন—তিনি চিৎ ও আনন্দ। সৎ এবং চিৎ ও আনন্দ অভিন্ন। এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য না হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত, সুতরাং তাঁহার চিৎ-ত্ব ও আনন্দ-ত্ব আমাদের পরিজ্ঞাত চিৎ-ত্ব ও আনন্দ-ত্ব হইতে ভিন্ন। সুতরাং আমাদের পরিজ্ঞাত কোনও গুণ ব্রহ্মে নাই ইহা স্বীকার করিলেও, কোনও গুণই তাঁহাতে নাই ইহা বলা যায় না। তাহা বলিলে ব্রহ্মকে "বস্তু-শূন্য বিকল্প" (বস্তুত্বহীন কল্পনা মাত্র) বলিতে হয়। ব্রহ্মে মানবীয় গুণের আরোপ নিষিদ্ধ—কেননা তিনি আমাদের পরিজ্ঞাত যাবতীয় গুণের অতীত। কিন্তু তিনি আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত গুণেরও অতীত, ইহা নিতান্তই দুঃসাহসিক উক্তি। গুণের আরোপ করিলে ব্রহ্মের অসীমত্ব সংকুচিত হয়, ইহাও বলা যায় না, কেননা অসীম গুণের আরোপে অসীমত্ব সংকুচিত হইবার কারণ নাই। স্পিনোজা বলিয়াছিলেন, কার্য্য তাহার কারণের নিকট যাহা প্রাপ্ত হয়, কারণে তাহার অস্তিত্ব নাই। ইহা বলিয়াও তিনি ব্যাপ্তি (Extension) ও চিন্তা (Thought) এই দুই গুণ ঈশ্বরে আরোপ করিয়াছিলেন। ইহারা অসীম বলিয়া এই দুই গুণের দ্বারা ঈশ্বরের অসীমত্বের সংকোচের আশঙ্কা তিনি করেন নাই। যখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভূত হয়। ভাষায় তাহার বর্ণনা অসম্ভব হইলেও সেই অনুভূত স্বরূপই ব্রহ্মের গুণ। সেই স্বরূপের মধ্যে যদি অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সহিত অনন্ত প্রেম ও অনন্ত ক্ষমা যে থাকিতে পারে না, তাহা বলা যায় না।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদে কোনও স্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। শঙ্কর দর্শনে ব্রহ্মই আদি, অন্ত ও মধ্য—ব্রহ্মই "সর্ব্বত্র গীয়তে।" তাহাতে জগতের অস্তিত্ব যদি বাস্তবিক অস্বীকৃতও হইত, তাহা হইলেও নিত্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার হেতু তাহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা যাইত না। কিন্তু শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক (phenomenal) অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। শঙ্করের দর্শন অজ্ঞেয়বাদও নহে। তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের নিকট ব্রহ্ম অজ্ঞেয়। কিন্তু মানবীয় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ইহাই মুক্তি—ইহাই বেদান্তের লক্ষ্য। এই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যখন লব্ধ হয়, তখন যে বাধাদ্বারা মানবের জ্ঞান সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ, তাহা বিদূরিত হয়। তখন মানবজ্ঞান অসীমপ্রায় হয়। ফলে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হয়। ভক্তিবাদীর নিকট এই পরিণাম বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি চিনি খাইতে চাহেন, চিনি হইতে চাহেন না। কিন্তু প্রেম চাহে প্রেমাস্পদের সহিত এক হইতে, ব্যবধান প্রেম সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এই ব্যবধান প্রেম কখনও অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। শঙ্করের মুক্তিতে এই ব্যবধানের বিলোপ হয় এবং তাহার ফলে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বিলুপ্ত হয় বলা হয়। কিন্তু এই ভেদের সম্পূর্ণ বিলোপ সম্ভবপর কি? সসীম যতই অগ্রসর হউক, অসীমকে ধরিয়া তাহার সহিত সম্পূর্ণ এক হইতে পারে কি? যতদিন ভেদ থাকে, ততদিন তাহার সংকোচ-সাধনেই ভক্তের সমস্ত চেষ্টা ব্যয়িত হয়। কিন্তু চেষ্টার সম্পূর্ণ সফলতা কখনও হয় কি? হইলেও তাহাকে ভয় করিবার কারণ নাই। শঙ্কর বলিয়াছেন—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ, তবাহং ন মামকীয়স্তং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ, ক্বচ ন তারঙ্গঃ সমুদ্রঃ॥

হে নাথ, ভেদ অপগত হইলেও আমি তোমারই থাকিব, তুমি আমার হইবে না। তরঙ্গ সমুদ্রেরই, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের হয় না।

৪

ভাস্করাচার্য্য

সংস্কৃত সাহিত্যে একাধিক ভাস্করাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। উদয়নাচার্য্য তাঁহার 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদয়ন দশম শতাব্দীর লোক। ইহা হইতে ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্য নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা অনেকের মত। ভাস্করের "ব্রহ্মসূত্রভাষ্য" ব্যতীত "ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যসার" নামে আর এক খানি গ্রন্থও আছে। ভাস্করাচার্য্যের জন্মস্থান নিঃসন্দিগ্ধ রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই।

ভাস্করাচার্য্যের মত "ভেদাভেদ"-বাদ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র কারণ রূপে অভিন্ন, কার্য্যরূপে ভিন্ন। ইহাই ভেদাভেদ-বাদ। ব্রহ্মের কার্য্যরূপ ঔপাধিক বা ঔপচারিক। তাহার উৎপত্তি আছে, লয় আছে। তাহা অনিত্য। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ উপাধিজাত, অভেদই স্বাভাবিক।

ভাস্করের মতের সহিত শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ের মতেরই পার্থক্য আছে। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সর্ব্বভেদবর্জিত নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্র নহেন। তিনি যাবতীয় পূর্ণতার আধার। ব্রহ্মের কারণরূপ নির্বিশেষ এক, কিন্তু কার্য্যরূপে ব্রহ্ম "নানা"। যাবতীয় বস্তু তাহাদের কারণ এবং জাতি রূপে অভিন্ন, কিন্তু বিশেষ ব্যক্তি (individual) রূপে ভিন্ন ভিন্ন। অগ্নি যেমন তৃণ ভস্ম করে, অভেদ তেমনি ভেদের নাশ করে না। ভেদ ও অভেদ তুল্যরূপে সত্য।

ভাস্করের ব্রহ্ম সগুণ, নিরাকার, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। নিরাকার রূপই তাঁহার কারণরূপ। জীব ও প্রপঞ্চ ব্রহ্মের কার্য্যরূপ। ব্রহ্ম সৎ-লক্ষণ ও বোধ-লক্ষণ, সত্যং, জ্ঞানং, অনন্তং, অদ্বিতীয়। ব্রহ্মই জীবরূপে পরিণত হন। সংসার দশায় জীব ব্রহ্মের অংশ, তাহার ভোক্তৃশক্তি অণু-পরিমাণ। ইহা তাহার ঔপাধিক পরিমাণ। জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক। উপাধিমুক্ত অবস্থায় জীব বিভু বা ব্রহ্ম। প্রলয়কালীন জীব অথবা মুক্তাত্মা ভোক্তা নহেন, সংসার কালেই জীব ভোক্তা।

ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও অপরিণত থাকেন। জগৎ সৎ, মিথ্যা নহে, কিন্তু অনিত্য, ঔপাধিক। প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্মের সহিত এক হয়। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। মায়া অনির্বচনীয়া নহে, তাহা ব্রহ্মের প্রকৃতি, বস্তু। "মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে অনয়া ইতি মায়া।"

ভাস্করের মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের উপরই মোক্ষ নির্ভর করে।

সুতরাং কর্ম্মমীমাংসা (পূর্ব্বমীমাংসা) পাঠের পরই বেদান্ত অধ্যয়ন কর্ত্তব্য। তাহার জন্ম সাধন-চতুষ্টয়ের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। শঙ্করের মতে সত্যত্ব ও নিত্যত্ব এক, উপাধি অনিত্য, সুতরাং মিথ্যা। ভাস্করের মতে সত্য বস্তু কিছুদিন সত্য থাকিয়া পরে মিথ্যা (বিনষ্ট) হইতে পারে। উপাধি নশ্বর হইলেও কিছুকাল থাকে বলিয়া মিথ্যা নহে। ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা ভাস্করের মতে স্বাভাবিক ও সত্য—সৃষ্টি, লয় ও মুক্তি সকল অবস্থাতেই সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ ঔপাধিক, সৃষ্টি ও স্থিতি-কালে সত্য হইলেও প্রলয় ও মোক্ষে সত্য নহে। উপাধি-নাশে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের নাশ হয়, যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়। ভাস্করের মতে ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে। ভেদ ঔপাধিক—স্বাভাবিক নহে, অল্পকাল স্থায়ী। অভেদই স্বাভাবিক ও নিত্য। ভাস্কর পরিণামবাদী। তাঁহার মতে ব্রহ্ম জীবের দুঃখ নিজে ভোগ করেন এবং জীবরূপে তিনি জন্মান্তরও ভোগ করেন। জ্ঞানের ফল মোক্ষ, কিন্তু কর্ম্ম মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানের অঙ্গ।

৫

যাদবপ্রকাশ

ব্রহ্মসূত্রের আর একজন ভাষ্যকারের নাম যাদবপ্রকাশ। রামানুজ কিছুদিন তাঁহার নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত অবলম্বন করিতে পারেন নাই। যাদবপ্রকাশ কাঞ্চীতে বাস করিতেন। ভাস্করের মতো তিনিও পরিণামবাদী ছিলেন এবং তাঁহার মতও ভেদাভেদ নামে খ্যাত। ব্রহ্ম তাঁহার মতে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন, এবং তিনি সত্যই চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরে পরিণত হন। ঈশ্বর যখন চিৎপদার্থ তখন চিৎ ও অচিৎ উভয়ই একই বস্তুর অবস্থাভেদমাত্র। কিন্তু ব্রহ্মে পরিবর্ত্তন হইলেও তাহা দ্বারা তাঁহার বিশুদ্ধির অপহ্নব হয় না। একই বস্তু একই সময়ে ভেদযুক্ত ও অভিন্ন উভয়ই হইতে পারে। প্রত্যেক বস্তুরই দুই দিক আছে। এক দিক হইতে (কারণ ও জাতির দিক হইতে) তাহার অন্য বস্তুর সহিত অভেদ, এবং কার্য্য ও ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার দিক হইতে ভেদ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও জগৎ এইরূপ ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই। জীবের দুঃখকষ্ট ব্রহ্ম অনুভব করেন না, তিনি সর্ব্বদাই নির্লিপ্ত থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট। যাদবপ্রকাশের মতে ভেদ ও অভেদ

তুল্যরূপেই সত্য। ভাস্করের মতে উপাধি হইতেই ভেদের উৎপত্তি হয়, এবং যদিও উপাধি অসত্য নহে, তথাপি অভেদই চরম সত্য। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ঐকান্তিক ভাবে ভিন্ন—এই মত ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তিসংকুল জীবনই সংসার। এই ভ্রান্তি-নাশের জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাইব যে রামানুজ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরে কোনও রূপ ভেদই স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বরের অতিরিক্ত কেহ নাই।

৬

রামানুজ

১০২৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে শ্রীপেরুমবাদুর গ্রামে রামানুজের জন্ম হয়। পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন শ্রীলক্ষ্মণ দেশিক। পিতার নাম ছিল আসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত, মাতার নাম শ্রীকান্তিমতী। কান্তিমতীর ভ্রাতা শ্রীশৈলপূর্ণ ছিলেন শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীযামুন মুনির শিষ্য। লক্ষ্মণ কাঞ্চীর যাদবপ্রকাশের নিকট কিছুদিন বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে শ্রীভাষ্য রচনা করিবার উদ্দেশ্যে রামানুজ কাশ্মীরের অন্তর্গত সারদাপীঠ হইতে বোধায়ন বৃত্তি আনিবার জন্য শিষ্য কুরেশের সহিত তথায় গমন করেন, কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদিগণ উহা দিতে অস্বীকৃত হন। একদিন বৃত্তিটি কোনও সুযোগে প্রাপ্ত হইয়া রামানুজ উহা লইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু কেবলাদ্বৈত্যবাদিগণ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া একমাস পরে তাঁহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া আসেন। ইতিমধ্যে কুরেশ উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রামানুজ শ্রীভাষ্য রচনা করেন এবং জীবনের ষাট বৎসর শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করেন। তাঁহার জীবিত কালেই শ্রীরঙ্গমে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ব্যতীত ভগবদ্গীতার ভাষ্য, বেদান্তসার, বেদার্থসংগ্রহ এবং বেদান্তদীপ নামে আরও তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথে ভ্রমণ করিয়া অনেক বৈষ্ণব মন্দিরের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং বহুলোককে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। রামানুজ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। বিষ্ণু বিশ্বব্যাপী। বেদে আছে 'সূরিগণ তাঁহার পরমপদ সর্ব্বদা দেখিতে পান'। বিষ্ণু যাবতীয় কল্যাণ গুণের আধার, তিনি মঙ্গলময় ভগবান্। তাঁহার উপাসনাই ভাগবত ধর্ম্ম। মহাভারতে যে পঞ্চরাত্র ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম। বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণুর

মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। রামানুজের পূর্ব্বেই শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী বর্ণিত ও তাঁহার ঈশ্বরত্ব খ্যাপিত হইয়াছিল। ভাগবত ধর্ম্ম খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বেই দক্ষিণাপথে প্রচারিত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথে ভক্তকবি আলবারদিগের স্তোত্রসকল রামানুজের চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত করিত। আলোবারদিগের মধ্যে একজন স্ত্রী ও কয়েকজন শূদ্রও ছিলেম। আলোবারদিগের পরে আচার্য্যদিগের উদ্‌ভব হয়। তাঁহারা ভক্তির উপরে সুদৃঢ় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীনাথমুনি ন্যায়তত্ত্ব, পুরুষ নির্ণয় ও যোগরহস্য নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ন্যায়তত্ত্বে গৌতমের মত খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীনাথমুনি সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিয়া কেবলাদ্বৈত্যবাদ ও নানাবিধ নাস্তিক মতের নিরসন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীনাথ শরণাগতি (প্রপত্তি) সম্বন্ধে এক বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। শ্রীনাথমুনির পৌত্র যামুনাচার্য্য বেদবেদান্তে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচিত স্তোত্ররত্ন, চতুঃশ্লোকী ও গীতার্থ সংগ্রহের উপরে পরে অনেকে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যের শিষ্য শ্রীমহাপূর্ণ রামানুজের গুরু ছিলেন।

রামানুজের সিদ্ধান্ত

রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাও অদ্বৈতবাদ, কিন্তু ব্রহ্মের এই অদ্বৈত বিশিষ্ট, অর্থাৎ তাহার মধ্যে বিশেষের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত বিশেষ বিশেষ রূপের স্থান আছে। "চিৎ-অচিৎ-বিশিষ্টং অদ্বৈতং তত্ত্বম্"—ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট এক। ঈশ্বর ভিন্ন—ঈশ্বরের অতিরিক্ত কিছু নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বদোষহীন, অনন্তকল্যাণগুণযুক্ত, অবধি ও তারতম্যহীন পুরুষোত্তম। অন্যত্র ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণ অর্থে। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর। মায়া ব্রহ্মের শক্তি—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। মায়া মিথ্যা নহে। জীব ব্রহ্মের বিশেষণ-রূপ অংশ। জীব নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, কর্ত্তা ও ভোক্তা। জীব ব্রহ্মেরই পরিণাম। ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলেও জীব ও জগৎ ব্রহ্মের ন্যায়ই সত্য, ব্রহ্মেরই শরীর বলিয়া সত্য।

রামানুজের মতে ব্রহ্মে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ আছে। জীবের সহিত ব্রহ্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। জীব ব্রহ্মের অংশ—অগ্নি হইতে নির্গত স্ফুলিঙ্গের ন্যায়। জীব অণু, ব্রহ্ম বিভু, জীব অজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। জীব অল্পশক্তিমান, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। জীব ও ব্রহ্ম এক

হইতে পারে না। জগৎ অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে। "তৎত্বমসি" বাক্যে ত্বম্ শব্দে জীব যাহার শরীর, সেই ব্রহ্ম। সুতরাং ত্বং পদবাচ্য জীব ও তৎ পদবাচ্য ব্রহ্ম অভিন্ন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য জীব যে চিৎ-স্বরূপ তাহার জ্ঞাপক। শরীরী ব্রহ্মের চিৎ-শরীর বিজাতীয় বস্তু নহে। রামানুজের মতে ভগবানে আত্মসমর্পণ দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়।

প্রমাণ

রামানুজের দর্শনের বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব্বে তাহার প্রমাণ-সম্বন্ধীয় মতের বর্ণনা আবশ্যক। রামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দপ্রমাণ স্বীকার করেন। উপমানকে তিনি স্মৃতি অথবা অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। অর্থাপত্তি ও অনুভবও তাঁহার মতে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। স্মৃতির সহিত প্রত্যক্ষ জড়িত বলিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয় না, কিন্তু অনুমানও প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য। এইজন্য স্মৃতিকে রামানুজ স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—সবিশেষ ও নির্বিশেষ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানে প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যে ভেদ এবং একটি সামান্যের জ্ঞান থাকে। এই সামান্য বা জাতিই ইহার রূপ। নির্বিশেষ প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ ভেদবর্জিত বস্তুর বোধ নহে, অথবা অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-হীন ধর্ম্মযুক্ত বস্তু ও তাহার ধর্মের বোধ নহে। সর্ব্বভেদবর্জিত কোনও বস্তুর বোধ হওয়া অসম্ভব। বস্তুবিশেষের কোনও একটি বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান ব্যতীত তাহার বোধ হইতে পারে না। সকল জ্ঞানেই বিশেষ-গুণযুক্ত কোনও বস্তুর জ্ঞান হয়। সবিশেষ প্রত্যক্ষের বেলায় দেখা যায়, যে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর সেই সকল গুণই স্মৃতিতে উদিত হয়, যাহারা নির্বিশেষ প্রত্যক্ষে জ্ঞানের বিষয় হইয়াছিল। সবিশেষ বস্তুই সকল প্রমাণের বিষয়। সবিশেষ ও নির্বিশেষ প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য এই যে নির্বিশেষ প্রত্যক্ষে বিশিষ্ট বস্তু প্রথম বার দৃষ্ট হয়, এবং তাহার সমজাতীয় বস্তুর সহিত তাহার যে ধর্ম্মে সাদৃশ্য আছে, তখন তাহার জ্ঞান হইলেও, সেই ধর্ম্ম যে অন্য বস্তুরও আছে, এই জ্ঞান হয় না। পরে যখন উক্ত শ্রেণীর অন্য বস্তু দৃষ্ট হয়, তখন সাদৃশ্যের অনুভব হয়। রামানুজের মতে এক শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও, শ্রেণী-সামান্য বলিয়া কোনও বস্তু (Essence) নাই। বস্তুর বিভিন্ন অংশের একবিধ সংস্থান হইতে এই সাদৃশ্যের উৎপত্তি হয়।

যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ হইতে তাহার জ্ঞানলাভ হয় না। ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মকে প্রমাণ করিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই, ইহাও প্রমাণ করা যায় না। তিনি বুদ্ধির বাহিরে অবস্থিত। বুদ্ধি তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে না। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় শাস্ত্র (বেদ)। বেদ নিত্য, প্রতিকল্পের আরম্ভে ঈশ্বর বেদ উচ্চারণ করেন। স্মৃতি ও পুরাণে, বেদে যাহা আছে, তাহারই ব্যাখ্যা আছে। সুতরাং তাহারাও মান্য। বাসুদেব হইতে পঞ্চরাত্র আগমের উদ্ভব বলিয়া তাহাও মান্য।

রামানুজের মতে সকল প্রত্যক্ষ জ্ঞানই সত্য। ভ্রান্তজ্ঞানেও যে বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহা মিথ্যা নহে। জাগতিক সকল বস্তুই পঞ্চভূতে গঠিত। প্রত্যেক বস্তুতেই পাঁচটি ভূত আছে—ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে হইলেও সকল বস্তুতেই পঞ্চভূত মিশ্রিত আছে। এই পরিমাণের বিভিন্নতার জন্য এক বস্তুকে আমরা বলি রজত, অন্য বস্তুকে বলি শুক্তি। রজতের সঙ্গে শুক্তির যে সাদৃশ্য আছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই শুক্তির কতকগুলি উপাদান যে রজতের মধ্যে আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। মরীচিকায় জল দেখিতে পাই, কেননা সূর্য্যকিরণ এবং মৃত্তিকাকণার সহিত জল থাকে। যখন কোনও শ্বেত বস্তু পাণ্ডুরোগীর নিকট পীতরূপে প্রতীত হয়, তখন রোগীর চক্ষুর পীতবর্ণ চক্ষু হইতে নির্গত আলোকরশ্মির সহিত শ্বেত বস্তুতে সংক্রামিত হয়। স্বপ্নে নিদ্রিত ব্যক্তির কর্ম্মানুযায়ী ভোগের জন্য ঈশ্বর স্বপ্নের বিষয়ের সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকালে জীবের ভোগের জন্য ঈশ্বর এমন কতকগুলি বস্তুর সৃষ্টি করেন, যাহারা সর্ব্ব-জীব-সাধারণ, এবং কতকগুলি কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির স্বল্পক্ষণিক ভোগের জন্য। কোন কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আবির্ভূত বস্তু যে মিথ্যা, তাহা রামানুজে স্বীকার করেন না। কিন্তু সকল জ্ঞানকে সত্য বলিলেও তাহা যে জ্ঞানের বিষয়ের সমগ্র অংশের জ্ঞান, রামানুজ তাহা বলেন নাই। আমাদের কোনও জ্ঞানই সম্পূর্ণ নহে। যাহাকে আমরা সত্য জ্ঞান বলি, তাহাও জ্ঞাত বস্তুর যাবতীয় ধর্ম্মের জ্ঞান নহে। যখন শুক্তিখণ্ডকে রজত বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন তাহার কতকগুলি ধর্ম্মেরই জ্ঞান হয়, অন্য ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না। স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা যে ক্ষণস্থায়ী ও তাহা যে অন্য লোকের প্রতীতির বিষয় নহে, ইহা আমরা লক্ষ্য করি। ইহাই তথাকথিত সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে ভেদ। রামানুজের

মতে জগৎ সত্য। সুতরাং জগৎ-জ্ঞানকে তিনি ভ্রান্তি বলেন নাই—মায়া বলেন নাই। যদি তাহা শুক্তিতে রজত-জ্ঞানের মতোও হয়, তথাপি তাহা মিথ্যা নহে, পূর্ণ সত্য নহে, এই মাত্র। যখন শুক্তিতে রজত-জ্ঞান হয়, তখন শুক্তির সহিত রজতের যে যে ধর্ম্মে সাদৃশ্য আছে, কেবল তাহাদের জ্ঞানই হয়, অন্য ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না। জগতের জ্ঞানেও তেমনি জগৎ যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই বিকার, সে জ্ঞান হয় না। আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাকে ভ্রান্তি বলা হয় তাহার সম্ভাবনা নিরাকৃত হয় না।

"রামানুজ জ্ঞানের স্বভাবের মধ্যে অনুস্যূত এক নিয়তির (necessity) অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এই অলঙ্ঘ্য নিয়তিবশতঃ নির্বিশেষ (indeterminate) জ্ঞান সবিশেষ (determinate) জ্ঞানে পরিণত হয়। সর্ব্বদাই আমাদের জ্ঞান তাহার বিষয়কে সমগ্র জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। জ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইবে, তখন একটি মাত্র অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে বদ্ধ জ্ঞান উদ্ভূত হইবে। তাহার অনেক অংশ থাকিবে। এই সমগ্রের মধ্যে প্রত্যেক অংশের স্বকীয় স্থান ও কার্য্য থাকিবে, এবং সসীম হইলেও প্রত্যেক অংশের বৈশিষ্ট্য এবং অসাধারণত্ব থাকিবে। জীব যখন মুক্ত হয়, তখন পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষ্যে উপনীত হয়।" * সত্যের সাক্ষাৎকার বুদ্ধির জ্ঞান নহে। ভক্তির ধর্ম্মবিশিষ্ট ধ্যান দ্বারাই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হয়। মননদ্বারা, যুক্তিদ্বারা সত্যের সাক্ষাৎকার হয় না।

বেদপাঠে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা গৌণ। আত্মার মধ্যে মননশক্তির অতিরিক্ত যে অংশ আছে, তাহাদ্বারাই সাক্ষাৎকার হয়। মন যখন তাহার সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়, তখন তাহা জ্ঞান ও ভক্তি উভয় দ্বারা পূর্ণ হয়। বাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তুসকল যেরূপ অব্যবহিত ও সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, আন্তর প্রত্যক্ষেও (সাক্ষাৎকারে) সেইরূপই হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত এই সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ হয়।

প্রত্যেক বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে অভেদ বা ভেদ ব্যক্ত হয়। রামানুজের মতে যে বাক্যে অভেদ ব্যক্ত হয়, সেখানেও ভেদ বর্ত্তমান। ভেদহীন অভেদবাচক বাক্য অর্থহীন পুনরুক্তি মাত্র। যদি 'ক'ও 'খ' এর মধ্যে কোনও ভেদই না থাকে, তাহা হইলে "ক হয় খ" এই বাক্যের দ্বারা কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। "তৎ ত্বম্ অসি" এই বাক্যেও "তৎ" ও "ত্বমের" মধ্যে

---

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ Indian Philosophy, vol II. P. 6‌16-71

অভেদ উক্ত হইলেও ভেদও আছে। এই বাক্যের অর্থ 'তৎ' ও 'ত্বমের' মধ্যে ভেদ থাকিলেও অভেদও আছে। শঙ্কর বলেন এই ভেদ প্রতীয়মান মাত্র, সত্য নহে। রামানুজ বলেন ভেদ ও অভেদ কেবল সেই দুই পদের মধ্যে উক্ত হইতে পারে, যাদ্বারা সত্যের একই স্তরে অবস্থিত। যাবতীয় অভেদই ভেদের মধ্যে বর্ত্তমান। ঈশ্বর ও জগৎ তুল্যরূপেই সত্য, উভয়ে পরস্পর সংবদ্ধ। জগৎ-জ্ঞানে ও ঈশ্বরের জ্ঞানে একই চরম তত্ত্বের বিকাশ। উভয়ের একের মাধ্যমে অন্যের সত্তা। রামানুজের মতে চরম সৎ পরম পুরুষ—অন্যান্য পুরুষ তাহার অংশ।

দ্রব্য ও গুণ

শঙ্করের ন্যায় রামানুজও সৎকার্য্যবাদী। অবস্থান্তরাপত্তিই কার্য্যতা, অর্থাৎ অবস্থান্তর-প্রাপ্ত কারণই কার্য্য। ভাব ও অভাব উভয়ই দ্রব্যের বিভিন্ন অবস্থা।

গুণের আধারই দ্রব্য। আধারের যাহা আধেয় তাহা অদ্রব্য। দ্রব্যের আধেয় গুণ। গুণ ও সম্বন্ধ অদ্রব্য। প্রদীপ দ্রব্য। প্রদীপের প্রভাও দ্রব্য। প্রভা গুণও বটে। বুদ্ধির হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে বলিয়া বুদ্ধি দ্রব্য। বুদ্ধি আত্মার গুণও বটে। জগৎ ঈশ্বরের বিশেষণ। ঈশ্বরের দিক হইতে জগৎ অদ্রব্য। দ্রব্যই উপাদান কারণ। রামানুজের মতে দ্রব্য ছয়টি—ঈশ্বর, জীব, ধর্ম্মভূত জ্ঞান, শুদ্ধ সত্ব, কাল ও প্রকৃতি। ঈশ্বর ও জীব চেতন। প্রকৃতি, কাল ও শুদ্ধ সত্ব অচেতন। জ্ঞান চেতন ও অচেতন উভয় ধর্ম্মযুক্ত, প্রকাশ-স্বভাব বলিয়া জড়ের মতো নহে। জ্ঞানকে ধর্ম্মভূত জ্ঞান বলে। ইহা আত্মার সহযোগী। জ্ঞান কখনও তাহার নিজের জন্য নহে, ইহা সর্ব্বদাই আত্মার জন্য। ইন্দ্রিয় পথে বাহির হইয়া জ্ঞান যখন কোনও বিষয়ের সংস্পর্শে আসে, তখন আত্মার সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। বিষয় জ্ঞানকর্ত্তৃক আত্মার সংস্পর্শে নীত হয়।

অনুভূতি বা সংবিদের স্বরূপ

রামানুজের মতে বিষয়হীন সংবিদের অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক সংবিদের মধ্যে বিষয়ীর সহিত বিষয় থাকে। জ্ঞানের মধ্যে ভেদের বোধ থাকে, ভেদহীন সত্তার উপলব্ধির কোনও শক্তি আমাদের নাই। বিশুদ্ধ সংবিদ বলিয়া কোনও বস্তুও নাই। জ্ঞান স্ব-প্রকাশ সত্য, কিন্তু জ্ঞান ও অন্য জ্ঞান-বেদ্য। জ্ঞাত সকল বস্তুই জড় নহে।

জ্ঞানের বিষয় সকল অবচ্ছিন্ন, জ্ঞানও অবচ্ছিন্ন। সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে না। তখন জ্ঞান যে বিশুদ্ধ সংবিদরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহা নহে। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া লোকে মনে করে বটে, সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিন্তু কখনও ভাবে না যে বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে কেবল সে অজ্ঞানের সাক্ষীরূপে তখন বর্ত্তমান ছিল। সুষুপ্তির পরে যে সুখে নিদ্রিত ছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তখন সুখের অনুভব হইয়াছিল, এবং অনুভবকর্ত্তা-রূপে অহম্ বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় ছিল না। সুষুপ্তিতে জ্ঞানের বিষয় থাকে না বলিয়া জ্ঞানের ক্রিয়া থাকে না, কেননা বিষয়-সম্বন্ধহীন জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায় না। সুষুপ্তিতে আত্মা স্বীয় স্বাভাবিক সংবিদবস্থায় ক্রিয়াহীন জ্ঞানের সহিত অবস্থান করে। আত্মা সর্ব্বদাই অহংকারযুক্ত থাকে। সুষুপ্তির পরে যখন মনে হয় যে সুষুপ্তিতে কোনও বিষয়ের জ্ঞান ছিল না, তখন জ্ঞানের বিষয়ই ছিল না, মনে হয়, কিন্তু জ্ঞাতা তখনও ছিল, এ বোধ হয়। সুষুপ্তি কালে আত্মা যে সাক্ষীরূপে (অজ্ঞানের সাক্ষী) অবস্থান করে, তাহা শঙ্করও বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে অহংকার তখন থাকে না। কিন্তু সাক্ষী অর্থ দ্রষ্টা। যে জানিতে পারে না, সে সাক্ষী হইবে কিরূপে? যে জানে, সেই বিষয়ী, সে অহংকারসমন্বিত। সুষুপ্তিতে তমঃকর্তৃক অভিভূত থাকে বলিয়া বিষয়ীর অস্তিত্ব বোধ হয় না। কিন্তু তখনও আত্মা না থাকিলে "সুখে নিদ্রিত ছিলাম" এ বোধ হইত না। স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা স্থির আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কোনও দ্রব্য পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এ বোধ হইতে পারিত না, যদি পূর্ব্বদর্শনকালের আত্মা ও পরের দ্রষ্টা এক না হইত।

সংবিৎ ও সংবেত্তা এক নহে। সংবিদ্ জ্ঞান, সংবেত্তা (বিষয়ী) জ্ঞাতা। "অনুভূতিঃ অহম্" (আমি সংবিদ) একথা আমরা বলিনা। আমরা বলি (অনুভবানি অহং) (আমি অনুভব করি)। জ্ঞান ও তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্ব নির্ভর করে আত্মার উপর। অহংকার প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ও অচেতন। তাহাকে জ্ঞাতা বলা যায় না। আত্মাই চিৎ-রূপ, চৈতন্য আত্মার গুণ। আত্মা জ্ঞাতা, কেবল প্রকাশ নহে। জ্ঞানের ফলে আত্মার যে পরিণাম হয়, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। জ্ঞাতা জ্ঞানরূপ গুণের আধার। আত্মা নিত্য বলিয়া, তাহার গুণ জ্ঞানও নিত্য। নিত্য হইলেও জ্ঞান সর্ব্বদা প্রকাশিত হয় না। জ্ঞান স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে। কর্ম্মের প্রভাবে ইহা সংকীর্ণ হইয়া বিভিন্ন কর্ম্মের উপযোগী হয়, এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়

কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ফলে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। কিন্তু কখনও জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলোপ হয় না, যদিও ইহাতে ক্রিয়ার ন্যূনাধিক সংঙ্কোচ হয়। কিন্তু এই হ্রাস-বৃদ্ধি জ্ঞানের স্বরূপগত নহে। সুতরাং জ্ঞানের ফলে আত্মার পরিণাম হয় না।

রামানুজের মতে সংবিদ্ বা অনুভূতির স্বরূপ হইতেছে বর্ত্তমান দশায় স্ব-সত্তাদ্বারা আপনার আশ্রয়কে (আত্মাকে) প্রকাশ করা, অথবা স্ব-সত্তা দ্বারা আপনার বিষয়কে সিদ্ধ করা। (অনুভূতিত্বং নাম বর্ত্তমানদশায়াং স্ব-সত্তয়ৈব স্বাশ্রয়-প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্তয়ৈব স্ব-বিষয়-সাধনত্বং বা)। আপনার আশ্রয় আত্মাকে এবং আপনার বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করাই অনুভূতির অনুভূতিত্ব। কেহ কেহ বলেন সংবিদ কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জ্ঞানও অন্য জ্ঞান-বেদ্য। সংবিদ যখন অন্য বস্তু প্রকাশ করে, তখন নিজে জ্ঞানের বিষয় হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু এক ব্যক্তির সংবিদ তাহার তৎকালীন আকৃতি ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অপরের জ্ঞানের বিষয় হয়; ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের অতীত জ্ঞানও বর্ত্তমান জ্ঞানের বিষয় হয়।

জীব

শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্মে বাস্তব ভেদ নাই। অবিদ্যাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব। কিন্তু রামানুজের মতে জীব ব্রহ্মের মতোই সত্য—ব্রহ্মের অংশ, শাশ্বত অংশ। তাহার নিজের অংশ নাই। জীব ব্রহ্মের প্রকার বা পরিণাম, অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন হইতে জীবাত্মা ভিন্ন। জীব জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। মনের কার্য্য তিনটি —অধ্যবসায় (নিশ্চিতি), অভিমান (অহং জ্ঞান), এবং চিন্তা। অধ্যবসায়ী মন বুদ্ধি, অভিমানী মন অহংকার, এবং চিন্তাকারী মন চিত্ত নামে অভিহিত হয়। আত্মার অধিষ্ঠান হৃদ্‌পিণ্ড। সুষুপ্তিতে আত্মার বিলয় হয় না। জীব অণু-পরিমাণ হইলেও সর্ব্ব শরীরেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে সক্ষম, ক্ষুদ্র প্রদীপ দ্বারা সমস্ত গৃহ যেরূপ আলোকিত হয় সেইরূপ। দেশ ও কালে দূরবর্ত্তী বস্তু গ্রহণ করিতেও জীব সমর্থ। জীব শাশ্বত সর্ব্বগ্রাহী জ্ঞানের অধিকারী হইলেও, তাহার জ্ঞান কর্ম্মাদি-দোষ-দূষিত বলিয়া সংকীর্ণ।

জীব সংখ্যায় বহু। দেহে বদ্ধ বলিয়া জীবের দৃষ্টি সংকীর্ণ। বারংবার জীব সংসারে জন্ম গ্রহণ করে ও মৃত্যুর অধীন হয়, কিন্তু তাহার স্বরূপের

পরিবর্ত্তন হয় না। অবিনাশী হইলেও প্রলয়ে জীবের বিশিষ্ট রূপের ধ্বংস হয়, কিন্তু প্রলয়ে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল হইতে জীব মুক্ত হয় না, পরবর্ত্তী কল্পে আবার জন্ম গ্রহণ করে। অহংবুদ্ধি জীবের স্বরূপের অন্তর্গত। তাহা না হইলে মুক্তির জন্য চেষ্টার কোনও অর্থ হইত না। বদ্ধ ও মুক্তি উভয় অবস্থাতেই জীবের জ্ঞাতৃত্ব অব্যাহত থাকে। জীব কর্ত্তা বলিয়াই তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মফলে যতদিন জীব দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে ততদিন তাহার কর্ম্ম মুখ্যতঃ পূর্ব্ব কর্ম্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু দেহ-মুক্ত হইবার পরে সংকল্প-মাত্র তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

রামানুজ ত্রিবিধ জীবের কথা বলিয়াছেন—নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। নিত্য জীব বৈকুণ্ঠের অধিবাসী। তাঁহারা কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত, এবং আনন্দময়। মুক্ত জীব স্বীয় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-বলে বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। অজ্ঞান ও স্বার্থপর সংসারী জীবই বদ্ধ। বদ্ধ জীবের দেহের প্রতি আসক্তি যখন বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইতে হইতে চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ভোগ-তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়-লালসার ফলে তাহার জ্ঞান-শক্তি লোপ পায়। দৈব, মানুষ, ইতর ও স্থাবর ভেদে বদ্ধ সংসারী জীব চারি ভাগে বিভক্ত। তাহাদের দৈহিক পার্থক্যের উপর এই ভেদ প্রতিষ্ঠিত। মানুষ জীবের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির শরীরের ভেদ আছে। সংসারী জীবের মধ্যে কেহ ভোগকামী, কেহ মুক্তিকামী। মুক্তি পর্য্যন্ত সকলকেই সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। যতদিন জীব বদ্ধ থাকে, ততদিন তাহার সূক্ষ্ম শরীর বর্ত্তমান থাকে। মুক্ত জীব দেবযান পথে, পুণ্যবান্ পিতৃযান পথে গমন করে। যাহারা পাপী, মৃত্যুর পরই তাহারা সংসারে ফিরিয়া আসে, তাহারা চন্দ্রলোকে যায় না। জীবাত্মা-দিগকে ঊর্দ্ধ পথে লইয়া যাইবার জন্য আতিবাহিক পুরুষ আছে। জীব স্বরূপে ঈশ্বরের সদৃশ হইয়াও কিরূপে কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইল, তাহা বলা অসম্ভব, কেননা সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি।

জীব নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই (শ্রী ভা ২।৩।১৮)। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা"। জীব জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ নহে—জ্ঞাতা; জড়-স্বরূপ নহে। জীব অণু-পরিমাণ, সর্ব্বগত নহে।

জীব ঈশ্বরের শরীর, ঈশ্বর জীবাত্মার আত্মা। স্বরূপে জীব ঈশ্বরের সদৃশ, যদিও জীব অণু, ঈশ্বর অনন্ত। জীব ঈশ্বরের গুণ। ঈশ্বর বিশেষ্য, জীব বিশেষণ। জীব ঈশ্বরের অংশ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ। জীব কখনও ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হইতে পারে না। ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ অংশহীন হইলেও জীব

তাঁহার অন্তর্গত।("প্রকাশাদিবৎ" "(শ্রীভাষ্য ২।৩।৪৫) অর্থাৎ অগ্নির জ্যোতি যেমন তাহার অংশ, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ। গোত্ব অথবা অশ্বত্ব অথবা শ্বেত বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি বর্ণ যেমন বস্তুর গুণ বলিয়া তাহার অংশ, দেবমনুষ্যাদি দেহধারীর দেহ যেমন তাহাদের অংশ, সেইরূপ জীব ব্রহ্মের গুণ এবং দেহ বলিয়া তাহার অংশ। (শ্রীভাষ্য, ২।৩।৪৫))

ঈশ্বর জীবের আত্মা হইলেও জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা যে নাই তাহা নহে। সকল ক্রিয়াতেই পুরুষের প্রযত্ন (উদ্যোগ) অপেক্ষা করিয়া অন্তর্যামী পরমাত্মা অনুমতি দান করতঃ ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত করেন। পরমাত্মার অনুমতি ভিন্ন প্রবৃত্তি হয় না। যেমন দুই জনের সম্পত্তি যদি একজন হস্তান্তরিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে অপরের অনুমতি আবশ্যক হয়। অনুমতি আবশ্যক হইলেও হস্তান্তর ক্রিয়ার ফল যেমন সে ভোগ করে, তেমনি ঈশ্বরের অনুমতি ক্রিয়ার জন্য আবশ্যক হইলেও ক্রিয়ার ফল জীব ভোগ করে। "যাহাকে ইহলোক হইতে উর্দ্ধে লইতে তিনি ইচ্ছা করেন, তাহাকে দিয়া সাধুকর্ম্ম করান। যাহাকে নিম্নে লইতে ইচ্ছা করেন তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান" এই শ্রুতি-বাক্যের অর্থ ইহা নহে যে ঈশ্বর উন্নিনীষা ও অধোনিনীষা হেতু কাহাকেও দিয়া সাধু, কাহাকেও দিয়া অসাধু কর্ম্ম করান। এই উক্তি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। (এতৎ ন সর্ব্বসাধারণম্)॥ যিনি অতিমাত্র পরম পুরুষের আনুকূল্যে ব্যবস্থিত (অনুকূল মানসিক ভাবযুক্ত) হইয়া প্রবৃত্ত হন, তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান অতি কল্যাণজনক তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) পাইবার উপায়ে তাহার রুচি উৎপাদন করেন। আবার যে অভিমাত্র প্রাতিকূল্যে (প্রতিকূল মানসিক অবস্থায়) ব্যবস্থিত হইয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে নিগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রাপ্তি-বিরোধী অধোগতিসাধক কর্ম্মে তাহার রুচি উৎপাদন করেন। এই কথাই

"তেষাং সততযুক্তানং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে।"

এবং "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরং ইত্যাদি "মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ", ইত্যন্ত বলিয়া পরে "তান্ অহং দ্বিষতঃ ক্রূরান সংসারেষু নরাধমান্ ক্ষিপাম্যজস্রং অশুভান্ আসুরীষ্বেবযোনিষু" শ্লোকে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন (শ্রী ভা ২।৩।৪১)। কাহারও প্রতি উন্নিনীষা কাহারও প্রতি অধোনিনীষা নিষ্কারণ নহে। তাহা বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মের ফল—স্বাধীনতা-প্রসূত কর্ম্মের ফল।

শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধ অর্থাৎ কোনও কর্ম্ম করণীয়, কোনও কর্ম্ম অকরণীয়

বলিয়া উল্লেখ আছে। জীবের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে এই বিধিনিষেধ বৈয়র্থ (অর্থহীন হয়)। আবার ঈশ্বর আত্মার মধ্যে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন (আত্মানম্ অন্তরো যময়তি) ইহাও শাস্ত্রে আছে। এই বিরোধের সমন্বয়ের জন্য ভাষ্যকার বলেন জীবের ঈশ্বরকর্তৃক নিয়মন জীবের প্রযত্নাপেক্ষ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু জীবের প্রযত্ন। এই প্রযত্ন জীবের স্বেচ্ছাকৃত। জীবের কৃত প্রযত্নই প্রথম প্রবৃত্তির হেতু। এই প্রযত্নের অনুমোদন করিয়া ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। জীবের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ হইতে বিধি ও নিষেধ যে অর্থহীন নহে তাহা জানা যায়। দুর্বল ব্যক্তি যেমন সবলের সহযোগে গুরুভার কাষ্ঠাদি বহন করিয়াও তাহার নিজের প্রযত্নের জন্য বিধি-নিষেধ যোগ্য হয়, সেইরূপ জীব পরম পুরুষের অনুমতি সহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও বিধি-নিষেধ যোগ্য হয়। বেদান্তসার (২।৩।৪১)।

"বেদান্তদীপে" রামানুজ বলিয়াছেন "জীবের কর্তৃত্ব" কি পরমাত্মার আয়ত্ত অথবা স্বায়ত্ত? যে স্বীয় বুদ্ধিতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিশক্ত সেই নিয়োজ্য এবং অনুগ্রহ-নিগ্রহাস্পদ।...জীবের স্বেচ্ছাকৃত প্রযত্ন অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর তাহাকে অনুমতি প্রদান করেন বলিয়া জীব বিধি-নিষেধ যোগ্য ও নিগ্রহ অনুগ্রহাস্পদ হয়।"

উপনিষদে আত্মাকে বিভু বলা হইয়াছে। জীব যদি অণুপরিমাণ হয়, বিভু ঈশ্বরের অংশ হয়, তাহা হইলে তাহার বিভূত্ব কিরূপে সঙ্গত হয়, তাহার উত্তরে রামানুজ বলেন যে আত্মা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া সকল অচেতন বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ। এই অর্থেই আত্মা বিভু বা ব্যাপী। বস্তুতঃ আত্মা অণুপ্রমাণ। অণু হইলেও আত্মা দেহের সর্ব্বাংশ আলোকিত করিতে সমর্থ। এই জন্যেই দেহের কোনও অংশে বেদনা হইলে তাহার অনুভূতি হয়।

জীব স্বকীয় কর্ম্মের ফলে দেহের সহিত সংযুক্ত হয় এবং কর্ম্মের গুণাগুণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দেহ প্রাপ্ত হয়। দেহে সংরুদ্ধ বলিয়া তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়কর্তৃক সীমাবদ্ধ হয়, যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে, তাহার জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জীব দেহের সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করে। এই দেহাত্মবুদ্ধিই অবিদ্যা। অনাত্ম দেহে যে অহংভাব তাহাই অহংকার। দেহে বদ্ধ হইয়া ও তাহার সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া সুখদুঃখ-ভোগই বন্ধ। এই বন্ধ জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা বিনষ্ট হয়। জ্ঞান ও শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের ফলে ভক্তির উদ্ভব হয়, এবং ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনার ফলে কর্ম্মের ধ্বংস

হয়, অবিদ্যার নাশ হয় এবং মোক্ষ-লাভ হয়।) শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের জ্ঞান-লাভের জন্য মীমাংসা শাস্ত্র পাঠ আবশ্যক। মীমাংসা শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীব জানিতে পারে যে যাগযজ্ঞ দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু মোক্ষ হয় না। মোক্ষের সন্ধানে সেইজন্য তাহাকে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে হয়। বেদান্ত পাঠে জীব সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা, সকল কল্যাণ গুণের আকর পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হয় এবং তাঁহার উপাসনা করিয়া মোক্ষলাভ করে।

ঈশ্বর

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। সত্যশব্দের অর্থ নিরুপাধি সত্তা যাহা সর্ব্ববস্তু-সাধারণ। ভৌতিক ও মানসিক যাবতীয় বস্তুই সত্তাবান্। প্রত্যেক বস্তু, চেতন অচেতন, সকল বস্তুই এই সত্তার বিশেষ। জ্ঞান পদের অর্থ নিত্য অসঙ্কুচিত জ্ঞানের একাকার। অনন্ত পদের অর্থ দেশ ও কালকর্তৃক অপরিচ্ছিন্ন—স্বীয় স্বরূপভূত গুণ আনন্ত্যধর্ম্মযুক্ত। ব্রহ্ম গুণহীন নহেন। নির্গুণ শব্দের অর্থ হেয়গুণহীন, অপহতপাপ্মা, বিজর, বিশোক ইত্যাদি। তিনি নিষ্কল নিরঞ্জন, যাবতীয় প্রাকৃত হেয়গুণ-বর্জিত। কিন্তু তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সত্যসংকল্প, যাবতীয় কল্যাণগুণের আধার। নির্গুণ ব্রহ্ম শূন্যমাত্র। প্রত্যক্ষ, অনুমান অথবা শব্দ কোনও প্রমাণেই এতাদৃশ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে।

ঈশ্বরের জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণ কাদাচিৎক নহে, অর্থাৎ কখনও থাকে কখনও থাকে না এরূপ নহে। তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক-নিত্যসিদ্ধ।

বেদান্তবাক্যসকল কেবল নির্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করে না। সৎশব্দ বাচ্য ব্রহ্ম জগতের উপাদান। তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ, সর্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সত্যসংকল্প, সর্ব্বান্তর, সর্বাধার, সর্বনিয়ন্তা। (শ্রী-ভা ১।১।১)।

ঈশ্বর সতের অংশ বিশেষ নহেন। তিনি "ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর" "তাঁহার সমান অথবা অধিক" দৃষ্ট হয় না, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার পরম মহত্ত্ব ব্যক্ত হয়। ঈশ্বরই পূর্ণ সত্য, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দস্বরূপ। ঈশ্বরের প্রত্যেক গুণ অন্য গুণ সকল হইতে পৃথক হইলেও, তাহাদের দ্বারা ঈশ্বরের একত্বের হানি হয় না, তাহারা সকলেই এক ঈশ্বরেরই গুণ।

"যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, এবং পৃথিবী যাহার শরীর" ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জড় বস্তুর উল্লেখের পরে "যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান

যাঁহার শরীর, যিনি আত্মাতে অবস্থিত এবং আত্মা যাঁহার শরীর" এই রূপে চেতন বস্তর পৃথক নির্দেশ করিয়া শ্রুতি সমস্ত বস্তুই পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের শরীর আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। চেতনের স্বার্থ-সাধনে যাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত এবং ব্যবস্থাপিত করা যায়, এবং যাহা কেবল উক্ত চেতনের অঙ্গ বা অধীন, তাহা উক্ত চেতনের শরীর। সমস্ত জগৎ পরম পুরুষের নিয়মন ও ধারণযোগ্য এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন। এইজন্য সকল বস্তুই তাঁহার শরীর। "তিনি অশরীর" এতাদৃশ শ্রুতি বাক্যও আছে। সে সকল স্থানে কর্ম্মনিমিত্ত শরীরের কথা বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের শরীর কর্ম্মজাত নহে। শ্রুতিতে পরমাত্মাকে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ সত্যসংকল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদং অভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ" বলা হইয়াছে। মনোময় অর্থাৎ পরিশুদ্ধ মন দ্বারা গ্রাহ্য। এই শব্দ দ্বারা যে সকল গুণ হেয়, ঈশ্বর তাহার বিপরীত গুণান্বিত, ইহা উক্ত হইয়াছে। মলিন মনে মলিনতাই গৃহীত হয়। প্রাণ যাহার শরীর (ক্ষেত্রভূত) তিনিই প্রাণ-শরীর, সর্ব্বপ্রাণের ধারক। ভারূপ অর্থাৎ অপ্রাকৃত, অসাধারণ কল্যাণ, দিব্যরূপ বলিয়া নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত; অপ্রতিহত-সংকল্প বলিয়া সত্য-সংকল্প, আকাশের মত সূক্ষ্ম, ও স্বচ্ছরূপ (আকাশাত্মা)। সকল কর্ম্মই তাঁহার বলিয়া সর্ব্ব কর্ম্মা সকল কাম অর্থাৎ ভোগের উপকরণ তাঁহার বলিয়া সর্ব্বকাম। অপ্রাকৃত অসাধারণ নিরবদ্য নিরতিশয় কল্যাণ গন্ধ ও রস তাঁহার বলিয়া সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরস। সমস্ত কাম তাহার অবাপ্ত বলিয়া তিনি অনাদর (শ্রী-ভা ১।১।২)। পরব্রহ্ম কারণাবস্থ ও কার্য্যাবস্থ। সূক্ষ্ম ও স্থূল, চিৎ ও অচিৎ সমস্ত বস্তু তাঁহার শরীর বলিয়া তিনি সর্ব্বদা সকলের আত্মভূত। সর্ব্বাত্মক হইলেও তিনি কেবল কল্যাণ গুণের আকর। তাঁহার প্রকারভূত (mode) যে শরীর, তাহার দোষের সহিত প্রকারী তাঁহার সম্বন্ধ নাই।

ঈশ্বরের দেহ পৃথিবী আদি ভূতের সমবায় নহে, (শ্রী ভা ২।১।৯) তাহা অপ্রাকৃত। "ন ভূতসংঘ সংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ"।

সত্যসংকল্প প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরে যে জ্ঞান ব্যতীত অন্য গুণও আছে তাহা প্রমাণিত হয় (শ্রী ভা ৩।২।১৬)। ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ (৩।২।১৫)। সংরাধনেই অর্থাৎ ভক্তিরূপপ্রাপ্ত নিদিধ্যাসনেই কেবল ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয় (৩।২।২৩)।

ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ (বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম) ইত্যাদি বাক্যে

জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব ও আনন্দিত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম কিন্তু নির্বিশেষ জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ নহেন। তিনি জ্ঞান ও আনন্দের আশ্রয়। জ্ঞান-স্বরূপের জ্ঞাতৃত্ব বহু শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের আনন্দের কথাও আছে (শ্রী ভা ১।১।১)।

ব্রহ্মের জ্ঞান অব্যবহিত, তিনি অনিন্দ্রিয় হইলেও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি পুরুষ, জ্ঞান ও ইচ্ছাযুক্ত পুরুষ। তিনি পুরুষোত্তম—পূর্ণ পুরুষ। অন্যান্য আত্মা অপূর্ণ পুরুষ। ঈশ্বর যাহা সংকল্প করেন, তাহা সিদ্ধ হয়।

জ্ঞান, শক্তি ও করুণা ঈশ্বরের বহু গুণের অন্তর্গত। করুণাবশে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টিতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহারা পূর্ণতাকামী, তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে সাহায্য করেন। ঈশ্বরের প্রত্যেক গুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সনাতন ও স্বাভাবিক।

ব্রহ্মের দুইরূপ—কার্য্যরূপ ও কারণরূপ। "স্থূল-সূক্ষ্ম-চিৎ-অচিৎ-প্রকারং ব্রহ্ম এব কার্য্যং কারণং চ ইতি ব্রহ্মোপদানং জগৎ। সূক্ষ্ম-চিৎ-অচিৎ-বস্তু-শরীরকং ব্রহ্ম এব কারণং ইতি" (১।১।১)। স্থূল ও সূক্ষ্ম, চিৎ ও অচিৎ-প্রকার ব্রহ্ম কার্য্য ও কারণ উভয়ই। ব্রহ্ম জগৎতের উপাদান। সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ-শরীরযুক্ত ব্রহ্ম কারণ। সর্ব্ববেদান্তই স্থূল ও সূক্ষ্ম, চেতন ও অচেতন সকল বস্তুকে পরমাত্মার শরীর বলিয়াছেন, (২।১।৯)। ঈশ্বরের শরীর থাকিলেও তিনি কর্ম্মের বশীভূত নহেন। তিনি সত্য-সংকল্প, তাঁহার ইচ্ছাতেই তাঁহার শরীর-সম্বন্ধ হইয়াছে। "নিখিল হেয়-প্রত্যনীক অনন্ত-জ্ঞান-আনন্দ-স্বরূপ সকল ইতর-বিলক্ষণ ব্রহ্মের যেমন স্বাভাবিক অনবধি-অতিশয় অসংখ্য কল্যাণ গুণ আছে, সেইরূপ স্বীয় অভিমতের অনুরূপ অচিন্ত্য-দিব্য-অদ্ভূত-নিত্য-নিরবদ্য-নিরতিশয় ঔজ্জ্বল্য-সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাদি অনন্ত গুণগণ-নিধির স্বাভাবিক দিব্য রূপও আছে। অপার কারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্য-ঔদার্য্য-জলনিধি নিরস্ত-নিখিল-হেয়-গন্ধ অপহতপাপ্মা পরমাত্মা পর ব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ উপাসকের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ তাঁহাকে প্রাপ্তির অনুরূপ সংস্থান করিয়া থাকেন," (শ্রী·ভা ১।১।২৫)।

আবার ব্রহ্মের রূপ থাকিলেও, রূপ নাই, ইহাও বলা যায়। "অরূপবৎ এব হি তৎ-প্রধানত্বাৎ" (ব্র সূ ৩।২।১৪)। ব্রহ্ম দেবমনুষ্যাদির শরীরে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া তাহাদের রূপযুক্ত হইলেও অরূপবান অর্থাৎ রূপ-রহিতের তুল্য। অর্থাৎ জীবের মতো শরীরত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মে কর্ম্মবশ্যতা নাই। "আকাশ নামরূপের নির্বাহিতা; নামরূপ যাহার বাহিরে, তাহাই ব্রহ্ম"। এই শ্রুতি

অনুসারে সর্ব্ব বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও নামরূপ কর্তৃক ব্রহ্ম স্পৃষ্ট হন না। শরীর-সম্বন্ধ হেতু জীবের শরীর-জন্য সুখ ও দুঃখের ভোগ হয়। কিন্তু ব্রহ্মের শরীর-জাত সুখদুঃখ ভোগ হয় না। এই জন্য ব্রহ্মের রূপ থাকিলেও ব্রহ্ম অরূপ-তুল্য, অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত হইলেও ব্রহ্ম নিরস্ত-নিখিল-দোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব রূপ উভয় লিঙ্গ। কর্ম্মই দুঃখের কারণ, শরীর নহে। এ জন্য দেহযুক্ত হইলেও ঈশ্বর দুঃখ ভোগ করেন না। ঈশ্বর কর্ম্মের অধীশ্বর, তিনিই কর্ম্মফলদাতা। "স এব হি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ মহোদারঃ যাগদান-হোমাদিভিঃ উপাসনেন চ আরাধিত ঐহিকামুষ্মিকভোগজাতং স্ব-স্বরূপাবাপ্তিরূপং অপবর্গং চ দাতুং ইষ্টে। ন হি অচেতনং কর্ম্ম ক্ষণধ্বংসি কালান্তরভাবি-ফলসাধনং ভবিতুং অর্হতি" (৩।৩।৪৭)। যাগ-দান-হোমাদি দ্বারা আরাধিত ঈশ্বরই ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ ও তাহার স্বরূপ-প্রাপ্তি-রূপ অপবর্গ দান করেন। অচেতন ক্ষণধ্বংসী কর্ম্ম কালান্তর-প্রাপ্য ফল দিতে সমর্থ নহে।

দ্রব্যের সহিত গুণের যে সম্বন্ধ, দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত জীব ও অচিৎ বস্তুর সম্বন্ধ তদ্রূপ। জীব ও অচিৎ (জড়) ঈশ্বরের "প্রকার"। তাহাদিগকে "নিয়ম্য" ও "শেষ"ও বলে। ঈশ্বর "প্রকারী", "নিয়ন্তা" ও "শেষী"। জীব ও জড় উভয়েই সৎ ও অবিনশ্বর, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীন। ঈশ্বর জগতের আত্মা, জীবাত্মা যেমন জীব-দেহে অধিষ্ঠিত, তাহার চালক। জগৎ ঈশ্বরে আশ্রিত এবং তাঁহার ইচ্ছার অধীন। জীব ঈশ্বরের অন্তঃশরীর, জগৎ তাঁহার বাহ্য শরীর। জীব ও জগৎ ঈশ্বরের গুণ হইলেও, তাহারা নিজেরাও দ্রব্য—গুণবিশিষ্ট দ্রব্য। তাহাদেরও প্রকার ও শক্তি ও ক্রিয়া আছে।

ঈশ্বরের উৎপত্তি নাই। তৎ ব্যতীত অন্য যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি ঈশ্বর হইতে (২।৩।৯)। ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (অচিৎ বস্তু) এবং প্রেরিতা (ঈশ্বর)—ইহাদের স্বরূপ ভিন্ন, কিন্তু ভোক্তা ও ভোগ্য প্রকারী ঈশ্বরের প্রকার; প্রকার ও প্রকারী অভিন্ন, কেননা প্রকারী ভিন্ন প্রকারের অস্তিত্ব নাই। জীব ও অচিৎ বস্তু এইজন্য প্রকারী ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন। ঈশ্বর অনাদি। জীবও অনাদি। জীব পুরুষ, ঈশ্বর পরম পুরুষ। ঈশ্বর জগতে যেমন অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি জগদতীতও বটেন। চেতন ও অচেতন সকল বস্তুর অস্তিত্ব ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরকর্তৃক রক্ষিত। বহুধা বিভক্ত জগৎ মায়ামাত্র নহে—তাহারা ঈশ্বরের মতোই সত্য, কিন্তু ঈশ্বরই তাহাদের অস্তিত্বের ভিত্তি। অগ্নি-আদি ভাস্বর বস্তু যেমন আদিত্যের

প্রকাশ বা অংশ, সেইরূপ জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ। একবস্তুত্ব ও এক-দেশত্বকে অংশ বলে। এক বস্তুর বিশেষণ যাহা, তাহা তাহার অংশ। বিশেষণ বিশেষ্যের অংশ, বিশেষ্য অংশী। কিন্তু জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ বা বিশেষণ হইলেও ভেদও আছে—স্বভাব-বৈলক্ষণ্য আছে (শ্রী ভা ২।৩।৪৫)। "একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদং অখিলং জগৎ (শ্রী ভা ২।৩।৪৬)। নির্বিশেষ ব্রহ্ম জীব ও জগৎকর্তৃক বিশিষ্ট (বিশেষভাবপ্রাপ্ত) হন বলিয়া জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ, এবং ব্রহ্ম বিশেষ্য। গুণ দ্বারাই বিশিষ্টতা উৎপন্ন হয়। এইজন্য জীব ও জগৎ ব্রহ্মের গুণ। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর হইলেও, তাহাদের হইতে ভিন্ন ব্রহ্মের এক অপ্রাকৃত শক্তি আছে। এই শক্তিদ্বারা স্বরূপতঃ এক হইয়াও তিনি বহু রূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন। ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ সকল বস্তুর আত্মভূত। শ্রুতিতে যে নানাত্বের নিষেধ আছে, তাহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই। সাধক যখন ধ্যানে ব্রহ্মানুভব লাভ করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মের স্বরূপের অন্তর্গত এবং ব্রহ্মের বিভূতি। "তৎ ত্বং অসি" বাক্যে "তৎ" ও "ত্বম্" উভয় পদের লক্ষ্য সবিশেষ ব্রহ্ম। "তৎ" শব্দে সর্বজ্ঞ সত্য-সংকল্প জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে বুঝায়। "তৎ" পদের সামানাধিকরণ (সমান অর্থাৎ অভিন্ন অধিকরণ যাহার) "ত্বম্" পদ "অচিৎ-বিশিষ্ট-জীব-শরীরক" (অচিৎ দেহবিশিষ্ট জীব যাহার শরীর) ব্রহ্মকে বুঝায়। "তৎ" ও "ত্বম্" উভয় পদের অধিকরণ এক। এই অর্থেই জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। "তৎ" শব্দ ব্রহ্মবাচক, "ত্বম্" শব্দে যে জীবকে বুঝায়, যে জীব ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাহার আত্মা। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মকে এক বলা যায়। প্রত্যেক বাক্যেই দুই ভিন্ন বস্তুর ঐক্য ব্যক্ত হয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকে। ভেদ না থাকিলে, অভেদবাচক বাক্যের অর্থ হয় না। সুতরাং যখন "তৎ" ও "ত্বম্" অভিন্ন বলা হয়, তখন উভয়ের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহাও স্বীকৃত হয়। বামদেব বলিয়াছিলেন "আমি মনু, আমি সূর্য্য"। ব্রহ্ম সকলের অন্তরাত্মা বলিয়া এরূপ বাক্য সু-সঙ্গত।

সৃষ্টি

জীব ও অচিৎ জড় ঈশ্বরের "প্রকার" হইলেও অনাদি কাল হইতে তাহাদের একরূপ স্বাতন্ত্র্যও আছে। সৃষ্টি ও প্রলয়ে তাহারা বিভিন্ন অবস্থায় থাকে।

সৃষ্টিতে তাহাদের যে সকল ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, প্রলয়ে তাহারা থাকে না। প্রলয়ে জীব ও জড় উভয়েই সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। তখন নামরূপের ভেদ থাকে না, জড় অব্যক্ত অবস্থায় এবং বুদ্ধি সংকুচিত অবস্থায় থাকে। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের শরীর। তাহাদের অব্যক্ত ও সংকুচিত অবস্থা ব্রহ্মের কারণাবস্থা। এই কারণাবস্থা হইতে কার্য্যাবস্থার উদ্ভব হয়। তখন অব্যক্ত জড় ব্যক্ত হয়, সংকুচিত চিৎ বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই কার্য্যাবস্থাই সৃষ্টি। তখন জীবাত্মাগণ জড় দেহে প্রবিষ্ট হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত পাপ ও পুণ্যের অনুরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি ও প্রলয় ব্রহ্মের বিভিন্ন অবস্থা—ঈশ্বরের কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা, জীব ও জড়েরও কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা। প্রলয়ে প্রকৃতি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং জীব জড়-সম্বন্ধবিযুক্ত হয়। প্রলয়ে জড় যে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রকৃতি। প্রকৃতি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, অনুমানের বিষয়ও নহে। শাস্ত্র হইতে তাহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ প্রকৃতির তিন গুণ। প্রলয়ে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহাদের কোনও ক্রিয়া থাকে না। কিন্তু সৃষ্টির সময় আগত হইলে জীবাত্মাগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্য উৎপাদন করে। তখন গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়, এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি জীবের কর্ম্মানুরূপ দেহ উৎপাদন করে। জীবগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগের ব্যবস্থার জন্য নূতন সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিতে দেব, মনুষ্য, তির্য্যক নানাবিধ যোনির উৎপত্তি হয়। ইহা ঈশ্বরের পক্ষপাতের ফল নহে। জীবের দুঃখভোগও ঈশ্বরের নির্দয়তার ফল নহে। সকল জীবই তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল-স্বরূপ উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হয়, এবং নিজের নিজের কর্ম্মের ফল সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে (শ্রী-ভা ২।১।৩৪)।

ব্রহ্মের পরিণাম হয় কিনা রামানুজ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৮ ভাষ্যে লিখিয়াছেন চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের দুই প্রকার। তাঁহার শরীর কখনও সূক্ষ্মাবস্থ চিৎ-অচিৎ বস্তু, (ইহা তাঁহার কারণাবস্থা,) কখনও নামরূপে বিভক্ত স্থূল চিৎ ও অচিৎ তাঁহার শরীর, (ইহা তাঁহার কার্য্যাবস্থা)। কারণাবস্থা হইতে কার্য্যাবস্থা-প্রাপ্তিকালে অচিৎ অংশের শব্দাদিবিহীন অবস্থা শব্দাদিযুক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। তখন স্বরূপের অন্যথা ভাবরূপ বিকার হয়। চিদংশেরও কর্ম্মফল-ভোগের জন্য তদনুরূপ জ্ঞানবিকাশরূপ বিকার সংঘটিত হয়। ব্রহ্মের নিয়ন্তৃ-অংশে উভয় প্রকারই (চিৎও অচিৎ) বর্ত্তমান। উভয় প্রকারের বিকারবশতঃ নিয়ন্তৃ অংশও উভয় প্রকার বিকারবিশিষ্ট হয়। কারণ-অবস্থার অবস্থান্তর প্রাপ্তিরূপ বিকার দুই "প্রকারে"র

(চিৎ ও অচিৎ) এবং প্রকারীর (নিয়ন্তা) সমান। কিন্তু ব্রহ্মের ঈদৃশ বিকার স্বীকার করিয়াও রামানুজ পরে লিখিয়াছেন "স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থচিদচিৎ-বস্তু-শরীরং ব্রহ্ম কার্য্যকারণোভয়াবস্থাবস্থিতমপি সর্ব্বদা নিরস্তনিখিল-দোষগন্ধং সত্যসংকল্পত্বাদি-অপরিমিত-উদারগুণসাগরং অবতিষ্ঠতে প্রকারভূত-চিৎ-অচিৎ বস্তুগতাঃ অপুরুষার্থাঃ স্বরূপান্যথাভাবাশ্চ।"—ব্রহ্ম স্থূলও সূক্ষ্মাবস্থ চিৎ-অচিৎ শরীর বিশিষ্ট কার্য্য কারণ উভয় অবস্থাতে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বদাই সকল দোষ গন্ধ-বর্জ্জিত, সত্যসংকল্পত্বাদি-উদার-গুণসাগর থাকেন। ব্রহ্মের প্রকারভূত চিৎ ও অচিৎ বস্তুগত অপুরুষার্থ এবং স্বরূপের অন্যথাভাব সকলই সামঞ্জস্যযুক্ত হয়।

অবিদ্যা ও মায়া

(রামানুজের মতে জগৎ সত্য, মিথ্যা ভাণমাত্র নহে।) তিনি বলেন কাহারও কাহারও মতে শাসক, শাসিত প্রভৃতি ভেদযুক্ত জগৎ এক নির্বিশেষ স্ব-প্রকাশ বস্তুতে কল্পিত, তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই। এই কল্পনার মূল অনাদি অবিদ্যা। এই অবিদ্যাকর্ত্তৃক বস্তুর স্বরূপ তিরোহিত হয়, এবং বিবিধ বিচিত্ররূপ ভ্রান্তি উদ্‌ভূত হয়। অবিদ্যাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। শ্রুতি জগৎকে "অনৃতেন প্রত্যূঢ়া" (অসত্য কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত) বলিয়াছেন (ছান্দো—৮।৩।২)। অবিদ্যা স্বীকার না করিলে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যে যে জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদন করা যায় না। অবিদ্যাকে "সৎ" বলা যায় না; কেন না সৎ যদি হইত, তাহা হইলে তাহা ভ্রান্তির বিষয় হইত না, তাহার বাধও হইতে পারিত না। আবার অসৎ হইলে, তাহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারিত না, এবং তাহার 'বাধ'ও হইত না। এইজন্য পণ্ডিতেরা ইহাকে "সদসৎ" শব্দদ্বয় দ্বারা অনির্বচনীয় বলিয়াছেন। কিন্তু এই অবিদ্যার আশ্রয় কি জীব অথবা ব্রহ্ম? অবিদ্যা জীবাশ্রিত হইতে পারে না, কেন না জীব অবিদ্যা-পরিকল্পিত (অবিদ্যার কল্পনা)। অবিদ্যার অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতে না থাকিলে জীবের কল্পনা করিবে কে? অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিতও হইতে পারে না, কেন না ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ এবং অবিদ্যা-বিরোধী এবং অবিদ্যা ব্রহ্মকর্ত্তৃক বাধিত এবং তৎকর্ত্তৃক তিরোহিত হয়।

জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্তকং মৃষাত্মকম্
অজ্ঞানং চেৎ তিরস্কুর্য্যাৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্ত্তনে?

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেৎজ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকম্
ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্ত্তকম্।
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎস্যাৎ প্রমেয়তা
ব্রহ্মণোঽনমুভূতিত্বং ত্বদুক্ত্যৈব প্রসজ্যতে।

পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান। অজ্ঞানের স্বরূপ মিথ্যাত্ব। অজ্ঞান যদি ব্রহ্মকে তিরোহিত করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানকে দূরীভূত করিতে সমর্থ কে? জ্ঞানই ব্রহ্ম এই জ্ঞান অজ্ঞান (অবিদ্যা) দূর করে। কিন্তু এই জ্ঞান (ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নহে; ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এই জ্ঞান) ব্রহ্মের মতই স্বপ্রকাশ (ব্রহ্মই যদি অজ্ঞানকে তিরোহিত করিতে না পারেন তাহা হইলে) এই জ্ঞানও অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে পারে না। আবার "জ্ঞানই ব্রহ্ম" এই জ্ঞানের অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয় (প্রমেয়) বলিতে হয়, তাহা হইলে তোমাদের উক্তি অনুসারে ব্রহ্মকে অনুভূতি-মাত্র-স্বরূপ বলা যায় না। যে জ্ঞান অবিদ্যার বাধক তাহা ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নহে, পরন্তু "ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান" যে জ্ঞানের বিষয়, ইহা সেই জ্ঞান—ইহা বলিলে দ্বিবিধ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, এক প্রকার জ্ঞান অবিদ্যা-বিরোধী অন্য প্রকার তাহা নহে। কিন্তু জ্ঞানের এই রূপ বিভাগের কোনও যুক্তি নাই।

তোমাদের মতে অনুভবই (সংবিদ্, Consciousness) ব্রহ্মের স্বরূপ এবং অনুভব-স্বরূপ ব্রহ্ম অন্য অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম যাহার বিষয়, এরূপ কোনও জ্ঞান নাই। জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পরের বাধক (Contradictory)। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অবিদ্যার বাধক, সুতরাং ব্রহ্ম অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারেন না। শুক্তি প্রভৃতি আপনাদের স্বরূপ-প্রকাশে অসমর্থ বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধীয় অজ্ঞান দূরীকরণে অসমর্থ। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধীয় অজ্ঞান দূরীকরণের জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ তাঁহার স্বীয় অনুভবসিদ্ধ, এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় অবিদ্যা-বিরোধী। ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় অজ্ঞান দূরীকরণের জন্য সুতরাং অন্যের জ্ঞানের অপেক্ষা নাই।

অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপ ও জগতের স্বরূপ উভয়ের সম্বন্ধেই হইতে পারে। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বস্তু মিথ্যা, এই জ্ঞান অবিদ্যা-বিরোধী। কিন্তু এই জ্ঞান কি ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞানেরও বিরোধী, অথবা কেবল জগৎকে সত্য বলিয়া ধারণারূপ অজ্ঞানের বিরোধী? এই জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, সুতরাং ইহা ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে অবিদ্যার বিরোধী হইতে পারে না। এই জ্ঞান

(জগৎ মিথ্যা) "জগৎ সত্য" এই ধারণার মূল অবিদ্যার বিরোধী, এবং এই জ্ঞান দ্বারা এই অবিদ্যা বাধিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বন্ধীয় অবিদ্যা বাধিত হয় না। যদি বলা হয় যে দ্বৈতজ্ঞানই ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞান, এবং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বস্তুই মিথ্যা এই জ্ঞান দ্বারা দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ তাঁহার স্বকীয় অনুভবসিদ্ধ। তাহা হইলে বলিব যদি অদ্বৈতই ব্রহ্মের স্বরূপ হয় এবং তাহা ব্রহ্মের স্বীয় অনুভবসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার বিরোধী দ্বৈতমূলক অজ্ঞান, এবং তাহার বাধের সম্ভাবনা থাকিত না। ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বকে যদি তাহার স্বরূপ না বলিয়া ধর্ম্ম বল, তাহাও হইতে পারে না, কেননা তোমরা ব্রহ্মকে নির্গুণ বল। সুতরাং জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারেন না। প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম অবিদ্যাকর্ত্তৃক তিরোহিত হন বলিলে ব্রহ্মের স্বরূপের নাশ হয় বলা হয়। প্রকাশের তিরোধান হইতে পারে প্রকাশের উৎপত্তির বাধা হইতে নতুবা তাহার বিনাশ হইতে। কিন্তু প্রকাশের (অনুভূতির) উৎপত্তি তোমরা স্বীকার কর না, সুতরাং তাহার তিরোধানের অর্থ তাহার নাশ বলিতে হইবে।

তোমাদের মতে বিষয়হীন আশ্রয়হীন স্ব-প্রকাশ অনুভূতি (ব্রহ্ম) তাঁহার মধ্যগত দোষের (অবিদ্যার) ফলে অনন্তাশ্রয় ও অনন্ত বিষয়রূপে আপনাকে অনুভব করেন। অনুভূতির আশ্রয়স্থিত এই দোষ কি সত্য অথবা মিথ্যা? ইহাকে তোমরা সত্য বলিয়া স্বীকার কর না। ইহা যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে এই দোষকে হয় দ্রষ্টা, অথবা দৃশ্য অথবা দৃশির (জ্ঞান-জ্ঞানক্রিয়া) বলিতে হইবে। দৃশির মধ্যে ভেদ তোমরা স্বীকার কর না, সুতরাং এই দোষ দৃশির হইতে পারে না। এই দোষের অধিষ্ঠান যে দৃশি (জ্ঞানক্রিয়া) তাহাকেও অসৎ বলা যায় না; বলিলে সকলই অসৎ হয়। ইহা মাধ্যমিক শূন্যবাদ। যদি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দৃশি সকলই মিথ্যা হয়, তাহা হইলে অন্য মূল দোষের অনুমান করিতে হয়। ফলে অনবস্থার উদ্ভব হয়। ইহা পরিহারের জন্য যদি বলা হয়, ব্রহ্মের স্বরূপ যে জ্ঞান তাহাই "দোষ", তাহা হইলে ব্রহ্মই জগদুদ্ভবের মূল। তাহা হইলে জগতের উদ্ভবের জন্য অন্য অবিদ্যার কল্পনার প্রয়োজন কি? ব্রহ্ম যখন নিত্য তখন এই অবিদ্যা হইতে মুক্তির কোনও উপায় নাই।

অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয়—ইহার অর্থ কি? যাহা 'সৎ' তাহা হইতেও ভিন্ন, যাহা অসৎ তাহা হইতেও ভিন্ন? এরূপ বস্তুর অস্তিত্বের কোনও প্রমাণই নাই।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন অবিদ্যা, অজ্ঞান অথবা নামান্তর-বাচ্য ভাবাত্মক

এক বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা অবগত হওয়া যায়। এই বস্তু জ্ঞানের প্রাগভাব (উৎপত্তির পূর্ব্বে অনস্তিত্ব) হইতে ভিন্ন। ইহা দ্বারা বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান তিরোহিত হয়। ইহা আন্তর ও বাহ্য বিবিধ অধ্যাসের উপাদান। ইহা পরমার্থের স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা নিবর্তিত হয়। এই অবিদ্যা-উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম অবিকারী স্বপ্রকাশ চিৎমাত্ররূপী অবিদ্যাকর্তৃক তিরোহিতস্বরূপ প্রত্যাগাত্মায় অহংকার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপে অধ্যাসের উপাদান। এই অধ্যায়ের অবস্থা-বিশেষ জগৎ। এই জগতে সর্প, রজত প্রভৃতি বস্তুর জ্ঞানরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়, যাহা জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয়। মিথ্যাভূত জগতের কারণও মিথ্যা; সুতরাং মিথ্যাভূত সমগ্র জগতের উপাদানও মিথ্যাভূত অবিদ্যা। "আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে জানি না, অন্যকেও জানি না" এইরূপ অজ্ঞান-বিষয়ক বোধ সকলেরই হয়। এই অজ্ঞান জ্ঞানের প্রাগভাব নহে। জ্ঞানের প্রাগভাগ ষষ্ঠ প্রমাণ (অনুপলব্ধি) গোচর। কিন্তু এই অজ্ঞান "আমি সুখী" ইত্যাদি জ্ঞানের মতো অপরোক্ষ (অব্যবহিত)। অভাবেরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, ইহা স্বীকার করিলেও আলোচ্যমান অনুভব আত্মায় জ্ঞানের অভাব-বিষয়ক নহে, কেননা অনুভবের সময়েই এই জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। না থাকিলে জ্ঞানাভাবই প্রতিপন্ন হইত না (জ্ঞানের অভাবের জ্ঞান হইত না। এই ভাবাত্মক অজ্ঞান অনুমানদ্বারাও প্রতিপাদিত হয়। যে কোনও প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ জ্ঞানের উদ্‌ভবের পূর্ব্বে তথায় সেই জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে ভিন্ন, সেই জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহার আবরক, সেই জ্ঞানকর্তৃক নিবর্তনীয় এবং সেই জ্ঞানের সহিত একদেশে অবস্থিত অন্য কিছু বর্তমান থাকে। যাহা অপ্রকাশিত, তাহাকে প্রকাশিত করাই জ্ঞানের ধর্ম্ম, যেমন অন্ধকারে প্রজ্বালিত প্রদীপের আলোক কর্তৃক গৃহস্থিত বস্তু সকল প্রকাশিত হয়। অন্ধকার অভাব নহে ভাবাত্মক। কেননা অন্ধকারের বহুলত্ব ও বিরলত্বাদি (গাঢ়ত্বের প্রভেদ) অবস্থা আছে এবং তাহার রূপও আছে।

উপরিউক্ত যুক্তির উত্তরে রামানুজ বলেন উপপত্তি সহিত প্রত্যক্ষ অথবা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ দ্বারা ভাবাত্মক অজ্ঞানের জ্ঞান—"আমি অজ্ঞ", "আমি আমাকেও জানি না, অন্য কাহাকেও জানি না" বলিতে যে অজ্ঞান ব্যক্ত হয়,—তাহার জ্ঞান হয় না। প্রত্যক্ আত্মা অজ্ঞানের আশ্রয় অথবা বিষয়রূপে হয় প্রতীত হয় অথবা প্রতীত হয় না। যদি প্রতীত হয়, তাহা হইলে যে অজ্ঞান প্রত্যক্ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়, তাহা সেই প্রত্যক্ আত্মার থাকে কিরূপে? যদি প্রত্যক্ আত্মার প্রতীতি না হয়, তাহা হইলে আশ্রয় ও

বিষয় জ্ঞানশূন্য অজ্ঞানের জ্ঞান হয় কিরূপে ? যাহার আশ্রয় নাই, বিষয়ও নাই, এরূপ অবিশিষ্ট ভাবাত্মক অজ্ঞানের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। আত্মার স্বরূপের সুস্পষ্ট প্রকাশই অজ্ঞানের বিরোধী এবং যখন অজ্ঞানের অনুভব হয়, তখন আত্মার অস্পষ্ট অনুভব হয়। অজ্ঞানের অনুভবের সহিত ভাবাত্মক অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় আত্মার এই প্রকার অবিশদ প্রতীতির বিরোধ নাই। ইহা বলিলে জ্ঞানের প্রাগভাবকেই অজ্ঞান বলা যাইতে পারে, কেননা জ্ঞানের প্রাগভাবও আত্মার স্বরূপের বিশদ জ্ঞানের অভাব। অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়ের যে জ্ঞান, তাহা আত্মার স্বরূপের অবিশদ জ্ঞান।

অজ্ঞান ভাবরূপই হউক অথবা জ্ঞানের প্রাগভাবই হউক, ইহার অর্থ জ্ঞান শব্দের অর্থের অপেক্ষা করে। অজ্ঞান বলিতে বুঝায় হয় জ্ঞানের অভাব অথবা জ্ঞান হইতে ভিন্ন কিছু অথবা জ্ঞানের বিরোধী কিছু। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জ্ঞান কি, তাহা জানার অপেক্ষা আছে। কিন্তু ভাবরূপ অজ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহা অজ্ঞাত। "অজ্ঞান" শব্দের মধ্যে "জ্ঞানের জ্ঞান" নিহিত। জ্ঞানের প্রাগভাব বলিতেও জ্ঞান কি, তাহার জ্ঞান নিহিত। সুতরাং "আমি অজ্ঞ", "আমি আমাকে জানি না, অন্য কাহাকেও জানি না" যখন আমরা বলি তখন জ্ঞানের প্রাগভাবেরই প্রতীতি হয়। নিত্য মুক্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞানের অনুভব সম্ভবপর নহে। কেন না "স্বানুভব" (আপনাকে অনুভব করা) তাহার স্বরূপ। যদি বল ব্রহ্ম স্বানুভবস্বরূপ হইলেও তিরোহিত-স্বরূপ বলিয়া অজ্ঞান অনুভব করেন, তাহা হইলে, জিজ্ঞাস্য এই 'তিরোহিত স্বরূপ" হওয়ার অর্থ কি ? ইহার অর্থ যদি হয় "অপ্রকাশিত—স্বরূপ", তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য স্বানুভব-স্বরূপ যিনি, তিনি কিরূপে অপ্রকাশিত স্বরূপ হন ? যদি বল স্বানুভব-স্বরূপেরও স্বরূপ অন্য কর্তৃক অপ্রকাশিত (আচ্ছাদিত) হইতে পারে, তাহা হইলে বক্তব্য প্রকাশ যখন আত্মার ধর্ম্ম নহে, স্বরূপ, তখন অন্য কর্তৃক তাহার প্রকাশ তিরোহিত হওয়া সম্ভবপর হইলে অন্য কর্তৃক তাহার স্বরূপের নাশও স্বীকার করিতে হয়।

ব্রহ্ম ভাবাত্মক অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না, কেননা ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাতে অজ্ঞান থাকিতে পারে না। শুক্তি যখন রজতরূপে প্রতিভাত হয়, তখন এই অজ্ঞান শুক্তির মধ্যে থাকে না, দ্রষ্টার মধ্যে থাকে। ভাবাত্মক অজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের আবরকও হইতে পারে না। কেন না অজ্ঞান জ্ঞানের বিষয়কেই আবৃত করে, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানের বিষয় নহেন।

ভাবাত্মক অজ্ঞান জ্ঞানকর্তৃক নিবর্ত্তনীয়ও নহে, কেননা অজ্ঞান জ্ঞানের বিষয়কেই নিবর্ত্তিত করিতে পারে, ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহেন। ব্রহ্ম অজ্ঞানের আস্পদ নহেন, কেন না তাঁহাতে জ্ঞাতৃত্ব নাই ঘটাদির ন্যায়। প্রমাণ-জনিত জ্ঞানের পূর্ব্বে তাহার প্রাগভাব ব্যতীত অন্য কোনও অজ্ঞান (ভাবরূপ অজ্ঞান) থাকে না। জ্ঞান কোনও বস্তুর বিনাশক নহে, কেন না তাহার সহিত শক্তি নাই। ভাবরূপ অজ্ঞান ঘটাদির ন্যায় বস্তু; শক্তি-বিরহিত জ্ঞান তাহার বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। ভয় প্রভৃতি ভাব জ্ঞানোৎপত্তির পরে বিনষ্ট হয় দেখা যায়। কিন্তু তাহারা জ্ঞানকর্তৃক বিনষ্ট হয় না। তাহারা ক্ষণিক বলিয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া অন্তর্হিত হয়।

অনির্বচনীয় অজ্ঞান-বিষয়ক কোনও জ্ঞানই আমাদের নাই। প্রতীতিই বল, ভ্রান্তিই বল অথবা বাধই বল, কোনও হেতুতেই অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। যাহার প্রতীতি হয়, তাহাই কেবল প্রতীতি, ভ্রান্তি ও বাধের বিষয় হইতে পারে। যাহা প্রতীতি, ভ্রান্তি ও বাধের বিষয়রূপে উপলব্ধ হয় না, তাহাকে ইহাদের বিষয়রূপে স্বীকার করা যায় না। শুক্তি যখন রজতরূপে প্রতীত হয়, তখন এক বস্তু অন্যরূপে প্রতীত হয়। সেখানে অনির্বচনীয় কোনও দোষের অনুমান করিবার হেতু নাই। অনাদি অবিদ্যা সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের উপাদান কারণ, এই মত অগ্রাহ্য। সকল দ্রব্যই পঞ্চভূতে নির্মিত। শুক্তির উপাদানও পঞ্চভূত, রজতের উপাদানও পঞ্চভূত—তবে বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত। শুক্তিতে যখন রজতের জ্ঞান হয়, তখন শুক্তির সহিত রজতের যে যে ধর্ম্মের সাদৃশ্য আছে, তাহাদেরই জ্ঞান হয়, অন্যান্য ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না। স্বপ্নেও যাহা দৃষ্ট হয়, জীবের কর্ম্ম অনুসারে তাহার ভোগের জন্য ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করেন।

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল কেবল দ্রষ্টার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন-কালের জন্য সৃষ্ট। সকল বিজ্ঞানই সত্য। (সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং সিদ্ধম্)। প্রত্যেক জীবের কর্ম্মানুরূপ ভোগের জন্য সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকালে ঈশ্বর কতকগুলি দ্রব্য এমন সৃষ্টি করেন যে তাহারা সর্ব্বসাধারণের প্রতীতির বিষয় হয়, আবার কতকগুলি দ্রব্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতীতির বিষয় ও ক্ষণস্থায়ী হয়। ইহা হইতেই বাধ্য-বাধকতা ভাব উৎপন্ন হয়।

সদসদনির্বচনীয় অজ্ঞান শ্রুতিসিদ্ধ নহে। "নাসৎ আসীৎ, নো সৎ আসীৎ"—এখানে সৎ ও অসৎ শব্দ দ্বারা চিৎ ও অচিৎ বস্তু সূচিত হয়। "সৎ" ও "ত্যৎ" শব্দ সৃষ্টিকালে "চিৎ" ও "অচিৎ" বস্তুবাচক। প্রলয়ে এই সৎ ও ত্যৎ

অচিৎ-সমষ্টিভূত "তমঃ"তে বিলীন হয়। ইহাই উপরি উক্ত শ্রুতি-বাক্যের অর্থ। এখানে সৎও নহে, অসৎও নহে, এরূপ কোনও বস্তুর কথা নাই। "সৎ" ও "অসৎ" শব্দ এখানে একই বস্তুর বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অবস্থাজ্ঞাপক। তমঃ-শব্দ দ্বারা এখানে অচিৎ বস্তু সূচিত হয়। "অব্যক্তং অক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে", এই শ্রুতিবাক্য ইহার প্রমাণ। তমঃ-শব্দ দ্বারা অচিৎ-সমষ্টিরূপ প্রকৃতির সূক্ষ্ম অবস্থা সূচিত হয়। এই প্রকৃতিকে শ্রুতি "মায়া" বলিয়াছেন সত্য (মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ)। কিন্তু তাহাতে প্রকৃতিকে অনির্বচনীয় বলা হয় নাই। শ্রুতিতে এমন কোনও বাক্য পাওয়া যায় না, যাহাতে মায়াকে অনির্বচনীয় বলা হইয়াছে। মায়া-শব্দ ও মিথ্যা-শব্দ এক অর্থবাচক বলিয়া মায়াকে অনির্বচনীয় বলিতে পারা যায় না। কেন না মায়া-শব্দ সর্ব্বত্র মিথ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অসুর ও রাক্ষসদিগের অস্ত্র অর্থেও মায়া-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল অস্ত্র মিথ্যা নহে, সত্য। এই সকল স্থানে "বিচিত্র বস্তু-সৃষ্টিকারী" অর্থে মায়া-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই অর্থেই প্রকৃতিকে মায়া বলা হইয়াছে। "অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ। তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ"। এখানে মায়া-শব্দ-বাচ্য প্রকৃতির বিচিত্র বস্তু-সৃষ্টিকরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পরম পুরুষকে যে মায়ী বলা হইয়াছে, তাহার কারণ মায়ার শক্তি তাঁহারই, তিনি যে অজ্ঞ (অজ্ঞানের বশীভূত) তাহা নহে। "অন্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" এখানে জীবকেই মায়াদ্বারা সন্নিরুদ্ধ বলা হইয়াছে। যেমন "অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে" এই বাক্যে। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে", এসকল স্থলেও মায়া-শব্দ দ্বারা বিচিত্র শক্তিই সূচিত হইয়াছে। "মম মায়া দুরত্যয়া", এখানে যে মায়ার কথা গীতায় বলা হইয়াছে, তাহা ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া প্রকৃতিই তাহার বাচ্য।

"তৎত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উক্ত হইয়াছে, এই কারণে "তৎ" শব্দ-বাচ্য সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, সকল জগতের সর্গ, স্থিতি ও বিনাশের হেতুভূত ব্রহ্মে যে তাহার বিপরীত অজ্ঞান কল্পনা করিতে হইবে, ইহার কারণ নাই ; কেননা ব্রহ্মে অজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা না করিয়াও এই উক্তির সংগতি রক্ষা করা যায়। জীবশরীরক ব্রহ্ম "ত্বং" শব্দের বাচ্য বলিলে উক্ত ঐক্যোপদেশ অধিকতর উপপন্ন হয়। ব্রহ্ম জীবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন, এই উক্তিদ্বারা পরমাত্মা পর্য্যন্ত সকল বস্তুই যে নামরূপভাক্ তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই।

রামানুজের মতে জীবাত্মা সসীম, অণু-পরিমাণ, ব্রহ্ম অনন্ত ও বিভু। সুতরাং জীব কখনও ব্রহ্মের সমান হইতে পারে না। ব্রহ্ম জীবে অনুপ্রবিষ্ট, এবং জীবের নিয়ন্তা, এই অর্থে জীব ও ব্রহ্মে একত্ব আছে। মানুষ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, ব্রহ্মের অংশ। অংশ সমগ্র হইতে যেমন ভিন্ন নহে, সমগ্রের অংশ, গুণ যেমন দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে, তাহার মধ্যে অবস্থিত, মানুষের দেহ যেমন তাহার মধ্যস্থ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি জীবাত্মাও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। উপনিষদ যে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়াছেন, ইহাই তাহার অর্থ। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনও ভেদই না থাকিত, তাহা হইলে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিবার কোনও অর্থ বা প্রয়োজন থাকিত না। একটি দ্রব্যের দুই রূপের মধ্যে অভেদ বলা যায়। "তৎ ত্বং অসি" বাক্যে ব্রহ্মের দুই রূপের কথা বলা হইয়াছে। "তৎ" শব্দ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বরবাচক। "ত্বং" শব্দ মানুষরূপে অবস্থিত ঈশ্বরবাচক। এখানে ঈশ্বরের দুই রূপের মধ্যে অভেদ উক্ত হইয়াছে। এই দুই রূপের মধ্যে যেমন অভেদ আছে, তেমনি ভেদও আছে। শরীরবিশিষ্ট জীবের সহিত ঈশ্বরের ঐক্য স্বীকার করে বলিয়া রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কিন্তু এই ঐক্য বা অভেদ যেমন সত্য, ভেদও তেমনি সত্য। ভেদ মিথ্যা নহে।

"অধিকং তু ভেদ নির্দেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২) সূত্রে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম জীবের অধিক, কেননা ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য"—আত্মাকে দর্শন করিবে, এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম যে আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা বলা হইয়াছে, কেননা জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইলে কে ব্রহ্মকে দর্শন করিবে? আবার "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (সুষুপ্তির সময় জীব সতের সহিত এক হইয়া যায়)—এই শ্রুতিতেও ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। শঙ্কর বলেন এই সকল ভেদসূচক শ্রুতি আছে, সত্য কিন্তু "তৎত্বমসি"—এরূপ শ্রুতিও তো আছে। শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভেদ ঘটাকাশ ও মহাকাশের মধ্যে ভেদের ন্যায়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভেদ আছে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে নাই। রামানুজ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা বৃহৎ। "তৎ ত্বমসি" বাক্যের অর্থ ব্রহ্ম জীবের আত্মা, জীবাত্মার আত্মা। তিনি এইজন্য পরমাত্মা। জীব ব্রহ্মের শরীর।

"ভাবে চ উপলব্ধিঃ" (ব্র-সূ-২।১।১৫) সূত্রের ব্যাখ্যায় রামানুজ বলিয়াছেন

কারণের ভাব (অস্তিত্ব) থাকিলে কার্য্যের উপলব্ধি হয়। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং জগৎ ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

"অংশো নানা ব্যপদেশাৎ, অন্যথা চ অপি দাশ কিতবাদিত্বং অধীয়ত একে" (ব্র, সূ, ২।৩।৪৩) সূত্রে "নানা" অর্থাৎ ভেদের উল্লেখ আছে, সুতরাং জীব ঈশ্বরের অংশ। কোনও শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই দাশ ও কিতব বলিয়া ঈশ্বর ও জীবকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় রামানুজ বলিয়াছেন দ্বৈতবাদ ও নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ ঠিক নহে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই ঠিক। কেননা শ্রুতিতে কোনও স্থানে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কোনও স্থানে অভিন্ন বলা হইয়াছে। জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তবেই এই উভয়বিধ উক্তির সামঞ্জস্য হইতে পারে। উপাধি-সংযোগে ব্রহ্ম জীব হন, এ মত সত্য হইতে পারে না। কোনও জ্ঞানবান শক্তিমান ব্যক্তি গৃহ প্রভৃতি উপাধিযোগে জ্ঞানহীন ও শক্তিহীন হইতে পারে না। অংশ ও সমগ্রের মধ্যে যেমন ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও তেমনি ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। জীব সসীম ও অপূর্ণ। ঈশ্বর অনন্ত ও পূর্ণ। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ স্পষ্ট। আবার ঈশ্বর জীবাত্মার আত্মা, এইজন্য জীব ও ঈশ্বরে অভেদ। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে বলিয়াছেন রামানুজ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে স্বীকার করেন। ভেদ ও অভেদ উভয়ই রামানুজ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ভেদ উপাধিজাত বলিয়া কাল্পনিক ও মিথ্যা নহে। তিনি জীবকে ব্রহ্মের বিকার বলিয়াও স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম যে জীবের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার মত নহে। উপাধিই যদি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদের কারণ হয়, বাস্তবিক ব্রহ্ম ও জীব যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জীবের অপূর্ণতা ব্রহ্মেরই অপূর্ণতা। কিন্তু ব্রহ্ম সদাই পূর্ণ। জীবের মলিনতা তাঁহাকে স্পর্শ করে না। জীব যদি ব্রহ্মের পরিণাম হয়, ব্রহ্মই যদি জীবরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি জীবের দুঃখকষ্ট সত্যসত্যই ভোগ করেন। কিন্তু রামানুজের মতে ব্রহ্ম কোনও কালবিশেষে জীবে পরিণত হন নাই। চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়) চিরকালই ঈশ্বরের অংশ—অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঈশ্বর উপাদান কারণ, জীব ও জগৎ তাঁহার কার্য্য। ব্রহ্ম কখনও জীবে পরিণত হন না। সমগ্র কখনও তাহার অংশে পরিণত হয় না, দ্রব্য তাহার গুণে পরিণত হয় না। ব্রহ্মের ন্যায় জীবও নিত্য—ব্রহ্মের নিত্য অংশ। ব্রহ্ম জীব ও জগতের কালগত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নহেন—তিনি উপাদান কারণ। যাবতীয় সসীম বস্তু

ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত—তিনিই সমগ্র সত্তা। সমগ্র অংশের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। শাশ্বত কাল হইতে ব্রহ্ম অংশ-সমন্বিত ভাবে বর্ত্তমান। তিনি কখনও অংশে পরিণত হন না।

উপরি উক্ত মতে ব্রহ্ম অঙ্গী, জীব ও জগৎ তাঁহার অঙ্গ। জীবশরীর অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক জীবকোষ স্বতন্ত্র প্রাণবান্। জীব-কোষের নিত্য ধ্বংস হইতেছে, নূতন কোষের উৎপত্তি হইতেছে, তাহাদের দ্বারা সমগ্র দেহের জীবনীশক্তি রক্ষিত হইতেছে। সমগ্র জীবশরীরের অংশ কোষসকল। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর লইয়া এক সমগ্র বস্তু। এই সমগ্রেরই অংশ জীব ও জগৎ। জীবকোষ যেমন জীবশরীরের অংশ বলিয়া ও একই পদার্থে গঠিত বলিয়া, একই উপাদানে নির্মিত বলিয়া জীবশরীরের সহিত অভিন্ন, তেমনি তাহাদের স্বতন্ত্র প্রাণ আছে বলিয়া ভিন্নও বটে। কিন্তু জীবকোষ-দিগের স্বাস্থ্য যেমন জীবদেহ উপভোগ করে, তাহাদের অস্বাস্থ্যও—তাহাদের পীড়া ও ক্ষতের দুঃখও তেমনি ভোগ করে। কিন্তু ঈশ্বর কি জীবদিগের সুখদুঃখ ভোগ করেন? রামানুজের ভেদাভেদের অর্থ একই বস্তু দুই রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু সেই এক বস্তু এই দ্বিবিধ প্রকারের অতীত। এই দুই রূপ একই বস্তুর মধ্যে অবস্থিত-সেই বস্তু সামানাধিকরণ্য। সেই সামানাধিকরণ্য সেই দুই রূপের অতীত। সেই দুই বস্তু সত্য—প্রতীতিমাত্র নহে। আবার সেই এক বস্তুর কালগত পরিণাম ঐ দুই বস্তু নহে। সেই সমগ্র সমগ্র বলিয়াই অংশদ্বয় হইতে ভিন্ন। কিন্তু একই সমগ্র আবার প্রত্যেক অংশে বর্তমান, ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত নহে। সমগ্র (ঈশ্বর) যখন প্রত্যেক অংশের (জীবের) মধ্যে বর্ত্তমান, তখন প্রত্যেক অংশের মনন, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি ঈশ্বরেরও হওয়া উচিত। কিন্তু সমগ্রের মধ্যে, রামানুজ অংশের (জীবের) স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন।

রামানুজের মতে নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয়, ইহা শাস্ত্রের মত নহে। বন্ধ সত্য, মিথ্যা নহে। কেবল মাত্র জ্ঞানদ্বারা বন্ধ-নাশ হওয়া অসম্ভব। দেহের সহিত আত্মার সংযোগবশতঃ সৎ ও অসৎ কর্ম্মের ফলে যে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাই হইল বন্ধ। এই বন্ধ মিথ্যা —ইহা বলিবার হেতু নাই। এই বন্ধের নাশ হইতে পারে কেবলমাত্র পরমাত্মার অনুগ্রহে। সেই অনুগ্রহ ভক্তিদ্বারা লভ্য। জগৎ মিথ্যা, এই জ্ঞানের উপর জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য। সুতরাং এই মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা বন্ধের বিবৃদ্ধিই হয়, নাশ হয় না। "উত্তম পুরুষস্ত

অন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" (গীতা) এবং "পৃথক্ আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন অন্তর্যামী ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারাই বন্ধের নাশ হয়। মায়াবাদ অনুসারে বন্ধের ন্যায় বন্ধ-নাশক জ্ঞানও মিথ্যা। সুতরাং তাহাও অবিদ্যা, তাহার নাশের জন্য অন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞান স্ববিরোধী। সকল ভেদের নিবৃত্তি করিয়া ক্ষণকাল পরেই ইহা বিনষ্ট হয়, ইহাও বলা চলে না; কেননা এই নিবর্ত্তক জ্ঞানেরও স্বরূপ, উৎপত্তি ও নাশ মিথ্যা, সুতরাং ইহার নাশের জন্যও অন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। ব্রহ্মের স্বভাববশতঃই এই জ্ঞানের নাশ হয়, ইহাও বলা যায় না। কেননা তাহা হইলে এই অবিদ্যানাশক জ্ঞানের উদ্‌ভবই হইতে পারে না। তাহার বিনাশ যদি স্থায়ী হয়, তবে তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। পরন্তু চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বস্তুর নিষেধাত্মক জ্ঞানের জ্ঞাতা কে? পরমাত্মায় অধ্যস্ত জীব তাহার জ্ঞাতা হইতে পারে না, কেননা জীব যখন অধ্যাসরূপ, তখন জীব উক্ত নিষেধাত্মক জ্ঞানের কর্ম্ম (বিষয়), কর্ত্তা হইতে পারে না। ব্রহ্মের স্বরূপকে উক্ত নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ত্তা বলিলে জিজ্ঞাস্য হয়, ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃত্ব কি ব্রহ্মের স্বরূপগত, না তাহাও ব্রহ্মে অধ্যস্ত। যদি অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত অধ্যাস ও তজ্জাত অবিদ্যার নাশ হইবে না, কেননা তাহা নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ত্তা, কর্ম্ম (বিষয়) নহে। ইহার নাশের জন্য অন্য নিবর্ত্তক জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহাতে অনবস্থার উদ্‌ভব হয়। এই জ্ঞাতৃত্ব যদি ব্রহ্মের স্বরূপগত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান-স্বরূপ নহেন, তিনি জ্ঞাতা ইহাও স্বীকার করিতে হয়। এই অবিদ্যানাশক জ্ঞান ও তাহার জ্ঞাতা উভয়ই বিনাশ্য অবিদ্যার অন্তর্গত, ইহা বলা, "ভূতল ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বস্তু দেবদত্ত ছেদন করিয়াছে" বলার মত উপহাস্য, কেননা দেবদত্ত যেমন তাহা দ্বারা কর্ত্তিত বস্তুদিগের অন্তর্গত হইতে পারে না, তেমনি নিবর্ত্তক জ্ঞানের জ্ঞাতাও আপনার নাশের হেতু নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ত্তা হইতে পারে না, কেননা নিজের নাশ কেহই চাহে না। বন্ধ অনাদি-কর্ম্ম-প্রবাহরূপ অজ্ঞানের ফল। তাহার নাশ জ্ঞানদ্বারা হয়। কিন্তু সে জ্ঞান পরমপুরুষের আরাধনা ও আত্মজ্ঞান-সংস্কৃত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মের দৈনিক অনুষ্ঠান দ্বারা লভ্য।

শঙ্কর ও রামানুজ

শঙ্করের মত নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ, রামানুজের মত বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ। শঙ্করের ব্রহ্ম ও রামানুজের ব্রহ্ম উভয়ই দ্বৈতহীন, অর্থাৎ উভয়ের মতেই ব্রহ্ম-

ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই। কিন্তু শঙ্করের ব্রহ্ম নির্বিশেষ অর্থাৎ সার্বিক। সার্বিক সত্তা, সার্বিক জ্ঞান ও সার্বিক আনন্দস্বরূপ তাঁহার বিশিষ্ট রূপ নাই। সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ একই, বিভিন্ন গুণ নহে। রামানুজের ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও তাঁহার মধ্যে বিশেষের স্থান আছে, তিনি চিৎ জীব ও অচিৎ (অচেতন) বস্তু-বিশিষ্ট। জীব ও অচিৎ জগৎ তাঁহার শরীর বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন-হইলেও, তাহারা তাঁহার বিশেষ ভাব। শঙ্করের মতে চিৎ জীব ও অচিৎ জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য বস্তু। তিনি সর্ব্ব ভেদ-বর্জিত

শঙ্করের ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, তিনি জ্ঞাতা নহেন। তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বও নাই। রামানুজের ব্রহ্ম জ্ঞাতা ও কর্ত্তা, তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন।

শঙ্করের মতে জীব অসৎ, অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব। রামানুজের মতে জীব অসৎ নহে, ব্রহ্মের অংশ। শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; জীবের যখন পারমার্থিক সত্তা নাই, ব্রহ্মই যখন একমাত্র সত্য বস্তু, যাহাকে জীব বলা হয়, তাহা যখন প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মে অধ্যস্ত, সেই অধ্যাসের আলম্বন যখন ব্রহ্ম, তখন জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। রামানুজের মতে জীব ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীর, অচিৎ জগৎ তাঁহার স্থূল শরীর, এইজন্য জীব ও ব্রহ্ম এক, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে। শঙ্করের মতে মোক্ষে জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। রামানুজের মতে মোক্ষেও ব্রহ্মের মধ্যে জীবের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় না। জীব যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে তাহা কখনও ব্রহ্মের সহিত এক হইতে পারে না; মিথ্যা ও সত্য কখনও এক হয় না। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ। রামানুজের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদোষ-বর্জিত অনন্ত কল্যাণগুণের আধার। জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহার বিশেষ ধর্ম্ম।

শঙ্করের মতে মায়া ব্রহ্মাশ্রিত, সত্য ও নহে মিথ্যাও নহে, সদসদনির্বচনীয়। রামানুজের মতে সৎ ও নহে অসৎও নহে, এরূপ কোন বস্তু হইতে পারে না। মায়া ব্রহ্মের শক্তি, বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী শক্তি। অবিদ্যা জ্ঞানের অভাব, কোন ভাব পদার্থ নহে। অবিদ্যা জীবাশ্রিত, ব্রহ্মে তাহার স্থান নাই। এই অজ্ঞান বন্ধের কারণ। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহার নাশ হয়।

শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও, তাহার অনুভব হয়, তাহা মিথ্যা। রামানুজের মতে জগৎ অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির মত মিথ্যা নহে। জগৎ ব্রহ্মের শরীর।

শঙ্করের মতে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়-

ভোগ-বিরাগ, শম-দম-তিতিক্ষা ও মুমুক্ষুত্ব, এই চারি সাধনসম্পত্তি অর্জনের পরে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় অধিকার-লাভ হয়। রামানুজের মতে বেদপাঠ ও কর্ম্ম-মীমাংসা শাস্ত্র আলোচনার পর কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নশ্বরতা অবগত হইয়া পরে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি জন্মে। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বস্তুতঃ একই মীমাংসা শাস্ত্র।

শঙ্করের মতে জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। রামানুজের মতে মুক্তির জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির প্রয়োজন। বর্ণাশ্রমে বিভিন্ন বর্ণের জন্য যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম। নিষ্কামভাবে অহরহ এই সকল কর্ম্ম করিলে তাহার ফলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বাধা বিদূরিত হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। তখন বেদান্ত-পাঠের ফলে ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় এবং আত্মা যে দেহ নহে এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু ব্রহ্মের অনুগ্রহেই যে মুক্তি-লাভ হয়, এই জ্ঞান হয়। বেদান্ত-পাঠের ফলে যে জ্ঞান হয়, তাহা 'সাক্ষাৎকার' নহে। ধ্রুব স্মৃতি অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বর-স্মরণ, ধ্যান, উপাসনা ও ভক্তি মুক্তির সাধন। ইহার ফলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান হয়। তাহার ফলেই ভক্তির বশ ঈশ্বর ভক্তের অবিদ্যার নাশ করিয়া মুক্তির বাধা অপসারিত করেন। মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করেন। ইহাই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। মুক্তিতে জীবের অস্তিত্বের লোপ হয় না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ

রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করেন। ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, বলিলেও ব্রহ্মের মধ্যেই ভেদ আছে, ইহা তাঁহার মত। কিন্তু তিনি আপনাকে ভেদাভেদবাদী বলিতে স্বীকৃত নহেন। তিনি ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করের নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের সময় (শ্রীভাষ্য ১।১।১) তিনি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদ বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। "অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ" (ব্র সূ ২।১।২২) সূত্রের ভাষ্যে তিনি বহু শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে শ্রুতি ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন। আবার "আরম্ভণাদিভ্য" (ব্র সূ ২।১।১৪) সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি ব্রহ্মের অভিন্নতা অতি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং দ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। ব্রহ্ম সূত্রের ২।৩।৪৬ সূত্রের ("অংশো নানা ব্যপদেশাৎ দাশ কিতবাদিভ্যঃ") ভাষ্যে তিনি ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে বলিয়া

উভয় মতের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র তিনি অভেদবাদ, ভেদবাদ ও ভেদাভেদবাদ সকলেরই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। রামানুজ নিজে ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিয়া আবার ভেদাভেদ-বাদের যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহার ভেদাভেদবাদ অন্য ভেদাভেদাবাদ হইতে ভিন্ন। ভাস্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম কারণরূপে ও জাতিরূপে অভিন্ন, কিন্তু কার্য্য ও ব্যক্তি রূপে ভিন্ন। নিরাকার ব্রহ্ম কারণরূপ, জীব ও প্রপঞ্চ তাঁহার কার্য্যরূপ। ভেদ স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক, উপাধির নাশ হইলে ভেদেরও নাশ হয়। রামানুজের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ ও তাঁহার শরীর, এই জন্য জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ভিন্ন। তিনি জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলেন না এবং ব্রহ্মের সহিত তাহাদের ভেদকে ঔপাধিকও বলেন না। তাহারা সত্য সত্যই ব্রহ্মের অংশ। মোক্ষেও জীবের ভিন্নতা তিরোহিত হয় না। ব্রহ্ম কখনও জীব ও জগৎ-রূপে পরিণত হন না। জীব ও জগৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে চিরকালই তাঁহার অংশ।

ব্রহ্মসূত্রে "আত্মকৃতেঃ" (১।৪।২৩) ও "পরিণামাৎ" (১।৪।২৭) এই দুই সূত্রে ব্রহ্মের পরিণাম-প্রাপ্তির কথা আছে। কিন্তু ব্রহ্ম যদি জীব ও জগৎ রূপে পরিণত হন, তাহা হইলে জীব ও জগতের অসম্পূর্ণতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নিখিলদোষস্পর্শহীন। রামানুজ এই পরিণামের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই—পরিণাম ব্রহ্মের স্বভাব। এই পরিণাম দ্বারা ব্রহ্মের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যই প্রতিপন্ন হয়। অশেষ কল্যাণগুণের আকর, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প অবাপ্তসমস্তকাম ব্রহ্মের লীলার উপকরণভূত সমস্ত চিৎ-অচিৎ বস্তু তাঁহার শরীর, এবং তিনি এই শরীরের আত্মা। প্রলয়ে প্রপঞ্চ যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন তাহা অতি সূক্ষ্ম তমঃ-শব্দবাচ্য অচিৎ বস্তুতে লীন হয়। এই সূক্ষ্ম তমঃ ব্রহ্মের শরীর। তাহা এত সূক্ষ্ম, যে তাহাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলা যায় না। এই সূক্ষ্ম তমঃকে ব্রহ্ম পুনরায় "আমি নামরূপে বিভক্ত চিৎ ও অচিৎ যুক্ত প্রপঞ্চ-শরীর হইব" এই সংকল্প করিয়া আপনার জগৎরূপ শরীরে পরিণত করেন"। ইহাই ব্রহ্মের পরিণাম।

জগতের দুই অবস্থা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম অবস্থায় স্থূল জগৎ তমঃতে বিলীন হয়। সেই তমঃ ব্রহ্মের শরীর ও ব্রহ্মের সহিত একীভূত। যখন সৃষ্টি হয়, তখন তমঃ হইতে স্থূল জগৎ অভিব্যক্ত হয়। এই স্থূল জগৎও ব্রহ্মের শরীর। সুতরাং জগদ্রূপে পরিণতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণতি। অনাদি কাল

হইতে ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইতেছেন। কিন্তু জগতের সমস্ত অপূর্ণতা ও দুঃখ তাঁহার দেহের অংশভূত জীবের, এবং সমস্ত পরিণাম তাঁহার দেহের অচিৎ অংশের। জগতের দুঃখ ও অপূর্ণতা ও পরিণাম তাহাকে স্পর্শ করে না। তিনি সর্ব্বকালেই জীব ও জগতের নিয়ন্তা। এই জগৎ তাঁহার লীলা।

"কৃৎস্ন-প্রসক্তি-নিরবয়ত্ব শব্দ কোপোহবা" (ব্র-সূ-২।১।২৬" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় রামানুজ লিখিয়াছেন, "আদিতে একমাত্র সৎই ছিলেন" প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলা হইয়াছে। এই সকল উক্তির অর্থ এই কারণাবস্থায় ব্রহ্মে চিৎ ও অচিতের ভেদ থাকে না বলিয়া তখন ব্রহ্ম অবয়ব-হীন। এক অবিভক্ত ব্রহ্ম বহু হইতে সংকল্প করিয়া আপনাকে আকাশ, মরুৎ প্রভৃতি জড় বস্তুতে এবং ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত বহু জীবে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মই (তাহার অংশ নহে) কারণ হইতে কার্য্যাবস্থায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।—তাঁহার চিৎ অংশ বিভিন্ন জীবে, এবং অচিৎ অংশ আকাশ, মরুৎ প্রভৃতি জড় বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কারণাবস্থায় অংশহীন, ইহা বহু শ্রুতিবাক্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণাবস্থায় যদিও সূক্ষ্মাবস্থ বস্তু—চিৎ ও অচিৎ, ব্রহ্মের শরীর, এবং কার্য্যাবস্থায় স্থূল অবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ তাঁহার শরীর, তথাপি ব্রহ্ম যখন কার্য্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন, তখন সমগ্র ব্রহ্মেরই কার্য্যের মধ্যে প্রবেশের জন্য তাঁহার কারণরূপের উচ্ছেদ হয়। ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বহু অংশে বিভক্ত হওয়া এবং তাঁহার স্থূল অংশ কার্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া তাহার বাহিরে থাকাও সম্ভবপর হয় না। এই সমস্যার সমাধান পরবর্ত্তী (২।১।২৭) "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" এই সূত্রে পাওয়া যায়। শ্রুতিতে প্রমাণ যে ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও তাঁহা হইতে বহুধা বিভক্ত জগতের উৎপত্তি হয়। শ্রুতির অর্থ শব্দমূলক অর্থাৎ শব্দ হইতে যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহাই শ্রুতির অর্থ। বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিবার শক্তি যে ব্রহ্মে আছে, তাহা শ্রুতি হইতেই জানা যায়, তাহা অন্য প্রমাণের বিষয় নহে। সুতরাং ব্রহ্মের এই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মের অসংখ্য প্রকারের শক্তি আছে, যাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের গম্য নহে। তাঁহাতে ভেদ ও অভেদ কিরূপে একসঙ্গে থাকিতে পারে, তাহা অচিন্ত্য।

উপরি বর্ণিত আলোচনা হইতে প্রতীত হয় যে ব্রহ্মের পরিণাম তাঁহার শরীরভূত চিৎ ও অচিৎ বস্তুর সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে, এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পরিণাম।

ব্রহ্ম হইতে তাঁহার শরীর যখন অভিন্ন, তখন এই পরিণাম তাঁহারই বলিতে হইবে। এই পরিণাম-সত্ত্বেও যে ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তিত এবং জগতের মালিন্যকর্ত্তৃক অকলুষিত থাকেন, তাহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলেই সম্ভবপর হয়। ইহার জন্য অবিদ্যা-কল্পনার প্রয়োজন নাই। ইহাই রামানুজের মত।

৭

ভেদাভেদবাদ

নিম্বার্কাচার্য্য

নিম্বার্কাচার্য্যের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। হায়দরাবাদের অন্তর্গত আদিনাবাদের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে আবিষ্কৃত এক শিলালিপিতে উদয়াদিত্যের কর্ম্মচারী লোলার্কের পত্নী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত "নিম্বাদিত্য প্রাসাদের" উল্লেখ দেখা যায়। উদয়াদিত্যের কাল ১১০০-১০৮৭ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু এই নিম্বাদিত্য-প্রাসাদের সহিত আচার্য্য নিম্বাদিত্যের নামের কোনও সম্বন্ধ যে আছে, তাহার প্রমাণ নাই। নিম্বার্কশব্দ সূর্য্যকেও বুঝাইতে পারে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অনেকের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী নিম্বার্কের আবির্ভাব-কাল। আবার তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে গৌতম বুদ্ধেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে অন্যান্য মতবাদের সহিত দ্বৈতাদ্বৈত-বাদেরও নিন্দা আছে। উক্ত নাটক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত। নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া উক্ত সমালোচনা নিম্বার্ক-দর্শনের সমালোচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক রচনার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নিম্বার্ক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের মত। ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণের মতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীই নিম্বার্কের আবির্ভাব কাল। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অনেকের মতে নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের অন্যান্য ভাষ্যকার-দিগের পূর্ব্ববর্ত্তী। নিম্বার্কের ভাষ্যে অন্য কোনও ভাষ্যের খণ্ডন নাই; ইহা হইতে তাঁহারা অনুমান করেন, নিম্বার্কের সময় অন্য কোনও ভাষ্যই ছিল না। আবার শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে নিম্বার্কের ভাষ্য প্রায় অবিকল উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও নিম্বার্কের পূর্ব্ববর্ত্তিতার প্রমাণ। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, নিম্বার্ক তাঁহার "সবিশেষ নির্বিশেষ" স্তবরাজ গ্রন্থে শঙ্কর ও তাঁহার পরবর্ত্তী নির্বিশেষাদ্বৈতবাদিগণের মতের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং নিম্বার্কের সমসাময়িক ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাস তাঁহার বেদান্ত-কারিকাবলী" গ্রন্থে প্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে নিম্বার্ক

শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণের পরবর্ত্তী ইহা প্রমাণিত হয়। **Mounier Williams** নিম্বার্ক সম্প্রদায়কে ছয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে **first in chronological order** অর্থাৎ অন্য সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। কিন্তু এই মতের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। ডাঃ দাস গুপ্তের মতে নিম্বার্ক রামানুজের পরবর্ত্তী।

তৈলঙ্গ প্রদেশে এক তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ বংশে নিম্বার্ক জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আরুণি, মাতার নাম জয়ন্তী। নিম্বার্ক-রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের নাম "বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ"। এতদ্ব্যতীত দশশ্লোকাত্মক "দশশ্লোকী" নামক গ্রন্থে তিনি তাঁহার মত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। "সবিশেষ নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ স্তবরাজে" পঁচিশ শ্লোকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের এক স্তবও রচনা করিয়াছিলেন। নিম্বার্কের মত বাস্তব বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, ইহাই নিম্বার্কের মত। ভেদ ও অভেদ সমান ভাবেই সত্য। নিম্বার্ক সম্প্রদায় চতুঃসন সম্প্রদায় নামেও অভিহিত হয়। নিম্বার্কের মতে জীব জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু জীব জ্ঞানমাত্র নহে, জ্ঞাতাও বটে। সূর্য্য যেমন আলোক এবং আলোকের আধার, জীবও তেমনি জ্ঞান ও জ্ঞানের আধার--জ্ঞাতা। জ্ঞান জীবাত্মার ধর্ম্ম; জীবাত্মা ধর্ম্মী। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী যেমন ভিন্ন, তেমনি অভিন্ন। জীব অণু পরিমাণ হইলেও জ্ঞান শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া সমগ্র দেহের সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতে সমর্থ। জীব কর্ত্তা। শাস্ত্রে যেখানে তাহার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে, সেখানে তাহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা বলাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে জীবের জ্ঞানও নাই, কর্ত্তৃত্বও নাই। সুষুপ্তিতে যেমন, মুক্তিতেও তেমনি জীবের অস্তিত্বের লয় হয় না। সকল অবস্থাতেই জীবে আনন্দের সদ্‌ভাব থাকে। জীবের সংখ্যা অনন্ত।

বিশ্বে তিন তত্ত্ব অনুস্যূত,—(১) অপ্রাকৃত, (২) প্রকৃতি ও (৩) কাল। অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নহে। ঈশ্বরের দেহ অপ্রাকৃত পদার্থে নির্ম্মিত, (রামানুজের শুদ্ধ সত্ত্ব)। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ প্রকৃতির মূলে অবস্থিত। অপ্রাকৃত, প্রকৃতি ও কাল সকলই নিত্য। জীবও নিত্য।

কেশব কাশ্মীরী (নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত) নির্গুণবাদের খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরকে কল্যাণগুণাবলীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। নিম্বার্ক শ্রীকৃষ্ণকেই পরমেশ্বর বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয়

কল্যাণ গুণের আধার, এবং সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহে তিনি প্রকাশিত। তিনি যুগে যুগে মানুষ-রূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরের চিৎ ও অচিৎ শক্তির প্রকাশই সৃষ্টি। তিনি জীব ও তাহার কর্ম্মের এবং কর্ম্মফলের মধ্যে সংযোগ বিধান করেন। জীব তাঁহার অংশ, তিনি অংশী। জগৎ মিথ্যা নহে। ঈশ্বরের স্বভাবের মধ্যে যাহা সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান, তাহার প্রকাশই জগৎ। জগৎ যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে তাহার অধ্যাস হইতে পারিত না।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবাদ উপনিষদের বহু উক্তির বিরোধী। আবার তাহাদের সম্পূর্ণ ভেদও বহু-উক্তি-বিরোধী। উপনিষদে ভেদ ও অভেদ উভয়ই উক্ত হইয়াছে। পরমাত্মা যদি জীব ও ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিভু বা সর্ব্বব্যাপী বলা যাইত না। ভেদ যে উপাধিজাত, নিম্বার্ক তাহাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য।

নিম্বার্ক রাধা ও কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনার নিষেধ করিয়াছেন। রাধা ও কৃষ্ণই লক্ষ্মী ও নারায়ণ। প্রপত্তি বা শরণাগতিই মুক্তির উপায়। যাহারা তাঁহার শরণাগত হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। তিনি তাহাদিগকে ভক্তি দান করেন। ভক্তিদ্বারাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার-লাভ হয়। ইহাই মোক্ষ। ইহার ফলে অজ্ঞানের নাশ হয়।

জীবের শুদ্ধ স্বভাব তাহার কর্ম্মদ্বারা অচ্ছেন্ন হয়। কর্ম্ম অবিদ্যার ফল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবিদ্যার নাশ হয়। দেহাত্মবোধ অবিদ্যার ফল। ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে দেহাত্মবোধ থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তি হইতে হয়। ভক্তি ও উপাসনা এক নহে। প্রেমই ভক্তি।

নিম্বার্ক শাস্ত্রবিধি পালনীয় বলিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান াভ হয়। চিৎ ও অচিৎ জগৎকে রামানুজ ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন। নিম্বার্ক তাহা স্বীকার করেন না। রামানুজ যাহাকে ব্রহ্মের দেহ বলিয়াছেন, তাহা নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মের শক্তি। জগতের সৃষ্টির জন্য কোনও উপাদানের প্রয়োজন ব্রহ্মের নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছা দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়। তিনি যেমন জগতের নিমিত্ত কারণ, তেমনি উপাদান কারণও বটেন। এই জন্য জগৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলেও ভিন্নও বটে।

রামানুজ ও নিম্বার্ক উভয়েই ভেদাভেদবাদী কিন্তু রামানুজ অভেদের উপরই গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। নিম্বার্কের মতে ভেদ ও অভেদ তুল্য রূপেই সত্য। ভাস্করাচার্য্যের মতে জীবের অণুত্ব ও বহুত্ব ঔপাধিক, জীব ব্রহ্মের ন্যায়ই বিভু কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় অণুত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার অণুত্ব ও বহুত্ব লক্ষিত হয়। মুক্ত অবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন বহুত্ব থাকে না। কিন্তু নিম্বার্কের মতে জীবের অণুত্ব ও বহুত্ব নিত্য, এবং প্রলয়ে ও মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কখনও জীব ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় না। জগৎও সর্ব্ব অবস্থাতেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।

শৈবদর্শন

১

শৈবসিদ্ধান্ত

শৈব ধর্ম অতি প্রাচীন। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পাতে যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে ভারতে শিব-ও-শক্তি-পূজা প্রচলিত ছিল। স্যার জন মার্শাল বলেন যে, মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার অধিবাসিগণ এক পুরুষ-দেবতা ও এক স্ত্রীদেবতার উপাসনা করিত। মার্শালের মতে শিবই এই পুরুষ দেবতা। কেননা এই দেবতার যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহারা ত্রিনেত্র এবং মহাযোগীর ন্যায় যোগাসনে উপবিষ্ট। মার্শালের মতে তাহারা লিঙ্গেরও পূজা করিত। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পা নগরের অধিবাসীরা মার্শালের মতে ছিল দ্রাবিড়-জাতীয়। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা যে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা, ইহাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। ভারতের বাহিরেও শৈব ধর্ম প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যেই শৈবধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পরে শৈব ধর্মকে বহুদিন তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। জৈন ধর্মের সহিত সংগ্রামও বহুদিন চলিয়াছিল। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্বদর্শন-সংগ্রহে চারি প্রকার শৈব দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন:

(১) নকুলীশ পাশুপত দর্শন (২) শৈব দর্শন (৩) প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন (৪) রসেশ্বর দর্শন। নকুলীশ পাশুপত দর্শনই শৈব সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম দর্শন। ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। রসেশ্বরবাদের দার্শনিক মূল্য বিশেষ নাই।

প্রাচীন গ্রন্থে পাশুপত শৈবগণের উল্লেখ আছে। শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে মাহেশ্বর পাশুপত দর্শনের খণ্ডন আছে। রামানুজের শ্রীভাষ্যে কাপাল, পাশুপত, শৈব ইত্যাদি চারি শ্রেণীর শিবোপাসকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশুপত ও শৈব দর্শন বেদবিরোধী নহে।

দাক্ষিণাত্যের তামিলদিগের মধ্যে প্রচলিত শৈব দর্শনের নাম শৈব-সিদ্ধান্ত। খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে এই দর্শন বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। 'তোলকাপ্পিয়ম' নামক প্রাচীন তামিল গ্রন্থে যে আড়িবারদিগের উল্লেখ আছে, তাঁহারা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ও মহাভারত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শৈব ধর্মের ২৮ খানা আগম আছে। শৈব সাধুদিগের রচিত স্তোত্রাবলীও শৈবদিগের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত।

২৮ আগমের মধ্যে কামিক আগম সর্বপ্রধান। কামিক আগমের যে ভাগে জ্ঞানের ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম মৃগেন্দ্র আগম। খৃঃ ৫ম হইতে ৯ম শতাব্দীর মধ্যে শৈব ধর্মের ভক্তিমূলক গ্রন্থগুলি রচিত হয়। নম্বি আন্দার নম্বি কর্তৃক সংগৃহীত শিবের স্তোত্রগুলি ১০০০ খৃষ্টাব্দে একত্র সংগৃহীত হইয়া তিরুমুরাই নামে প্রচারিত হয়। এই সংগ্রহে সংবন্দর, অপ্‌প্‌র এবং সুন্দররের রচিত স্তোত্র আছে। মাণিক্য বাসগর রচিত 'তিরু বাসগম্' গ্রন্থেও অনেক স্তোত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সেক্কিরর-রচিত 'পেরিয় পুরাণম' গ্রন্থে [১১ শতাব্দী] ৬৩ জন শৈব সাধুর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ১৩শ শতাব্দীতে রচিত 'শিব জ্ঞানবোধমে' 'রৌরব' আগমের ১২টি শ্লোকের ব্যাখ্যা আছে। এই গ্রন্থ শৈব সিদ্ধান্তের একখানা প্রধান গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। এতদ্ব্যতীত 'শিবজ্ঞানসিদ্ধিয়র' [অরুলনন্দী শিবাচার্য-রচিত], উমাপতি-রচিত 'শিব প্রকাশম্' ও তিরু অরুলপয়নও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। নীলকণ্ঠ [১৪শ শতাব্দী] বেদ ও আগমের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ভেদাভেদবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে শিব ও অম্বাই [শিবপত্নী) পরম তত্ত্ব। জীব ও জড় শিবের শরীর।

শৈব সিদ্ধান্ত মতে শিবই পরম তত্ত্ব। শিব অনাদি, স্বয়ম্ভূ, অনবদ্য, সর্বকর্মা ও সর্বজ্ঞ। যে পাশে জীব বদ্ধ তাহা হইতে শিবই তাহাকে মুক্ত করেন। শিব সচ্চিদানন্দ। তিনি অনন্ত জ্ঞান, অসীম বুদ্ধি ও অনন্ত প্রেমের

আধার। তিনি সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি আনন্দময়। এই মতে জগতের উপাদান প্রকৃতি অচেতন। এই অচেতন প্রকৃতি কর্তৃক সুসংবদ্ধ জগৎ-সৃষ্টি অসম্ভব। কাল পরিণামী বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক অপরিণামী। তাহাদ্বারাও সৃষ্টি অসম্ভব। কালের কর্তৃত্বও অসম্ভব। কর্মদ্বারাও জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা যায় না। ঈশ্বরই কেবল সৃষ্টি করিতে সমর্থ। এই সৃষ্টিদ্বারা ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য এবং পূর্ণতার অপহ্নব হয় না। তিনি স্বকীয় শক্তি দ্বারাই সৃষ্টি করেন। তিনিই পাপ ও পুণ্যের ভেদ এবং জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেন। তিনিই তাঁহার শক্তিদ্বারা প্রত্যেক জীবের কর্ম্মানুযায়ী ফলপ্রাপ্তির বিধান করেন। কুম্ভকার যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ, মৃত্তিকা তাহার উপাদান কারণ, চক্র ও যষ্টি তাহার করণ কারণ, সেইরূপ ঈশ্বর জগতের প্রথম [নিমিত্ত] কারণ, তাঁহার শক্তি করণ কারণ এবং মায়া উপাদান কারণ। স্বর যেমন ধ্বনিদ্বারা পূর্ণ, ফল তাহার স্বাদদ্বারা পূর্ণ, তেমনি ঈশ্বর সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। জগতে তিনি এমন ভাবে বর্তমান, যে তাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীতি হয় না। বিশ্ব ও মানব ঈশ্বরের দেহ, ঈশ্বর তাহাদের আত্মা। তিনি বিশ্বের মধ্যে ও জীবের মধ্যে বাস করিলেও তাহাদিগের সহিত অভিন্ন নহেন। অদ্বৈত ও একত্ব এক নহে। অদ্বৈত অর্থ অবিচ্ছেদ্যতা।

শিবের শক্তি চেতন। শিব শাশ্বত ও সর্বশক্তিমান। তাঁহার শক্তিই তাঁহার দেহ। ইহা দ্বারাই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত হয়। জীবের দেহবন্ধ ও মুক্তিও তাঁহারই শক্তিদ্বারা হয়। তাঁহার যে জ্ঞান তাহা অপরোক্ষ ও নিত্য। বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপী শিব এবং অচেতন জড়ের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় তাঁহার শক্তি দ্বারা। শিবের শক্তির নাম কুণ্ডলিনী বা শুদ্ধ মায়া। এই শক্তিদ্বারা শিবের সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই শক্তিই সকল জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ। শক্তির এক নাম উমা। উমা শিবেরই অন্য মূর্তি—স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। অসঙ্গ স্বরূপে যিনি শিব, তিনিই বিষয়-সম্বন্ধে শক্তি। শিব অসঙ্গ [Absolute], আবার শিবই ঈশ্বর। মানুষের প্রতি অপার করুণা-বশতঃ তিনি তাহাদিগের গুরু ও মুক্তিদাতা। তিনি প্রেমময় ভগবান্। শৈব দর্শনে শিব পতি [প্রভু], জীব পশু। জীব সনাতন—সুতরাং তাহার সৃষ্টি নাই। দেহ জীবের ভোগ্য। স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারা আত্মার দেহের মধ্যে অবস্থিতি প্রমাণিত হয়। আত্মা শাশ্বত ও সর্ব্বব্যাপী, এবং চিৎশক্তির আবাসস্থল। আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ এবং দৃক্‌ক্রিয়ারূপ। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সহিত সংযুক্ত

হইলেও, আত্মা তাহাদিগের হইতে ভিন্ন। আত্মা ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আধার। আত্মা তাহার অধিষ্ঠান দেহের সহিত কিছুদিনের জন্য মিলিত এবং সংসারে সংসারিক ব্যাপারে মগ্ন থাকে। মুক্তিতে তাহার সমগ্র সংবিদ ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রলয়ে সকল জীব দেহ-বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের মধ্যে শক্তিরূপে বর্তমান থাকে। আত্মাদিগের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। যখন কোন আত্মা মুক্তিলাভ করে, তখন বদ্ধ আত্মাদিগের সংখ্যার হ্রাস হয়। বদ্ধ জীবের জ্ঞান আবৃত। মুক্ত জীবের জ্ঞান পূর্ণ-প্রকাশ।

পাশ-বন্ধ (পাশ-জাল) ত্রিবিধ—অবিদ্যা, কর্ম ও মায়া। অবিদ্যাকে আণব মল বলে। জীবাত্মা আপনাকে অণুর মত মনে করে বলিয়া তাহার এই অজ্ঞানরূপ মলকে আণব মল বলে। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু আপনাকে দেহ-বদ্ধ ও সসীমশক্তি ও জ্ঞানবিশিষ্ট, এবং দেহের সহিত অভিন্ন মনে করে। ইহাই তাহার পশুত্ব [পশু=জীবাত্মা]। এই অবিদ্যা অনাদি। ইহা সকল জীবে বর্তমান ও বহুরূপী। জীবাত্মার সহিত দেহের সংযোগের কারণ কর্ম। কর্ম অবিদ্যার সহকারী। কর্ম সূক্ষ্ম ও অদৃষ্ট। সৃষ্টির স্থিতি-কালে কর্মের অস্তিত্ব, কিন্তু প্রলয়ে ইহা মায়াতে লীন হয়। কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী—কর্মের ধ্বংস কখনও হয় না।

মায়া জগতের উপাদান কারণ। মায়া অচেতন। মায়াশক্তি বহুপ্রকার। মায়া সর্ব্বব্যাপী ও অবিনাশী। মায়াই বিশ্বের বীজ। বীজ হইতে যেমন শাখাপত্র সমন্বিত বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি মায়া হইতে এই বিচিত্র বিশ্বের উদ্ভব হয়।

শৈব সিদ্ধান্ত মতে জগৎ মিথ্যা নহে। জড় ও আত্মা উভয়েই অনাদি। তাহাদিগের হইতেই সংসারের উৎপত্তি। জগৎ-সৃষ্টিতে একটি শুভ উদ্দেশ্য আছে। ইহাকে ভুয়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ঈশ্বর সর্ব্বদাই জীবকে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট। ঋত ও কর্মের লক্ষ্য মানুষকে উন্নত জীবনের দিকে আকৃষ্ট করা। জীবই যে কেবল ঈশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করে তাহা নহে। ঈশ্বরেরও ইচ্ছা জীব তাঁহাকে জানে।

শিব আমাদিগকে পাশ হইতে মুক্তিলাভে সহায়তা করেন। দর্শন শাস্ত্রে যিনি অসঙ্গ [Absolute], তাঁহা হইতে মুক্তিলাভে সাহায্য পাওয়া যায় না। জীবের সুখদুঃখে তিনি বিচলিত হন না। কিন্তু শিব করুণাময়, তিনি কল্প কল্প ধরিয়া জীবের প্রেম ও পূজার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। প্রত্যেক জীবের সহিত ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। তাঁহার দয়াতেই মুক্তি হয়।

তাঁহার নিকট ছোট বড় নাই। যাহারা তাঁহার নিকট যায় না, তাহাদিগকে তিনি কিছু দান করেন না। যাহারা তাঁহার নিকটে যায়, তাহাদিগকে তিনি সর্ব্ব সম্পদ দান করেন।

শৈবদর্শনে পাপবোধ অতি প্রবল। শৈব সাধু আপ্পর লিখিয়াছেন—

"আমার বংশ পাপী, আমার সমস্ত গুণ পাপবিদ্ধ, আমি কেবল পাপেতেই বড়, পাপই আমার মঙ্গল। আমার অন্তরতম আত্মা পাপী, আমি মূর্খ, যাহা বিশুদ্ধ তাহাই আমি পরিহার করি। আমি পশু নহি, কিন্তু পশুর আচরণ কখনও বর্জন করিতে পারি না।" শৈব ধর্ম্মে গুরুর স্থান অতি উচ্চে। যে গুরু অপুনর্ভব (জন্মান্তর-রাহিত্য) প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার আর জন্ম হইবে না, তিনিই প্রকৃত গুরু। শিব নিজেই গুরুর মধ্যে বাস করেন এবং গুরুর চক্ষুদ্বারা শিষ্যের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করেন। শিব অবতার গ্রহণ করেন না, কিন্তু তিনি ভক্তের নিকট আবির্ভূত হন।

কর্মের ফল অখণ্ডনীয় হইলেও জীবের স্বাধীন ইচ্ছা তাহার দ্বারা বাধিত হয় না, কেননা ঈশ্বর জীবকে সাহায্য করিতে সর্বদাই প্রস্তুত।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাসব নামে এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। বাসব-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। অনেক শৈব কবি জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন।

শৈব মতে পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শিবের সাদৃশ্য লাভ করেন, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হন না। ঈশ্বরের সমীপে বাসই মুক্তি। মুক্তিতে জীব শিবের ভৃত্যরূপে তাঁহার সহিত সংযুক্ত হন। তখন আত্মায় কোন মালিন্য থাকে না বলিয়া ঈশ্বরের আলোক তাহার মধ্যে দীপ্তি পায়। মুক্তিতে জীব ঈশ্বরের সহিত এক হয়। কাহারও কাহারও মতে মুক্ত পুরুষ আলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে কর্মফলের ধ্বংস হওয়া আবশ্যক। জীবন্মুক্ত পুনর্জন্মকর কর্মে প্রবৃত্ত হন না। যত দিন তাঁহার অতীত কর্ম নিঃশেষ না হয় তত দিন তাঁহার দেহের নাশ হয় না। জীবন্মুক্ত অবস্থায় কৃত কর্ম হৃদিস্থিত ঈশ্বরের প্রেরণাবশে কৃত হয়। সে কর্মের ফল ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভস্মীভূত হয়।

জীবের পাপ হরণ করেন বলিয়া শিবের নাম হর। তিনি মঙ্গলময় বলিয়া তাঁহার নাম শিব। তিনি শিব, তিনি শিবা, তিনি শিবম্। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের অতীত [গুণহীন নহেন], তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত তুরীয় তত্ত্ব। তিনি জ্ঞানাতীত, কিন্তু অজ্ঞেয় নহেন। তিনি

বিশ্বের অন্তর্যামী হইয়াও বিশ্বাতিগ, তিনি বিশ্বরূপ হইয়াও বিশ্বের অধিক। তিনি অপরিণামী। বিশ্ব প্রকৃতির পরিণাম, তাঁহার পরিণাম নহে। তাঁহার মায়াশক্তির সাহায্যে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন। শুদ্ধ মায়া ও অশুদ্ধ মায়া ভেদে মায়া দ্বিবিধ। শুদ্ধ মায়া বিশ্বের জননী। তিনি বাক [নাদ]। অশুদ্ধ মায়া হইতে কাল, নিয়তি, কলা আদি ক্রমে পঞ্চতত্ত্বের উদ্ভব হয়।

শৈব সিদ্ধান্ত মতে সাংখ্যের মূল প্রকৃতি মূল তত্ত্ব নহে। তাহার পূর্বে পাঁচটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। প্রকৃতির পরে গুণ। গুণের পরে বুদ্ধি। অন্যান্য তত্ত্ব সাংখ্যের ন্যায়। পুরুষ ষড়বিংশ তত্ত্ব। তাহার পাঁচকোষ [পঞ্চ কঞ্চুক] —নিয়তি, কাল, রাগ, বিদ্যা এবং কলা। কলার পরে মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব ও শিব। মোট ছত্রিশটি তত্ত্ব। সদাশিব, ঈশ্বর ও শুদ্ধ বিদ্যা এই তিনটি বিদ্যাতত্ত্ব। শিবতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব।

সমস্ত জ্ঞানের মূল শিবতত্ত্ব। তিনি নিষ্কল অবিভক্ত। শুদ্ধ মায়াই শিবের শক্তি। যখন তাহার ক্রিয়া আরব্ধ হয়, তখন শিব হন সদাশিব বা সদাখ্য। তিনি তখন হন ভোক্তা, তিনি শিব হইতে ভিন্ন নহেন। যখন শুদ্ধ মায়া সক্রিয় থাকে, তখন সদাশিব হন "অধিকার শিব"—ঈশ্বর। তিনিও শিব হইতে ভিন্ন নহেন। শুদ্ধ বিদ্যা হইতে সত্য জ্ঞান হয়। ঈশ্বর প্রত্যেক জীবের কর্ম দেখেন এবং তাহাকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন।

২

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন

প্রত্যভিজ্ঞা শব্দের অর্থ চেনা। আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারা অর্থাৎ আত্মা ও ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞা। কাশ্মীরীয় শৈবদর্শন অদ্বৈতবাদী। এই দর্শনের মতে আত্মা ও ঈশ্বর অভিন্ন। এই অভিন্নতা-জ্ঞানেই মুক্তি হয়।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ "শিব সূত্র"। বসু গুপ্ত (খৃঃ ৮ম শতক) এই গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। বসু গুপ্ত-রচিত গ্রন্থের নাম "স্পন্দ কারিকা"। তাহার উপর কল্লাট ভট্ট এক বৃত্তি রচনা করেন। সোমানন্দের (৯০০ খৃঃ অঃ) "শিবদৃষ্টি", তাঁহার শিষ্য উৎপলাচার্য্যের (৯৩০ খৃঃ অঃ) "প্রত্যভিজ্ঞা সূত্র", অভিনব গুপ্তের (৯৬০ খৃঃ অঃ) "পরমার্থসার" এবং "প্রত্যভিজ্ঞা বিমর্ষিণী" ও "তন্ত্রালোক", এবং ক্ষেম রাজার "শিব সূত্র বিমর্ষিণী" ও "স্পন্দ সন্দোহ" এই দর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ। শৈব আগমসকল ও

শৈব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী এই সকল গ্রন্থে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, ইহাদিগের অদ্বৈতাভিমুখী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যেও সকল বিষয়ে ঐক্য নাই। এই সকল গ্রন্থে ঈশ্বর, আত্মা ও জড়ের আলোচনা আছে বলিয়া ইহাদিগকে "ত্রিক" বলা হয়। ভাস্করের বার্ত্তিক এবং ক্ষেম রাজার বিমর্ষিণীযুক্ত শিবসূত্রে যে মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত বসু গুপ্তের স্পন্দ কারিকা ও কল্লাট ভট্টের বৃত্তির পার্থক্য খুব বেশী নহে। সোমানন্দের শিবদৃষ্টি ও উৎপলাচার্য্যের প্রত্যভিজ্ঞা সূত্র এবং অভিনব গুপ্তের গ্রন্থে যে দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা পূর্ণ অদ্বৈতবাদ। মাধবাচার্য্য তাহার সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে এই মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এই মতের সমর্থকদিগের মতে অন্য দুইটি মত শেষোক্ত মতের সোপান-মার্গ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা যদি অভিন্নই হয়, তাহা হইলে জীবাত্মা তো সদা মুক্ত, তাহার মুক্তির জন্য আবার এই অভেদ-জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মাধবাচার্য্য বলেন, কেবল প্রেমিকের উপস্থিতি দ্বারাই বিরহাকুল রমণীর সান্ত্বনা হয় না, তাহাকে তাহার প্রেমিক বলিয়া চিনিতে পারা চাই। জীব ও ঈশ্বরের একত্ব-জ্ঞানেই কেবল অজ্ঞানের বন্ধ নিবৃত্ত হয়। এই জ্ঞানের ফলে জীবাত্মা ঈশ্বরের আনন্দের মধ্যে বাস করে। যোগের প্রগাঢ় ধ্যানে জীবাত্মা জ্ঞানলাভ করিয়া শান্তিতে নিমগ্ন হয়। অভিনব গুপ্ত তিন প্রকার মুক্ত আত্মার কথা বলিয়াছেন—পরমুক্ত, অপরমুক্ত ও জীবন্মুক্ত। পরমুক্ত পরম তত্ত্বে মিশিয়া যান, অপরমুক্ত পরম তত্ত্বের প্রকাশিত রূপে মিশিয়া যান। মুক্ত আত্মা যখন পরমাত্মায় মিশিয়া যান, তখন দ্বৈতের তিরোধান হয়, আত্মা মায়া উত্তীর্ণ হইয়া জল যেমন জলে মিশিয়া তেমনি ব্রহ্মে মিশিয়া যান।

সমগ্র বিশ্বে শিবই পরিণামবিহীন পরম সত্য। কিন্তু তাঁহার শক্তির অসংখ্য রূপ। এই সকল রূপের মধ্যে চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া প্রধান। শক্তি যখন চিৎরূপ ধারণ করেন, তখন অসঙ্গ পরমতত্ত্ব হন বিশুদ্ধ চৈতন্য-রূপ শিবতত্ত্ব। শক্তির আনন্দরূপ হইতে প্রাণের উদ্ভব হয়। তখন উদ্ভূত হয় শক্তিতত্ত্ব। আপনাকে অভিব্যক্ত করিবার ইচ্ছাই শক্তির তৃতীয় রূপ। তাহার পরে জ্ঞানরূপী ঈশ্বর তত্ত্ব—বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা-ও-শক্তি-সমন্বিত। তাহার পরে বিষয়ী ও বিষয়ের—বেত্তা ও বেদ্যের-উদ্ভব। তখন ক্রিয়ার আরম্ভ। ইহাই শুদ্ধ বিদ্যা। ইহাই শিবের শক্তির পঞ্চবিধ অভিব্যক্তি।

শিবই বিশ্বে একমাত্র সৎ বস্তু। তিনি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, সনাতন এবং স্বচ্ছন্দ (স্বাধীন)।

তিনি বিষয়ী, তিনি বিষয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, তাঁহার চারি অবস্থার মধ্যে কখনও তাঁহার স্বভাবের বিচ্যুতি ঘটে না। তাঁহার সুখ নাই, দুঃখ নাই। তাঁহার মধ্যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদ নাই; চৈতন্যের অভাব নাই। জগৎ অচেতন বলিয়া প্রতীত হইলেও চৈতন্যের মধ্যেই অবস্থিত।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনে প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ বলা হয় না। মায়া হইতে মিথ্যা রূপের উৎপত্তি হয়, ইহাও স্বীকৃত হয় না। ঈশ্বর স্বীয় ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা যাহা কিছু আছে, সে সকলের সৃষ্টি করেন। তিনি এমন ভাবে সৃষ্টি করেন যে জগৎ তাঁহার মধ্যে অবস্থিত হইলেও তাহা হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীত হয়। সৃষ্টি-কার্য্যের ফলে ঈশ্বরের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, দর্পণে অন্যান্য বস্তু প্রতিফলিত হইলেও, যেমন তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। তাঁহার অচিন্তনীয় শক্তি-বলে ঈশ্বর জীবাত্মা-রূপে এবং তাহাদের ভোগ্য বস্তু-রূপে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের স্পন্দই (ক্রিয়া) জগতের যাবতীয় ভেদের কারণ।

মায়াশক্তি দ্বারা জগতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জগৎ মিথ্যা নহে। মায়া হইতে নিয়তি (দিক্), কাল, রাগ, বিদ্যা (জ্ঞান) এবং কলা উদ্ভূত হয়। মায়াশক্তি দ্বারাই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর আপনাকে বহু-সংখ্যক পুরুষ রূপে প্রকাশিত করেন। তাঁহার অসীমত্বের অবচ্ছেদের জন্য অবচ্ছেদকের প্রয়োজন। সেইজন্য প্রকৃতির উদ্ভব। প্রকৃতিদ্বারা পুরুষ অবচ্ছিন্ন হয়। প্রকৃতির উদ্ভবের পরে তাহা হইতে সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত ভাবে অন্য সকল বস্তুর অভিব্যক্তি হয়। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের মতে জীবাত্মার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপে অভিন্ন। পরমাত্মা প্রত্যেক জীবে অধিষ্ঠিত হইলেও উপাধিদিগের দ্বারা তাহার জ্ঞান আবৃত। স্বরূপে অনন্ত জ্ঞান হইলেও, জীবাত্মা আপনাকে সসীম এবং দেহ হইতে অভিন্ন মনে করে। এই অজ্ঞানই বন্ধ। জীবাত্মা ভুলিয়া যায় যে সে শিব, এবং শিব হইতে স্বতন্ত্র ভাবে জগতের অস্তিত্ব নাই।

সৃষ্টির পরে প্রলয় এবং প্রলয়ের পরে পুনরায় সৃষ্টি সাংখ্যের ন্যায় প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনেও স্বীকৃত।

৩

বীর শৈবদর্শন

যিনি নির্ভীক বীর, ষড়রিপু যাঁহার বশীভূত সেই শিবোপাসক বীর-শৈব। বীর শৈবগণ লিঙ্গায়েৎ নামেও পরিচিত। তাঁহারা গলদেশে বা

বাহুতে শিবলিঙ্গ ধারণ করেন বলিয়া তাঁহাদের এই নাম। লিঙ্গ-সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা অনেকের আছে। লিঙ্গ যে দুইটি তত্ত্বের প্রতীক, তাহা সত্য। কিন্তু এই দুই তত্ত্ব পুরুষ ও স্ত্রী নহে। শিব ও শক্তি পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক নহে। তাঁহারা স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক ইহাদের কোনোটিই নহেন। শিব পরম তত্ত্বের "সৎ" রূপ, শক্তি তাঁহার চিৎ রূপ। শিব তাঁহার নির্গুণ রূপ, শক্তি সগুণ রূপ। শিব নিষ্ক্রিয়, শক্তি সক্রিয়। শিব নৈর্ব্যক্তিক, শক্তি ব্যক্তিরূপ। লিঙ্গ পরমার্থের সৎ ও চিৎ রূপের একত্ব। ২৮ শৈব আগমের শেষ অংশে বীর শৈব মত বর্ণিত আছে। বীর শৈব মত "শক্তি বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ" নামেও পরিচিত।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী বীরশৈব সম্প্রায়ের উদ্ভব-কাল। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম বসব (১১৬০ খৃষ্টীয়)। বসব এক জৈন রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বসব এবং তাহার শিষ্যদিগের বচন যে গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার নাম বসব-সংহিতা। এই গ্রন্থ বীরশৈবদিগের পবিত্র গ্রন্থ। বসব জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতেন। লিঙ্গায়েৎগণ বর্ণাশ্রম স্বীকার করেন না।

লিঙ্গায়েৎ মতে জগতের মূলে জাগতিক যাবতীয় সম্বন্ধের আধার এক আত্মিকতত্ত্ব স্বীকার না করিলে জগতের ব্যাখ্যা করা যায় না। এই তত্ত্ব অসঙ্গ ও শাশ্বত আত্ম-সংবিদ। মানুষ যাহা অল্প অল্প করিয়া জানিতে পারে, তাহা সমগ্র রূপে এই অসঙ্গ সংবিদে প্রকাশিত। এই অসঙ্গই ঈশ্বর। বীর শৈব শাস্ত্রে তাঁহার নম "স্থল।" যাবতীয় সামুৎপাহিক সত্তার উৎস এই "স্থল"। সনাতন স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভূ সংবিদের কালে খণ্ডশঃ প্রকাশই সমুৎপাদ। স্থল শাশ্বত শান্তি। তাঁহাতেই সমস্ত গতির অবসান। স্থল কেবল সংবিদ নহেন, তিনি সংবেত্তাও বটেন। তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞান উভয়ই। চিন্তা অথবা সংবিদ স্থলের রূপ, অহন্তা তাহার উপাদান। চরম সংবিদের এই অহন্তা উপাদান তাহার "সৎ" রূপ বিভাব (aspect of Being) শিব, শক্তি তাহার রূপ (form)। শক্তি চিৎ। জগতের মূলে যে আত্ম-সংবিদ, তাহাতে 'সৎ' ও চিৎ, জ্ঞাতা ও জ্ঞান উভয়ই বর্তমান।

পরমার্থের সমগ্র রূপের জ্ঞান-অংশের কালিক ক্রমে প্রকাশই এই বিশ্ব। মানুষের স্বরূপের মধ্যেও দুইটি অংশ—সত্তা ও জ্ঞান। জ্ঞানের ক্রম-বিকাশই মানুষের বিকাশ। বীর শৈবদর্শন সত্তা ও বোধের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ভেদ

স্বীকার করে না। অসঙ্গের একটি অংশ শক্য। তাহাই তাহার উপাদান অংশ। তাহাই শিব। তাহার বাস্তব রূপ বা জ্ঞানাংশ শক্তি। শক্তি শিবের সহিত এক। সত্তার মধ্যে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট। শিব ও শক্তি নিত্য সম্পৃক্ত ও এক বলিয়াই এই দর্শনের নাম শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।*

বীর শৈবদর্শন মায়াবাদ স্বীকার করে না। এই মতে শিবের বিমর্ষশক্তি হইতেই সৃষ্টি উদ্ভূত হয়। এই শক্তি সৃষ্টি ও সংহার উভয়েই সমর্থ। বীর শৈব মতে জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে। এই দর্শনে সাংখ্যের পরিণামবাদও অস্বীকৃত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই দর্শনে মৌলিক তত্ত্ব নহে। তাহারা চৈতন্য হইতে একান্ত ভিন্ন নহে।

শিব ও শক্তি এক স্থলেরই দুই রূপ। শিব ও শক্তি নিত্য সংযুক্ত। শক্তি শিবের আত্মা। শিব ও শক্তির একত্বের প্রতীক লিঙ্গ। "লি" ও "গম্" এই দুই ধাতু হইতে লিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি। যাহাতে যাবতীয় বস্তু লয়প্রাপ্ত হয় ও যাহা হইতে তাহারা বহির্গত হয়, তাহাই লিঙ্গ।

এই মতে জীবের বন্ধন অনাদি, কিন্তু ইহার সমাপ্তি আছে। মুক্তির আরম্ভ থাকিলেও শেষ নাই। মুক্ত পুনরায় বন্ধন প্রাপ্ত হয় না।

দ্বৈতবাদ—মধ্বাচার্য্য

মধ্বাচার্য্যের পিতৃদত্ত নাম বাসুদেব। তিনি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে দক্ষিণ কানাড়া জেলার উড়ুপী গ্রামের নিকটস্থ এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি পিতামাতার অজ্ঞাতসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ। আচার্য্য পদ গ্রহণ করিবার পরে তিনি মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত হন।

মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের তিন খানা ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন: (১) সূত্র ভাষ্য, (২) অনু ভাষ্য ও (৩) অণু ভাষ্য। প্রথম ভাষ্যটী বৃহৎ, কিন্তু ইহাতে অন্য মতের খণ্ডন নাই। দ্বিতীয় ভাষ্যে বিরুদ্ধ মত খণ্ডিত ও স্ব মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৃতীয় ভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য শ্লোকাকারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

মধ্বাচার্য্যের মত তত্ত্ববাদ নামে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় তত্ত্ববাদী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

---

* History of Philosophy Easlern and Western—Saivism দ্রষ্টব্য।

৭৯ বৎসর বয়সে মধ্ব পরলোক গমন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী না হইলেও মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ব্যতীত মধ্ব অনেকগুলি উপনিষদের ভাষ্য এবং "শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা তাৎপর্য্য নির্ণয়" এবং আরও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মধ্ব মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র। স্বতন্ত্র তত্ত্ব একটি—ঈশ্বর। ঈশ্বর ও পরতন্ত্রসকলের মধ্যে ভেদ নিত্য। জীব ও জগৎ পরতন্ত্র। ঈশ্বর যেমন নিত্য, জীব ও জগৎও তেমনি নিত্য। ঈশ্বরের সহিত জীব ও জগতের ভেদ অনতিক্রমণীয়। জীবে ও ঈশ্বরে, ঈশ্বরে ও জড়ে, জীবে ও জীবে, জীবে ও জড়ে এবং জড়ে ও জড়ে—এই পঞ্চ ভেদ নিত্য ও অনাদি।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাহা বেদ হইতে জানা যায়। সুতরাং তাহা অনির্দেশ্য নহে। শাস্ত্রে যখন ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে অনির্দেশ্য বলেন, তখন তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। ধ্যানে তাঁহার যেরূপ দৃষ্ট হয়, তিনি তাহা নহেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে যে ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ বর্ণিত হইয়াছে, মধ্ব তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে একই ব্রহ্মকে বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। "ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই বাক্যের অর্থ এই যে ব্রহ্মের সমান কেহ নাই, তিনি সর্ব্বব্যাপী। ব্রহ্মের যাবতীয় গুণই অসীম, সুতরাং তিনি তাহার গুণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। সর্ব্ব প্রকার পূর্ণতাই তাঁহাতে বর্ত্তমান। তিনিই বিষ্ণু এবং জগতের প্রভু। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও সংহারকর্ত্তা। অন্তর্যামী রূপে তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে বর্ত্তমান। তাঁহার এক অপ্রাকৃত শরীর আছে। তিনি নানা ব্যূহে প্রকাশিত এবং যুগে যুগে মানব-রূপে ধরায় অবতীর্ণ হন।

মধ্ব-মতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণমাত্র, উপাদান কারণ নহেন। কুম্ভকার ও কুম্ভের উপাদান মৃত্তিকা যেমন অভিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ জগতের স্রষ্টা ও তাহার উপাদান এক বস্তু হইতে পারে না। জগৎ প্রকৃতি-উপাদান দ্বারা ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট। প্রলয়ে জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়। প্রকৃতি এক (homogeneous) বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাহার মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ বর্ত্তমান। তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম রেণু তাহার উপাদান। এই সকল রেণু বৈশেষিক পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম। তাহাদের দ্বারাই ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করেন।

ঈশ্বরের শক্তিই মুখ্য মায়া। প্রকৃতি অমুখ্য মায়া। প্রকৃতি হইতে জগতের উদ্ভবের পূর্ব্বে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে মহৎ, অহংকার, বুদ্ধি, মন দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয় এবং পঞ্চভূতের (চতুর্বিংশতি তত্ত্বের) উদ্ভব হয়। প্রকৃতির মধ্যে ইহারা সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান থাকে, পরে অভিব্যক্ত হয়।

মধ্বের মতে জগতের প্রত্যেক বস্তুই জীবিত পদার্থ এবং বিশ্বের প্রত্যেক বিন্দু জীব দ্বারা পূর্ণ। "এক বিন্দু স্থান অসংখ্য জীবে পূর্ণ"। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অলঙ্ঘ্য। মুক্তিতেও জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বিদূরিত হয় না। সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হইলেও জীব মুখ্যতঃ ক্রিয়াপর। জীবের শক্তি সীমাবদ্ধ। ঈশ্বর বিভু, সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু জীব অণু। কিন্তু অণু-পরিমাণ হইলেও ইহা বুদ্ধিগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত। জড় দেহের সহিত সংযোগবশতঃ জীবাত্মা স্বভাবতঃ আনন্দ-স্বরূপ হইলেও দুঃখকষ্ট ভোগ করে। অতীত কর্ম্মই দেহের সহিত জীবাত্মার সংযোগের কারণ। যত দিন পর্য্যন্ত আত্মার কালিমা বিদূরিত না হয়, তত দিন তাহাকে জন্মমৃত্যু ভোগ করিতে হয়। মুক্তিতে আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। জীবে জীবে ভেদ নিত্য। কোনও দুই জীবের মধ্যে প্রকৃতিগত সাম্য নাই।

জীব ত্রিবিধ—নিত্য মুক্ত, মুক্ত এবং বদ্ধ। নিত্য মুক্ত জীব কখনও বদ্ধ ছিলেন না—যেমন লক্ষ্মী। বদ্ধ জীবের মধ্যে আছে দুই শ্রেণী—মুক্তিযোগ্য ও মুক্তির অযোগ্য। যাহারা মুক্তির অযোগ্য, তাহাদের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী—যাহারা নারকী বা তমঃযোগ্য, এবং যাহারা সংসার-চক্রে বদ্ধ—নিত্য সংসারী। কোন কোনও জীব তাহাদের গুণের জন্য মুক্তির জন্য নির্বাচিত, কেহ কেহ নরকে বদ্ধ থাকে, আবার কেহ অনন্ত কাল ধরিয়া সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে, কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করে। সাত্ত্বিক লোক স্বর্গে যায়। রাজসিক লোক সংসারে বদ্ধ থাকে এবং তামসিক লোক নরকে যায়। জীব দেব, মানব, তির্য্যক এবং উদ্ভিদ, এই চারি ভাগে বভিক্ত। দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা ও বায়ু প্রধান। বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা আচার্য্যদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই মাধ্বদর্শন প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। এই জন্য মাধ্ব সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ও বলে। বায়ু জীবকে পরমার্থ জ্ঞান-ও-মুক্তিলাভে সহায়তা করেন। বায়ুকে হরির "প্রেয়সী প্রতিমা" এবং "হরির সুতও" বলে। মধ্বশিষ্যগণ মধ্বকে বায়ুর অবতার এবং তিনি অতীত জন্মে হনুমান ও ভীম রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

মধ্ব-মতে সকল জীবই হরির অনুচর। জীবদিগের মধ্যে অধিকারের তারতম্য আছে। মুক্তির অর্থ জীবের স্বরূপ যে আনন্দ, তাহার অনুভূতি। মুক্তিই প্রয়োজন, তাহার সাধন অমল ভক্তি। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক। তাহাতে আনন্দের প্রাচুর্য্য বলিয়া তিনি আনন্দময়, তিনি অনন্ত শক্তির আধার। লক্ষ্মী ঈশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি। মধ্ব "তত্ত্বমসি" পাঠটি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে "স

আত্মা তত্ত্বমসি"—ইহাই প্রকৃত পাঠ। আত্মা তত্ত্বমসি=আত্মা+অতৎ+ত্বম্+অসি। তুমি আত্মা তাহা (ব্রহ্ম) নও। মধ্ব ভেদাভেদবাদ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে জীব ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন। শ্রুতিতে,যেখানে অভেদ উক্তি আছে, সেখানে জীব যে ব্রহ্মের অংশ, ইহাই সূচিত হইয়াছে। মধ্ব-মতে জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে। ভ্রান্ত জ্ঞানেও কোনও বিষয় মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই বিষয়ের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তি হয়। এই ভ্রান্তির কারণ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা অথবা অন্য কিছু হইতে পারে। কিন্তু ভ্রান্ত জ্ঞানেও তাহার বিষয় অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়-দোষ অথবা কারণান্তরবশতঃ আমরা মনের সম্মুখে উপস্থাপিত সমগ্র বস্তুটি দেখিতে পাই না, যেটুকু দেখি, তাহা দেখিয়া তাহার সদৃশ পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু-বিশেষের স্মৃতি মনে উদিত হয়। তাই তাহার সহিত সদ্য দৃষ্ট বস্তু গুলাইয়া যায়। জগৎকে যখন মিথ্যা বলি, তখন জগৎ-রূপে যাহা মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই বস্তুটি মিথ্যা নহে, তাহার যে রূপ আমরা দেখি, তাহাই মিথ্যা।

প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ—মধ্ব এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায় না। সুতরাং পরমার্থের জ্ঞানের জন্য বেদের উপর নির্ভর করিতে হয়। মধ্ব বেদের সকল অংশের প্রামাণ্যই স্বীকার করেন। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উপনিষদের মতোই প্রামাণিক। বেদ অপৌরুষেয় এবং ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য।

জ্ঞানই জ্ঞাত বস্তুর মুখ্য প্রমাণ। জ্ঞানের সময় তাহার যাহা সাধন, তাহা জ্ঞানের মধ্যে উপস্থিত থাকে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অব্যবহিত। প্রত্যেক জ্ঞানই প্রামাণিক, তাহা দ্বারা তাহার বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই অস্তিত্ব ক্ষণিক হইতে পারে। পরে অন্যবিধ জ্ঞানের ফলে ইহাকে আমরা অগ্রাহ্য করিতেও পারি। সূর্য্য উদিত হয় ও অস্ত যায়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যখন জানিতে পারি যে সূর্য্য ওঠেও না, অস্তও যায় না, তখন পূর্ব্বের বিশ্বাস বর্জন করি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের অস্তিত্ব না থাকিলে কোনও জ্ঞানেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। আমাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন প্রত্যয়ের অস্তিত্ব হইতে মনের বাহিরে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। এই ভেদ স্বীকার না করিলে প্রত্যয়দিগের মধ্যে ভেদের ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না, ইহা বলিলেও মধ্ব জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই। ঈশ্বরে ভক্তির জন্য ঈশ্বর-সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন। জাগতিক

যাবতায় বস্তুই ঈশ্বরের শাসনাধীন, এই জ্ঞান হইলেই ঈশ্বরে ভক্তি সঞ্জাত হয়। মুক্তির জন্য উন্নত চরিত্রও অত্যাবশ্যক। অন্যায় কর্ম্ম বর্জন করিয়া নিষ্কাম ভাবে সৎ কর্ম্ম করিতে হইবে। ধার্ম্মিক জীবন জ্ঞান-লাভের সহায়ক। বেদপাঠ করিয়া সত্য জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর সাহায্য ব্যতীত বেদ বুঝিতে পারা যায় না। গুরু শিষ্যের ক্ষমতানুসারে তাহাকে মুক্তির পথে চালিত করেন। মধ্বের মতে বেদান্তের অর্থ বুঝিতে সক্ষম সকল লোকেরই (জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে) বেদান্ত-পাঠে অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভিন্ন অন্য কাহারও বেদপাঠে অধিকার নাই। স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণ পুরাণ ও স্মৃতি হইতে বেদের জ্ঞান আহরণ করিতে পারেন। গভীর ধ্যানে ঈশ্বরের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়। এই অনুভূতি যখন স্থায়ী হয়, তখনই জীবের বন্ধন খসিয়া পড়ে।

"স্ব-স্ব-যোগ্য-স্ব-স্ব-রূপানন্দাভিব্যক্তি"ই মুক্তি—অর্থাৎ জীবের স্বরূপভূত আনন্দে অবস্থিতিই মুক্তি। মুক্তিতে দুঃখের অনুভব হয় না, কিন্তু সুখ অনুভূত হয়। মুক্ত আত্মার মনে কোনও সংশয় নাই, কামনা নাই। তাহাদের কামনা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত অভিন্ন।

ঈশ্বরকে সোজাসুজি পাওয়া যায় না, বায়ু দেবতার মাধ্যমে তাঁহাকে পাইতে হয়। মধ্বের মতে কোনও জীবই স্বীয় চেষ্টা দ্বারা মুক্তির উপযুক্ত হয় না। ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন কেহই মুক্তি পায় না। কাহাকে ঈশ্বর করুণা করিয়া মুক্তি দিবেন, তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই মত খৃষ্টীয় মতের সদৃশ। কিন্তু মধ্বের মতে ঈশ্বরের করুণা ভক্তির গভীরতার অনুযায়ী হয়। ঈশ্বরের দয়া ভক্তের বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপরও নির্ভর করে। ঈশ্বর যখন ভক্তের বিশ্বাস ও ভক্তির গভীরতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন, তখনই তিনি আপনাকে তাহার নিকট প্রকাশিত করেন। মধ্ব কায়, মন ও বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। তিনি জীব-বলি নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং পশুর বদলে গোধূমচূর্ণ-নির্মিত-পশুদেহ-বলির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ—বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য্য

বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লিখিত হন। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব-কাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্‌গীতা ও ভাগবতের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুস্বামীর মতে ঈশ্বর সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। জীব স্বরূপে স্বপ্রকাশ হইলেও পরমাত্মার মায়াদ্বারা আবৃত। দুঃখের আকর মায়া ঈশ্বরের অধীন, অবিদ্যাপদবাচ্য এবং জীবের পীড়াদায়ক। মুক্ত জীব নিত্য দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের সেবা করেন। জীব নিত্য। জীব, জগৎ ও মায়ার আশ্রয় ঈশ্বর। ইহাদের আশ্রয়-রূপে ঈশ্বর অদ্বয় তত্ত্ব।

বিষ্ণুস্বামীর মত বল্লভাচার্য্য (১৪০১ খৃষ্টাব্দ) কর্ত্তৃক পুনরুজ্জীবিত হয়। বল্লভাচার্য্য দক্ষিণাপথের এক তেলেগু ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। কিন্তু সেখান হইতে কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবৎগীতার সহিত তিনি ভাগবত পুরাণেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। অনুভাষ্য, সিদ্ধান্তরহস্য এবং ভাগবত-টীকা সুবোধিনী প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৮৪ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার অনুভাষ্য ও সুবোধিনী গ্রন্থের সমগ্র অংশ পাওয়া যায় নাই।

বল্লভের মতে বেদান্তের ব্রহ্মই ভাগবতের ভগবান্। জ্ঞান-মার্গীর নিকট তিনি ব্রহ্ম-রূপে অনুভূত হন, ভক্তের নিকট ভগবান-রূপে। জগৎ সত্য, স্বরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জীবও স্বরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জীব, কাল ও প্রকৃতি সকলই নিত্য, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যাহারা মায়াশক্তিদ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করেন, তাহারা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এক শক্তি স্বীকার করেন বলিয়া তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলা যায় না। মায়া ব্যতিরেকে জগৎ-সৃষ্টির সামর্থ্য ঈশ্বরের আছে।

ঈশ্বর নির্গুণ নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ। শ্রুতিতে যেখানে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, সেখানে তিনি প্রাকৃত-গুণ-বিবর্জিত, ইহাই শ্রুতির অর্থ। জ্ঞান-ও-ক্রিয়া-গুণান্বিত ঈশ্বরই কৃষ্ণ। তিনি জগতের স্রষ্টা। ইচ্ছা-শক্তির বলে তিনি জগতের সৃষ্টি করেন। তিনি কর্ত্তা ও ভোক্তা। তিনি নিরাকার, কিন্তু ভক্তের নিকট তিনি সাকার রূপে আবির্ভূত হন। যজ্ঞরূপী তাঁহাকে বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা উপাসনা করিতে হয়। জ্ঞানদ্বারা তাঁহার

ব্রহ্ম-রূপের উপাসনা হয়। গীতা ও ভাগবতের উপদেশ অনুসারে তাঁহার কৃষ্ণ-রূপের উপাসনা করিতে হয়।

জীব ব্রহ্মের চিৎ অংশ। জীবে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ তিরোহিত। জীব নিত্য, অণুপরিমাণ ও অসংখ্য। জীব কর্ত্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা, মায়ার বশীভূত। অগ্নির অংশ স্ফুলিঙ্গে যেমন অগ্নির ধর্ম্ম দাহকত্বের অস্তিত্ব হেতু তাহা অগ্নি বলিয়া কথিত হয়, তেমনি জীবে ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মের অস্তিত্ব হেতু জীব ব্রহ্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের কৃপায় জীবে যখন তিরোহিত আনন্দাংশ আবির্ভূত হয়, তখন জীব ব্রহ্মাত্মক হয়। তাহার প্রতি লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার অণুত্ব তিরোহিত হয় না।

জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি- ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা সৃষ্ট। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনি নিজে অবিকৃত থাকিয়া জগৎ-রূপে পরিণত হন। মায়া ব্রহ্মের শক্তি। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সূক্ষ্ম রূপে ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে। জীবে ব্রহ্মের আনন্দাংশ যেমন তিরোহিত, তেমনি অচেতন জড়ে তাঁহার আনন্দ ও চিৎ উভয় অংশই তিরোহিত। ব্রহ্মের গুণের আবির্ভাব ও তিরোভাবই সকল বস্তুর উৎপত্তির কারণ। স্বকীয় গুণের আবির্ভাব বা তিরোভাব করিয়া ব্রহ্ম যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হন।

জীব ত্রিবিধ—শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। অবিদ্যাকর্ত্তৃক যে সকল জীবের ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদিত নহে, তাহারা শুদ্ধ। যাহারা অবিদ্যার জালে বদ্ধ এবং জন্ম-মৃত্যু ভোগ করে, তাহারা সংসারী। বিদ্যা-বলে যাহারা সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত। মুক্তি-প্রাপ্ত জীব তাহার তিরোহিত আনন্দ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত হন। জড় জগৎ ব্রহ্মাত্মক, কিন্তু ব্রহ্মের চিৎ ও আনন্দাংশ ইহা হইতে তিরোহিত, ব্রহ্মের সত্তা-অংশ কেবল ইহাতে বর্ত্তমান। ব্রহ্মই জগৎ-রূপে প্রকাশিত বলিয়া জগৎ "ব্রহ্ম কার্য্য"। শঙ্করের মতে আত্মা এক ও দ্বিতীয়রহিত। বল্লভার্য্যের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই সত্য। জীবাত্মা সংখ্যায় অনন্ত। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ—স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ। স্বরূপতঃ জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন। মুক্তিতে জীবাত্মার আনন্দাংশ তাহাতে প্রত্যাগত হয়, জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মে মিশিয়া যায় না। জীব নিত্য, ব্রহ্মই জীবে পরিণত হন। সুতরাং জীবের অস্তিত্ববশতঃ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না। শঙ্কর ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম কেবল সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ। বল্লভের মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের গুণ। তিনি

সত্তাবান, জ্ঞানবান ও আনন্দময় পুরুষ, কেবল সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ নহেন। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা, বল্লভের মতে জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য। কেননা ব্রহ্ম কেবল যে জগতের স্রষ্টা, তাহা নহে, তিনি নিজেই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন। বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে আছে যে ব্রহ্ম বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া নিজে বহু আত্মা ও বিশ্বে পরিণত হইলেন। বল্লভের মতে ব্রহ্ম জগৎ, জীব ও জগতে পরিণত হইয়াছেন। বল্লভের মতে মায়া ও অবিদ্যা এক নহে। মায়া ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ঠ, তাঁহারই পক্তি। এই শক্তি দ্বারাই তিনি জগতের সৃষ্টি ও লয়-সাধন করেন। অবিদ্যা দ্বারা বস্তুর স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়, বহুত্বের প্রতীতি হয়, এবং ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়। জগৎ সত্য, কিন্তু তাহার যে প্রতীতি হয়, সেই প্রতীতি মিথ্যা। জগৎ যে ব্রহ্ম, সে প্রতীতি আমাদের হয় না, তাই তাহাতে আমরা বহুত্বের আরোপ করি। এই ভ্রান্তি অবিদ্যা-জাত। অবিদ্যার স্থান মানুষের মনে। জগৎ যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহা বলা যাইত না। বল্লভ নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই বলিয়াছেন। নির্গুণ শব্দের অর্থ প্রাকৃত-গুণ-রহিত। ব্রহ্ম প্রাকৃত-গুণ-বর্জিত এবং অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের আধার। তিনি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। তিনি "অপাণিপাদ" হইয়া ও "জবন"ও "গ্রহীতা"। সুতরাং তাঁহাতে সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই থাকিতে পারে। ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যই বল্লভের মুক্তি বা মোক্ষ। মোক্ষ অর্থে পরব্রহ্মে প্রবেশ। তাহাতে জীবাত্মার অস্তিত্বের বিলয় হয় না। পূর্ণানন্দ-স্বরূপ পুরুষোত্তমের মধ্যে প্রবেশের ফল আনন্দময়ত্ব-প্রাপ্তি। ভক্তিই মোক্ষের প্রধান সাধন। ভক্তিপথ মর্য্যাদা ও পুষ্টিভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রানুযায়ী বৈধী ভক্তিই মর্য্যাদা মার্গ। আর যে ভক্তির লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের অনুগ্রহ লাভ, তাহাই পুষ্টিমার্গ।

বল্লভাচার্য্য বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়কেই স্বীকার করিয়াছেন। কেবল কর্ম্মকাণ্ড অথবা কেবল জ্ঞানকাণ্ড গ্রহণ করিলে পূর্ণাঙ্গ বেদের অঙ্গচ্ছেদ হয়। তাঁহার মতে উক্ত দুই কাণ্ড পরস্পরের পরিপূরক। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ব্রহ্ম যজ্ঞ-রূপে এবং জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আবার তিনিই স্মৃতিতে পরমাত্মা-রূপে এবং ভাগবতে ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

বল্লভ "তত্ত্বমসি" বাক্যে "তত্ত্বং" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "তস্য ভাবঃ", এবং সমগ্র বাক্যের অর্থ করিয়াছেন "ত্বম্ তস্য (ব্রহ্মণঃ) ভাবঃ অসি" অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে গুণের সমতা আছে। তাঁহার মতে এই বাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞাপক নহে।

শাক্তদর্শন

পাশুপত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় শাক্ত ধর্ম্মের মূল বেদে নিহিত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৫ সূক্তের নাম দেবী সূক্ত। এই মন্ত্রের ঋষি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্। ইহার দেবতা, আদ্যাশক্তি। এই সূক্তে আছে "আমি রুদ্র, বসু ও আদিত্য এবং বিশ্বদেবদিগের সহিত বিচরণ করি, মিত্র ও বরুণ এবং ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। আমি সোমদেবকে, ত্বষ্টাকে, পূষণকে ও ভগকে ধারণ করি, যজ্ঞফল দান করি। আমি জগতের ঈশ্বরী, ধনপ্রদাত্রী, যজ্ঞে আহুতদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, প্রপঞ্চ-রূপে বহু ভাবে অবস্থিত, সর্ব্ব ভূতে জীব-রূপে প্রবিষ্ট। আমাকে দেবগণ নানা ভাবে আরাধনা করে" ইত্যাদি। ঐ মণ্ডলের ঐ অনুবাকের রাত্রিসূক্ত নামে অভিহিত ১২৭ সূক্তে যে রাত্রিদেবীর কথা আছে তিনি ও দেবী সূক্তের দেবী অভিন্না। কেন উপনিষদে এই দেবীই উমা। তিনি দেবতাদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়া অসুরবিজয়-গর্বিত দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন ব্রহ্মশক্তিতেই তাঁহারা অসুরদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শৈবগণ এই শক্তিকে শিবের পত্নী বলেন। মহাভারতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী বলা হইয়াছে। পুরাণে তাঁহার নাম চণ্ডী। শাক্তদর্শনের ধারাবাহিক বিবরণ এখন পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। তন্ত্র-সাহিত্যে এই দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বহু দিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশে তন্ত্রশাস্ত্র অবজ্ঞাত ছিল। সার্ জন উড্রফ্ প্রধান প্রধান কয়েকখানি তন্ত্রের অনুবাদ করিয়া তাহাদের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শাক্ত আগমের সংখ্যা ৭৭। তাহাদের মধ্যে ৫ খানা শুভাগম নামে খ্যাত। তাহাতে জ্ঞানলাভ ও মুক্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ৬৪ খানা কৌল আগমে অলৌকিক শক্তি-লাভের উপায়ের বর্ণনা আছে। অবশিষ্ট ৮ খানা মিশ্রাগমে মুক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতালাভ উভয়ের উপায়ের বর্ণনা আছে। তন্ত্রসকল ৭ম শতাব্দী ও তাহার পরে রচিত। ভস্করাচার্য্য শক্তি-সূত্র নামে এক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। শাক্ত দর্শনের ইতিহাসকে ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) প্রাচীন বা প্রাক্ বৌদ্ধ ও প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ। (২) মধ্যযুগ বা বুদ্ধোত্তর এবং

খৃষ্টোত্তর যুগ। এই যুগ ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (৩) আধুনিক যুগ— খৃষ্টীয় ১৩০০ অব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত। প্রাচীন যুগের কোনও গ্রন্থই পাওয়া যায় নাই। বেদে ও উপনিষদে শক্তি-সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। মধ্য যুগের গ্রন্থের অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। শাক্ত আগমের অধিকাংশই এই যুগে রচিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগেও অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

শাক্ত দর্শনে শিব ও শক্তির মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। সেইজন্য শৈবতন্ত্র ও শাক্ত-তন্ত্রের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। অধিকাংশ আগমই অদ্বৈতমূলক। কিন্তু দ্বৈতবাদও অনেক গ্রন্থে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ৬৪ ভৈরব আগম অদ্বৈতবাদী, ১০ শৈব আগম দ্বৈতবাদী, এবং ১৮ রুদ্র আগম দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতৎব্যতীত আরও বহু আগম ছিল, কিন্তু তাহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত আগমগুলি দর্শনের দিক হইতে মূল্যবান্। (১) স্বচ্ছন্দ, (২) মালিনীবিজয়, (৩) বিজ্ঞান ভৈরব, (৪) ত্রিশিরা ভৈরব, (৫) কাল গহ্বর, (৬) পূর্ণানন্দ তন্ত্র, (৭) আগম রহস্য, (৮) অভেদকারিকা, (৯) অজ্ঞাবতার।*

শাক্ত দর্শনের গ্রন্থাবলী

শাক্ত দর্শনের নানা শাখা আছে। তাহাদের মধ্যে শ্রীবিজয়, কালী, শ্রীকুল, কালীকুল উল্লেখযোগ্য। অগস্ত্য, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয় শ্রীবিজয়-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অগস্ত্য শক্তিসূত্র ও শক্তি-মহিমাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। দুর্বাসা শিব ও শক্তির দুইটি স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় "দত্তাত্রেয় সংহিতা"র রচয়িতা। কথিত আছে ১০০০০ শ্লোক এই সংহিতায় ছিল। পরশুরাম ৬০০০ সূত্রে এই গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন। পরশুরামের শিষ্য সুমেধা দত্তাত্রেয় ও পরশুরামের মধ্যে কথোপকথন-আকারে এই গ্রন্থের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থই "ত্রিপুরা-রহস্য" নামে পরিচিত বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রিপুরা রহস্যের "মাহাত্ম্য" অধ্যায়ে উক্ত কিংবদন্তী বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরা রহস্যের জ্ঞানখণ্ডে শাক্ত দর্শনের বর্ণনা আছে।

শঙ্করের পরম গুরু গৌড়পাদের "শ্রীবিদ্যারত্ন শাস্ত্র" শাক্ত সাহিত্যে একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহার শঙ্করকৃত ভাষ্য আছে। শঙ্করের সৌন্দর্য্যলহরী,

---

* ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজের Sakta Philosophy in History of Phi. Easetrn and Western.

এবং প্রপঞ্চসার (পদ্মপাদের টীকা সংবলিত) এবং লক্ষণ দেশিকের "সারদা-তিলক"ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শৈব সোমানন্দ তাঁহার "শিবদৃষ্টি" গ্রন্থে "বাক"এর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শাক্ত মতের অনুসারী। কাশ্মীরের অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোক নামক বিরাট গ্রন্থ শৈব ও শাক্ত দর্শনের মূল্যবান আকর। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নাম "মালিনী-বিজয় বার্ত্তিক" "পরাত্রিংশিকা বিবরণ" "প্রত্যভিজ্ঞা বিমর্ষিণী" ও "প্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতি বিমর্ষিণী"।

অভিনব গুপ্তের পরবর্ত্তী শাক্ত দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা উল্লেখযোগ্য, তাঁহাদের নাম—(১) গোরক্ষ, (২) পুণ্যানন্দ, (৩) নটনানন্দ, (৪) অমৃতানন্দ, (৫) স্বতন্ত্রানন্দ, (৭) ভাস্কর রায়। গোরক্ষ (মহেশ্বরানন্দ) "মহার্থমঞ্জরী", "সংবিদবিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। পুণ্যানন্দের "কামকলা বিলাস" গ্রন্থে শক্তির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে। স্বতন্ত্রানন্দের "মাতৃকা-চক্র-বিবেক" গ্রন্থে শাক্ত আগমের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাস্কর রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে শাক্তদর্শন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে "সেতুবন্ধ" সর্ব্বোত্তম। *

শাক্তদর্শনে শক্তি শিবের শক্তি। শিব অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী-সার্বিক চৈতন্য বা প্রকাশ-স্বরূপ। তিনি বিশুদ্ধ সত্তা, সর্ব্ব সম্বন্ধ-বিবর্জিত সার্বিক তত্ত্ব। শক্তি সচ্চিদানন্দরূপিণী। তাঁহাকে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় রূপেই ধ্যান করা যায়। শক্তিহীন শিব শব-কল্প। তাঁহার কোনও ক্রিয়া নাই। শক্তির সহিত যুক্ত না হইলে তিনি নড়িতেও পারেন না। যখন শক্তির সহিত যুক্ত হন, তখন শিব সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ শিবে শক্তি গূঢ় রূপে অবস্থিত। শিব প্রকাশ, শক্তি বিমর্ষ। বিমর্ষ শব্দে ক্রিয়া বুঝায়। পরম তত্ত্বের মধ্যে যে স্বয়ম্ভূত স্পন্দন, তাহাই বিমর্ষ। বিমর্ষ হইতে নানা ভেদপূর্ণ জগতের উদ্ভব হয়। অসঙ্গ চৈতন্যের পুরুষত্ব-প্রাপ্ত অবস্থাই শক্তি। তখন তিনি বিষয়ীতে পরিণত হন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের (অনাত্মার) উদ্ভব হয়। শক্তি চিদ্রূপিণী—সৃষ্টিশক্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই শক্তির আদেশে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শিব ও শক্তি মিলিত হইয়া আনন্দরূপী হন। তখন তাঁহারা অভিন্ন। শিব অনবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম।

---

* Dr. G. N. Kaniraj, History of Philosophy, Eastern and Western. দ্রষ্টব্য।

শক্তি অবচ্ছিন্ন ইচ্ছা-জ্ঞান-ও-ক্রিয়া-সমন্বিত ব্রহ্ম (স্বাভাবিক জ্ঞান-বল ক্রিয়া—উপনিষদ্)। তাহা হইতে সমস্ত বিশ্ব নির্গত হয়। সতের মধ্যে শক্তি গূঢ় রূপে থাকে বলিয়া শিব ও শক্তি অভিন্ন। শক্তি কখনও সক্রিয়, কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু উভয় অবস্থাতেই তাহার অস্তিত্ব থাকে।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ শাক্ত মতে সৃষ্টির নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন। (History of Philosophy—Eastern and Western) শিব সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে শক্তির আবির্ভাব হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ হয়, যেমন তিল হইতে তৈলের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের যে রূপের মধ্যে পরম শক্তি গূঢ় রূপে থাকে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশিত করে। সুষুপ্তি হইতে জাগরিত ব্যক্তির মনে যেমন পূর্ব্ব স্মৃতি উদিত হয়, প্রলয় রাত্রির পরে শক্তির আবির্ভাব সেইরূপ। প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত জগৎকে পুনরায় দেখিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইতেই পুনরায় সৃষ্টি হয়। এই ইচ্ছার সহিত একটা শূন্যতার অনুভব থাকে। ইহাই মায়া। এই মায়া সৃষ্টির পুরোবর্ত্তী। যে ঐশ্বরিক তত্ত্ব হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, তিনি ইহার (মায়ার) প্রভু ও নিয়ন্তা। পূর্ব্বোক্ত শূন্যতার অনুভবের সঙ্গে থাকে একটি অস্পষ্ট শব্দ। তাহাই পর-নাদ। সমগ্র আকাশ এই শব্দে পূর্ণ থাকে। নাদ ও আলোকের স্বরূপ এক। নাদ ও আলোক এক সঙ্গে থাকে। পরম সত্তার ইচ্ছার প্রথম প্রকাশ হয় "শূন্যে"র এবং যে নাদ ও আলোক দ্বারা এই শূন্য পরিপূরিত থাকে, তাহার উৎপত্তিতে। এ সকলই ইহার অন্তর্গত। ইহার পরে উক্ত নাদ ও আলোক ঘনীভূত হইয়া একটা কেন্দ্রস্থ হয়। এই কেন্দ্রের নাম "বিন্দু"। এই সময়ে ক্রিয়া-শক্তি স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। তখন সৃষ্টির সকল তত্ত্ব এই "বিন্দু" হইতে অভিব্যক্ত হয়। "বিন্দু", বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিন অংশে বিভক্ত হয়। যে অংশে শিবত্ব অধিক, তাহাই বিন্দু; যে অংশে শক্তির প্রাধান্য, তাহা বীজ। নাদ অংশে শিব ও শক্তি সমান।

"বিন্দুর সাম্য ভঙ্গ হয় কিসে? সারদা তিলকে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। প্রপঞ্চসারে আছে যে কালদ্বারাই বিন্দুর সাম্যচ্যুতি হয়। এই মতে কাল শাশ্বত পুরুষের একটি শাশ্বত রূপ। কালের সাহায্যে শাশ্বত পুরুষ পরা প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করেন। প্রকৃতি স্ব-প্রকাশ, আপনাকে জানে। "বিন্দু যখন তিন ভাগে বিভক্ত হয়, তখন এক ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়। তাহার নামই শব্দব্রহ্ম (সারদা তিলক ও প্রপঞ্চসারের মতে)।

"মস্তকের মধ্যে বর্ত্তমান যে সহস্রদল পদ্মের কথা শোনা যায়, তাহারই নাম ব্রহ্ম-রন্ধ্র। তাহাকে শূন্যও বলা হয়। সুষুম্না নাড়ীর মাধ্যমে ইহা মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মন এই শূন্যে যখন নিযুক্ত থাকে, তখন তাহার চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়, এবং জীব তখন আপনাকে গুণাতীত বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এই উৎস হইতে ইচ্ছা-শক্তি এবং পরনাদ বাহির হয়। পরনাদ "বিসর্গমণ্ডল" নামেও অভিহিত হয়। ইহা ব্রহ্মের "মহাকারণ" অবস্থা। পরা শক্তিকে যদি কুল এবং পর শিবকে অকুল বলা যায়, তাহা হইলে বিসর্গমণ্ডলকে তাহাদের উভয়ের নিম্নবর্ত্তী বলা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ বিসর্গমণ্ডল ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরিভাগে অবস্থিত বলা হয়। তাহার নিম্নে সূর্য্য, চন্দ্র ও বায়ুমণ্ডল। ইহাদের সকলই সহস্র দল পদ্মের মধ্যে অবস্থিত।

"ব্রহ্মের কারণাবস্থাকে শব্দব্রহ্ম বা "কুল কুণ্ডলিনী" বলা হয়। ইহাকে বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিন তত্ত্বরূপ বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজরূপে কল্পনা করা হয়। এই তিন তত্ত্ব পরবিন্দু হইতে উদ্‌ভূত। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, পরবিন্দু ও পরনাদ দ্বারা যে মূল শক্তি সূচিত হয়, ত্রিকোণ কুণ্ডলিনী সেই শক্তির প্রকাশ। "বিশ্বের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল কুণ্ডলিনী হইতে নির্গত হইয়া কপালে এবং তাহার নিম্নে sympathetic systemএর বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থিত হয়। নিম্নস্থ "বিন্দু" যে শিব, "বীজ" যে শক্তি এবং নিম্নস্থ "নাদ" যে বিন্দু ও বীজের মিলন হইতে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সমগ্র বর্ণমালাই বীজ বা শক্তি। তন্ত্রে বর্ণমালার বর্ণসকল একটি ত্রিভুজাকারে সজ্জিত হয়। এই ত্রিভুজকে "অ-ক-থ" ত্রিভুজ বলে। এই সমকোণী ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহু ১৬টি বর্ণ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক বাহুগঠক বর্ণগুলির প্রথমে "অ", "ক" ও "থ" যথাক্রমে অবস্থিত। "পরবিন্দুর বিভাগ হইতে যে শব্দ-ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, তাহা হইতে বিন্দু ও বীজের ক্রিয়া হইতে উদ্‌ভূত নাদ ভিন্ন। শব্দ-ব্রহ্মকে "মহানাদ" বলা হয়। "নাদে"র মধ্যে বর্ণমালার যাবতীয় বর্ণের অস্পষ্ট শব্দ বর্ত্তমান। সূর্য্যের মধ্যে যেরূপ নানা বর্ণের রশ্মি থাকে, সেইরূপ কুণ্ডলিনী-রূপে অভিব্যক্ত মহানাদ মানুষের দেহে অবস্থিত, এবং তাহা দ্বারা শব্দ বিভিন্ন আকারে স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয় (articulated)। কোনও মন্ত্র বহুবার জপ করিলে তাহা সূক্ষ্ম রূপে সুষুম্নায় ধ্বনিত হয়। সেই শব্দ বিস্তৃতি লাভ করিয়া নিম্নস্থ নাদের সহিত মিলিত হয়, কিন্তু তাহার উপরিস্থ মহানাদ পর্য্যন্ত উঠিতে সক্ষম হয় না। মহানাদ একদিকে তাহার উপরিস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত পরনাদের সহিত সংবদ্ধ, অন্যদিকে নিম্নস্থ নাদের সহিতও সংবদ্ধ।

নিম্নস্থ নাদের শক্তি দুই ভ্রূর মধ্য দেশ অতিক্রম করিয়া সুষুম্না নাড়ী দিয়া নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, এবং তলদেশে উপস্থিত হইয়া কুণ্ডলিনীতে পরিণত হয়। কুণ্ডলিনীতে প্রকাশিত বীজের সমস্ত শক্তি নিম্নস্থ নাদের অন্তর্গত। ধ্যানের পক্ষে পরবিন্দু গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ঐশ্বরিক স্তর (plane) এবং বৈশ্বিক বা বিশ্বাতীত স্তর পরবিন্দু দ্বারা সংযুক্ত। এই স্থলেই নাদ মহানাদ বা শব্দ ব্রহ্মে বিস্তৃত হয়। শব্দব্রহ্মের পরে অনন্তের মধ্যে ঐশ্বরিক নাদ। পরনাদ হইতেছে মনের অতীত (উন্মনী) ঐশ্বরিক সংবিদ ও প্রকাশ। তাহার নিম্নস্থ মহানাদ বিশ্ব-সৃষ্টির উৎস। উভয়ের মধ্যে পরবিন্দু বর্ত্তমান। গুরুর ধ্যানের পক্ষে এই জন্য ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত।"

এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে নাদের সংখ্যা তিনটি :— পরবিন্দুর পূর্ব্ববর্ত্তী পরনাদ, পরবিন্দুর বিভক্ত হওয়ার পরবর্ত্তী মহানাদ বা শব্দব্রহ্ম এবং বিন্দু ও বীজের সংযোগ হইতে উদ্ভূত নাদ। বিন্দুর সংখ্যা দুইটি—পরনাদের কেন্দ্রীভবন হইতে উদ্ভূত পরবিন্দু (যাহা হইতে সৃষ্টি-শক্তির উৎস শব্দব্রহ্ম উদ্ভূত) এবং শিব-অংশপ্রধান অপর বিন্দু। মহাশক্তিই সর্ব্বোচ্চ "কলা"। ইহা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের মধ্যগত। বীজ অর্থেও কলা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে নিম্ন নাদের মূল তত্ত্ব বর্ণমালার বর্ণসকল এবং অ-ক-থ ত্রিভুজ বা কুণ্ডলিনী ও কলা।

শাক্ত মনোবিজ্ঞান

পর সংবিদের যেমন দুইরূপ—নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, প্রকাশ ও বিমর্ষ, মনেরও তেমনি দুই রূপ প্রকাশ ও বিমর্ষ। প্রকাশ-রূপে মন বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসে। বাহ্য বস্তু মনে প্রতিফলিত হইয়া "ইহা এইরূপ" এই চিন্তায় প্রকাশিত হয়। মনে সঞ্চিত অতীত বস্তুর স্মৃতির উদ্বোধনের ইহা ফল। প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগের মাধ্যমে মন বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসে। ফলে বাহ্য বস্তু অবিভক্ত অবস্থায় মনের নিকট প্রকাশিত হয়। তাহার সহিত কোনও শব্দের (যেমন মানুষ, গো, বৃক্ষ প্রভৃতির) সম্বন্ধ থাকে না। ইহা মানুষ, অথবা গো, এ বোধ তখন হয় না। একটি বস্তুমাত্র-রূপে ইহা মনের নিকট উপস্থিত হয়। এইটি নির্বিকল্প জ্ঞান। পরক্ষণেই পরিচিন্তনের উদ্ভব হয়, এবং বস্তুটি গো অথবা মনুষ্য অথবা অন্য কিছু, এই চিন্তা উদিত হয়, অন্য বস্তুর সহিত ইহার ব্যাবৃত্তির জ্ঞান হয়, এবং নানা সম্প্রত্যয়ের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহাকে "বিচার" অথবা "সবিকল্প জ্ঞান বা বিমর্ষ" বলে।

বিমর্ষ ত্রিবিধ--অনুভব (অব্যবহিত জ্ঞান), স্মৃতি ও অনুসন্ধান। অনুসন্ধানে অন্য জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য-স্থাপন বুঝায়।

সুষুপ্তি অবস্থায় নিদ্রার প্রকাশ হয়। নিদ্রা মহাশূন্যের প্রতিরূপ, এবং আকাশের সহিত অভিন্ন। ইহার কোনও রূপই নাই, এবং কেবল নিদ্রাতেই ইহা প্রকাশিত হয়। ইহাই সমগ্র প্রকাশিত বিশ্বের পটভূমি। সুষুপ্তিতে ইহা প্রকাশিত হয় বলিয়া লোকে জাগরিত হইয়া বোধকরে যে নিদ্রাবস্থায় তাহার কিছুরই জ্ঞান ছিল না। নিদ্রার প্রকাশ এক প্রকার নির্বিশেষ জ্ঞান। তখন বিমর্ষের সম্পূর্ণ অভাব। সুষুপ্তি বিশুদ্ধ প্রকাশ। ইহা অজ্ঞানের অবস্থা, জাগর অবস্থা বিমর্ষের অবস্থা। সুষুপ্তিতে মন নিশ্চেষ্ট থাকে। তখন কোনও রূপই তাহার নিকট আবির্ভূত হয় না। কিন্তু জাগর অবস্থার জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি মন প্রযুক্ত হয়। ইহাই চিত্ত। সুষুপ্তিতে মনের প্রকাশ-রূপ থাকে, কিন্তু বিমর্ষরূপ থাকে না। এই জন্য সুষুপ্তিতে মনের লয় হয়, বলা হইয়া থাকে।

শাক্ত দার্শনিকগণ বলেন যে জাগরিত অবস্থাতেও যখনই মন কোনও বিষয়ের সম্পর্শে আসে, তখন ক্ষণকালের জন্য তাহার জ্ঞানের লোপ হয়, কিন্তু মন তাহা বুঝিতে পারে না। নির্বিকল্প জ্ঞানের বেলাতেই ইহা ঘটে। কিন্তু ইহা ক্ষণস্থায়ী। নির্বিকল্প সমাধি, সুষুপ্তি এবং প্রত্যক্ষ দর্শন, তিন অবস্থাতেই মনের লয় হয়—বিমর্ষের প্রকাশ হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মনের লয় ক্ষণিকমাত্র। সমাধির পরে যে বিমর্ষের (মনের ক্রিয়ায়) উদ্ভব হয়, তাহার রূপ "আমি এতক্ষণ শুদ্ধ ছিলাম"। সুষুপ্তির পরবর্তী বিমর্ষের রূপ "আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।" কিন্তু প্রত্যক্ষে বিষর্ষের রূপ "ইহা এই রূপ।" সমাধির বিষয় বিশুদ্ধ আত্মা, সম্পূর্ণ বাহ্য রূপ হীন। সুষুপ্তির বিষয় রূপহীন অব্যক্ত বাহ্যসত্তা। প্রত্যক্ষের বিষয় বাহ্যবস্তু।

শাক্ত দ্বৈতবাদ

শিবের স্বরূপ ও শক্তি নিত্য সংযুক্ত। প্রকৃত পক্ষে উভয়ে অভিন্ন। স্বরূপ ও শক্তি উভয়ই চিদ্রূপী একই ঐশ্বরিক তত্ত্বের দুই বিভাব। শক্তি শিবের ইচ্ছা এবং ইহা জ্ঞান ও বিষয় এই দুই রূপে প্রকাশিত হয়। শিব ও শক্তির অতিরিক্ত তৃতীয় তত্ত্বের নাম বিন্দু। বিন্দু জড়তত্ত্ব। বিন্দু শক্তির অধীন, কিন্তু শিব ও শক্তির ন্যায় শাশ্বত। এই তিন তত্ত্বকে শৈবধর্মের ত্রি-রত্ন বলে। সৃষ্টি-কার্য্যে শিব কর্ত্তা, শক্তি করণ এবং বিন্দু উপাদান।

ক্রিয়া-কালে শক্তির পরিণাম হয় না, কিন্তু বিন্দুর হয়। প্রলয়ান্তে শক্তির চাপে বিন্দু হইতে পঞ্চ কলার উদ্ভব হয়। এই পঞ্চকলা সমকেন্দ্রিক পাঁচটি বৃত্তের ন্যায় আবির্ভূত হয়। কলাদিগের হইতে "তত্ত্ব" ও "ভুবন"দিগের উদ্ভব হয়। পঞ্চকলার নাম নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীত। নিবৃত্তি বাহ্যতম এবং শান্ত্যতীত অন্তরতম কলা। ইহারা বিন্দুর অর্থ-বিষয় রূপে অভিব্যক্তি। ইহা ব্যতীত বিন্দু নাদ, বিন্দু ও বর্ণরূপেও অভিব্যক্ত হয়। বর্ণ বাহ্যতম অভিব্যক্তি।

বিন্দু মহামায়া ও কুণ্ডলিনীর সহিত অভিন্ন। বিন্দু শুদ্ধ জড়শক্তি। মায়া ও প্রকৃতি অশুদ্ধ। বিন্দু হইতে দ্বিবিধ অভিব্যক্তি হয়—শব্দ ও অর্থ। ক্ষোভিত মহামায়া হইতে নিম্নলিখিত ক্রমে শাব্দিক সৃষ্টি হয়: (১) মহামায়া, (২) নাদ, (৩) বিন্দু, (৪) সদাখ্য, (৫) ঈশ ও (৬) বিদ্যা। মহামায়া অক্ষুব্ধ পরবিন্দু। যখন চিৎশক্তি ইহার উপর প্রযুক্ত হয়, তখন তাহার নাম হয় নাদ। বিন্দুর উপর শক্তির ক্রিয়া এক অর্থে সর্বদাই বর্ত্তমান বলিয়া মহামায়া এবং নাদকে একই বস্তুর দুই বিভাব বলা যায়। বস্তুতঃ এই দুই বিভাব সমকালবর্ত্তী এবং মহামায়ার ক্ষুব্ধ অংশই "নাদ"। মহামায়া কুণ্ডলিনীর স্বরূপ, নাদ কুণ্ডলিনীর জাগ্রৎ এবং সক্রিয় অবস্থা। জীবাত্মার সহিত মহামায়ার স্বরূপের কোনও সম্বন্ধ নাই, কিন্তু নাদ বা কুণ্ডলিনী-রূপে মহামায়া প্রতি পুরুষে বাস করেন। প্রকৃত পক্ষে পরাবাক্ (সূক্ষ্ম), পশ্যন্তী বাক্, মধ্যমা বাক্ এবং বৈখরী বাক্—এই চতুর্বিধ বাক্‌রূপে মহামায়ার অভিব্যক্তি, এবং মলদ্বারা প্রত্যেক জীবাত্মার শিবত্বের আচ্ছাদন অনাদি কাল হইতে এক সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এই আচ্ছাদন অপসৃত এবং পরাবাকে অতিক্রান্ত হয় একই ক্রিয়াদ্বারা। ইহাদ্বারাই জীব তাহার শিবত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার মল দূরীভূত হয়। এই অর্থে উপরি উল্লিখিত শাব্দিক সৃষ্টি-ক্রমের বিন্দুর অর্থ অপর বিন্দু, এবং ইহা শক্তি-তত্ত্বের এক নাম। পরবর্ত্তী "সদাখ্য"—অক্ষর বিন্দু। স্থূল কিন্তু অবিভক্ত ধ্বনিরূপী নাদই ইহার লক্ষ্য। ঈশ অক্ষরবিন্দু এবং বৈখরী বাকের (বর্ণমালার সকল বর্ণের নানাবিধ সংস্থান এবং সংযোগরূপে প্রকাশিত) মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বিশেষ। ইহার মধ্যে অষ্ট মন্ত্রেশ্বর এবং তাহাদের শক্তি বর্ত্তমান। শাব্দিক অভিব্যক্তির শেষ ক্রম "বিদ্যার" মধ্যে যাবতীয় মন্ত্র এবং বিদ্যা, সকল আগম এবং সপ্ত বিদ্যা-বাজ্ঞী (শ্রুতিযোগ্য যাবতীয় শব্দ) বর্তমান। উপরিবর্ণিত মহামায়াই পরাশক্তি বলিয়া অভিহিত এবং এই বিশ্বের পরম কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। তিনিই সূক্ষ্ম নাদ।

নাদ বহু। প্রতি জীবে ভিন্ন ভিন্ন নাদ বর্ত্তমান, প্রত্যেক নাদ অন্যান্য নাদ হইতে ভিন্ন। অনাদি বিন্দু হইতে ইহার উৎপত্তি। *

নাদ-তত্ত্ব—শব্দব্রহ্ম

ভর্ত্তৃহরির ব্রহ্মকাণ্ডে আছে—

অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দ-তত্ত্বং যদক্ষরং
বিবর্ত্ততে'র্থ ভাবেন জগতঃ প্রক্রিয়া যথা।

অনাদি ও অবিনশ্বর ব্রহ্ম অক্ষর শব্দতত্ত্ব। তিনি জগতের যেমন অভিব্যক্তি হয়, সেই রূপে বস্তু-রূপে অভিব্যক্ত হন। যোগবাশিষ্ঠে আছে "ব্রহ্ম-বৃং হৈব জগৎ, জগৎ চ ব্রহ্ম বৃংহণম্"। ইহার অর্থ জগৎ ব্রহ্মের বৃংহণ বা শব্দ। জগৎ ব্রহ্মের চিন্তার শব্দ-রূপে ব্যক্ত রূপ।

বেদে ও উপনিষদেও অনেক স্থলে এই ভাবের কথা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে (৩ য়, ১২, ১৭) "আমি সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানি, যিনি তমসের পারে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত রূপের চিন্তা পূর্ব্বক তাহাদিগকে নাম দিয়াছিলেন।" এখানে নাম শব্দরূপী। শতপথ ব্রাহ্মণে (৬ষ্ঠ, ১, ১) আছে "প্রজাপতি ব্রহ্মের (বেদের) সৃষ্টি করিয়া 'বাক' হইতে জলের সৃষ্টি করিলেন।" ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।২।২৮) আছে শব্দ হইতেই দেবগণের উৎপত্তি। এই তত্ত্বটি শাক্ত দর্শনে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। উপরে শাক্ত মতে সৃষ্টির বর্ণনায় বলা হইয়রছে যে প্রলয়ান্তে জগৎ পুনরায় দেখিবার একটি ইচ্ছা ঈশ্বরের হয়। ইহার সহিত একটা শূন্যতার অনুভব হয়। তাহার সহিত থাকে একটি অস্পষ্ট শব্দ; সমগ্র আকাশ এই শব্দে পূর্ণ থাকে। ইহাই "পরনাদ"। ইহা হইতেই জগতের যে ক্রমে উদ্ভব হয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই মতে ব্রহ্মের কারণরূপই শব্দব্রহ্ম বা কুলকুণ্ডলিনী। উচ্চারণযোগ্য যাবতীয় শব্দের প্রতীক বর্ণমালার বর্ণগণ এই জন্যে তান্ত্রিক সাধনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বিষ্ণুর যোগনিদ্রাকে স্বরাত্মিকা স্বাহা, স্বধা, বষটকার এবং ত্রিধা মাত্রাস্থিত ওঁকার বলা হইয়াছে, এবং তাহাকে "অর্দ্ধমাত্রাস্থিত অনুচ্চার্য্যা" এবং গায়ত্রী মন্ত্র-রূপীও বলা হইয়াছে। শব্দের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধ একটি প্রাচীন ভারতীয় মত।

---

* মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজের Sakta Philosophy in History of Philosophy Eastern & Weastern—দ্রষ্টব্য।

মায়া ও মুক্তি

অদ্বৈত শাক্ত দর্শনে মায়া ও প্রকৃতি অভিন্ন, তাহা শক্তির স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত। মায়া শক্তির গর্ভস্থিত; তাহা হইতেই বিশ্বের উদ্‌ভব হয়। প্রলয়ে মায়া সুপ্ত থাকে। সৃষ্টিকালে সক্রিয় হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি হইতে যে ক্রমে জড় জগৎ অভিব্যক্ত হয়, শাক্ত দর্শনে তাহা অংশতঃ স্বীকৃত হইলেও এই অভিব্যক্তি পরিচালিত হয় শক্তিকর্তৃক। শৈবদর্শনের ন্যায় শাক্ত দর্শনেও তত্ত্ব সংখ্যা ৩৬টি। দ্বৈতবাদী শাক্ত দর্শনে শক্তি ও শিবের সহিত তৃতীয় এক জড় শক্তি স্বীকৃত। তাহার নাম বিন্দু। বিন্দু শিব ও শক্তির ন্যায়ই শাশ্বত, কিন্তু স্বাধীন নহে, শক্তির অধীন। বিন্দু শুদ্ধ জড়শক্তি, কিন্তু মায়া (প্রকৃতি) অশুদ্ধ। মায়াধীন জীব আপনাকে স্বাধীন কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করে। শক্তির জ্ঞান বিনা নির্বাণ (মুক্তি) লাভ হয় না। পরমেশ্বরের আনন্দের মধ্যে মিশিয়া যাওয়াই নির্বাণ। যিনি সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শন করেন, তাহার যোগ অথবা উপাসনার প্রয়োজন নাই। ইহ জীবনে যাঁহারা মুক্তিপ্রাপ্ত হন, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। স্তবপাঠ, উপবাস অথবা যাগযজ্ঞ দ্বারা মুক্তি হয় না। "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে "দেহে কেবল মৃত্তিকা অথবা কর্দ্দম মাখিলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে, তো গ্রাম্য কুকুরদিগকে মুক্ত বলা যাইত।

তন্ত্রের সাধনার সকলেরই অধিকার আছে। "অন্ত্যজও যদি ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারও নাম ও জ্ঞানে অধিকার হয়। স্ত্রী, শূদ্র, ব্রহ্মবন্ধুদিগের সকলেরই তন্ত্র-জ্ঞানে অধিকার আছে।" "সকল নদীই যেমন সমুদ্রে পতিত হয়, তেমনি যে কোনও দেবতার উপাসনা করিলে ব্রহ্ম তাহা গ্রহণ করেন। দেবতাগণও কাল ও কর্ম্মের অধীন। তন্ত্রের উপর যোগের প্রভাব অত্যধিক। মন্ত্রের শক্তিতেও তন্ত্রের অপরিসীম বিশ্বাস। মন্ত্র সকল অতি পবিত্র। মন্ত্র ও শক্তি অভিন্ন। মন্ত্র ঈশ্বরেরই সৃষ্ট। শক্তিই শাশ্বত শব্দ—নাদ ব্রহ্ম। দেহের মধ্যস্থ শক্তি জাগ্রৎ করাই তন্ত্রের লক্ষ্য। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রৎ হইলে সাধক "ষট্‌চক্রভেদ" করিতে সক্ষম হন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের উদ্‌ভব শ্রীচৈতন্যদেব হইতে। ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৬ খৃঃ অব্দে) নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র; মাতার নাম শচীদেবী। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। তাঁহার ডাক নাম ছিল নিমাই। নবদ্বীপ তখন বিদ্যা-চর্চার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। বিশ্বম্ভর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথমে শ্রীলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন, এবং লক্ষ্মীদেবী পরলোক গমন করিলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। বিশ্বম্ভরের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়। এক দিগ্বিজয়ী কাশ্মীরী পণ্ডিত নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে তিনি তর্কে তাহাকে পরাস্ত করেন। পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি যখন গয়াধামে গমন করেন, তখন তথায় ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের ফলে তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ভক্তির সাধনা করিতে আরম্ভ করেন। গয়া গমনের পূর্ব্বে তিনি এক টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। গয়া হইতে ফিরিয়া তিনি ছাত্রদিগকে ভক্তির কথা ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে পারিলেন না, এবং টোল ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার পরে তিনি অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। অবশেষে একদিন গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। পুরীতে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত মিলিত হন। সেখানে সাত দিন তিনি সার্ব্বভৌমের বেদান্ত-ব্যাখ্যা (শারীরক ভাষ্য-ব্যাখ্যা) শ্রবণ করেন। সাত দিনের মধ্যে তিনি একটি কথাও বলেন না দেখিয়া সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি তাঁহার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছেন না। ইহার উত্তরে চৈতন্য ব্রহ্মসূত্রের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি। তিনি চব্বিশ বৎসর পুরীধামে অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে দক্ষিণাপথের যাবতীয় তীর্থে ভ্রমণ এবং কাশী, প্রয়াগ ও বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

সার্ব্বভৌম যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছেন কিনা, তখন শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন "সত্যই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ব্রহ্মসূত্রের অর্থ আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সূত্রের অর্থ-প্রকাশই ভাষ্যের উদ্দেশ্য, কিন্তু আপনার ভাষ্যে সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিতই হয়। সূত্রের মুখ্যার্থ না করিয়া আপনি কল্পিত অর্থ করিতেছেন, মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছেন, অভিধা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। লক্ষণার্থ করিলে বৈদিক বচনের স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়। "ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু, ঈশ্বর লক্ষণ"। যে ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যের আধার, তাঁহাকে আপনি নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেকগুলি শ্রুতিতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন সত্য। কিন্তু সেই সকল শ্রুতিতেই তাঁহাকে সবিশেষও বলা হইয়াছে। যে শ্রুতিতে ব্রহ্ম "অপাণি" ও "অপাদ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহাতেই আবার তাঁহাকে "জবন" ও "গ্রহীতা" বলা হইয়াছে। যিনি শীঘ্র চলেন (জবন), যিনি সর্ব্ব গ্রহণ করেন (গ্রহীতা), তাঁহাকে সবিশেষ বলিতেই হইবে। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব উদ্ভূত, এবং ব্রহ্মেই বিশ্ব লীন হয়। ব্রহ্ম জগতের অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারক। ব্রহ্ম অর্থে স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ। একই চিৎশক্তি তিন রূপে প্রকাশিত। আনন্দ-রূপে তাহাকে হ্লাদিনী বলে, সৎ-রূপে সন্ধিনী, এবং চিৎ-রূপে সংবিদ বলে। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াবশ। এহেন ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ নাই বলা অসীম সাহসের পরিচায়ক। ঈশ্বরের বিগ্রহ সৎ-চিদানন্দাকার। পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের অভিমত। স্পর্শমণি নিজে অবিকৃত থাকিলেও, তাহা হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ ঈশ্বর নিজে অবিকৃত থাকিয়া জগৎরূপে পরিণত হন। বিবর্ত্তবাদ ব্যাসের অভিমত ছিল না। জীবের দেহাত্মবুদ্ধিই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা নহে। প্রণবই মহাবাক্য, "তত্ত্বমসি" নহে। "তৎ ত্বম্ অসি" প্রাদেশিক বাক্য মাত্র।" শ্রুতি যেখানে ব্রহ্মকে নিরাকার বা নির্গুণ বলিয়াছেন, সেখানে তাহার অর্থ তাঁহার "প্রাকৃত আকার" বা "প্রাকৃত গুণ" নাই, কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত আকার ও অপ্রাকৃত গুণ শ্রুতি অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মে অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। তাহার মধ্যে স্বরূপ শক্তি, তটস্থ জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। তাঁহার শক্তির কথা "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াচ" এই শ্রুতিবাক্যে পাওয়া যায়। স্বরূপ-শক্তি অন্তরঙ্গ। তাহার তিন বৃত্তি হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিদ্।

জীবে তাঁহার তটস্থ শক্তি, জগৎ-সৃষ্টিতে তাঁহার মায়া-শক্তি প্রকাশিত। ভগবদ্‌গীতায় জীবকে ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি এবং "ক্ষিতিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ অহংকার" কে অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। জগৎ যে ঈশ্বরের পরিণাম, তাহার প্রমাণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে। "তৎ আত্মানং স্বয়ং অকুরুত"—তিনি আপনাকে (জগতে) পরিণত করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মানন্দ বল্লী নাম দ্বিতীয় বল্লী)।

শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন ও ভিন্ন দুইই। সূর্য্য ও তাহার কিরণ, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি এক নহে। কিন্তু কিরণ ব্যতিরেকে সূর্য্যের সত্তা, এবং দাহিকা শক্তি ব্যতীত অগ্নির সত্তা অসম্ভব। সুতরাং সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণ, এবং অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্ন। এইরূপ পরমেশ্বর ও তাঁহার শক্তি (তটস্থ) জীব ভিন্ন এবং অভিন্ন। অগ্নির দাহিকা শক্তি এবং সূর্য্য-কিরণ যেমন স্বীয় আশ্রয়ভূত অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, তেমনি জীবও স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। এই ভেদাভেদ-বাদই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিমত। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ঔপাধিক নহে—স্থায়ী।

কাশীধামে প্রকাশানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগকে শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন "বেদান্ত-শাস্ত্রে ভ্রমপ্রমাদ অসম্ভব। সূত্রের মুখ্যার্থ সুস্পষ্ট। শঙ্কর সেই মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণবৃত্তিতে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে জীবের সর্ব্ব কর্ম্ম পণ্ড হয়।"

"ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান্॥"

"ব্রহ্ম চিৎ। তিনি ঐশ্বর্য্যের আধার। তিনি ভগবান্। তাঁহার বড় অথবা সমান কেহ নাই। ঈশ্বর জ্বলন্ত অগ্নি, জীব সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। চিন্তামণি হইতে যেমন অসংখ্য রত্নরাশি উৎপন্ন হয়, কিন্তু চিন্তামণি অবিকৃত থাকে, অবিচিন্ত্য শক্তিশালী ভগবান্ সেইরূপ জগৎরূপে পরিণত হইলেও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন।"

শ্রীচৈতন্য মায়াবাদকে "বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ" বলিয়াছেন—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক,
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।"

জীব গোস্বামী

জীব গোস্বামী রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের পুত্র। আনুমানিক ১৪৩৫ হইতে ১৪৪৫ শকাব্দের মধ্যে (১৫১৩-১৫২৩ খৃঃ অব্দ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, ন্যায়, মীমাংসাদি দর্শন-শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি প্রথমে নবদ্বীপ, এবং পরে কাশীধামে গমন করিয়া কিছুদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাশীধাম হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া জীব রূপ ও সনাতন গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত ও ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ করেন। জীব গোস্বামী ভগবৎ সন্দর্ভ, পরমাত্মা সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, শ্রীভক্তি সন্দর্ভ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জীব গোস্বামীর মতে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। অন্ত-সম্বন্ধবর্জিতরূপে তিনি ব্রহ্ম। জগতের স্রষ্টারূপে তিনি ভগবান। বহু যুক্তি দ্বারা তিনি মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ উভয়বাচক বচনই পাওয়া যায়। সুতরাং উভয়ই স্বীকার্য্য। এই ভেদাভেদ অচিন্তনীয়। কিন্তু "শ্রুতি-মূলত্বাৎ" ইহা স্বীকার করিতে হয়। জীব গোস্বামীর মত "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" নামে প্রসিদ্ধ।

মধুসূদন সরস্বতী

শঙ্করাচার্য্যের পরে বহু অদ্বৈতবাদী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী মধুসূদন সরস্বতীর নাম উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড়া গ্রাম। কোটালিপাড়ায় বহু পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মধুসূদন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-বংশে মধুসূদনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। মধুসূদন পিতার টোলে প্রবিষ্ট হইয়া বাল্য-বয়সেই সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মে, এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে পিতামাতার অনুমতি লইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের লীলাভূমি নবদ্বীপে উপস্থিত হন। চৈতন্যের ভক্তিধর্ম্ম তাঁহার উপর প্রভূত

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নবদ্বীপে তখন নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য মথুরা নাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক অধ্যাপক ছিলেন। মধুসূদন ন্যায়-দর্শনে পারদর্শী হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে অভিলাষী হন এবং শাঙ্কর দর্শনে জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য বারাণসী গমন করেন। বারাণসীতে মধুসূদন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক রামতীর্থের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বেদান্ত-পাঠের ফলে তাঁহার পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত হয়, এবং অদ্বৈতবাদের সত্য তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তিনি বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তখন তাঁহার নাম হয় মধুসূদন সরস্বতী।

মধুসূদন সরস্বতী-রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অদ্বৈত সিদ্ধি, গীতার টীকা, সিদ্ধান্ত বিন্দু, মহিম্ন স্তবের টীকা এবং প্রস্থানত্রয় প্রসিদ্ধ। মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসরায়ের "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থের খণ্ডনের জন্য "অদ্বৈত সিদ্ধি" রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন মধুসূদনের মত ইহার পরে আবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং তিনি পুনরায় বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ তাহারা নিম্নলিখিত শ্লোক মধুসূদনের রচিত বলিয়া উল্লেখ করেন।

ধ্যানাভ্যাস-বশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনঃ যদি পশ্যন্তি, পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচন-চমৎকারায় ভূয়াৎ চিরং
কালিন্দী-পুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনো ধাবতি॥

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃত-চিত্ত যোগিগণ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় এক জ্যোতি যদি দেখেন তো দেখুন! আমাদের মন যমুনাতটে লোচনতৃপ্তিকর সেই নীলরূপের দিকে ধাবিত হয়।

অদ্বৈতসিদ্ধিতে মধুসূদন নূতন ভাবে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রস্থানভেদে তিনি ষড়দর্শন ও পাশুপত এবং পাঞ্চরাত্র দর্শনের সংক্ষিত বিবরণ দিয়াছেন। এই সকল দর্শনের বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—বস্তুতঃ এই সকল দর্শনে তিনটি মতই ব্যক্ত হইয়াছেঃ (১) আরম্ভবাদ বা পরমাণুবাদ! (২) পরিণাম-বাদ বা অভিব্যক্তিবাদং এবং (৩) বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ। প্রথম মত অনুসারে পরমাণুদিগের সংযোগ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। তার্কিক (ন্যায় এবং বৈশেষিক) এবং মীমাংসকদিগের এই মতে জগতের অস্তিত্ব ছিলনা কিন্তু তাহার কারণ ছিল; কারণ হইতে জগৎরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় মত

সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাশুপতদিগের। ইহাদের মতে প্রধান অথবা সত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত প্রকৃতি হইতে মহৎ এবং অহংকারের এবং মহৎ এবং অহংকার হইতে জগতের (বাহ্য ও আন্তর) উদ্‌ভব হইয়াছে। এই মতে কার্য্য জগৎ তাহার উদ্‌ভবের পূর্ব্বে সূক্ষ্ম রূপে বর্ত্তমান ছিল, এবং কারণ দ্বারা স্থূল রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয় মত ব্রহ্মবাদীদিগের। এই মতে স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়াবশে জগৎরূপে প্রতিভাত হন। ইহা মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু বৈষ্ণবগণ জগৎকে ব্রহ্মের সত্য পরিণাম বলিয়া গণ্য করেন।

মধুসূদন বলেন এই সকল মত বিভিন্ন হইলেও ইহাদের প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের সকলেরই ইচ্ছা ছিল এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করা। বিবর্ত্তবাদ এই সকল মতের শেষ পরিণাম। ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাঁহারা যে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বৈনাশিক মতসকলের নিরোধ করা। মানুষ স্বভাবতঃ পার্থিব বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট বলিয়া একেবারেই পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিতে পারেনা। ঋষিগণ সেজন্য তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে সত্যের পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

'অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থে মধুসূদন "দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ" অবলম্বন করিয়া জীবের দৃষ্ট সকল বস্তুই তাহার নিজের সৃষ্টি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আনুমানিক ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন অতি বৃদ্ধ বয়সে পরলোকগমন করেন।

শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০)

শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পিতা সিভিল সার্জন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁহাকে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতি অল্প বয়সে শিক্ষার জন্যে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত রাজনারায়ণ বসু অরবিন্দের মাতামহ ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অরবিন্দ কেম্ব্রিজের King's Collage এ প্রবেশ করেন। পিতার ইচ্ছানুসারে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করেন নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রথমে বরোদা কলেজের Vice Principal এবং পরে Principal হন। বরোদায়

থাকিবার সময় তিনি মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষা করেন। লর্ড কার্জন যখন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেন এবং তাহার জন্য বাংলাদেশে প্রবল আন্দোলন আরব্ধ হয়, অরবিন্দ তখন বাংলায় আসিয়া সে আন্দোলনে যোগদান করেন। বাংলায় National Council of Education-কর্তৃক যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, অতি সামান্য বেতনে অরবিন্দ তাহার Principal নিযুক্ত হন। দেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ "বন্দে মাতরম" পত্রিকায় ও সভা সমিতিতে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশিত হয়। মজঃফরপুরে বোমার আঘাতে একজন সাহেবের মৃত্যুর পরে অরবিন্দ, তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্র এবং আরও অনেকে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু পরিশেষে অরবিন্দ নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পান। ইহার পরে তিনি পণ্ডিচেরীতে গমন করেন এবং আর বাংলায় ফিরিয়া আসেন নাই এবং রাজনীতিতেও আর যোগদান করেন নাই। বহু দিন তিনি গভীর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে অষ্টাত্তর বর্ষ বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ Life Divine ও Essays on the Geeta। এতদ্ব্যতীত The Human Cycle, tne Ideal of Human Unity এবং বেদ সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বেদ-সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধবালী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন তাঁহার Life Divine এবং Essays on the Geeta য় বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

অরবিন্দের দর্শনের আরম্ভ মানব মনের আস্পৃহা (aspiration) হইতে। এই আস্পৃহা উন্নততর, মহত্তর এবং দুঃখবিমুক্ত জীবন-লাভের জন্য। প্রতি যুগে প্রত্যেক দেশে অনেকের মনে এই আস্পৃহা উদিত হইয়াছে। ইহুদীগণ পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের (Kingdom of Heaven) কল্পনা করিয়াছিল। আমাদের দেশে রাম-রাজ্যের কল্পনা অনেকের মনে জাগিয়াছিল। প্রকৃতির অন্তর্ভূত মানুষের মনে এই কল্পনা হইতে অনুমান করা যায় যে প্রকৃতির মধ্যেই এই মহত্তর জীবন-উদ্‌ভাবনের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, এবং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সেই উদ্দেশ্য মনুষ্যের সংবিদে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। মানুষের মনে কোনও আদর্শের আবির্ভাব প্রকৃতির ভাবী অভিব্যক্তির একটা স্তরের সূচনা করে। এই আদর্শ অনেক সময় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে এই আদর্শের উদ্‌ভাবক উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব দর্শনের অবহেলার বিষয় নহে। মানুষ কি, তাহার পরিপূর্ণ ধারণা করিতে হইলে, মানুষের

বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনাই যথেষ্ট নহে, মানুষ যাহা হইতে সক্ষম, তাহার আলোচনারও প্রয়োজন। মানুষ যাহা হইতে সমর্থ, তাহার সহিত তাহার আস্পৃহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা নিহিত আছে, তাহারই প্রকাশ তাহার আস্পৃহায়। অরবিন্দের দর্শনে মানুষের সম্ভাব্য পরিণতি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অরবিন্দ সংবিদ্‌কে একটা miracle (অপ্রাকৃত বস্তু) বলিয়াছেন। এই সংবিদ অসঙ্গ (The Absolute) হইতে জড় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিস্তৃত। বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে ব্যবধান দূরীকরণের জন্য অরবিন্দ জড়কে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জড়ের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহা চৈতন্যের ক্রমাভিব্যক্তির শেষ প্রান্ত। এই অভিব্যক্তির অন্য প্রান্ত—যাহার অভিব্যক্তি জড়, তাহা—অসঙ্গ পরমাত্মা। সংবিদের বিভিন্ন ক্রম অরবিন্দ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সকল ক্রম এই : অতিমানস সংবিদ (Supra-mental consciousness) উচ্চতর মানস সংবিদ (overmental consciousness) মানস সংবিদ (mental consciousness), তাহার পরে জৈব সংবিদ (vital consciousness), তাহার পরে পার্থিব সংবিদ্ (physical consciousness)।

অরবিন্দের অসঙ্গ আত্মা (Absolute Sperit) বেদান্তের ব্রহ্ম। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। জীব ও জগৎ তাঁহার মতে মায়ার সৃষ্টি ও মিথ্যা। অরবিন্দ মায়াবাদ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে অসঙ্গ পরমাত্মাই জীব-ও-জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। জীব ও জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে। ব্রহ্ম-চৈতন্য জীব ও জড়ে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

অন্তর্লীনতা (Involution) ব্যতীত অভিব্যক্তি (Evolution) অসম্ভব। যাহা হইতে অভিব্যক্তি হয়, যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহা তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম রূপে বর্ত্তমান থাকে। তাহার প্রাক্‌ভাব (পূর্ব্বাস্তিত্ব) না থাকিলে অভিব্যক্তি অসম্ভব। ইহাই "সৎকার্য্যবাদ"। যখন জড়ের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়, তখন সেই চৈতন্য যে জড়ের মধ্যে অপ্রকাশিত রূপে ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার ভাব (অস্তিত্ব) কখনও হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা জড় হইতে ক্রমশঃ উদ্‌ভিদ, ইতর প্রাণী এবং পরিশেষে মানুষের উদ্‌ভবের ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে জড়ে অনুস্যূত চৈতন্য ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে হইতে মানবের আত্ম-সংবিদ-যুক্ত মানস সংবিদে (mental consciosness) উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এই মানস চৈতন্যই আরোহণের (Ascent) শেষ পর্য্যায় নহে।

অরবিন্দ বলেন মানুষের স্বাধীন চেষ্টার সহযোগে এই উর্দ্ধগতি দ্রুততর হইতে পারে। এই উর্দ্ধগতির সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে নিহিত আছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার উপায় অরবিন্দের "যোগ"। যে উর্দ্ধগতির ক্রমে জড়ে আবদ্ধ ক্ষীণ চৈতন্য মানবীয় সংবিদে উপনীত হইয়াছে, মানুষে আসিয়া সে গতি স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। মানুষ সহযোগিতা করুক বা না করুক, একদিন তাহা স্বীয় লক্ষ্যে পৌছবে, ইহা নিশ্চিত। বহু দিন পূর্ব্বে Annic Besant এক Sixth Raceএর আবির্ভাব সুরু হইয়াছে বলিয়াছিলেন। এই Race বর্ত্তমান মানব-সমাজ হইতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও চরিত্রে উন্নত হইবে, তিনি বলিয়াছিলেন। অরবিন্দের সাধনার উদ্দেশ্য মানব-সমাজকে সেই অবস্থায় উন্নীত করা। তাহার উপায় তাঁহার "যোগের" সাহায্যে মানবীয় সংবিদকে উন্নততর সংবিদে পরিবর্ত্তিত করা (Transfornation of oconsciousness)। যোগবলে মানুষ মানস-সংবিদ হইতে "উদ্ধ মানস সংবিদে, এবং তাহাও অতিক্রম করিয়া অতিমানস সংবিদে আরোহণ করিতে সমর্থ। মানুষের বর্ত্তমান মানস সংবিদের সমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন মানব-প্রকৃতির (যাহা বর্ত্তমান অশান্তির মূল) সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অসম্ভব। অরবিন্দের যোগ কেবল ব্যক্তির মুক্তির উপায় নহে! ইহা সমগ্র মানব জাতিকে উর্দ্ধে তুলিবার উপায়। ইহার সাধনাতেই ঋষি অরবিন্দ দীর্ঘ-কাল পণ্ডিচেরীর আশ্রমে নিমগ্ন ছিলেন।

অরবিন্দ যেমন সাধকের উর্দ্ধে আরোহণের (Ascent) কথা বলিয়াছেন, তেমনি ঐশ্বরিক সংবিদের অবতরণের (descent) কথাও বলিয়াছেন। যোগ-সাধকের অতিমানস সংবিদে আরোহণ এবং অতিমানস সংবিদের নিম্নস্তরে অবতরণ দ্বারা নিম্নতর সংবিদের পরিবর্ত্তনসাধন (tranasformation)—উভয়ই অরবিন্দের যোগের লক্ষ্য। কিন্তু এই "ক্ষুরধার-সম নিশিত, দুরত্যয় দুর্গম" পথ অতিবাহন করিয়া লক্ষ্যে পৌছিবার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা অধিক নহে। তাহা না হইলেও অরবিন্দ বিশ্বাস করেন যে সামান্যসংখ্যক লোকের দৈহিক-জৈব-মানসিক সংবিদে উর্দ্ধতর সংবিদের অবতরণ সংঘটিত হইলে তাহা মানব-জাতির পক্ষে পরম মঙ্গলের সূচনা করিবে। তাহাই পরবর্ত্তী কালে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংঘটিত হইবে। সেই দিনের প্রতীক্ষায় সকলকে প্রস্তুত হইতে অরবিন্দ আহ্বান করিয়াছেন।

অরবিন্দের উচ্চতর সংবিদাপন্ন মানুষ (Superman) ও Niet-zscheর Superman এক নহে। অরবিন্দের Superman ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন, Nietzsheর Superman আসুরিক। শরণাগতি বা ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণই অরবিন্দের যোগের

প্রধান অঙ্গ। অরবিন্দ যে অতিমানস সংবিদের আবির্ভাব কামনা করিয়াছেন, তাহার স্বরূপ বোঝা সহজ নহে। তাহার পরিধি মানস সংবিদের পরিধি (scope) অপেক্ষা বিস্তৃততর। অনুভব না হইলে তাহার স্বরূপ বোধগম্য হয় না।

অরবিন্দ জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে জাগতিক সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য জীবাত্মার বহু বার জন্ম-গ্রহণের প্রয়োজন।

অরবিন্দ বলিয়াছেন বেদের আক্ষরিক অর্থ ব্যতীত এক গূঢ় অর্থ (Esoteric meaning) আছে। আক্ষরিক অর্থ সাধারণ লোকের জন্য, কিন্তু দীক্ষিতদিগের (Initiated) মধ্যে এক গূঢ়ার্থ প্রচলিত ছিল। সায়ণের ভাষ্যে সেই গূঢ়ার্থ প্রকাশিত হয় নাই। আধুনিক পণ্ডিতেরা সায়ণের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। আক্ষরিক অর্থের অনেক ক্ষেত্রে অনুপযোগিতা অরবিন্দ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গীতোক্ত পুরুষোত্তম-তত্ত্বের অরবিন্দ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই: গীতা যে তিন পুরুষের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ক্ষর হইতেছে যে সার্ব্বিক আত্মা (Universal Soul) প্রকৃতির মধ্যে তাহার বিভিন্ন সমুৎপাদ-রূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, সেই পুরুষ। তিনি চঞ্চল, নিত্য-পরিণামী প্রকৃতির-(যে প্রকৃতি তাঁহারই অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ, অনল, বায়ু, খ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এবং জীবভূতা পরা প্রকৃতি) মধ্যে অধিষ্ঠিত। বাসুদেবঃ সর্ব্বং। ক্ষর পুরুষ দৃশ্যমান জগৎ ও জীব উভয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত। ইহা পরমাত্মার সক্রিয়রূপ। পরমাত্মার অন্য রূপ "অক্ষর"—ক্ষরের অন্তরালে যিনি নিশ্চল নিষ্ক্রিয় কূটস্থরূপে বর্ত্তমান।' অপরিণামী কূটস্থ পুরুষ এবং পরিণামী চঞ্চল ক্ষর পুরুষ বাস্তবিক পরমাত্মারই দ্বিবিধ রূপ। ইহারা অভিন্ন। উত্তম পুরুষ বা পরমাত্মা ইহাদের হইতে উত্তম। তাঁহারই শক্তি প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়াপর। আবার তিনিই নিশ্চল রূপে প্রকৃতির সাক্ষীরূপে ক্ষর পুরুষের অন্তরালে বর্ত্তমান। তিনি লোকত্রয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিয়া পোষণ করিতেছেন। পুরুষোত্তম রূপে তিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রতা এবং প্রকৃতিতে লিপ্ততা উভয়ের উর্দ্ধে। যে সর্ব্বোত্তম ভক্তিযোগ অদ্বৈতবাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়া যাইতে হয়, ইহাই তাহার ভিত্তি। ভক্তি-রসাত্মক পুরাণ-সমূহের মূলেও এই পুরুষোত্তমবাদ নিহিত রহিয়াছে। এই পুরুষোত্তমই (নির্গুণ) ব্রহ্মের এবং অব্যয় অমৃত ও শাশ্বত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ভূমি।

অরবিন্দের মতে মুক্তিতে জীবের বিনাশ হয় না। মুক্তিতে জীব ভগবানের মধ্যে বাস করে (নিবসতি)।

সমাপ্তি

পরিশিষ্ট

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পুরাণ বলিয়া গণ্য হইলেও পুরাণের বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। সমগ্র গ্রন্থেই অদ্বৈত দর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহার শ্লোক-সংখ্যা ২৩৭৩৪। এই বৃহৎ গ্রন্থ অদ্বৈতবাদিগণের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিলেও শঙ্কর-দর্শনের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই।

যোগবাশিষ্ঠের রচয়িতা ও রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় না। এই গ্রন্থ বাল্মীকি-রচিত বলিয়া কথিত হইলেও, ইহা বাল্মীকির বহু পরে রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ইহার

অথ তামতিমাত্রবিহ্বলাং সকৃপাকাশভবা সরস্বতী
শফরীং হ্রদ-শোষ-বিহ্বলাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ।

শ্লোকের সহিত কুমার-সম্ভবের

ইতি দেহবিমুক্তয়ে স্থিতাং রতিমাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীম্ হ্রদশোষবিক্লবাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ॥ ৪।৩৯

শ্লোকের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহা কালিদাসের অনুকরণে রচিত বলিয়া মনে হয়। যোগবাশিষ্ঠে শঙ্করাচার্য্যের নামের উল্লেখ নাই; শঙ্করও তাঁহার ভাষ্যে যোগবাশিষ্ঠের উল্লেখ করেন নাই। ইহার দার্শনিক মতের সহিত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সাদৃশ্য দেখিয়া এই গ্রন্থ বৌদ্ধ মতের ব্রাহ্মণ্য সংস্করণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। গৌড়পাদের দর্শনের সহিতও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের প্রচুর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য ডাঃ দাশগুপ্ত ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যোগবাশিষ্ঠের ভূমিকা এইরূপঃ—অগস্ত্য ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ নামে এক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মোক্ষের মুখ্য সাধন জ্ঞান অথবা কর্ম্ম? অগস্ত্য কহিলেন, পক্ষী যেমন তাহার দুই পক্ষদ্বয়ের ব্যবহার করিয়াই উড়িতে সক্ষম হয়, মানুষও তেমনি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সাহায্যে পরম পদ-লাভে সমর্থ হয়। কেবল কর্ম্ম বা কেবল জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয় না। ইহার পরে অগস্ত্য এক আখ্যায়িকা বলিলেন:—

অগ্নিবেশ্যের পুত্র কারুণ্য পাঠসমাপনান্তে মূক ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কারুণ্য কহিলেন, শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা পরম পুরুষার্থ-লাভের অধিকতর উপযোগী কিনা, তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। পুত্রের সন্দেহ দূর করিবার জন্য অগ্নিবেশ্য এই উপাখ্যান বলিলেন:

অরিষ্টনেমি-নামক রাজা রাজ্যভার পুত্রকে অর্পণ করিয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া ইন্দ্র রাজাকে স্বর্গে আনিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্গলোকে সুখ উপভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, ইহা শুনিয়া রাজা স্বর্গে যাইতে অস্বীকৃত হন। ইন্দ্র রাজাকে বাল্মীকির নিকট লইয়া যাইতে আদেশ করেন। বাল্মীকির নিকট আনীত হইয়া রাজা তাঁহাকে মোক্ষ-লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে বাল্মীকি বশিষ্ঠ-রাম সংবাদ বর্ণনা করেন।

বাল্মীকি কহিলেন, ব্রহ্মা একদিন ভরদ্বাজকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, তোমার রাম-চরিত্র-বর্ণনা শেষ হয় নাই। তুমি রামের চরিত্র এমন ভাবে বর্ণনা কর, যেন তাহা শুনিয়া লোকে সংসার-সঙ্কট পার হইতে পারে। ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে বাল্মীকি কহিলেন, শিক্ষা সমাপ্ত হইলে রাম তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে দিন যাপন করিতেছেন দেখিয়া দশরথ বশিষ্ঠকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এই সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষিও রাক্ষস-বধের জন্য রামকে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করেন এবং রামকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাম বলেন, তাঁহার সুখভোগে বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীতে সুখ নাই। লোকে জন্মে মরিবার জন্য এবং মরে পুনরায় জন্মিবার জন্য। জগতে কোনও বস্তুর সহিত কোনও বস্তুর সম্বন্ধ নাই। আমরা তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করি। ভোগ্য বস্তুসকল মনেরই সৃষ্টি, আবার মনেরও অস্তিত্ব নাই। জগৎ মরীচিকা বলিয়া আমার বোধ হয়। এইজন্যই আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। রামের এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে তাঁহার সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন এবং বশিষ্ঠ রামকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ রামকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই যোগবাশিষ্ঠে বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকির উপদেশ শুনিয়া অরিষ্টনেমির সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছিল। কারুণ্য পিতার নিকট ইহা শুনিয়া সত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং

সাংসারিক কর্ত্তব্য-পালনে মন দিয়াছিলেন। অগস্ত্যের নিকট সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সুতীক্ষ্ণের সংশয়ও বিদূরিত হইয়াছিল।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে (১) বৈরাগ্য, (২) মুমুক্ষু-ব্যবহার, (৩) উৎপত্তি, (৪) স্থিতি, (৫) উপশম এবং (৬) নির্ব্বাণ, এই ছয় প্রকরণ আছে। আনন্দবোধেন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত ইহার "তাৎপর্য্য-প্রকাশ" নামে উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত এক ভাষ্য আছে।

যোগবাশিষ্ঠে মনস্তত্ত্ব

যোগবাশিষ্ঠের মতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই। বাহ্য জগৎ মনের সৃষ্টি এবং মন সর্ব্বদাই সক্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, কল্পনা, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, বাসনা, কর্ম্ম, মায়া, বিদ্যা, প্রযত্ন, প্রকৃতি এবং ক্রিয়া—সকলই মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার নাম। সজ্ঞান ক্রিয়া যখন প্রথম উদ্‌গত হয়, তখন সেই ক্রিয়ার নাম মন। মনের গতি বিভিন্ন দিকে। যখন কোনও বিষয় "এই রূপ" বলিয়া মন স্থির করে অর্থাৎ সেই বিষয় "ইহা, অন্য কিছু নহে" বলিয়া ধারণা করে, তখন সেই ক্রিয়ার নাম বুদ্ধি। আত্মা ও দেহ যখন অভিন্ন বলিয়া মন ধারণা করে এবং তাহার ফলে "অহং" বা "আমি"র ধারণা উৎপন্ন হয়, তখন তাহার নাম অহংকার। অতীতের স্মৃতির সহিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পরিচিন্তনকে বলে চিত্ত। মন যখন আপনাতে আপনি তুষ্ট না থাকিয়া অন্য কিছু পাইতে ইচ্ছা করে, তখন তাহার নাম কল্পনা। চিত্ত যখন পূর্ব্ব দৃষ্ট কোনও বিষয়ের অভিমুখী হইয়া তাহাকে পূর্ব্বদৃষ্ট বলিয়া গণ্য করে, তখন উদ্‌ভূত হয় স্মৃতি। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রূপ পঞ্চবিধ জ্ঞানের নাম ইন্দ্রিয়। বাসনা অতি সূক্ষ্ম ও গূঢ়রূপে কোনও বস্তুর প্রতি রাগ অথবা বিরাগ-রূপে অনুভূত হয়। কোনও এক দিকে মনের গতিকে কর্ম্ম বলে। মনের সক্রিয় অবস্থাই কর্ম্ম। যে অবস্থা সৎও নহে, অসৎও নহে। যাহা হইতে যাবতীয় ভাণের উদ্‌ভব হয়, তাহাকে বলে মায়া। যে পরমাত্মা হইতে জগৎপ্রপঞ্চ উদ্‌ভূত হয়, তাহা প্রকৃতি। জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি—সকলই মায়া। সত্য জ্ঞানই (জগতের মিথ্যাত্বজ্ঞান) বিদ্যা। মনের প্রত্যেক অবস্থাকর্ত্তৃক তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাকে পরবর্ত্তী অবস্থার কর্ত্তা বলা যায়। কিন্তু এই পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং যাহা কর্ত্তা, তাহা আবার কর্ম্ম--বীজাঙ্কুরের ন্যায়। কর্ম্ম আত্মার নহে, মনের। ব্রহ্ম হইতে মনের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মের উদ্‌ভব

হয়, এবং ইহার ফলেই জীব ও তৎসংশ্লিষ্ট দেহের ভাণ উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম ও মন এক অর্থে অভিন্ন। "ক্রিয়া-স্পন্দ"ই কর্ম্ম। মনের ক্রিয়া হইতেই সুখ ও দুঃখের ভোক্তা দেহ এবং অন্য সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়। কর্ম্মনাশে মনেরও নাশ হয়। অগ্নি হইতে উত্তাপকে যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনি মন হইতে তাহার স্পন্দ ও ক্রিয়া পৃথক করা যায় না। একের নাশে অন্যের নাশ হয়। সত্তা ও অসত্তার মধ্যে যে ক্রিয়া, যে ক্রিয়া দ্বারা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়, তাহাই মন। মনের স্বরূপ শক্তি। মনের ক্রিয়া দ্বারাই বিষয়ি-বিষয়হীন বিশুদ্ধ চৈতন্য আত্ম-সংবিদের রূপ প্রাপ্ত হয়। মনের স্পন্দ হইতে বিবিধ রূপ কর্ম্ম উদ্ভূত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগের ক্রিয়াসকল মনেরই ক্রিয়া। আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই। অবুদ্ধিপূর্ব্বক যখন কোনও কার্য্য করা হয়, সে স্থলে "আমি করিতেছি" এরূপ বোধ হয় না। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তরস্থিতমনোবৃত্তিই কর্ত্তৃত্ব। ইহাকে বাসনা বলে। বাসনার অধীন চেষ্টা-বশেই ফল-ভোক্তৃত্ব হইয়া থাকে। মনের বাসনা যেরূপ হইবে, পুরুষ কোনও কার্য্য করুক বা না করুক, তদনুরূপ স্বর্গ বা নরক-ফল প্রাপ্ত হইবে। যাহারা তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ, তাহাদেরই কর্ত্তৃত্ব। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই। ভোগাসক্ত-চিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তি কোন কার্য্য না করিলেও, তাহার কর্ত্তা হয়। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বাসনা শিথিল হওয়ায়, ফল কামনা না করিয়া তিনি অনাসক্ত ভাবে কেবল মাত্র স্পন্দন করেন। তাহাকে কর্ত্তা বলা যায় না। সংসার চিত্তময়, চিত্তেই সংসার অবস্থিত। হস্তীর যেমন পল্বলে নিমজ্জন অসম্ভব, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও তেমনি বাসনাময় স্পন্দরসে নিমগ্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। মনকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে সকল কর্ম্ম পরিত্যক্ত হয়।

পরমার্থ

রামের প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, "যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশ-কানন কখনই ছিল না, এখনও নাই, সেইরূপ এই দৃশ্য জগৎও কখনই ছিল না এবং এখনও নাই, ইহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। যেমন কজ্জলের সহিত তাহার শ্যামবর্ণের এবং হিমের সহিত শৈত্যের পার্থক্য নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত জগতের পার্থক্য নাই।" শেষোক্ত বাক্য হইতে মনে হইতে পারে, বশিষ্ঠ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, তাহাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরেই বলিয়াছেন,

যেমন মরুস্থলীর নদীর জল এবং দ্বিতীয় চন্দ্র উভয়েরই অত্যন্তাভাব, তেমনি এই জগৎ দৃষ্ট হইলেও শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মে তাহার অভাব নিশ্চিত। জড় বস্তুর কারণ জড় বস্তুই হইতে পারে। ব্রহ্ম জড় নহেন। সুতরাং তিনি জড় জগতের কারণ হইতে পারেন না। ব্রহ্মে জগৎ-রূপ বস্তু না থাকিলেও অজ্ঞান-বশতঃ তাহা স্বপ্নকালীন বস্তু-দর্শনের ন্যায় জাগ্রৎ দশায় দৃষ্ট হইতেছে। এই বিশ্ব অনন্ত-প্রকাশ ও অনন্ত-চিন্ময় পরমাত্মার স্বাভাবিক সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তিনি আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল, তাহাতে প্রথমে যে চেত্যতার (বিষয়ের) প্রকাশ হয়, সেই চেত্য-জ্ঞানের সহিত অহং জ্ঞান থাকে। তাহাতে সকল জ্ঞান-সংস্কার হয়। চিত্তবৃত্তির ন্যায় বৃত্তিযুক্ত চেতনাত্মক ব্রহ্ম-সত্তাই চিন্ময় পরম সত্তা রূপে ব্যবহৃত হন। পরে যখন তিনি ঈক্ষণ-সংবেদন-বশতঃ জ্ঞানঘন হন, তখন আত্মভাব বিস্মৃত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্যুতি হয় না বা তাঁহার কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না। জীবাত্মার পরে শূন্যতা-রূপ আকাশ, কাল এবং জীবের অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। তাহাই ভাবী সৃষ্টির ও জগৎ-স্থিতির মূল। সেই পরমাত্মা হইতে এই আত্ম-সংবেদ্য অসৎরূপ জগৎ উৎপন্ন হইয়া সত্যের মতো প্রকাশিত হইতেছে। অহংতত্ত্বাদি-সংবলিত সংবিদ সংকল্পরূপ বৃক্ষের বীজ। তাহা হইতেই পঞ্চ তন্মাত্র ও জগতের উদ্ভব হয়।

পরমাত্মার স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, যে জ্ঞানের শরীর নিমেষ-মধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যে জ্ঞান-সমুদ্রে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালেই সংসারের অভাব রহিয়াছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাহাতে দ্রষ্টা; দৃশ্য ও দর্শন থাকিয়াও নাই, যাহা বিপুলতায় আকাশ-সদৃশ, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অসৎ জগৎ যাহাতে সৎরূপে অবস্থিত ও সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি হইলেও জগৎ যাহাতে মিথ্যা রূপে অবভাসিত হয়, তাহাই 'পরমাত্মার রূপ'। যিনি চিন্ময় হইয়াও পাষাণের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বস্তুর সহিত সঙ্গত হইয়া ব্যবহার-যোগ্য হন, তাহাই পরমাত্মার রূপ। আলোক যেমন প্রকাশক পদার্থের রূপ, শূন্যতা যেমন আকাশের রূপ, সেইরূপ যাহাতে পরমাত্মা অবস্থিত, তাহাই তাহার রূপ। যেমন রূপহীন আকাশে নীলাদি গুণ দেখা যায়, তেমনি চিন্ময় ব্রহ্মে এই ভ্রম-জগৎ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম বোধ-স্বরূপ। জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-মাত্র।

"দেখা যাইতেছে", ও "দেখিতেছি", এই দুই বোধের বিনাশ হইলে চৈতন্য-

মাত্র অবশিষ্ট থাকে। "দেখা যাইতেছে" এ বোধ থাকিলে "দেখিতেছি" এ বোধও থাকিবে। "দেখিতেছি" এ বোধ থাকিলে "দেখা যাইতেছে" এ বোধ ও থাকিবে। দর্শক দৃশ্যেরই অন্তর্গত। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাব অন্তর্হিত হইলে তাহাদের আশ্রয়ীভূত ব্রহ্ম-সত্তাই বর্ত্তমান থাকে। জগদ্-জ্ঞান মিথ্যা, দৃশ্যমান এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড কখনও উৎপন্ন হয় নাই, তাহা ব্রহ্মচৈতন্যে কল্পিত।

উৎপত্তি বা সৃষ্টি

যোগবাশিষ্ঠের মতে যাহা আদিতে ছিল না, যাহা উৎপন্নও হয় নাই, যাহার ধ্বংসও হয় না, তাহার উৎপত্তি ও নাশের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

জগতের চরম তত্ত্ব, "নির্ব্বাণমাত্র" বা "পরবোধ" (বিশুদ্ধ বোধ)। তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন কখনও হয় না। পরবোধ হইতে "স্ব"তার (অহং-বোধের) উদ্ভব হয়। এই "স্ব"তা পরবোধ হইতে ভিন্ন নহে। "স্ব"-তার স্পন্দন হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়। যাহা চরমতত্ত্ব, তাহা বিশুদ্ধ কল্পনা-রূপ (সংকল্প পুরুষ)। তাহাতেই "চেত্য" (বিষয়) আবির্ভূত হয়। চেত্য ও অহংজ্ঞান আবির্ভূত হয় একসঙ্গে। ইহার পরে আরও স্পন্দনের ফলে যাহা আবির্ভূত হয়, তাহাতে সকল বস্তুই প্রতিফলিত হইতে সমর্থ। তাহাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি বলা যায়। তাহা চিৎ। চিতের মধ্যে স্পন্দন ক্রমশঃ ঘন হইতে থাকে এবং তাহার ফলে জীবের অন্যান্য অবস্থার উদ্ভব হইতে থাকে। চিৎ তখন তাহার বিষয়ি-বিষয়হীন স্বরূপের কথা যেন বিস্মৃত হইয়া আপনা হইতে ভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হয়। ফলে আকাশের উদ্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে অহন্তা ও কাল আবির্ভূত হয়। এই সকলই ভাণমাত্র, পরতত্ত্বের স্ব-সংবেদনমাত্র। সংবিদের ভাবনা হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। তাহার পরে শব্দ (খ-তন্মাত্র), স্পর্শ-তন্মাত্র, তেজ তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র এবং গন্ধ-তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। এইরূপে সমগ্র জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই সকলই মনের ধারণামাত্র, ইহাদের মনোবাহ্য অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতা বিষয়ী, জ্ঞাত বিষয় ও জ্ঞান—কিছুরই অস্তিত্ব নাই। শূন্য নাই, অচেতন জড় নাই, চৈতন্য নাই, আছে কেবল "অভাব"। এই অভাবই ব্রহ্ম। ইহা "শান্ত"। সাংখ্য ইহাকেই বলেন "পুরুষ", বেদান্ত বলেন ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন "বিজ্ঞান-মাত্র", বৈনাশিক বলেন শূন্য। যাহাতে শূন্য জগৎ প্রতিষ্ঠিত, তাহাই এই তত্ত্ব। জগৎ মায়ামাত্র—মরীচিকায় দৃষ্ট জলের মতো, বন্ধ্যার পুত্রের মতো। যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা সৎও নহে, অসৎও

নহে, তাহা "স্পন্দাস্পন্দাত্মক" (নিষ্ক্রিয় ও ক্রিয়াপর), অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বচনীয়, সদসৎ নহে, ভাবও নহে, ভবনও নহে (ন ভাবো ভবনম্ ন চ)। বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ অব্যক্ত ব্রহ্মে প্রথমে "চেত্যত্ব" আবির্ভূত হয়। এই চেত্যত্ব চরম তত্ত্বের আপনার দিকে দৃষ্টি হইতে বিষয়রূপে আবির্ভাব। পরে আবির্ভূত হয় "আত্মা"—চিতের সহিত চেত্যের সংযোগ-জ্ঞান হইতে। তখন বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদজ্ঞান উদ্ভূত হয়. এবং তাহা হইতে বুদ্ধির ক্রিয়ার (বুদ্ধিত্বাকলন) উৎপত্তি হয়। বুদ্ধির ক্রিয়া হইতে তন্মাত্রদিগের এবং জগতের উদ্ভব হয়। কিন্তু এ সকলই মনের সৃষ্টিমাত্র।

জগতের উৎপত্তি যে ভাবে যোগবাশিষ্ঠে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতি জটিল। অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মে কোনও রূপে মনের উদ্ভব হয় এবং মনের কল্পনা হইতে জীব ও জগতের উৎপত্তি হয়, সংক্ষেপে ইহাই উক্ত বর্ণনার মর্ম্ম। "আমি দেখিব" এই ইচ্ছার.উদয়ের ফলে চক্ষুর উদ্ভব হয়, এবং এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি হয়। ব্রহ্ম জীবের কল্পনা করেন, সেই কল্পনার ফলে জীবের ভাণ উদ্ভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মের কল্পনার বাহিরে জীবের অস্তিত্ব নাই। জীব চিন্তার "চমক" (flash) মাত্র—(চিত্ত-চমৎকার)। বিশুদ্ধ সংবিদের যে ক্রিয়া দ্বারা তাহা হইতে চেত্যের (বিষয়ের) উদ্ভব হয়, তাহাই মন। চিৎ-কর্ত্তৃক চেত্য-উৎপাদনই মনের স্বভাব। চিৎ অজড় (আত্মিক), চেত্য জড়। চিৎ আপনাকেই চেত্যের মধ্যে দেখে, যদিও তাহাকে আপনা হইতে ভিন্ন রূপে দেখে। এই চেত্যের প্রথম উৎপত্তি অহংকারের উৎপত্তিতে।

পরতত্ত্ব শান্ত (স্পন্দহীন)। এই শান্ত অবস্থার সমতার বিচ্যুতি কেন হয় এবং সৃষ্টির কারণভূত মনের ক্রিয়া হইতে জগতের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহার ব্যাখ্যায় "কাকতালীয় যোগ" (আকস্মিকতা) ইহার কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মের কারণ কি, এই প্রশ্ন অযৌক্তিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (ব্রহ্মণো কারণং কিং স্যাৎ, ইতি বক্তুং ন যুজ্যতে)। ব্রহ্ম হইতে মনের উদ্ভব। মনের ক্রিয়া হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, কিন্তু ব্রহ্মের জগৎ-রূপ পরিণাম সত্য নহে—মায়িক। এই সকল পরিবর্ত্তন যখন প্রতীত হয়, তখনও ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই থাকেন। বাহ্য বলিয়া যে সকল বিষয়ের ভাণ হয়, তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যে রূপে তাহারা আবির্ভূত হয়, তাহাই মিথ্যা। এই মিথ্যা জগতের মধ্যে যে শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, তাহা যাদৃচ্ছিক বা আপতিক, এক স্বপ্নের সঙ্গে অন্য স্বপ্নের সামঞ্জস্যের ন্যায় (অনেক

সময় যাহা দেখা যায়)। স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর স্থায়িত্ব নাই। এইজন্যই স্বপ্নকে মিথ্যা বলা হয়। স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহার যদি স্থায়িত্ব থাকিত এবং জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা যদি ক্ষণিক হইত, তাহা হইলে জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্ন বলা হইত এবং স্বপ্নাবস্থাকে স্বাভাবিক বলা হইত। স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহা স্থায়ী এবং সত্য বলিয়াই মনে হয়। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বপ্নাবস্থা অস্থির, জাগ্রৎ অবস্থা স্থির।

আমাদের মধ্যে যে চিৎ-পদার্থ আছে, তাহাই জীব-ধাতু (জীব-চৈতন্য), তাহাই বীর্য্য (প্রাণ) এবং দেহের তেজ। জাগ্রৎ অবস্থায় দেহের সহিত যখন বাক্ ও কর্ম্ম সংহত থাকে, তখন জীব-ধাতু দেহের মধ্যে সঞ্চরণ করে এবং ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু সুষুপ্তি-অবস্থায় মনের ক্রিয়া হয় না, কর্ম্ম বা বাক্যও তখন থাকে না। জীব-ধাতু শান্ত অবস্থায় থাকে, তাহার প্রকাশ থাকে না। যখন জীব-ধাতু অতিমাত্র স্পন্দিত হয়, তখন স্বপ্নের আবির্ভাব হয়। মন যখন কোনও প্রত্যয়ের সহিত গভীর ভাবে একীভূত হয়, তখন নিজে নিজের নিকট সেই প্রত্যয়-রূপে আবির্ভূত হয়—অগ্নির মধ্যস্থিত লৌহ-গোলক যেমন উত্তপ্ত হইয়া অগ্নির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। মন যেমন পুরুষ (জ্ঞাতা), তেমনি জ্ঞাত জগৎ। মন বিশ্বরূপ। কোনও বস্তু স্বরূপতঃ সুখজনক অথবা দুঃখজনক, মিষ্ট অথবা তিক্ত নহে। এ সকল অনুভূতি মনেরই সৃষ্টি। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কোনও বিষয়কে কোনও বিশিষ্ট রূপে চিন্তা করিলে, তাহা সেই রূপেই আবির্ভূত হয়।

দৈব ও পুরুষকার

সাধূপদিষ্টমার্গেণ যৎ মনোঽঙ্গবিচেষ্টিতম্
তৎ পৌরুষম্, তৎ সফলম্, অন্যৎ উন্মত্ত-চেষ্টিতম্ ॥
যো যমর্থং প্রার্থয়তে, তদর্থং চেষ্টতে ক্রমাৎ।
অবশ্যং স তমাপ্নোতি নচেৎ অর্দ্ধান্নিবর্ত্ততে ॥

(২৪।১১-১২)

সাধুদিগের উপদিষ্ট মার্গে যে মানসিক ও শারীরিক চেষ্টা, তাহাকে পৌরুষ বলে। তাদৃশ চেষ্টাই সফল হয়। অন্য প্রকার চেষ্টা উন্মত্ত-চেষ্টা। যে যাহা কামনা করে, সে যদি তাহার প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে থাকে এবং সফলতার অর্দ্ধপথে যদি সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সে কাম্য বস্তু

প্রাপ্ত হয়। পুরুষকার দ্বিবিধ—প্রাক্তন ও অদ্যতন। প্রাক্তন পুরুষকার (দৈব) বর্ত্তমান পুরুষকার দ্বারা জয় করা যায়। উৎসাহ-সমন্বিত যত্নশীল পুরুষ শত শত সুমেরুকে জীর্ণ করিতে পারেন, প্রাক্তন পুরুষকারের কথা তো অতি সামান্য। কোনও বস্তু কামনা করিয়া শাস্ত্র-সম্মত কর্ম্ম দ্বারা তাহার প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা না করিলে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় না। দৈব কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত ও শাস্ত্র-বহির্ভূত ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। শেষোক্ত কর্ম্ম অনিষ্টের মূল, প্রথমোক্ত কর্ম্ম পরম ইষ্টসাধক। প্রাক্তন এবং ঐহিক কর্ম্মের মধ্যে মেষদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধের ন্যায় বিরোধে যাহার শক্তি কম, সে নিরস্ত হয়। সেই জন্য প্রাক্তন কর্ম্মকে পরাজিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। যখন শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম করিলেও অনিষ্টপাত হয়, তখন বুঝিবে অনিষ্টজনক স্বীয় দুষ্কর্ম্ম প্রবল আছে। দৃঢ় ভাবে কল্যাণজনক ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা ফলোন্মুখ প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মকেও জয় করিতে পারা যায়। "প্রাক্তন কর্ম্ম আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে," এইরূপ বুদ্ধি ত্যাগ করিবে এবং যতক্ষণ ঐহিক সৎ কর্ম্মদ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত না হয়, ততক্ষণ ঐহিক সৎ কর্ম্মে যত্ন করিবে। প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয় পরাস্ত হইবে। শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রযত্ন কখনও নিষ্ফল হয় না। তবে ফলের তারতম্য আছে। সৎ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সৎসঙ্গে থাকিয়া সদাচার-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, তাহা সম্পূর্ণ ফল দান করিয়া থাকে। তাহা না হইলে উপযুক্ত ফল দান করে না। ইহা বুঝিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে কেহই কখনও বিফলপ্রযত্ন হয় না। প্রাক্তন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য দৈব কিছু নাই। অতএব উক্ত দৈব দূরে ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা বলপূর্ব্বক জীবকে উদ্ধার করিতে হইবে। যেরূপ যত্ন, ফলও তদ্রূপ হইবে। পূর্ব্বকৃত অসৎ কর্ম্ম যেমন সৎ কর্ম্ম দ্বারা শুভে পরিণত করা যায়, প্রাক্তন কর্ম্মও সেইরূপ করা যাইতে পারে। অল্প-বুদ্ধি যাহারা দুঃখের সময় রোদন করিতে থাকে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্যই "দৈব" শব্দের ব্যবহার। বস্তুতঃ দেবলোকে ভুক্তাবশিষ্ট উভয়লোক-হিতকারী প্রাক্তন পৌরুষকেই দৈব বলিয়া থাকে (২।৬।২৫)। বাল্যকাল অবধি যে বিষয়ে যেরূপ যত্ন করা যায়, ফল-লাভও সেই রূপ হইয়া থাকে। দৈব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব জগতে কেবলমাত্র পৌরুষই বর্ত্তমান।

দৈবের আকার নাই, কোন কর্ম্ম নাই, স্পন্দ নাই, পরাক্রম নাই। মানুষের যাবতীয় চেষ্টা প্রকাশিত হয় সংবিদ্-স্পন্দ, মনঃস্পন্দ (পুরুষার্থ-সাধনের ইচ্ছা) ও পরে ইন্দ্রিয়স্পন্দ (অঙ্গ-চালনার জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি) রূপে। ইহা

হইতে কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হয়। চিত্তে যেরূপ বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়, শরীর-চেষ্টাও তাহার অনুরূপ হয়। ইহার মধ্যে দৈব কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। দৈব কল্পনামাত্র। ফলাভিলাষে অতি যত্নে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই "দৈব" শব্দে কথিত হয়। পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন সকলই অসত্য। সুতরাং দৈব নাই। "স্ব-প্রযত্নকৃত পুরুষকার দ্বারাই শাশ্বত শ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইবে। তুমি চেতন, জড় নহ। অন্যের অধীনতা তোমাতে নাই। বাসনা-নদী শুভ ও অশুভ উভয় পথে প্রবাহিত। পৌরুষ দ্বারা তাহাকে শুভ পথে যোজিত করিবে। শুভ বাসনাকে প্রগাঢ় করিবে।" সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ব্রহ্ম-সত্তাই ভবিষ্যৎ কালের সম্বন্ধে নিয়তি-নামে অভিহিত হয়। সুতরাং তাহা হইতে প্রতিকূলতার আশঙ্কা নাই।

মুক্তি

আকাশের বাস্তবিক কোনও রূপ নাই, তবুও আকাশ নীল বলিয়া প্রতীত হয়। জগতেরও বাস্তবিক সত্তা নাই, তবুও জগৎ-ভ্রম হয়। এই ভ্রান্ত জগৎ যখন আর মনে আসে না, তাহার প্রতীতি হয় না—এইরূপ যে বিস্মরণ, তাহাই মুক্তির স্বরূপ। দৃশ্যমাত্রই একেবারে অস্তিত্বশূন্য, এ জ্ঞান না হইলে কেহ মুক্তির স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না। এই জ্ঞান আত্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে হয়। বাসনাসমূহের নিঃশেষরূপে পরিহারই প্রধান মুক্তি নামে অভিহিত। চিত্তশুদ্ধি হইতে ক্রমে ক্রমে সেই মুক্তি-লাভ হইয়া থাকে। বাসনার ক্ষয় হইলে চিত্তও লয়-প্রাপ্ত হয়। মলিন বাসনা হইতে জন্ম, শুদ্ধ বাসনা হইতে জঠর-যন্ত্রণার বিনাশ হয়। শুদ্ধ বাসনা তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী; ভৃষ্ট (আগুনে ভাজা) বীজের ন্যায়, তাহাতে পুনর্জন্মের অঙ্কুর থাকে না। জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহে মৃত্যু পর্য্যন্ত শুদ্ধ বাসনা থাকে, কিন্তু পুনর্জন্ম উৎপাদন করে না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে লব্ধ মুক্তিকে বলে জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্তের কোনও কামনা থাকে না—তিনি "অপগতৈষণ"। তিনি সুষুপ্তবৎ অবস্থান করেন। যদিও বাহ্য চক্ষু দ্বারা তিনি বাহ্যবস্তু দর্শন করেন এবং অঙ্গচালনাদি করেন, তথাপি তাঁহার অন্তশ্চক্ষু সর্ব্বদাই অন্তর্দিকে প্রযুক্ত। তাঁহার অতীতের স্মৃতি নাই, ভবিষ্যতের জন্য তিনি অপেক্ষা করেন না। বাহিরে সকল কার্য্য করিয়াও তিনি অন্তরে কিছুই করেন না। কর্তৃত্বাভিমান তাঁহার নাই। কোনও বিষয়েই তাঁহার দ্বেষ নাই। অপ্রিয় ঘটনায় তিনি শোকাকুল এবং ইষ্টলাভে আনন্দিত হন না। তিনি কর্ম্ম করেন, কিন্তু তাহার ফলের অনুসন্ধান করেন

না। তাঁহার দয়া থাকে না, কিন্তু তিনি নির্দ্দয় নহেন। ভিক্ষাদি অপমানকর কার্য্যে তিনি লজ্জিত হন না, কিন্তু কখনই দীন ভাব বা ঔদ্ধত্য অবলম্বন করেন না। তিনি নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিত্য-তৃপ্ত ও স্বরূপভূত আনন্দে আনন্দিত থাকেন। তিনি কখনও উদ্বিগ্ন হন না। মুক্তি ত্রিবিধ—সদেহ মুক্তি, বিদেহ মুক্তি ও নির্ব্বাণ-মুক্তি। মুক্তির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ নাই। কোনও মুক্তিতেই বিষয়-রস-আস্বাদন নাই। জীবন্মুক্ত ও নির্ব্বাণমুক্ত উভয়েই জ্ঞান-স্বরূপ, ইহাদের ভেদ নাই। দ্বৈতহীন জীব-ব্রহ্মের অভেদই তাহাদের পরমার্থ-দৃষ্টির বিষয়। স্থূল দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মদেহ এবং সূক্ষ্মদেহের অভ্যন্তরে কারণদেহ বর্ত্তমান: এই ত্রিবিধ দেহই সংসার। মৃত্যুতে জগদ্-ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। স্থূলদেহের সঙ্গে সংসারের লোপ হয় না। সুষুপ্তি (বা প্রকৃতি-লয়) অবস্থায় সূক্ষ্ম দেহও থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তি-অপগমে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহাদির অস্তিত্ব অনুভূত হয়। সূক্ষ্মদেহ ভিন্নও সংসার আছে। না থাকিলে সূক্ষ্মদেহ-নাশে জীবের মুক্তি হইত। সূক্ষ্মদেহের অভ্যন্তরে যে কারণ-দেহ আছে, অবিদ্যাই সেই কারণ-দেহ। অবিদ্যারূপ কারণদেহ-নাশেই মুক্তি হয়। হরিহরাদি দেবগণ সচ্চিদানন্দের সূক্ষ্মকল্পনার অন্তর্গত, কিন্তু অবিদ্যাময়ী প্রকৃতির গুণত্রয়ে জড়িত থাকিলেও তাঁহারা সচ্চিদানন্দের শুদ্ধ-সত্ত্বরূপে নির্ম্মল পদের অধিকারী। রুদ্রাদি দেবগণ সাক্ষাৎ সত্ত্বময়। যতদিন জগতের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন। যখন দেহ ত্যাগ করিবেন, তখন অশরীরী হইয়া পরমেশ্বরের মধ্যে অবস্থান করিবেন।

যেমন জল হইতে বুদ্-বুদের উৎপত্তি, তেমনি জ্ঞান হইতে অজ্ঞানের উদ্ভব। জলে বুদ্বুদের মতো জ্ঞানে অজ্ঞান মিশিয়া যায়। হরিহরাদির দেহও ব্রহ্মে বিলীন হয়। দ্বিত্ব-ভাবনা-বশতঃ তাঁহাদের দেহ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। দ্বিত্ব-ভাবনার ফলেই জ্ঞান ও অজ্ঞান পৃথক বলিয়া বোধ হয়। সংসারে জ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই, অজ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই। আছে শুধু তাহাই, যাহা জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়। তাহার জ্ঞাপক কোনও শব্দ নাই, সঙ্কেতও নাই। এই তত্ত্ব জ্ঞানের অতীত, অজ্ঞানের স্বপ্নেরও অগোচর। শাস্ত্রে যে "ন কিঞ্চন" এর কথা আছে, তাহাও চৈতন্যরূপে অবস্থিত একটা অবস্থা,—"কিঞ্চন" বটে, উপাধিময় "কিঞ্চন",—একটা আভাস। তাই শাস্ত্র তাহাকে অবিদিত বলিয়াছেন। "ন কিঞ্চনের" বোধ-উৎপাদনে তাহা সমুজ্জ্বল আলোক। সে আভাস দুর্ব্বোধ্য হইলেও শাস্ত্র তাহা বুঝিয়াছেন। তাই তাহাকে অবিদ্যা বলিয়াও আবার সৎ বলিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় অবিদ্যা থাকিতে পারে না বলিয়া অবিদ্যার "অবিদ্যা" নাম কল্পনাটিও মিথ্যা বলিয়াছেন। জ্ঞান না থাকিলে অজ্ঞান হইতে পারে না। আবার জ্ঞানের সম্মুখেও অজ্ঞান থাকিতে পারে না। যখন অজ্ঞান অন্তর হইতে বিলীন হয়, তখন অজ্ঞান-জাত দ্বিত্ব-কল্পনা বিনষ্ট হয়। জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই তিরোহিত হইলে যাহা থাকে, তাহার প্রতিশব্দ নাই বলিয়া তাহা উপাধিশূন্য, তাহাই অবাপ্য, তাহাই শেষ (নির্ব্বাণ-প্রকরণ—নবম সর্গ)! অবিদ্যার বিলয়ে জ্ঞানেরও বিলয় হয়। যাহা থাকে, তাহা "ন কিঞ্চিৎ।" সংসারে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা এই "ন কিঞ্চিৎ" এ-ই বিদ্যমান। কিন্তু এই "কিছু না" শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের শূন্যের ন্যায় নহে। এই "ন কিঞ্চিৎ" এ সর্ব্বশক্তি-সমবায়-রূপী "কিঞ্চন" (কিছুত্ব) সমবেত। সূক্ষ্ম বটবীজের মধ্যে বিশাল বটবৃক্ষের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ সেই বিশাল বটবৃক্ষের যাহা-কিছু সকলই সেই বীজের মধ্যে নিহিত। যাহা নাই, তাহা "ন কিঞ্চিৎ" ভিন্ন আর কি? কিন্তু এই নাস্তিত্বের অভ্যন্তরে যেমন অস্তিত্বের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ "ন কিঞ্চনত্বের" মধ্যে সর্ব্বশক্তি সমবেত। এই "ন কিঞ্চন" শূন্য হইলেও চিদাত্মক সর্ব্বশক্তি বলিয়া চৈতন্যময়। চেতন ভিন্ন জড়ের শক্তি কোথায়? সমস্ত সংসার সেই শূন্যের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ, সূর্য্য হইতে তাহার কিরণের মতো, সেই নিত্য-জ্ঞানময় চৈতন্য-স্ফুরিত "ন কিঞ্চন" হইতে সমগ্র বিশ্ব বাহির হইয়া আসে (নির্ব্বাণ-প্রকরণ—৯ম সর্গ)।

পরমব্রহ্ম হইতে প্রথম উৎপন্ন হয় মন। পুষ্পমধ্যে সৌরভের ন্যায় পরব্রহ্মে মন রহিয়াছে। প্রকাশময় আত্মা আত্মশক্তিতে সংকল্পময়ী শক্তির উদ্ভাবন করেন। তখন আত্মা পৃথকরূপে প্রতীয়মান হইয়া সংকল্প-কল্পনাময় মনোরূপে বিবর্ত্তিত হন। ঐ সঙ্কল্পাত্মক চিত্ত যেরূপ সংকল্প করে, জগৎ যেইরূপেই আবির্ভূত হয় (নির্ব্বাণ পূর্ব্বভাগ, ১১৪ সর্গ)।

ব্রহ্ম নিজেই প্রথমে চিন্ময়ভাব হইতে আপনাকে "আমি" বলিয়া যে জ্ঞান করেন, তাহাই হিরণ্যগর্ভতা। সেই জ্ঞানের মধ্যেই এই জগৎ-অবস্থিত। সেই জ্ঞানের বাহিরে ব্রহ্ম বা জগতের অস্তিত্ব নাই। জ্ঞানময় ব্রহ্মে যে জগদ্‌ভাব প্রতীত হয়, তাহা প্রতিভাসমাত্র, তাহা অসৎ, অথচ ভ্রান্তিও নহে। ভ্রান্তিই বা কোথায় কাহার হইবে? যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ব্রহ্মই। ব্রহ্ম-সত্তা সর্ব্বদাই "আমি" ইত্যাদি প্রকার অনুভব করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাতে অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই। মিশ্র দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে জগৎ ও অজগৎ

উভয়-রূপী বলা যায়, কিন্তু পরমার্থ-দৃষ্টিতে নহে। মিশ্র দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্ব্বরূপী, ব্রহ্মই জীবরূপে সকল অনুভব করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিতে হয়, কেহই কিছু অনুভব করে না; ব্রহ্মই কেবল বোধরূপে বর্ত্তমান। বদ্ধ ব্যক্তির জ্ঞানে ব্রহ্মই জগৎ-আকারে প্রতীয়মান হন। মুক্ত ব্যক্তি বোধ করেন দৃশ্য-প্রপঞ্চ কিছুই নাই, কেবল বিশুদ্ধ ব্রহ্মই বিদ্যমান। ব্রহ্ম হইত জগৎ উৎপন্ন হয় না (নির্ব্বাণ প্রকরণ—উত্তর ভাগ, ১১২ সর্গ)।

মুক্তির পথে সাতটি ক্রমের নির্দ্দেশ যোগবাশিষ্ঠে আছে। প্রথমে সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রচর্চ্চা। দ্বিতীয় ভূমিকা বিচারণা। তৃতীয় অসঙ্গ আত্মার ভাবনা। চতুর্থ বিলাপনা। এই ভূমিকায় বাসনা-বিলয় দ্বারা তত্ত্ব-সাক্ষাৎ করিয়া জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের ধারণা হয়। পঞ্চম ভূমিকা বিশুদ্ধ চিন্ময় আনন্দরূপ অবস্থা। এই অবস্থায় যোগী অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধপ্রবুদ্ধের ন্যায় জীবন্মুক্তরূপে অবস্থান করেন। ষষ্ঠ ভূমিকায় সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় আনন্দ-ঘন আকারে অবস্থিতি। তাহার পরে যখন তাদৃশী বৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন একমাত্র ব্রহ্মই পূর্ণ-প্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকেন। তখন জীবিতাবস্থায় যে অবস্থিতি, তাহাই সপ্তম ভূমিকা। ইহাকে তুরীয়াবস্থা বলে। তুরীয় অবস্থার অতীত যে অবস্থা, তাহা পরম নির্ব্বাণ-স্বরূপ – সপ্তম ভূমিকার চরম অবস্থা। সে অবস্থা জীবিত ব্যক্তির হয় না। এই অবস্থাপন্ন যোগীকে মুক্ত বলা যায়। তখন সুখ বা দুঃখে যোগীর বুদ্ধি বিচলিত হয় না। তখন শরীর থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যোগী তখন "আমি চিৎ, অন্য কিছু নহি," কেবল এই মাত্র বোধ করেন। তিনি বোধ করেন, "আমি অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, শান্ত চিৎ-স্বরূপ দেবতা, মনুষ্য, হস্তী, সূর্য্য, আকাশ প্রভৃতি সকল বস্তুতে যিনি রহিয়াছেন, আমি সেই নিত্য চিদ্-বস্তু; রাগশূন্য, বাসনাশূন্য চিদাকাশ।"

যোগবাশিষ্ঠ মুক্তির জন্য কঠোর তপস্যার বিধি দেন নাই।

"স্ব-পৌরুষ-প্রযত্নেন, বিবেকেন বিকাশিনা।"

স দেব জ্ঞায়তে রাম, ন তপঃ-স্নান-কর্ম্মভিঃ।

পৌরুষ ও বিবেক দ্বারাই সেই দেব জ্ঞাত হন; তপঃ ও স্নান-কর্ম্ম দ্বারা নয়। মনের কালিমা ধুইয়া ফেলিতে না পারিলে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল দম্ভ ও অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। মুক্তির জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই প্রয়োজন।

যোগবাশিষ্ঠে "যোগ" শব্দ বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদ্গণ সমস্ত ভেদবিস্মৃতিই জীব-ব্রহ্মের একতারূপ যোগ বলিয়া জানেন।" "বুধগণ

বাহ্য বস্তুর বিস্মৃতিপূর্ব্বক যথার্থ চিত্তক্ষয়কেই যোগ বলিয়া থাকেন।" (৬।১২৬) "যোগ ও জ্ঞান চিত্তনাশের প্রধান উপায়। চিত্তের ব্যাপক নিরোধকে যোগ ও বস্তুর সম্যক্ দর্শনকে জ্ঞান বলে।" (৫।৭৫) যোগকে "অবেদনে"র অবস্থা এবং "ইচ্ছা-বিষ-বিকারের বিয়োগও" বলা হইয়াছে। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। অবিদ্যা নাই, মায়াও নাই। আছেন কেবল শান্ত ব্রহ্ম। তিনিই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। "কেহ ইহাকে শ্বাস বলেন, ও কেহ বলেন বিজ্ঞান, কেহ বলেন ঈশ্বর। মনন-বর্জ্জিত প্রশান্ত-বুদ্ধি ক্ষীণচিত্ত হইয়া তুমি মৌনী হও। চিত্তের সত্তাই পরম দুঃখ। চিত্তের অসত্তাই পরম সুখ। তুমি চিন্ময়াত্মা হও, বাহ্য রমণীয় বস্তু অরমণীয় জ্ঞান করিয়া, তাহাদের ভাবনা ত্যাগ করিয়া পাষাণবৎ নিশ্চল হও।"

যোগবাশিষ্ঠে মনের ক্রিয়াই কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। মননক্রিয়া প্রকাশিত হয় বিষয়-বিষয়ি-ভেদ যুক্ত জ্ঞানে। কর্ম্ম-ত্যাগ ও মনের ক্রিয়া-ত্যাগ একই কথা। মনের ক্রিয়া হইতেই যখন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখন কর্ম্মত্যাগ ও জ্ঞাননাশ একই। মনের স্পন্দন হইতে অহমের এবং চেত্য (বিষয়) দিগের উদ্ভব হয়। মনের ক্রিয়ার নাশের সঙ্গে জ্ঞানের নাশই মুক্তির লক্ষ্য।

পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দেহবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষের মূল কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের মূল জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগের মূল জগৎত্রয়-ব্যাপী মন। মনের মূল চেত্য-ভাব-উন্মুখ চিৎ-আত্মা, যাহা যাবতীয় চেত্যের কারণ। তাহার মূল ব্রহ্ম। চেত্যোন্মুখী চিৎই নিখিল কর্ম্মের বীজ। ঐ বীজ প্রথমে আপনাকে "অহং" রূপে ভাবনা করিয়া ক্রিয়াত্মক স্পন্দরূপে উদ্‌ভূত হয়। চৈতন্য চেত্যাকার ভাবনা দ্বারা আক্রান্ত হইলে কর্ম্মের বীজ হইয়া ওঠে। এই চিৎ অন্তরে ও বাহিরে যেরূপ অনুভব করে, তাহা অসত্য হইলেও তদাকার দৃশ্য হইয়া উঠে। চিৎই ঐ ভ্রান্তিরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। কেননা, ইচ্ছা, মন, সঙ্কল্প, কর্ম্ম প্রভৃতি উহারই বিভিন্ন নাম। জীবদ্দশায় চিত্তের ত্যাগ হইতে পারে না। তবে "আমি অসঙ্গ-অদ্বিতীয়-কূটস্থচৈতন্য", এইরূপ ভাবনা দ্বারা বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিলে কর্ম্মত্যাগ করিয়া মন আত্মারূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। অন্য কোনও উপায়ে কর্ম্মত্যাগ সম্ভবপর নহে।

মনন-ক্রিয়ার উত্তেজক কোনও কারণ নাই। কিন্তু এই মনন হইতেই অহং এবং চৈত্য (বিষয়) সকলের উদ্ভব হয়।

সমালোচনা

যোগবাশিষ্ঠে ব্যাখ্যাত দর্শনের সহিত শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ মিল নাই। প্রপঞ্চের মধ্যে অবস্থিত অহং-জ্ঞানী জীবের অস্তিত্ব যতটুকু সত্য, জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্বও ততটুকু সত্য। যাহা বাহ্যবস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা জীবের মনের সৃষ্ট নহে। তাহার মনোবাহ্য অস্তিত্ব আছে। বৌদ্ধ বিজ্ঞান-বাদ-খণ্ডনে শঙ্কর ইহা স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর বৌদ্ধ মতের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই :—

যখন যুগপৎ দুই বস্তুর অনুভব হয়, তখন তাহারা অভিন্ন। জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের অনুভব এক সঙ্গে হয়, সুতরাং জ্ঞান ও বিষয় অভিন্ন। বাহ্য জগতে এমন কিছু নাই, যাহা আমাদের প্রত্যয়ের (Ideas) অনুরূপ। স্বপ্নাবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন আমাদের মনে প্রত্যয়দিগের আবির্ভাব-দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, প্রত্যয়দিগের (জ্ঞানের) উৎপাদন ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ব্যতীতও হইতে পারে। বাহ্য জগতের সহিত প্রত্যয়দিগের সম্বন্ধ প্রমাণ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে, বিভিন্ন প্রত্যয় কিরূপে উৎপন্ন হয়, ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, বাসনা-শক্তি কর্তৃক উহারা উৎপন্ন হইতে পারে।—অর্থাৎ যে-ক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষণের সামর্থ্যাতিশয়" দ্বারা তাহারা উৎপন্ন হইতে পারে; সেই সামর্থ্য বাসনার পরিণাম। যদি বল, বিভিন্ন বাহ্য বস্তুর বিভিন্ন গুণ আছে বলিয়া বিভিন্ন প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বলিব যে, বিভিন্ন ক্ষণেরও বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য আছে, ইহা মনে করা যাইতে পারে। স্বপ্নে এই সকল ক্ষণ দ্বারাই বিভিন্ন প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। এই যুক্তির উত্তরে শঙ্কর বলেন, বাহ্য বস্তুসকল যখন সমস্ত প্রত্যক্ষেই অব্যবহিত রূপে পরিজ্ঞাত হয়, তখন তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি বল, ইন্দ্রিয়ের 'সংবেদন ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রতীতির অন্য কোনও বিষয় নাই, অথবা যদি বল, কোনও বস্তুর অস্তিত্বের অর্থ হইতেছে তাহার অনুভব, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, বস্তুর প্রতীতি হইতে ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব যে আছে, তাহা প্রতীতির স্বরূপ হইতেই জানা যায়। কোনও বস্তুর প্রতীতি ও সেই বস্তু এক বলিয়া অনুভূত হয় না। যে নীলবর্ণ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নীলবর্ণের জ্ঞান হইতে ভিন্ন রূপে—তাহার বিষয়-রূপে জ্ঞাত

হয়। তাহা কখনও সেই জ্ঞানের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী যখন বলেন যে, যাহা আমাদের আভ্যন্তরীণ জ্ঞান, তাহাই আমাদের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, তখন তিনি এই বাহ্য অস্তিত্বের ভেদ একপ্রকার স্বীকার করেন। বাহ্য কিছুই যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাহার বোধ হয় কিরূপে? যখন সমস্ত অনুভবেই জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের ভেদ, এবং মনন ও প্রত্যয়ের আধার অন্তর্জগৎ এবং বাহ্য বিষয়-জগতের ভেদ অনুভূত হয়, তখন এ-ভেদ অস্বীকার করা অসম্ভব। কোনও ঘট দেখা এক মানসিক ক্রিয়া, তাহার স্মরণ অন্য মানসিক ক্রিয়া, কিন্তু উভয় ক্রিয়াতেই একই বিষয় বর্ত্তমান। ইহা হইতে শঙ্কর যে জ্ঞানের বিষয়ের জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শঙ্করের এই স্বীকৃতি বাহ্য বস্তুর ব্যবহারিক অস্তিত্বের স্বীকৃতি, মায়ামুগ্ধ জগতে যেরূপে প্রতীতি হয়, তাহারই বর্ণনা। প্রকৃত পক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই।

যোগবাশিষ্ঠের মতে বাহ্য-জগৎ মনের সৃষ্টি। মনের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদে প্রত্যয়ের আধার কোনও সার্ব্বিক মনের (Mind) অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। যোগবাশিষ্ঠের মতে ব্রহ্মের কল্পনা হইতে সকল সৃষ্টি হয়। ব্রহ্ম কল্পনা করেন যে জীব প্রত্যক্ষ করিতেছে এবং সেই কল্পনার ফলে জীব ও তাহার প্রত্যক্ষ জগৎ উভয়েরই আবির্ভাব হয়। সৃষ্টি ও তাহার পরে প্রলয় উভয়ই ব্রহ্মের কল্পনা। ব্রহ্ম কবি, বিশ্ব তাঁহার কাব্য। সেই কাব্যই স্থূল রূপে প্রকাশিত। চলচ্চিত্রে নাটকের যাবতীয় ঘটনা যেমন এক সঙ্গে চিত্রে গ্রথিত থাকে. কিন্তু দর্শকের নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয়রূপে জগতের ইতিহাস এক সঙ্গে ব্রহ্মের মনে বর্ত্তমান।

শঙ্করোত্তর বেদান্ত দর্শনে প্রকাশানন্দের "বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী"তে "অজ্ঞাত-সত্তার" অস্তিত্ব অস্বীকৃত। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রকাশানন্দ স্বীকার করেন নাই। প্রকাশানন্দের মতে যতক্ষণ বিষয়ের জ্ঞান থাকে, ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব থাকে এবং তাহাদের প্রতীতি হইতে স্বতন্ত্র কোনও রূপ অস্তিত্ব বাহ্যবস্তুর নাই (দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ)। * এই মতের সহিত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সাদৃশ্য

---

* ডাঃ দাসগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ—২৭

আছে। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠের মত ইহা হইতে ভিন্ন। যোগবাশিষ্ঠের মতে সমস্ত সৃষ্টি ব্রহ্মের মনের মধ্যে বর্ত্তমান।

শঙ্করের মতে বাহ্যবস্তু যেরূপে জ্ঞাত হয়, সেই রূপেই তাহারা মনের বাহিরে বর্ত্তমান; মনে তাহাদের যে জ্ঞান হয়, তাহার উপর বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। ইহাকে একপ্রকার বস্তুবাদ বলা যায়। কিন্তু বাহ্যবস্তু শঙ্করের মতে ব্রহ্মে অধ্যস্ত,—তাহার তলদেশে ব্রহ্মই সৎরূপে বর্ত্তমান। অন্তর্জগতেও ব্রহ্মই অনুস্যূত। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মই অন্তরে ও বাহিরে নামরূপে প্রকাশিত। ইহা অধ্যাত্মবাদ। অধ্যাসের কারণ যে মায়া, তাহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ শাঙ্কর দর্শনে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। শঙ্কর যাহাকে মায়া বলিয়াছেন, যোগবাশিষ্ঠ তাহাকে শক্তি বলিয়াছেন। সেই শক্তিবশতঃ স্পন্দের উদ্ভব হয়। যোগবাশিষ্ঠের মতে যাহা পরম সত্য, তাহা ব্রহ্ম। তাহাকে চিৎ ও শূন্যও বলিয়াছেন। তাহা নির্গুণ। ব্রহ্মের শক্তি হইতে যে স্পন্দের উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই যাবতীয় সৃষ্টি হয়। বিষয়ি-বিষয়হীন চিৎ হইতে বিষয়ি-বিষয়ীভূত মনের উদ্ভব হয়। মন হইতে সমস্ত সৃষ্টি হয়। কিরূপে হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যোগবাশিষ্ঠে নাই।

যোগবাশিষ্ঠে মুক্তিকে কোথায়ও পরম আনন্দের অবস্থা বলা হইয়াছে। কোথায়ও বা "পাষাণবৎ" অচেতন অবস্থা বলা হইয়াছে। উদ্দালকের কাহিনী-বর্ণনায় বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—(উপশম প্রকরণ—৫২-৫৫—সর্গ) "তখন সর্ব্ববিধ বিক্ষোভের শান্তি হওয়াতে **নিবৃত্তিপর আনন্দ-স্বরূপ** পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, এবং তাঁহার চিত্ত সম্যক্‌রূপে বিচলিত হইলে, সমুদয় কর্ম্মবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে তদীয় জন্মপাশ একেবারে ছিন্ন হইল।...তিনি অমল ব্রহ্মাকার ধারণ করিলেন।" বিদেহ-মুক্ত অবস্থায় অবস্থিত হইতে ইচ্ছা করিয়া উদ্দালক বিশ্বভূত চিৎ-সামান্যের অনুসন্ধান অভ্যাস করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দ-স্পন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং চিৎসামান্য দশায় লয় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী আত্মসামান্য দশা প্রাপ্ত হইলেন। তখন অনুপম পরমানন্দে প্রসন্ন তাঁহার মুখমণ্ডল পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। মননাদিজনিত সংসার-ভ্রান্তি তিরোহিত হইল। কতিপয় দিবস মধ্যে তিনি স্বস্তিপদে উপশান্ত হইলেন এবং পরমসুখময় পদ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর বাক্‌পথাতীত অনন্ত, সত্য ও আনন্দ-প্রচুর পরমসুখে পরিণত হইলেন। ঐ সুখের অভ্যন্তরে নিখিল জগৎ বর্ত্তমান। উদ্দালকের এই অবস্থা মুক্তির। কিন্তু অন্যত্র মুক্তিকে পাষাণবৎ বলা হইয়াছে। মুক্তির

দ্বিবিধ বর্ণনা হইতে সমগ্র গ্রন্থ একজনের রচিত কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

শঙ্করের মতে কেবল জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। যোগবাশিষ্ঠমতে মুক্তির জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই প্রয়োজন। শাস্ত্রপাঠ, সাধুসেবা এবং বিচারণা এই সকল কর্ম্ম মুক্তির জন্য আবশ্যক। ধর্ম্ম-জীবন লাভের জন্য আন্তরিক চেষ্টা বিহীন বাহ্য-অনুষ্ঠান যোগবাশিষ্ঠমতে নিতান্তই মূল্যহীন।
